ী, করাচী, পাটনা, বিহার, উৎকল ও গৌহাটি বি...

ডিয়েট, বি. এ. ও বি. টি. পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের বা...

...সাহিত্যের বিবিধ পরীক্ষার জন্য নব পরিকল্পনায় লিখিত

...একের ভিতরে চার

...নয় সরকার, এম. এ., নাট্যবিশারদ

...ক, বাংলা ও সাহিত্য-বিভাগ, সিটি কলেজ (সাধারণ ও বাণিজ্য

...তা। ...র্ব অধ্যাপক, ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে সেণ্ট্রাল

...জ), ক... গভর্নমেণ্ট কমার্শিয়াল কলেজ (বর্তমানে গোয়েংক

...ব কম ...কলিকাতা; বালিগঞ্জ গার্লস্ কলেজ (বর্তমানে মুরলীধর

কলে... ...কলিকাতা। প্রাক্তন পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা...

প্র... 'ব্যাকবণিকা', 'প্রবেশিকা বাংলা ব্যাকরণ-সার', 'এ স্ট...

...অব্ কমার্শিয়াল বেংগলী', 'দেবত্র' নাটক প্রভৃতি।

সম্পা... 'কপালকুণ্ডলা' ['কপালকুণ্ডলা-পরিচিতি' সংবলিত],

...নী', '... সাহিত্য-বোধিনী', 'আধুনিক সাহিত্য-বোধিনী', 'মেঘ...

...মেঘনা... ...ব্য-বোধিনী' সংবলিত], 'মাধ্যমিক বাংলা-বোধিনী' '...

বো... ...রাজপুত জীবনসন্ধ্যা-বোধিনী', 'গল্পগুচ্ছ-বোধিনী', 'ছে...

...র পাগলী বোধিনী', 'গৃহদাহ-পরিচিতি' ইত্যা...
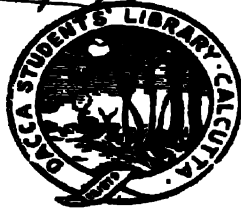
দি ঢাকা ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

৬নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

১৯৫৭

প্রথম খণ্ড

ব্যাকরণ

প্রথম পর্ব—ধ্বনি-প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

বর্ণপরিচয় : উচ্চারণ-তত্ত্ব

বর্ণপরিচয়

ভাষায় উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষ করিলে **ধ্বনি** পাওয়া যায়। ধ্বনি দুই জাতের—এক জাতীয় ধ্বনি অপর জাতীয় ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংপূর্ণ ও পরিস্ফুট ভাবে উচ্চারিত হয় এবং ইহাকেই আশ্রয় করিয়া অপর জাতীয় ধ্বনি, যাহা একলা স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইবার যোগ্য নয়, তাহাই ব্যক্ত হয়—এইরূপ স্বয়ংপূর্ণ ধ্বনিই **স্বরধ্বনি** এবং পরনির্ভরশীল ধ্বনিই **ব্যঞ্জনধ্বনি** : যেমন—'ক্' একটি ব্যঞ্জনধ্বনি ; ইহাকে শ্রুতিযোগ্য করিয়া উৎকৃষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে হইলে স্বরধ্বনির আশ্রয় লইতে হয় অর্থাৎ ক = ক্ + অ ; কা = ক্ + আ, কি = ক্ + ই। ধ্বনিনির্দেশক চিহ্নকে **বর্ণ** বলা হয়। কিন্তু বর্ণ এবং অক্ষর এক জিনিস নয়, আলাদা। কোন শব্দ যখন একসংগে যতটুক উচ্চারিত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় **অক্ষর** : যেমন,—'কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান'—এই চরণটিতে চোদ্দটি অক্ষর আছে, কিন্তু চব্বিশটি বর্ণ আছে। অতএব, বাংলা অক্ষর ইংরাজি Syllable শ্রেণীরই সামগ্রীবিশেষ।

স্বরধ্বনিবোধক চিহ্নকে **স্বরবর্ণ** এবং ব্যঞ্জনধ্বনিবোধক চিহ্নকে **ব্যঞ্জনবর্ণ** বলা হয়। ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিদ্যোতক চিহ্নাদির সমষ্টিকে বলা হয় **বর্ণমালা**। বাংলা বর্ণমালায় অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, (ৠ, ঌ), এ, ঐ, ও ঔ—**ইহারা স্বরবর্ণ** এবং ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ; ত, থ, দ, ধ, ন ; প, ফ, ব, ভ, ম ; য, র, ল, ব ; শ, ষ, স, হ ; ড়, ঢ় ; য় ; ং, ঃ, ঁ—**ইহারা ব্যঞ্জনবর্ণ**। অ-ভিন্ন অন্যান্য স্বরবর্ণ তাহাদের সংক্ষিপ্ত রূপ লইয়া ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হয়। ইহাদের সংক্ষিপ্ত রূপ এইরূপ :—[া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ৄ, ৢ, ে, ৈ, ো, ৌ]। পক্ষান্তরে,

অ-কারের নিমিত্ত কোন সংক্ষিপ্ত রূপ নাই—অ-কার ব্যঞ্জনবর্ণের গায়েরই মধ্যে মিশিয়া থাকে। তাই (্) এই চিহ্নটি ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে বসাইলে অ-কারের লোপ জানানো হয়; এই বিশিষ্ট চিহ্নেরই নাম **হসন্তচিহ্ন**। বাংলায় হসন্তচিহ্নের ব্যবহারে বড়ই শিথিলতা দেখা যায়। ইহা ঠিক নয়। বাংলায় ব্যবহৃত হসন্ত তৎসম শব্দগুলিতে হসন্তচিহ্ন থাকা উচিত। ইহা ছাড়া, বাংলায় যুক্তাক্ষর ভাঙিয়া লিখিবার কালে হসন্ত-চিহ্ন অবশ্যই দিতে হইবে: যেমন,—মহান্, উদ্‌ঘাটন।

স্বরবর্ণের উচ্চারণ আলোচনা

অ—(ক) সাধারণ বা **স্বকীয়** উচ্চারণ: যথা,—কথা; চলা, অধীর। ইহার উচ্চারণ অনেকটা ইংরাজি law-এর স্বরধ্বনির ন্যায়। (খ) ও-কারবৎ উচ্চারণ—সাধারণত পরবর্তী অক্ষরে ই বা উ-ধ্বনি যদি থাকে অথবা য-ফলা বা ক্ষ [যাহার বাংলা উচ্চারণ 'খ্য'] যদি থাকে, তাহা হইলে অ-কার ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়: যথা,—অতি [= ওতি], বস্তু [= বোস্তু], তাৎপর্য [= তাৎপোর্‌জো]। আবার একাক্ষর শব্দে অ-কার দীর্ঘ রূপেও উচ্চারিত হয়: যথা,—জল [= জ—ল্]।

লুপ্ত অ কার—সন্ধি অর্থাৎ শব্দের ধ্বনিমিলন ঘটিলে অ-কারের লোপ হয়। এই ঘটনাটি বুঝাইবার জন্য এক অনুচ্চার্য অক্ষর আছে—ঽ। ইহার অবস্থানই আছে, উচ্চারণ নাই: যথা,—ততোঽধিক [= ততঃ + অধিক]-এর উচ্চারণ [= ততোধিক]।

আ—(ক) একাক্ষর শব্দে আ-কার দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত হয়: যথা,—নাম [= না—ম্]। (খ) আ-কার অপেক্ষাকৃত হ্রস্বভাবেও উচ্চারিত হয়: যথা,—নামা। (গ) হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী থাকিলে আ-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘের মাঝামাঝি হয়: যথা,—কাট্, মার্।

ই, ঈ—(ক) একাক্ষর পদে ই ঈ দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত হয়: যথা,—দিন, দীন। (খ) একাধিক অক্ষরের পদে কিংবা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যে ই ঈ হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হয়: যথা,—দিন-কাল, কলমটি আমায় দিন্ দেখি, দীন-দুনিয়ার মালিক, দীন-দুঃখী।

উ, ঊ—(ক) একাক্ষর পদে উ ঊ দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত হয়: যথা,—পুব, পূব, পুর, পূর। (খ) একাধিক অক্ষরের পদে কিংবা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যে উ ঊ হ্রস্ব ভাবে উচ্চারিত হয়: যথা, পুব-দিক, পূব-মুখো চলেছ বুঝি, আলিপুর যাবে নাকি, কচুরির পুরটি খেয়ে দেখ তো।

ঋ, ৠ, ঌ—সংস্কৃতে এইগুলি স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হইত, কিন্তু বাংলায় এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ এইরূপ:—রি, রী, লি। বাংলায় এইগুলিকে প্রকৃতপক্ষে স্বরধ্বনি বলা যায় না। কারণ,—র, ল-এর সহিত সংযুক্ত ই অথবা ঈ-ধ্বনি লইয়াই

ঋ ৠ, ঌ-এর উচ্চারণ-পদ্ধতি। সংস্কৃত বর্ণমালাকে অনুসরণ করিয়া এইগুলিকে বাংলা বর্ণমালাতেও রাখা হইয়াছে। বাংলায় ঌ-এর ব্যবহার নাই।

এ—(ক) সাধারণ বা স্বকীয় উচ্চারণ : যথা,—কেশ, মেষ, শেষ। এ-কারের উচ্চারণটি Fame-এর 'a' স্বরধ্বনির ন্যায়। (খ) বিকৃত উচ্চারণ : যথা,—একা [=অ্যাকা], খেলা [=খ্যালা]। এ-কারের এইরূপ বিকৃত উচ্চারণ শব্দের আদিতেই কেবল মিলে। এই বিকৃত উচ্চারণটি Bad-এর 'a' স্বরধ্বনি অর্থাৎ 'অ্যা'-এর ন্যায়।

ও—ও-কারের উচ্চারণটি ইংরাজি শব্দ 'robe, roap'-এর 'o, oa'-র স্বরধ্বনির ন্যায় হয় : যথা,—লোক, বোগা, বিয়োগ, পুরোহিত।

ঐ, ঔ—ঐ-কার এবং ঔ-কারকে বাংলায় **যৌগিক স্বরধ্বনি** বা **সন্ধ্যক্ষর** (Dipthong) বলা হয়। 'ও' এবং 'ই'—এই দুইটি স্বরধ্বনির দ্রুত উচ্চারণের ফলে 'ঐ' আবার 'ও' এবং 'উ'—এই দুইটি স্বরধ্বনির দ্রুত উচ্চারণের ফলে 'ঔ' সন্ধ্যক্ষরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে : যথা,—ধৈর্য [=ধোইর্‌জো], চৈতন্য [=চোইতোন্‌নো], কৌরব [=কোউরব্]।

মন্তব্য : একটিমাত্র স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময়ে যদি দুইটি স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে **সন্ধ্যক্ষর** বা **সংযুক্ত স্বর** বলা হয়। সন্ধ্যক্ষরে দুইটি মিলিত স্বরধ্বনি একটি অখণ্ড একক স্বরধ্বনি সৃষ্টি করে। চলিত বাংলায় পঁচিশটি সন্ধ্যক্ষর বা সংযুক্ত স্বর আছে।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-আলোচনা

ক্ হইতে ম্ অবধি পঁচিশটি বর্ণ **স্পর্শবর্ণ**। কারণ, এই বর্ণগুলির উচ্চারণে জিহ্বার কোন-না-কোন অংশের সহিত কণ্ঠ, তালু বা দন্তের কিংবা ওষ্ঠে ও অধরে স্পর্শ হয়ই, ক-বর্গ, ট-বর্গ এবং প-বর্গের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বর্ণগুলির উচ্চারণ-সময়ে মুখবিবরের বিশেষ স্থান স্পৃষ্ট হয় বলিয়া ইহারা **স্পৃষ্টবর্ণ**। চ্ ছ্ জ্ ঝ্—ইহাদিগের উচ্চারণকালে জিহ্বা এবং তালুর স্পর্শের পরেই উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণ-জাত ধ্বনি বাহির হয় বলিয়া ইহারা **ঘৃষ্টবর্ণ**। ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্—ইহাদিগের উচ্চারণ-কালে মুখের ভিতরে কিংবা ঠোঁটে-ঠোঁটে স্পর্শ ঘটিয়া থাকে এবং মুখের ভিতরকার বাতাস মুখপথ দিয়া বাহির না হইয়া নাক দিয়া বাহির হয় বলিয়া ইহারা **নাসিক্য** বা **অনুনাসিক ধ্বনি**।

ক-বর্গ—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্। জিহ্বার মূল বা পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা কণ্ঠের দিকে তালুর কোমল অংশে স্পর্শ করিয়া এই বর্ণমালার ধ্বনি উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **জিহ্বামূলীয় বর্ণ** বলা হয়। ঙ্—প্রাচীন সময়ে এই বর্ণটির উচ্চারণ ছিল—'উঁঅ্'। এখন ঙ্-বর্ণের উচ্চারণ ইংরাজি Sing-শব্দের ng-র ন্যায়।

চ-বর্গ—চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্। জিহ্বার মধ্যভাগ-দ্বারা তালুর সম্মুখ বা কঠিন অংশে স্পর্শ বা ঘর্ষণ করিয়া এই বর্ণমালার ধ্বনি উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **তালব্য বর্ণ** বলা হয়। বাংলা চ্ ছ্ জ্ ঝ্-এর উচ্চারণ যথাক্রমে ইংরাজি ch বা tch, ch-h বা tch-h, j বা dg এবং j-h বা dg-h-এর ন্যায়। কিন্তু পূব ও উত্তর বংগে এই বর্ণমালার উচ্চারণ অন্যবিধ। **ঞ**—এই বর্ণটির উচ্চারণ সানুনাসিক য় বা ইয়্-র ন্যায়। তাই বর্ণটির নাম 'ইয়ঁ'। সাধারণত চ বর্গের বর্ণগুলির পূর্বে অবস্থিত এই বর্ণটির উচ্চারণ দন্ত্য ন-কারবৎ হয়: যথা,—পঞ্চ [= পন্‌চ], অঞ্জলি [= অন্‌জোলি], আবার অন্যত্র য়ঁ-এর মত উচ্চারণও হয়: যথা,—মিঞা [= মিয়াঁ]। সংস্কৃত যাচ্ঞা শব্দের পুরানো বাংলা উচ্চারণ [= জাচিঙ্গা], আধুনিক বাংলা উচ্চারণ [= জাচ্‌ঞা]। কিন্তু জ্ + ঞ্ অর্থাৎ জ্ঞ্-এর উচ্চারণ বাংলায় [= গ্যঁ]: যথা,—আজ্ঞা [আগ্‌গ্যাঁ] —পশ্চিম বংগে [= আঁগ্‌গ্যাঁ, আঁগ্‌গে], কিন্তু পূর্ব বংগে [= আইগ্‌গ্যা]]

ট-বর্গ—ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্। জিহ্বার অগ্রভাগকে প্রতিবেষ্টিত করিয়া অর্থাৎ উল্‌টাইয়া মূর্ধন বা মূর্ধা-প্রদেশে অর্থাৎ তালুর শীর্ষদেশের নিকট (অবশ্য সাধারণ বাংলা উচ্চারণে আরও একটু নিম্নে), স্পর্শ করিতে হয় বলিয়া এই বর্ণমালাকে **মূর্ধন্য বর্ণ** বলা হয়। জিহ্বাগ্রকে উল্‌টাইয়া লইয়া উচ্চারণ করা—ইহাই হইতেছে মূর্ধন্য বর্ণমালার বিশিষ্ট লক্ষণ, তাই ইহাদিগকে **প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি** বলা হয়। **ট্ ড্**—ইংরাজির t, d-ধ্বনি আমাদের কানে ট্, ড্-এর মত শুনাইলেও, ঐ ইংরাজি শব্দ দুইটি দন্তমূলীয়, অর্থাৎ ইংরাজি t, d-ধ্বনি আমাদের দন্ত্য ত্, দ্-এর সগোত্র—আমাদের মূর্ধন্য ট্, ড্-এর সগোত্র নয়। **ড়্ ঢ়্**—শব্দের মধ্যে ও অন্তে ড্ ঢ্ বাংলায় ড়্ ঢ়্ হয়। বিন্দুযুক্ত ড্ ঢ্ অর্থাৎ ড়্ ঢ়্ বর্ণদ্বয় বাংলায় নূতন—প্রাচীন বাংলায় বা তাহারও অগ্রবর্তী বাংলার বর্ণমালায় ড়্ ঢ়্ বর্ণদ্বয় নাই: যথা,—বিডাল, ক্রীডা। ড়্ ধ্বনি একটি ক্ষণিক ধ্বনি। জিহ্বার অধোভাগ বা তলা দিয়া দন্তমূলে তাড়ন বা আঘাত হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই ধ্বনিকে **তাড়নজাত ধ্বনি** বলা হয়। ড়্-এর মহাপ্রাণ রূপ হইতেছে ঢ়্। পূর্ব বংগে সাধারণত এবং পশ্চিম বংগের স্থানবিশেষে 'ড়্' 'র্'-এর মত উচ্চারিত হয়: যথা—'ঘর ভাড়া' স্থলে লেখায় এবং সময়ে কথাতেও 'ঘড ভারা' প্রচলিত আছে। **ণ**—মূর্ধন্য ণ-এর ধ্বনি বাংলায় লুপ্ত—ইহার উচ্চারণ বাংলায় দন্ত্য ন-এর মতই, যথা, কাণ [= কান]; পুরাণ [পুরান]। তবে, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্-এর আগে ণ-কারের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। 'ঘণ্টা' 'কণ্ঠ' প্রভৃতির উচ্চারণ কালে জিহ্বা উল্‌টাইয়া মূর্ধন্য-স্থানে মূর্ধন্য ণ-কার ধ্বনিত হয়, কিন্তু বাঙালীর কানে তাহা দন্ত্য ন-কারের ন্যায় শোনায়। বিশুদ্ধ মূর্ধন্য ণ-এর ধ্বনি কানে খানিকটা [ড়ঁ-] এর মত শোনা যায়।

ত-বর্গ—ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্। জিহ্বার অগ্রবর্তী অংশকে পাখার ন্যায় মেলিয়া তাহার দ্বারা উপরিস্থ দন্তসারির পিছনের দিকে নিম্নভাগে স্পর্শ করিয়া এই বর্ণমালার উচ্চারণ করিতে হয় বলিয়া ইহাদিগকে **দন্ত্য বর্ণ** বলা হয়। **ন্**—দন্ত্য ন-এর শুদ্ধ উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তশ্রেণীর একটু ঊর্ধ্বে কোনও স্থানে ঠেকে। কিন্তু ত্, থ্, দ্, ধ্-এর পূর্ববর্তী ন-কারের উচ্চারণে জিহ্বা একেবারে দাঁতের উপরে ঠেকিয়া থাকে। 'প্রান্ত, কন্থা, মন্দ, অন্ধ' প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে ইহা লক্ষণীয়।

প-বর্গ—প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্। এই বর্ণমালার উচ্চারণে ওষ্ঠ এবং অধর পরস্পর কর্তৃক স্পৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাদিগকে **ওষ্ঠ্য বর্ণ** বলা হয়। **ফ্ ভ্**—মহাপ্রাণ বর্ণ ফ্ ও ভ্-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ হইতেছে প্+হ্ এবং ব্+হ্ অর্থাৎ ইংরাজির loop-hole, club house-এর 'p-h' এবং 'b-h'-এর ন্যায় ফ্ ও ভ্-এর উচ্চারণ হওয়া উচিত; যথা,—প্রফুল্ল [=প্রপ্ হুল্ল], প্রভা [=প্রব্ হা]। কিন্তু বাংলায় ফ্ ও ভ্ বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ স্পৃষ্টধ্বনি নয়—Spirant বা উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ বাংলায় 'ফ্ ও ভ্'-এর উচ্চারণ কতকটা f ও v-এর ন্যায় হয়: যথা,—প্রফুল্ল [=Profullo], প্রভাত [=Provat]। ইংরাজিতে বাংলা নামের এইরূপ বানানই লেখা হয়। কিন্তু ফ্, ভ্-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে ইংরাজিতে লেখা উচিত—Praphulla ; Prabhat।

অন্তঃস্থ বর্ণ—য্ র্ ল্ ব্। একদিকে ক্ হইতে ম্ অবধি পঁচিশটি স্পর্শবর্ণ এবং অন্যদিকে শ্ ষ্ স্ হ্ এই চারিটি উষ্মবর্ণ—এই উভয় তরফের অন্তঃ বা অন্তরস্থিত অর্থাৎ মধ্যবর্তী য্ র্ ল্ ব্ এই চারিটি বর্ণকে **অন্তঃস্থ বর্ণ** বলা হয়। এই চারিটি বর্ণের মধ্যে য্ (=y), ব্ (=w) হইতেছে **অর্ধস্বর** এবং র্, ল্ হইতেছে **তরল স্বর**। এই চারিটি অক্ষরের অন্তর্নিহিত অ-কারকে বাদ দিলে যথাক্রমে স্বরধ্বনি ই, ঋ, ঌ, উ মিলে। **য্**—এই বর্ণের প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ [=ইঅ], কিন্তু প্রাকৃতে ও তদনুসারে বাংলায় ইহার বর্তমান উচ্চারণ [=জ]। আর য-কারের প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ [=ইঅ]-কে জানাইবার নিমিত্ত আধুনিক কালে বাংলায় 'বিন্দুযুক্ত য' অর্থাৎ 'য়' অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। **জ্**-এর উচ্চারণ ইংরাজি [j] এবং 'য়্'-এর উচ্চারণ ইংরাজি [y]-এর ন্যায় হওয়া সমীচীন। (ক) পদের আদিস্থিত 'য্' সর্বত্রই নিজ উচ্চারণ রাখে : যথা,—যন্ত্র; যম। (খ) পদের মধ্যস্থিত 'য্' কখনও-বা নিজ উচ্চারণ রাখে, আবার কখনও-বা 'য়্' উচ্চারণ গ্রহণ করে : যথা,—বিয়োগ, প্রয়োগ, সংযোগ, উপযোগী। (গ) পদের অন্ত্যস্থিত 'য়্' অ-কারের ন্যায় উচ্চারিত হয় : যথা,—তনয়; সময়। **র্**—জিহ্বার অগ্রবর্তী অংশকে কাঁপাইয়া সেই কম্পমান অংশের দ্বারা দন্তমূলে একাধিক বার দ্রুত আঘাত করিয়া র-ধ্বনির উৎপত্তি হয় বলিয়া

এই ধ্বনিকে **কম্পনজাত ধ্বনি** বলা হয়। ইংরাজি 'r'-এব উচ্চারণ বাংলা 'র'-এর উচ্চারণ হইতে বিশেষ পৃথক। **ল্**—ল-কারেব উচ্চারণ-কালে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকাইয়া রাখিয়া জিহ্বার দুই পাশ দিয়া মুখবিবর হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করা হয় বলিয়া ল্-এর ধ্বনিকে **পার্শ্বিক ধ্বনি** বলা হয়। পববর্তী দন্ত্য বা মূর্ধন্য বর্ণের প্রভাবে পডিয়া পূর্ববর্তী ল্-এর উচ্চারণস্থান একটু বদলাইয়া যায়: যথা,—আলতা [=আল্তা], এখানে ল-কার দন্তে উচ্চাবিত হয়। আবার 'উল্টা ; পাল্টা' প্রভৃতি শব্দে ল-কার মূর্ধন্য ল-রূপে উচ্চাবিত হয়। **ব্**—এই **অন্তঃস্থ ব** এবং **প-বর্গীয় ব**, উভয়েরই আকৃতি ও উচ্চারণ বর্তমানে বাংলায় অভিন্ন। বর্গীয় ব-এব উচ্চারণ ইংরাজি 'b'-এর অনুরূপ এবং অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ ইংরাজি 'w' [অর্থাৎ উঅ]-এব উচ্চারণের অনুরূপ। সংযুক্ত বর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণেব পবে যে ব-ফলা আসে, তাহা সাধারণত অন্তঃস্থ ব ; কিন্তু ইহা বাংলায় নিজস্ব কোন উচ্চাবণ না ঘটাইযা পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব-ভাব ঘটায়। আবার আদ্য অক্ষরে ব-ফলা থাকিলে তাহার নিজস্ব উচ্চারণ তো দূরের কথা, ব্যঞ্জনবর্ণেরও দ্বিত্ব-ভাব ঘটায় না: যথা,—পক্ব [=পক্ক] ; বিদ্বান্ [=বিদ্দান্], কিন্তু দ্বিত্ব [=দিৎত]; স্বত্ব [=শৎত]। আবার 'জিহ্বা, আহ্বান, বিহ্বল'-এর বেলায় উচ্চারণ হয় যথাক্রমে [=জিউহা, আওহান্, বিউহল]। এখানে অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চাবণ কিছুটা ইংরাজি w-এব মত হয়। অবশ্য ইহাদেব উচ্চারণ যথাক্রমে [=জিব্ভা, আব্ভান, বিব্ভল]-ও আছে, এরূপ উচ্চাবণ প্রাচীন বাংলা বা প্রাকৃতের অনুরূপ। **মন্তব্য:** স্মরণ রাখা উচিত যে, বর্গীয় 'ব' বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য বর্ণ ; পক্ষান্তরে অন্তঃস্থ 'বর্ণ' দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ। এই উভয় 'ব'-এর চিনিবাব লক্ষণটি এইরূপ:—'উদূঢৌ যত্র বিদ্যতে যো বঃ প্রত্যয়সন্ধিজঃ অন্তঃস্থং তং বিজানীয়াৎ তদন্যো বর্গ্য উচ্যতে।'—অর্থাৎ যেখানে 'ব' 'উ'-তে পরিণত হয়, যেখানে 'ব' প্রত্যয় বা সন্ধি-জাত, সেখানে উহা অন্তঃস্থ ; অবশিষ্ট স্থানগুলিতে 'ব' বর্গীয়।

উষ্মবর্ণ—শ্ ষ্ স্ হ্। 'উষ্ম' শব্দের অর্থ 'নিঃশ্বাস'। যতক্ষণ শ্বাস থাকে, ততক্ষণ এই বর্ণগুলির উচ্চারণ টানিয়া প্রলম্বিত করা যায় বলিয়া ইহাদিগকে **উষ্মবর্ণ** বলা হয়। শ্-এর উচ্চাবণ-স্থান তালুতে, ষ্-এর উচ্চারণ-স্থান মূর্ধায়, স্-এর উচ্চারণ-স্থান দন্তে এবং হ্-এর উচ্চাবণ-স্থান কণ্ঠে। উষ্মবর্ণকে **নিঃশ্বসিত** বা **নিঃশ্বাসাশ্রয়ী** বর্ণও বলা যায়। শ্ ষ্ স্—শিশ্ দিবার ধ্বনির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাদিগকে **শিশ্ ধ্বনি** বলা যায়। প্রাচীনকালে ইহাদের পৃথক পৃথক উচ্চারণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে বাংলায় ইহাদের উচ্চারণ একই রূপ অর্থাৎ ইংরাজি s-এর মত না হইয়া sh-এরই মত। **ক্ষ**—মূলে ক্ ও ষ্-এর সংযোগে গঠিত সংযুক্ত-বর্ণের উচ্চারণ প্রাচীন সংস্কৃতযুগে ছিল [= ক্ ষ্], কিন্তু এক্ষণে বাংলায় হয় [=খ্য]: যথা,—

'লক্ষ'-এর প্রাচীন উচ্চারণ [=লক্‌ষ্‌], কিন্তু বর্তমান উচ্চারণ [=লখ্য], পশ্চিম বংগে [=লোক্‌-খো], কিন্তু পূর্ব বংগে [=লইক্‌খ]। **হ্‌**—কণ্ঠনালী হইতে উদ্ভূত হ-কার উষ্ম ঘোষবর্ণ। যতক্ষণ শ্বাস থাকে, ততক্ষণ ইহাকে প্রলম্বিত করা যায় : যথা,—হ্‌ হ্‌ হ্‌ হ্‌……। পূর্ব বংগে উষ্ম উচ্চারণের জায়গায় হ-কার কণ্ঠনালীর স্পৃষ্টধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় : যথা,—হাত [ꞌআৎ]।

অনুস্বার—ং। সংস্কৃতে অনুস্বারের প্রয়োগ আংশিক ভাবে সানুনাসিক পরিবেশ গড়িলেও, বাংলায় ইহার উচ্চারণ দাড়াইয়াছে [=ঙ]। উচ্চারণ-সময়ে ইহাতে কোন স্বরবর্ণ যোগ করা যায় না। তাই ইহা **অযোগবাহ ধ্বনি**। বলিতে কি, ইহার ঠিক পূর্ববর্তী কোন স্বরধ্বনির সংগে ইহাকে উচ্চারণ করিতে হয়। তাই অনুস্বার আশ্রয়-স্থানভাগীও বটে। বাংলায় 'ং' এবং 'ঙ' উচ্চারণে অভিন্ন হইয়া যাওয়ায়, একের ব্যবহার অপরের পরিবর্তে খুবই সাধারণ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে : যথা,—'বাংলা' এবং 'বাঙলা', 'রং' এবং 'রঙ'।

বিসর্গ—ঃ। ইহা এক রকম হ-এর ধ্বনি। সাধারণ 'হ' ঘোষধ্বনি আর বিসর্গ অর্থাৎ 'ঃ' তাহারই অনুরূপ অঘোষ ধ্বনি। উচ্চারণকালে ইহাতে কোন স্বরবর্ণ যোগ করা যায় না। তাই ইহা **অযোগবাহ ধ্বনি**। বলিতে কি, ইহার ঠিক পূর্ববর্তী কোন স্বরধ্বনির সংগে ইহাকে উচ্চারণ করিতে হয়। তাই বিসর্গ আশ্রয়স্থান-ভাগীও বটে। (ক) বাংলা ভাষায় কেবলমাত্র বিস্ময়াদি-প্রকাশক অব্যয়ের ক্ষেত্রেই বিসর্গের ধ্বনি আছে : যথা,—আঃ, উঃ, ওঃ। (খ) পদের অন্ত্যস্থিত বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে : যথা,—বস্তুতঃ [—বস্তুত]। (গ) পদমধ্যবর্তী বিসর্গ ঠিক ইহারই পরবর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করিয়া থাকে : যথা,—দুঃখ [=দুক্‌খ], মফঃস্বল বা মফঃসল [=মফস্‌সল]।

চন্দ্রবিন্দু—ঁ। চন্দ্রবিন্দুর এই চিহ্নটি স্বরধ্বনির মাঝে অনুনাসিকতা সংক্রামিত করে : যথা,—পাক>পাঁক, ইদুর>ইঁদুর।

স্পর্শ বর্ণমালার উচ্চারণরীতিগত বিভাগ

স্পর্শ বর্ণমালার অন্তর্গত প্রতিটি বর্গের প্রথম চারিটি বর্ণের মধ্যে, দ্বিতীয় বর্ণটি প্রথমটির সংগে প্রাণ বা নিঃশ্বাস-যোগে এবং চতুর্থ বর্ণটি তৃতীয়টির সংগে প্রাণ বা নিঃশ্বাস-যোগে গঠিত হয়। 'প্রাণ বা নিঃশ্বাস যোগ' মানে 'হ-কার জাতীয় ধ্বনির সংযোগ'। এইভাবে গঠিত ধ্বনিগুলিকে **মহাপ্রাণ ধ্বনি** বলা যায় : যথা,—খ্‌ [=ক্‌হ্‌]; ঘ্‌ [=গ্‌হ্‌]; ছ্‌ [=চ্‌হ্‌] ইত্যাদি। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে এই প্রাণ নাই—তাই ইহাদের ধ্বনিকে **অল্পপ্রাণ ধ্বনি** বলা যায় : যথা,—ক্‌, গ্‌, চ্‌

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থানের ছক

উচ্চারণের রীতি			কণ্ঠনালী	কণ্ঠ (কোমল তালু) ও জিহ্বামূল	কঠিন তালুর ঊর্ধ্বভাগ ও জিহ্বা-মধ্য	মূর্ধা বা তালুর শিরোভাগ ও উল্টানো জিহ্বাগ্র	দন্তমূল ও জিহ্বাগ্র-ভাগ	দন্ত ও জিহ্বাগ্র-ভাগ	দন্ত ও ওষ্ঠ (অধর)	ওষ্ঠদ্বয়
স্পর্শ	অল্পপ্রাণ	অঘোষ	...	ক	চ	ট	...		...	প
		ঘোষ	...	গ	জ	ড	...	দ	...	ব
	মহাপ্রাণ	অঘোষ	...	খ	ছ	ঠ	...	থ	...	ফ
		ঘোষ	...	ঘ	ঝ	ঢ	...	ধ	...	ভ
নাসিক্য ঘোষ			...	ঙ	ঞ	ণ	ন	...	...	ম
কম্পনজাত (ঘোষ)			...	...	..	..	র	...	...	...
পার্শ্বিক (ঘোষ)			...	...	...	...	ল	..	...	...
তাড়নজাত	অল্পপ্রাণ		...	...	...	ড়	...	...	. .	...
	মহাপ্রাণ		...	...	...	ঢ়	...	...	...	...
উষ্মজাত	অঘোষ		: (বিসর্গ)	...	...	...	...	...	f (ফ)	...
	ঘোষ		হ	...	...	...	...	...	v (ভ)	...
	শিস্ধ্বনি (অঘোষ)		...	...	শ	[ষ]	স জ = z (ঘোষ)	...	...	...
অর্ধস্বর (ঘোষ)			...	...	(য় = y)	...	...	...	...	অন্তঃস্থ ব ব় (ওয়) = w

ইত্যাদি। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণে গাম্ভীর্য নাই, আছে মৃদুতা; পক্ষান্তরে, তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণ গম্ভীর। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ **অঘোষ-বর্ণ** বা **শ্বাসবর্ণ**; তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ **ঘোষ-বর্ণ** বা **নাদ-বর্ণ**।

অনুশীলনী

[এক] নিম্নোদ্ধৃত বর্ণগুলির যে কোন চারিটির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর :— এ, ং, ঃ, ঞ, ণ, শ, য-ফলা, ব-ফলা, ঁ। **ক বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৪৮**

[দুই] উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কর :—অ, আ, ঈ, ঋ, ঐ, ও, ঔ, ঙ, চ, জ, ড, ঢ, ন, ফ, ব, ভ, য, ব, ল, হ, স, ক্ষ।

[তিন] উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর :—হসন্ত, লুপ্ত অ-কার; যৌগিক স্বরধ্বনি, শ্বাস-বর্ণ বা অঘোষবর্ণ, শিশ্ ধ্বনি; প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি; অযোগবাহ ধ্বনি; স্পর্শ বর্ণ, কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ; দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ; অন্তঃস্থ বর্ণ, উষ্ম বর্ণ। নাদ-বর্ণ বা ঘোষবর্ণ [**মা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫**]। মহাপ্রাণ বর্ণ, অনুনাসিক বর্ণ (**গৌ. বি. বি. এ. '৫১**)। অঘোষ, মহাপ্রাণ, দ্বি-স্বর, অর্ধস্বর, নাসিক্য, ঘৃষ্ট, সংবৃত [**ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫০**]। স্পৃষ্টধ্বনি [**ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫১**]।

[চার] নিম্নলিখিত শব্দগুলির উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যবোধক বানান লিখ :—তাৎপর্য, খেলা; ধৈর্য; অঞ্জলি, আজ্ঞা; প্রফুল্ল, প্রভা; বিদ্বান্; বিম্ব; স্বত্ব; বিহ্বল; লক্ষ্য; মফঃস্বল, দুঃখ; চৈতন্য; কৌরব; জিহ্বা, আহ্বান, প্রভাতু, ততোঽধিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বনিপরিবর্তন : কতিপয় বিশিষ্ট রীতি

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis)

সহজে উচ্চারণ করিবার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ভাঙিয়া উহাদের ভিতরে স্বরধ্বনি সংক্রামিত করিলে **স্বরভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষ** হয় : যেমন,—(ক) অ-কারের আগম—চক্র > চকর (চলিত ভাষায়), সূর্য > সুরজ, ফারসী শর্ম্ > সরম = শরম ; ইংরাজি মট্‌ন্ (mutton) > মটন। (খ) ই-কারের আগম—শ্রী > ছিরি, ইন্দ্র > ইন্দির (চলিত ভাষায়), ফারসী নির্‌খ্ > নিরিখ ; ইংরাজি ফিল্‌ম্ (film) > ফিলিম। (গ) উ-কারের আগম—মুক্তা > মুকুতা, শুক্রবার—শুকুরবার (চলিত ভাষায়) : ফারসী মুল্ক্ > মুলুক, মুল্লুক, তুর্কী কুফ্‌ল্ > কুলুপ্, ইংরাজি ফ্লুট (flute) > ফুলুট। (ঘ) এ-কারের আগম—শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ, ফারসী সির্ফ্ > সেরেফ্, ইংরাজি গ্লাস (glass) > গেলাস। (ঙ) ও-কারের আগম—শ্লোক > শোলোক, ফারসী মুর্গ্ > মোরোগ, মোরগ। (চ) ঋ-কার ব্যঞ্জনবর্ণের পরে আসিলে, সংযুক্তবর্ণের মত উচ্চারিত হয় অর্থাৎ র-ফলা ও হ্রস্ব ই যুক্ত হয়—তৃপ্ত > তিরপিত ; সৃজিল > সিরজিল।

সম্প্রকর্ষ

তাড়াতাড়ি উচ্চারণের সময়ে পদের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনির যে লোপের ব্যাপারটি ঘটে, তাহারই নাম **সম্প্রকর্ষ**। আসলে ইহা বিপ্রকর্ষেরই বিপরীত ঘটনা : যেমন,—(ক) অ-কারের অবলুপ্তি—বসতি > বস্তি। (খ) আ-কারের অবলুপ্তি—জানালা > জান্‌লা। (গ) ই-কারের অবলুপ্তি—ভগিনী > ভগ্নী।

শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পরে স্বরধ্বনি যোজনা

বাংলায় শব্দের শেষে দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে না। হয় দুইটিকে ভাঙিয়া স্বরভক্তি সংক্রামিত করিতে হয়, নয় উহাদের অন্তে একটি স্বরধ্বনি যুক্ত করিতে হয় : যেমন,— 'সূর্য' এই শব্দটির মূল উচ্চারণ, যাহা হিন্দীতে সুপ্রচলিত, বাংলায় তাহা প্রচলিত নয়। পক্ষান্তরে, বাংলায় স্বরভক্তির প্রভাবে ইহার উচ্চারণ হয় 'সুরজ' ; অথবা ইহার উচ্চারণ হয় 'শুরজো'। বলা বাহুল্য, এই উচ্চারণটিতে শেষে একটি 'ও-কারের আগম' ঘটিয়াছে। এইরূপ ইংরাজি লিস্‌ট্ (list) > লিষ্টি, বেঞ্চ (bench) > বেঞ্চি।

স্বরসংগতি বা স্বরসৌষম্য (Vowel Harmony)

সময়ে সময়ে সাধু ভাষায়—এবং চলিত ভাষায় তো বিশেষ করিয়াই—পরবর্তী অথবা পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে, পদস্থিত অপর অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণ-স্থান

বদলাইয়া গেলে যে উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য ঘটিয়া থাকে, তাহারই নাম **স্বরসংগতি** বা **স্বরসৌষম্য**।

পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে স্বরসংগতি—(ক) পরবর্তী অক্ষরে ই, উ, য-ফলা, জ্ঞ, ক্ষ থাকিলে পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ ও-কারবৎ হয়; তবে, এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বানান বদলায় না: যেমন,—অতি (=ওতি), অমুক (=ওমুক), পথ্য (=পোৎথ), দৈবজ্ঞ (=দোইবোগ্‌গঁ), লক্ষ (=লোক্‌খ্‌)। (খ) পরবর্তী অক্ষরে অ, আ, এ, ও থাকিলে পূর্ববর্তী অক্ষরের ই-কারের উচ্চারণ এ-কার হয়; এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বানানও বদলাইয়া যায়: যেমন,—মিশা>মেশা, মিশে>মেশে। (গ) পরবর্তী অক্ষরে অ, আ, এ, ও থাকিলে পূর্ববর্তী অক্ষরের উ-কার উচ্চারণ ও-কার হয়, এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বানানও বদলাইয়া যায়: যেমন,—শুনা>শোনা; শুনে>শোনে, শুনো>শোনো। (ঘ) পরবর্তী অক্ষরে অ, আ, এ, ও থাকিলে পূর্ববর্তী অক্ষরের এ-কারের উচ্চারণ 'বাঁকা এ' অর্থাৎ 'অ্যা' হয়, এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাধারণ বানান লিখিত হয় না, তবে কোন কোন আধুনিক লেখক উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বানান লিখিয়া থাকেন: যেমন,—দেখা>দেখা (=দ্যাখা), দেখে> দেখে (=দ্যাখে), দেখো> দেখো (=দ্যাখো), দেখ>দেখ (=দ্যাখ)। (ঙ) পরবর্তী অক্ষরে ই, উ থাকিলে, পূর্ববর্তী অক্ষরের ও-কারের উচ্চারণ উ-কার হয়, এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বানানও বদলাইয়া যায়: যেমন,—শোই>শুই, শোউক>শুউক>শু'ক, নোড়া> নুড়ী; আমোদিয়া>আমুদে, নিয়োগী>নেউগী, নেওগী। পরবর্তী য-ফলার অন্তর্নিহিত ইকারের প্রভাবে, পূর্ববর্তী অক্ষরের ও-কারের উচ্চারণও উ-কার হয়: যেমন,—যোগ্য>যোগ্‌ইঅ>যুগ্যি (=জুগ্‌গি)। (চ) তিন বা ততোঽধিক অক্ষরের শব্দের শেষে যদি ই, ঈ থাকে তবে পদমধ্যবর্তী অ-কারের উচ্চারণটি উ-কারে পরিবর্তিত হয়: যেমন,—এখনি>এখুনি, উড়নী>উড়ুনি, নাটকিয়া>নাটুকে।

পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে স্বরসংগতি—(ক) শব্দের ভিতরে প্রথমেই যদি ই-কার থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী অক্ষরের আ-কার উচ্চারণটি এ-কারে পরিবর্তিত হয়: যেমন,—মিছা>মিছে, করিতাম>করিতেম, ক'রতেম; বিলাত >বিলেত। (খ) শব্দের ভিতরে, প্রথমেই যদি উ-কার বা ঊ-কার থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী অক্ষরের আ-কার উচ্চারণটি ও-কারে পরিবর্তিত হয়: যেমন,—পূজা >পূজো; শূয়ার>শূওর, শোর। (গ) তিন অক্ষরের শব্দে যদি দ্বিতীয় অক্ষরে অ-কার থাকে, তাহা হইলে চলিত ভাষায় এই আ-কার উচ্চারণটি সাধারণত পূর্ণ ও-কার রূপে অথবা ঈষৎ ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়, এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

অনুযায়ী বানান বদলায় না: যেমন,—গোবর [= গোবোর]; বোতল [= বোতোল]।

অপিনিহিতি (Epenthesis)

শব্দের ভিতরে যদি ই বা উ থাকে, তাহা হইলে সেই ই বা উ-কে পূর্বেই উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে, সেই উচ্চারণ-রীতির নাম **অপিনিহিতি**। য-ফলায় যে ই-ধ্বনি থাকে, তাহাও অপিনিহিতির ফলে প্রকট ই-কার রূপে দেখা দেয়। একদা পূর্ব ও পশ্চিম বংগে অপিনিহিতি বিদ্যমান ছিল, এখন পূর্ব বংগেই ইহা চালু আছে, আর পশ্চিম বংগে অপিনিহিতি অভিশ্রুতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রসংগত, মনে রাখিতে হইবে যে, অপিনিহিতি সাধু ভাষায় খাটে না: (ক) ই-কারের অপিনিহিতি—রাখিয়া>রাখ্+ইয়া>রাইখ্-ইয়া, রাইখ্যা (পুরাতন বাংলায় ও আধুনিক পূর্ব বংগে)>রেখ্যা, রেখ্যে, রেখে (অভিশ্রুতিতে রূপান্তরিত হইয়া পশ্চিম বংগে প্রচলিত)। কালিয়া>কাল্+ইয়া>কাইলিয়া, কাইল্যা>কেলে। (খ) উ-কারের অপিনিহিতি—জলুয়া>জউলুয়া, জইলুয়া>জ'লো, জোলো। গাছুয়া> গাউছুয়া>গেছো। (গ) য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের অপিনিহিতি—সত্য [= শইত্ত], কাব্য [= কাইব্ব], কন্যা [= কইন্না]। পূর্ব বংগের উচ্চারণ-রীতিতে এই ধরণের অপিনিহিতি লক্ষ্য করা যায়। (ঘ) 'ক্ষ, জ্ঞ'—এই দুইটির উচ্চারণেও ই-কারের অপিনিহিতি পাওয়া যায়: যেমন,—লক্ষ>লখ্য [= লইক্‌খ], যজ্ঞ>জগ্‌গ্য [= জইগ্‌গঁ]।

অভিশ্রুতি (Umlaut)

ই এবং উ (বা উ হইতে জাত ই) অপিনিহিত হইলে, এই ই-ধ্বনি সাধারণ একাক্ষর শব্দে লোপ পাইয়া থাকে, কিন্তু একাধিক অক্ষরময় শব্দে পূর্ববর্তী স্বর-ধ্বনিকে প্রভাবান্বিত করিয়া এক রকমের আভ্যন্তর সন্ধির বলে পূর্বস্থিত স্বরবর্ণের নবরূপ ধারণ করাইয়া থাকে। এই স্বরধ্বনির পরিবর্তন তথা নবরূপ ধারণ করাইবারই নাম **অভিশ্রুতি**: যেমন,—(ক) অ+ই+অ = অ'(= ও)+ও :—বলিব>বইল্‌ব>ব'ল্‌ব, ব'ল্‌বো [= বোল্‌বো]; সত্য>সৎতিয় [= শোত্তো] উচ্চারণে। (খ) অ+ই+আ বা এ = অ'(= ও)+এ :—করিয়া>কইর‍্যা>ক'রে [= কোরে], ধরিলে>ধইর‍্লে >ধ'র‍্লে [= ধোর‍্লে]; অভ্যাস>অব্‌ভিয়াস্>ওবভেশ্ (উচ্চারণে)। (গ) আ+ই+অ বা ও = এ+ও :—রাখিহ>রাখিঅ>রাখিও>রাইখো>রেখো। (ঘ) আ+ই+আ = এ+এ :—রাখিয়া>রাইখ্যা>রেখে; আসিয়া>আইস্যা > এসে। (ঙ) অ, আ, ই, উ, এ অথবা ও+আই+আ = যথাক্রমে অ' (= ও), আ, ই, উ, ই, উ+ই+এ :—বলাইয়া>ব'লিয়ে [= বোলিয়ে]; নাচাইয়া>নাচিয়ে; ডিঙাইয়া> ডিঙিয়ে; দেওয়াইয়া [= দেআইয়া]>দিইয়ে; শোয়াইয়া>শুইয়ে। (চ) অ+

ইআ+ই=অ'(=ও)+এ+ই :—করিয়াছি>ক'রেছি [=কোরেছি]; বসিয়াছিল> ব'সেছিল। (ছ) অ, আ, আই, ই, উ, এ, ও+অ+ইআ=যথাক্রমে অ' (=ও), আ, এ, ই, উ, ই, উ+উ+এ :—নগরিয়া>ন'গুরে, নগুরে' [=নোগুরে]; কান্দনিয়া >কাঁদুনে', দেঅনিয়া>দিউনে'; কোন্দলিয়া>কুঁদুলে'। (জ) অ+উ+আ=অ'(=ও) +ও :—জলুয়া>জ'লো [=জোলো]; পটুয়া>প'টো [=পোটো]। (ক) আ+ উ+আ=এ+ও :—সাথুয়া>সাউথুআ>সাইথুআ>সেথো; মাছুয়া>মেছো।

শ্রুতিধ্বনি (Glide)

শব্দ-মধ্যে পাশাপাশি দুইটি স্বরধ্বনি যদি থাকে এবং সেই দুইটি স্বর যদি একটি যৌগিক স্বরে বা সন্ধ্যক্ষরে রূপান্তরিত না হয় তাহা হইলে সেই স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনের অভাবজনিত ফাঁকটুকুতে (hiatus) উচ্চারণের সুবিধার জন্য অন্তঃস্থ য় (y), অন্তঃস্থ ব (=w, ওয়, ও) বা 'দ' ধ্বনির আবির্ভাব ঘটে। শ্রুতিমাধুর্যের জন্য এই যে অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনির আবির্ভাব, ইহাকেই বলা হয় **শ্রুতিধ্বনি**: (ক) **য়-শ্রুতির** উদাহরণ :—মা+আমার>মা+য+আমার>মাযামার, মা+এর>মা+য়+এর> মায়ের, কে+এলো>কে+য+এলো>কেয়েলো। (খ) **ব-শ্রুতির** উদাহরণ :— খা+আ>খাওয়া, মো+আ>মোয়া, না+ওয়া>নাওয়া। **মন্তব্য**: এই উদাহরণগুলিতে ইহাই লক্ষ্য করা যায় যে, য়-শ্রুতি 'য়' বর্ণ দ্বারা বুঝানো হয়; কিন্তু ব-শ্রুতির বেলায় 'ওয়, ও, য়'—এই তিনটিরই ব্যবহার আছে। আবার য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির অদল-বদলও দেখা যায়: যেমন,—দেযাল>দেয়াল (য়-শ্রুতিতে), দেওয়াল (ব-শ্রুতিতে): ছায়া>ছায়া (য-শ্রুতিতে), ছাওয়া (ব-শ্রুতিতে) (গ) **দ-শ্রুতির** উদাহরণ: বৈদিক সংস্কৃত সু+নর>সুন্দর; বা+নর>বান্দর>বাঁদর।

শব্দ-মধ্যবর্তী র-কার ও হ-কারের লোপ-প্রবণতা

শব্দ-মধ্যে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের আগে যে র-কার (রেফ) থাকে, চলিত বাংলার উচ্চারণ-ক্ষেত্রে অনেক সময়েই লোপ পায়। ঠিক এমনি ভাবে দুই স্বরের মধ্যবর্তী হ-কারও সহজেই লুপ্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, অন্ত্য হ-কার তো সহজেই লোপ-প্রবণ বর্ণ। অনেক সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বিদেশী শব্দ এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের ফলে বাংলায় নব রূপ লাভ করিয়াছে: (১) **র-এর লোপ**—করিতে>ক'রতে>ক'ত্তে (=কোত্তে); মারিল>মা'রল>মাল্ল; গৃহিণী>গিরহিণী>গিন্নী; ফারসী শীরীণী> শিরণী>শিন্নী। (২) **হ-এর লোপ**—ফলাহার>* ফলাআর>ফলার; পুরোহিত >*পুরুইত>পুরুত; মহোৎসব>মোচ্ছব; নাহিব>নাইব; বাহির>বার।

অপশ্রুতি (Ablaut)

সংস্কৃত ধাতু হইতে শব্দগঠন করিবার সময়ে ধাতুর স্বরধ্বনিতে যে পরিবর্তনগুলি

ঘটে, তাহারা গুণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ নামে সংস্কৃত ব্যাকরণে পরিচিত। এই তিন প্রকারের পরিবর্তনকে সমবেতভাবে বাংলা ব্যাকরণে বলা হয় **অপশ্রুতি**: যেমন,—'বচ্' ধাতু হইতে 'বচন' (গুণের দৃষ্টান্ত), 'বাচ্য' (বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত), 'উক্ত' (সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত), 'বস্' ধাতু হইতে 'বসতি' (গুণের দৃষ্টান্ত), 'বাসী' (বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত), 'উষিত' (সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত)। সংস্কৃত এবং পরে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া খাঁটি বাংলা ভাষাও উত্তরাধিকার-সূত্রে অপশ্রুতি পাইয়াছে: যেমন,—মিল>মেলা (গুণের দৃষ্টান্ত); পড়ে>পাড়ে (বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত); দ্বার>দুয়ার (সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত)।

সমীকরণ, সমীভবন বা **সমবর্ণতা** (Assimilation)

শব্দের ভিতরে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি আলাদা ধ্বনির একটি অপরটির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কমবেশী স্বারূপ্য বা স্বগোত্রতা পাইলে **সমীকরণ, সমীভবন** বা **সমবর্ণতা** হয়: যেমন,—জন্ম>জম্ম, গল্প>গপ্প, চন্দন>চন্নন, পাঁচ্‌সের>পাঁস্‌সের।

সমীভবন তিন রকমের: যেমন,—(১) **প্রগত** বা **পুরোবর্ত সমীভবন** (Progressive Assimilation): ইহাতে পূর্বের ধ্বনি পরের ধ্বনিকে বদলাইয়া দেয়: অন্য>অন্ন। (২) **পরাগত** বা **প্রত্যাবর্ত সমীভবন** (Regressive Assimilation): ইহাতে পরের ধ্বনি পূর্বের ধ্বনিকে বদলাইয়া দেয়: তৎ+জন্য>তজ্জন্য। (৩) **অন্যোন্য সমীভবন** (Mutual Assimilation): ইহাতে পরস্পরের প্রভাবে উভয় ধ্বনিই বদলাইয়া যায়: উৎ+শ্বাস>উচ্ছ্বাস।

অসমীকরণ, বিষমীভবন বা **বিষমবর্ণতা** (Dissimilation)

শব্দের ভিতরে দুইটি সমধ্বনির একটির পরিবর্তন ঘটিলে **অসমীকরণ, বিষমীভবন** বা **বিষমবর্ণতা** হয়: যেমন,—শরীর>শরীল, লাল>নাল (গ্রাম্য উচ্চারণে), তরবার>তলোয়ার, চলচল>চঞ্চল, পোর্তুগীস আর্মারিও>বাং আল্‌মারি।

স্বরাগম বা স্বরের পূর্বাগম (Prothesis)

শব্দের আদিতে অবস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের আগে স্বরধ্বনির আবির্ভাব ঘটিলে **স্বরাগম** বলা হয়: যেমন,—স্ত্রী>ইত্থি (পালিতে), ইস্তিরি (বাংলায়), স্পিরিট>ইস্পিরিট, স্টেব্‌ল্>আস্তাবল, স্টেশন>ইস্টিশন, স্কুল>ইস্কুল; ঘোর>অঘোর।

বর্ণাগম

শব্দের গোড়ায়, মধ্যে বা শেষে, নূতন স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের আবির্ভাব ঘটিলে **বর্ণাগম** বলা হয়: যেমন,—স্পর্ধা>আস্পর্ধা: অম্ল>অম্বল; নস্য>নস্যি। প্রথম উদাহরণে স্বরাগম, দ্বিতীয় উদাহরণে বিপ্রকর্ষ, তৃতীয় উদাহরণটিও বিপ্রকর্ষজাত।

স্বরলোপ (Aphesis : Syncope : Apocope)

উচ্চারণকালে শব্দের অন্তর্গত কোন বর্ণের উপরে পক্ষপাতহেতু বিশেষ জোর দেওয়া

হইলে অপব কোন ব্যঞ্জনধ্বনি অনাদৃত হয়—ফলে ঐ ব্যঞ্জনবর্ণের স্বরধ্বনি অবলুপ্ত হয়। ইহাকেই বলা হয় **স্বরধ্বনি লোপ** অর্থাৎ **স্বরলোপ**। ইহা তিন রকমে হইয়া থাকে। (১) প্রথম স্বরবর্ণ লুপ্ত হইলে **আদি স্বরলোপ (Aphesis)** হয় : যেমন,—অলাবু> লাউ ; অপিধান>পিধান ; উধার>ধার ; উডুম্বর>ডুমুর। (২) মধ্যবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হইলে **মধ্য স্বরলোপ** (Syncope) হয়। মূলত, ইহাকেই ইতিপূর্বে **সম্প্রকর্ষ** বলা হইয়াছে। সম্প্রকর্ষের উদাহরণ দ্রষ্টব্য। (৩) শেষের স্বরবর্ণ লুপ্ত হইলে **অন্ত স্বরলোপ (Apocope)** হয় ; যেমন,—কাল>কাল্, ভাত>ভাৎ (ভাত্), অতিথি>অতিথ্।

অন্তর্হতি

শব্দেব মধ্যবর্তী কোন বর্ণ যদি লুপ্ত হয় অর্থাৎ মাঝখান হইতে যদি কেবলমাত্র ব্যঞ্জনধ্বনি অথবা স্বরবর্ণযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়, তাহা হইলে যে ঘটনাটি ঘটে, তাহাকে বলা হয় **অন্তর্হতি** : যেমন,—আলাহিদা>আলাদা ; ফাল্গুন>ফাগুন ; ফলাহাব> ফলার, ছোট দিদি>ছোট্‌দি, ছোড়্‌দি।

বর্ণবিপর্যয় বা বর্ণব্যত্যয় (Metathesis)

শব্দেব মধ্যবর্তী স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণেব স্থান-পরিবর্তন ঘটিলে **বর্ণবিপর্যয়** বা **বর্ণব্যত্যয়** বলা হয় : যেমন,—মুকুট>মুটুক, ঢেঁকশাল>ঢেঁশকাল, বাক্স>বাস্ক ; পিশাচ>পিচাশ, বারাণসী>বানারসী, রিক্সা>রিস্কা, আলনা>আনলা।

বর্ণবিকৃতি (Voicing)

শব্দেব অন্তর্গত স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ নতুন রূপ ধরিলে **বর্ণবিকৃতি** বলা হয় ; যেমন,—বাষ্প>ভাপ ; ধাই>দাই ; কবাট>কপাট ; শাক>শাগ ; ধোবা>ধোপা।

বর্ণদ্বিত্ব

জোরেব সহিত বলিবার জন্য কখনও কখনও শব্দেব অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করা হইলে **বর্ণদ্বিত্ব** হয় : যেমন,—ছোট>ছোট্ট, পাকা>পাক্কা ; একরতি>একরত্তি।

অপিনিহিতি, সমাক্ষর লোপ বা বর্ণচ্যুতি (Haplology)

শব্দের অন্তর্গত পাশাপাশি অবস্থিত সমধর্মাবলম্বী দুইটি বর্ণের একটির লোপ হইলে **অপিনিহিতি** বলা হয় : যেমন,—দাদা>দা ; সব্যব্যস্ত>সাব্যস্ত ; ভাইশ্বশুর>ভাশুর ; বৌদিদি>বৌদি, মুখকোষ>মুখোষ, লৌকিকতা>লৌকতা।

পীনায়ন (Aspiration)

অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণরূপে উচ্চারিত হইলে **পীনায়ন** হয় : যেমন,—কাঁটাল> কাঁঠাল ; পুস্তর>পুথর।

ক্ষীণায়ন (**De-aspiration**)

মহাপ্রাণ বর্ণ অল্পপ্রাণ বর্ণরূপে উচ্চারিত হইলে **ক্ষীণায়ন** হয় : যেমন,—হাথ > হাত, পালখ > পালক ; ধাত্রী > ধাই > দাই।

নাসিক্যীভবন (**Nasalisation**)

ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্—এই নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি যদি লুপ্ত হইয়া পূর্ববর্তী বর্ণের স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করিয়া তোলে, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **নাসিক্যীভবন** : যেমন—সন্ধ্যা > সাঁঝ, চন্দ্র > চাঁদ, গঙ্গা > গাঙ্। অবশ্য সময়ে সময়ে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির সংযোগ ব্যতিরেকেই স্বরধ্বনি আপনা হইতেই অনুনাসিক হইয়া পড়ে, যেমন—পুথি > পুঁথি, ছুচ > ছুঁচ, হাসি > হাঁসি, কানা > কাঁনা।

মূর্ধন্যীভবন (**Cerebralisation**)

যদি কোন ব্যঞ্জনধ্বনির সাহায্যে অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্য বর্ণে পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **মূর্ধন্যীভবন** : যেমন,—মৃত > মড়া, বৃদ্ধ > বাড় ; পততি > পড়ে, মৃত্তিকা > মাটি।

সকারীভবন (**Assibilization**)

যদি স্পর্শবর্ণ স শ বা জ-এর মত উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **সকারীভবন** : যেমন,—গাছতলা > গাস্তলা।

উষ্মীভবন

যদি স্পর্শবর্ণ উষ্মধ্বনির মত উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **উষ্মীভবন** : যেমন,—কাগজ > কাগজ্ (= z), মেজদা > মেজ্ (= z) দা। জ্-এর ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় ঠিক ইংরাজি "z"—এর ন্যায়।

সাদৃশ্য (**Analogy**)

যদি একটি শব্দের সদৃশ হইয়া এবং মানে হয় এমন ভাবেই অপর কোন শব্দ ধ্বনি-পরিবর্তনের সাহায্যে গঠিত হয়, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **শব্দ-সাদৃশ্য** বা **সাদৃশ্য**। মনে রাখিতে হইবে, সাদৃশ্যের মধ্যে অনুসরণ-ক্রিয়াই প্রবল : যেমন,—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত 'পাখি—পাখালি' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে গঠিত হইয়াছে 'গাছ—গাছালি' শব্দ। 'ধোপানী' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে 'মাষ্টারনী', 'নাটক' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে 'কবিতিকা', ফারসী 'নাবালিগ্' শব্দ হইতে উদ্ভূত 'নাবালক' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে 'সাবালক', আরবী শব্দ 'ওকালৎ'-এর প্রসারে বাংলা 'ওকালতি' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে ইংরাজি শব্দ 'জজ্' হইতে 'জজিয়ৎ'-এর প্রসারে বাংলা 'জজিয়তি', 'বক্তব্য' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে 'কহতব্য' শব্দ প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে।

মিশ্রণ (Contamination)

শব্দের সাদৃশ্যে সৃষ্টি হইবার কথা থাকিলেও যদি কোন নবজাত শব্দ অপর কোন শব্দের ধ্বনিধারাকে অনুকরণ করিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে এই ক্রিয়াটিকে বলা হয় **মিশ্রণ :** যেমন,—পোর্তুগীজ ভাষার 'Ananas' শব্দটি বাংলা 'রস' শব্দের ধ্বনিধারা অনুসরণ করিয়া 'আনারস' হইয়াছে। সংস্কৃত 'সর্ব' শব্দটি ধ্বনিপরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বাংলায় 'সাব' না হইয়া 'সভা' শব্দের সাদৃশ্যপ্রভাবে 'সব' হইয়াছে। পোর্তুগীজ 'পাউ' ও হিন্দুস্থানী 'রুটি'—সমার্থক শব্দ; কিন্তু উভয়ের মিশ্রণে বাংলা ভাষায় 'পাউরুটি' শব্দটি আসিয়াছে। ঠিক এইরূপ Hospital>হাঁসপাতাল; Arm-chair>আরাম-চেয়ার>আরাম-কেদারা।

জোড়কলম (Portmanteau)

ইহাও একরূপ মিশ্রণই। দুইটি বিভিন্ন শব্দের মিলনে একটি নূতন শব্দ গঠিত হয় এব এই মিলনে দুইটি শব্দেরই ছিন্নাংশ থাকিয়া যায় বলিয়া এই জাতীয় নবসৃষ্ট শব্দকে বলা হয় **জোড়কলম শব্দ :** যেমন,—আরবী মিন্নৎ+সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি (>প্রাঃ বিন্নত্তি >বাং বিনতি) হইতে 'মিনতি' এই জোডকলম শব্দটি গঠিত হইয়াছে।

লোক-ব্যুৎপত্তি (Folk-etymology)

নূতন শব্দগঠনের সময়ে ধ্বনিসাম্য রক্ষা করিতে গিয়াও সময়ে সময়ে লোকেরা এক অভিনব অশ্রুতপূর্ব শব্দ গঠন করিয়া বসে। সাধারণ লোকের সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির আওতায় পড়িয়া একটা ব্যাপক লোক-ব্যবহারে যে শব্দগুলির সৃষ্টি হয়, তাহাদিগকে বলা হয় **লোক-ব্যুৎপত্তি :** যেমন,—English>ইংরাজ; 'রাজ' শব্দটি সাধারণ লোকের বড়ই প্রিয় আবার ইংলিশ জাতি বাংলা তথা ভারতের 'রাজা'ও বটে—তাই ধ্বনিসামঞ্জস্য পরিহার করিয়া 'ইংলিশ' হইয়াছে 'ইংরাজ'। Tobacco >তাম্রকূট>তামাক। সেই কোন্ অতীতকালে Tobacco যখন এদেশে আসে, তখন তাহার রং ছিল ঈষৎ তামাটে আর ঐ পদার্থটি সাধারণ লোকের কাছে ছিল 'কূট' অর্থাৎ বিষতুল্য। তাই সাধারণ লোকে Tobaccoকে 'তাম্রকূট' বলিত। লোকব্যবহারে 'তাম্রকূট' এখন 'তামাকে' পরিণত হইয়াছে। Martaban দেশের কদলী লোকব্যবহারে নাম পাইয়াছে 'মর্তমান'। Batavia দেশ হইতে আনীত লেবু লোকব্যবহারে নাম পায় 'বাতাবিয়া'—উহাই এক্ষণে 'বাতাবী'রূপে আমাদের রসনাকে পরিতৃপ্ত করে।

শীৎকার বা কাকুধ্বনি (Click)

হর্ষ, বিস্ময়, শোক প্রভৃতি আকস্মিক ভাবপ্রকাশের কালে, কিংবা মেঘের গর্জন,

তব্‌লার বোল্‌, পাখির ডাক, বৃষ্টিপতনের শব্দ প্রভৃতি বুঝাইতে হইলে বর্ণমালার সাহায্যে নয়—ধ্বনির সাহায্যে রূপদান করিতে হয়। মুখবিবরে বাতাস টানিয়া জিহ্বাকে নানা কায়দায় আলোড়িত করিয়া এই সমস্ত ধ্বনি উচ্চারিত হইলে এই ক্রিয়াকে বলা হয় **কাকুধ্বনি** বা **শীৎকার ঃ** যেমন,—ইস্‌, উস্‌; ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা; পিউ পিউ; ঝম্‌ ঝম্‌। পোষা বিড়ালকে আদর করিবার বা গোরু তাড়াইবার সময়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহারও নাম 'কাকুধ্বনি'।

অনুশীলনী

[এক] ধ্বনিপরিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলির পরিচয় উদাহরণ সহ লিখ।

রা. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৭

[দুই] দৃষ্টান্ত-সহযোগে ব্যাখ্যা কর :—অভিশ্রুতি [**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭**]। সমীভবন, বিপ্রকর্ষ, স্বরাঘাত, স্বরলোপ [**ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫১**]। অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, য়-শ্রুতি [**ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫০**]। স্বরসংগতি, অপিনিহিতি [**রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬**]। অভিশ্রুতি, বর্ণবিপর্যয়, য়-শ্রুতি, অপশ্রুতি [**রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫**]। অপশ্রুতি, অভিশ্রুতি (**গৌ বি. বি. এ. '৫১**)। বিপ্রকর্ষ (**ক. বি. বি. এ. '৫১**)। অপিনিহিতি, স্বরসংগতি (**উ. বি. বি. এ. '৫৫**)।

[তিন] ব্যাকরণে 'আগম' কাহাকে বলে? পূর্বাগম, মধ্যাগম ও অন্ত্যাগমের উদাহরণ দাও। অপিনিহিতি (Epenthesis) কি প্রকারের আগম? উদাহরণ-সহ বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৮**

[চার] ব্যাকরণে 'আগম' কাহাকে বলে? পূর্বাগম, মধ্যাগম ও অন্ত্যাগমের উদাহরণ দাও। অপিনিহিতি (Epenthesis) কাহাকে বলে? তিনটি উদাহরণ দাও। স্বরসংগতি (Vowel harmony) কাহাকে বলে? উর্ধ্বস্বর নিম্নাকৃষ্ট এবং নিম্নস্বর উর্ধ্বাকৃষ্ট হইয়াছে এমন দুইটি উদাহরণ দাও। **ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৭**

[পাঁচ] নিম্নলিখিত বিধিগুলি উদাহরণ-সহযোগে ব্যাখ্যা কর :—শব্দমধ্যবর্তী র-কার ও হ-কারের লোপপ্রবণতা; শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পরে স্বরধ্বনি যোজনা; সমীকরণ; অসমীকরণ; বর্ণাগম, শ্রুতিধ্বনি; বর্ণবিকৃতি; স্বরলোপ; বর্ণদ্বিত্ব; অদ্বিকোক্তি; স্বরাগম; লোক-ব্যুৎপত্তি; পুরোবর্ত সমীকরণ; প্রত্যাবর্ত সমীকরণ; অন্যোন্য সমীকরণ; পীনায়ন; ক্ষীণায়ন; নাসিক্যীভবন; মূর্ধন্যীভবন; সকারীভবন; উষ্মীভবন; সাদৃশ্য; মিশ্রণ, জোড়কলম; শীৎকার।

তৃতীয় অধ্যায়

ধ্বনিপরিবর্তন ও মূর্ধন্যীকরণ

ণত্ববিধি

কোথায় কোথায় মূর্ধন্য ণ হয় ?

(ক) ট্ ঠ্ ড্ ঢ্-এর আগে মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন,—কণ্টক, কুণ্ঠা, দণ্ড, ঢুণ্ঢি। (খ) ঋ র্ ষ্-এর পর মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন,—ঋণ, কর্ণ, বিষ্ণু। (গ) একই পদের মধ্যে প্রথমে ঋ র্ ষ্ ও পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, য্ ব্ হ অথবা অনুস্বারের ব্যবধান আর ইহার পরে দন্ত্য ন থাকিলে সেই দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন,—রুক্মিণী, দর্পণ, পাষাণ, শ্রবণ, বেণু, বৃংহণ। (ঘ) প্র, পরা, পরি, নির্—এই চারিটি উপসর্গের পর প্রায়ই মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন—প্রণাম, প্রণাশ, প্রণোদিত, পরায়ণ, পরিণীত, নির্ণয়। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে: যেমন,—প্রনষ্ট, পরান্ন, পরিনির্বাণ। (ঙ) সমাস হইলেও কয়েকটি পদের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন—অগ্রণী, উত্তরায়ণ, গ্রামণী, পূর্বাহ্ণ, রামায়ণ, শূর্পণখা। (চ) কয়েকটি শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য ণ হয়: যেমন,—অণু, আপণ, কংকণ, কণা, কণিকা, কল্যাণ, কোণ, গণ, গণ্য, গুণ, গৌণ, ঘৃণ, চিক্কণ, তূণ, নিপুণ, পণ, পণ্য, পাণি, পুণ্য, বণিক, বাণ, বাণিজ্য, বাণী, বিপণি, বীণা, বেণী, বেণু, ফণা, ফণী, লবণ, লাবণ্য, শণ, শোণ, শোণিত, স্থাণু।

কোথায় কোথায় দন্ত্য ন হয় ?

(ক) ত-বর্গযুক্ত দন্ত্য ন অপরিবর্তিত থাকে: যেমন,—বৃন্ত, গ্রন্থ, মন্দির, রন্ধন, নিরন্ন। (খ) পদের অন্তস্থিত দন্ত্য ন অপরিবর্তিত থাকে: যেমন,—শ্রীমান, ধর্মচারিন্। (গ) সমাস হইলে দ্বিতীয় পদের দন্ত্য ন অপরিবর্তিত থাকে: যেমন,—দুর্নাম, বরানুগমন, দুর্নিমিত্ত, দুর্নীতি। (ঘ) বাংলা ক্রিয়ার দন্ত্য ন অপরিবর্তিত থাকে: যেমন—ধরেন, করেন, ধারেন। (ঙ) অসংস্কৃত শব্দে দন্ত্য ন থাকিবে: যেমন,—বামুন, সোনা, কোরান, করোনার, কর্নওয়ালিশ, গভর্নমেণ্ট। 'রাণী' শব্দ বিকল্পে 'রানী'ও হয়। কিন্তু অসংস্কৃত শব্দে যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে: যেমন,—ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা।

ষত্ববিধি

(ক) ঋ বা ঋ-কারের পর মূর্ধন্য ষ হয়: যেমন—ঋষি, বৃষ, কৃষ্ণ। (খ) অ আ-ভিন্ন স্বরবর্ণ ক র-এর পর প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়: যেমন,—জিগীষা, শ্রীচরণেষু, কল্যাণীয়েষু। কিন্তু -সাৎ প্রত্যয়ের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়: যেমন,—অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ। (গ) অতি, অধি, অনু, অপি, অভি, নি, পরি, প্রতি, বি, সু—এই উপসর্গগুলির পরে কতিপয় ধাতুর দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়: যেমন,—অধিষ্ঠান, অনুষংগ, অভিষেক, পরিষদ, প্রতিষেধ, বিষণ্ণ, সুষুপ্ত। (ঘ) দুইটি পদ সমাসবদ্ধ হইয়া একটি শব্দে পরিণত হইলে, পূর্বপদের শেষে ই, উ, ঋ, ও থাকিলে পরপদের আদ্য দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়: যেমন,—যুধিষ্ঠির, সুষম, পিতৃষ্বসা, গোষ্ঠ, বিষম। (ঙ) কয়েকটি শব্দ স্বভাবতই মূর্ধন্য ষ হয়, যেমন,—অমর্ষ, আষাঢ়, ঈষৎ, ঊষা, ওষধি, ঔষধি, কর্ষণ, কৃষি, কোষ, ঘর্ষণ, তুষার, দূষণ, দোষ, পরুষ, পাষাণ, পুরুষ, পুষ্টি, পুষ্প, পৌষ, প্রদোষ, বর্ষণ, বর্ষা, বিষাণ, বিশেষ, বিশেষণ, বিশেষ্য, ভাষা, ভীষ্ম, ভূষা, মহিষ, মূষিক, মেষ, শোষ, শ্লেষ, শ্লেষ্মা, ষট্, ষোড়শ, সর্ষপ, হর্ষ।

শ ষ স সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

(ক) মূল সংস্কৃত শব্দানুসারে তদ্ভব শব্দে শ ষ বা স হইবে: যেমন,—অংশু>আঁশ; আমিষ>আঁষ, সর্ষপ>সরিষা। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে: যেমন,—শ্রদ্ধা>সাধ; মনুষ্য>মিন্‌সে। (খ) দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে: যেমন,—ফরসা, ফরশা; উসখুস, উশখুশ; করিস। (গ) বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে s-এর স্থানে স, sh-এর স্থানে শ হইবে: যেমন,—আসমান, কনস্টেবল, ক্লাস, চশমা, ডিশ, বদমাশ, লশকর, শখ, শরবৎ, শহর, শহীদ, শাগরেদ, শার্ট, শুরু, শেমিজ, সাদা, সালিস, সুপারিশ, সুটকেশ, স্টিমার, স্টেশন, হামেশা, হিস্টিরিয়া, হুঁশ, হুসিয়ার, হুঁসিয়ার। তবে কতকগুলি শব্দে প্রচলিত বানান বজায় থাকিবে: যেমন,—গোমস্তা, ইস্তাহার, ভিস্তি, খ্রীষ্ট।

অনুশীলনী

[এক] ণত্ব ও ষত্ব বিধির প্রধান প্রধান সূত্র উদাহরণ-সহ নির্দেশ কর।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫০

[দুই] কারণ নির্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত শব্দগুলির শুদ্ধি সাধন কর:—ঋসি, দর্পন, উত্তরায়ন, কর্ন, কর্ণওয়ালিস, রেনু, প্রনোদিত, পুন্য, শূর্পনখা, ধর্মচারিণ, দুর্ণাম, ধরেণ, সোণা, শ্রীচরণেষু, কল্যাণীয়াষু, অণুসংগ, সুসম, বিসেশ, সোশ, সরিসা, ফরষা, আশমান, ক্লাশ, ডিস, শুটকেশ, ষ্টিমার, পরিণির্বান, গ্রামনী, অগ্নিষাৎ, মিন্‌ষে, খ্রীস্ট।

দ্বিতীয় পর্ব—শব্দ-প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

শব্দপরিচয়

ধ্বনি ভাষা শব্দ ও পদের সংজ্ঞা

মানুষের মন গতিশীল। তাই তাহার মনে যে কোন ভাবের উৎপত্তি হইবামাত্র, তাহা তাহার কণ্ঠ, নাসিকা ও মুখের ভিতর অবস্থিত জিহ্বা ইত্যাদি বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সাংকেতিক **ধ্বনির** মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। কণ্ঠ হইতে উদ্‌গীর্ণ অর্থবান এই ধ্বনিসমষ্টিই **ভাষা**। একটি ধ্বনি অথবা একাধিক ধ্বনিসমষ্টি যখন কোন বস্তু বিষয় বা ভাবকে ব্যক্ত করে, তখন সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির লিখিত রূপকে বলা হয় **শব্দ**। বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে বলা হয় **পদ**। দৃষ্টান্ত—'ছাত্ররা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে'। বিশ্লেষণ করিয়া আমরা পাই—

'ছাত্র' শব্দ+'-রা' বিভক্তি='ছাত্ররা' পদ।

'শিক্ষক' শব্দ+'-কে' বিভক্তি='শিক্ষককে' পদ।

'শ্রদ্ধা' শব্দ+'শূন্য' বিভক্তি (অর্থাৎ বিভক্তি হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে কিছু নজরে পড়ে না)='শ্রদ্ধা' পদ।

'কর্' ধাতু+'-এ' বিভক্তি='করে' পদ।

বলা বাহুল্য, 'ছাত্র' **শব্দে** আমরা পাই ছ্+আ+ত্+র্+অ **ধ্বনিসমষ্টি**। এই ধ্বনিসমষ্টিতে ছ্, ত্, র্—এই তিনটি **ব্যঞ্জনধ্বনি** এবং আ, অ—এই দুইটি **স্বরধ্বনি** আছে। সর্বসমেত এই পাঁচটি ধ্বনির সমষ্টি লইয়াই তো 'ছাত্র' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার

আমাদের এই বাংলা দেশে বাঙালী জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত শব্দাদি লইয়া **বংগভাষা** তথা **বাংলা ভাষা** গঠিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের শ্রেণীবিভাগ হয় উৎপত্তির দিক দিয়া, নয় গঠনের দিক দিয়া, নয় অর্থের দিক দিয়া, নয় প্রত্যয়-বিভক্তিযোগের দিক দিয়া—নানা রকমে করা যাইতে পারে। বিভিন্ন ছকের সাহায্যে শব্দের শ্রেণীবিভাগের নানাবিধ পদ্ধতি পরবর্তী পৃষ্ঠাদিতে ব্যাখ্যাত হইল—

শব্দের শ্রেণীবিভাগের নানাবিধ পদ্ধতি

(১) ভাষাতত্ত্বমূলক পদ্ধতিতে বিভাগ
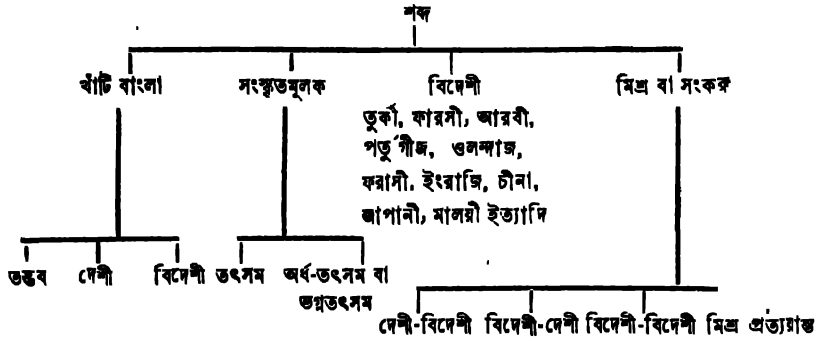
ভাষাতত্ত্বমূলক দৃষ্টিভংগী লইয়া বাংলা শব্দেব শ্রেণীবিভাগ করিবাব কালে আমবা চার জাতের বাংলা শব্দ পাই: যেমন,—(ক) খাঁটি বাংলা শব্দ, (খ) সংস্কৃতমূলক শব্দ; (গ) বিদেশী তথা বিদেশ হইতে আমদানীকৃত শব্দ; (ঘ) মিশ্র বা সংকব শব্দ।

খাঁটি বাংলা শব্দেব তিনটি বিভাগ—তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী। **তদ্ভব**—অর্থাৎ 'তৎ' বা 'তাহা হইতে' মানে 'মূল আর্যভাষা হইতে ভব অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার'। প্রাচীন আর্য ভাষা হইতে উৎপন্ন শব্দই **তদ্ভব শব্দ**। সংস্কৃতই এই মূল আর্যভাষার প্রকৃষ্ট রূপ। প্রাচীন আর্যভাষা ভাষা-প্রাকৃতের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত বা বিকৃত হইয়া বাংলায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। এই ভাবেই তদ্ভব শব্দের উদ্ভব বা আগমন ঘটিয়াছে। প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত বলিয়া তদ্ভব শব্দেব অপব এক নাম **প্রাকৃতজ শব্দ**। পবিবর্তন বা বিকৃতির মধ্য দিয়া তদ্ভব শব্দের উৎপত্তিব নমুনা এইরূপ:—সং অদ্য>প্রাঃ অজ্জ>বাং আজ; সং কর্ণ>প্রাঃ কণ্ণ>বাং কান, সং কাষ্ঠ>প্রাঃ কট্ঠ>বাং কাঠ। প্রাকৃত ভাষায় অনেক অনার্য শব্দ ও অজ্ঞাতমূল শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল—উহারাই **দেশী শব্দ**: যেমন,—'চঙ্গ' হইতে প্রাদেশিক বাংলায় 'চাঙ্গা' বা 'চাঙা'; 'ঢুণ্ট' হইতে বাংলায় 'ঢুঁড়' ইত্যাদি। 'চাউল, তেঁতুল, লাঠি, ঢেঁকি, ডাগর, বাদুড, কুকুর, গাডী, ঘোডা' প্রভৃতি দেশী শব্দ। অবশ্য ইহাদের কয়েকটির প্রতিরূপ শব্দ সংস্কৃতেও পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে পুরাতন পারসীক, গ্রীক প্রভৃতিব সহিত যোগাযোগ থাকায় কয়েকটি ঐ ঐ ভাষাসভূত **বিদেশী শব্দও** প্রাকৃতে প্রবেশ করিয়াছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে ভাষা-রূপান্তরের মধ্য দিয়া বাংলা ভাষাতেও তাহারা স্থায়ী আসন লইয়াছে: যেমন,—প্রাচীন-গ্রীক দ্রাখ্মে (=মুদ্রাবিশেষ)>দ্রম্ম>দম্ম>দাম। প্রাচীন পারসীক 'মোচক্ (=পাদত্রাণ) প্রস্তুতকারী' অর্থে মোচিক>মোচিঅ>মুচি।

সংস্কৃতমূলক শব্দের দুইটি বিভাগ—তৎসম ও অর্ধতৎসম। অবিকৃত বানানসংবলিত সংস্কৃত শব্দই **তৎসম শব্দ**। **তৎসম**—অর্থাৎ 'তৎ বা তাহার' মানে 'সংস্কৃতের সম বা সমান': যেমন,—'গৃহিণী, কৃষ্ণ, চন্দ্র, যজ্ঞ, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, মিত্র' ইত্যাদি। বিকৃত তৎসম বা বিকৃত সংস্কৃত শব্দকে বলা হয় **অর্ধতৎসম** বা **ভগ্নতৎসম শব্দ**: যেমন,—'গিন্নি, কেষ্ট, চন্দর, যজ্জি, পুরুত, বেরাহ্মণ, মিত্তির' ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার উৎপত্তির পরে এই ভারতে তথা বাংলা দেশেও বহু জাতির পদার্পণ ঘটিয়াছে। ফলে বাংলা ভাষায় বহু **বিদেশী শব্দ** প্রবেশ করিয়াছে। এই বিদেশী উপাদানের যৎকিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল: যেমন,—'চকমকি, চাকু, দারোগা, লাশ' প্রভৃতি **তুর্কীশব্দ**, 'কাগজ, কলম, বরফ' প্রভৃতি **ফারসী শব্দ**; 'কবর, নমাজ' প্রভৃতি **আরবী শব্দ**, 'কামরা, পেয়ারা, বোতল, চাবি, পাউরুটি, পেঁপে, বালতি, সাবান, বোতাম' প্রভৃতি **পোর্তুগীজ শব্দ**, 'কার্তুজ, কুপন, ওলন্দাজ, দিনেমার, বুর্জোয়া' প্রভৃতি **ফরাসী শব্দ**, 'ইস্ক্রুপ, তুরুপ, ইস্কাপন, হরতন, রুইতন' প্রভৃতি **ওলন্দাজ শব্দ**; 'গেলাস, বেঞ্চি, টিকিট, ট্রেন, নম্বর, কাপ, ডিস, স্কুল, কলেজ, সিনেমা, থিয়েটার, হাইকোর্ট, ডাক্তার, জজ, ট্রাম, চেয়ার, টেবিল, লেমনেড, পাশ, ফেল' প্রভৃতি **ইংরাজি শব্দ**; 'রিক্সা, হারিকিরি' প্রভৃতি **জাপানী শব্দ**; 'চা, চিনি, লুচি' প্রভৃতি **চীনা শব্দ**: 'সাগু, গুদাম' প্রভৃতি **মালয়ী শব্দ**। আবার **বাণ্টু ভাষার** 'জুলু', **দক্ষিণ আফ্রিকার** ভাষার 'জেব্রা', **পেরু দেশীয়** ভাষার 'কুইনিন', **অষ্ট্রেলীয়** ভাষার 'কাংগারু', **ইটালীয়** ভাষার 'ম্যাজেণ্টা', **তিব্বতী** ভাষার লামা, **বর্মী** ভাষার 'ফুংগী', **রুশ** ভাষার 'বলশেভিক'—এমনি কত কত বিদেশী শব্দকে বাংলা ভাষা সাদরে বরণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া, বাংলা ভাষার ভগ্নীস্থানীয় আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা হইতেও হয় সরাসরিভাবে, নয় খবরকাগজ বা পুস্তকাদির মারফতে অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে: যেমন,—'বাণী' **হিন্দুস্থানী শব্দ**, 'শিখ, চাহিদা' প্রভৃতি **পাঞ্জাবী শব্দ**, 'হরতাল' **গুজরাটী শব্দ**, 'বর্গী' **মারাঠী শব্দ**, 'চেট্টি' **তামিল শব্দ**; 'কপি, কলা, মর্কট' প্রভৃতি **দক্ষিণ ভারতীয় আদি অনার্য শব্দ**, 'কম্বল, ময়ূর' প্রভৃতি **সাঁওতালী শব্দ**। এই ভারতীয় এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত অ-ভারতীয় শব্দাদিই বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে **বিদেশী শব্দ** নামে অভিহিত হইয়াছে।

খাঁটি বাংলা শব্দ, সংস্কৃতমূলক শব্দ ও বিদেশী শব্দের সংযোগে অথবা এক শ্রেণীর শব্দের সংগে অপর শ্রেণীর প্রত্যয়াদির মিশ্রণে জাত যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় আসিয়াছে, তাহারাই **মিশ্র** বা **সংকর শব্দ** (Hybrid word)। ইহাদের উৎপত্তি-ব্যাপারে সাধারণত চার রকমের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়: যেমন,—(১) দেশী ও বিদেশী শব্দের মিশ্রণ—'হাট-বাজার, রাজা-উজীর, শাক-সব্জী'; (২) বিদেশী ও

দেশী শব্দের মিশ্রণ—'মাস্টার-মশাই, জামাই-বাবু, হেড-পণ্ডিত'; (৩) বিদেশী ও দেশী শব্দের মিশ্রণ—'উকিল-ব্যারিস্টার, হেড্-মৌলবী'; (৪) মিশ্র প্রত্যয়ান্ত শব্দ—'পণ্ডিতগিরি, বেটাইম, নস্যদান, মাস্টারী, বাজারিয়া>বাজারে।'

(২) গঠনমূলক অর্থাৎ ব্যাকরণগত পদ্ধতিতে বিভাগ
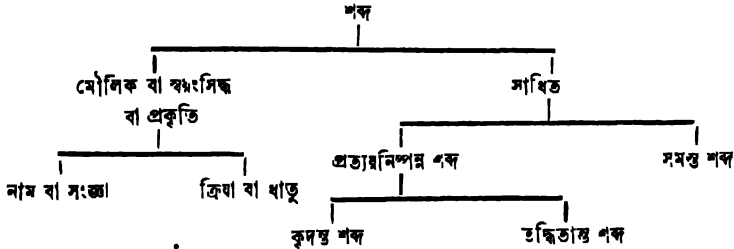
(ক) যে শব্দকে ভাঙা যায় না এবং যাহার প্রকাশিত অর্থই চরম, তাহাকে বলা হয় **মৌলিক** বা **স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ**: মৌলিক শব্দেরই অপর নাম **প্রকৃতি**। যখন কোনও দ্রব্য, জাতি, গুণ বা অপর পদার্থ এই প্রকৃতির দ্বারা দ্যোতিত হয়, তখন ইহাকে **নামপ্রকৃতি** বা **সংজ্ঞাপ্রকৃতি** বলা যায়: যেমন,—'কলম, ভাই, পা, নদী, রাত্রি, পাহাড়'। অর্থসম্পন্ন অথচ বিভক্তিহীন এমন **নামপ্রকৃতিকে প্রাতিপদিক** বলা হয়: যেমন,—'লতা, পাতা, ফুল, নদী, পাখী'। পক্ষান্তরে, প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ ভাঙিলে মৌলিক ভাবব্যঞ্জক যে অংশটুকু কোনও দ্রব্য জাতি বা গুণ না বুঝাইয়া কোনও রকমের ক্রিয়া বুঝায়, তাহারই নাম **ক্রিয়াপ্রকৃতি** বা **ধাতুপ্রকৃতি** তথা **ধাতু**: যেমন,—'রাখ্, গাহ্, খা, চল্, জান্'। (খ) যে শব্দকে ভাঙা যায় এবং ভাঙিয়া যে শব্দের পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে বলা হয় **সাধিত শব্দ**। শব্দ দুই জাতের—**প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ** বা **সমস্ত শব্দ**। একটি শব্দ ভাঙিয়া যদি একটি অংশে মৌলিক ভাব এবং অপর অংশে ঐ মৌলিক ভাবেরই প্রসারণ সংকোচন এবং অপরাপর পরিবর্তন নির্দেশক আর একটি অংশ—যাহার নাম **প্রত্যয়**—থাকে, তাহা হইলে সেই শব্দকে বলা হয় **প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ**: যেমন,—কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দের নমুনা—'দৃশ্+অনট্=দর্শন, রাখ্+আল=রাখাল'। তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দের নমুনা—'বাক্স+বন্দ>প্রসারে বন্দী =বাক্সবন্দী; সর্প+ইলচ্ (ইল)=সর্পিল'। যে শব্দ ভাঙিলে একাধিক মৌলিক বা প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় **সমস্ত শব্দ** অর্থাৎ **সমাসযুক্ত** বা **মিলিত শব্দ**। যেমন,—'পা-গাড়ী, হাত-পাখা, বর্ষব্যাপী, উনুনমুখো' ইত্যাদি।

(৩) অর্থমূলক পদ্ধতিতে বিভাগ

(ক) ভাষায় যাহার বিশ্লেষ সম্ভব নয় এমন মৌলিক শব্দ অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ের যোগে, অথবা একাধিক শব্দের সংযোগে যে অর্থ হওয়া সমীচীন, তাহাই **যৌগিক** বা **যোগ শব্দের** দ্বারা প্রকাশিত হয় : যেমন, 'যিনি দান করেন' এই অর্থে দাতা<দা+তৃন্ ; 'মিতা বা বন্ধুর ভাব' এই অর্থে মিতালি<মিতা+আলি। (খ) প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অনুসারী অর্থ না হইয়া, যেখানে শব্দের দ্বারা অপর কোন বিশেষ পদার্থ বুঝায়, সেইরূপ শব্দকে বলা হয় **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ** : যেমন,—'কুশল'-এর প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হইতেছে 'যে কুশ তুলিতে পারে', কিন্তু এই শব্দের প্রচলিত রূঢ়ি অর্থ হইতেছে 'দক্ষ'। 'জেঠাম'-এর প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ 'জেঠার মত কাজ' কিন্তু এই শব্দের প্রচলিত রূঢ়ি অর্থ 'চাপল্য'। (গ) একাধিক শব্দ বা ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন বা সমাসযুক্ত শব্দ যেখানে অপেক্ষিত অর্থ অর্থাৎ স্বাভাবিক অর্থ প্রকাশ করিয়াও কোনও বিশেষ অর্থ বুঝায়, সেইরূপ শব্দকে বলা হয় **যোগরূঢ় শব্দ** : যেমন,—'রাজপুত' শব্দের অপেক্ষিত বা স্বাভাবিক অর্থ 'রাজার পুত বা পুত্র' ; কিন্তু 'ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধ-জাতি-বিশেষ'ও বুঝায়—তাই 'রাজপুত' যোগরূঢ় শব্দ। 'সুহৃৎ' শব্দের অপেক্ষিত বা স্বাভাবিক অর্থ 'সুন্দর হৃদয় যাহার', কিন্তু ইহা 'বন্ধু' এই বিশেষ অর্থও বুঝায়—তাই 'সুহৃৎ' যোগরূঢ় শব্দ। 'পংকজ' শব্দের অপেক্ষিত বা স্বাভাবিক অর্থ 'পংকে যাহা জাত' ; কিন্তু ইহা 'পদ্ম' এই বিশেষ অর্থও বুঝায়—তাই 'পংকজ' যোগরূঢ় শব্দ।

(৪) প্রত্যয়-বিভক্তিযোগমূলক পদ্ধতিতে বিভাগ
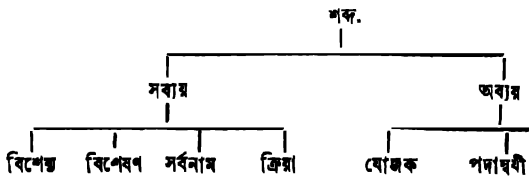
প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করিলে যে শব্দের রূপান্তর ঘটে, তাহা **সব্যয় শব্দ** ; যেমন,—ছাত্র+রা বিভক্তি=ছাত্ররা। কর্+ইতেছে প্রত্যয়=করিতেছে। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া—এই চার প্রকারের সব্যয় শব্দ হয়। লিংগ, বিভক্তি ও বচনের দিক দিয়া যে শব্দের কোন রকমেরই পরিবর্তন ঘটে না, তাহাই **অব্যয় শব্দ**।

অব্যয় শব্দকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় : যেমন,—'আর' 'ও' 'কিন্তু' প্রভৃতি **যোজক অব্যয়** ; 'দ্বারা' 'চেয়ে' 'নিমিত্ত' প্রভৃতি **পদান্বয়ী অব্যয়** : 'মরি-মরি' 'ছি ছি' **অনন্বয়ী অব্যয়**। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক রকমের অব্যয় শব্দ বাংলায় আছে : যেমন,—'তা' 'তো' প্রভৃতি **বাক্যালংকার অব্যয়**। 'যদিও···তথাপি', 'হয় ···নয়', 'যখন·· তখন' প্রভৃতি **সাপেক্ষ অব্যয়** ; 'শন্ শন্' 'ঘেউ ঘেউ' 'কড়মড়' প্রভৃতি **অনুকৃতিবাচক অব্যয়**।

অনুশীলনী

[এক] 'শব্দ' ও 'পদে'র পার্থক্য কী ? শব্দের শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন পদ্ধতি ছকের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

[দুই] বাঙলা ভাষায় প্রযুক্ত বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও প্রত্যয় যোগে গঠিত পাঁচটি মিশ্র বা সংকর শব্দের (Hybrid word-এর) উদাহরণ দাও ও সেই শব্দ লইয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৭**

[তিন] নিম্নলিখিত প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া দৃষ্টান্তসহ বিশদ পরিচয় লিখ :— দেশী শব্দ, সংকর শব্দ ও যৌগিক শব্দ (**গৌ. বি বি. এ. '৫০**)। সংকর শব্দ ও যোগরূঢ় শব্দ (**গৌ. বি. বি এ. '৫১**)। যোগরূঢ় শব্দ ও তদ্ভব শব্দ [**রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫**]। অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ [**ক. বি বি. এ. '৫১ , (বিকল্প) '৫১ , উ. বি বি. এ. '৫৫**]। বিদেশী শব্দ , স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ , সাধিত শব্দ ; সমস্ত শব্দ ; প্রকৃতি ; নামপ্রকৃতি , ধাতুপ্রকৃতি , প্রাতিপদিক , রূঢ়ি শব্দ ; সব্যয় শব্দ , অব্যয় শব্দ।

[চার] তদ্ভব, তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দ কাহাকে বলে উদাহরণ-সহ বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. বি. এ (বিকল্প) '৫৫**

[পাঁচ] বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের বিবিধ ও বিচিত্র উপকরণগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ কর। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৪৯ ; বি. এ. (বিকল্প) '৫৬**

[ছয়] প্রাকৃতের সংগে বাংলা ভাষার সম্পর্ক সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। **ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৭**

[সাত] বাংলা শব্দসমূহের ভিতরে কত রকমের আগন্তুক শব্দ রহিয়াছে দৃষ্টান্তসহ সে সম্বন্ধে আলোচনা কর। **ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫১**

[আট] বাংলা ভাষার অংগীভূত ছয়টি বিদেশী শব্দের মূল ভাষার উল্লেখপূর্বক উহাদের সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা কর। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬**

[নয়] নিম্নলিখিত শব্দগুলির জাতি-পরিচয় লিপিবদ্ধ কর :—আমড়া , চাঙ্গা ; দাম ; চন্দন ; চাকু ; বরফ , কবর ; বোতাম , ইস্ক্রুপ ; পাশ ; লুচি ; রিক্সা ; বেটাইম ; ঘোড়া ; রাখাল ; উনুনমুখো ; রাত্রি ; মিতালি ; কুশল ; শন্ শন্ ; ছাত্ররা ; কিন্তু।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দবিবর্তন

সংস্কৃত	প্রাকৃত	আধুনিক বাংলা
অদ্য (* অদ্যম্)	অজ্জিং	আজ্
অধস্তাৎ (* অধিস্তাৎ)	হেট্ঠা, হেণ্টা	হেঁট
অপর	অবর	আব্
অপরস্মরতি	পস্সরদি, পস্সরই	পাসরে
অর্দ্ধ-তৃতীয়	অড্ঢ-তইঅ	আড়াই
অলক্ত—	অলত্ত—	আল্তা
অবিধবা	অবিহবা	এয়ো
অবিধবত্ব	অবিহবত্ত	এয়োৎ
অশীতি	অসীদি, অসীই	আশী
অষ্টাদশ	অট্ঠারহ	আঠারো
অস্মে	অম্হে	আমি
আদর্শিকা	আঅরসিআ	আরশি
আদিত্য	আইচ্চ	আইচ্ (পদবী)
আম্রাতক	অম্বাডঅ	আম্ড়া
আত্রিশতি	আত্রিসই	আইসে, আসে
ইন্দ্রাগার—	ইন্দাআর—	ইঁদারা, ইঁদেরা
ইষ্টক	ইঠঅ, ইট্ঠঅ	ইট, ইঁট
উদ্ধার—	উদ্ধার	উধার > ধার
উষ্ণাপন—	উন্হারণ	উনান
উপাধ্যায়	উবজ্ঝাঅ	ওঝা > রোজা
কথয়তি	কহেই	কহে, কয়্
কফোণিকা	কহোণিঅ	কইনু
কক্ষ—	কচ্ছ, কখ < কক্থ	কাঁখ, কাছ
কর্ণ	কণ্ণ	কান
কর্ষপট্টিকা	কস্সবট্টিআ	কষটী, কষ্টী
কীদৃশ, কীদৃশন— / * কাদৃশন—	কাইসণ, / কইসণ—	কেন (= ক্যানো)
*কৃষ্ণ—*ক্র্ষ্ণ	কণ্হ	কান, কানু, কানাই

সংস্কৃত	প্রাকৃত	আধুনিক বাংলা
কেতক-	কেদগ—, কেঅঅ—	কেয়া
*কেতক-ট—	কেদগড— / কেঅঅড—	কেওড়া
ক্ষার—	ছার, খার	ছার, খার
খাদতি	খাঅই	খায়্
খাদ্য—	খজ্জ	খাজা
গত + —ইল—	গঅ-ইল—	গেল (= গ্যালো)
গর্দভ—	গদ্দহ—	গাধা
গৃহিণী	ঘরিণী	ঘরণী
গো-বিষ্ঠা	গোইট্ঠা	ঘুঁটে
গোস্বামিক	গোসামিগ, গোসামিঅ	গুঁই (পদবী)
গোরূপ	গোরূব	গোরু
গ্রথতি	গঢই	গঢে > গড়ে
গ্রন্থি	গণ্ঠি	গাঁঠ
গ্রাম	গাম	গাঁও, গাঁ
ঘাত	ঘাদ, ঘাঅ	ঘাও, ঘা
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
ছাদনিকা—	ছাঅণিঅ	ছাঅনি > ছানি
জতুগৃহ	জোহর	জহর
জ্যেষ্ঠতাত	জেট্ঠআঅ	জেঠা (জ্যাঠা)
তন্ত্র	তন্ত	তাঁত
তাম্র—, *তাম্ব	তম্ব—	তাঁবা, তামা
তুণ্ড	টুণ্ড	ঠোঁট
ত্রীণি	তিন্নি	তিন্
দলপতি	দলবই	দলই, দলুই (পদবী)
দীপবর্তিকা	দীববট্টিআ	দেউটী
দীপবৃক্ষ	দীবরুক্খ—	*দিঅউরুখা, দেউরুখা / দেরখো
দুহিতা	ধীতা > ঝিআ	ঝি

সংস্কৃত	প্রাকৃত	আধুনিক বাংলা	সংস্কৃত	প্রাকৃত	আধুনিক বাংলা
দেবকুলিক—	দেউলিঅ	দেউলিয়া	রাজ্ঞিকা	রণ্ণিআ	রাণী
দ্বি-অর্দ্ধ	দিঅড্ঢ	দেড	রাধিকা	রাহিআ	রাই
দেবগৃহ	দেবহর—	দেহরা	রোহিত—	রোহিঅ	রুহী, রুই
নবনীত	নবনীঅ	ননী	বল্গা	বগ্‌গা	বাগ্‌
নপ্তৃক—	নত্তিঅ	নাতি	বন্যা	বন্না	বান্‌
পাটলি, পাটলিকা	পাডলি, পাডলিআ	পারুল্‌	শুক—	সুক্‌খ—	শুখা, শুকো
প্রতিষ্ঠা	পইট্‌ঠা	পইঠা > পৈঠা	শৃণোতি	সুণই	শুনে, শোনে
প্রতিবেশিক—	পডিএসিঅ	পডিশী > পড়শী	শেফালিকা	সেহালিআ	শিউলী
প্রস্থাপয়তি	পট্‌ঠাবেই	পাঠায়	*শ্বশ্রূটিকা	সসুহুডিআ	শাশুড়ী
প্রবিশতি	পবিসই	পৈশে, পশে	ষোড়শ	ষোলহ	ষোল
বাষ্প	*বপ্‌ফ > ভপ্প	ভাপ	সন্ধ্যা	সঞ্‌ঝা	সাঁঝ্‌
ব্রাহ্মণ	বম্‌হণ	বামন্‌, বামুন্‌	সপত্নী	সবত্তী	সৎ (সৎ-মা)
ভদ্রক	ভদ্দঅ—	ভালো	সমর্পয়তি	সমপ্পেই	সঁপে
ময়া	মএ	মুই	সংক্রম	সংকম	সাঁকো
মৃত—	মড—	মড়া	সংদংশিকা	* সণ্ডংসিআ	সাঁড়াশি
যাতি = যাতি	জাই	জায়্‌ (= যায়)	স্থামিক	ঠামিঅ > ঠাবিঁঅ	ঠাঁই
রথ্যা	রচ্ছা, লচ্ছা	নাচ			
রক্ত	রত্ত	রাতা (প্রাচীন বাং)	সামন্তরাজ	সামন্তরাঅ	সাঁত্‌রা (পদবী)
রক্ষাপাল	রকখপাল	রাখাল	হস্ত	হত্থ	হাত্‌

অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির সংস্কৃত মূল লিখ এবং তাহা হইতে বর্তমান আকারে পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা প্রদর্শন কর :—গুঁই (পদবী); দেবুখো; সাঁকো; সাঁঝ; আইচ (পদবী); কেন? আমি; এয়ো; ঘুঁটে; ভালো; উবু; নাছ; ভাপ; ঝি, বাগ (rein); খাজা; সাঁওতাল; ভাত, দাঁ (পদবী); সী (পদবী)। ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৫, '৫৬, '৫৭

[দুই] নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—কানু, ঠাকুর, তাম্বুল, শিউলি, উর্ণনাভ, পুঁথি, মুচি, দাম, হেঁট, কার্তুজ। ক. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫২

[তিন] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির নিজ নিজ ক্ষেত্রানুযায়ী তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম অথবা তৎসম প্রতিশব্দ দাও এবং একটি করিয়া বাক্য রচনা কর :— তন্ত্র; কোটাল; ডাল; ক্ষুদ্র; বুদ্ধ; গোরু; রক্ত; রত্ন; স্বামী; গাঁঠ; খাদ্য, অন্ত; ঘরণী; কৃষ্ণ; বদন; পংক্তি; বদল; মহার্ঘ্য; বকশিশ; সরম; স্নেহ; আমিষ; কামার; সূত্রধার; মোতি; রাখাল; বাঙ্গালা। গৌ. বি. বি. এ. '৫০, '৫১

তৃতীয় অধ্যায়

শব্দগঠন

প্রত্যয়—সন্ধি—সমাস—উপসর্গ

শব্দগঠনের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়,—সাধারণত শব্দগঠন দুই রকমে হয়: প্রথমত, প্রত্যয়যোগে; দ্বিতীয়ত, ধ্বনির সংগে ধ্বনিযোগে, শব্দের সংগে শব্দ-যোগে। ধাতুর সহিত কৃৎপ্রত্যয়-যোগে এক জাতীয় শব্দ গঠিত হয়—ইহারা **কৃদন্ত শব্দ**। ক্রিয়াপ্রকৃতি অথবা ধাতুর উত্তর যে সকল প্রত্যয় জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহারাই **কৃৎপ্রত্যয়**। আবার শব্দের সহিত তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগে আর এক জাতীয় শব্দ গঠিত হয়—ইহারা **তদ্ধিতান্ত শব্দ** বা **সাধিত শব্দ**। শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহারাই **তদ্ধিত প্রত্যয়**। সর্বশেষে ধ্বনির সংগে ধ্বনি-যোগে, শব্দের সংগে শব্দযোগে যে শব্দাদি গঠিত হয়, তাহারা **সন্ধিনিষ্পন্ন, সমাসনিষ্পন্ন ও উপসর্গযোগে উৎপন্ন শব্দ**। এই জাতীয় শব্দই **যৌগিক শব্দ**।

(১) কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ তথা কৃদন্ত শব্দ

বাংলা কৃৎপ্রত্যয়

অন>(বিকারে স্বরবর্ণের পরে) ওন—(ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন করে ও অর্থটি অনেক ক্ষেত্রেই ক্রিয়াবাচক হইতে বস্তুবাচক হইয়া পড়ে)—নাচ্+অন= নাচন; খা+ওন=খাওন, এইরূপ ঢাকন, ফলন, ঝাড়ন, ঝুলন।

অনা, ওনা—('অন' প্রত্যয়েরই প্রসার, তাই ইহার অর্থটিও 'অন' প্রত্যয়েরই অনুরূপ)—কাঁদ্+না=কাঁদনা>কান্না; এইরূপ কুটনা, বাজনা, ঢাকনা।

অন্ত—('এইরূপ করিতেছে, এইরূপ অবস্থায় বিদ্যমান' অর্থে এই প্রত্যয়ঘটিত শব্দ বিশেষণ ও বিশেষ্য গঠন করে)—জী+অন্ত=জীয়ন্ত>জ্যান্ত, এইরূপ বাড়ন্ত, ফলন্ত।

অৎ>প্রসারে অতা, অতী (অতি), তা, তি—ফির্+অৎ=ফিরৎ=ফেরৎ>প্রসারে ফেরতা, ফিরতী; এইরূপ চলতী, উঠতি, বহতা, সব-জান্‌তা, পারত-পক্ষে। এই প্রত্যয়ের প্রসার-জাত অতী, অতি, তি প্রত্যয় ক্রিয়া এবং বস্তুবোধকও বটে: যেমন,—গুনতি, ভরতি, বাড়তি, ঘাটতি, ঝড়তি, পড়তি।

আই—(সাধারণত ভাববাচক ক্রিয়াদ্যোতক, তবে কদাচিৎ বস্তুদ্যোতকও হয়)—লড্‌+আই=লড়াই ; এইরূপ বাছাই, খোদাই, ঝালাই, বাঁধাই।

আনি, আনী—(ভাববাচক ক্রিয়াবোধক, তবে কখনও কখনও বস্তুবাচক নামরূপেও হয় ব্যবহৃত)—উড়্‌+আনি (নী)=উড়ানি, উড়ানী ; এইরূপ নিকানি, নিকানী।

আনো, আনী—('ণিজন্ত অথবা নামধাতুর নিষ্ঠা' অর্থে)—নামধাতুতে 'আনো'—যেমন,—ঘোলানো ; এইরূপ ভিড়ানো। ণিজন্ত ধাতুতে 'আনো'—যেমন,—ছাদচোঁয়ানো, ঘুমভাঙানো, বুকজুড়ানো, বাঁধআটকানো। ধ্বন্যাত্মক ধাতুতে 'আনি'—যেমন,—কলকলানি, ফোঁসফোঁসানি, কনকনানি, দবদবানি, টনটনানি, ধড়ফড়ানি। আবার লোকহাসানী, ঘরভাঙানী, পাড়াবেড়ানী।

আরী, উরী—('জীবিকা' অর্থে)—ডুব্‌+আরী (উরী)=ডুবারী, ডুবুরী , এইরূপ ধুনারী, ধুনুরী।

ইয়া>চলিত ভাষায় ইয়ে—('সেই বিষয়ে প্রবীণ বা দক্ষ' বুঝায়)—খা+ইয়ে=খাইয়ে , এইরূপ বলিয়ে, গাইয়ে, নাচিয়ে, বাজিয়ে।

উনি—('স্বল্পতাবোধক ক্রিয়া অথবা ক্ষুদ্র বস্তু' অর্থে ; 'সে এই কাজ করে' অর্থে)—বক্‌+উনি=বকুনি , এইরূপ গাঁথুনি, রাঁধুনি, নাচুনি, বাঁধুনি।

উয়া>চলিত ভাষায় ও—('সে করে' এই অর্থে)—পড়্‌+উয়া>ও=পড়ুয়া>প'ড়ো। এইরূপ খাউয়া, খেয়ো।

উক>প্রসারে উক+আ=উকা—(স্বভাব বুঝাইতে)—খা+উকা=খাউকা>খেকো। এইরূপ মিশুক।

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়

— অক্—('শিল্পী' অর্থে)—গৈ+অক=গায়ক ; এইরূপ রঞ্জক, নর্তক, খনক।

তৃচ, তৃন্—('সে করে' অর্থে)—দা+তৃন্=দাতা ; এইরূপ জেতা, গ্রহীতা, নিয়ন্তা, সবিতা।

অ=খচ্—('যে করে' অর্থে)—শুভ+কৃ+খচ্=শুভংকর ; এইরূপ ভয়ংকর, ক্ষেমংকর, প্রিয়ংবদ, তুরংগম, যুগন্ধর, বিশ্বম্ভর, শত্রুঞ্জয়।

ঘঞ্—(কর্তার, অথবা ভাবের প্রকাশক)—বি—রঞ্জ্‌+ঘঞ্=বিরাগ ; এইরূপ পাক, শোক, রোগ, সংগ, ভাগ; ভাব, বোধ, দায়।

অচ্—(ভাববাচক নামপ্রকাশক)—জি+অচ্=জয় ; এইরূপ লয়, রব, বর্ষ, মোহ।

অনট্—(করণ বুঝাইতে, অর্থাৎ 'যদ্দ্বারা কার্য নিষ্পন্ন হয়' এই অর্থে)—সৃজ্‌+অনট্=সর্জন, কিন্তু বাংলায় 'সর্জন' স্থানে 'সৃজন' সুপ্রচলিত ; চি+অনট্=চয়ন ; এ

এইরূপ আরোহণ, বিধান, ভোজন, রঞ্জন, শয়ন, শ্রবণ, পতন, গান, অধ্যয়ন, অনুষ্ঠান, দান।

ক্ত=ত—(নিষ্ঠার্থে অর্থাৎ 'হইয়াছে' অর্থে)—নি—মস্জ্+ক্ত=নিমগ্ন; নির্—আ—কৃ ('খণ্ডন করা' অর্থে)+ক্ত=নিরাকৃত; বি-নশ্+ক্ত=বিনষ্ট; এইরূপ গত, দগ্ধ, স্থিত, মৃত, দত্ত, দৃষ্ট, মুগ্ধ। লালা+ক্যঞ্=‘লালায়’ নামধাতু। অতঃপর লালায়+ক্ত=লালায়িত।

তব্য, অনীয়—('ইহা করা হইবে, অথবা করা উচিত' এই অর্থে)—দৃশ্+তব্য, অনীয়=দ্রষ্টব্য, দর্শনীয়; এইরূপ বক্তব্য, বচনীয়; পূজিতব্য, পূজনীয়; কর্তব্য, করণীয়; স্মর্তব্য, স্মরণীয়; মন্তব্য, মননীয়।

যৎ>য—পা+য=পেয়; এইরূপ সহ্য, দেয়, লভ্য, জ্ঞেয়, ধ্যেয়, ভব্য।

ক্তি=তি—('ভাববাচ্যে' অর্থাৎ 'তাহার ভাব' এই অর্থে)—বচ্+ক্তি=উক্তি; এইরূপ দৃষ্টি, খ্যাতি, গীতি, শ্রান্তি, হানি।

ণিন্=ইন্—(কর্তৃবাচ্যে 'ব্রত, শীল ও পৌনঃপুন্য' অর্থে)—অপ—রাধ্+ণিন্=অপরাধী; এইরূপ উপকারী, অধিকারী, সত্যবাদী, জয়ী, দমী, যোগী, মিত্রদ্রোহী, বিবেকী।

শানচ্—বৃধ্+শানচ্=বর্ধমান, এইরূপ বর্তমান, দীপ্যমান, ম্রিয়মাণ, শয়ান, আসীন। বন্দমান (কর্তৃবাচ্যে), বন্দ্যমান (কর্মবাচ্যে); ঘূর্ণমান (কর্তৃবাচ্যে), ঘূর্ণ্যমান (কর্মবাচ্যে)। দণ্ড+ক্যঙ=‘দণ্ডায়’ নামধাতু। অতঃপর দণ্ডায়+শানচ্=দণ্ডায়মান।

যঙ্+শানচ্—('পৌনঃপুন্য' অর্থে 'যঙ্' প্রত্যয় বসে)—জ্বল্+যঙ্+শানচ্=জাজ্বল্যমান; এইরূপ দেদীপ্যমান, রোরুদ্যমান, দোদুল্যমান।

সন্+অঙ্—(ইচ্ছার্থে)—শ্রু+সন্+অঙ্, স্ত্রীলিংগে আ=শুশ্রূষা; এইরূপ জিজ্ঞাসা, জিগীষা, বুভুক্ষা, পিপাসা, লিপ্সা, ভিক্ষু, পিপাসু।

প্রয়োগ

বাতাসে **দোদুল্যমান** বস্ত্রাঞ্চল শারদ আকাশের মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। গীতকণ্ঠ পথিক সুরের মাধুর্য চতুর্দিকে **বিকীর্ণ** করিতে করিতে যাইতেছেন। তিনি পুত্রশোকে **মুহ্যমান** হইলেন। **বাতাহত** কদলীপত্রের শোভা দর্শনে তিনি বিমোহিত হইলেন। কবিতাটি **নাচুনি** ছন্দে লিখিত। নেতাজীর **স্মৃতি** আমাদের অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে **খোদাই** থাকিবে। **পড়ন্তি** বেলায় মেয়েরা কলসী-কাঁখে জল আনতে যায়। লোকটি বেশ **বলিয়ে-কইয়ে**।

(২) তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ তথা তদ্ধিতান্ত শব্দ

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

আল, আলা, ওয়াল, ওয়ালা—('সম্বন্ধ=দেশ, ব্যবসায়' বুঝাইতে)—ঘোষাল, কাশীয়াল, গয়াল, আগরওয়াল, বাড়িয়ালা, ফুলওয়ালা, ফেরিওয়ালা, পানয়ালা।

টে, আ, ঈ, ওয়ার, আলো, মন্ত, বন্ত, ইয়াল, দার—(স্বার্থে বা সাদৃশ্যে, ভাবার্থে, 'গুণ সম্বন্ধ শীল বা সংযোগ' বুঝাইতে)—হিংসুটে, বকাটে, ভাড়াটে, পাগ্‌লাটে, রোগাটে, তামাটে, ঘোলাটে, সাদাটে, ধোঁয়াটে; জংলা, তেলা, লাংলা; করাতী, দোকানী, পসারী, ঢাকী, দরদী, মরমী, বাঙালী, দাঁড়ী; জানোয়াব, হুঁসিয়ার, পাটোয়ার; শাঁসালো, ধারালো, তেজালো; লক্ষ্মীমন্ত, শ্রীমন্ত; ভাগ্যবন্ত, বলবন্ত; খাটিয়াল, লাঠিয়াল; চড়নদার, বাজনদার।

পারা, পানা—(সাদৃশ্যার্থে)—চাঁদপারা, পাগলপারা; কুলোপানা, হাঁড়িপানা।

আলি, পনা, আনি, আমি, মি, তমি—('ভাব, বৃত্তি বা কার্য' বুঝাইতে)—মিতালি, ঠাকুরালি, ঘটকালি; টাটপনা, গিন্নিপনা; কাতরানি, জ্যাঠামি; গোঁয়ারতমি।

উক, উকে—('আতিশয্য, আসক্তি' অর্থে)—লাজুক, মিথ্যুক, পেটুক, নাটুকে।

ত', তো, তা, তুতা, তুতো—(অপত্যার্থে)—জেঠাত', জেঠুতা, জেঠ্‌তুতা, মামাতুতো>মামাতো।

আর, রী, আরী—('জীবিকা' অর্থে)—চামার, কুমার, ছুতার; শাঁখারী, কাঁসারী, পূজারী, চুণারী, ভিখারী।

আই—(ভাবে ও আদরে)—বামনাই, বড়াই, খাড়াই, পোষ্টাই, চওড়াই, সাফাই, মিঠাই; কানাই, ধনাই, লখাই, ছিরাই, গণাই, জনাই।

আ, ই, উ—(স্বার্থে)—চোঙা, তলা, থালা, চোরা, পাতা, ল্যাজা; কাঁঠি, ছাতি, থলি; আগু, গাড়ু, চুমু।

তা, তী, উতি, ত—(পত্রজাতীয় বস্তু বুঝাইতে 'যুক্ত' অর্থে)—নামতা, নোনতা, পান্তা, চাকতি, করাত।

ঈ—('সম্বন্ধ, সংযোগ, শীল, ধর্ম, ব্যবসায় বা আজীবিকা' বুঝাইতে)—নাকী, দাগী; আলাপী, মজলিসী, হিসাবী, খেয়ালী, ধ্রুপদী, সেতারী।

কর—('করে' অর্থে)—কারিকর, বাজীকর, হালুইকর, শালকর।

আ, আল, লি, আলি, রি, লা, ই—(বিবিধার্থে)—ভাতা, হাতা, বাঘা, চাষা, বাতাসা; সাজাল, দাঁতাল, দয়াল; সোনালি, মাঝিয়ালি, দূতীয়ালি; মাঝারি, মশারি, বাঁকারি; শ্যাম্‌লা, আধ্‌লা, ছাদলা, কামলা, মেঘলা; ডালি, কাঁসি, দাঁতি।

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণি, ষ্ণিক, ষ্ণেয়, ষ্ণায়ন, ষ্ণীয়—(অপত্যার্থে)—পার্থ, দৌহিত্র, মানব; দৈত্য, চাণক্য; দ্রৌণি, কার্ষ্ণি, দাশরথি, সৌরি, রাবণি, আর্জুনি, সৌমিত্রি; রৈবতিক, আশ্বপালিক, কৌন্তেয়, বৈমাত্রেয়, গাংগেয়; বৈশম্পায়ন, দ্বৈপায়ন, বাৎস্যায়ন, মৌদ্‌গলায়ন, নারায়ণ, কাত্যায়ন; স্বস্রীয়।

ষ্ণ, ষ্ণ্য—('উপাসক বা ভক্ত' অর্থে)—সৌর, ব্রাহ্ম, জৈন, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য।

ষ্ণিক, নীন (=ঈন), নীয় (=ঈয়)—('সম্বন্ধীয়' অর্থে)—মানসিক, নৈতিক, সার্বজনিক, ঐহলৌকিক, পারলৌকিক; সার্বজনীন, সর্বজনীন; গ্রামীণ; জলীয়, রাজকীয়, বংগীয়, স্বীয়, স্বকীয়, রাষ্ট্রীয়, শারদীয়, স্বর্গীয়, জাতীয়, ভবদীয়, মদীয়, তদীয়।

ত্ব, তা, ইমন্‌, থা, ত্য—('গুণ, ভাব' অর্থে)—দাসত্ব, সতীত্ব, সত্ত্ব, মহত্ত্ব, সত্তা, মধুরতা; মধুরিমা, নীলিমা, মহিমা, রক্তিমা, গরিমা, লঘিমা, লালিমা; সর্বথা, যথা; পাশ্চাত্ত্য, দাক্ষিণাত্য।

তা, ত্ব, ষ্ণ্য, ষ্ণিক—('কার্য, জীবিকা' অর্থে)—শিক্ষকতা; পৌরোহিত্য; নেতৃত্ব, সতীত্ব, নারীত্ব; সারথ্য, সৌজন্য; তৈলিক, তাম্বুলিক, নাবিক।

ইন্‌, ময়ট্‌, ল, আলু, শ, ইল, র, মতুপ্‌, বতুপ্‌—(অস্ত্যর্থে)—দেহী; মহিমময়; মাংসল, রসাল; দয়ালু; রোমশ; ফেনিল, পংকিল; নখর; শ্রীমান্‌; গুণবান্‌।

চ্বি—('অভূত-তদ্ভাব' অর্থে)—ভস্মীভূত, একত্রীভূত, বশীভূত, একীভূত।

কল্প—('ন্যূন' অর্থে)—ঋষিকল্প, দেবকল্প, মৃতকল্প, পিতৃকল্প।

ময়ট্‌ (=ময়)—('বিকার, সংসর্গ, ব্যাপ্তি, প্রাচুর্য' অর্থে) হিরণ্ময়; পাপময়; জলময়; তন্ময়; আনন্দময়।

ইত, ইক—('উৎপন্ন, দেয়, জাত, যুক্ত, জ্ঞাত' অর্থে)—ফলিত, পুষ্পিত, নিদ্রিত, পুলকিত, কলংকিত; চৈনিক, মাসিক, বার্ষিক, দৈনিক, বাসন্তিক, সামুদ্রিক, ঐহিক, ঐতিহাসিক, নৈয়ায়িক, সাহিত্যিক।

বৎ, স্থানীয়—(সাদৃশ্যার্থে)—মাতৃবৎ, মাতৃস্থানীয়; পিতৃব্য, পিতৃস্থানীয়।

বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়

আন, ওয়ান, দার—('অধিকার' বুঝাইতে)—গাড়োয়ান, দারওয়ান, কোচওয়ান ; দোকানদার, বুটিদার, দানাদার, চৌকিদার, বুঝদার।

আনা (-য়ানা)>প্রসারে আনী, আনি—('অভ্যাস বা শীল' অর্থে)—বিবিয়ানা, বিবিয়ানি ; মস্তানী ; সালানা, সালিয়ানা ; হিন্দুয়ানা ; হিন্দুয়ানী।

খানা—('দোকান, স্থান' অর্থে)—মুদিখানা, ছাপাখানা, ডাক্তারখানা, পিলখানা।

খোর—('সেবনকারী' অর্থে)—গাঁজাখোর, মদখোর, গুলিখোর, আফিঙখোর।

গর—('যে করে বা গড়ে' অর্থে)—কারিগর, বাজিগর, সওদাগর।

গিরি—('ব্যবসায় বা শীল' অর্থে)—মুটিয়াগিরি, পাণ্ডাগিরি, রাজাগিরি, মুচিগিরি, বাবুগিরি, কেরাণীগিরি।

চা, চি, চী—('আধার, ক্ষুদ্র' অর্থে)—বাগিচা, নলিচা, নইচা, পাতমুচি বা পাতঞ্চি ; ধূনাচী'। চী—('ব্যবসায়ী বা কর্মী' অর্থে)—বাবুর্চী, খাজাঞ্চী, কলমচী (ব্যংগার্থে লেখক)।

দান, দানী—('আধার' অর্থে)—আতরদান, কলমদান, নস্যদান ; ফুলদানী, পিকদানী।

তর, তরো—('প্রকার' অর্থে)—এমনতর, গুরুতর, বহুতর ; যেমনতরো।

নবিশ—('লেখা, পেশা, বা ব্যবসায়' অর্থে)—নকলনবিশ, শিক্ষানবিশ।

বন্দ>প্রসারে বন্দী—('বদ্ধ বা গৃহীত' অর্থে)—পেঁটরা-বন্দী, বাক্সবন্দী, চিঠা-বন্দী, বাঘ-বন্দী।

বাজ—('অভ্যস্ত' অর্থে)—চালবাজ, ফন্দীবাজ, ধড়িবাজ, ধাপ্পাবাজ, ধোঁকাবাজ, মামলাবাজ। বাজী—(প্রসারে 'শীল' অর্থে)—চালবাজী, গলাবাজী।

সহি, সই—('যোগ্য' অর্থে)—মানান্-সহি, প্রমাণসহি ; মাপসই, টেকসই, চলনসই, লাগসই।

স্তান—('দেশ' অর্থে)—হিন্দুস্থান, পাকিস্তান (সং পাবক-স্থান = পবিত্র দেশ)

প্রয়োগ

আমাদের **বাড়িয়ালার** সংগে রাস্তার **পানয়ালার** ঝগড়া বাধিতেই এক **ফুলয়ালা** আসিয়া গোলমাল মিটাইয়া দিল। **পাওনাদারদের** ভয়ে **দেনাদার** খিড়কীর দুয়ার দিয়া যাতায়াত করে। **বাজীকরের** অপূর্ব ক্রীড়া দেখিয়া কারখানার **কারিকরেরা** বিস্মিত হইল। হরেনবাবু যেমন **আলাপী** তেমনি **মজলিসী**। মুখখানি **হাঁড়িপানা** করে ব'সে আছ কেন? আঙুর খুব **পোষ্টাই**। এই গ্রামে একটিও **কয়াতী** নাই।

(৩) যৌগিক শব্দ

কয়েকটি সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ

স্বরসন্ধি—অনু + উদিত = অনূদিত। গংগা + ঊর্মি = গংগোর্মি। মহা + ওষধি = মহৌষধি। হিম + ঋতু = হিমর্তু। উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ। বি + অর্থ = ব্যর্থ। প্রতি + উষ = প্রত্যূষ। নি + ঊন = ন্যূন। ত্রি + অম্বক = ত্র্যম্বক। বি + উঢ় = ব্যূঢ়। বহু + আশী = বহ্বাশী। সাধু + ঈ = সাধ্বী। যোদ্ধৃ + ঈ = যোদ্ধ্রী। কর্তৃ + ঈ = কর্ত্রী।

ব্যঞ্জনসন্ধি—ষট্ + অংগ = ষড়ংগ। বাক্ + দত্তা = বাগ্দত্তা। বাক্ + নিষ্পত্তি = বাঙ্নিষ্পত্তি। উৎ + ছিন্ন = উচ্ছিন্ন। উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল। বিদ্যুৎ + লীলা = বিদ্যুল্লীলা। উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস। উৎ + হৃত = উদ্ধৃত। পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন।

বিসর্গসন্ধি—সদ্যঃ + ছিন্ন = সদ্যশ্ছিন্ন। তপঃ + ধন = তপোধন। বয়ঃ + বৃদ্ধ = বয়োবৃদ্ধ। ততঃ + অধিক = ততোঽধিক। স্বঃ + গত = স্বর্গত। প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ। মাতঃ + গংগে = মাতর্গংগে। দুঃ + অদৃষ্ট = দুরদৃষ্ট। জ্যোতিঃ + ময় = জ্যোতির্ময়। নিঃ + বন্ধ্র = নীবন্ধ্র। চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষুরোগ। জ্যোতিঃ + ক = জ্যোতিষ্ক। ধনুঃ + পাণি = ধনুষ্পাণি। অতঃ + এব = অতএব।

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি—কুল + অটা = কুলটা। বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ। শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন। স্ব + ঈর = স্বৈর। মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড। অন্য + অন্য = অন্যান্য, অন্যোন্য। সার + অংগ = সারংগ। প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়। গো + অক্ষ = গবাক্ষ। অক্ষ + ঊহিণী = অক্ষৌহিণী। শীত + ঋত = শীতার্ত। আঃ + পদ = আস্পদ। পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি। বনঃ + পতি = বনস্পতি। বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি। এক + দশ = একাদশ। ষট্ + দশ = ষোড়শ। দিব্ + লোক = দ্যুলোক। আ + চর্য = আশ্চর্য। সীমন্ + অন্ত = সীমান্ত। মনস্ + ঈষা = মনীষা। হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র। গো + পদ = গোষ্পদ। তৎ + কর = তস্কর। [সন্ধির নিয়মানুযায়ী যে পদ সিদ্ধ হয় না, তাহাকে বলা হয় **নিপাতনে সিদ্ধ** পদ।]

খাঁটি বাংলা সন্ধি—তেমন + ই = তেমনি। যেমন + ই = যেমনি। এত + দিন = এদ্দিন। পাঁচ + জন = পাঁজ্‌জন। পাঁচ + সের = পাঁশ্‌সের। নাত্ + জামাই = নাদ্-জামাই। সাত + গুণ = সাদ্‌গুণ। জাহাজ + উপরি = জাহাজোপরি। কোথা + যাবে = কোজ্জাবে। বড + ঠাকুর = বড়্‌ঠাকুর > বট্‌ঠাকুর। ঘোড়া + গাড়ী = ঘোড়্-গাড়ী। পাট + কাঠি = পাঁকাঠি। আমি + তা = আম্‌তা। দূর + তোর = দুত্তোর। হাত + ধরা = হাদ্‌ধরা। প্রকৃতপক্ষে এই উদাহরণগুলি বাংলা যৌথিক সন্ধির উদাহরণ।

সমাসনিষ্পন্ন শব্দ

শব্দগঠনের ব্যাপারে সমাস একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই সমাস সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে। তবে একটি বিষয় এখানে আলোচনা করিব। এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা সমাসের কখনও-বা পূর্বপদ, কখনও-বা পরপদরূপে প্রচলিত। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, একই পূর্বপদের সহিত বিভিন্নার্থক পরপদ যুক্ত হইলে বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দ গঠিত হয়; আবার একই পরপদের সহিত বিভিন্নার্থক পূর্বপদ যুক্ত হইলেও বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দের সৃষ্টি হয়।

একই পূর্বপদের সহিত বিভিন্ন অর্থবোধক পরপদের যোগ

লোক—লোকপাল, লোকসাহিত্য, লোকশিক্ষা, লোকসংখ্যা, লোকনিন্দা। **লীলা**—লীলাক্ষেত্র, লীলাবসান, লীলাস্থলী, লীলাচঞ্চল, লীলাখেলা। **পতি**—পতিসেবা, পতিভক্তি, পতিপদ, পতিধর্ম, পতিপ্রেম। **পথ**—পথকর, পথখরচ, পথনির্দেশ, পথচারী, পথরোধ। **ফল**—ফলকর, ফলশ্রুতি, ফলাহার, ফলভোগ, ফলহানি। **অগ্নি**—অগ্নিপরীক্ষা, অগ্নিবৃষ্টি, অগ্নিবাণ, অগ্নিমূল্য, অগ্নিযুগ। **ধন**—ধনস্থান, ধনপিশাচ, ধনকুবের, ধনধান্য, ধনদৌলত। **যোগ**—যোগাসন, যোগাযোগ, যোগবল, যোগমায়া, যোগস্থান। **রাম**—রামছাগল, রামপাখী, রামরাজ্য, রামলীলা, রামদা। **দান**—দানপত্র, দানাধিকার, দানসাগর, দানবীর, দানসজ্জা। **ক্ষয়**—ক্ষয়ক্ষতি, ক্ষয়ব্যাধি, ক্ষয়শীল, ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষয়কাশ। **আশ্রম**—আশ্রমবাসী, আশ্রমবালক, আশ্রমবিধি, আশ্রমবৃক্ষ, আশ্রমধর্ম। **আচার**—আচারনিষ্ঠ, আচারপরায়ণ, আচারব্যবহার, আচাবভক্ষণ, আচারপালন। **অন্তর**—অন্তরাত্মা, অন্তরাপত্যা, অন্তর্দর্শন, অন্তর্বেদনা, অন্তর্যামী। **ভ্রষ্ট**—ভ্রষ্টাচার, ভ্রষ্টচরিত্র, ভ্রষ্টাচরণ, ভ্রষ্টগুণ, ভ্রষ্টস্বভাব। **শক্তি**—শক্তিশেল, শক্তিশালী, শক্তিহীন, শক্তিলাভ, শক্তিমত্তা।

একই পরপদের সহিত বিভিন্ন অর্থবোধক পূর্বপদের যোগ

লোক—দেবলোক, দ্যুলোক, ভূলোক, বিষ্ণুলোক, গন্ধর্বলোক। **লীলা**—নরলীলা, জীবলীলা, ভবলীলা, দেবলীলা, কৃষ্ণলীলা। **পতি**—নরপতি, দলপতি, কমলাপতি, ভূপতি, কুলপতি। **পথ**—রাজপথ, সৎপথ, নয়নপথ, শ্রবণপথ, হাঁটাপথ। **ফল**—কর্মফল, ভাগফল, গুণফল, পরীক্ষাফল, কোষ্ঠীফল। **অগ্নি**—জঠরাগ্নি, মুখাগ্নি, মন্দাগ্নি, যজ্ঞাগ্নি, হোমাগ্নি। **ধন**—স্ত্রীধন, পুত্রধন, গোধন, পিতৃধন, পরধন। **যোগ**—নৌকাযোগ, রাত্রিযোগ, অমৃতযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। **রাম**—বলরাম, পরশু-রাম, বোকারাম, সীতারাম, রাজারাম। **দান**—গোদান, অন্নদান, বস্ত্রদান, কন্যাদান, ভিক্ষাদান। **ক্ষয়**—লোকক্ষয়, অর্থক্ষয়, আয়ুক্ষয়, রক্তক্ষয়, পুণ্যক্ষয়। **আশ্রম**—আতুরাশ্রম, অনাথাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, উন্মাদাশ্রম। **আচার**—বীরাচার, স্ত্রী-

আচার, লোকাচার, ম্লেচ্ছাচার, দেশাচার। **অন্তর**—দেশান্তর, দ্বীপান্তর, বারান্তর, উপায়ান্তর, গ্রামান্তর। **আলয়**—বিদ্যালয়, রংগালয়, যমালয়, লোকালয়, পিত্রালয়। **ভ্রষ্ট**—যূথভ্রষ্ট, চরিত্রভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট, কক্ষভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট। **পরায়ণ**—ধর্মপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ, দুর্নীতিপরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ, যজ্ঞপরায়ণ। **শক্তি**—গণশক্তি, আদ্যাশক্তি, নৌশক্তি, সংঘশক্তি, বাক্‌শক্তি।

প্রয়োগ

পুত্রহারা জননীর শোক দেখিয়া আমার **অন্তরাত্মা** কাঁদিয়া উঠিল। **অন্তরা-পত্যা** রমণীকে অতি সাবধানে থাকিতে হয়। যোগী পুরুষের **অন্তর্দর্শনের** ক্ষমতা থাকে। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া আমি গভীর **অন্তর্বেদনায়** মুষড়াইয়া পড়িলাম। **অন্তর্যামী** ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া কর্মপথে অগ্রসর হইতে হয়। **দেশান্তরে** গমন করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন। বিচারে হত্যাকারীর **দ্বীপান্তর** দণ্ড হইল। **বারান্তরে** তোমার সহিত সকল বিষয়ই আলোচনা করিব। **উপায়ান্তর** না দেখিয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। **গ্রামান্তরেও** এই জনরব বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া পড়িল।

উপসর্গ-যোগে গঠিত শব্দ

সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী উপসর্গাদি ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসিয়া তাহার অর্থের বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে।

বাংলা উপসর্গ—(১) আ-, অনা-, অ-—('না'অর্থে অথবা 'কুৎসিত'অর্থে)—আকথা, আলুনি; অনামুখো, অনাবাটা, অনাছিষ্টি; অখুনী, অহিসাবী, অকাজ, অঝর, অকুমারী, অমন্দ, অথৈ। (২) আ-, অ-—('প্রকৃষ্ট' অর্থে, স্বার্থে, সাদৃশ্যার্থে)—আরংগা বা অবংগা, আঁকাড়া, আকাঠ, আচোট, আগাছা, আথাল্বা। (৩) অগা-, অঘা-—('অজ্ঞ' অর্থে)—অগারাম; অঘাচণ্ডী। (৪) অন্তর-—('গোপন' অর্থে)—অন্তর-টিপুনী। (৫) অজ-—('খুব' অর্থে)—অজ-পাড়াগাঁয়ে। (৬) অব-—('খারাপ' অর্থে)—অবগুণ। (৭) আন্-—('অন্য' অর্থে)—আন্‌কোরা, আন্‌মনা, আন্‌কো। (৮) আগ-—('অগ্র' অর্থে)—আগডাল, আগবাড়া (ভাত)। (৯) আড়-—('বক্র, অর্ধ' অর্থে)—আড়মোড়া, আড়নয়ন, আড়ময়লা, আড়বুঝো, আড়খেমটা, আড়ক্ষেপা। (১০) উন-—('কম' অর্থে)—উনপাঁজুরে, উনবুকে, উনবর্ষা। (১১) উভ-—('উচ্চ, চতুর্দিকে' অর্থে)—উভরায়। (১২) কু-—('নিন্দনীয়' অর্থে)—কুচাল, কুকেচ্ছা, কুচুটে ('কুচক্রী' অর্থে)। (১৩) নি-, নির-, নিশ-—('না' অর্থে)—নিখোঁজ, নির্ভরসা, নিবাম, নিশ্ছিপি। (১৪) পাতি-—('ক্ষুদ্র' অর্থে)—পাতি-কুয়া>পাতকো, পাতিহাঁস, পাতিভাঁড়, পাতিলেবু। (১৫) বি-, বে-—('না' অর্থে

বা নিন্দার্থে)—বিভুঁই, বিজোড়, বিকল, বেঢপ, বেজন্মা, বে-আরাম, বে-টাইম, বে-হেড্। (১৬) ভর-, ভরা-—('পূর্ণ' অর্থে)—ভরপেট, ভরযুবতী, ভরাবাদর, ভরাদুপুর, ভরা-যৌবন। (১৭) স-—('সহিত' অর্থে)—সজোরে, সঠিক, সঘনে, স-বুট (পদাঘাত)। (১৮) সা-—('ভাল' অর্থে)—সা-জিরে, সা-মরিচ, সা-জোয়ান। (১৯) সু-—('প্রশস্ত' বা 'প্রশংসার যোগ্য' এই অর্থে)—সুছাঁদ, সুডৌল, সুগোছ, সুগড়, সুনজর। (২০) রাম-—('বড' অর্থে)—রাম-দা, রাম-শিঙে, রাম-শালিক। (২১) হা-—(হতার্থে বা বিগতার্থে)—হাপুত্ত, হাঘ'রে, হাবাতে, হা-পিত্যেশ, হাপুতি।

সংস্কৃত উপসর্গ—(১) অতি- (অতিক্রমণ, অতিরিক্ত); (২) অধি- (উপরে, মধ্যে); (৩) অনু- (পরে, কোনও কিছুর দিকে); (৪) অন্তর-, অন্তঃ- (মধ্যে, ভিতরে); (৫) অপ- (দূরে, মধ্য হইতে); (৬) অপি- (ভিতরে, উপরে, সন্নিকটে); (৭) অভি- (প্রতি, উপর, দিকে, চতুর্দিকে); (৮) অব- (নিম্নে, নিম্নদিকে); (৯) আ- (প্রতি, উপরে, ঈষৎ, সম্যক্); (১০) উদ্- (উপরে, উপরের দিকে, বাহিরে); (১১) উপ- (দিকে, প্রতি, সন্নিকট); (১২) দুঃ- (মন্দ, কু); (১৩) নি- (নিম্নে, ভিতরে, মধ্যে, পূর্ণরূপে); (১৪) নিঃ- (বহির্গত, নাই), (১৫) পরা- (দূরে, বাহিরে); (১৬) পরি- (চতুর্দিকে, ব্যাপকভাবে); (১৭) প্র- (সম্মুখে, পুরত, শ্রেষ্ঠ); (১৮) প্রতি- (বিপরীতভাবে, বিরুদ্ধে, প্রত্যুত্তরে); (১৯) বি- (বিদূরে, বিশ্লিষ্ট, বাহিরে); (২০) সং- (সহিত, একত্র); (২১) সু- (মংগল, ভদ্র, উৎকর্ষ, উৎকৃষ্ট)। এই মোট একুশটি সংস্কৃত উপসর্গের অর্থও বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

নী (পথ দেখানো)—প্রণয়, পরিণয়, বিনয়, অভিনয়, অনুনয়।

হৃ (হরণ করা)—আহার, প্রহার, সংহার, পরিহার, উপহার, উদ্ধার, ব্যবহার।

গম্ (যাওয়া)—আগমন, অনুগমন, নির্গমন, প্রত্যাগমন, সংগম।

কৃ (করা)—অধিকার, অপকার, আকার, উপকার প্রকার, বিকার।

ক্রম্ (পদক্ষেপ করা)—অতিক্রম, উপক্রম, নিক্রম, পরাক্রম, পরিক্রম, বিক্রম, ব্যতিক্রম।

বদ্ (বলা)—অনুবাদ, অপবাদ, প্রবাদ, বিবাদ, সংবাদ, সুবাদ।

যুজ্ (যোগ করা)—প্রয়োগ, নিযোগ, বিয়োগ, অনুযোগ, অভিযোগ, সংযোগ।

দৃশ্ (দেখা)—অন্তর্দর্শন, নিদর্শন, পরিদর্শন, প্রদর্শন, সুদর্শন, সন্দর্শন।

বিদেশী উপসর্গ—(১) আম-—('সাধারণ' অর্থে)—আমদরবার, আমরাস্তা। (২) কার-—('কৌশল' অর্থে)—কারদানি, কারচুপি, কারসাজি, কারবার। (৩) খাস-—

('নিজস্ব' অর্থে)—খাসমহল, খাসকামরা। (৪) গর—('না' অর্থে)—গরমিল, গরহিসাবী, গররাজী, গরহাজির। (৫) গুম—('গোপন' অর্থে)—গুমখুন, গুমসানি (=রুদ্ধ গরম), গুমান (=গোপনে অহংকার)। (৬) দর—('নিম্নস্থ, অল্প, ঈষৎ' অর্থে—দরদালান, দরপত্তনি, দরকচা (কাঁচা), দরপাকা, দরপোক্ত। (৭) না—(নঞর্থে)—না-হক, না-টক, না-মিষ্টি, নাচার, নাবালক, নাখেরাজ =নিষ্কর), নাখোস (=অসন্তুষ্ট)। (৮) নিম্—("অর্ধ" অর্থে)—নিমরাজী, নিমখুন, নিম্-হাকিম, নিম্-আস্তীন, নিম্-মোল্লা। (৯) পিল—('হাতী' অর্থে)—পিলখানা, পিলসুজ, পিলপা। (১০) ফি—(প্রত্যেক)—ফি-লোক, ফি-দিন। (১১) বদ্—(নিন্দায়)—বদ্‌রাগী, বদ্‌হাল, বদ্‌মাইস, বদ্‌লোক, বদ্‌রীত্, বদ্‌গন্ধ। (১২) বর—বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরবাদ। (১৩) ব—('সহিত' অর্থে)—বমাল, বনাম, বহাল, বকলম। (১৪) হর—(প্রত্যেক, সর্ব)—হর-বোলা, হর-সাল, হর-রোজ, হর-ঘড়ি। (১৫) হেড্—(=Head)—হেড্-পণ্ডিত, হেড্-মুহুরী, হেড্-মৌলবী। (১৬) হাফ্—(=Half)—হাফ্-আখড়াই, হাফ্-গেরস্ত ইত্যাদি। (১৭) ফুল্—(=Full)—ফুল্-বাবু, ফুল্-সার্ট। (১৮) সব্—(=Sub)—সব্-ডেপুটি, সব্-জজ।

প্রয়োগ

আলুনি তরকারি সে হাত দিয়েও স্পর্শ করল না। **নিশ্ছিপি** বোতলের ওষুধটা নষ্ট হয়ে গেছে। একদা এই বাংলা দেশে নীলকর সাহেবেরা **স-বুট** পদাঘাতে গর্ভবতী রমণীর প্রাণনাশ করেছিল। গোপার দু'খানি হাত কেমন **সুডৌল**! **হাবাতের** বেটার মুখে আবার পোলাও-কালিয়ার গল্প! **প্রকৃত বন্ধুপ্রণয়** এই পৃথিবীতে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তরুণ-তরুণীর **প্রণয়** সময়ে **পরিণয়ে** রূপান্তরিত হয়। বিদ্যাই মানুষকে বিনয়-গুণে সম্পৃক্ত করিয়া থাকে। আধুনিক বাংলা রংগমঞ্চের **অভিনয়ে** শিশিরকুমারই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। মাথার দিব্যি দিয়া, **অনুনয় করিয়া**, কখনও ভালবাসা পাওয়া যায় না। মনের সংগে **গরমিল** হলেই **বদ্‌লোকে না-হক** (অর্থাৎ শুধু শুধু) গালমন্দ পেড়ে থাকে। পরীক্ষা দিবার সময়ে কোন কোন ছাত্র **হর-ঘড়ি** মলমূত্রত্যাগের জন্যে বাইরে গিয়ে থাকে। **ফি-দিন হেড্-পণ্ডিত মশায়** আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় বেড়াতে আসেন।

অনুশীলনী

[এক] নিম্নোক্তটির উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দাও :—তদ্ধিত প্রত্যয়।

চা. বি. মাধ্যমিক '৫৭

[দুই] চৈনিক, সার্বজনীন, শ্রীমন্ত, বিবিয়ানা, এমনতর, চালবাজী, নকলনবিশ, রোমশ—ইহাদের মধ্য হইতে যে কোনও পাঁচটি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৬

[তিন] নিম্নের যে কোনও পাঁচটি শব্দ কি করিয়া গঠিত হইল তাহা বল :—ফেনিল, মহত্ব, বাড়ন্ত, বোরুদ্যমান, বর্তমান, সর্বথা, পাশ্চাত্ত্য ও বৈমাত্রেয়।

ক. বি মাধ্যমিক (কলা) '৫৬

[চার] কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য কি ? তিনটি কৃৎপ্রত্যয়ের নাম কব ও কৃদন্ত শব্দ প্রয়োগ কবিয়া বাক্য বচনা কর। ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৬

[পাঁচ] প্রত্যয় ও উপসর্গেব প্রভেদ উদাহবণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

রা. বি মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫

[ছয়] খাঁটি বাংলা শব্দে বিদেশী প্রত্যযযোগেব পাঁচটি উদাহবণ দিয়া তাহাবা কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা বল। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৩

[সাত] নিম্নলিখিত শব্দগুলিব যে কোনও পাঁচটিব প্রকৃতি, প্রত্যয় এবং প্রত্যয়েব অর্থ লিখ : দাশবথি, বিশ্বজনীন, অকর্মণ্য, সৈন্ধব, শ্রমিক, মহিমা, নৌকা, পাতলা, কুঠরী, সোনালি, হল্‌দে, বড়াই, বেশমী, চিমৃটি, গরু, ঘুমন্ত, উঠ্‌তি, বাঁধুনী, ডুবুরী, পোড়ো। ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৩, '৫৭

[আট] 'বিত্ত' শব্দের যোগে গঠিত, বাংলা ভাষায় সচরাচর প্রচলিত একটি শব্দের উল্লেখ ও অর্থ নির্দেশ কব। (উত্তব। 'মধ্যবিত্ত' শব্দ এবং ইহার অর্থ 'ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবর্তী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ'।) ক. বি. মাধ্যমিক '৫৩

[নয়] নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলিব যে-কোন একটিকে পবপদ তথা দ্বিতীয় উপাদান হিসাবে গ্রহণ কবিয়া পাঁচটি যৌগিক শব্দ গঠন কব এবং উহাদের প্রত্যেকটিকে লইয়া বাক্য বচনা কব :—অন্তব, আলয়, পবায়ণ, ভ্রষ্ট, লোক। ক বি. মাধ্যমিক '৪৮

[দশ] -দার,-ওয়ালা,-কর এবং-ঈ প্রত্যযান্ত ব্যক্তিবাচক বা শ্রেণীবাচক শব্দাদিব দৃষ্টান্তবাহী বাক্য বচনা কব। ক. বি. মাধ্যমিক '৩৭

[এগার] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে পাঁচটির সংগে সমার্থক শব্দ যোজনা করিয়া উহাদেব সম্পূর্ণ দ্বৈতরূপটি উদ্ধার কব ও এই যুগ্ম শব্দসমূহের প্রয়োগ বুঝাইবার জন্য পাঁচটি বাক্য বচনা কর :—দর—; বন—; কুটুম্ব—; লোক—; সৈন্য—; আদর—; লোহা—; বিবাদ—; রাত—, ছল—। (উত্তর-সংকেত। দরদস্তর; বনজংগল; কুটুম্বস্বজন; লোকজন, সৈন্যসামন্ত; আদরযত্ন; লোহা-লক্কড়; বিবাদ-বিসংবাদ; রাতাব্রাতি; ছলচাতুরী—এই শব্দাদি অবলম্বনে বাক্যাবলী রচনা করিতে হইবে।) ক. বি. বি. এ. '৫৪

[বারো] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্য হইতে ছয়টি শব্দ নির্বাচন করিয়া উহাদের দ্বারা তিনটি সমস্ত পদ রচনা কর :—পদ্ম, মাতা, পুষ্প, সমাজ, পতি, জায়া, গন্ধ, নদী, ধনুঃ, বিদ্বান্। (উত্তর। পদ্মগন্ধা ; নদীমাতৃক ; পুষ্পধন্বা ; দম্পতি ; বিদ্বৎসমাজ।)
ক. বি. বি. এ. '৫১

[তেরো] নিম্নলিখিত ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা ও বিধিগুলির যে কোন তিনটির দৃষ্টান্তসহিত বিশদ পরিচয় দাও :—নিপাতনে সন্ধি, সর্বনাম হইতে গঠিত তদ্ধিত পদ, সমীকরণ। ক. বি. বি. এ. '৫০

[চোদ্দ] উপসর্গ-প্রয়োগে অর্থান্তর-সংঘটনের উদাহরণ দাও। ক. বি. বি. এ. '৪৮

[পনেরো] প্র-, পরি-, বি- এবং অভি- এই চারিটি উপসর্গের যোগে নী ধাতুর অর্থপরিবর্তন দর্শাও। ক. বি. বি. এ. '৪৪

[ষোলো] তদ্ধিত ও কৃদন্তের অথবা সন্ধি ও সমাসের উদাহরণসহ পার্থক্য দেখাও। ক. বি. বি. এ. '৫৬

[সতেরো] খাঁটি বাংলা সন্ধির উদাহরণবাহী পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

[আঠারো] নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলির যে কোন একটিকে একবার পূর্বপদ এবং আরেক বার পরপদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া পাঁচ পাঁচটি যৌগিক শব্দ গঠন কর। অতঃপর গঠিত দশটি শব্দ লইয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা কর :—অগ্নি, ধন, রাম, পথ, ফল, দান, আচার, লীলা।

[উনিশ] খাঁটি বাংলা শব্দগঠনে ও বাক্যরচনায় নিম্নোদ্ধৃত উপসর্গগুলির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য দর্শাও :—অনা-, দর-, নিশ-, পাতি-, ভরা-, হা-, গর-, না-, ফি-, হেড্-, হাফ্-, ফুল্-, সব-, আম্-, সা-, নিম্-, রাম্-, অগা-, অজ-, উন-, আড-, কার-, পিল্-, গুম্-।

[কুড়ি] খাঁটি বাংলা শব্দে বাংলা উপসর্গ ও বিদেশী উপসর্গ যোগের পাঁচটি উদাহরণ দিয়া তাহারা কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা বল।

[একুশ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :—দেওন ; মাগ্না ; জাস্তা ; ঝালাই ; ঘরভাঙানী ; ধুকুরী ; বকুনি, বাজিয়ে ; গুনতি, বঞ্চক ; সবিতা ; ক্ষেমংকর ; বিরাগ ; মোহ ; স্তজন ; চয়ন ; নিমগ্ন ; নিরাকৃত ; লালায়িত ; স্মর্তব্য ; গেয় ; খ্যাতি ; অপরাধী ; বিবেকী ; ম্রিয়মাণ, দণ্ডায়মান ; ঘূর্ণমান ; ঘূর্ণ্যমান ; দেদীপ্যমান ; পিপাসু ; গাড়োয়ান ; খাটিয়াল ; পয়মন্ত ; হাঁড়িপানা ; কাতরানি ; গোঁয়ারতমি ; সাদাটে ; লাগসই ; নাটুকে ; আতরদান ; খাজাঞ্চি ; ধড়িবাজ ; মামাতো ; পিলখানা ; সাফাই ; কাঁঠি ; করাতী ; সেতারী ; শালকর ; কমলা ; স্বস্রীয় ; বাৎস্যায়ন ; গাণপত্য ; গ্রামীণ ; সত্তা ; তাম্বূলিক ; পংকিল, একীভূত ; মৃতকল্প ; হিরণ্ময় ; পুষ্পিত।

চতুর্থ অধ্যায়

শব্দগঠন ও পদপরিবর্তন

প্রথম পর্যায়

বিশেষ্য বিশেষণ

উপলব্ধি—উপলব্ধ, উপলভ্য
আঘাত—আহত, আঘাতী
বিদ্যা—বিদ্বান্
পরিচয়—পরিচিত, পরিচায়ক
বায়ু—বায়বীয়, বায়ব্য
আরোহণ—আরূঢ়, আরোহী
সাহিত্য—সাহিত্যিক
বিদ্যুৎ—বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুত, বিদ্যুত্বান্
গান—গীত, গেয়, গায়ক, গায়েন
পিতৃ-পিতামহ—পৈতৃক
কৌতূহল—কৌতূহলী
অধ্যয়ন—অধীত, অধ্যেয়, অধ্যেতব্য
প্রার্থনা—প্রার্থিত, প্রার্থী, প্রার্থনীয়
স্পর্শ—স্পৃষ্ট
পান—পানীয়, পীত, পেয়
কামনা—কাম্য, কামনীয়
স্ত্রী—স্ত্রৈণ
পুর—পৌর
পর—পরকীয়
হেম—হৈম
গিরি—গৈরিক
অধিবাস—অধিবাসী
অণু—আণব, আণবিক
ধর্ম—ধর্ম্য

বিশেষ্য বিশেষণ

অভিধা—অভিহিত
অভিধান—আভিধানিক
জন্তু—জান্তব
প্রমাণ—প্রামাণ্য, প্রামাণিক
খেদ—খিন্ন
বিপ্লব—বিপ্লুত, বৈপ্লবিক
ইয়ত্তা—ইয়ৎ
অবসান—অবসিত
ভংগ—ভগ্ন
শরৎ—শারদ, শারদীয়
শ্রম—শ্রান্ত, শ্রমিক
যশ—যশস্বী
বাক্—বাগ্মী, বাচাল
পুরুষ—পৌরুষেয়
মৃৎ—মৃন্ময়
সংখ্যা—সাংখ্য
বস্তু—বাস্তব, বাস্তবিক
সূর্য—সৌর
ধ্যান—ধ্যানী, ধ্যেয়
আসন—আসীন
ফেন—ফেনিল
মুখ—মৌখিক, মুখ্য, মুখর
বিধান—বিহিত, বিধেয়
বপন—উপ্ত
পংক্তি—পাংক্তেয়
পাঠ—পাঠ্য, পঠিত

বিশেষ্য বিশেষণ

অরণ্য—আরণ্য
গো—গব্য
স্বাস্থ্য—স্বস্থ
আদি—আদ্য, আদিম
মোহ—মুগ্ধ, মূঢ়
অগ্নি—আগ্নেয়
উপনিবেশ—ঔপনিবেশিক
প্রতীচী—প্রতীচ্য
প্রাচী—প্রাচ্য
স্মৃতি—স্মার্ত
ফল—ফলিত
বর্ষ—বার্ষিক
উপদ্রব—উপদ্রুত
মদ—মত্ত
লয়—লীন
লোম—লোমশ
প্রত্যয়—প্রতীত
ভূমি—ভৌম
পুষ্প—পুষ্পিত
পংক—পংকিল
মনঃ—মানসিক
নিশা—নৈশ
চক্ষু—চাক্ষুষ
ন্যায়—নৈয়ায়িক
মাংস—মাংসল
পাণ্ডু—পাণ্ডুর

বিশেষ্য বিশেষণ	বিশেষ্য বিশেষণ	বিশেষ্য বিশেষণ
ভেদ—ভিন্ন	জাতি—জাতীয়	শিক্ষা—শিক্ষিত
সর্বাংগ—সর্বাংগীণ	ঋষি—আর্ষ	শোক—শোচ্য, শোচনীয়
অন্ত—অন্তিম, অন্ত্য	গ্রাম—গ্রাম্য, গ্রামীণ	দর্শন—দৃষ্ট, দার্শনিক
অগ্র—অগ্র্য, অগ্রিম	বন্ধু—বান্ধব	চন্দ্র—চান্দ্র
কণ্ঠ—কণ্ঠ্য	প্রশ্ন—পৃষ্ট, প্রষ্টব্য	আয়ু—আয়ুষ্য
কর্ম—কর্মঠ	হৃদয়—হৃদ্য	সিন্ধু—সৈন্ধব
বীর্য—বীর	মধু—মধুর	ব্যাস—বৈয়াসিক
গ্রহণ—গ্রাহ্য	অনুবাদ—অনূদিত	গ্রন্থ—গ্রথিত, গ্রন্থিত

চলিত ভাষায় কয়েকটি উদাহরণ

শান্তিপুর—শান্তিপুরী	সোনা—সোনালি (লী)	ধার—ধারাল
ঘর—ঘরোয়া	রং—রংদার	মাটি—মেটে
পাটনা—পাটনাই	পুষ্টি—পোষ্টাই	গাঁ—গেঁয়ো
মোগল—মোগলাই	ঢাকা—ঢাকাই	বন—বুনো
মেয়ে—মেয়েলি	গাছ—গেছো	কাঠ—কেঠো
ঝড—ঝডো	দাঁত—দাঁতাল, দেঁতো	খেয়াল—খেয়ালী
ভূত—ভূতুড়ে	ধান—ধেনো	জল—জ'লো
হিংসা—হিংসুটে	মেঘ—মেঘলা	বেগুন—বেগুনী (নি)

প্রয়োগ

যশস্বী ব্যক্তিই লোকসমাজে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। **বাগ্মী** সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি আজও এই ভারতে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। **বাচালের** কথায় কেহ বিশ্বাস করে না। কাহারও কাহারও মতে, বৈদিক সূক্তাদি **পৌরুষেয়** রচনা নহে। কপিল মুনি **সাংখ্যদর্শনের** প্রণেতা। **সৌর** জগতের অনেক তত্ত্বই বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখনও সমস্ত **বায়বীয়** পদার্থের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় নাই। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলায় **বায়ব্য** স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর। পদ্মাসনে **আসীন** যোগীর ধ্যানরত সৌম্য মূর্তি দেখিলে সারা অন্তর আপনা হইতেই শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসে। হিমালয়ের গোমুখী-গহ্বর হইতে বাহির হইয়া গংগা যখন সমতলভূমির উপর দিয়া বহিয়া চলে, তখন তাহার তরংগমালা স্বভাবতই **ফেনিল** হইয়া থাকে। **মৌখিক** শিষ্টাচারে সাময়িক ফল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু **মুখ্য** ফল পাওয়া যাইতে পারে না। বিহগ-কাকলীতে তখন কাননভূমি **মুখর** হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির **বেদ-বিহিত** রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মনুষ্যসমাজে বাস করিতে হইলে পরোপকার সর্বতোভাবে **বিধেয়**।

দ্বিতীয় পর্যায়

বিশেষণ বিশেষ্য	বিশেষণ বিশেষ্য	বিশেষণ বিশেষ্য
প্রপীড়িত—প্রপীড়ন	প্রবীণ—প্রবীণতা, প্রাবীণ্য	অবহিত—অবধান
আহৃত—আহরণ	প্রতিকূল—প্রতিকূলতা, প্রাতিকূল্য	সুরভি—সৌরভ
অনাদৃত—অনাদর		সৎ—সত্তা, সত্ত্ব
সুগন্ধ—সৌগন্ধ্য	গুরু—গুরুত্ব, গৌরব, গরিমা	দীর্ঘ—দৈর্ঘ্য, দ্রাঘিমা
দক্ষ—দক্ষতা, দাক্ষ্য	চতুর—চাতুরী	মন্দ—মান্দ্য
পরাক্রান্ত—পরাক্রম	বুদ্ধিমান—বুদ্ধিমত্তা	অরুণ—অরুণিমা
বিপ্রলব্ধ—বিপ্রলম্ভ	নিকট—নৈকট্য	মধুর—মাধুর্য, মাধুরী, মধুরতা, মধুরিমা, মধুরত্ব
অনভ্যস্ত—অনভ্যাস	অবসন্ন—অবসাদ	
প্রণীত—প্রণয়ন, প্রণেতা	ব্যাহত—ব্যাঘাত	রক্ত—রাগ, রক্তিমা
নিষ্কর্মা—নৈষ্কর্ম্য, নিষ্কর্মতা, নিষ্কর্মত্ব	ইষ্ট, ঐচ্ছিক—ইচ্ছা	চেতন—চৈতন্য
সহায়—সাহায্য, সহায়তা	বৈধ—বিধি	মহৎ—মহিমা, মহত্ত্ব
উচিত—ঔচিত্য	তামসিক—তমঃ	দুরাত্মা—দৌরাত্ম্য
প্রসন্ন—প্রসাদ	শুষ্ক—শোষ	বিদগ্ধ—বৈদগ্ধ্য
সংক্ষুব্ধ—সংক্ষোভ	সৌম্য—সোম	জড়—জাড্য, জড়িমা
শিথিল—শৈথিল্য, শিথিলতা	ঋজু—ঋজুতা, আর্জব	বিষম—বৈষম্য
প্রিয়—প্রীতি, প্রেম	শুদ্ধ—শোধ	কৃশ—কার্শ্য
অতীত—অত্যয়	বহু—ভূমা	হ্রস্ব—হ্রাস
উজ্জ্বল—ঔজ্জ্বল্য	সম্পন্ন—সম্পদ	দৃঢ়—দৃঢ়তা, দার্ঢ্য
অভিজাত—আভিজাত্য	কুশল—কৌশল	সুকুমার—সৌকুমার্য
নীল—নীলিমা	শীত—শৈত্য	লঘু—লঘিমা
নিপুণ—নিপুণতা, নৈপুণ্য	সুন্দর—সৌন্দর্য	আভ্যন্তরীণ—অভ্যন্তর
মলিন—মালিন্য, মলিনতা	মৃদু—মৃদুতা	মূর্খ—মূর্খতা

চলিত বাংলায় কয়েকটি উদাহরণ

ইতর—ইতরামি	গিন্নী—গিন্নীপনা	মেজাজী—মেজাজ
ধূর্ত—ধূর্তামি, ধূর্তপনা	পাকা—পাকামি	বাবু—বাবুয়ানা, বাবুগিরি
কুঁড়ে—কুঁড়েমি	নকল—নকলবীশ	চতুর—চতুরালি
বড়—বড়াই	দীর্ঘ—দীঘল	বুড়ো—বুড়োমি

প্রয়োগ

ঔচিত্য বিচার না করিয়া কার্য করিলে পরিণামে কষ্ট পাইতে হয়। বিধির **বিধানে** পাপীকে পরিণামে দুঃখক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ভগবদ্‌-**প্রসাদে** তিনি কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন। বিরহী জনের হৃদয়ের **সংক্ষোভ** কয়জনেই-বা বুঝিতে

পারে! কর্মময় জীবনে **অবসাদকে** এড়াইয়া যাইতে হইবে। নব নব **ব্যাঘাতকে** জয় করিবার সাহস ও ধৈর্য আজ সঞ্চয় করিতে হইবে। **ইচ্ছাই** মানুষের কর্মশক্তিকে জাগাইয়া রাখে। উনবিংশ শতাব্দীর নব্য বংগ-সম্প্রদায় সামাজিক **বিধি** লংঘন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। ছাত্রজীবনে **বাবুগিরি** আদৌ শোভনীয় নহে। বাংলা রামায়ণ-**প্রণেতাদের** মধ্যে কৃত্তিবাসই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছেন। অক্লান্তলেখক রবীন্দ্রনাথ প্রচুর বাংলা গ্রন্থ **প্রণয়ন** করিয়াছেন। কর্মত্যাগে **নৈষ্কর্ম্য** অর্জিত হয় না, অর্জিত হয় **নিষ্কর্মত্ব**। গীতা বলেন, **নিষ্কর্মতা** পরিত্যাজ্য আর **নৈষ্কর্ম্য** একান্তভাবে কাম্য। বৈষ্ণব-কবি বিদ্যাপতি শব্দের **মধুরতার** সহিত মনের **মাধুরী** মিশাইয়া যে **মাধুর্যরস** পরিবেশন করিয়াছেন, তাহার **মধুরিমা** আস্বাদ করিবার ক্ষমতা কয়জনেরই-বা আছে?

তৃতীয় পর্যায়

অব্যয় বিশেষ্য

তথা—তথ্য
সহসা—সাহস
পৃথক—পার্থক্য
কেবল—কৈবল্য
যুগপৎ—যৌগপদ্য
সুষ্ঠু—সৌষ্ঠব

অব্যয় বিশেষণ

অকস্মাৎ—আকস্মিক
পুনঃপুনঃ—পৌনঃপুনিক
অধুনা—আধুনিক
বহিঃ—বাহ্য
সায়ং—সায়ন্তন
ইদানীম্—ইদানীন্তন
পশ্চাৎ—পাশ্চাত্ত্য

সর্বনাম বিশেষ্য

মৎ—মদীয়
তৎ—তদীয়
ভবৎ—ভবদীয়
যৎ—যাদৃশ
অদস্—অমুক
স্ব—স্বীয়, স্বকীয়

সর্বনাম অব্যয়

স্ব—স্বতঃ
সর্ব—সর্বথা
অন্য—অন্যত্র
তদ্—তথা, তত্র
কিম্—কদা, কুত্র
ইদম্—ইদানীম্

বিশেষ্য গুণবাচক বিশেষ্য

পুরোহিত—পৌরোহিত্য
ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ্য
ভাস্কর—ভাস্কর্য
স্থপতি—স্থাপত্য
পিতা—পিতৃব্য
সহচর—সাহচর্য
মিত্র—মৈত্রী
সুজন—সৌজন্য
অতিথি—আতিথ্য
সুভ্রাতা—সৌভ্রাত্র
চোর—চৌর্য

প্রয়োগ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে ও সাহিত্যে একটি সমন্বয়মূলক **সৌষ্ঠব** রক্ষা করিয়া চলিতেন। **মদীয়** বাসভবনে উপস্থিত হইয়া আনন্দ বর্ধন করিবেন। গান্ধীজীর **আকস্মিক** নিধনে সমগ্র দেশবাসী শোকে মুহ্যমান হইয়াছিল। যিনি **স্বতঃপ্রবৃত্ত** হইয়া সভাপতিত্ব করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হন, তিনি লোকসমক্ষে উপহাসাস্পদ হইয়া

থাকেন। তাঁহার **সৌজন্যে** ও **আতিথ্যে** আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রাচীন ভারতের **স্থাপত্য**-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন রহিয়াছে।

অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত পদগুলিকে প্রয়োজনানুসারে বিশেষ্য অথবা বিশেষণে পদান্তরিত করিয়া উহাদের প্রত্যেকটিকে অবলম্বন করিয়া এক একটি বাক্য গঠন কর :—অধ্যয়ন, প্রার্থনা, পান, কামনা, উপলব্ধি, আঘাত, সাহিত্য, পরিচয়, বায়ু, শ্রম, আরোহণ, বিদ্যুৎ, গান, কৌতূহল, প্রপীড়িত, আহৃত, সুগন্ধ, অনাদৃত, দক্ষ, বিপ্রলব্ধ, পরাক্রান্ত, অনভ্যস্ত, আসন, ফেন, মুখ, অবসন্ন, ব্যাহত, বিধান, ইষ্ট, বৈধ, উচিত, আরূঢ়, সংখ্যা, বস্তু, সূর্য, বিহিত, প্রসন্ন, সংক্ষুব্ধ, ধ্যান, বায়ু।

ক. বি. মাধ্যমিক '৩১, '৩৩, '৪২, '৪৪

[দুই] নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিকে বিশেষ্যপদে রূপান্তরিত করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা কর :—বাবু, প্রণীত, নিষ্কর্মা, মধুর।

ক. বি. মাধ্যমিক '৩৭

[তিন] নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিকে বিশেষণপদে রূপান্তরিত করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা কর :—যশঃ, বাক্, পুরুষ, মৃৎ ; দাঁত, মাটি, মোগল, গাঁ, বন, ঢাকা। ক বি. মাধ্যমিক '৩৬, (কলা) '৫৭

[চার] অব্যয়কে বিশেষ্যে, সর্বনামকে বিশেষণে, অব্যয়কে বিশেষণে, সর্বনামকে অব্যয়ে, বিশেষ্যকে গুণবাচক বিশেষ্যে পদ-পরিবর্তনমূলক এক একটি পদ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বাক্য রচনা কর।

[পাঁচ] নিম্নলিখিত যে কোনও পাঁচটি শব্দের বিশেষণ হইলে বিশেষ্যের এবং বিশেষ্য হইলে বিশেষণের রূপ লিখ :—মূঢ়, আয়ু, স্নিগ্ধ, সূর্য, তামসিক, বীর্য, অগ্নি, ঝড়, নিকট, লঘিমা, চাতুরী, মধু, যশ, লোম, র‍্যাস, অধিবাস, বপন, বায়ু, সোনা, চন্দ্র, ন্যায়, পিতৃ-পিতামহ, বিদ্যা, গাছ, কাঠ। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫০**

[ছয়] নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ্য থাকিলে বিশেষণে, কিংবা বিশেষণ থাকিলে বিশেষ্যে পরিবর্তিত করিয়া পরিবর্তিত শব্দগুলির দ্বারা বাক্য রচনা কর। (যে কোনো পাঁচটি) :—বস্তু, সুন্দর, গ্রাহ্য, পান, অনুবাদ, গ্রন্থ, আভ্যন্তরীণ, নিপুণ, শিক্ষা, জাতি, গো, মলিন, সহায়, স্পর্শ, ইষ্ট, অধুনা, মৃদু, মূর্খ, ভেদ, চক্ষু। **রা. বি. মাধ্যমিক '৫৬, '৫৭**

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দগঠন—সমাস (Compounds)

পরস্পরের সহিত অর্থসম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হইয়া একটিমাত্র পদে পরিণত হইলে, এই মিলনকে বলা হয় **সমাস**। এহেন সমাস হইতে উদ্ভূত শব্দ বা পদকে বলা হয় **সমস্ত পদ**। যে পদগুলি মিলিত হইয়া সমাস তৈয়ার করে, তাহাদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় **সমস্যমান** পদ। যে বাক্যের সাহায্যে সমস্যমান পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষ করিয়া—অর্থাৎ সোজা কথায় সমাস ভাঙিয়া—দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়, সেই বাক্যকে বলা হয় **সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য**। সমস্ত পদের প্রথম পদটির নাম **পূর্বপদ** ও শেষ পদটির নাম **উত্তরপদ**। যেমন,—'শূলপাণি'—এই সমস্ত পদে 'শূল' ও 'পাণি'—পদ দুইটির প্রত্যেকেই সমস্যমান পদ; 'শূল পাণিতে বা হস্তে যাহার'—এই বাক্যটির পারিভাষিক নাম সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য; 'শূল' পূর্বপদ ও 'পাণি' উত্তরপদ।

প্রসংগত **সন্ধি** ও **সমাসের পার্থক্যটি** স্মরণ রাখা উচিত। দুইটি ধ্বনির দ্রুত উচ্চারণকালে তাহাদের আংশিক বা পূর্ণভাবে মিলন ঘটিলে অথবা একটির লোপ হইলে কিংবা একে অপরের প্রভাবে বদলাইয়া গেলে এই মিলন লোপ বা পরিবর্তনই **সন্ধি** নামে অভিহিত। পক্ষান্তরে, দুই বা ততোধিক সুবন্ত পদের একপদীভাব হইলে **সমাস** হয়। সন্ধিতে কোন পদেরই বিভক্তি লোপ পায় না, কিন্তু সমাসে প্রতিটি পদের বিভক্তি লোপ পায়। সন্ধিতে অনেক পদ অনেক পদই থাকে, কিন্তু সমাসে অনেক পদ মিলিয়া একটিমাত্র পদই হয়। যেমন,—সন্ধির উদাহরণ: গণ+ঈশ=গণেশ। সমাসের উদাহরণ: গাছে পাকা=গাছপাকা (৭মী তৎপুরুষ সমাস)।

সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে সমাস প্রধানত চার প্রকার: যথা,—অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি। এক রকমের তৎপুরুষকে কর্মধারয় এবং এক রকমের কর্মধারয়কে দ্বিগু বলা হয়। তাই কর্মধারয় ও দ্বিগু তৎপুরুষেরই অন্তর্গত। তবে অনেকে এই সমস্ত সমাসের বিষয়-বহির্ভূত আর একটি পৃথক সমাস 'সহসুপা'কে গণ্য করিয়া **পঞ্চবিধ সমাসও** বলিয়া থাকেন। অব্যয়ীভাবে পূর্বপদের অর্থ-প্রাধান্য, তৎপুরুষে উত্তর পদের অর্থ-প্রাধান্য, বহুব্রীহিতে পূর্বপদ বা উত্তরপদের অর্থ না বুঝাইয়া অন্য অর্থের প্রাধান্য এবং দ্বন্দ্বে উভয় পদেরই অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়। দ্বন্দ্ব ও

সমাসের গোষ্ঠী-তালিকা
সমাস
সংযোগমূলক
ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক
বর্ণনামূলক
দ্বন্দ্ব সমাস
বহুব্রীহি সমাস
সাধারণ
অলুক
'ইত্যাদি' অর্থসূচক
সমার্থক
ব্যধিকরণ
সমানাধিকরণ
ব্যতিহার
মধ্যপদলোপী
অলুক্
নঞ্
কর্মধারয়
দ্বিগু
তৎপুরুষ
সাধারণ
মধ্যপদলোপী
উপমামূলক
উপমান
রূপক
উপমিত
প্রথমা
দ্বিতীয়া
তৃতীয়া
চতুর্থী
পঞ্চমী
ষষ্ঠী
সপ্তমী
উপপদ
নঞ্
অলুক্
প্রাদি
গতি
নিত্য
অব্যয়ীভাব
সহসুপা
একদেশী
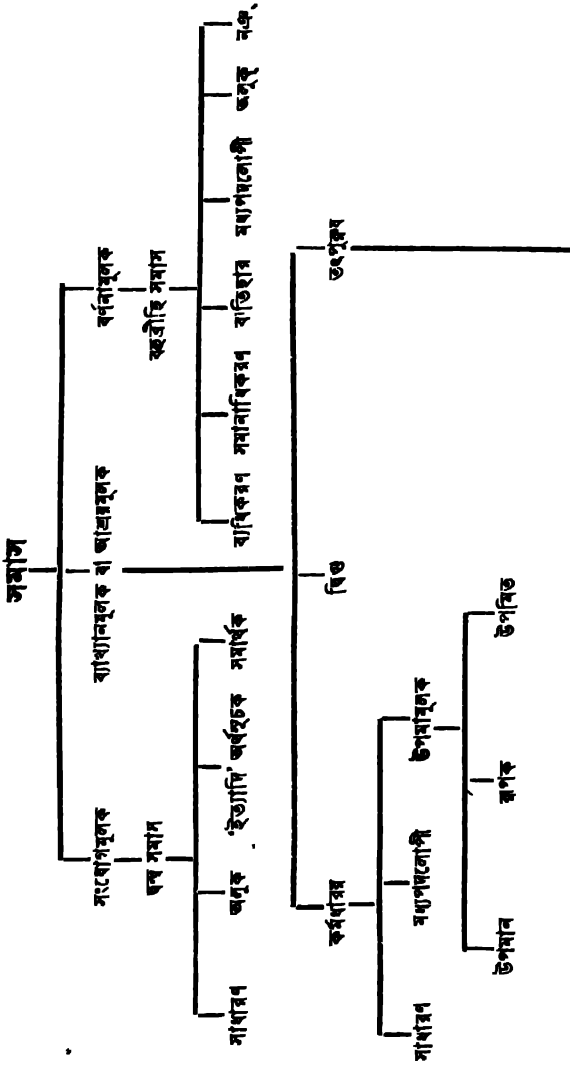
বহুব্রীহি বহু পদের মিলনেও হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য সমাস কেবলমাত্র দুইটি পদেরই মিলনে হয়। আবার কোন কোন বৈয়াকরণ **অন্যথায় সমাসের ছয়টি প্রকারও** বলিয়াছেন : যথা,—অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি। সে যাই হোক,—মোটের উপর সমাসের গোষ্ঠী বড়ই বৃহৎ। তাই ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নূতন দৃষ্টিভংগী লইয়া সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা-সহযোগে সমাসকে মোটামুটি ভাবে তিনটি প্রধান বিভাগে এবং এক একটি প্রধান বিভাগকে নানা উপবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ছকের সাহায্যে এই বিভাগ ও উপবিভাগগুলিকে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হইয়াছে।

ঐ ছক লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, **অলুক্ সমাস** সংযোগমূলক, ব্যাখ্যানমূলক ও বর্ণনামূলক এই তিন জাতেরই সমাসে যথাক্রমে অলুক্ দ্বন্দ্ব, অলুক্ তৎপুরুষ ও অলুক্ বহুব্রীহি নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সমাসবদ্ধ হইলেও অন্বয়জ্ঞাপক বিভক্তি লোপ পায় না। তাই সমাসের নাম অলুক্ সমাস : যেমন,—হাটে-মাঠে; চিনির-বলদ; গায়ে-পড়া।

সংযোগমূলক সমাস

দ্বন্দ্ব সমাস—একাধিক পদে মিলিত এই সমাসে প্রতিটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে। এই সমাস নানা জাতের :—(১) **সাধারণ দ্বন্দ্ব**—যেমন,—অহঃ ও রাত্রি = অহোরাত্র ; কুশ ও লব = কুশীলব ; এইরূপ আনা-গোনা, হয়-নয়, লোক-লস্কর, জায়াপতি দম্পতি দম্পতী, তেল-নুন-লাকড়ী, দুধ-দই-ক্ষীর-সর, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ। (২) **অলুক্ দ্বন্দ্ব**—বনে ও বাদাড়ে = বনে-বাদাড়ে ; এইরূপ দুধে-ভাতে, হাতে-পায়ে, ঠারে-ঠোরে। (৩) **'ইত্যাদি' অর্থসূচক দ্বন্দ্ব**—(ক) সহচর শব্দযোগে—যেমন, লাঠি-ঠেঙা ; বাড়ি-ঘর ; জীব-জন্তু। (খ) অনুচর শব্দযোগে—যেমন,—চুরি-চামারি ; হাতী-ঘোড়া। (গ) প্রতিচর শব্দযোগে—যেমন,—মেয়ে-পুরুষ ; হিন্দু-মুসলমান। (ঘ) বিকার শব্দযোগে—যেমন,—অদল-বদল ; তুক্-তাক্। (ঙ) অনুকার শব্দযোগে—যেমন,—কাজ-ফাজ ; উলট-পালট। (৪) **সমার্থক দ্বন্দ্ব**—যেমন,—কাগজ-পত্র ; রাজা-বাদশা ; ঠাট্টা-মস্করা ; শাক-সব্জী। (৫) **একশেষ দ্বন্দ্ব**—যেমন,—তুমি সে ও আমি, আমরা ; তুমি ও সে, তোমরা।

ব্যাখ্যানমূলক বা আশ্রয়মূলক সমাস

কর্মধারয় সমাস—এই সমাসে প্রথম পদটি দ্বিতীয় পদের বিশেষণ-রূপে থাকিয়া দ্বিতীয় পদের অর্থের প্রাধান্য বজায় রাখে। দুইটি বিশেষণ পদ মিলিয়াও কর্মধারয় সমাস হয়। এই সমাস নানা জাতের :—(১) **সাধারণ কর্মধারয়**—(ক) বিশেষণ + বিশেষ্য—যেমন,—কু যে পুরুষ, কুপুরুষ বা কাপুরুষ ; এইরূপ নীলোৎপল,

মহানদী, মহারাজা, অপরাহ্ণ। (খ) বিশেষ্য+বিশেষণ—যেমন,—ঘননীল; হলুদ-বাটা। (গ) বিশেষণ+বিশেষণ—যেমন,—ভাজাও যাহা মরাও তাহা, ভাজা-মরা; এইরূপ নীল-লোহিত, মধুর-ভীষণ, রুদ্র-সুন্দর। (ঘ) বিশেষ্য+বিশেষ্য—যেমন,—সর্দারও যে পড়ুয়াও সে, সর্দার-পড়ুয়া; এইরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ভূলোক, আকাশমণ্ডল। (ঙ) অবধারণা-পূর্বপদ কর্মধারয়—এই জাতীয় কর্মধারয় সমাসে প্রথম পদের অর্থের উপরে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয়: যেমন,—উদরই সর্বস্ব, উদরসর্বস্ব, এইরূপ দোজবর, কালসর্প। (চ) পূর্বনিপাত কর্মধারয়—এই জাতীয় কর্মধারয় সমাসে পরে যে পদের বসা কর্তব্য তাহা আগেই বসে: যেমন,—ছন্নমতি মতিচ্ছন্ন; উত্তম পুরুষ, পুরুষোত্তম; এইরূপ রাজাধম, তেল-পড়া, হলুদ-বাটা। (ছ) বিবিধ—যেমন,—সেজন; বিভূঁই, সুনজর; বে-সুর; তে-তালা; অনিন্দ্য; অদৃষ্ট; স্বয়ংকৃত। (২) **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়**—এই জাতীয় কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী ব্যাখ্যানমূলক পদের লোপ হয়: যেমন,—সিংহ-চিহ্নিত আসন, সিংহাসন; ছায়া-প্রধান তরু, ছায়াতরু; অষ্ট-অধিক দশ, অষ্টাদশ; কীর্তি-প্রকাশক মন্দির, কীর্তিমন্দির; নাতি-পর্যায়ের জামাই, নাত-জামাই; 'মনি' রাখিবার 'ব্যাগ', মনি-ব্যাগ। (৩) **উপমামূলক কর্মধারয়**—এই জাতীয় সমাসে দুইটি বস্তুর পরস্পরের মধ্যে তুলনা বা উপমা থাকে। তুলনা বা উপমার ক্ষেত্রে যাহা উপমিত হয় অর্থাৎ যাহাকে তুলনা করা হয়, তাহাকে বলা হয় **উপমেয়**; আবার যাহার সংগে উপমা বা তুলনা করা হয়, তাহাকে বলা হয় **উপমান**। উপমামূলক কর্মধারয় তিন রকমের হয়:—(ক) **উপমান কর্মধারয়**—যে ক্ষেত্রে উপমানের ধর্ম উপমেয়ের দ্বারা দ্যোতিত হয়, সেখানে হয় উপমান কর্মধারয় সমাস: যেমন,—মিশির মত কালো, মিশ্‌-কালো; এইরূপ দূর্বাদল-শ্যাম, অরুণ-রাঙা, কুসুম-কোমল। (খ) **রূপক কর্মধারয়**—ভিন্ন জাতীয় বা ভিন্ন শ্রেণীর উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোনও বিষয়ে স্পষ্ট হইলে এবং উভয়কে অভিন্ন রূপে কল্পনা করিলে রূপক কর্মধারয় সমাস গঠিত হয়: যেমন,—বাদলা-রূপ দূতী, বাদল-দূতী; এইরূপ শোকসিন্ধু, মুখচন্দ্র, চাঁদবদন, জ্ঞানালোক। (গ) **উপমিত কর্মধারয়**—যেখানে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট নয়, তবে উভয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনও সমান ধর্ম বা গুণ বর্তমান থাকে, সেখানে হয় উপমিত কর্মধারয় সমাস: যেমন,—মন-রূপ রথ, মনোরথ; কর পল্লবের ন্যায়, করপল্লব; হংসতুল্য রাজা (=রাজ-শ্রেষ্ঠ), রাজহংস; এইরূপ নরপুংগব, নরশার্দূল, পুরুষসিংহ।

দ্বিগু সমাস—প্রথম পদটি সংখ্যাবাচক হইলে এবং সমস্ত পদটির দ্বারা সংযোগ বা সমষ্টি বুঝাইলে, দ্বিগু সমাস হয়: যেমন,—পাঁচ সেরের সমাহার, পঞ্চসেরী

(পন্‌সেরী, পাঁচসেরা)। এইরূপ ষড়্‌ঋতু, চৌমুহানী, তিন-ঠেঙ্‌। তবে, যেখানে সমষ্টি বুঝাইতে গিয়া শেষের পদে প্রত্যয়ের লোপ বা যোগ হয় বা অপর কোন পরিবর্তন ঘটে, সেখানে হয় **সমাহার দ্বিগু**: যেমন—পঞ্চ নদীর সমাহার, পঞ্চনদ (-ঈপ্রত্যয়ের লোপ); পঞ্চ বটের সমাহার, পঞ্চবটী (-ঈ প্রত্যয়ের যোগ); চৌ (=চারি) মাথার্‌ সমাহার, চৌমাথা; এইরূপ শতাব্দী, পঞ্চাংগুল।

তৎপুরুষ সমাস—পূর্বপদের কারকবোধক বিভক্তির লোপ হইয়া ইহার সহিত পরপদের সমাসে প্রায়ই পরপদের অর্থের প্রাধান্য দেখা দিলে তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয়। তৎপুরুষ সমাস বহু প্রকারের:—(১) কর্তৃবাচক—**প্রথমা তৎপুরুষ**: যেমন,—হাতী-কাঁদা; দাগ-লাগা; বাজ-পড়া; ঘর-চাপা। (২) কর্মবাচক—**দ্বিতীয়া তৎপুরুষ**: যেমন,—নথ-নাড়া; ভুঁই-ফোঁড়্‌; চোখ-মটকানো; সাহায্যপ্রাপ্ত; গৃহপ্রবিষ্ট; চিরকাল ব্যাপিয়া শত্রু, চিরশত্রু; অর্ধ-রূপে মৃত, অর্ধমৃত; দ্রুত যথা তথা গামী, দ্রুতগামী; মৃদু যথা তথা ভাষিণী, মৃদুভাষিণী; নিম্‌ (=অর্ধ) রূপে রাজী, নিমরাজী; এইরূপ নিমখুন. ধীরগামী, মাসাশৌচ। (৩) করণবাচক—**তৃতীয়া তৎপুরুষ**: যেমন,—(বিধিপূর্বক) বাক্য দ্বারা দত্তা (কন্যা), বাগ্‌দত্তা; মন দ্বারা গড়া, মন-গড়া; এইরূপ ঢেঁকি-ছাঁটা, ঝাঁটা-পেটা, মধু-মাখা, শ্রীযুত, বিস্ময়বিহ্বল, মৎকৃত, মাতৃহীন, পোয়া-কম। (৪) উদ্দেশ্যবাচক—**চতুর্থী তৎপুরুষ**: যেমন,—ডাকের জন্য মাশুল, ডাকমাশুল; জীয়নের জন্য কাঠি, জীয়নকাঠি; বিয়ের জন্য পাগল, বিয়েপাগলা। এইরূপ শোষ-কাগজ, ধান-জমি, শিশু-বিভাগ, যূপ-কাষ্ঠ, বালিকা-বিদ্যালয়। সম্প্রদানার্থেও চতুর্থী তৎপুরুষ হয়: যেমন,—দেবকে দত্ত, দেবদত্ত। (৫) অপাদানবাচক—**পঞ্চমী তৎপুরুষ**: যেমন,—আগা হইতে গোড়া, আগাগোড়া; যুদ্ধ হইতে উত্তর, যুদ্ধোত্তর; মিত্র হইতে জাত, মিত্রজা। এইরূপ ঘোষ-জা, ধ'লে-ঝাড়া, কলেজ-পালানো, স্বর্গভ্রষ্ট, ভুক্তাবশেষ, স্নাতকোত্তর, জেল-খালাস, বিলাত-ফেরত। (৬) সম্বন্ধবাচক—**ষষ্ঠী তৎপুরুষ**: যেমন,—মনের রথ, মনোরথ; হংসের রাজা, রাজহংস; হাত-বড়ি; ঠাকুরপো; জাহাজ-ঘাটা; চা-বাগান; গিনি-সোনা; গোরা-বারিক; গুরূপদেশ; শিশুগণ; ধনিগণ; ভ্রাতৃ-সম; ভ্রাতা-সম; দাতৃগণ; দাতাগণ; নদীর মাঝ, মাঝনদী; মৃগীর শাবক, মৃগশাবক; হংসীর অণ্ড, হংসাণ্ড; ছাগীর দুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ; তাহার প্রতি, তৎপ্রতি; বন্ধুর ত্রয়, বন্ধুত্রয়। (৭) স্থানবাচক—**সপ্তমী তৎপুরুষ**: যেমন,—গাছে পাকা, গাছপাকা; ঘরে পোড়া, ঘরপোড়া; লিপ্তি-ভুক্ত; পুঁথি-গত; সাঁঝ-ঘুমানী; পাড়া-বেড়ানী; আকাশ-বাণী; জল-জাত; কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কবিশ্রেষ্ঠ; নরের মধ্যে অধম, নরাধম; দক্ষিণে পথ, দক্ষিণাপথ; পূর্বে শ্রুত, শ্রুতপূর্ব;

পূর্বে ভূত, ভূতপূর্ব; পূর্বে দৃষ্ট, দৃষ্টপূর্ব; ঝুড়ী-ভরতী; মাথা-ব্যথা; কোল-কুঁজো.; পকেট-জাত; বাস্তবন্দী; রথারূঢ়; লোকবিশ্রুত; কাশীবাসী।

(৮) **উপপদ তৎপুরুষ সমাস:** উপপদের সহিত পরবর্তী পদের বিভিন্ন কারকের অন্বয় করিয়া সমাস হইলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস হয়। সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত পদের পূর্বে উপসর্গ ছাড়া অন্যান্য শব্দও বসে। উপসর্গ ছাড়া অন্য শব্দকে উপপদ বলে: যেমন,—গৃহে থাকে যে, গৃহস্থ; হাড় ভাঙে যাহাতে, হাড়ভাঙা; বর্ণ চুরি করে যে, বর্ণচোরা; ফেল মারে যে, ফেল-মারা; হিত ইচ্ছা করে যে, হিতৈষী; হালুয়া করে যে, হালুইকর; পাশ করিয়াছে যে, পাশ-করা; গিরিতে যিনি শয়ন করেন, গিরিশ। (৯) **নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাস:** 'না', 'নাই' বা 'নয়' অর্থে 'নঞ্‌' নামে এক সংস্কৃত প্রত্যয় আছে। পরপদের প্রাধান্য রাখিয়া এই 'নঞ্‌'-এর সহিত যে সমাস গঠিত হয়, তাহাই নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাস। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে, 'ন'-এর পরিবর্তে 'অ' হয় আর স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'ন'-এর পরিবর্তে প্রায়ই 'অন', 'অনা' হয়। 'বে' 'গর' 'না' 'অ' প্রভৃতি নাস্তিবাচক শব্দযোগেও নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন, নয় লক্ষুণে (=শুভ), অলক্ষুণে; ন কাতর, অকাতর; ন আচার, অনাচার, ন অন্ত, অনন্ত; আইনের অভাব, বে-আইনী; ন হাজির গরহাজির; নাই মামা, নেইমামা; নয় ঘাট, আঘাট; নয় সৃষ্টি, অনাসৃষ্টি। (১০) **অলুক্‌ তৎপুরুষ সমাস:** এই সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় না। প্রতি প্রকার তৎপুরুষ সমাসেরই অলুক্‌ সমাস হয়: যেমন,—**অলুক্‌ ৩য়া তৎপুরুষ**—তেলে-ভাজা, বালির-বাঁধ, ঢেঁকি-ছাঁটা, ঘিয়ে-ভাজা। **অলুক্‌ ৪র্থী তৎপুরুষ**—ঘানির-বলদ, চায়ের-বাটি, আত্মনেপদ। **অলুক্‌ ৫মী তৎপুরুষ**—ঘানির-তেল, নদীর-মাছ, কলের-জল। **অলুক্‌ ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ**—হাতের-পাঁচ, ভাগের-মা, চোখের-বালি, পাথরের-বাটী, ভ্রাতুষ্পুত্র, বাচস্পতি, সোনার-বাংলা। **অলুক্‌ ৭মী তৎপুরুষ**—তেলে-বেগুনে, গায়ে-পড়া, হাতে-গরম, অন্তেবাসী, লালে-লাল, চোখে-দেখা, হাতে-খড়ি, মুখে-মধু।

(১১) **প্রাদি সমাস:** প্রথমে প্র-আদি উপসর্গ ও পরে কৃদন্ত পদযোগে এবং অব্যয়ের সহিত নামযোগে এই সমাস গঠিত হয়। ইহা তৎপুরুষের রূপান্তর। একদিক দিয়া এই সমাসকে নিত্য সমাসেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়: যেমন,—প্র (=প্রকৃষ্টরূপে) ভাত (=জ্যোতিঃযুক্ত), প্রভাত; সু (=সুদৃশ্য) পুরুষ, সুপুরুষ; প্রাকৃতকে অতিক্রম করিয়া, অতিপ্রাকৃত; উৎ (=উৎক্রান্ত) শৃংখলা, উচ্ছৃংখল।

(১২) **গতি সমাস:** 'আবিঃ, পুরঃ, তিরঃ, প্রাদুঃ, বহিঃ, অলম্‌, সাক্ষাৎ'—এই কয়টি অব্যয়কে 'গতি' বলা হয়। এই গতির সহিত কৃদন্ত পদের সমাস হইলে গতি সমাস হয়: যেমন,—আবিঃ (=দৃষ্টিগোচর হইবার) ভাব, আবির্ভাব; পুরঃ

(সম্মুখে আনিবার) কার (=কাজ), পুরস্কার ; তিরঃ (দৃষ্টির বাহিরে যাইবার) ভাব, তিরোভাব ; ভাবের প্রাদুঃ ; প্রাদুর্ভাব ; অংগের বহিঃ, বহিরংগ ; অলং (=সম্যক্রূপে) করণ (সাজানো), অলংকরণ ; সাক্ষাতের কার (=ভাব, বা কাজ), সাক্ষাৎকার। (১৩) **নিত্য সমাস :** সমস্যমান পদগুলি পাশাপাশি থাকিলেই নিত্য সমাস হয় : যেমন,—অন্য গৃহ, গৃহান্তর ; কেবল দর্শন, দর্শনমাত্র ; তাহা মাত্র (=কেবল তাহা), তন্মাত্র ; একটি লোক, লোকটি ; অনেক মাছ, মাছগুলি ; একখানি বই, বইখানি ; এইরূপ অনলসংকাশ, বজ্রসন্নিভ।

(১৪) **অব্যয়ীভাব সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদাশ্রিত অব্যয় পদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই অব্যয়ীভাব সমাস। অবশ্য এই সমাস প্রাদি-পর্যায়েই পড়ে। সামীপ্য, বীপ্সা (পুনঃ পুনঃ অর্থে), অনতিক্রম, পর্যন্ত, যোগ্যতা, অভাব, পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, হীনতা, ক্ষুদ্রতা, অধিকরণ অর্থ বুঝাইতে অব্যয়ীভাব সমাস হয় : যেমন,—কূলের সমীপে, উপকূল ; দিন দিন, প্রতিদিন ; ক্ষণ ক্ষণ, অনুক্ষণ ; রোজ রোজ, হররোজ ; বছর বছর, ফিবছর : টকের অভাব, না-টক ; ঘরের অভাব, হা-ঘর ; ভিক্ষার অভাব, দুর্ভিক্ষ ; মিলের অভাব, গরমিল ; মানানের অভাব, বেমানান ; জানু পর্যন্ত, আজানু ; বিধিকে অতিক্রম না করিয়া, যথাবিধি ; রূপের যোগ্য, অনুরূপ ; গমনের পশ্চাৎ, অনুগমন ; বনের সদৃশ, উপবন ; হীন দেবতা, অপদেবতা ; উপ (=ক্ষুদ্র) বিভাগ, উপবিভাগ, আত্মাকে অধিকার করিয়া, অধ্যাত্ম ; দৈবকে অধিকার করিয়া, অধিদৈব।

(১৫) **সহসুপা বা সুপ্‌সুপা সমাস :** 'সুপ্' অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত একটি নামপদের সহিত আর একটি 'সুপ্' অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত পদের সমাসকে সুপ্‌সুপা বা সহসুপা সমাস বলা হয়। ব্যাপক অর্থ ধরিলে সকল প্রকারের সমাসই সুপ্‌সুপা সমাস। কিন্তু এই অর্থকে সংকুচিত করিয়া ইহাই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, যখন কোন সমাসবদ্ধ পদকে অপর কোন সমাসেরই অন্তর্গত করা যায় না, তখনই তাহাকে সুপ্‌সুপা সমাসরূপে ধরা হয় : যেমন,—পর রাত্র, পররাত্র ; পরম পূজ্য, পরমপূজ্য প্রত্যক্ষ ভূত, প্রত্যক্ষভূত ; ন অতি শীতোষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ ; পূর্বে ভূত, ভূতপূর্ব।

(১৬) **একদেশী বা একদেশ সমাস :** 'একদেশ' মানে 'অবয়ব' বা 'অংশ' নয়—'অবয়বী' বা 'সমগ্র'। এই সমাসে সমগ্রবোধক পদের সংগে অংশবোধক পদের সমাস হয়। তবে কাহারও কাহারও মতে, একদেশবাচক পদের সহিত কালবাচক পদের সমাসই একদেশী বা একদেশ সমাস নামে পরিচিত : যেমন—কায়ের উত্তরভাগ, উত্তরকায় ; গ্রামের অর্ধ, গ্রামার্ধ ; রাত্রির পূর্বভাগ, পূর্বরাত্র ; রাত্রির মধ্যভাগ, মধ্যরাত্র ; অহ্নের সায়ম্, সায়াহ্ন ; অহ্নের অপর ভাগ, অপরাহ্ন।

বর্ণনামূলক সমাস

সমাসস্থ পদগুলির কোনটিরই অর্থ না বুঝাইয়া সমাসনিষ্পন্ন পদ অপর কোন পদার্থকে প্রধান রূপে বুঝাইলে, বহুব্রীহি সমাস হয়। সমাসনিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ হয়। এই সমাস নানা জাতের :—(১) **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি**—পূর্বপদ বিশেষণ না হইলে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয় : যেমন,—বাক্ দত্ত হইয়াছে যাহার সম্পর্কে এমন যে সে (স্ত্রীলিংগে) বাগ্‌দত্তা ; বজ্রের ন্যায় নখ যাহার, বজ্রনখ ; পদ্ম নাভিতে যাহার, পদ্মনাভ (=বিষ্ণু) ; বীণা পাণিতে যাহার বীণাপাণি (=সরস্বতী)। (২) **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি**—পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হইলে, সমানাধিকরণ বহুব্রীহি হয় : যেমন,—পীত অম্বর যাহার, পীতাম্বর (=কৃষ্ণ) ; কালো বরণ (=বর্ণ) যাহার, কালোবরণ। (৩) **ব্যতিহার বহুব্রীহি**—পরস্পরের মধ্যে একই ধরণের ক্রিয়া করা বুঝাইলে, একই শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা ব্যতিহার বহুব্রীহি গঠিত হয়। সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদ হয় আকারান্ত আর পরপদ হয় ইকারান্ত : যেমন—কানে কানে কথা যেখানে, কানাকানি ; দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধ যাহার তাহা, দণ্ডাদণ্ডি ; হাসিয়া হাসিয়া আলাপ যেখানে হাসাহাসি। এইরূপ, নখানখি, গালাগালি, কাড়াকাড়ি, ঝাঁকাঝাঁকি। (৪) **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি**—যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যে মধ্য পদের লোপ হয় তাহাই মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস ; যেমন—মীনের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার সে (স্ত্রীলিংগে), মীনাক্ষী ; মৃগের ন্যায় সুন্দর নয়ন যাহার সে (স্ত্রীলিংগে), মৃগনয়নী। এইরূপ চাঁদমুখ, চন্দ্রবদন, চন্দ্রমুখী। (৫) **সংখ্যা বহুব্রীহি**—যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে, তাহাই সংখ্যা বহুব্রীহি সমাস : যেমন,—সে (=ফার্সি তিন) তার যাহার, সেতার ; পঞ্চ মুখ যাহার, পঞ্চমুখ ; দুই নল যাহার, দোনালা। এইরূপ দশানন, ত্রিবর্ণ, ত্রিপদী, চৌচির ইত্যাদি। (৬) **অলুক্ বহুব্রীহি**—এই জাতীয় বহুব্রীহি সমাসে বিভক্তির লোপ হয় না : যেমন,—যাচ্ছে তাই, যাচ্ছেতাই। এইরূপ পাঞ্জাবী-গায়ে, মাথায়-ছাতি, কোঁচা-হাতে, ছড়ি-হাতে, আপ্-কে-ওয়াস্তে। (৭) **নঞ্ বা নিষেধ বহুব্রীহি**—যেমন,—নাড়ী (নাড়ী-জ্ঞান) নাই যাহার সে, আনাড়ী। এইরূপ নির্জলা, বেইমান। (৮) **অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি**—যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের শেষ পদের লোপ হয়, তাহাই অন্ত্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস : যেমন,—পাঁচ হাত পরিমাণ যাহার, পাঁচহাতি ; বিশ হইতে পঁচিশ সীমা যাহার, বিশ-পঁচিশ ; গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে, গায়ে-হলুদ। এইরূপ দশ-বছরিয়া >দশ-বছুরে, দশগজী, বউভাত।

আরও কতিপয় সমাস

অসংলগ্ন সমাস—সমাসে সমস্ত পদটি একপদে পরিণত হইবেই। কিন্তু বাংলা

ভাষায় মিশ্র সমাসবদ্ধ বড় বড় পদকে ভাঙিয়া পৃথক্ পৃথক্ পদ বা শব্দরূপে লেখা হয়। এহেন পদসমষ্টিতে সমাসত্ব থাকিলেও সমাসের প্রধান সর্ত একপদীভাবত্বটি নাই; আবার লেখায় দৃষ্টিকটুতা পরিহারার্থে সমস্যমান পদগুলির ভিতরে হাইফেন-চিহ্নও বসানো হয় না। এইজন্যই এহেন পদসমষ্টিকে বলা হয় অসংলগ্ন সমাস: যেমন,—প্রবাসী বংগসাহিত্য সম্মেলন; নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা; সব পেয়েছির দেশ।

পদগর্ভ সমাস—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত কতিপয় দীর্ঘ সমাসকে সংস্কৃত রীতি-অনুসারে কোনও সমাসের অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারায়, কোন কোন বৈয়াকরণের মতে ঐ জাতীয় দীর্ঘ সমাস পদগর্ভ বা বাক্যগর্ভ সমাস নামে অভিহিত হইয়াছে: যেমন,—'এক যে ছিল রাজার আমল'; 'কানে কানে ডাকা'; 'দশের ইচ্ছা বোঝাই করা'।

মিশ্র সমাস—ভাষায় যে সমস্ত সমাস ব্যবহৃত হয়, তাহারা সাধারণত কোন একটি সমাসের অবিমিশ্র রূপ নয়। প্রায়ই নানা সমাস মিশ্রভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাই ইহাদের নাম মিশ্র সমাস: যেমন,—শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী; জনগণ-মন-অধিনায়ক; নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর; বাণ-বিদ্ধ-মীন-মত।

সমাসের দরুণ অর্থ-পার্থক্য

বসন্তসখা—বসন্ত সখা যাহার, বহুব্রীহি। **বসন্তসখ**—বসন্তের সখা, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **মহাধন**—মহৎ ধন, কর্মধারয়। **মহদ্ধন**—মহতের ধন, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **মাতাপিতা**—মাতা ও পিতা, দ্বন্দ্ব। **মাতৃপিতা**—মাতার পিতা, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **সূত্রধর**—সূত্রের ধর বা ধারণকারী, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **সূত্রধার**—সূত্র ধরে যে, উপপদ তৎপুরুষ। **স্বপত্নী**—নিজের পত্নী, ষষ্ঠী তৎপুরুষ। **সপত্নী**—সমান পতি যাহাদের, বহুব্রীহি। **মতিচ্ছন্ন**—ছন্ন বা আচ্ছন্ন মতি, কর্মধারয়। **ছন্নমতি**—ছন্ন বা আচ্ছন্ন মতি যাহার, বহুব্রীহি। **অনর্থ**—নাই অর্থ, নঞ্ তৎপুরুষ। **অনর্থক**—অর্থ নাই যাহাতে, বহুব্রীহি সমাস।

অর্থের দরুণ সমাস-পার্থক্য

কীর্তিমন্দির—(১) কীর্তি-প্রকাশক মন্দির, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়; (২) কীর্তি প্রকাশ করে যে মন্দির, উপপদ তৎপুরুষ। **কাশীবাসী**—(১) কাশীতে বাসী, সপ্তমী তৎপুরুষ; (২) কাশীতে বাস করে যে, কর্মধারয়। **সুপুরুষ**—(১) সু যে পুরুষ, কর্মধারয় সমাস; (২) সু-পুরুষ, প্রাদি সমাস। **বাগ্‌দত্তা**—(১) বাক্য দ্বারা দত্তা (কন্যা), তৃতীয়া তৎপুরুষ; (২) বাক্ দত্ত হইয়াছে যাহার সম্পর্কে এমন সে, ব্যধিকরণ বহুব্রীহি।

অনুশীলনী

[এক] সন্ধি ও সমাসের উদাহরণসহ পার্থক্য দেখাও। ক. বি. বি. এ.' ৫৬

[দুই] সমাস কাহাকে বলে এবং বাংলা ভাষায় সমাসের আবশ্যকতা কি ? রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫

[তিন] সমাস কয় প্রকার এবং কি কি ? প্রত্যেক প্রকার সমাসের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭

[চার] প্রধান সমাসগুলির উদাহরণ খাঁটি বাঙালা ভাষা হইতে দাও। বহুব্রীহি ও তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা বর্ণন করিয়া তাহাদের পার্থক্য প্রদর্শন কর। রা. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৬

[পাঁচ] নিম্নলিখিত পদগুলির সমাস নির্ণয় করিয়া ব্যাসবাক্য লিখ:— পটলভাজা, হরিণনয়না, চুলোচুলি (ক. বি. বি. এ., ৫৬)। তিনকড়ি (মানুষের নাম), বিড়ালচোখী, ঘনশ্যাম, চুলোচুলি, তেমোহানী, অম্লমধুর, গাছপাকা, ঢেঁকিছাঁটা, বিয়েপাগলা, পুষ্পধন্বা (ক. বি. বি. এ. '৫৫)। না-মঞ্জুর, শশব্যস্ত, হাতে-খড়ি, জীবন্মৃত, সেতার, গ্রামান্তর, সস্ত্রীক, রাতকানা, এতিমখানা [রা বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৪]। মাথাপিছু, লক্ষ্মীছাড়া, ছেলেভুলানো বালিকাবিদ্যালয়, ঘরপাতা, পীরোত্তর, হরবোলা, সেতার, কানাকড়ি, তেপান্তর [রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫]। স্বাধীনতা-দিবস, অর্থনীতি, তেলেবেগুনে, হেড্‌পণ্ডিত, রূপবাণী, উড়োজাহাজ, গাছপাকা, চুলোচুলি, জলযোগ, শতবার্ষিকী [রা বি. মাধ্যমিক. (বিকল্প) '৫৬]। তেপায়া, ডাকাবুকো, বিয়েপাগলা, মাথাব্যথা, চালাকচতুর, লাঠালাঠি, একঘরে, তেলেভাজা, দাকুমড়া, বকধার্মিক (ঢা. বি. বি. এ. '৪৯)। রাজহংস, বাগ্‌দত্তা, আজানুলম্বিত, গাছপাকা, আগাগোড়া, মনোরথ, অভূতপূর্ব, অলক্ষুণে, মতিচ্ছন্ন, আনাড়ী (ক. বি. মাধ্যমিক '৩৪, '৩৫)। জলজ্যান্ত, গাছপাকা, কাজল-কালো, ফি-বছর, আকাল, ছোলাভিজে, প্রীতিভোজ [ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৩]। আশালতা, এণাক্ষী, ব্রাহ্মণেতর, সুধী, সতীর্থ, মসীকৃষ্ণ, ধর্মসংক্রান্ত, অহোরাত্র [ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫]। ত্রিশ, অন্তরীপ, অনুক্ষণ, ভূতপূর্ব, রাজপথ, কুশীলব, তন্তুবায়, কদন্ন, গাছপাকা, [ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬]। বেতার, বালিকা-বিদ্যালয়, ফুলবাবু, গরমিল, হাড়ভাঙা, মিঠাকড়া, মনমাঝি, সেতার, দিনভর, রূপবাণী [ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭]।

[ছয়] রূপক, উপমিত ও উপমান—এই সমাসত্রয়ের উদাহরণ-সহকারে পার্থক্য নির্দেশ কর। ঢা. বি. বি. এ. '৫০

[সাত] নিম্নের যে কোনও পাঁচটি শব্দে কি সমাস হইয়াছে তাহা লেখ এবং শব্দগুলি দিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—জারি-জুরি, ভাগ-বাঁটোয়ারা, যুদ্ধোত্তর, কোপবহ্নি, কানাকানি, জনগণ-মন-অধিনায়ক, শোকাকুল, স্বর্ণাক্ষর।

ক. বি মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৬

[আট] থানা-পুলিস, দুধে-ভাতে, ঘর-পালানো, বাটা-ভরা, ঘর-পিছু, অতি-মানব, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভুক্তাবশেষ—ইহাদের মধ্য হইতে যে কোন পাঁচটি সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য বল এবং উহাদের লইয়া বাক্য রচনা কর।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৫

[নয়] উদাহরণ-সহযোগে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা লিখ :—সমাহার দ্বিগু (ঢা বি. বি. এ. '৫০); সমাহার দ্বিগু ও উপমিত সমাস (ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৩), দ্বিগু সমাস, বহুব্রীহি সমাস. নঞ্ তৎপুরুষ, রূপক কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয় (ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৬); অলুক্ সমাস (গৌ বি. বি এ. '৫০); বহুব্রীহি সমাস (গৌ. বি. বি. এ '৫১); উপমাত্মক বহুব্রীহি (ক. বি. বি. এ. '৫০); একদেশ সমাস ও ব্যতিহার বহুব্রীহি (ক. বি. বি. এ. '৫১); অলুক্ তৎপুরুষ ও রূপক কর্মধারয় [ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৩]; অলুক্ দ্বন্দ্ব [রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫]; অলুক্ সমাস, উপমিত সমাস, উপপদ সমাস ও নিত্য সমাস (ঢা. বি মাধ্যমিক '৫৭); দ্বন্দ্ব সমাস [ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭]।

[দশ] সমাস নির্ণয় করিয়া অর্থপার্থক্য লিপিবদ্ধ কর :—বসন্তসখা, বসন্তসখ; মহাধন, মহদ্ধন; মাতাপিতা, মাতৃপিতা; সূত্রধর, সূত্রধার, স্বপত্নী, সপত্নী।

[এগারো] অর্থের দরুণ সমাস-পার্থক্য নির্ণয় কর :—কীর্তিমন্দির, কাশীবাসী; সুপুরুষ; বাগ্‌দত্তা।

[বারো] উদাহরণ-সহযোগে নিম্নলিখিত সমাসগুলির পার্থক্য দেখাও :—কর্মধারয় ও বহুব্রীহি; সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি; গতি ও নিত্য; মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি; প্রাদি ও অব্যয়ীভাব; নঞ্ তৎপুরুষ ও নঞ্ বহুব্রীহি।

[তেরো] উদাহরণযোগে নিম্নলিখিত সমাসগুলির ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ কর :—উপপদ তৎপুরুষ সমাস; সহসুপা বা সুপ সুপা সমাস; অসংলগ্ন সমাস; পদগর্ভ সমাস; মিশ্র সমাস।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শব্দগঠন

লিংগ বচন ও পদাশ্রিত-নির্দেশক

লিংগ

পার্থিব বস্তুমাত্রই পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব, এই তিন শ্রেণীর। প্রাণীদিগের মধ্যে পুরুষ **পুংলিংগ** আর স্ত্রী **স্ত্রীলিংগ :** যেমন,—'বালক, পুরুষ' প্রভৃতি পুংলিংগ ; কিন্তু 'বালিকা, স্ত্রী' প্রভৃতি স্ত্রীলিংগ। পক্ষান্তরে, প্রাণহীন বা অচেতন অথবা স্বভাবত চলচ্ছক্তিহীন বস্তু অথবা ক্রিয়া বা ভাবের নাম **ক্লীবলিংগ :** যেমন,—'পাথর, গাছ, আকাশ, জল, পর্বত, রোদ, ছুরি, সমুদ্র, ঘুম, বই, সরম, রাগ, গাড্'। পুংলিংগ শব্দের স্ত্রী-রূপ দ্বিবিধ : একটি রূপ বুঝায় সেই শ্রেণীর বা জাতির স্ত্রীলোককে এবং অপর রূপ বুঝায় সেই শ্রেণীরই বা জাতিরই পুরুষের পত্নীকে : যেমন,—'ভাই' এই শ্রেণী বা পর্যায়ের স্ত্রী-রূপ হইতেছে 'বোন, ভগ্নী, ভগিনী' ; কিন্তু অপর রূপে 'ভাইয়ের পত্নী' অর্থে 'ভাজ' হয়।

বাংলায় পুংলিগ শব্দকে স্ত্রীলিংগে পরিণত করিবার উপায় তিনটি :

(১) স্বতন্ত্র শব্দ-দ্বারা পুংলিংগ ও স্ত্রীলিংগ-প্রদর্শন

পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ	পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ	পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ
দাদা—দিদি, বৌদিদি	বর—বধূ, কন্যা, ক'নে	ছাহেব—{ ছাহেবা, বিবি, খাতুন
ভাশুর ; দেওর—ননদ ; জা	কর্তা—গৃহিণী, গিন্নি কর্ত্রী	
বেটা, ছেলে, পো }—{ মেয়ে, ঝি, বউ	পুত্র—কন্যা ; স্নুষা, পুত্রবধূ	লর্ড, লাট—লেডী
	রাজা—রাজ্ঞী, রাণী	
জামাই—বউ ; ঝি, মেযে	পুরুষ—নারী, প্রকৃতি, মহিলা	গোলাম, নফর, বান্দা }—বাঁদী
তালুই, তাউই, তাঐ }—{ মাউই, মায়ৈ আবুই, আবুই-মা	শুক—সারি, সারিকা	চাকর—দাসী, ঝি, চাকরানী
	ভূত, প্রেত—প্রেতিনী, পেত্নী	খানসামা, খিদ্‌মৎগার—আয়া
	স্বামী—স্ত্রী, জায়া, ভার্যা, সহধর্মিণী	বাদশাহ্, নবাব—বেগম
নাতী—নাতনী, নাতবৌ	সাহেব, গোরা—বিবি, মেম	খাঁ—খানম

(২) সাধারণ শব্দে পুরুষ বা স্ত্রী-বোধক শব্দযোগে লিংগ-নির্দেশ

পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ	পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ	পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ
বন্ধু—বন্ধুজায়া	যাত্রী—মেয়ে-যাত্রী, স্ত্রী যাত্রী	বেটা-ছেলে—মেয়ে-ছেলে
কবি—{ মহিলা-কবি, স্ত্রী-কবি, মেয়ে-কবি	গোঁসাই—মা-গোঁসাই	এঁড়ে-বাছুর—{ বই-বাছুর, বকন-বাছুর
	পুরুষ মানুষ—মেয়ে-মানুষ	

পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ	পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ	পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ
গয়লা—গয়লা-বৌ	মদ্দা-হাঁস—মাদী-হাঁস	উড়ে—উড়েনী, উড়েবৌ
ডাক্তার—লেডী-ডাক্তার	প্রভু—প্রভু-পত্নী	দত্ত—দত্তগিন্নী, দত্তবৌ
কর্মী—কর্মিণী, মহিলা-কর্মী	শিল্পী—নারী-শিল্পী	উট—মাদী-উট, উটনী
চিল—মাদী-চিল, স্ত্রী-চিল	পুলিশ—মেয়ে-পুলিশ	বৃষ, ষাঁড, বলদ } —গাই-গোরু
প্রতিনিধি—মহিলা-প্রতিনিধি	কাপুরুষ—মেয়ে-কাপুরুষ	ষাঁড-গোরু }

(৩) পুং-বাচক নামের অন্তে স্ত্রী-প্রত্যয়যোগে লিংগ-নির্দেশ

পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ	পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ	পুংলিংগ স্ত্রীলিংগ
বিদ্বান্—বিদুষী	তনু—তন্বী	পণ্ডিত—পণ্ডিতা, পণ্ডিতানী
আয়ুষ্মান্—আয়ুষ্মতী	গুরু—গুর্বী, গুরুপত্নী	মালী—মালিনী
অশ্ব—অশ্বা	ব্রাহ্ম—ব্রাহ্মী, ব্রাহ্মিকা	মেধাবী—মেধাবিনী
সুকণ্ঠ—সুকণ্ঠা, সুকণ্ঠী	ঠাকুর—ঠাকুরাণী, ঠাকরুণ	সুদন্ত—সুদতী, সুদন্তী, সুদন্তা
ছাত্র—ছাত্রা, ছাত্রী	সয়া—সই	লঘু—লঘ্বী
গায়ক—গায়িকা ; গায়কী	খোকন—খুকনা	প্রেয়ান্—প্রেয়সী
শূদ্র—শূদ্রা ; শূদ্রী, শূদ্রানী	চোর—চোরনী	ভূয়ান্—ভূয়সী
মনুষ্য—মনুষী	আহ্লাদে—আহ্লাদী, আহ্লাদিনী	ভাবুক—ভাবুকা, ভাবুকী
আচার্য—আচার্যা, আচার্যানী	মিতে—মিতেন	সেবক—সেবকা, সেবিকা
মনু—মনাবী, মনায়ী	নন্দাই—ননদ, ননদী, ননদিনী	সম্রাট্—সম্রাজ্ঞী
মহাত্মা—মহীয়সী	শুক্ল—শুক্লা	অধীন—অধীনা
পাচক—পাচিকা	মহৎ—মহতী	সাধু—সাধ্বী
প্রদর্শক—প্রদর্শিকা	গরীয়ান্—গরীয়সী	মাতুল—মাতুলানী
সুনেতা—সুনেত্রী	দূত—দূতী	ওজস্বী—ওজস্বিনী
সুনেত্র—সুনেত্রা	বন্ধু—বান্ধবী, বন্ধুনী	ঘোড়া—ঘুড়ী

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(ক) স্ত্রীবোধক শব্দ হইতে পুং-বাচক শব্দের উৎপত্তি : যেমন,—ননদ—নন্দাই ; বোন—বোনাই ; পিসী—পিসা ; মাসী—মেসো ; ফুফী, ফুফু—ফুফা।

(খ) নিত্য পুংলিংগ শব্দ : যেমন,—বিপত্নীক, সভাপতি, সেনাপতি, ভাই (সম্বোধনে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে ব্যবহৃত)।

(গ) নিত্য স্ত্রীলিংগ শব্দ : যেমন,—বিধবা, অংগনা, সজনী, রূপসী, ধনী, গর্ভিণী ডাকিনী, অরক্ষণীয়া, বড়কী, ছোটকী, এয়ো, অবীরা, কপিলা, ধাই, শাকচুন্নী।

(ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ লিংগ-পরিবর্তন : যেমন,—অরণ্য—অরণ্যানী (মহারণ্য); হিম—হিমানী (হিমসংহতি বরফ); বন—বনানী (বৃহৎ বন); স্থল—স্থলী (অকৃত্রিম ভূমি); যবন—যবনানী (যবনদের লিপি যব—যবানী (খারাপ যব)

(ঙ) ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রী-বাচক '-ইকা' ও '-ঈ' প্রত্যয় : যেমন,—পুস্তক—পুস্তিকা ; নাটক—নাটিকা ; মালা—মালিকা ; চয়ন—চয়নিকা ; ব্যাকরণ—ব্যাকরণিকা ; ঘট—ঘটী ; ছোরা—ছুরী ; বেড়া—বেড়ী ; ঝোড়া—ঝুড়ী ; বাটা—বাটী।

(চ) অলিংগক শব্দ : এই জাতীয় শব্দের পুংলিংগ নাই : যেমন,—পাল্কী, জুল্‌ফি, খুঁটি, বঁটি, চুড়ী, ঝুঁটি, রুটি, চটি।

(ছ) নারীর নাম ও উপাধিতে পুংলিংগ শব্দের স্ত্রীলিংগরূপে প্রচলন : 'সবিতা, নমিতা, নীলিমা, পূর্ণিমা, চন্দ্রমা, শশী' প্রভৃতি শব্দাদি সংস্কৃতে পুংলিংগ, কিন্তু এক্ষণে নারীদের নামকরণে ইহাদের ব্যবহার সুপ্রচলিত। আবার পূর্বকালে নারীদের কুলোপাধি অনুযায়ী 'দাশগুপ্তা, ঘোষজায়া, চৌধুরাণী, দত্তজা, বসুজায়া, দাসী' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এক্ষণে সরাসরিভাবে আধুনিকাদের নামের পরে কুলো-পাধির লিংগ পরিবর্তন না করিয়াই ব্যবহার করা হইয়া থাকে : যেমন,—মাধুরী দাশগুপ্ত ; প্রীতি ঘোষ ; কল্যাণী দত্ত ইত্যাদি।

(জ) সমূহার্থে স্ত্রীপ্রত্যয় : যেমন,—জোড়া+ঈ=জুড়ী ; কাঁধ+ঈ=কাঁধী> কাঁদী ; ত্রিলোক+ঈ=ত্রিলোকী ; পাঁচসের+ঈ=পাঁচসেরী।

(ঝ) তারিখ অর্থে স্ত্রী-প্রত্যয় : যেমন,—ষোড়শ+ঈ=ষোড়শী ; পাঁচ+ই= পাঁচই ; এইরূপ একাদশী, পঞ্চমী, তেরোই, আটই।

বচন

যাহার দ্বারা শব্দার্থের সংখ্যা-বিষয়ে বোধ জন্মে তাহারই নাম **বচন**। বাংলায় দুইটি বচন—**একবচন** ও **বহুবচন**। দ্বিবচন নাই। একবচনে কোন প্রত্যয় নাই—মূল শব্দটির অবিকৃতভাবে বহুবচন করিতে হইলে হয় কোন প্রত্যয়, নয় কোন সমষ্টিবোধক শব্দ বসাইতে হয় : যেমন,—

(১) '-রা, -এরা, -দিগ, -দিগের, -দের, -গুলি, -গুলা' প্রত্যয়াদি—(ক) '-রা, -এরা' প্রত্যয় দুইটি কেবলমাত্র কর্তৃকারকেই প্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয়। তবে অপ্রাণিবাচক বস্তুতেও প্রাণ বা চেতনাশক্তি আরোপ করিয়া এই প্রত্যয় দুইটি প্রয়োগ করা চলিতে পারে : যেমন,—'শিশুরা' ; 'ব্রাহ্মণেরা' ; নভোমণ্ডলের 'নক্ষত্রেরা' যেন তাহাদের নয়ন মেলিয়া এই পৃথিবীর ঘুমন্ত প্রকৃতির শিয়রে সারা রাত জাগিয়া পাহারা দেয়। আবার '-রা,-এরা' প্রত্যয়ের সংগে 'সব' শব্দটিরও ব্যবহার আছে : যেমন,— মূর্খেরা সব'। (খ) '-দিগ, -দিগের, -দের, -দিকে, -এদের, -দের' প্রত্যয়গুলি কর্তা ভিন্ন অন্ত কারকে প্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত হয় : যেমন,—'বালকদিগের ; ছাত্রদের ; ভদ্রলোকেদের'। (গ) সমস্ত কারকেই প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক, উভয় প্রকার

শব্দেরই সংগে অনাদরে '-গুলা' প্রত্যয় সংযোজিত হয়: যেমন,—'বদমাশগুলা শূয়ারগুলা; ফুলগুলি, গোরুগুলি'। প্রসংগত ইহাও লক্ষণীয় যে, উচ্চশ্রেণীর অথব মানী ব্যক্তিগণের নামবাচক শব্দে এই প্রত্যয় দুইটি চলে না: যেমন,—'শিক্ষকগুলি, 'শিক্ষকগুলা' হবে না, হবে 'শিক্ষকগণ'; এইরূপ 'ঋষিগণ, দেবতাগণ'।

(২) 'গণ, মণ্ডলী, বর্গ, কুল, জন, লোক, সভা'—এই সমষ্টিবোধক শব্দগুলি প্রাণিবাচক একবচনাত্মক শব্দের পরে বসে: যেমন,—'মানবগণ, দেবগণ, বিবুধমণ্ডলী, রাজন্যবর্গ. বেনুকুল, সাধুজন, মূর্খলোক, পণ্ডিতসভা'।

(৩) 'মহল, দিগর'—এই সমষ্টিবোধক বিদেশী শব্দগুলি প্রাণিবাচক একবচনাত্মক শব্দের পরে বসে: যেমন,—'নবীমহল, যোগীন্দ্রনাথ সরকার-দিগর' (অর্থাৎ যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁহার সহযোগীরা)।

(৪) 'গ্রাম, চয়, দাম, নিকর, মণ্ডল, মালা, রাশি, রাজি, বৃন্দ'—এই সমষ্টিবোধক শব্দগুলি অপ্রাণিবাচক একবচনাত্মক শব্দের পরে বসে: যেমন,—ইন্দ্রিয়গ্রাম, পুষ্পচয়, বিদ্যুদ্দাম, কমলনিকর, মেঘমণ্ডল, নক্ষত্রমালা, কুসুমরাশি, বৃক্ষরাজি, সভ্যবৃন্দ'।

(৫) 'আবলী, নিচয়, সকল, সব, সমুচয়, সমূহ'—এই সমষ্টিবোধক শব্দগুলি প্রাণী ও অপ্রাণী উভয়বোধক শব্দের পরে বসে: যেমন,—'চিত্রাবলী, পত্রাবলী; পুষ্পনিচয়, পশুনিচয়; ছাত্রসকল, দোষসকল; ভাইসব, দোষসব, মনুষ্যসমুচয়; বৃক্ষসমুচয়; ছাত্রসমূহ, দোষসমূহ'।

(৬) 'অনেক, বহু, অজস্র, প্রচুর, দেদার'—এই সমষ্টিবোধক শব্দগুলি একবচনাত্মক শব্দের পূর্বে বসাইয়া বহুবচন করা যায়: যেমন,—'অনেক লোক, বহু দোষ, অজস্র অর্থ, প্রচুর টাকা, দেদার স্ফূর্তি'।

(৭) 'পত্র'—এই শব্দটি অপ্রাণিবাচক একবচনাত্মক শব্দের পরে বসে: যেমন— 'জিনিসপত্র, কাগজপত্র'।

(৮) দ্বিরুক্তি অর্থাৎ শব্দদ্বৈতের দ্বারা বহুবচনের ভাব প্রকাশ করা যায়: যেমন,—(ক) দ্বিরুক্ত বিশেষ্য—এই কথা আমি 'জনে জনে' (=নানা জনকে) বলিব। এইরূপ 'বনে বনে; ভাই ভাই'। (খ) দ্বিরুক্তি বিশেষণ—বাজারে 'বড় বড়' মাছ (= বড় আকৃতির মৎস্যসমূহ) আসে। এইরূপ 'লাল লাল' ফুল; 'উঁচু উঁচু' পাহাড়।

পদাশ্রিত-নির্দেশক বা বস্তুনির্দেশক

'টা, টি, টুকু, টুকুন্, টুক্, খানা, খানি, গাছা, গাছ, গাছি, জন'—এই শব্দ বা শব্দাংশগুলিকে বলা হয় **পদাশ্রিত-নির্দেশক** প্রত্যয়। কারণ,—ইহারা বিশেষ্য বা বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক বিশেষণের সংগে সংযুক্ত হইয়া বিশেষ্য বা

সংখ্যাবাচক শব্দকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ করে: যেমন,—'বইখানা, বইখানি; লাঠিগাছা, লাঠিগাছ' ইত্যাদি।

একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পদাশ্রিত-নির্দেশকসমেত সংখ্যাবাচক বিশেষণ যখন বিশেষ্যের পূর্বে বসে, তখন একটা **অনির্দিষ্ট ভাব** সংক্রামিত করে, কিন্তু যখন ইহা বিশেষ্যের পরে বসে, তখন **সুনির্দিষ্ট ভাব** সঞ্চারিত করে: যেমন,—'তিনখানা বই' অনির্দিষ্ট তিনখানা বইকে বুঝায়, কিন্তু 'বই তিনখানা' সুনির্দিষ্ট বা সুপরিজ্ঞাত তিনখানা বইকে বুঝায়। ঠিক এইরূপ 'পাঁচটি ছেলে', 'দশজন প্রজা', 'একটা বালক বা বালক একটা', 'চারগাছা ডাঁটা' অনির্দিষ্ট ভাবদ্যোতক এবং 'ছেলে পাঁচটি', 'প্রজা দশজন', 'বালকটা', 'ডাঁটা চারাগাছা' সুনির্দিষ্ট ভাবদ্যোতক।

অবশ্য সংখ্যাবাচক বিশেষণের আগে পদাশ্রিত-নির্দেশক জুড়িয়াও অনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করা যায়: যেমন—'জন-চার ছাত্র', 'খান-ছয় গামছা', 'গাছ-কতক ডাঁটা'। আবার অনিশ্চয়তা-বোধক প্রত্যয় 'এক' সংখ্যাবাচক শব্দে যোগ করিয়া অনির্দিষ্ট ভাবকে আরও জোরালো করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে: যেমন,—'জন-চারেক ছাত্র', 'খান-ছয়েক গামছা', 'গাছ-পাঁচেক লাঠি', 'খান-সাতেক কটি'।

'টা' ও 'টি'

এই দুইটি পদাশ্রিত-নির্দেশক প্রত্যয়ের মধ্যে প্রথমটি বিরক্তি বা অবজ্ঞা-বোধক এবং শেষোক্তটি সাধারণত স্নেহ বা সহানুভূতিব্যঞ্জক: যেমন,—'ছাত্রটা' বড়ই অমনোযোগী। 'ছাত্রটি' বেশ মেধাবী।

'টুকুন্', 'টুকু' ও 'টুক্'

এই তিনটি পদাশ্রিত-নির্দেশক প্রত্যয় পরিমাণবাচক শব্দের সংগে বসে। 'টুকুন্' স্বল্পতম পরিমাণব্যঞ্জক এবং স্নেহাদর-বোধকও বটে: যেমন,—শ্বশুরবাড়িতে জামাইকে ঐ 'দুধটুকুন্' খাওয়ানোর জন্য শাশুড়ীর কতই-না প্রয়াস দেখা গেল! 'টুকু' সাধারণভাবে পরিমাণজ্ঞাপক: যেমন,—'দুধটুকু' খেয়ে ফেল। আবার এই 'টুকু' ক্রিয়া-বিশেষণেও ব্যবহৃত হয়: যেমন,—আমি তোমার অনুরোধ 'এতটুকু' শুনিব না। 'টুক্' স্বল্পতম পরিমাণজ্ঞাপক, কিন্তু অবজ্ঞাবোধক: যেমন,—বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ঐ 'দুধটুক্' ফেলে দাও।

'খানা' ও 'খানি'

এই দুইটি পদাশ্রিত-নির্দেশক প্রত্যয় দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-সমন্বিত আয়তনবোধক। তবে 'খানা' বড় আয়তনের জিনিসকে আর 'খানি' ছোট আয়তনের জিনিসকে বুঝায়: যেমন,—'কাপড়খানা'; 'গামছাখানি'। তবে 'খানি' পদাশ্রিত-নির্দেশকটি আদরার্থে সরু জিনিসের সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়: যেমন,—"শুধু 'বাঁশীখানি' হাতে দাও তুলি।"

'গাছা', 'গাছি' ও 'গাছ'

এই পদাশ্রিত-নির্দেশক প্রত্যয় তিনটি সরু ও লম্বা জিনিসের বেলায় বসে। 'গাছা' ও 'গাছ' লম্বা জিনিসের সম্পর্কে ও 'গাছি' সরু জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়: যেমন.—'লাঠিগাছা, লাঠিগাছ'; 'ছড়িগাছি'।

ইহা ছাড়া, 'এক, টা, টো, জন, খান, গোটা'—এই কয়টির অনির্দেশক প্রত্যয়রূপে ব্যবহার লক্ষণীয়: যেমন,—'এক' রাজা ছিলেন। 'একটা' কথা বলি। 'দুটো' ভাত চাই। 'জনতিনেক' ছেলে। 'খানপাঁচেক' খাতা। 'গোটাকতক' আম।

অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত যে কোন পাঁচটির স্ত্রীলিংগের রূপ লিখ :—অশ্ব, বিদ্বান্, সম্রাট্, আচার্য, বাদশাহ, ঠাকুর, কবি, ডাক্তার, মহাত্মা, গুরু। ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫০

[দুই] নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে কোনও পাঁচটির লিংগ পরিবর্তন কর এবং বাক্যরচনা করিয়া উদাহরণ দাও :—পাচক, মহৎ, বিদ্বান্, সাধু, গরীয়ান্, সম্রাট্, মাতুল, কর্তা, কবি, কাপুরুষ। ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৩

[তিন] নিম্নলিখিত নির্দেশানুসারে পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা কর :—(ক) বিশেষ্যের দ্বিত্বের দ্বারা বহুবচন ; (খ) অনির্দিষ্ট বা সুনির্দিষ্ট ভাব বুঝাইতে পদাশ্রিত-নির্দেশক-সংযুক্ত সংখ্যাবাচক বিশেষণের ব্যবহার ; (গ) বিশেষণের দ্বিত্বের দ্বারা বিশেষ্যের বহুবচন। (ক. বি. বি এ. '৪৮)। বিভক্তি দ্বারা বহুবচন-প্রকাশ। [ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৩]

[চার] টি, টা, খানি, খানা, টুকু, টুকুন্, গাছি, গাছা প্রভৃতি নির্দেশাত্মক বা খণ্ডসূচক প্রত্যয়ের প্রয়োগের বিভিন্ন অর্থ ও উপলক্ষ্য উদাহরণ-সাহায্যে পরিস্ফুট কর। ক. বি. মাধ্যমিক '৫৩

[পাঁচ] 'টা', 'টি', 'খানা', 'খানি' প্রভৃতি নির্দেশ বা পরিমাণ-সূচক প্রত্যয়-গুলির বিভিন্নরূপ প্রয়োগ উদাহরণ-সহযোগে বুঝাইয়া দাও। ক. বি. বি. এ. '৫৪

[ছয়] নিম্নলিখিত যে কোনও পাঁচটির ব্যাখ্যা লিখ ও উদাহরণ দাও :—উভয় লিংগ (ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৪); নিত্য পুংলিংগ ; নিত্য স্ত্রীলিংগ ; অলিংগক শব্দ ; সমূহার্থে স্ত্রী-প্রত্যয় ; ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রী-প্রত্যয় ; তারিখার্থে স্ত্রী-প্রত্যয়।

[সাত] বহুবচন করিবার বেলায় নিম্নলিখিত প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দাবলীর প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ কর :—-রা, -দের, -গুলি, -গুলা, গণ, মণ্ডলী, সভা, লোক, মহল, দিগর, গ্রাম, দাম, বৃন্দ, রাজি, আবলী, নিচয়, সকল, অনেক, দূর, দেদার, প্রচুর, পত্র।

সপ্তম অধ্যায়

শব্দগঠন

বিশেষণের তারতম্য বা অতিশায়ন

সংস্কৃতের ন্যায় বাংলা ভাষায়, বিশেষত সাধু ভাষায়, দুয়ের মধ্যে তারতম্য দেখাইতে বিশেষণ শব্দের পরে '-তর' অথবা '-ঈয়স্' (-ঈয়সুন্) এবং বহুর মধ্যে তারতম্য দেখাইতে বিশেষণ শব্দের পর '-তম' অথবা '-ইষ্ঠ' (-ইষ্ঠন্) প্রত্যয় যোগ করা হয়: যেমন,—লঘু—লঘুতর, লঘীয়ান্—লঘুতর, লঘিষ্ঠ। বহু—বহুতর, ভূয়ান্—বহুতর, ভূয়িষ্ঠ। শ্রী (প্রশস্ত)—শ্রেয়ান্ (শ্রেয়ঃ)—শ্রেষ্ঠ। প্রিয়—প্রেয়ান্ (প্রেয়ঃ), প্রিয়তর—প্রেষ্ঠ, প্রিয়তম; বৃদ্ধ—বর্ষীয়ান, জ্যায়ান্—বর্ষিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ। যুবা—যবীয়ান্—যবিষ্ঠ। অল্প—কনীয়ান্—কনিষ্ঠ। স্বাদু—স্বাদীয়ঃ, স্বাদুতর—স্বাদিষ্ঠ, স্বাদুতম। গুরু—গরীয়ান্, গুরুতর—গরিষ্ঠ, গুরুতম। উরু—বরীয়ান্—বরিষ্ঠ। মহৎ—মহীয়ান্, মহত্তর—মহিষ্ঠ, মহত্তম। তবে একটি কথা। তারতম্যবোধক '-ঈয়স', '-ইষ্ঠ'—প্রত্যয় দুইটি বাংলায় প্রায়ই সাধারণ বিশেষণের ন্যায় প্রচলিত: যেমন,—সুন্দর স্বাদযুক্ত' অর্থে 'স্বাদিষ্ঠ', 'প্রভূত' অর্থে 'ভূয়সী', 'বলশালী' অর্থে 'বলিষ্ঠ', 'অগ্রজ' অর্থে 'জ্যেষ্ঠ', 'প্রিয়া স্ত্রী' অর্থে 'প্রেয়সী', 'মহৎ গুণবিশিষ্টা' অর্থে 'মহীয়সী', 'উৎকৃষ্ট' অর্থে 'শ্রেষ্ঠ' শব্দাদি ব্যবহৃত হয়। আবার কদাচিৎ ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, তারতম্যবোধক '-তর, -তম' প্রত্যয় দুইটিও তুলনা না বুঝাইয়া গুণাধিক্য বুঝায়: যেমন,—'ঘোরতর' (=অতীব ঘোর বা কঠিন) বিপদ; 'গুরুতর' (অতীব গুরু) সমস্যা; 'উত্তম' (খুব ভাল) ছেলে। ব্যাকরণমতে, 'শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম, কনিষ্ঠতম' যদিও ভুল, তবু বাংলায় ইহাদের প্রচলন আছে।

খাঁটি বাংলায় দুইটি ব্যক্তি বা পদার্থের মধ্যে তুলনাকালে 'হইতে', 'থেকে', 'চেয়ে', 'অপেক্ষা' প্রভৃতি শব্দকে বিশেষ্যের পরে বসাইয়া তারতম্য প্রদর্শিত হয়: যেমন—সোনার 'চেয়ে' হীরার দাম বেশী। পক্ষান্তরে, বহুর মধ্যে তারতম্য দেখাইবার ব্যাপারে 'সকল', 'সর্বাপেক্ষা', 'সব চেয়ে' প্রভৃতি শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহৃত হয়: যেমন,—বর্তমান বংগ-রংগালয়ে শিশিরকুমারই 'সব চেয়ে' বড় অভিনেতা।

অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত বিষয়টির ব্যাখ্যা কর ও উদাহরণ দাও:—বিশেষণের তারতম্য। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭

[দুই] নিম্নোদ্ধৃত প্রতিটি শব্দের দুই এবং বহুর মধ্যে তারতম্যবোধক শব্দাদি গঠন করিয়া বাক্য রচনা কর:—গুরু, বহু, শ্রী, প্রিয়, বৃদ্ধ, যুবা, অল্প।

[তিন] খাঁটি বাংলায় দুই বা ততোধিকের মধ্যে কি ভাবে তারতম্য দেখানো হয়? উদাহরণ দাও।

অষ্টম অধ্যায়

শব্দদ্বৈত

বাংলা ভাষায় একই শব্দ বা পদের দ্বিত্ব বা দ্বৈতরূপক প্রয়োগে বিভিন্ন অর্থের প্রকাশ হয়। এই শব্দদ্বৈত দ্বন্দ্বসমাসের পর্যায়ভুক্ত নয়। শব্দদ্বৈত তিন রকমে গঠিত হইয়া থাকে : **প্রথমত,** একই শব্দের পুনরাবৃত্তিযোগে : যেমন,—'চোখে-চোখে, শীত-শীত'; **দ্বিতীয়ত,** একই শব্দের সহিত সমার্থক বা অনুরূপ অর্থ-সমন্বিত অপর এক শব্দযোগে : যেমন,—'জন-মানব; গা-গতর'। **তৃতীয়ত,** অনুকার বা বিকারজাত শব্দযোগে : যেমন,—'হুপ্-হাপ্; চিপ-চাপ্'।

শব্দদ্বৈতাদির প্রয়োগ ও অর্থ

(ক) পুনরাবৃত্তি, পৌনঃপুন্য বা বাহুল্য বুঝাইতে শব্দদ্বৈত হয় : যেমন,—'বছর-বছর, ধামা-ধামা; মুঠা-মুঠা; হাঁড়ি-হাঁড়ি; বাড়ি-বাড়ি'; যজ্ঞি-বাড়ীতে 'হাতে-হাতে' কাজ না করিলে কাজ এগোয় না।

(খ) সাদৃশ্য, ঈষৎ অল্পতা, মৃদুতা বুঝাইতে শব্দদ্বৈত হয় : যেমন,—'জ্বর-জ্বর' (ভাব); 'শীত-শীত' (ভাব) করিতেছে; 'হাসি-হাসি' মুখ; 'কাঁদ-কাঁদ' (ভাব); 'গরম-গরম' (ঈষৎ অল্পতা) খাওয়া উচিত।

(গ) দ্বিধা, আগ্রহ, আকুলতা, ইচ্ছা বুঝাইতে শব্দদ্বৈত হয় : যেমন—'মানে-মানে' এখান থেকে যেতে পারলেই বাঁচি (দ্বিধা-প্রকাশক)। পূজার বন্ধের পূর্বে প্রবাসী ছাত্রদের মন 'বাড়ি-বাড়ি' করে (আগ্রহ ও ব্যাকুলতা-প্রকাশক)। প্রেক্ষাগৃহ হইতে 'উঠি-উঠি' করিয়াও উঠিতে পারিলাম না (ইচ্ছাপ্রকাশক)। 'টাকা-টাকা' করিয়া রাম পাগল হইয়াছে (আগ্রহ ও ব্যাকুলতা-প্রকাশক)।

(ঘ) সম্পূর্ণতা বুঝাইতে বিভিন্ন শব্দযোগে শব্দদ্বৈত হয় : যেমন,—'গা-গতর; ভেবে-চিন্তে; করে-কম্মে; পূজা-আচ্চা; মাথা-মুণ্ডু; বিদেশ-বিভূঁই; লজ্জা-সরম'।

(ঙ) ইত্যাদি অর্থে শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ হইয়া থাকে : যেমন,—'রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া; হাঁড়ি-কুঁড়ি; রাজা-রাজড়া'। **মন্তব্য :** 'ইত্যাদি' অর্থবোধক শব্দদ্বৈতের অর্থের সংকোচ, প্রসারণ প্রভৃতি নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে : যেমন,—(১) **অর্থের সংকোচ**—'কাজ-ফাজ; ভাত-ফাত; তাস-ফাস; লুচি-ফুচি; মাছ-ফাচ; ভূত-ফুত'। এখানে **ফ-যোগে অবজ্ঞা** বুঝাইতেছে। (২) **অর্থের প্রসারণ**—'কাজ-টাজ; ভাত-টাত; তাস-টাস; লুচি-টুচি; মাছ-টাচ, ভূত-টুত'। এখানে **ট-যোগে সাধারণ ভাবে শব্দের প্রসার** তথা 'অনুরূপ বস্তু'

বুঝাইতেছে। (৩) **অর্থের আমূল পরিবর্তন**—'লুচি-মুচি ; তেল-মেল'। এখানে **ম-যোগে অপ্রীতি বা রুক্ষতার ভাব বুঝাইতেছে।**

(চ) ব্যতিহার অর্থাৎ পারস্পরিক ভাব বুঝাইতে শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ হয়: যেমন,—'পিঠা-পিঠি' ভাই ; কথা 'চালা-চালি' ; 'খেও-খেই ; মারা-মারি ; ঝোলা-ঝুলি'।

(ছ) বিশেষ্য, বিশেষণ পদকে দ্বিত্ব করিয়া বিশেষ্যের বহুবচন বুঝানো যায়: যেমন,—'হাঁড়ি-হাঁড়ি' সন্দেশ ; 'লাল-লাল' ঘোড়া ; 'ছোট-ছোট' মাছ। (জ) ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, এই অর্থে ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব লক্ষণীয়: যেমন,—'খাইতে খাইতে' কথা বলিলে বা হাসিলে বিষম লাগে। 'দেখ্‌তে দেখতে' অধ্যাপনায় একটি যুগ কেটে গেল। 'শুযে শুয়ে' বাতে ধরবে। (ঝ) বিশেষ্য, বিশেষণ পদের দ্বিত্ব করিয়া উহাদের ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে ব্যবহারও লক্ষণীয়: যেমন—'দিনে দিনে' হচ্ছে বেশ। বাতাস 'মন্দ-মন্দ' বহিতেছিল। **মন্তব্য:** এই অনুচ্ছেদে যে দ্বিরুক্তিগুলি আছে, তাহাদিগকে সাধারণভাবে 'শব্দদ্বৈত' বলা হয়। কিন্তু এই দ্বিরুক্তিগুলির বিশেষ প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদিগকে **পদদ্বৈত** বলাও চলে।

(ঞ) অনুকার-ধ্বনিতে শব্দদ্বৈত খুবই ঘটে: যেমন,—'ঝনাঝন ; কচর-মচর ; দুড-দাড়>দুদ্দাড় ; ফিট্-ফাট্ ; ভুজং-ভাজং, শুখনা-শাখনা, খোঁচ-খাঁচ, নজ-গজ ; আবুড়া-খাবুড়া (এবড়ো-খেবড়ো) ; আঁকু-পাঁকু ; কট্-কট্ ; টন্-টন্ ; বক্-বক্ ; খাঁ-খাঁ'। ধ্বনির অনুকরণে উদ্ভূত বলিয়া ইহাদিগকে **ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত** বলা যায়।

অনুশীলনী

[এক] শব্দদ্বৈত কিরূপে গঠিত হয়? পদদ্বৈত হইতে ইহার পার্থক্য কিরূপ? শব্দদ্বৈত যে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, তাহার উদাহরণ দাও? রা. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৬

[দুই] পদদ্বৈত, শব্দদ্বৈত এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত—ইহাদের পার্থক্য উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৩

[তিন] নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের উদাহরণ-সহযোগে অর্থ নির্দেশ কর:—(ক) বিশেষণের দ্বিত্বের দ্বারা বিশেষ্যের বহুবচন (ক. বি. বি. এ. '৪৮) ; (খ) অসম্পূর্ণ ক্রিয়া বুঝাইতে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব (ক. বি. বি. এ. '৪৯) ; (গ) ঈষৎ অর্থে শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ ও দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুবচন প্রকাশ [ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৩]

[চার] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটিতে সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দের পুনরাবৃত্তির বিশেষ অর্থ বুঝাইয়া দাও:—তুলতুলে, কাঁদ-কাঁদ, রাজা-রাজড়া, খাঁ-খাঁ, পূজা-আচ্চা, টাকা-টাকা (করিয়া পাগল হইয়াছে), শীত-শীত (করিতেছে), গরম-গরম (খাওয়া উচিত), সকাল-সকাল (শুইবে), শুয়ে-শুয়ে (বাতে ধরবে)।

ক. বি. মাধ্যমিক '৫৩

তৃতীয় পর্ব—শব্দার্থ-প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

শব্দার্থপরিচয়

শব্দার্থের শ্রেণীবিভাগ
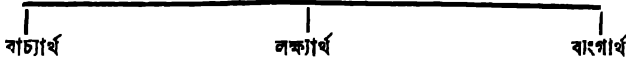
অর্থসম্পন্ন বা **সার্থক শব্দ** তিন রকমের হয়: যথা—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যংগার্থ। (ক) যে শব্দ উচ্চারিত হওয়ামাত্র সুবিদিত প্রচলিত অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই শব্দের **বাচ্যার্থ, মুখ্যার্থ** বা **শক্যার্থ**: যেমন,—'বৃক্ষ, মানুষ, জল' ইত্যাদি। (খ) যেখানে শব্দের **মুখ্য অর্থের বদলে তৎসংশ্লিষ্ট** অন্য অর্থ বক্তার অভিপ্রেত হয়, সেখানে শব্দের **লক্ষ্যার্থ** সূচিত হয়: যেমন,—হরেনের মাথায় 'গোবর-ভরা'। বলা বাহুল্য, হরেন যখন মানুষ, তখন তাহার মাথায় গোরুর শ্লেষ্মময় দুর্গন্ধ মলমূত্র তথা গোবরের উৎপত্তি ঘটিতেই পারে না। তাহা ছাড়া, গোরুরও মাথায় গোবর থাকে না। সুতরাং এহেন কল্পনা সাধারণ দৃষ্টিতে অর্থহীন। কিন্তু বক্তা 'গোবর' শব্দ প্রয়োগ করিয়া হরেনের মাথায় 'ধারণাশক্তির অভাব'কে নির্দেশিত করিতেছে। এখানে 'গোবর' মুখ্যার্থ প্রকাশ না করিয়া লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করিতেছে। (গ) যেখানে শব্দের বাচ্যার্থ অথবা লক্ষ্যার্থ ধরিয়া বাক্যের অর্থবোধ হয় না, বরং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন অর্থ সূচিত হয়, সেখানে শব্দের বিরূপ অর্থ ধরিতে হয়—ইহাই শব্দের **ব্যংগার্থ**: যেমন—, সে 'পটোল তুলিয়াছে'। এখানে 'পটোল তোলার' ব্যংগার্থ 'মৃত্যু হওয়া'।

শব্দার্থের পরিবর্তন-লীলা

ভাষায় এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহাদের প্রচলিত অর্থের সহিত ব্যুৎপত্তিগত তথা মূল অর্থের কোন সম্বন্ধ নাই। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, শব্দাদির কোথাও-বা অর্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ, কোথাও-বা অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ, কোথাও-বা অর্থের প্রসার, কোথাও-বা অর্থের সংকোচ আবার কোথাও-বা অর্থের আমূল পরিবর্তনই ঘটিয়াছে।

অর্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ

মূল অর্থ পরিহার করিয়া কোন শব্দের অর্থগৌরব দেখা দিলে শব্দার্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ হয়: যেমন,—বাধিত—পীড়িত (মূল অর্থ); কৃতজ্ঞ (প্রচলিত অর্থ)। সম্ভ্রম—ভ্রান্তি (মূল অর্থ); মর্যাদা (প্রচলিত অর্থ)। মন্দির—গৃহ (মূল অর্থ); দেবালয় (প্রচলিত অর্থ)। ধ্যান—চিন্তা (মূল অর্থ); পরমার্থ-চিন্তা (প্রচলিত অর্থ)। মান—পরিমাপ (মূল অর্থ); সম্মান (প্রচলিত অর্থ)। সংকীর্তন—গুণাদি কথন (মূল অর্থ); শ্রীহরির মাহাত্ম্যগান (প্রচলিত অর্থ)। সাহস—হঠকারিতা, বলপূর্বক কৃত দুষ্কর্ম (মূল অর্থ): বিপদসংকুল কর্মে নির্ভয় উদ্যম (প্রচলিত অর্থ)। 'মন্দির', 'ধ্যান' ও 'সংকীর্তন'—এই শব্দত্রয়ের অর্থের উৎকর্ষের সংগে সংকোচও ঘটিয়াছে।

অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ

মূল অর্থ পরিহার করিয়া কোন শব্দের অর্থের অগৌরব বা হীনতা দেখা দিলে শব্দার্থের অবনতি বা অপকর্ষ হয়: যেমন,—ইতর—অপর লোক (মূল অর্থ); ছোট লোক (প্রচলিত অর্থ)। মহাজন—মহাপুরুষ (মূল অর্থ); উত্তমর্ণ, বণিক্ (প্রচলিত অর্থ)। ঠাকুর—গুরু, দেবতা (মূল অর্থ); পাচক ব্রাহ্মণ (প্রচলিত অর্থ)। অর্বাচীন—পরবর্তী, অপ্রাচীন (মূল অর্থ), আনাড়ী, অনভিজ্ঞ, অপরিণত-বুদ্ধি (প্রচলিত অর্থ)। রাগ—রঙ, প্রীতি, অনুরাগ (মূল অর্থ); ক্রোধ (প্রচলিত অর্থ)। ঝি—কন্যা (মূল অর্থ); চাকরানী (প্রচলিত অর্থ)। সাধু—ধার্মিক, সৎ (মূল অর্থ); বণিক্ (প্রচলিত অর্থ)। বৈরাগী—সংসারে অনাসক্ত (মূল অর্থ); বৈষ্ণব ভিক্ষু (প্রচলিত অর্থ)।

অর্থের প্রসার

কোন কোন সংস্কৃত শব্দ মূলগত সংকুচিত বিশেষ অর্থটি না বুঝাইয়া বাংলায় সামান্য অর্থাৎ ব্যাপক অর্থটি বুঝায় আর ইহাই প্রচলিত অর্থ: যেমন,—ফলাহার—ফল ভক্ষণ (মূল অর্থ); মিষ্টান্নাদি আহার (প্রচলিত অর্থ)। কালি—কালো রঙ (মূল অর্থ); লাল কালি, সবুজ কালি, নীল কালি ইত্যাদি যে কোন রঙ (প্রচলিত অর্থ)। তৈল—তিল হইতে জাত স্নেহপদার্থ (মূল অর্থ); রেড়ির তৈল, নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল ইত্যাদি যে কোন স্নেহপদার্থ (প্রচলিত অর্থ)। বাঁশি—বংশনির্মিত ফুৎকার-বাদ্যযন্ত্রবিশেষ (মূল অর্থ); যে কোন ফুৎকার-বাদ্যযন্ত্র (প্রচলিত অর্থ)। গৌরচন্দ্রিকা—কীর্তনগানের পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনাজ্ঞাপক পদবিশেষ (মূল অর্থ); যে কোন বিষয়ের অবতরণিকা (প্রচলিত অর্থ)। পরশু—এই বাংলা শব্দটি সংস্কৃত 'পরশ্বঃ' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই সংস্কৃত শব্দটির মূল অর্থ 'আগামী কল্যের পর দিন', কিন্তু বাংলায় এই অর্থটি ছাড়াও 'গত কালের পূর্ব দিন' অর্থে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

গাঙ্—এই বাংলা শব্দটি সংস্কৃত 'গংগা' শব্দ হইতে উদ্ভূত। এই সংস্কৃত শব্দটির মূল অর্থ 'গংগা নামে নদী'; কিন্তু বাংলায় ইহা 'নদীমাত্র'কেই বুঝায়।

অর্থের সংকোচ

কোন কোন সংস্কৃত শব্দ মূলগত সামান্য অর্থাৎ ব্যাপক অর্থ না বুঝাইয়া বাংলায় সংকুচিত বিশেষ অর্থটি বুঝায় আর ইহাই প্রচলিত অর্থ: যেমন,—সম্বন্ধী—যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে (মূল অর্থ); শ্যালক (প্রচলিত অর্থ)। পংকজ—পংকে যাহা জাত (মূল অর্থ); পদ্ম (প্রচলিত অর্থ)। মিছরী—মিসর দেশের জিনিস (মূল অর্থ); শর্করাখণ্ড (প্রচলিত অর্থ)। অন্ন—যাহা খাওয়া হয় (মূল অর্থ); ভাত (প্রচলিত অর্থ)। মহোৎসব—বড় উৎসব (মূল অর্থ); বৈষ্ণব উৎসববিশেষ অর্থাৎ মোচ্ছব (প্রচলিত অর্থ)। ক্ষীর—দুগ্ধ (মূল অর্থ); ঘনায়িত দুগ্ধ (প্রচলিত অর্থ)। পানি—যে কোন রকমের পেয় বস্তু (মূল অর্থ); জল (প্রচলিত অর্থ)। বৈবাহিক—বিবাহ-সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তি (মূল অর্থ); জামাতার বা পুত্রবধূর পিতা (প্রচলিত অর্থ)। করী—কর আছে যাহার (মূল অর্থ); হস্তী (প্রচলিত অর্থ)।

অর্থের আমূল পরিবর্তন

বাংলায় সংস্কৃত শব্দের অর্থের উন্নতি, অবনতি, প্রসার বা সংকোচ, ইহাদের মধ্যে কোনটিই ঘটে নাই অথচ অর্থের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এমন বহু উদাহরণ মিলে: যেমন,—সন্দেশ—সংবাদ (মূল অর্থ); মিষ্টান্নবিশেষ (প্রচলিত অর্থ)। প্রসাদ—অনুগ্রহ (মূল অর্থ); ভুক্তদ্রব্যের অবশেষ, নিবেদিত ভোজ্য বস্তু (প্রচলিত অর্থ)। তত্ত্ব—খবর (মূল অর্থ); কুটুম্ববাড়িতে প্রেরিত নানাবিধ উপঢৌকন-দ্রব্য (প্রচলিত অর্থ)। ঘর্ম—গরম (মূল অর্থ); ঘাম, স্বেদ (প্রচলিত অর্থ)। কৃপণ—কৃপার পাত্র (মূল অর্থ); ব্যয়কুণ্ঠ (প্রচলিত অর্থ)। তিরস্কার—অদৃশ্য হওয়া (মূল অর্থ), ভর্ৎসনা (প্রচলিত অর্থ)। আবার ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, (১) লক্ষণার দ্বারা অর্থের আমূল পরিবর্তন ঘটে: যেমন,—'পুলক' শব্দের অর্থ 'রোমাঞ্চ'; কিন্তু লক্ষণার দ্বারা এই শব্দ 'আনন্দ'কেও বুঝায়। (২) ব্যঞ্জনার দ্বারাও অর্থের আমূল পরিবর্তন ঘটে: যেমন,—'গুরু-গোঁসাই', 'ধুরন্ধর'। (৩) বিশিষ্টার্থক পদেও শব্দের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে: যেমন,—'তীর্থের কাক', 'ধামা-ধরা' 'ঘরের ঢেঁকি' ইত্যাদি।

শব্দার্থের এই পরিবর্তনলীলা পরবর্তী উদাহরণাদিতেও পরিলক্ষিত হইবে। প্রতিটি শব্দের প্রথম অর্থটি মূলগত তথা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং দ্বিতীয় অর্থটি বাংলায় প্রচলিত অর্থ: যেমন,—

অনটন—(১) ভ্রমণাভাব ; (২) অভাব।
অনিবার—(১) অনিবার্য ; (২) সতত।
অনুপপত্তি—(১) প্রমেয়ের অসিদ্ধি ; (২) অভাব।
অনুবাদ—(১) পশ্চাৎ ভাষণ ; (২) ভাষান্তরীকরণ।
অপর্যাপ্ত—(১) অল্প ; (২) প্রচুর।
অপ্রতুল—(১) অসম ; (২) অভাব।
অবকাশ—(১) অন্তর (ফাঁক) ; (২) অবসর, ছুটি।
অবদান—(১) পূজা বা অর্চনার্থ দান ; (২) দান।
অসুখ—(১) দুঃখ ; (২) রোগ।
আংগিক—(১) অংগ-সম্বন্ধীয় অভিনয়ের প্রকার, (২) গঠন-প্রণালী, প্রমূর্তি।
আক্রোশ—(১) শব্দ ; (২) ক্রোধ।
আজি—(১) যুদ্ধ ; (২) অদ্য।
আতর—(১) তরপণ্য, (২) সুগন্ধি দ্রব্য।
আদায়—(১) লইয়া (গৃহীত্বা), (২) পাওয়া।
আপ্যায়িত—(১) বর্ধিত ; (২) তৃপ্ত।
আম—(১) অপক্ব ; (২) ফলবিশেষ।
আমাশয়—(১) অন্ত্রের অংশ ; (২) রোগবিশেষ।
আরতি—(১) ক্রীড়া, তৃপ্তি, (২) নীরাজনাবিধি।
ইতি—(১) এই, (২) পত্রাদির সমাপ্তিসূচক বাক্য।
উচ্ছিষ্ট—(১) অবশিষ্ট, (২) এঁটো।
উদ্দেশ্য—(১) উপায়, পথ ; (২) খোঁজ-খবর।
উদ্বেল—(১) বেলাভূমিকে অতিক্রম করিয়াছে যে ঢেউ ; (২) ব্যাকুল।
উন্মাদ—(১) রোগবিশেষ ; (২) উন্মত্ত ব্যক্তি।
উপন্যাস—(১) বাক্যোপস্থাপন ; (২) নভেল সাহিত্যগ্রন্থ।
এবং—(১) এইরূপ ; (২) ও, আরও।
কপাল—(১) মাথার খুলি, শরা ; (২) ললাট।
কম—(১) কমনীয় ; (২) অল্প।
কবচ—(১) বর্ম, ধারণীয় মন্ত্রাদি, (২) দাখিলার কবচ, মাদুলি।
কলম—(১) শর, খাগ ; (২) লেখনী।
কলা—(১) বিদ্যা ; (২) ফলবিশেষ।
কল্য—(১) প্রত্যূষকাল ; (২) আগামী দিবস।
কুক্ষি—(১) উদর, বাহুমূল, (২) বাহুমূল।
গবাক্ষ—(১) গোরুর চোখ ; (২) জানালা।
গোষ্ঠী—(১) যেখানে অনেক গোরু থাকে ; (২) সমূহ
গব্য—(১) গো-সম্বন্ধীয় ; (২) দড়ি।
ঘটা—(১) সমূহ ; (২) উৎসব।
ঘাট—(১) অংগবিশেষ ; (২) জলাবতরণের জন্য সোপানাদি।
চাপ—(১) ধনু ; (২) ভার দেওয়া।
ছবি—(১) কান্তি ; (২) আলেখ্য।
জন্তু—(১) প্রাণী ; (২) পশু।
টীকা—(১) গ্রন্থের ব্যাখ্যা ; (২) দাহ্য বস্তুবিশেষ।
দম—(১) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, (২) শ্বাস।
দর (১)—ভয় ; (২) মূল্য।
দল—(১) পত্র ; (২) বর্গ বা সমূহ।
দায়—(১) পৈতৃক সম্পত্তি, (২) ঠেকা, বাধা।
দাম—(১) রজ্জু বা মাল্য ; (২) মূল্য।
দারুণ—(১) দারুনির্মিত, (২) অত্যন্ত কঠিন।
দুরন্ত—(১) যাহার পরিণাম মন্দ ; (২) দুর্বৃত্ত।
ধন্য—(১) ধনশালী ; (২) সর্বসৌভাগ্যবান।
ধুনী—(১) নদী ; (২) অগ্নিকুণ্ড।
ধূম—(১) অগ্নির ধূম ; (২) উৎসব।
নাক—(১) স্বর্গ, (২) নাসিকা।
নাগর—(১) নগরের লোক, (২) অবৈধ প্রণয়ী।
নায়ক—(১) পরিচালক, (২) নাটকের প্রধান ব্যক্তি
নিরীহ—(১) অচেষ্ট, নিশ্চেষ্ট, নিষ্কাম ; (২) নির্বিরোধী, শান্ত।
পশ্চিম—(১) দিগ্‌বিশেষ, শেষ ; (২) দিগ্‌বিশেষ।
পাষণ্ড—(১) ধর্মসম্প্রদায় ; (২) ধর্মজ্ঞানহীন, অত্যাচারী।
প্রমাদ—(১) ভুল, (২) বিপদ।
প্রস্তুত—(১) আরব্ধ, উপস্থিত ; (২) তৈয়ারী।
পাতা—(১) পালক ; (২) পত্র।
বনস্পতি—(১) বনের পতি, (২) বৃহৎ।
বর—(১) কন্যানির্বাচনকারী ; (২) বিবাহার্থী, স্বামী।
বলি—(১) উপচার, চর্মসংকোচ ; (২) পশুবধ।
বর্ষ—(১) বর্ষাকাল, (২) বৎসর।
বালিশ—(১) মূর্খ ; (২) উপাধান।
বিরক্ত—(১) অননুরক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত ; (২) অসন্তুষ্ট।
বিবাহ—(১) একেবারে বহন করিয়া অর্থাৎ অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া ; (২) পরিণয়।

ভান—(১) জ্ঞান ; (২) ছল।
মদ—(১) গর্ব ; (২) মন্ত।
মধুর—(১) মধুযুক্ত ; (২) রমণীয়, চমৎকার।
মায়া—(১) ইন্দ্রজালবিদ্যা ; (২) স্নেহ, মমতা।
যথেষ্ট—ইচ্ছানুরূপ ; (২) প্রচুর।
যবনিকা-পতন—(১) নাট্যাংক বা গর্ভাংকের অভিনয়ান্তে পটক্ষেপ ; (২) নাট্যাভিনয়ের সমাপ্তিবোধক পটক্ষেপ।
লক্ষ্মী—(১) দেবীবিশেষ ; (২) শান্তশিষ্ট।
লাবণ্য—(১) লবণত্ব ; (২) কান্তি।
লৌকিকতা—(১)লৌকিক ব্যবহার ; (২) উপহার।
বাজী—(১) অশ্ব ; (২) অগ্নিক্রীড়া।
বাণ—(১) শর , (২) বন্যা।
বালা—(১) বালিকা ; (২) অলংকারবিশেষ।
বিরাট—(১) আদি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার রূপবিশেষ ; (২) বৃহৎ।
ব্যবসায়—(১) চেষ্টা ; (২) বাণিজ্য।
শরৎ—(১) শীতকাল ; (২) ঋতুবিশেষ।
শরাব—(১) শরা ; (২) মন্ত।
শক্ত—(১) সমর্থ ; (২) কঠিন।
শাস্তি—(১) শাসন করে (শাস্+তি) ; (২) দণ্ড।
শ্বশুর, শ্বশ্রূ—(১) পতির পিতা, মাতা ; (২) পতি বা পত্নীর পিতা, মাতা।
সমারোহ—(১) সম্যক্ আরোহণ ; (২) উৎসব।
সন্ধান—(১) যুক্ত করা ; (২) খোঁজ-খবর।
সম্ভ্রান্ত—(১) বিচলিত, ভীত ; (২) মাননীয়।
সুতরাং—(১) অতিশয় ; (২) অতএব।
স্তম্ভিত—(১) স্তম্ভত্বপ্রাপ্ত ; (২) বিস্মিত।
সহসা, হঠাৎ }—(১) সবলে ; (২) আকস্মিকভাবে।

অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত শব্দগুলির ভিতর হইতে যে কোনও চারিটি শব্দ বাছিয়া লইয়া বাংলায় তাহাদের ব্যবহারে কি ভাবে অর্থ-সংকোচন, অর্থ-প্রসারণ বা অর্থ-পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা কর :—আংগিক, অবদান, ইতর, রাগ, ছবি, ইতি, সুতরাং, যবনিকা-পতন। ক. বি. বি. এ. '৫২

[দুই] 'তুমি এ বিষয়ে কোন উচ্চ-বাচ্য করিও না'—এই বাক্যটিতে 'উচ্চ-বাচ্য' কথাটির মূলগত অর্থের সহিত ব্যবহারগত অর্থের কি সম্বন্ধ বুঝাইয়া দাও। (উত্তর—'উচ্চ-বাচ্য' কথাটির মূলে আছে সংস্কৃত 'উচ্চাবচ' শব্দটি। উহার অর্থ—'উচ্চনীচ ; ভালমন্দ ; বিবিধ ; অসমান'। কিন্তু বাংলায় উহার অর্থ—'ভালমন্দ ; ভাল বা মন্দ ; কোন কথার উত্থাপন ; কথাটি মাত্র ; কোন সাড়া শব্দ।' আবার 'উচ্চ' ও 'বাচ্য', এই দুইটি বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দকে একযোগে জুড়িয়া অর্থ পাওয়া যায়—'যাহা উচ্চৈঃস্বরে বা জোরে বলিবার যোগ্য তাহাই উচ্চ-বাচ্য'। কিন্তু বাংলায় এরূপ অর্থ অচল। 'উচ্চ-বাচ্য না করা' মানে 'কোন বিষয়ে প্রশ্ন প্রতিবাদ বা হাঁ-না ভালমন্দ কিছুই না বলা'—ইহাই বাংলায় প্রচলিত অর্থ)। ক. বি. মাধ্যমিক '৫১

[তিন] 'বিরক্ত' ও 'নিরীহ', এই দুইটি পদের বাঙলা ভাষায় প্রয়োগে সংস্কৃত হইতে কিরূপ অর্থবিভেদ ঘটিয়াছে, তাহা দেখাও। ক. বি. মাধ্যমিক (বিশেষ) '৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভিন্নার্থক শব্দ

অংক—(১) নাটকের অংশবিশেষ—কোন কোন সমালোচকের মতে, দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের চতুর্থ 'অংকে'র পরই যবনিকা-পতন হওয়া উচিত (২) গণিত—'অংক'-শাস্ত্রে রামানুজম্ সুপণ্ডিত ছিলেন। (৩) ক্রোড়—মাতৃ-'অংকে' শিশুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। (৪) চিহ্ন, রেখা—পালামৌতে যাইবার পথে সঞ্জীবচন্দ্র বরাকরনদীর পূর্বপার হইতে দেখিলেন যে, অপরপারে জনৈক চাপরাসী পারার্থীদের বাহুতে গৈরিক মৃত্তিকা-দ্বারা কি যেন 'অংক'পাত করিতেছিল।

অর্থ—(১) মানে—রসবোধ না থাকিলে রবীন্দ্রকাব্যের 'অর্থ'ভেদ অসম্ভব। (২) টাকাকড়ি—মানুষের জীবনে 'অর্থ'ই যখন বড় হয়, তখন সে হারায় মনুষ্যত্ব।

উত্তর—(১) ব্যক্তিবিশেষের নাম—বিরাটরাজার পুত্র 'উত্তর' অতিশয় রণনিপুণ ছিলেন না। (২) অসামান্য—মহাত্মাজীর 'লোকোত্তর' চরিত্রের প্রভাবে অনেকেই প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। (৩) ভবিষ্যৎ—বালকটি 'উত্তর'জীবনে শস্ত্র-চালনায় নিপুণ হইবে। (৪) পরবর্তী—'রবীন্দ্রোত্তর' যুগে বাংলা সাহিত্যে কাব্যরচনা করিয়া কীর্তিলাভ করা বড়ই কঠিন। (৫) জবাব—এই দুরূহ প্রশ্নের 'উত্তর' কয়জনেই-বা দিতে পারে? (৬) দিগ্‌বিশেষ—ভারতের 'উত্তরে' আছে গিরিরাজ হিমালয়।

কড়া—(১) নির্মম, কঠোর—'কড়া' অভিভাবকের 'কড়া' কথা সব সময়ে সুফল প্রসব করে না। (২) ঘর্ষণজাত দাগ—জুতা পরিতে পরিতে পায়ে 'কড়া' পড়িয়া যায়। (৩) কপর্দক—হরিহরবাবুর মৃত্যুর পরে দেখা গেল যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীপুত্রের জন্য এক 'কড়া' সম্বলও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। (৪) রন্ধনপাত্রবিশেষ—ছোট 'কড়া'য় দুধ জ্বাল দিতে পার। (৫) বালার মত হাতল—বাহিরে যাইবার পূর্বে দরজার 'কড়া'য় তালাটি দিও।

কড়ি—(১) কপর্দক—বিদেশভ্রমণকালে সংগে টাকা-'কড়ি' রাখিলেও বিপদ, না রাখিলেও বিপত্তি। (২) ছাদ রাখিবার জন্য লম্বা কাঠ বা লোহা—অতি পুরাতন কাঠের 'কড়ি'তে ঘুণ ধরিয়া থাকে।

কথা—(১) প্রতিশ্রুতি—আমি যখন 'কথা' দিয়াছি, তখন এই কাজ করিবই। (২) অনুরোধ—ভয় হয়, পাছে যদি তুমি আমার 'কথা' না রাখ। (৩) গল্প, উপাখ্যান—'কথা'সাহিত্যে শরৎচন্দ্র অমর হইয়া থাকিবেন। (৪) অভিপ্রায়, চিন্তা—মনের 'কথা' একবার খুলেই বল। (৫) প্রবাদ—'কথা'য় বলে তিন কাল গিয়ে

এককালে ঠেকেছে, এখনও তার মরণের ভয়! (৬) প্রসংগ—বিবাহের 'কথা' উঠিতেই মঞ্জুশ্রী লজ্জায় জবাফুলের ন্যায় রাঙা হইয়া উঠিল। (৭) আলোচনা—অপরের 'কথা'য় থাকিতে নাই।

কর্ম—(১) কার্য—'কর্মে'র দ্বারা কর্মীর খাঁটি বিচার করা যায় না। (২) পেশা—প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেরা কুল'কর্ম' করিয়াই জীবিকানির্বাহ করিতেন। (৩) অনুষ্ঠান—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আশুতোষ হিন্দুর ক্রিয়া-'কর্মে' শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। (৪) প্রাক্তন—ইহজন্মে, এমন কি জন্মান্তরেও, 'কর্মের' ভোগ ভুগিতে হয়।

কর—(১) কিরণ—রবি'কর'স্পর্শে ঘুমন্ত প্রকৃতি যেন জাগিয়া উঠিল। (২) হস্ত—সেবাপরায়ণা জননীব 'কর'স্পর্শে রুগ্ন শয্যাশায়ী সন্তানের অন্তর ভরিয়া যায়। (৩) শুল্ক—প্রাক্-স্বাধীন ভারতের বিক্রয়'কর' এই স্বাধীন ভারতেও অধিকতর প্রতাপের সহিত চলিয়াছে।

কাণ্ড—(১) স্থূল জ্ঞান—'কাণ্ড'জ্ঞান থাকিলে কি আর ছাত্র শিক্ষকের সম্মুখে ধূমপান করে! (২) অধ্যায়, সর্গ—সপ্ত'কাণ্ড' রামায়ণ পড়িবার পরেও সীতাহরণ-কাহিনী যথাযথভাবে বিবৃত করিতে পারিতেছ না। (৩) গাছের গুঁড়ি—অদূরবর্তী অশ্বত্থ'কাণ্ডে' একটি বিষধর সর্প জড়াইয়া আছে। (৪) বিষম ব্যাপার—তর্কাতর্কি, হাতাহাতি, পরিশেষে খুনোখুনি 'কাণ্ড' শিক্ষিত লোকেই করিয়া বসিল!

গজ—(১) দাবাখেলার বলবিশেষ—'গজে'র কিস্তিতে সে তাহার প্রতিপক্ষকে মাৎ করিল। (২) হস্তী—নবজামাতা 'গজ'গমনে শ্বশুরালয়ে চলিলেন। (৩) মাপবিশেষ—আমার জামা তৈয়ার করিতে সাড়ে তিন 'গজ' কাপড় লাগে।

গুণ—(১) দড়ি, কাছি—নদীর আর একটি বাঁক অবধি মাঝিরা নৌকার 'গুণ' টানিয়া চলিল। (২) বার—তাহার সম্পত্তির আয় আমার সম্পত্তির আয় অপেক্ষা বিশ 'গুণ' বেশী। (৩) উপকার, ফায়দা—বিত্তশীল ব্যক্তির সন্তান সময়ে সময়ে শিক্ষার 'গুণ' বুঝিতে পারে না। (৪) যাদু, তুক্—ডাইনী বুড়ী 'গুণ' করিয়া কোলের শিশুটিকে কংকালসার করিয়া ফেলিল। (৫) ফলোৎপাদিকা শক্তি—ঔষধটির এমনই 'গুণ' যে পান করিবামাত্রই তাহার জ্বর চলিয়া গেল। (৬) ধর্ম—প্রাচীনারা দ্রব্য'গুণ' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। (৭) অলংকারশাস্ত্রে কথিত প্রসাদ, মাধুর্য, ওজঃ গুণবিশেষ—শরৎচন্দ্রের রচনারীতিতে প্রসাদ 'গুণ' বিদ্যমান।

ঘন—(১) মেঘ—বর্ষার আকাশ 'ঘন'ঘটায় ছাইয়া থাকে। (২) অল্প-সময়ের ব্যবধানবোধক—'ঘন ঘন' বাড়ি গেলে চাকুরী রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। (৩) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের ভাব—এই প্রস্তরবেদীর 'ঘন'ফল কত হইতে পারে? (৪) নিবিড়—

নবকুমার 'ঘন' অরণ্যের সমীপবর্তী হইলেন। (৫) গাঢ়—দুধ 'ঘন' করিয়া রাবড়ী প্রস্তুত করা হয়।

চাল—(১) চাউল—কলে-ছাঁটা 'চাল' স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী। (২) ফন্দি—যাহারা 'চাল' চালে, একদিন তাহাদের স্বরূপ বাহির হইয়া পড়েই। (৩) প্রতিমার পিছনের পট—এবারে কুমারটুলির দুর্গাপ্রতিমার 'চাল'চিত্রটিই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। জীবনযাত্রার রীতি—পিতৃবিয়োগের পরে নবাবী 'চালে' চলিয়া সে পথের ভিখারী হইল।

ছল—(১) প্রতারণা—'ছলে'বলে রমেন তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্পত্তি গ্রাস করিয়া বসিল। (২) ব্যপদেশ—'ক্রীড়াচ্ছলে' রসিদ রমেনের পা ভাঙিয়া দিল। (৩) কপট—'ছল' শ্রীকৃষ্ণের ছলনা পুরাণ-প্রসিদ্ধ ব্যাপার। (৪) ছুতা—রোগের 'ছল' করিয়া সে বাড়িতে বসিয়া থাকিল। (৫) উপলক্ষ্য—স্তুতির 'ছলে' নিন্দা করিতে নারদ অভ্যস্ত ছিলেন।

ছাপা—(১) ছাপা, লুক্কায়িত—দুষ্কৃতি কখনও 'ছাপা' থাকে না। (২) মুদ্রণ—বইখানির 'ছাপা' ও বাঁধাই বেশ চমৎকার। (৩) অতিক্রম করা—বর্ষার জল পুকুর 'ছাপাইয়া' উঠিয়াছে।

ছোট—(১) কনিষ্ঠ—লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের 'ছোট' ভাই। (২) ক্ষমতায় বা পদে নীচু—আপিসের 'ছোট' সাহেবের অত্যাচারে বাবুরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। (৩) খাটো—আমার ভায়ের ধুতি আমার ধুতির চেয়ে দুই আঙুল 'ছোট'। (৪) সমাজে অবনত—গান্ধীজী 'ছোট' লোকদিগকেই 'হরিজন' বলিয়াছেন। (৫) সংক্ষিপ্ত—ভোজসভায় শ্রীযুক্ত বসু একটি 'ছোট' বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

ডাক—(১) খ্যাতি—রেবা নাকি এই অঞ্চলের মধ্যে 'ডাকে'র সুন্দরী। (২) নিলামে ক্রেতা যে দর হাঁকে—নিলামে বেতারযন্ত্রটির 'ডাক' উঠিল দুই শত টাকা। (৩) সম্বোধন—হরেনের 'ডাক' নাম ছাগলা। (৪) চীৎকার—নিদ্রা হইতে উঠিয়াই শিশুটি 'ডাক' ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। (৫) চিঠিবিলির জন্য সরকারী ব্যবস্থা—'ডাক'টিকিটের মূল্য বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পত্রপ্রেরণ-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে নাই।

তত্ত্ব—(১) ব্রহ্ম—'তত্ত্ব'জ্ঞান লাভ করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। (২) উপঢৌকন—পশ্চিম-বংগের অঞ্চলবিশেষে পূজাপার্বণাদি উপলক্ষে বধূর বাপের বাড়ি হইতে 'তত্ত্বাদি' আসে। (৩) খোঁজ—মাঝে মাঝে আমি তাহার 'তত্ত্ব' লইয়া থাকি। (৪) বিজ্ঞান—পল্লীপ্রধান ভারতে কৃষি'তত্ত্ব' সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা হওয়া উচিত।

তন্ত্র—(১) অধীন—ইন্দ্রিয়-পর'তন্ত্র' হইলে দিন দিন আয়ু হয় ক্ষীণ। (২) রাজ্যশাসন-পদ্ধতি—ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াও আমলা'তন্ত্রের' প্রভাব হইতে

একেবারে মুক্ত হইতে পারে নাই। (৩) শাস্ত্রবিশেষ—'তন্ত্র'মতের উপরেই তান্ত্রিকের উপাসনা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। (৪) অনুবন্ধী বিষয়ের সমবায়—রক্তসংবহন'তন্ত্র' সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে চিকিৎসক হওয়া যায় না।

তাল—(১) গীত বাদ্য বা নৃত্যে সময়ের বিভাগ—কমল মল্লিক গান গায় ভাল, কিন্তু একেবারে 'তাল'কানা। (২) গোলাকার পিণ্ড—বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে মাটির 'তাল' পাকাইয়া রাখে। (৩) ফলবিশেষ—কচি 'তালে'র আঁঠির শাঁস খাইতে বড়ই সুস্বাদু। (৪) বাহু ইত্যাদিতে চপেটাঘাত—স্বনামপ্রসিদ্ধ কুস্তিগীর গামা ও গোবর কুস্তির আখড়ায় 'তাল' ঠুকিতে লাগিলেন। (৫) পিশাচবিশেষ—বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরংগলীলা দেখিয়া মনে হয়, বুঝিবা 'তাল'বেতাল সমুদ্রবক্ষের উপরে অদৃশ্য নৃত্য সুরু করিয়াছে।

দণ্ড—(১) খেসারৎ, গচ্চা—পচা মাছ কিনিয়া দুই টাকা 'দণ্ড' গেল। (২) শাস্তি—মহাত্মাজীর আততায়ী গডসে প্রাণ'দণ্ডে' দণ্ডিত হইয়াছিল। (৩) ডাণ্ডা—লৌহ'দণ্ডের' প্রহারে চোরের আক্কেলগুড়ুম হইল। (৪) কালের বিভাগ-বিশেষ—আমার এখানে দুই 'দণ্ড' থাকিলে তোমার পিতা আদৌ বিরক্ত হইবেন না।

দল—(১) পত্র—বিল্ব'দল' শিবপূজার উপকরণ। (২) জলজ তৃণবিশেষ—গ্রামের অধিকাংশ জলাশয়ই যত্নের অভাববশত 'দলে' পরিপূর্ণ থাকে। (৩) সম্প্রদায়—পুণ্যলাভের আশায় দল'বদ্ধ' যাত্রীগণ গংগাসাগরাভিমুখে চলিয়াছে। (৪) সমূহ, পাপড়ি—কুসুম'দল' ছিন্ন করিয়া রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন।

ধর্ম—(১) প্রতিটি জীব, বস্তু বা বিষয়ের নিজস্ব গুণ, যাহার অভাবে ঐ জীব, বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে না—জলের 'ধর্ম' যেমন তারল্য ও শৈত্য, অগ্নির 'ধর্ম'ও তেমনি উত্তাপ ও ঔজ্জ্বল্য। (২) দণ্ড পুরস্কারের কর্তা যম—এই অন্যায়ের বিচার 'ধর্ম'ই করিবেন। (৩) রীতি—কালের 'ধর্ম'কে কখনও অস্বীকার করা যায় না। (৪) স্বভাব—তোমার 'ধর্ম' তোমারই থাক্। (৫) শাস্ত্রবিহিত আচার—আজিকার দিনে হিন্দু'ধর্মের' গোঁড়ামি মানিতে অনেকেই নারাজ।

ধারা—(১) প্রবাহ—অপরের দুঃখ দেখিয়া যাঁহার গণ্ডদেশ অশ্রু'ধারা'য় প্লাবিত হয়, তিনিই ধরাধামে ধন্য। (২) রীতি—একাহারী থাকা, ইহাই এই বংশের 'ধারা'। (৩) আইনের বিধি—ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে, এমন কি এই স্বাধীন ভারতের ইতিহাসেও, ১৪৪ 'ধারা' একটি স্বনামখ্যাত বিধান। (৪) শৃংখলা—বিধাতার কাজের 'ধারা' বুঝিবার সাধ্য কাহার? (৫) ঋণী হইয়া থাকা—'ধারাধারির' ভিতরে আমি যাই না। (৬) স্রাব—গুলীবিদ্ধ ছাত্রশহীদের বক্ষোদেশ শোণিত'ধারায়' স্নাত ছিল।

নাম—(১) ইষ্টদেবের নাম—কায়মনোবাক্যে 'নাম' জপিতে পারিলে সাধকের সিদ্ধিলাভ ঘটে। (২) ঈষৎ—ক্ষুধা না থাকায় 'নাম'মাত্র খাইব। (৩) খ্যাতি—গাঁজা খাইয়া শেষে কি বংশের 'নাম' ডুবাইবে? (৪) আখ্যা—পিতা সদ্যোজাত পুত্রের 'নাম' রাখিলেন শিবাশীষ।

পক্ষ—(১) দল—বর'পক্ষ' আসিয়া পড়িলেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। (২) চন্দ্রের ক্ষয় বা বৃদ্ধিকাল—কৃষ্ণ'পক্ষ' অপেক্ষা শুক্ল'পক্ষ'ই যুবকযুবতীর প্রাণে হিল্লোল বহাইয়া দেয়। (৩) একাধিক পত্নীর একটি—কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় 'পক্ষ' শান্তি দেওয়া দূরে থাকুক, অশান্তির আগুনই জ্বালাইয়া থাকে। (৪) পাখির ডানা—রাবণের অস্ত্রাঘাতে জটায়ুর 'পক্ষ'দেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। (৫) বাটীর পার্শ্ব—পাওনাদারদের ভয়ে তিনি 'পক্ষ'দ্বার দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকেন। (৬) তরফ—কলওয়ালা ও শ্রমিক, এই দুই বিরুদ্ধ 'পক্ষে'র মধ্যে শেষোক্ত পক্ষের দাবিই মানবতার দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য।

পত্র—(১) পাতা—পুস্তকের 'পত্র'গুলি জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। (২) চিঠি—আমি তাহাকে 'পত্র' দিয়াছি। (৩) প্রভৃতি-বোধক—বিছানা'পত্র' ভাল করিয়াই বাঁধিয়া লইয়াছি। (৪) পাত—স্বর্ণ'পত্রের' উপরে সূক্ষ্ম কারিগরি সকল স্বর্ণকারই দেখাইতে পারে না।

পদ—(১) অনুগ্রহ বা আশ্রয়—দরিদ্র ব্যক্তিটি প্রধান মন্ত্রীর নিকট যাইয়া কহিলেন, "আপনি যদি আমায় 'পদে' রাখেন, তাহা হইলে আমি সপরিবারে বাঁচিবার আশা রাখি।" (২) কর্মের ভার—তিনি রাজস্বমন্ত্রীর 'পদে' বহাল হইলেন। (৩) ছন্দোবদ্ধ বাক্য—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব মহাজন কর্তৃক রচিত 'পদাবলী' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। (৪) চরণ—শিষ্য গুরুদেবের 'পদ'রেণু মস্তকে ধারণ করিলেন। (৫) বিবিধ বস্তু বা অংগ—ভোজের 'পদগুলি' পূর্বেই জানা থাকিলে খাইয়ে লোকের সুবিধা হয়।

পর—(১) অপর—'পরে'র অনিষ্ট চিন্তা করিলে নিজেরই সর্বনাশ হয়। (২) অনাত্মীয়—তুমি আমার আপনার জন, 'পর' নও। (৩) পরম—চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারিলে 'পর'ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে। (৪) রত—স্বার্থ'পর' ব্যক্তি মানবজাতির কলংক। (৫) পশ্চাৎ—তাহার 'পর' পুত্রহারা জননীর কাছে সারা বিশ্ব শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। (৬) পরিধান কর—জন্মদিনে নববস্ত্র 'পর'।

পান—(১) তরল বা বায়ব দ্রব্য গলাধঃকরণ—সুরা'পান' মহাপাপ। (২) তাম্বুল—দোকানে-সাজা 'পানে'র খিলি চর্বণ করিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে।

(৩) খাদ—কোন কোন স্বর্ণকার গহনায় এত 'পান' দিয়া থাকে যে, তাহা ভাঙিয়া গড়াইবার কালে 'পান'-মরা হিসাবে বেশ কিছু পরিমাণ বাদ পড়িয়া যায়।

পাশ—(১) বন্ধন—অর্জুন নাগ'পাশ' অস্ত্রের অধিকারী ছিলেন। (২) গুচ্ছ—কুসুমমাল্যে সুশোভিত কেশ'পাশের' শোভা অতীব মনোমদ।। (৩) পার্শ্ব—ক'লকাতার এমনই আজব সভ্যতা যে 'পাশে' বাস করেও একজন আর একজনের খোঁজখবর রাখে না।

ফল—(১) বৃক্ষলতাদির শস্য—গাছে 'ফল' ধরিয়াছে। (২) পরিণাম—পাপের 'ফল'ভোগ করিতেই হইবে। (৩) নির্ধারণ—তাঁহার পক্ষে জ্যোতিষ-গণনার 'ফল' আদৌ অনুকূল নয়। (৪) উপকার—ব্রজ কবিরাজের ঔষধে 'ফল' হইয়াছে। (৫) অংক কষিবার পর যে রাশি পাওয়া যায়—দেখ তো! অংকের 'ফল' কত দাঁড়াইল ?

বর—(১) আশীর্বাদ—রাবণ ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া 'বর' লাভ করিয়াছিলেন। (২) বিবাহের পাত্র—'বর'-কনের উপস্থিতিতে বিবাহ-বাসর অপূর্ব শোভায় শোভিত হইয়া থাকে। (৩) অনুগ্রহসূচক করভংগী—সাধকের জীবনে ইষ্টদেবতার 'বরাভয়' অমূল্য সম্পদ। (৪) শ্রেষ্ঠ—'বরনারী' সীতা রঘুকুলপতি শ্রীরামচন্দ্রের যোগ্যা সহধর্মিণী ছিলেন।

বর্ণ—(১) রং—অসীম সমুদ্র নীল'বর্ণ'। (২) অক্ষর—আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই 'বর্ণ'জ্ঞান নাই। (৩) জাতি—হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিটি 'বর্ণে'র মধ্যে ব্রাহ্মণই 'বর্ণ'শ্রেষ্ঠ।

বারণ—(১) হস্তী—যুবামন মদমত্ত 'বারণে'রই ন্যায় বেগবান। (২) নিষেধ—বারংবার 'বারণ' করিয়াও তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিলাম না।

বাস—(১) অবস্থান—পূর্ববংগ হইতে বাস্তুহারাদের আগমনে কলিকাতায় 'বাস'গৃহ-সমস্যা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। (২) বস্ত্র—পীত 'বাস'-পরিহিত বনমালী হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা। (৩) সুগন্ধ—ফুলের 'বাস' সমগ্র কাননটিকে আমোদিত করিতেছে।

বিধি—(১) নিয়তি—'বিধি'-বিড়ম্বনায় তিনি অতি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। (২) ক্রম—সভাপতি সভার কার্য'বিধি' ঘোষণা করিলেন। (৩) বিধান—হরেনের পিতৃশ্রাদ্ধ যথাসম্ভব শাস্ত্র'বিধি'মতেই হইয়াছে। (৪) আইন—ভারতীয় দণ্ড'বিধির' ১০ ধারা এই মোকর্দমা-সম্পর্কে প্রযোজ্য।

বেলা—(১) সময়—'বেলা' দশটায় আপিস বসে। (২) বিলম্ব—প্রতিদিন এত 'বেলা' করিয়া আসিলে তোমার চাকুরী থাকিবে না। (৩) সমুদ্রতীর—

'বেলা'ভূমিতে যখন তরংগনিচয় আছড়াইয়া পড়ে, তখন এক অপূর্ব শোভা বিকশিত হয়। (৪) বয়স—এইটুকু 'বেলা'য় বিয়ে না করাই ভাল। (৫) পক্ষ—আপন সন্তানের 'বেলায়' কোন দোষ নাই, আর পরের ছেলের 'বেলা'য় যত দোষ! (৬) সুযোগ, অবসর—বাবা বাড়িতে নাই—এই 'বেলা' খেলার মাঠে চল্ ভাই। (৭) আটা ময়দা প্রভৃতির পিণ্ড পাত্‌লা করা—বেলন দিয়া ময়দা 'বেলা' শ্রমসাপেক্ষ নয় বটে, তবে অভ্যাসসাপেক্ষ। (৮) পুষ্পবিশেষ—'বেলা' ফুলের গন্ধ বড়ই মনোরম।

বোঝা—(১) ভার—কুলিটি দেড়মণি 'বোঝা' অবলীলাক্রমে তাহার মাথার উপরে রাখিল। (২) ভর্তি—বাক্স-'বোঝাই' কাপড়চোপড় লইয়া চোর গভীর রজনীতে পলায়ন করিল। (২) হৃদয়ংগম করা—এই জটিল তত্ত্বকথা 'বোঝা' আমার কর্ম নয়।

ভাব—(১) মনঃস্থিত বিষয় অর্থাৎ Idea—কবিতাটির 'ভাব' সম্প্রসারণ কর। (২) অনুরাগ, প্রণয়—অসৎ লোকের সংগে 'ভাব' থাকা সমীচীন নয়। (৩) আচরণ—দাস্য'ভাব'ও ভগবদ্‌প্রেমের সাধনায় সিদ্ধি দান করে। (৪) চিত্তবিকার—নবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্যদেব 'ভাবাবেশে' হরিনাম সংকীর্তন করিতেন। (৫) মনের অবস্থা—তাঁহার 'ভাবান্তর' দর্শনে আমি ব্যথিত হইলাম। (৬) অভিপ্রায়—আমি আমার মনো'ভাব' সভায় জানাইয়া দিয়াছি।

ভার—(১) দুরূহ—এই দুর্মূল্যতার বাজারে সাধারণ লোকের বাঁচাই 'ভার'। (২) ভরণপোষণ—মৃত বন্ধুর পোষ্য আত্মীয়বর্গের 'ভার' লইয়া তিনি মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। (৩) সমূহ—ধীবর মৎস্য'ভার' লইয়া বাজারে চলিল। (৪) দায়িত্ব—অল্প বয়স হইতেই তিনি কঠিন কাজের 'ভার' লইতে অভ্যস্ত। (৫) চাপ —পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের স্কন্ধে দেনার 'ভার' পড়িল। (৬) উদ্বেগ—বেদনার 'ভার' আর তো বহিতে পারি না। (৭) ওজন—ধারে নাই-বা কাটিল, 'ভারে' তো কাটিবে।

ভোর—(১) ব্যাপিয়া—তিনি জীবন'ভোর' সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। (২) বিহ্বল—পুষ্পকানন গন্ধে 'ভোর' হইয়া আছে। (৩) পরিমিত—মটর'ভোর' আফিম খাইয়াও মৃত্যু ঘটিতে পারে। (৪) রাত্রিশেষ—'ভোর' হইবামাত্র তিনি মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

যোগ—(১) সম্বন্ধ—রক্তের 'যোগ' অস্বীকার করা যায় কি? (২) সংযোগ—সুয়েজপ্রণালী ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের মধ্যে 'যোগ'সাধন করিতেছে। (৩) সময়—সেই ভয়াবহ রাত্রি'যোগে' নদী পার হইয়া ডাকাতের দল পাকিস্তান-এলাকায় প্রবেশ করিল'। (৫) হঠযোগাদি সাধন—'যোগ'বলে মহাত্মা বামা ক্ষেপা সকলই জানিতে পারিতেন। (৬) নিষ্কাম সাধনা—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার

গীতার ভক্তি'যোগে'র অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (৭) পর্ব, উৎসব—গত বৎসরে চূড়ামণি-'যোগে' নবদ্বীপধামে বেশ জনসমাগম হইয়াছিল। (৯) ঔষধ—আমাশয় রোগের পক্ষে এই মুষ্টি'যোগ'টি অব্যর্থ।

রস—(১) অলংকারশাস্ত্রোক্ত আদি করুণ বীর ইত্যাদি নবরস—মেঘনাদ-বধকাব্য করুণ'রসা'শ্রিত মহাকাব্য। (২) রংগ,কৌতুক—'রস'রচনায় নাট্যকার অমৃতলাল বসু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। (৩) নিঃস্রাব—ফোড়ার 'রস' পড়িতেছে। (৪) নির্যাস—সরবতের সংগে লেবুর 'রস' মিশাইয়া পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ উপকারী। (৫) সম্বল বা সামর্থ্যজনিত গর্ব—হাভাতের বেটার ভারী 'রস' হয়েছে! (৬) রসায়ন—'রস'শালায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অধিকাংশ সময়ই কাটাইতেন।

রাগ—(১) ক্রোধ—তাঁহার 'রাগ' না পড়া অবধি আমি কিছুতেই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিব না। (২) সংগীতশাস্ত্রসম্মত স্বরবিন্যাসের পদ্ধতিবিভাগ—হিন্দুসংগীতশাস্ত্রানুসারে ছয় 'রাগ' ও ছত্রিশ রাগিণী আছে। (৩) বক্তিমা—অস্ত-'রাগের' আভা যেন প্রকৃতিরাণীর ললাটে সিন্দুর'রাগ' মাখাইয়া দিল। (৪) অনুরাগ—বৈষ্ণব মহাজনদিগের পূর্ব'রাগের' পদাবলী বড়ই অপূর্ব।

রূপ—(১) আকৃতি—শ্রীনাথ বহুরূপী কুলবধূর 'রূপ' ধরিয়া বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। (২) প্রকার—এই'রূপ' গালিগালাজ করা আদৌ শোভনীয় নয়। (৩) সৌন্দর্য—বুদ্ধের 'রূপ' উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেরই আছে। (৪) স্বরূপ—দারিদ্র্য'রূপ' দোষ মানুষকে বহু অকল্যাণের মুখে টানিয়া লইয়া যায়। (৫) শিল্প—'রূপ'কার উদয়শংকর 'কল্পনা' বাণীচিত্রে প্রাচ্য নৃত্যকলার রস পরিবেশন করিয়াছেন।

লোক—(১) মনুষ্য—তিনি বড় ভাল 'লোক'। (২) জনসাধারণ—প্রাচীন কালে যাত্রা কথকতা পাঁচালী গান প্রভৃতি 'লোক'সাহিত্য 'লোক'শিক্ষার বাহন ছিল। (৩) ভুবন—নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি ইহ'লোক' ত্যাগ করিয়াছেন? (৫) ভৃত্য, কর্মচারী—আপিসে কাজের যখন এতই চাপ, তখন একজন 'লোক' তো অনায়াসেই লইতে পার।

সুর—(১) দেবতা—বৃহস্পতি 'সুর'গণের গুরুদেব। (২) কণ্ঠস্বর—অনেক গায়ক-গায়িকা আধুনিক বাংলা গান নাকী 'সুরে' গাহিয়া থাকেন। (৩) রাগিণী—সেই অজানা পথিকের গানের 'সুর' আজও আমার কর্ণে বাজে। (৩) আভাষ—'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের মূল 'সুর'—গতিরাগের 'সুর'। (৫) উদ্দেশ্য—হিন্দুমহাসভা পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করিবার পর হইতেই তাঁহার 'সুর' পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

সূত্র—(১) গতিক—কার্য'সূত্রে' ছুটির মধ্যেও কলিকাতায় থাকিলাম। (২) ধারা—পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর বজ্রগম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া আমার চিন্তা'সূত্রের' খেই হারাইয়া গেল। (৩) সংক্ষিপ্ত বাক্য—বেদন্ত'সূত্রের' ব্যাখ্যা না পড়িলে, উহার মর্মভেদ করা দুঃসাধ্য। (৪) নাটকের প্রস্তাব—সংস্কৃত নাটকে 'সূত্র'ধার প্রথমেই যে 'সূত্র' স্থাপন করেন, তাহা নাটকের ফলশ্রুতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রচিত। (৫) সুতা—কার্পাস-'সূত্র'-নির্মিত বস্ত্রের মূল্য উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে।

হার—(১) মাল্য—কুসুম-'হার'শোভিত রাজনর্তকী চারুকুন্তলা রাজপ্রাসাদে চলিল। (২) দর—জোড়াপিছু গামছার 'হার' কত? (৩) পরাভব—তর্কে রমেন রমেশের কাছে 'হার' মানিল।

হাল—(১) লাঙল—গোরু ও 'হাল',—এই দুইটিই চাষীদের জীবনধারণের সম্বল। (২) অবস্থা—যৌবনে টাকা-পয়সা উড়িয়ে আজ তার হাড়ীর 'হাল' হয়েছে। (৩) বর্তমান—তোমার 'হাল' সনের খাজনা এখনও পাই নি। (৪) আধুনিক—'হাল' ফ্যাশানের শাড়ী পরতে মেয়েরা বড়ই ভালবাসে।

হেলা—(১) অবজ্ঞা—'হেলা'য় আমার কোন সংবাদ লও নাই। (২) শালুক—পুষ্করিণীতে 'হেলা'ফুল ফুটিয়াছে। (৩) স্নেহ; প্রীতি—আমার প্রতি যেন তোমার 'হেলা' থাকে। (৪) স্ত্রীলোকের ভাববিশেষ—লীলা মেয়েটির প্রায়ই 'হেলা' হয়। (৫) ঝুঁকা—চেয়ারটি বাঁ দিকে 'হেলা' নয় তো কী?

অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটিকে নির্বাচনপূর্বক প্রত্যেকটি শব্দের ভিন্নার্থবোধক দুইটি করিয়া মোট দশটি বাক্য রচনা কর:—কড়া, কড়ি, কথা, ডাক, অংক, দণ্ড, ছাপা, গজ, পাশ, পান, বারণ, বোঝা, হার, পর, কর।

ক. বি. মাধ্যমিক (অতি) '৪৭

[দুই] নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে একাধিক অর্থে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর:—উত্তর, গুণ, ভাল, ধর্ম, ধারা, নাম, পক্ষ, পদ, বেলা, ভাব, ভার, যোগ, রস, রাগ, রূপ, সুর, সূত্র, লোক, ভোর, বিধি, বর, বর্ণ, হাল, হেলা।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থবোধক শব্দ

অজাগর—অনিদ্রা
অজগর—সর্পবিশেষ

অগণ্য—যাহা গণনার অতীত
নগণ্য—যাহা গণনার অযোগ্য

অধৃষ্ট—নম্র
অধৃষ্য—অজেয়

অংশ—ভাগ
অংস—স্কন্ধ

অনু—পশ্চাৎ
অণু—সূক্ষ্মতম অংশ

অনুধাবন—বিবেচনা
অনুধ্যান—কল্যাণময় চিন্তা

অনুনাসিক—নাকী, খোনা
উন্নাসিক—ঘৃণাব্যঞ্জক

অবতরণ—নামা
অবতারণা—প্রস্তাবনা

অনুবাদিত—ভাষান্তরিত
অনুবাদ্য—অনুবাদযোগ্য

অন্যান্য—অপরাপর
অন্যোন্য—পরস্পর

অন্তর্বর্তী—অন্তঃপাতী
অন্তর্বত্নী—গর্ভবতী

অপলাপ—গোপন
প্রলাপ—অর্থহীন উক্তি

অপ্রমিত—অপরিমিত
অপ্রমেয়—অপর্যাপ্ত

অবগত—জ্ঞাত
অপগত—বিদূরিত

অবদ্য—অকথ্য, নিন্দিত
অবধ্য—যে বধের অযোগ্য

অবলম্বিত—গৃহীত
অবিলম্বিত—ত্বরিত

অবলেপন—বিলেপন
অবলেহন—চাটা

অবিরাম—অবিরত
অভিরাম—সুন্দর

অর্ঘ—মূল্য
অর্ঘ্য—পূজার উপকরণ, পূজ্য

অসি-লতা—তরবারি
অ-শীলতা—অশিষ্ট ব্যবহার

অন্নদা—অন্নপূর্ণা
অন্যদা—অন্য সময়ে

অন্নপুষ্ট—অন্নের দ্বারা পুষ্ট
অন্যপুষ্ট—কোকিল

অযুগ্ম—বিজোড়
অযোগ্য—অনুপযুক্ত

অরণ্য—বন
অরণ্যানী—বৃহৎ বন

অলিক—ললাট
অলীক—মিথ্যা

অশক্ত—অসমর্থ
অসক্ত—নির্লিপ্ত

অশন—ভোজন
অসন—ক্ষেপন

অর্ধাসন—আসনের অর্ধভাগ
অর্ধাশন—আধপেটা আহার

অবিচার—অবিবেচনা
অভিচার—পরহিংসা

অবচয়—চয়ন
অপচয়—ক্ষতি

অশিত—ভক্ষিত
অসিত—কৃষ্ণ

অন্তঃ—ভিতর
অন্ত—শেষ

অর্তি—পীড়া
অর্থী—যাচক

অনিল—বাতাস
অ-নীল—যাহা নীল নহে

অন্বয়—পদের পরস্পর সম্বন্ধ
সমন্বয়—মিলন

অতএব—এ কারণে
অর্থাৎ—ইহার মানে

অবদান—পূজা বা অর্চনার্থ দান
অবধান—মনোযোগ-সহ শ্রবণ

অভ্যাশ—সমীপ
অভ্যাস—বারংবার একই কর্ম করণ

অভিনিবেশ—মনোযোগ
উপনিবেশ—বিদেশস্থিত আবাসভূমি

অনিষ্ট—অপকার
অ-নিষ্ঠ—নিষ্ঠাহীন
অন্বিষ্ট—আকাংক্ষিত

অবহিত—অভিনিবিষ্ট
অবিহিত—নিন্দিত
অভিহিত—কথিত

অশ্ব—ঘোটক
অ-স্ব—নিজের নহে
অশ্ম—পাথর
অমানুষ—পশুবৎ, মনুষ্যত্বহীন
অমানুষিক—মানুষের অতীত (ভাল অর্থে); মনুষ্যস্বভাবের বিরুদ্ধ (খারাপ অর্থে)

অস্ত্র—যাহা ছুঁড়িয়া মারিবার যোগ্য অর্থাৎ যন্ত্রচালিত প্রহারক: যথা,—আগ্নেয়াস্ত্র
শস্ত্র—যাহা ছুঁড়িয়া মারিবার নয়, হাতে করিয়া প্রহার করিতে হয়: যথা,—অসি

আকিঞ্চন—আকাংক্ষা
অকিঞ্চন—দীন

আগত—যাহা আসিয়াছে
আগামী - যাহা আসিবে

আত্ত—গৃহীত
আর্ত—পীড়িত

আপন—নিজ
আপণ—দোকান, হট্ট

আহুত—হোমপ্রদত্ত
আহূত—আহ্বানপ্রাপ্ত

আদি—প্রথম
আধি—মনঃপীড়া

আধ্মান—স্ফীতি
আধ্যান—চিন্তা

আবৃতি—আবরণ
আবৃত্তি—বারংবার পাঠ

আভাষ—ইংগিত, ভূমিকা
আভাস—ঈষৎ দীপ্তি

আস্তিক—ঈশ্বরে বিশ্বাসী
আস্তীক—জরৎকারু-পুত্র

আরাম—আয়েশ
বিরাম—নিবৃত্তি

আসক্তি—প্রীতি
আসত্তি—সন্নিধি

আসব—চোয়ানো মদ
আহব—যুদ্ধ

আকাট—নিরেট
আকাটা—কাটা নয়
অকাট্য—প্রতিবাদের অতীত

আকাল—দুঃসময়
আকালিক—অসাময়িক
অকাল—অসময়োচিত

আপ্ত—ভগবান, দেবতা বা ঋষি হইতে প্রাপ্ত; বিশ্বস্ত
আত্ম—নিজ সম্পর্কিত, স্বয়ং

আসার—ধারাসম্পাত
আষাঢ—মাসবিশেষ
অসার—মিথ্যা

ইষ—আশ্বিন মাস
ঈশ—ঈশ্বর
ঈষ—লাঙলের ফলা

ইতি—সমাপ্তি, এই অবধি
ঈতি—ফসল ফলাইবার ষড়্‌বিধ বিঘ্ন: যথা,—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পতংগ, পক্ষী ও নিকটবর্তী শত্রু রাজা

উদ্‌বৃত্ত—বাকি
উদ্ধৃত—উত্তোলিত

উপজীবী—আশ্রিত
উপজীব্য—আশ্রয়স্থল

উপধি—রথচক্র, কপট
উপাধি—পদবী

উপাদান—মালমশলা
উপাধান—বালিশ

উদ্দেশ—অভিমুখ
উদ্দেশ্য—অভিপ্রায়

উদ্ধত—ধৃষ্ট
উদ্যত—উদ্যুক্ত

উপাসিত—আরাধিত
উপোষিত—অভুক্ত

উত্থিত—যে বা যাহা উঠিয়াছে
উত্থাপিত—যাহা বা যাহাকে উঠানো গিয়াছে

উৎপত—পাখী
উৎপথ—কু-পথ
উৎপাত—উপদ্রব

উপকরণ—কার্যসমাধার সমবায়ী কারণ
উপাদান—দ্রব্যনির্মাণের সমবায়ী কারণ

ঋষ্টি—দ্বিধার খড়্গ
রিষ্টি—অশুভ

একদা—এক কালে
একধা—এক প্রকারে

ওষধি—ফলপাকান্ত উদ্ভিদ
ঔষধি—রোগবিনাশক দ্রব্য

কল্য—প্রত্যূষ
কল্ল—বধির

করংক—কৌটা, কমণ্ডলু
কলংক—অখ্যাতি

কৃতদাস—ভৃত্যে পরিণত
ক্রীতদাস—গোলাম

কুট—পর্বত; দুর্গ
কূট—জটিল; পর্বতশৃংগ

কৃত্তি—বাঘের ছাল
কীর্তি—যশ

কপাল—মাথার খুলি
কপোল—গণ্ডদেশ

কৃত্তিবাস—মহাদেব
কীর্তিবাস—যশস্বী

কৃতি—কার্য; নির্মিতি
কৃতী—নিপুণ

কটি—কোমর
কোটি—সংখ্যাবিশেষ

কৃত্য—কার্য
কৃত্ত—ছিন্ন

কৃষ্ট—কর্ষিত
কৃষ্ণ—বাসুদেব

কোণ—দুই রেখার মিলনস্থান
কোন—অনিশ্চিত কিছু একটা

কোমল—নরম
কমল—পদ্ম

কৌতুক—তামাশা
কৌতূহল—ঔৎসুক্য

কুল—বংশ ; সমূহ ; ফলবিশেষ
কূল—নদীতীর

কতক—কিছু
কথক—কথার মাধ্যমে ভাগবত-ব্যাখ্যাকার-বিশেষ

গড্ডুর—কুব্জ
গরুড—পক্ষিরাজ

গুড়—খাদ্যবিশেষ
গূঢ—গুপ্ত

গর্ভ—ভ্রূণ, কুক্ষি
গর্ব—অহংকার

গোলক—বর্তুলাকৃতি ; তারক
গোলোক—বৈকুণ্ঠ ; স্বর্গ

গিরীশ—পর্বতশ্রেষ্ঠ ; মহাদেব
গিরিশ—মহাদেব

চাষ—কর্ষণ
চাস—নীলকণ্ঠ পাখী

চির—দীর্ঘ
চীর—ছেঁড়া কাপড়

চিৎ—চৈতন্য
চিত—সঞ্চিত

চ্যুত—ভ্রষ্ট
চূত—আম্র

চিত—সঞ্চিত
চিত্ত—মনঃ

চতুর্—চারি
চতুর—চালাক

ছাত—ছিন্ন
ছাদ—আচ্ছাদন

জাম—ফলবিশেষ
যাম—প্রহর

জাল—ফাঁদ
জ্বাল—আগুনের আঁচ

জাত—উৎপন্ন
যাত—গত

জিন—বুদ্ধ, বিষ্ণু
জীন—জীর্ণ ; বৃদ্ধ

টপ্ টপ্—জোর বৃষ্টির শব্দ
টিপ্ টিপ্—অল্প বৃষ্টির শব্দ

তত্ত্ব—গূঢ় অর্থ ; সংবাদ ; ব্রহ্ম
তথ্য—বিষয়, যাথার্থ্য

তদীয়—তাহার
ত্বদীয়—তোমার

তরণী—নৌকা
তরুণী—নবযুবতী ; নবীনা

তুণ্ড—মুখ
তুন্দ—উদর

দারা—পত্নী
দ্বারা—দিয়া

দোষ—অপরাধ
দোস্—বাহু

দূত—চর
দ্যূত—পাশা

দশাস্য—দশানন রাবণ
দশাশ্ব—চন্দ্র

দেবত্ব—দেবভাব
দেবত্র—দেবসেবার্থ ভূমি

দূতী—সংবাদবাহিকা
দ্যুতি—দীপ্তি

দিষ্টান্ত—মৃত্যু
দৃষ্টান্ত—উদাহরণ

দিননাথ—সূর্য
দীননাথ—দরিদ্রবন্ধু

দেশ—রাজ্য
দ্বেষ—ঈর্ষা

দ্বন্দ্ব—কলহ ; বিরোধ
দণ্ড—লগুড়

দ্বিকুল—দুই বংশ
দুকূল—সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র ; দুই তীর

দীপ—প্রদীপ
দ্বীপ—জলবেষ্টিত ভূভাগ
দ্বিপ—হস্তী

ধরা—পৃথিবী
ধড়া—জীর্ণ বস্ত্র

ধন—ঐশ্বর্য
ধ্বন—শব্দ

ধাতৃ—বিধাতা
ধাত্রী—ধাই-মা, পৃথিবী

ধনী—ধনবান্
ধনি—সুন্দরী স্ত্রী
ধ্বনি—শব্দ

ধুম—সমারোহ
ধূম—ধোঁয়া

নাক—স্বর্গ
নাগ—হস্তী ; সর্প

নিরাশ—হতাশ
নিরাস—ক্ষালন ; নিরাকরণ

নিদেশ—আজ্ঞা
নির্দেশ—ইংগিত দ্বারা প্রদর্শন

নির্জর—দেবতা
নির্ঝর—ঝরণা

নশাত—শাণিত
নিষাদ—চণ্ডাল

নিশিত—শাণিত
নিশীথ—গভীর রাত্রি

নিরস্ত্র—অস্ত্রহীন
নিরস্ত—বিরত

নিবার—নিষেধ
নীবার—ধান্যবিশেষ

নিরশন—অনাহার
নিরসন—দূরীকরণ

নিবন্ধ—প্রবন্ধ
নির্বন্ধ—অতিশয় অনুরোধ

নিবৃত্তি—বিরতি, ক্ষান্তি
নির্বৃতি—মুক্তি, শান্তি

নীর—জল
নীড়—পাখীর বাসা
নিরয়—নরকবিশেষ

নিপাত—বিনাশ
নিপাতন—সূত্রোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম

পক্ষ—পাখীর ডানা; মাসার্ধ
পক্ষ্ম—চক্ষুর পাতার লোম

পরভৃৎ—কাক
পরভৃত—কোকিল

পদ্য—ছন্দোময় বাক্য
পদ্ম—কমল

পরুষ—কঠোর
পৌরুষ—পুরুষত্ব

পুরুষ—নর; আত্মা
পুরীষ—বিষ্ঠা

পরন্তু—পক্ষান্তরে
উপরন্তু—অধিকন্তু

পর্যবসিত—পরিণত
পর্যুসিত—বাসি

পল্লব—নূতন পাতা
পল্বল—ক্ষুদ্র জলাশয়

পাণি—হস্ত
পানি—জল

পৃষ্ট—জিজ্ঞাসিত
পৃষ্ঠ—পশ্চাদ্‌ভাগ

প্রকার—ভেদ; জাতি
প্রাকার—প্রাচীর

প্রসাদ—অনুগ্রহ
প্রাসাদ—অট্টালিকা

প্রতিশ্রুৎ—প্রতিধ্বনি
প্রতিশ্রুত—অংগীকৃত

পুৎ—নরকবিশেষ
পূত—পবিত্র

পুষ্কর—পদ্ম
পুষ্কল—শ্রেষ্ঠ

পূর্বাহ—পূর্বদিন
পূর্বাহ্ণ—দিনের পূর্বভাগ

প্রতি—লক্ষ্য
প্রীতি—ভালবাসা

পরিচর্চা—আলোচনা
পরিচর্যা—সেবা

প্রোত—গ্রথিত
প্রোথ—অশ্বনাসিকা

পরিচ্ছন্ন—পরিষ্কৃত
পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ

প্রকৃত—ঃ
প্রাকৃত—স্বাভাবিক

প্রতিষ্ঠা—খ্যাতি
প্রতিষ্ঠান—সংস্থাপন

পালন—পোষণ
প্রতিপালন—মাননা

প্রসূত—সন্তান
প্রসূতি—জননী

প্রয়োজন—দরকার
প্রযোজনা—পরিচালনা

প্রবাদ—জনশ্রুতি
পরিবাদ—অপবাদ

পরিণত—পরিপুষ্ট
পরিণীত—বিবাহিত

প্রশস্ত—যোগ্যতম
প্রশস্তি—প্রশংসা

পরিষদ—সভা
পারিষদ—সভ্য

পরিচ্ছদ—পোশাক
পরিচ্ছেদ—গ্রন্থাদির বিষয়-বিভাগ

পরস্ব—অন্যের সম্পত্তি
পরশ্ব—আগামী কালের পরদিন

প্রকৃত—যথার্থ
প্রাকৃত—স্বাভাবিক; সংস্কৃতের পূর্ববর্তী ভাষা-বিশেষ

পবন—বায়ু
পাবন—পবিত্র, পবিত্রতাকারী

প্রেরণ—পাঠানো
প্রেরণা—প্রবৃত্তি শক্তি প্রতিভা ইত্যাদির সঞ্চার

পঞ্চবার্ষিক—পাঁচ বৎসর ব্যাপিয়া যাহা হইয়াছে বা হইতেছে
পাঞ্চবার্ষিক—যাহা আগামী পাঁচ বৎসরে সম্পন্ন হইবে

বন্ধ—বন্ধন
বন্ধ্য—নিষ্ফল

বিজন—নির্জন
বীজন—পাখা

বলি—উৎসর্গযোগ্য দ্রব্য
বলী—বলবান

বর্জ্য—ত্যাজ্য
বর্য—শ্রেষ্ঠ
বক্ত্র—মুখ
বক্র—বাঁকা
বৃন্ত—বোঁটা
বৃন্দ—সমূহ
বসন—বস্ত্র
ব্যসন—বিপদ ; বিষয়াসক্তি
বান—বন্যা
বাণ—শর
বিত্ত—বিভব ; ধনসম্পত্তি
বৃত্ত—বর্তুল ; গোলাকার ক্ষেত্র
বিবৃত—বর্ণিত
বিব্রত—ব্যতিব্যস্ত
বিবৃতি—বিস্তৃতি
বিবৃত্তি—বিবর্তন
বিমল—নির্মল
বিমলিন—বিশেষ ম্লান
বল্লব—পাচক ; গোপ
বল্লভ—প্রিয়
বিবর—গর্ত
বীবর—জলজন্তুবিশেষ
বৃষ্টি—বর্ষণ
বৃষ্ণি—যদুবংশ
বিল্ল—আলবাল ; হিং
বিল্ব—শ্রীফল
বীভৎস—ঘৃণার্হ
বীভৎসু—অর্জুন
বিস্মিত—চমৎকৃত
বিস্মৃত—ভ্রান্ত
বেদ—হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থবিশেষ
বেধ—গভীরতা
বিনা—ব্যতীত
বীণা—বাঁশী

বানী—বানাইবার ব্যয় (যেমন,—স্বর্ণকারের 'বানী')
বাণী—বাক্য; সরস্বতী
বিশ—কুড়ি ; বৈশ্য
বিষ—গরল ; মৃণাল
বিস—মৃণাল
বিদুর—ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ; জ্ঞানী
বিদূর—বহুদূরস্থ
ভাশুর—স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
ভাস্বর—দীপ্তিশালী
ভাষণ—উক্তি ; অভিভাষণ
ভাসন—দীপ্তি
ভাণ—নাট্যবিশেষ
ভান—দীপ্তি ; শোভা ; প্রকাশ ; ছল
মণ—চল্লিশ সের
মন—অন্তঃকরণ
মেদ—মজ্জা
মেধ—যজ্ঞ
মহিত—পূজিত
মোহিত—মোহপ্রাপ্ত
মরীচি—কিরণ ; দীপ্তি
মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণিকা
মূক—নির্বাক
মুখ—বদন
মুখপত্র—প্রথম বা প্রধান পত্র বা পত্রিকা
মুখপাত্র—প্রধান ব্যক্তি ; অগ্রণী
যব—শস্য বা পরিমাণ-বিশেষ
জব—বেগ (যেমন,—রথজব)
যাপন—কাটানো
উদ্‌যাপন—সম্পাদন
যতি—যতিচিহ্ন ; মুনি ; ভিক্ষু
যতী—তপস্বী ; ভিক্ষু
জ্যোতি—দীপ্তি

যাচক—প্রার্থী
উপযাচক—স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যে যাচ্ঞা করে
যবনী—যবন-স্ত্রী
যবনানী—যবনলিপিসমূহ
যবানী—যোয়ান ; যবানীনামক ঔষধ
রত—ব্যাপৃত
রথ—স্যন্দন
রিক্ত—শূন্য
রিক্‌থ—ধন, দায়
রুক্ম—স্বর্ণ
রুক্ষ—কর্কশ
রীতি—প্রথা ; প্রণালী
ঋতি—পথ ; গতি
হৃতি—হরণ
লক্ষ—সংখ্যাবিশেষ
লক্ষ্য—উদ্দিষ্ট ; দ্রষ্টব্য ; শরব্য
শকল—খণ্ড ; আঁইস
সকল—সমস্ত
শকৃৎ—বিষ্ঠা
সকৃৎ—একবার
শক্ত—সমর্থ
সক্ত—অনুরক্ত ; লগ্ন
শংকর—শিব
সংকর—মিশ্রণোৎপন্ন
শংখ—শাঁখ
সংখ্য—সংখ্যাযোগ্য
শম্বর—হরিণ
সম্বর—সংবরণ
শঠ—প্রবঞ্চক
ষট্—ছয়
শত—সংখ্যাবিশেষ
স্বতঃ—আপনা হইতে

শপ্ত—অভিশাপগ্রস্ত
সপ্ত—সাত
শবল—নানাবর্ণযুক্ত
সবল—বলবান
শম—যম, শান্তি, চিত্তস্থৈর্য
সম—সমান
শরল—পীতদারু বৃক্ষ
সরল—ঋজু
শরণ—আশ্রয়
স্মরণ—স্মৃতি
শশা—ফলবিশেষ
স্বসা—ভগিনী
শান্ত—ধীর
সান্ত—সসীম
শারদ—শরৎকালীন ; বৎসর
সারদ—শ্রেষ্ঠত্বদায়ক
শারদা—ভগবতী দুর্গা
সারদা—সরস্বতী
শ্রুত—যাহা শোনা গিয়াছে
স্রুত—ক্ষরিত
শিকড়—বৃক্ষমূল
শীকর—জলকণা
শুক—পক্ষিবিশেষ
শূক—শস্যের সূক্ষ্মাগ্র
শূকর—জন্তুবিশেষ
সুকর—সুসাধ্য
শুক্তি—ঝিনুক
সূক্তি—সজ্জনবাণী
শীত—ঠাণ্ডা ঋতুবিশেষ
সিত—সাদা
শিতি—কৃষ্ণবর্ণ
সিতি—শুক্লবর্ণ
শৃত—পক্ব
শ্রিত—সেবিত

শ্রবণ—শ্রুতি
স্রবণ—ক্ষরণ
শর—বাণ
সর—দুধের সর
স্বর—উদাত্তাদি কণ্ঠধ্বনি
শাপ—অভিশাপ
সাপ—সর্প
স্বাপ—নিদ্রা
শক্তি—ক্ষমতা
সক্তি—সংযোগ
সক্থি—উরু
শুচি—পবিত্র
সূচী—ছুঁচ ; নির্ঘণ্ট ; বিষয়-নির্দেশ-তালিকা
শূর—বীর
সুর—দেবতা, গানের সুর
সূর—সূর্য
শব—মৃত
সব—প্রসব ; সমস্ত
শর্ব—শিব
সর্ব—সমস্ত
শিল্—মসলা গুঁড়া করিবার পাথরের নুড়ি
শীল—চরিত্র
সীল—জলজন্তুবিশেষ
সত্র—যজ্ঞ
সত্বর—শীঘ্র
সবিতৃ—সূর্য
সবিত্রী—জননী
সম্প্রতি—অধুনা
সম্প্রীতি—সদ্ভাব
সর্গ—অধ্যায়, সৃষ্টি
স্বর্গ—দেবলোক
সহিত—সংগে
স্বহিত—নিজের কল্যাণ

সংস্কার—ধর্মবিহিত অনুষ্ঠান
সংস্করণ—মুদ্রিত পুস্তকাদির রূপ
সাক্ষর—অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন
স্বাক্ষর—দস্তখত
সামি—অর্ধাংশ
স্বামী—প্রভু ; ভর্তা
সার্থ—সমূহ ; বণিক্‌দল ; ধনবান
স্বার্থ—নিজের প্রয়োজন
সীমন্ত—সিঁথি
সীমান্ত—সীমাশেষ
সুত—পুত্র
সূত—সারথি
সুতা—কন্যা
সূতা—সুতো
সমীর—বাতাস
শমীর—বৃক্ষবিশেষ
সিক্ত—আর্দ্রীভূত
সিক্থ—মোম
স্কন্দ—কার্তিকেয়
স্কন্ধ—কাঁধ
সুদ—কুসীদ
সূদ—পাচক
সাম—বেদবিশেষ
শ্যাম—বর্ণবিশেষ
সুবন্ত—সুপ্‌বিভক্ত্যন্ত
সুবন্ধ—তিল ; বন্ধু
সদ্য—টাট্‌কা
সদ্ম—আবাস
সোদর—সহোদর
স্বোদর—নিজের উদর
সুগন্ধ—যাহা অপর সামগ্রীর সৌরভে সুবাসিত
সুগন্ধি—যে সামগ্রীর নিজেরই ভাল গন্ধ আছে

সত্য—যথার্থ, প্রকৃত
সত্ত্ব—গুণবিশেষ ; সার ; প্রাণী
স্বত্ব—স্বামিত্ব

সার্বজনীন—সর্বজনের সম্বন্ধীয়
সর্বজনীন—সর্বজনের মংগলের নিমিত্ত বা সর্বজনের হিতকর

সুকৃতি—সৎকর্ম, ভাগ্য
সুকৃতী—পুণ্যাত্মা, সৌভাগ্যশালী
সুকীর্তি—সুখ্যাতি

প্রয়োগ

কোকিলশাবককে পালন করায় কাকের নাম হইয়াছে **পরভৃৎ**। কাকের দ্বারা পালিত হওয়ায় কোকিলের নাম হইয়াছে **পরভৃত**। **অসিতবর্ণ** লৌহে নির্মিত অসিতে হয় হীরকের দীপ্তি। শীতকালে **অশিতকর** রবিরশ্মির জন্য জীবকুল আগ্রহান্বিত থাকে। তূলা **উপাধানের** প্রধান **উপাদান**। **বিষই** বিষের ঔষধ। বিস-কিসলয় মরালের প্রিয় সামগ্রী। **বিশ** বছর আগে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। **আষাঢ়ে** বর্ষারাণী বিরহিণী রমণীর নয়ন-**আসারও** বহাইয়া থাকে। নিশীথে সহসা **আর্তধ্বনি** শ্রুত হইল। সাধারণত **ধনীর** দুলাল মূর্খই হয়। 'শুনগো রাজার **ধনি**' ('সুন্দরী স্ত্রী' অর্থে 'ধনি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়)।

অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত শব্দযুগলসমূহের মধ্যে চারিটির প্রয়োগ ও অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :—নিপাত, নিপাতন ; অভিনিবেশ, উপনিবেশ ; প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান ; পালন, প্রতিপালন ; আরাম, বিরাম ; আসব, আহব ; কৌতুক, কৌতূহল ; যাচক, উপযাচক ; পরন্তু, উপবস্তু ; অতএব, অর্থাৎ ; উদ্বৃত্ত, উদ্ধৃত ; যাপন, উদ্‌যাপন ; টপ্ টপ্, টিপ্ টিপ্ ; অন্বয়, সমন্বয় ; পরুষ, পৌরুষ ; সংস্কার, সংস্করণ ; ভাত-টাত, ভাত-ফাত ; অবতরণ, অবতারণা ; অর্ধাসন, অর্ধাশন ; অনুনাসিক, উন্নাসিক ; প্রেরণ, প্রেরণা ; প্রশস্ত, প্রশস্তি ; প্রয়োজন, প্রযোজনা, প্রবাদ, পরিবাদ ; শংকর, সংকর ; শক্ত, সক্ত ; শারদা, সারদা ; সর্গ, স্বর্গ ; চ্যুত, চূত ; আহত, আহূত ; সাক্ষর, স্বাক্ষর ; সার্থ, স্বার্থ ; সত্ত্ব, সত্ত্ব ; সম্প্রতি, সম্প্রীতি ; বিষ, বিস, অবদান, অবধান, অবিরাম, অভিরাম ; পরুষ, পুরুষ ; পল্লব, পল্বল ; প্রকার, প্রাকার ; প্রকৃত, প্রাকৃত ; প্রসাদ, প্রাসাদ।

ক. বি. মাধ্যমিক '৫০, '৫১, '৫৪, (বিজ্ঞান) '৫৫, (বিকল্প) '৫৫

[দুই] নিম্নলিখিত যে কোন তিনটি শব্দযুগ্মের অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া উপযুক্ত বাক্য রচনা কর :—অবদান অবধান ; নির্বন্ধ, নিবন্ধ ; কূট, কুট ; অবিচার, অভিচার ; গিরিশ, গিরীশ ; অসার, আসার।

গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫১

[তিন] যে কোনও পাঁচটিতে অর্থবৈষম্য নির্ণয় কর :—অস্ত্র ও শস্ত্র ; কুল ও কূল ; ব্যসন ও বসন ; উপকরণ ও উপাদান ; শ্মশ্রু ও শ্বশ্রূ ; পরিচ্ছেদ ও পরিচ্ছদ ; সর্গ ও স্বর্গ ; স্বত্ব ও সত্ত্ব।

রা বি. মাধ্যমিক '৫৪

চতুর্থ অধ্যায়

প্রায়-সমার্থবাচক শব্দাদির সূক্ষ্ম অর্থপার্থক্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে লেখকের অভাব নাই। খুবই দুঃখের বিষয় যে, জনপ্রিয় লেখকেরাও সময়ে সময়ে অত্যন্ত আল্‌গা ভাবে শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমাদের সাহিত্যে এমন অনেক শব্দগুচ্ছ আছে, যাহারা প্রায়-সমার্থবাচক হইলেও শব্দনির্বিশেষে সূক্ষ্ম অর্থসম্পন্ন। এই ধরণের বহুপ্রচলিত কয়েকটি প্রায়-সমার্থবাচক শব্দগুচ্ছের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

অকস্মাৎ—সাধারণভাবে অপ্রত্যাশিত বিপদকে বুঝায়। **দৈবাৎ**—মানব-জীবনের দুর্ঘটনায় নিয়তির অমোঘ বিধান যেখানে কল্পিত হয়। **সহসা**—প্রাকৃতিক বিপৎপাত যেখানে দেখা দেয়। **হঠাৎ**—অপ্রত্যাশিতপূর্ব ঘটনা যেখানে লক্ষিত হয়।

অকাজ—অপ্রয়োজনীয় কাজ। **কু-কাজ**—খারাপ কাজ।

অকাল—অপ্রশস্ত কাল : যেমন,—অকালের আম। **অবেলা**—অতিশয় বেলা : যেমন,—অবেলায় আহার। **অসময়**—বিপদের সময় : যেমন—অসময়ের বন্ধু।

অনায়াসে—মানসিক ক্ষেত্রে বিনা চেষ্টায় : যেমন,—অনায়াসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। **অক্লেশে**—কায়িক ক্ষেত্রে কষ্টবোধ না করিয়া : যেমন,—অক্লেশে দশ মাইল হাঁটা। **সহজে**—আপনা হইতেই অপরের উপরে নির্ভর না করিয়া : যেমন,—পশু সহজেই পশু।

অজ্ঞ—যে জানে না অর্থাৎ অভিজ্ঞতাহীন। **অশিক্ষিত**—যে লেখাপড়ার মারফতে শিক্ষালাভ করে নাই। **অবোধ**—বয়সও কম এবং বুদ্ধিও পাকে নাই : যেমন,—অবোধ বালক। **নির্বোধ**—বয়স বেশী, অথচ বুদ্ধিহীন : যেমন,—নির্বোধ বৃদ্ধ। **মূর্খ**—সাধারণ ভাবে 'বোকা' অর্থে প্রযুক্ত।

অনিদ্র—রোগ শোক চিন্তা বেদনাব জন্য অবিরাম নিদ্রাহীনতাবোধক : যেমন,—বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার চিন্তায় অনিদ্রভাবে বৃদ্ধ পিতার রজনীযাপন। **বিনিদ্র**—ঐরূপ কোন উপসর্গ নাই, অথচ ক্ষণকালের জন্য নিদ্রাহীনতা : যেমন,—রজনীতে বিনিদ্র হইয়া দেখি, প্রদীপ নির্বাপিত—গৃহদ্বার উন্মুক্ত।

অহংকার—নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান। **অভিমান**—প্রিয়জনের ত্রুটিহেতু ক্ষোভ, আত্মমর্যাদাবোধ। **গর্ব**—ধন বিদ্যা রূপ ইত্যাদির জন্য আত্মশ্লাঘা ও অপরকে

উপেক্ষা। **দর্প**—ধনবিদ্যাদির আতিশয্যবশত আত্মগৌরব প্রকাশ। **দম্ভ**—যে বিষয়ে যোগ্যতা নাই, সেই বিষয়েই যোগ্যতা প্রকাশ।

আগত—যে বা যাহা আসিয়াছে। **আগামী**—যে বা যাহারা আসে নাই, কিন্তু আসিবে।

আচার—সাধারণ ভাবে চালচলন: যেমন,—দেশাচার, লোকাচার, সদাচার ইত্যাদি। **ব্যবহার**—ব্যক্তিবিশেষের চালচলন।

আধি—মনের পীড়া। **ব্যাধি**—দেহের পীড়া।

উৎকণ্ঠা—চিত্তচাঞ্চল্য। **উদ্বেগ**—সংশয়জনিত ব্যাকুলতা। **ঔৎসুক্য**—মনের মত কাজে আগ্রহ।

উপকরণ—যে সকল সমবায়ী কারণের গুণে কার্যসমাধা হয়: যেমন,—নৈবেদ্য পূজার উপকরণ। **উপাদান**—যে সকল সমবায়ী কারণের গুণে দ্রব্য নির্মিত হয়: যেমন,—কাঠ আয়নার উপাদান।

কুল—একজাতীয় নিম্নশ্রেণীর প্রাণিবাচক বহুবচনবোধক শব্দ: যেমন,—ধেনুকুল, অলিকুল। **গণ**—একজাতীয় উচ্চজাতীয় প্রাণিবাচক বহুবচনবোধক শব্দ: যেমন,—মনুষ্যগণ। শব্দটি দেবতাবাচকও বটে। **নিচয়**—প্রাণি- এবং অপ্রাণিবাচক বহুবচনবোধক শব্দ: যেমন,—পশুনিচয়, মেঘনিচয়, পুষ্পনিচয়। **বর্গ**—একজাতীয় অথবা একই রকমের ধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ: যেমন,—নেতৃবর্গ, রাজন্যবর্গ। **সভা**—প্রাণিবাচক বহুবচনবোধক শব্দ: যেমন,—পণ্ডিতসভা, যুবতীসভা। **মণ্ডলী**—উচ্চনীচনির্বিশেষে সকল জাতীয় প্রাণিবাচক বহুবচনবোধক শব্দ: যেমন,—কৃষক-মণ্ডলী, বিবুধমণ্ডলী। **গ্রাম, দাম, মণ্ডল, মালা, রাজি**—অপ্রাণিবাচক বহুবচন-বোধক শব্দ: যেমন,—ইন্দ্রিয়গ্রাম, বিদ্যুদ্দাম, মেঘমণ্ডল, নামমালা, বৃক্ষরাজি।

দল—একই আদর্শ বা লক্ষ্য-সমন্বিত সম্প্রদায়:—শ্রমিকদল, ধনিকদল, কৃষক-দল, দস্যুদল। **পাল**—গবাদি গৃহপালিত পশুর সমষ্টি: যেমন,—গোরুর পাল, ছাগলের পাল, ভেড়ার পাল। **সার্থ**—একমাত্র বণিকদল সম্পর্কেই প্রযোজ্য: যেমন,—বণিক্‌সার্থ। **যূথ**—পশুসমষ্টি, বিশেষ করিয়া হস্তিসমষ্টি, বুঝাইবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: যেমন,—হস্তিযূথ।

কুশল—গুরুজন ও লঘুজন, ভক্তিভাজন ও স্নেহভাজন—উভয়ের জন্য মংগল আকাংক্ষা। **কল্যাণ**—কেবলমাত্র লঘুজন তথা স্নেহভাজনেরই জন্য মংগল আকাংক্ষা। **আশীর্বাদ**—গুরুজনের দ্বারা শুভ কামনাসূচক বাচন।

জাগ্রৎ—যে ঘুমন্ত নয়, পক্ষান্তরে জাগিয়াই আছে: যেমন,—জাগ্রৎ দেবতা; গৃহস্থকে 'জাগ্রৎ' দেখিয়া চোর পলায়ন করিল। **জাগরিত**—যাহার সবেমাত্র নিদ্রাভংগ হইয়াছে: যেমন,—ভীতসন্ত্রস্ত প্রতিবেশীদের চীৎকারে আমি 'জাগরিত'

হইলাম। **জাগরূক**—সজাগ, সতর্ক : যেমন,—তাঁহার উপদেশ সর্বদা আমার অন্তরে জাগরূক' রহিয়াছে।

দর্শন—সাধারণ দেখা। **সন্দর্শন**—মহাপুরুষদিগের দর্শন। **পর্যবেক্ষণ**—মনোযোগ দিয়া দেখা। **পরিদর্শন**—তন্ন তন্ন করিয়া দেখা।

সেবা—দেবদ্বিজ ও গুরুজনের সন্তুষ্টিবিধায়ক কার্য। **শুশ্রূষা**—রোগীর পরিচর্যা।

হিংসা—অপরের অনিষ্ট করিবার মনোভাব। **ঈর্ষা**—পরশ্রীকাতরতা। **দ্বেষ**—অপরের প্রতি ঘৃণা। **অসূয়া**—অপরের গুণের অনাদর ও দোষের আলোচনা।

শক্তি—কাজ করিবার ক্ষমতা। **সামর্থ্য**—শারীরিক বল। **প্রভাব**—প্রভুশক্তি। **প্রতাপ**—লোকবল ও অর্থবলজনিত তেজ।

নমস্কার—সমপদস্থ বা তুল্য ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানো : যেমন,—শূদ্র শূদ্রকে নমস্কার করে। **প্রণাম**—গুরুজনকে নত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখানো : যেমন,—শূদ্র ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে। **অভিবাদন**—অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সম্মান দেখানো : যেমন,—প্রজা রাজাকে অভিবাদন করে।

ক্ষুদ্র—আকারে ছোট : যেমন,—ক্ষুদ্র অণু। **ছোট**—যাহা বড নয় : যেমন,—ছোট নদী। **তুচ্ছ**—নগণ্য : যেমন,—তুচ্ছ ব্যাপার। **হীন**—নীচ : যেমন,—হীন আচরণ।

রীতি—পদ্ধতি, প্রথা। **নীতি**—ধর্মসংগত বা সমাজহিতকর বিধান।

ভ্রম—অমনোযোগিতার জন্য ভুল। **প্রমাদ**—অজ্ঞতার জন্য ভুল। **ভুলচুক**—সামান্য ভুল। **বিস্মরণ**—স্মৃতিশক্তিহীনতার জন্য একেবারে ভুল।

ইচ্ছা—সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত শব্দ। **স্পৃহা**—ইচ্ছা যখন খুব বলবতী হয় : যেমন,—ভোজনের স্পৃহা। **লিপ্সা**—লাভ করিবার ইচ্ছা : যেমন—যশোলিপ্সা। **লালসা**—যে ইচ্ছার মধ্যে লোভ প্রবাহিত থাকে : যেমন,—অর্থলালসা। **বাসনা**—বিষয়ভোগের ইচ্ছা : যেমন,—বিষয়বাসনা। **আকাংক্ষা**—প্রাপ্তির নিমিত্ত আগ্রহ : যেমন,—ধনাকাংক্ষা। **অভিরুচি**—মনের প্রবৃত্তি : যেমন,—ঘরজামাই হইয়া থাকিবে, কি থাকিবে না—তোমার 'অভিরুচি'। **বাঞ্ছা**—অন্তরের ইচ্ছা : যেমন,—সাধিকা শবরী 'বাঞ্ছা'-কল্পতরু শ্রীরামচন্দ্রের জন্য তাঁহার অন্তরে প্রেমের প্রদীপ জ্বালাইয়াছিলেন।

বন্ধু—যাহার ত্যাগ (অর্থাৎ বিয়োগ অথবা বিচ্ছেদ) সহ্য করা যায় না। **সুহৃৎ**—যে সকল সময়েই একমত থাকিয়া প্রিয় কাজ অথবা মংগলাকাংক্ষা করিয়া থাকে। **মিত্র**—যে একই প্রকার ক্রিয়াকর্ম করে। **সখা**—প্রাণের তুল্য প্রিয় জন। [তুলনীয় : 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ। একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।'—হিতোপদেশ।]

অনুরাগ—সাধারণ ভাবে চেতন অচেতনের প্রতি হৃদয়ের টান: যেমন—খেলাধূলায় অনুরাগ। **প্রেম**—ভগবান ও সর্বজীবের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা: যেমন,—ভগবৎপ্রেম, জীবে প্রেম। **প্রণয়**—পতি, পত্নী, বন্ধু ইত্যাদির প্রতি ভালবাসা; যেমন,—বন্ধুর প্রণয়। **প্রীতি**—ভালবাসার জনের সুখ দেখিয়া যেখানে মানসিক তৃপ্তিলাভ করা যায়: যেমন,—কাহারও ব্যবহারে প্রীতিলাভ করা। **ভালবাসা**—বন্ধু প্রভৃতি সমকক্ষ ব্যক্তি সম্পর্কে হৃদয়ের টান: যেমন,—প্রবোধ আমার 'ভালবাসা'র পাত্র।

আদর—স্নেহের বাহ্য প্রকাশ: যেমন,—অতি 'আদর' দিলে ছেলের মাথা খাওয়া হয়। **স্নেহ**—ছোটদের প্রতি ভালবাসা: যেমন,—সন্তানস্নেহ।

শ্রদ্ধা—অনাত্মীয় বড়দের প্রতি সম্মাননিষিক্ত ভালবাসা: যেমন,—কবি-সমালোচক মোহিতলাল আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। **ভক্তি**—আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ গুরুজনের প্রতি হৃদয়ের সশ্রদ্ধ টান: যেমন,—পতিভক্তি, গুরুভক্তি।

মায়া—মিথ্যাবুদ্ধিজনিত অজ্ঞানতা: যেমন,—এই নশ্বর জীবনে সন্তানের প্রতি 'মায়া' ভগবদ্‌প্রেম-প্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায়। **মমতা**—আপন বলিয়া জ্ঞান: যেমন,—পরের ছেলের প্রতি 'মমতা' আরোপ করিলে কষ্ট পাইতে হয়।

কি—এই জিজ্ঞাসাবাচক শব্দটি সাধারণত প্রশ্নার্থে, কষ্টে-খেদে, বিস্ময়ে, সন্দেহে, বিরক্তিতে, নিষেধে, ভয়প্রদর্শনে, সংস্রব-রাহিত্যে, অভাবার্থে ব্যবহৃত হয়। **কী**—ভয়প্রদর্শনে, ক্রোধে, বিস্ময়ে, বিরক্তিতে, ঘৃণায়, লজ্জায় ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত শব্দগুচ্ছগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটি গুচ্ছকে বাছিয়া লও এবং প্রত্যেক গুচ্ছের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দের সূক্ষ্ম অর্থ বিবেচনা করিয়া এক একটি পৃথক বাক্য রচনা কর:—অকস্মাৎ দৈবাৎ সহসা ও হঠাৎ; অহংকার অভিমান গর্ব দর্প ও দম্ভ; কুল গণ নিচয় বর্গ সভা মণ্ডলী গ্রাম ও দাম; দল পাল সার্থ ও যূথ; দর্শন সন্দর্শন পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন; ইচ্ছা আকাংক্ষা অভিরুচি ও স্পৃহা; লিপ্সা লালসা বাসনা ও বাঞ্ছা; বন্ধু মিত্র সখা ও সুহৃৎ; অনুরাগ প্রেম প্রীতি প্রণয় ও ভালবাসা; আদর ও স্নেহ; শ্রদ্ধা ও ভক্তি, মায়া ও মমতা; কি ও কী (ক. বি. বি. এ. '৫১)।

পঞ্চম অধ্যায়

বিপরীতার্থক শব্দ

শব্দ — বিপরীত শব্দ

অগ্রজ—অনুজ
অণু—বৃহৎ
অনুরক্ত—বিরক্ত
অনুগ্রহ—নিগ্রহ
অনুলোম—প্রতিলোম, বিলোম
অনৃত—সুনৃত
অধমর্ণ—উত্তমর্ণ
অন্তর—বহিঃ
অর্পণ—গ্রহণ; প্রত্যর্পণ
অর্থী—প্রত্যর্থী
অধিত্যকা—উপত্যকা
অনুকূল—প্রতিকূল
অসীম—সসীম
অন্ত্য—আদ্য
অলস—শ্রমী
আনা—গোনা
অনন্ত—সান্ত
অমৃত—বিষ, গরল
আকর্ষণ—বিকর্ষণ
আমায়—সিদ্ধান্ত
আরোহণ—অবরোহণ
আবাহন—বিসর্জন
আবির্ভাব—তিরোভাব; তিরোধান
আস্তিক—নাস্তিক
আদিষ্ট—নিষিদ্ধ
আস্থা—অনাস্থা
আবিল—অনাবিল
আশা—নিরাশা; হতাশা
আবৃত—অনাবৃত; উন্মুক্ত
আসামী—ফরিয়াদী
ইষ্ট—অনিষ্ট

শব্দ — বিপরীত শব্দ

উচ্চ—অবচ; নীচ
উগ্র—সৌম্য
উৎকর্ষ—অপকর্ষ
উত্থান—পতন
উন্মীলন—নিমীলন
উপচয়—অবচয়
উৎকৃষ্ট—নিকৃষ্ট; অপকৃষ্ট
উত্তর—দক্ষিণ; প্রত্যুত্তর
উত্তাপ, তাপ—শৈত্য
উত্তরণ—অবতরণ
ঊর্ধ্ব—অধঃ
ঋজু—বক্র
ঐক্য—অনৈক্য
ঐহিক—পারত্রিক
ওস্তাদ—সাগ্‌রেদ; আনাড়ী
কোমল—কর্কশ; কঠিন
কুৎসা—প্রশংসা
কৃতজ্ঞ—কৃতঘ্ন
কাপুরুষ—বীরপুরুষ
কৃত্রিম—নৈসর্গিক
ক্ষিপ্ত—প্রকৃতিস্থ
কৃষ্ণ—শুক্ল; শুভ্র
ক্রোধ—প্রীতি; ক্ষমা; শান্তি
ক্ষয়িষ্ণু—বর্ধিষ্ণু
ক্ষীণ—পীন, পুষ্ট
খেদ—আহ্লাদ
গরিষ্ঠ—লঘিষ্ঠ
গরিমা—লঘিমা
গুণ—দোষ; ভাগ
গুরু—লঘু; শিষ্য
গুপ্ত—ব্যক্ত; প্রকাশিত

শব্দ — বিপরীত শব্দ

গৌরব—লাঘব
গ্রহণ—দান; বর্জন; ত্যাগ; অর্পণ
গ্রাম্য—পৌর; শহুরে, জানপদ
গোপন—প্রকাশ
গৃহী—সন্ন্যাসী
ঘন—তরল; বিরল
ঘাত—প্রতিঘাত
চেতন—জড়
চড়াই—উতরাই
জ্যোৎস্না—আঁধার
জরা—যৌবন
জয়—পরাজয়
জাগরণ—নিদ্রা; সুপ্তি
জ্বলন—নির্বাণ
জাগ্রৎ, প্রবুদ্ধ—সুষুপ্ত
ঝটিতি—বিলম্ব
ডুবন্ত—ভাসন্ত
তন্বী—স্থূলা; স্থূলাংগী
তরুণ—বৃদ্ধ
তিতা—মিঠা
তিমির—আলোক
তামসিক—রাজসিক; সাত্ত্বিক
তেজঃ—ক্ষমা
দাতা—গ্রহীতা; ভিক্ষুক; বখিল; কৃপণ
দীর্ঘ—হ্রস্ব
দুরন্ত—শান্ত
দক্ষিণ—বাম
দ্যুলোক—ভূলোক
দাবি—উপরি
দুষ্কৃতি—সুকৃতি

শব্দ	বিপরীত শব্দ

দ্রুত—মন্থর
দৃঢ়—শিথিল
দুষ্কর—সুকর
ধনিক—শ্রমিক
নীচ—উচ্চ ; মহৎ
নিন্দা—প্রশংসা, স্তুতি
নিরত—বিরত, রত
নির্দয়—সদয়
নির্মল—মলিন
নরম—শক্ত
নিশ্চেষ্ট—সচেষ্ট
নীরস—সরস
ন্যূন—অধিক
পরকীয়—স্বকীয়
প্রফুল্ল—ম্লান
প্রাচীন—অর্বাচীন ; আধুনিক ; নব্য
পরুষ—পেলব
প্রবীণ—নবীন ; নব্য
পুরোভাগ—পশ্চাদ্ভাগ
প্রকৃতি—বিকৃতি
প্রত্যক্ষ—পরোক্ষ
প্রতিযোগী—সহযোগী ; অনুযোগী
প্রসন্ন—বিষন্ন
প্রসারণ—সংকোচন ; আকুঞ্চন
প্রাংশু—বামন
পূর্ণ—শূন্য
পরাধীন—স্বাধীন
পুরস্কার—তিরস্কার, দণ্ড
ফলন্ত—অফলা
বন্ধ ; বন্ধন—মুক্ত
বাদ—প্রতিবাদ
বিয়োগ—যোগ ; সংযোগ
বিধি—নিষেধ
বন্ধুর—মসৃণ
বর্ধমান—ক্ষীয়মাণ
বাদী—বিবাদী, প্রতিবাদী
বিশ্লেষণ—সংশ্লেষণ

শব্দ	বিপরীত শব্দ

বিনীত—উদ্ধত ; গর্বিত
বরখাস্ত—বহাল
বিপথ—সুপথ
বিমল—সমল
বিরল—গাঢ়
বিস্তৃত—সংক্ষিপ্ত
বোকা—সেয়ানা
ব্যর্থ—সার্থক ; অব্যর্থ
বিপ্রকর্ষ—সন্নিকর্ষ
বন্য—গৃহপালিত ; গ্রাম্য
বিজেতা—বিজিত
বাচাল—স্বল্পভাষী
ভীরু—নির্ভীক
ভাঁটা—জোয়ার, উজান
ভূত—ভবিষ্যৎ
ভদ্র—ইতর ; অভদ্র
ভূষণ—দূষণ
মিলন—বিরহ
মুখ্য—গৌণ
মৃদু—প্রবল ; উগ্র ; তীব্র ; তীক্ষ্ণ
মধুর—তিক্ত ; কটু
মরণ—জীবন ; বাঁচন, জনম
মান—অপমান
যশ—অপযশ ; কলংক
যোজক—প্রণালী
রুষ্ট—তুষ্ট
রোগী—নীরোগ
রাগ—শম ; শান্তি ; দ্বেষ
লাভ—ক্ষতি ; লোকসান
শিব—অশিব
শীতল—তপ্ত, উষ্ণ
শুষ্ক—আর্দ্র ; সিক্ত
শুকো—হাজা
শ্রদ্ধা—ঘৃণা, অশ্রদ্ধা
শোক—আনন্দ
শ্রম—বিশ্রাম, আলস্য
শ্বাস—প্রশ্বাস, নিশ্বাস

শব্দ	বিপরীত শব্দ

শিক্ষক—শিক্ষার্থী ; ছাত্র
সংক্ষেপ—বাহুল্য ; বিস্তার
সংকীর্ণ—প্রশস্ত
সরল—কপট ; কুটিল
সজীব—নির্জীব
সাদৃশ্য—বৈসাদৃশ্য
সঞ্চয়—ব্যয়, অপচয়
সংকোচ—বিস্তার, অসংকোচ
সন্ধি—বিগ্রহ
সাম্য—বৈষম্য
সমাপ্ত—আরব্ধ
স্বার্থ—পরার্থ
সাকার—নিরাকার
সুগন্ধি—দুর্গন্ধি
সুগম—দুর্গম
সুশীল—দুঃশীল
সৃষ্টি—প্রলয়, সংহার ; ধ্বংস
সাবধান—অনবধান
স্থাবর—জংগম
স্থূল—সূক্ষ্ম ; কৃশ
সমস্ত—ব্যস্ত
স্মৃতি—বিস্মৃতি
সত্য—মিথ্যা, অলীক
স্বর্গ—নরক ; পাতাল
সুধা—হলাহল
স্বতন্ত্র—পরতন্ত্র
সমষ্টি—ব্যষ্টি
সম্পদ—বিপদ ; আপদ
সুরভি—পূতি
সাধু—দুষ্ট ; চোর ; অসাধু ; ভণ্ড
স্নিগ্ধ—রুক্ষ
হৃদ্য—ঘৃণ্য
হর্ষ—বিষাদ
হ্রাস—বৃদ্ধি
হরণ—পূরণ

প্রয়োগ

ভারতের **ক্ষীয়মাণ** কুটীরশিল্পের মাঝে বিপ্লব দেখা না দিলে, ভারতীয় জনসাধারণের **ক্ষয়িষ্ণু** অবস্থার উন্নতি ঘটিবে না। পূতচরিত্র মানবমাত্রেই **ঐহিক** বোধ পরিহারপূর্বক **পারত্রিক** চিন্তা করিয়া থাকেন। দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যখন **সন্ধির** সর্ত অচল হইয়া পড়ে, তখন স্বভাবতই **বিগ্রহের** আগুন জ্বলিয়া উঠে। **ব্যষ্টিকে** অস্বীকার করিয়া **সমষ্টিকে** চালনা করা অশ্বের সম্মুখে শকট রাখিয়া চালাইবার প্রয়াসের ন্যায় নিরর্থক ও হাস্যকর। **অব্যর্থ** শরসন্ধানের ক্ষেত্রে অর্জুন ছিলেন **সার্থক** ধানুকী। কায়মনোবাক্যে যিনি **শান্তি** কামনা করেন, তিনি কখনও অপরের প্রতি **দ্বেষ** পোষণ করেন না। **অগ্রজ** শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ **অনুজ** লক্ষ্মণ পালন করিতেন। সকল পদার্থেরই **শৈত্যে সংকোচন** ও **উত্তাপে প্রসারণ** ঘটে। গান্ধীজীর **তিরোভাবে** ভারতীয় জাতি পিতৃহীন হইয়াছে। আজিকার দিনে **শিক্ষক-ছাত্রের** সম্পর্ক, অতীত কালের ন্যায় মধুর নয়। কল্যকার অধিবেশনে **ওস্তাদ-সাকরেদের** সংগীতচর্চা খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। **মরণ-বাঁচনের** কথা কে বলিতে পারে? **রাজসিক** আহার **সাত্ত্বিক** ভাবগঠনের পরিপন্থী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই **স্থূলা** রমণী **তন্বী** নারীর চেয়ে কর্মিষ্ঠা হয় না। **আপদে-সম্পদে** যিনি সমভাবে ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্মভীরু ব্যক্তি। চন্দ্রের **হ্রাসবৃদ্ধিতে** সাগরে **জোয়ারভাঁটা** দেখা দেয়। **দুষ্ট** জনের সংসর্গে পড়িয়া **সাধু** ব্যক্তিরও সর্বনাশ ঘটিয়া থাকে।

অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির বিপরীতার্থক শব্দদ্বারা একটি করিয়া বাক্য রচনা কর:—প্রফুল্ল; গর্বিত; বিরক্ত; উগ্র; কৃত্রিম; শ্রম; সন্ধি; সঞ্চয়; ভূত; বিরল। ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭

[দুই] নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতে পাঁচটি বাছিয়া লইয়া উহাদের সমার্থক প্রতিশব্দ দ্বারা একটি ও বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা একটি করিয়া বাক্য রচনা কর:—স্থূল, বিসর্জন, গর্বিত, স্তুতি, হ্রাস, স্নিগ্ধ, কৃত্রিম, উগ্র, মধুর, অর্বাচীন। রা. বি. মাধ্যমিক '৫৬

[তিন] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনও পাঁচটির বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ও সেই শব্দগুলি লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর:—হর্ষ, বিরত, বর্ধমান, ঐহিক, সন্ধি, সমষ্টি, শ্রম, প্রফুল্ল, রাগ, জয়, আরোহণ, অগ্রজ, প্রসারণ, আবির্ভাব, শিক্ষক, ওস্তাদ, মরণ, হ্রাস, আপদ, তামসিক, ক্ষয়িষ্ণু, তন্বী, সাধু; প্রাচীন, অধঃ, চড়াই, জড়, জংগম, প্রত্যক্ষ, দ্যুলোক, নরম, কৃতঘ্ন, দুরন্ত, ধনিক, তিক্ত; আরোহণ, বক্র, জংগম, তন্বী, সুধা, সহযোগী, গৌরব; ব্যষ্টি, হ্রাস, সুকৃতি, জংগম, সরল।

ক. বি. মাধ্যমিক '৪৪, '৪৯, (অতি) '৪৯, (কলা) '৫৫; বি. এ. '৫৬

চতুর্থ পর্ব

পদ-প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

পদপরিচয়
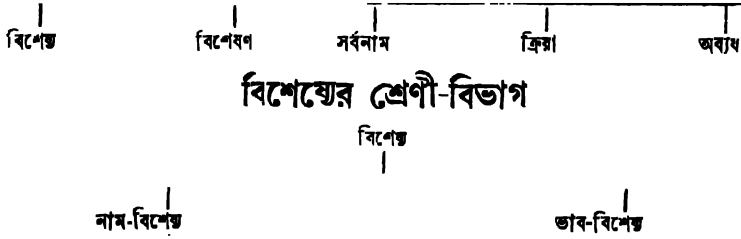
'কৃষ্ণ, রাধা, সামসুদ্দিন' ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য। 'ঢাকা, রাজসাহী, কলিকাতা, দিল্লী' স্থানবাচক বিশেষ্য। 'জল, ফল' দ্রব্যবাচক বিশেষ্য। 'মানুষ, সাপ' জাতিবাচক বিশেষ্য। 'অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা' গুণবাচক বিশেষ্য। 'সুখ, দুঃখ' অবস্থাবাচক বিশেষ্য। 'আহার, দর্শন' কার্যবাচক বিশেষ্য। ভাব-বিশেষ্য, ভাব-বচন বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য একাধারে বিশেষ্যবোধক ও ক্রিয়াবোধক। ভাব-বিশেষ্য ক্রিয়াবোধক হিসাবে কর্তা কর্ম প্রভৃতি কারকের সহিত যেমন অন্বিত হইয়া থাকে, আবার বিশেষ্যবোধক হিসাবে নিজে কারকত্বও পায়: যেমন,—চক্রবর্তী কোম্পানীর বই 'বাঁধাই' ভাল। এখানে ক্রিয়ারূপে 'বাঁধাই'-এর কর্ম 'বই' এবং বিশেষ্যরূপে 'বাঁধাই' 'হয়' এই উহ্য ক্রিয়ার কর্তা।

বিশেষ্যের নিম্নলিখিত প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়:—(১) বিশেষণরূপে বিশেষ্যের ব্যবহার: যেমন,—কর্মকারের কাছে আমি একখানি 'রাম'-দা গড়াইতে দিয়াছি। (২) ক্রিয়াবিশেষণরূপে বিশেষ্যের ব্যবহার: যেমন,—বিবাহের কথা উত্থাপন করিতেই মঞ্জুশ্রীর মুখ লজ্জায় যেন 'জবাফুল' হইয়া গেল।

বিশেষণের শ্রেণী-বিভাগ
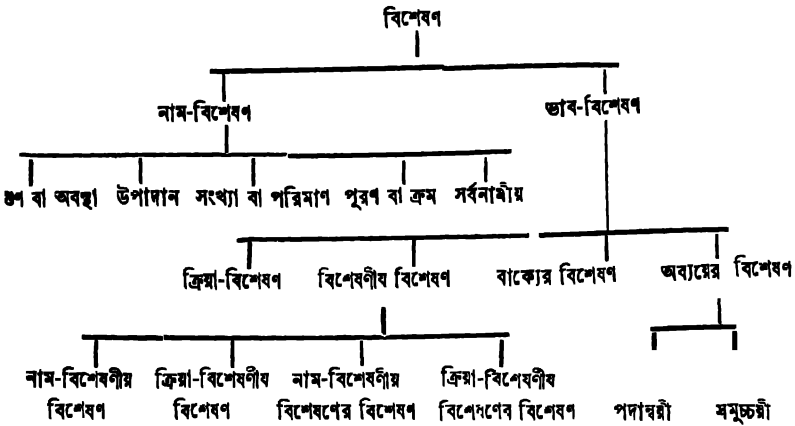
নাম-বিশেষণ

নাম-পদ তথা বিশেষ্যপদ, সর্বনামপদ ও বিশেষণপদের সংগে যুক্ত হয়। অর্থ বিচার করিয়া নাম-বিশেষণকে মোটামুটি ভাবে পাচটি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়: যেমন,—(ক) গুণ বা অবস্থা-বাচক নাম-বিশেষণ: যথা,—'সহিষ্ণু' ব্যক্তি, 'পরাধীন' জীবন; (খ) উপাদান-বাচক নাম-বিশেষণ: যথা,—'মেটে' হাঁড়ি। (গ) সংখ্যা বা পরিমাণ-বাচক নাম-বিশেষণ: যথা,—'দশ-জন' মানুষ, 'চার' বাটি দুধ, 'বহু' লোক। (ঘ) পূরণ-বা ক্রম-বাচক নাম-বিশেষণ: যেমন,—'দ্বিতীয়' পুত্র, 'সাতই' আশ্বিন। (ঙ) সর্বনামীয় বা সর্বনাম-জাত বিশেষণ: যেমন,—'মদীয়' ভবনে একবার আপনি আসিবেন। 'সে' কথা আমার মনে নাই।

ভাববিশেষণ

বিশেষ্য ও সর্বনাম ছাড়া অন্য পদ বা বাক্যকে যে পদ বিশেষিত করে, সেই পদের নাম ভাব-বিশেষণ। (ক) ক্রিয়া-বিশেষণ: যথা,—যথেষ্ট সময় থাকায় ষ্টেশনের অভিমুখে আমরা 'ধীরে' চলিলাম। (খ) নামবিশেষণীয় বিশেষণ: যথা,—সব্যসাচী 'অতি' চরিত্রবান ছাত্র। (গ) ক্রিয়াবিশেষণীয় বিশেষণ: যথা,—দুর্বল শরীরে 'খুব' ধীরে ধীরে পথ চল। (ঘ) নামবিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ: যথা,—'অল্প' কিছু কম টাকা লইয়া তিনি শ্যামকে দেনার দায় হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। (ঙ) ক্রিয়া-বিশেষণীয় বিশেষণের বিশেষণ: যথা,—'এত' তাড়াতাড়ি করিয়া চলিতেছ কেন? (চ)

বাক্যের বিশেষণ : যথা,—'সৌভাগ্যক্রমে' বাসগাড়ীখানি গতিবেগ কমাইয়া ছেলেটিকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। (ছ) পদান্বয়ী অব্যয়ের বিশেষণ : যথা,—আমাদের কলেজের অধ্যক্ষমহাশয় তো 'একেবারে' মহাদেবের ন্যায় নিস্পৃহ। (জ) সমুচ্চয়ী অব্যয়ের বিশেষণ : যথা,—আগন্তুকের সংগে আলাপ করিয়া বুঝিলাম, সম্প্রতি সে কার্যোদ্ধারের জন্য একজন 'আস্ত' বিড়ালতপস্বী সাজিয়াছে।

লক্ষণীয় কয়েকটি বিষয়

ইহা ছাড়া, আরও কিছু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে : যেমন,—(১) সম্বন্ধপদীয় বিশেষণের দৃষ্টান্ত—'ভোরের ঘুম' যেন কিছুতেই ভাঙ্‌তে চায় না। (২) যৌগিক বিশেষণের দৃষ্টান্ত—'তালিমারা' পাঞ্জাবী গায়ে দিয়েই সে বেরিয়ে পড়ল। 'বিয়ে-পাগলা' অরুণকে লইয়া তরুণ সিনেমা দেখিতে গেল। (৩) বহুপদীয় বিশেষণের দৃষ্টান্ত—'আপন-ভাবে-আপনি-বিভোর' ব্যক্তি জীবনে কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। (৪) ধ্বন্যাত্মক বিশেষণের দৃষ্টান্ত—এমন 'প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে' ছেলে কদাচিৎ দেখা যায়। (৫) বিধেয় বিশেষণের দৃষ্টান্ত—গান্ধীজী আমাদের 'নমস্য'। (৬) অনুবর্তী বিশেষণের দৃষ্টান্ত—'আলুভাজা' মুখরোচক সামগ্রী। (৭) লক্ষ্যার্থক বিশেষণের দৃষ্টান্ত—রমেনবাবু একেবারে 'মাটির মানুষ'। (৮) বীপ্সাত্মক বিশেষণের দৃষ্টান্ত—বিয়েবাড়িতে 'হাঁড়ি-হাঁড়ি' রসগোল্লা যাইতেছে। (এখানে বিশেষ্যশব্দের বীপ্সা ঘটিয়াছে।) প্রতি বছরেই ভারত হইতে 'লাখ-লাখ' টাকা বাহিরে চলিয়া যায়। (এখানে বিশেষণ শব্দের বীপ্সা ঘটিয়াছে।) 'টানাটানা' চোখে সে সুরমা দিয়াছে। (এখানে কৃদন্ত পদের বীপ্সা ঘটিয়াছে।) (৯) বিশেষণরূপে বিশেষ্যপদের প্রয়োগ—কবিতাটির 'সার' মর্ম লিপিবদ্ধ কর। (১০) বিশেষ্যরূপে বিশেষণের একবচন অথবা বহুবচন গ্রহণ—'বড়'র সংগে 'ছোট'র বন্ধুত্ব হয় না। 'বড়দের' কথা আর বলিবার নয়, 'ছোটদের' প্রতি তাহারা একবারেই বেদরদী। (১১) বিশেষণের আলংকারিক প্রয়োগ—'সুবাসিত' রজনীতে তরুণ-তরুণী 'পুষ্পিত' বাক্য ও 'ক্ষুব্ধ' অভিমানের 'মোহন' মালা রচনা করিয়া থাকে।

(ক) বিশেষ্য-বিশেষণে বিভক্তিযোগে ক্রিয়া-বিশেষণ—সে এখানে 'বিলম্বে' আসিয়াছে। বাতাস 'ধীরে' বহিতেছিল। (খ) সমস্তপদীয় ক্রিয়াবিশেষণ—পাগলটি 'অনর্গল' বকিতেছে। (গ) বীপ্সায় ক্রিয়াবিশেষণ—ছায়াচিত্রের টিকিট কাটিবার জন্য আবালবৃদ্ধ 'সারিসারি' দাঁড়াইয়া আছে। (ঘ) ক্রিয়ামূলক ক্রিয়া-বিশেষণ—মেয়েটি 'ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে' কাঁদছে।

সর্বনামের শ্রেণী-বিভাগ
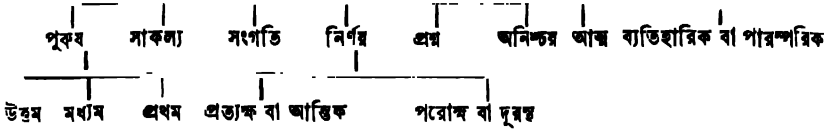
যে পদ 'সর্ব' মানে 'সর্ব-জাতীয' নাম তথা বিশেষ্যপদেব স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাহাকেই বলা হয সর্বনাম। (১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনামের গোষ্ঠীতে পড়ে 'আমি, মুই, মোবা, আমরা' উত্তম পুরুষের সর্বনাম, 'তুই, তুমি, আপনি, তোবা, তোমবা, আপনারা' মধ্যম পুরুষের সর্বনাম এবং 'সে, তিনি, তাহা (তা), তাহাবা, তা'রা, তাঁহাবা, তাঁ'রা' প্রথম পুরুষেব সর্বনাম। (২) 'উভয়, সকল, সর্ব'—এই কয়টি সাকল্যবাচক সর্বনাম। (৩) 'যে, যিনি, যাহা'—এইগুলি সংযোগ, সম্বন্ধ বা সংগতিবাচক সর্বনাম। (৪) 'এ, ইহা, ইনি'—এই কয়টি প্রত্যক্ষ নির্ণযসূচক বা উল্লেখসূচক সর্বনাম এবং 'ও, উহা, উনি'—এই কযটি পবোক্ষ নির্ণয়সূচক বা উল্লেখসূচক সর্বনাম। (৫) 'কে, কি, কোন্, কাহাব'—এই কযটি প্রশ্নসূচক সর্বনাম। (৬) 'কেহ, কেউ, কিছু'—এই কয়টি অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম। (৭) 'স্বযং, নিজ, আপনি'—এইগুলি আত্মবাচক সর্বনাম, ইহাব প্রয়োগ এইরূপ:—তুমি 'আপনি' এই কথা বলিয়াছিলে। (৮) ব্যতিহারিক বা পাবস্পবিক সর্বনাম বুঝাইতে 'পবস্পব' অর্থে বা 'স্বেচ্ছায়' অর্থে 'আপনা-আপনি' এইদ্বিত্ব রূপ ব্যবহৃত হয়। 'পবস্পর' অর্থে 'আপন' শব্দেবও ব্যবহাব আছে: যেমন,—'আপনেব' মধ্যে বাদবিতণ্ডা করা অনুচিত।

ইহা ছাডা, (ক) সাপেক্ষ সর্বনামের উদাহরণ—'যে' নবহত্যা করে, 'সে' মহাপাপী। এই উদাহরণে দেখা যায়, 'যে' সর্বনামটি ব্যবহৃত হওয়ায় 'সে' সর্বনামটি আবশ্যক রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহাই সাপেক্ষ সর্বনামের প্রযোগবিধি। (খ) নিবপেক্ষ সর্বনামের উদাহরণ—'তুমি' এই কাজ কবিয়াছ। (গ) যৌগিক সর্বনামের উদাহরণ—'আমবা সবাই' তাহাব কর্মনীতি সমর্থন করি। (ঘ) পুবা বাক্যের পবিবর্তে সর্বনামের প্রয়োগ—ক্রোড়পতি রবীন্দ্রনাথ আজ পথের ভিখারী হইয়াছেন! 'ইহাই' কি আমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে? (ঙ) বাক্যাংশের পরিবর্তে সর্বনামের প্রয়োগ—পাডা-প্রতিবেশীব সংগে তোমার যে আচবণ, 'তাহা' আমি কোন ক্রমেই সমর্থন করিতে পাবি না।

ক্রিয়ার শ্রেণী-বিভাগ

ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষ করিলে দুইটি অংশ পাওয়া যায়: একটি, অবিভাজ্য অপরিবর্তনীয় মৌলিক অংশ এবং অপরটি, প্রত্যয় ও বিভক্তি। প্রথমাংশটিই ক্রিয়া-পদের অন্তর্নিহিত নিছক ভাবটিকে ব্যঞ্জিত করে আর ইহারই নাম **ক্রিয়া-প্রকৃতি** বা **ধাতু**। অতঃপর দ্বিতীয়াংশটি ঐ ধাতুর বিকার অথবা পূর্তি ঘটাইয়া ক্রিয়াপদ গঠন করে।
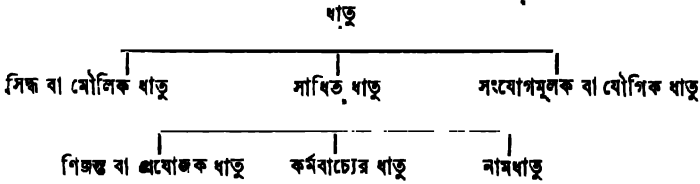
বাংলা ধাতুসমূহের উৎপত্তি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিলে উল্লিখিত শ্রেণীসমূহে বিভক্ত করা যায়। (১) যে ধাতুসমূহ স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ যাহাদিগের বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, তাহাদিগকে **সিদ্ধ** বা **মৌলিক ধাতু** বলা হয়: যেমন,—'কর্, খা, গাহ্, চল্; দে'। (২) যে সমস্ত ধাতুকে বিশ্লেষ করিলে অপর একটি ধাতু অথবা নামশব্দ এবং এক বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায়, তাহাদিগকে **সাধিত ধাতু** বলা যায়: যেমন,—'করা, বেঁধা, বেতা'। (২ক) যে সমস্ত মৌলিক ধাতুতে 'আ' বা '-ওয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহারাই **ণিজন্ত** বা **প্রযোজক ধাতু**: যেমন,—'কর্+আ=করা, খা+আ=খাআ >খাওয়া (ব-শ্রুতিতে)'। (২খ) যে সমস্ত মৌলিক ধাতু কর্মবাচ্যে '-আ' প্রত্যয়-যুক্ত হয়, তাহাদিগকে **কর্মবাচ্যের ধাতু** বলে: যেমন,—'বিঁধ্+আ=বিঁধা> বেঁধা' (উদাহরণ—নাকে নথ পরিবার জন্য সে নাক 'বেঁধায়'।) (২গ) সাধারণ বিশেষ্য বিশেষণ এবং (প্রসারে) অব্যয় শব্দে '-আ' প্রত্যয় যোগ করিয়া যে সকল ধাতু নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে **নামধাতু** বলে: যেমন,—'লাঠি বা লাঠা+আ=লাঠা, জুতা+আ =জুতা; বেত+আ=বেতা; থমক+আ=থমকা; ধমক+আ=ধমকা, দাবড+আ দাবড়া; আঁচড+আ=আঁচড়া; ঘষট+আ=ঘষটা; ছোবল+আ=ছোবলা, ডুকর+আ =ডুকরা, ঝলস+আ=ঝলসা; লেংচ+আ=লেংচা। (৩) 'কর্, দে, পা, হ্' প্রভৃতি কতিপয় ধাতুর সংগে বিশেষ্য বিশেষণ শব্দাদি অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দ জুড়িয়া দিয়া যে ধাতুগুলি গঠিত হয়, তাহাদিগকেই **সংযোগমূলক** বা **যৌগিক ধাতু** বলা হয়: যেমন,—'ভ্রমণ কর্; উত্তর দে; লজ্জা পা; রাজী হ্' ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় প্রায় সকল বিশেষ্যপদেরই সহিত 'কর্' ধাতু জুড়িয়া দিয়া সংযোগমূলক ধাতু গঠন করা যায়।

দ্রষ্টব্য : ধ্বন্যাত্মক বা **অনুকারধ্বনিজ** ধাতু নামেও একজাতীয় ধাতু মেলে। ধ্বনি বা শব্দের অনুকরণে '-আ' প্রত্যয়যোগে এই জাতীয় ধাতু গঠিত হয় : যেমন,—'ফোঁস্-ফোঁস্ +আ=ফোঁস্-ফোঁসা ; হাঁচ্+আ=হাঁচা'। ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারবাচক অব্যয় শব্দ হইতে জাত এই ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারধ্বনিজ ধাতু মূলত নামধাতুই। আবার এই ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বয় অবলম্বনে সংযোগমূলক বা যৌগিক ধাতুও গঠন করা যায় : যেমন,—'ফোঁস্-ফোঁস্ কর্', 'হাঁচি দে'।
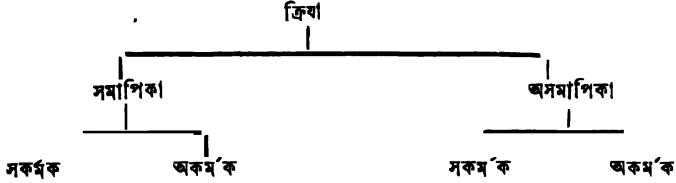
সমাপিকা ক্রিয়ায় বক্তব্য বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। অকর্মক ক্রিয়া কর্তাকে অবলম্বন করিয়া ঘটে—ইহার কর্ম নাই : যেমন,—লিচুগাছটি 'বাড়িতেছে'। সকর্মক ক্রিয়ায় ক্রিয়াপদের দ্বারা বর্ণিত ব্যাপার কোনও কর্মকে অবলম্বন করিয়াই সমাপ্ত হয় : যেমন,—সে 'বই' পড়ে। সকর্মক ক্রিয়ার একাধিক কর্মও থাকে : যেমন,—ছাত্র 'শিক্ষকমহাশয়কে' 'প্রশ্ন' করিল। 'প্রশ্ন' মুখ্য কর্ম 'শিক্ষকমহাশয়কে' গৌণ কর্ম

প্রযোজক বা **প্রেরণার্থক ক্রিয়ায়** ক্রিয়ার কাজ একজনের প্রেরণা বা চালনার দ্বারা অপর জন কর্তৃক সংঘটিত হয়। ক্রিয়াকে প্রেরণার্থক করিতে হইলে 'ণিচ্' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। তাই প্রযোজক বা প্রেরণার্থক ক্রিয়াকে **'ণিজন্ত ক্রিয়া'**ও বলা হয়। প্রযোজক ক্রিয়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল কর্ম অকর্মক থাকিলে, প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়। মূল ক্রিয়া ও প্রযোজক ক্রিয়ার প্রয়োগ-বৈচিত্র্য এইরূপ :

মূল ক্রিয়া	**প্রযোজক ক্রিয়া**
(ক) শিশু 'হাসে'। (মূল ক্রিয়া অকর্মক)	(ক) পিতা শিশুকে 'হাসায়'।
(খ) শিশু 'দুধ' খায়। (মূল ক্রিয়া সকর্মক)	(খ) জননী শিশুকে দুধ 'খাওয়ায়'।
(গ) হরেন নরেনকে বই 'দিল'। (মূল ক্রিয়া দ্বিকর্মক)	(গ) শিক্ষকমহাশয় হরেনকে দিয়া নরেনকে বই 'দেওয়াইলেন'।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। অসমাপিকা ক্রিয়াও সকর্মক অথবা অকর্মক হইতে পারে : যেমন,—সে 'ভাত' 'খাইয়া' আসিবে। (এখানে 'খাইয়া' অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম 'ভাত')। সে 'আসিলে' আমি যাইব। (এখানে 'আসিলে' অসমাপিকা ক্রিয়াটি অকর্মক)। উল্লিখিত দুইটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিলে ইহাই আমরা পাই যে, '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ও বাক্যের

সমাপিকা ক্রিয়া—উভয়েরই কর্তা এক ও অভিন্ন। ইহা ছাড়া, এই **কর্তৃনিষ্ঠ অসমাপিকা ক্রিয়া** পূর্ববর্তিতাবোধকও বটে। তবে, **ভাবে সপ্তমী** বুঝাইলে আলাদা কর্তাও হইতে পারে: যেমন, ঝড় 'উঠিয়া' নৌকা ডুবিয়া গেল। কিন্তু '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা সাধারণত সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা হইতে বিভিন্ন হয়। এই জাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়াকে **সাপেক্ষিকা বা অবস্থাত্মিকা ক্রিয়াও** বলা হয় এইজন্য যে, এই অসমাপিকা ক্রিয়ারই উপরে সমাপিকা ক্রিয়া একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই **অন্যাশ্রয়ী অসমাপিকা** ক্রিয়া ভাবে সপ্তমী বুঝাইবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী: যেমন—'বর্ষা 'পড়িলে' ছোটখাট নদীতে নৌকা চলে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার কয়েকটি বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) কর্তা অথবা ক্রিয়ার বিশেষণরূপে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে: যেমন,—'কাঁদিয়া কাঁদিয়া' নববধূ পতিগৃহে যাত্রা করিল। এই পত্রটি 'ধরিয়া ধরিয়া' লিখিবে। (২) সমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষণ রূপেও অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়: যেমন,—ধীরেন তাহার বন্ধুর জিনিষপত্তর 'কষিয়া' বাঁধিল। গ্রামবাসিগণ জমিদারকে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 'চাপিয়া' ধরিল। (৩) 'পরে' এই ক্রিয়াবিশেষণটিকে '-ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিতও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়: যেমন,—রাম আসিলে 'পরে' শ্যাম যাইবে।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ

(ক) কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর '-ইতে' প্রত্যয় যোগ করিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ গঠন করা যায়। ক্রিয়াবাচক বিশেষণের প্রয়োগ, হয় একরূপে, নয় দ্বিরুক্তরূপে, ঘটিয়া থাকে: যেমন,—রাম না 'হইতে' রামায়ণ। আমি তাহাকে 'আসিতে' দেখিলাম। নরেনকে কাঁঠাল 'পাড়িতে' দেখিয়াছিলাম। সমুদ্রের মনোহর দৃশ্য 'দেখিতে দেখিতে' আমরা অগ্রসর হইলাম। মহালে জমিদারবাবু 'থাকিতে থাকিতে' প্রজারা খাজনা চুকাইয়া দিয়া গেল। (খ) কর্মবাচ্যে ধাতুর উত্তর '-আ' এবং '-আনো' প্রত্যয় যোগ করিয়াও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ গঠন করা হয়: যেমন,—সুনীতিবাবুর ব্যাকরণ তো আমার 'পড়া' বই। জামা 'কাচানো' হয় নাই। (গ) মৌলিক ধাতুর উত্তর '-অন্ত' প্রত্যয় যোগ করিয়া কর্তৃবাচ্যের বিশেষণ গঠিত হয়: যেমন,—'ডুবন্ত' সূর্যের শোভা অনির্বচনীয়। 'উঠন্ত' বয়সে বালকদিগকে সাবধান থাকিতে হয়। (ঘ) সংস্কৃত ধাতুর উত্তর 'ক্ত, তব্য, অনীয়, শানচ্' প্রত্যয়াদি যোগ করিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠিত হয়: যেমন,—'হৃত' সামগ্রী ফিরিয়া পাইবার আশা আমি রাখি না। আমার 'কর্তব্য' কার্য সমাধা করিয়াছি। আপনার দোকানে 'পানীয়' জল আছে কি? 'আসীন' ভদ্রলোকটিকে যথারীতি সম্ভাষণ করিলাম।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা ভাব-বচন

ধাতুর সহিত কতিপয় প্রত্যয়-যোগে ক্রিয়ার ভাব বা কাজ জানানো হয়: যেমন,—দেখন, বাটনা, গোড়ালী, বোল-চাল, বুলি, ফেরী বা ফিরি, নেওয়া, করা, জিয়ানো, ঝাঁকানি, জলুনি, জলনি, মেলানি, চোলাই, উতরাই, বনিবনাও, দিবামাত্র, ধরিবার, আসিবারে। [পূর্বে 'বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগের' আলোচনায় এতৎসম্পর্কে বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে।]

নঞর্থক বা পংগু ক্রিয়া

অস্তি-বাচক 'হ্' ধাতুর আগে নঞর্থক 'ন' শব্দযোগে 'নহ্' ধাতুর উৎপত্তি ঘটে। এই 'নহ্' ধাতুর প্রয়োগে 'হ' ধাতুর সর্ববিধ রূপ পংগুত্ব তথা নিষ্ক্রিয়তা পায় বলিয়া ইহাকে বলা হয় **নঞর্থক** বা **পংগু ক্রিয়া**। নিত্য বর্তমানেই এই ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে, অন্যকালে ইহার প্রয়োগ হয় না। সাধু ভাষায় এই ক্রিয়ার রূপ পাওয়া যায়—'নহি, নহ; নহিস্, নহেন; নহে', কিন্তু চলিত ভাষায় ইহার রূপ হয়—'নই, নও, ন'স্; নন্, নয়। এই ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপ হইতেছে—'নহিলে, নইলে'। কবিতায় 'নার্' এই নঞর্থক ধাতুর ব্যবহার আছে। অব্যয় 'না বা ন' এবং 'পার্' ধাতুর যোগে 'নাপার্>নার্' ধাতুর উৎপত্তি ঘটিয়াছে। 'নারিলাম, নারিনু, নারিলা, নারিবি, নারিবা' ইত্যাদির প্রয়োগ কবিতায় যথেষ্ট মিলে। অসমাপিকা ক্রিয়ায় এই ধাতুর রূপ হয়—'নারিয়া, নারিলে, নারিতে'।

সংযোগমূলক বা যৌগিক বা মিলিত ক্রিয়া

'-ইতে' এবং '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সমাপিকা ক্রিয়ার যোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। এই জাতীয় ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়াপদটির অর্থই প্রধান এবং দ্বিতীয় ক্রিয়াপদটি প্রথম ক্রিয়ার অর্থকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সাহায্য করে। তাই দ্বিতীয় ক্রিয়াপদটিকে প্রথম বা **মৌলিক** ক্রিয়ার **সহকারী ক্রিয়া** বলা যাইতে পারে: যেমন,—'করিতে লাগ্, খাইতে থাক্, খাইতে দে, কাড়িয়া লহ্; সরিয়া পড়্; বসিয়া যা; লাফাইয়া পড়্, গিয়া থাক্, চাহিয়া দেখ্'। বলা বাহুল্য, যৌগিক ক্রিয়ার সমাপিকা অংশটিকেই সহকারী বলা হইয়াছে।

প্রসংগত, আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় ভিন্নার্থক দুইটি ধাতু পাশাপাশি পৃথকরূপে প্রযুক্ত হইয়াও উভয়ে মিলিত ভাবে একটি অর্থই প্রকাশ করে: যেমন,—ছাত্রটি মন দিয়া 'পড়াশুনা' করে (=পাঠাদি করে)। পাচক ঠাকুর 'রান্নাবান্না' করিয়াছে (=অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে)। এই জাতীয় ক্রিয়াপদে ইহাই লক্ষ্য করা যায় যে, যৌগিক ক্রিয়ার ন্যায় একটি ধাতুর অর্থ মুখ্য এবং অপরটির অর্থ গৌণ নয়, পক্ষান্তরে উভয় ধাতুরই অর্থ বলবান।
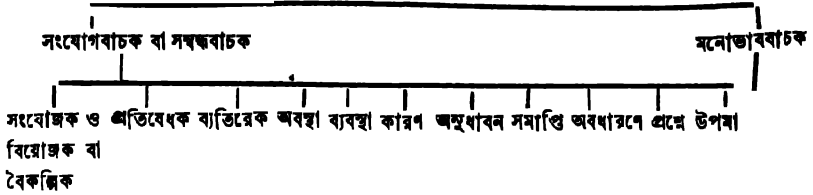
সম্মতি অসম্মতি অনুমোদন ঘৃণা বা বিরক্তি মনঃকষ্ট বিস্ময় করুণা আহ্বান অনুকার

(ক) 'এবং, ও, আর' প্রভৃতি সংযোজক সমুচ্চয়ী অব্যয়: 'কিংবা, অথবা, চাই কি, না-না, না' প্রভৃতি বিয়োজক অব্যয়, 'অর্থাৎ, অনন্তর' প্রভৃতি বৈকল্পিক অব্যয়। (খ) 'কিন্তু, অধিকন্তু, তো, নয় তো, তথাপিও, পুনশ্চ, তথাচ' প্রভৃতি প্রতিষেধক বা প্রাতিপক্ষিক অব্যয়। (গ) 'যদি না, নতুবা' প্রভৃতি ব্যতিরেকাত্মক অব্যয়। (ঘ) 'যদি, যদি নাকি, যাই, হইলে' প্রভৃতি অবস্থাত্মক অব্যয়। (ঙ) 'তবে, তদনন্তর, কখনও কখনও, তবে নাকি, তাহা হইলে প্রভৃতি ব্যবস্থাত্মক অব্যয়। (চ) 'কারণ, বলিয়া, যে হেতু, যে কারণে' প্রভৃতি কারণাত্মক অব্যয়: ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত— বকিয়াছি 'বলিয়া' সে আর আমার সংগে দেখাসাক্ষাৎ করে না। (ছ) 'এই জন্য, এই হেতু, তাইতে' প্রভৃতি অনুধাবনাত্মক অব্যয়: ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'এই হেতু' আমি তাহার বাড়িতে যাই না। (জ) 'যাহাতে (lest), শেষটা, আখের' প্রভৃতি সমাপ্তিবাচক অব্যয়: ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'শেষটা' তুমি এই কাজ করেছ? (ঝ) 'তো, না, মেনে, বটে' প্রভৃতি অবধারণে, পাদপূরণে, বাক্যালংকারে ব্যবহৃত অব্যয়: ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—তুমি 'না' গাইয়ে? (ঞ) 'অ্যাঁ? কি? বটে? হ্যাঁ? না কি? হ্যাঁ?' প্রভৃতি প্রশ্নাত্মক অব্যয়: ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'বটে'? খুব বাহাদুর হয়েছ 'না কি'? (ট) 'যেন, মনের মত, যথা-তথা, ন্যায়, যেমন' প্রভৃতি উপমাদ্যোতক অব্যয়: ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—সে আমার 'মনের মত' জন। এই এগারো প্রকার অব্যয় শব্দ সম্বন্ধ বা সংযোগ-বাচক অব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(ক) 'আচ্ছা, আজ্ঞে, যথা-আজ্ঞা, যা বলেন, তাই' প্রভৃতি সম্মতিজ্ঞাপক অব্যয়: ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'আচ্ছা', এ কাজ আমি করব। (খ) 'না, একদম না, আদৌ না, প্রায়ই না, কখনো না' প্রভৃতি অসম্মতিজ্ঞাপক অব্যয়: ইহার প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত— চাকুরীর কথা বলিতেই বড়বাবু 'একদম না' বলিয়া দিলেন। (গ) 'বাঃ বাঃ বাঃ, বাহবা, বেড়ে, কি খাসা, সাবাস্, বলিহারি যাই, মরি মরি, ধন্য ধন্য' প্রভৃতি অনুমোদন-

জ্ঞাপক অব্যয়ঃ ইহাব প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—তাহার ছেলেটি 'কি চমৎকাব'! (ঘ) 'ছিঃ ছিঃ, রামঃ বামঃ, আ মলো, ছাই, ধ্যেৎ, দুত্তোর' প্রভৃতি ঘৃণা বা বিবক্তিব্যঞ্জক অব্যয়ঃ ইহার প্রযোগ-দৃষ্টান্ত—'ম্যাঃ গে'। ও বাডিব নতন বৌয়েব কি চেহাবা! (ঙ) 'উঃ, ওঃ, বাপ, গেলাম বে, মারে' প্রভৃতি ভয় যন্ত্রণা বা মনঃকষ্টব্যঞ্জক অব্যয়ঃ ইহাব প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'মা গো'। তোমাব মনে এই ছিল! (চ) 'ওব্বাবা, বল কি, ওমা, কোথা যাবো, হবি হবি' প্রভৃতি বিস্ময়দ্যোতক অব্যয়ঃ ইহাব প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'ওমা'! 'কোথা যাবো'। আমাব ববাতে এও ছিল। (ছ) 'বাছা আমার, ধন আমাব, আহা হা, হায় হায়' প্রভৃতি করুণদ্যোতক অব্যয়ঃ ইহাব প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—'আহা হা'। অহিংস গান্ধীজী হিংসাব অনলে প্রাণ আহুতি দিলেন। (জ) 'আব, ওগো, ওলো, তুতু, চৈচৈ, আ আ, আয আয়' প্রভৃতি আহ্বান বা সম্বোধন-দ্যোতক অব্যয়ঃ ইহাব প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—বাডিব পোযা কুকুবটিকে না দেখিতে পাইয়া তিনি 'তুতু' স্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। (ঝ) 'কুহু-কুহু, ঝাঁ-ঝাঁ, কড্ কড্, খাঁ-খাঁ, টিম্-টিম্' প্রভৃতি অনুকার-বাচক অব্যয়ঃ ইহাব প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত—গতকাল 'কড্ কড্' শব্দে বাজ পডিযাছিল।

(১) কয়েকটি অব্যযেব সহাযতায় শব্দেব পরে বিশেষ বিশেষ বিভক্তি যুক্ত কবা হয়। এহেন বিভক্তিযুক্ত পদেব সংগে এই অব্যয়গুলিব অন্বয় থাকায়, অব্যযগুলিকে **পদান্বয়ী অব্যয়** বলা হয়ঃ যেমন,—অমৃতবাজাব পত্রিকাব 'চেয়ে' হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা যথেষ্ট ভাল। (২) যে অব্যযগুলি দুইটি বাক্য অথবা পদেব সংযোজন বা বিযোজন কবিয়া থাকে, তাহাদিগকে **সমুচ্চয়ী অব্যয়** বলা হয়ঃ যেমন,—স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্মবীর 'ও' কর্মবীর। তুমি 'অথবা' তোমাব ভাই আমার কাছে থাকিতে পার। (৩) যে অব্যয়গুলি বাক্যেব মধ্যে অবস্থিত থাকিযাও অপব পদের সংগে ব্যাকরণগত সম্বন্ধবিরহিত, তাহাদিগকে **অনন্বয়ী অব্যয়** বলা হয়ঃ যেমন,—নবেন 'নাকি' সিটি কলেজেই পডিবে? মহাত্মা গান্ধী অহিংস 'বটে'। 'ছিঃ' তোমার ন্যায় কৃতী ছাত্রের এই চৌর্যবৃত্তি! এই পদান্বয়ী সমুচ্চয়ী ও অনন্বয়ী অব্যয়কে **নিরপেক্ষ অব্যয়ও** বলা যাইতে পাবে। কাবণ,—এই অব্যয় বাক্যেব অপর অংশের উপরে নির্ভরশীল থাকে না। (৪) একাধিক শব্দযোগে **যৌগিক অব্যয়** হইয়া থাকেঃ যথা,—'তাও আবাব, তদনন্তর, এমন কি, তবে কিনা, যদি বা, তাহা হইলে'। (৫) কতকগুলি অব্যয় এমন আছে, যাহাদের একটিকে ব্যবহার করিলে অপর একটি অব্যয়কেও ব্যবহার করিতে হয, নচেৎ বাক্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—এহেন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অব্যয়কে **সাপেক্ষ** বা **নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়** বলা হয়ঃ যেমন,—গভীব রজনীতে 'যাই' চোর চোর বব উঠিল, 'অমনি' পাডার লোকে জাগিল। 'পাছে' লোকে কিছু বলে, 'তাই' সে নীরব থাকে।

বিভিন্ন পদরূপে অব্যয়ের ব্যবহার

(ক) বিশেষ্যরূপে অব্যয়ের প্রয়োগ : যেমন,—দেনদার পাওনাদারকে 'আজকাল' করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। তাঁহার ন্যায় লোকের মুখের 'হাঁ- কে না' করিবার 'জো' নাই। (খ) বিশেষণরূপে অব্যয়ের প্রয়োগ : যেমন,—তোমার বিরুদ্ধে আমি 'নানা' কথা শুনিয়াছি। 'বৃথা' ব্যয় করিয়া লাভ আছে কি ? (গ) সর্বনামরূপে প্রয়োগ : যেমন,—আধুনিক বংগরংগমঞ্চে শিশিরকুমারের 'মত' অভিনেতা 'আর' নাই। 'যত' হাসি 'তত' কান্না। (ঘ) ক্রিয়ারূপে অব্যয়ের প্রয়োগ : যেমন,—এই গরীব ছেলেটির বই 'নাই'। ছেলেটি ভাল 'নয়'। (ঙ) ক্রিয়া-বিশেষণরূপে অব্যয়ের প্রয়োগ : যেমন,—সে আগামী কাল এখানে 'অবশ্য' আসিবে। রমেন হরেনের বাড়িতে 'সর্বদা' যায়।

আপেক্ষিক বা সাপেক্ষ পদের প্রয়োগ

বাক্যে একটি পদ প্রয়োগ করিলে তদনুযায়ী অপর একটি পদও ব্যবহার করিয়া বাক্যটিকে যখন সম্পূর্ণাংগ করিয়া তুলিতে হয়, তখন এহেন উভয় পদকে **আপেক্ষিক** বা **সাপেক্ষ পদ** বলে। অব্যয় ছাড়াও, সর্বনাম, বিশেষণ এবং ক্রিয়াবিশেষণে পরস্পরসাপেক্ষ শব্দপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত মিলে : যেমন,—'কে' এমন সাহিত্যিক আছেন, 'যিনি' রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হইবেন ? 'যে' আমার বিরুদ্ধে এই কথা বলিয়াছে, 'সে' অতীব মিথ্যাবাদী। 'যত' অর্থ দান করিবে, 'ততই' নাম হইবে। 'এক' মা মনসা, 'তায়' ধুনোর গন্ধ। আমি 'যেখানেই' যাই, 'সেখানেই' তোমার সুখ্যাতি শুনি। আমি 'যখন' ষ্টেশনে পৌঁছিলাম, 'তখনই' ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

অনুশীলনী

[এক] ধাতু প্রধানত কয় প্রকার এবং কি কি ? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[দুই] বাক্যে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম পুরুষের কর্তার প্রত্যেকের পৃথক ভাবে এবং সকলের একত্রে অবস্থিতির বিভিন্ন উদাহরণ দাও। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[তিন] উদাহরণরূপে বাক্যাদি রচনা কর :—ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ; 'না' বাক্যালংকার অব্যয় ; 'চেয়ে' শব্দের অব্যয় প্রয়োগ। **ক. বি. বি. এ. '৫৭**

[চার] ধ্বন্যাত্মক ধাতু কাহাকে বলে ? এই ধাতুর উদাহরণ-স্বরূপ দুইটি বাক্য গঠন কর। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭**

[পাঁচ] দেখা, শোনা, পড়া, বহা, ফলা, চলা, দেওয়া—ইহাদের যে কোনও পাঁচটি হইতে প্রযোজক ধাতু নিষ্পন্ন কর এবং তাহা দিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর। **ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৫**

[ছয়] নিম্নলিখিত ব্যাকরণের বিধিগুলির প্রত্যেকটিরই দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও :—(ক) পরস্পরসাপেক্ষ (correlative) শব্দযোগে গঠিত ক্রিয়া-বিশেষণ। (খ) প্রতিষেধক অব্যয়। (গ) পুরা বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্তে সর্বনামের প্রয়োগ। (ঘ) বিশেষ্যের বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে ব্যবহার। (ঙ) অব্যয়ের নিরপেক্ষ (বাক্যের অন্য অংশের উপর অনির্ভরশীল) প্রয়োগ। (চ) বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণের বহুবচন গ্রহণ। (ছ) অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রয়োগ। (জ) নামধাতু। (ঝ) সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক অথবা অকর্মকের সকর্মক প্রয়োগ।

ক. বি. বি. এ. '৫৬, '৫৫, '৪৯, (অতি) '৪৮, '৪৮

[সাত] উদাহরণ-সহ ব্যাখ্যা কর :—সংযোজক অব্যয়, ণিজন্ত ক্রিয়া, দ্বিরুক্ত সর্বনাম ও বিধেয় বিশেষণ [**রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫**]। ণিজন্ত ক্রিয়া ও নামধাতু (**গৌ. বি. বি. এ. '৫০**)। যৌগিক ক্রিয়া ও সহায়ক ক্রিয়া (**গৌ. বি. বি. এ. '৫১**)। যৌগিক বা মিলিত বা মিশ্র ক্রিয়া (**ঢা. বি বি. এ. ৫১, মাধ্যমিক '৫৩**)। অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম ও ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় [**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৩**]। পূরণবাচক বিশেষণ (**ক. বি. বি. এ. '৫১**)। ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ (**ক. বি. বি. এ. '৫০**)। বিশেষণ পদ হইতে গঠিত নামধাতুর পদ (**ক. বি. বি. এ. '৪৯**)। নঞর্থক বা পংগু ক্রিয়া (**ক. বি. বি. এ. '৫২**)। অনুকার শব্দ, নামধাতু, অনন্বয়ী অব্যয় [**রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬**]। প্রথম পুরুষ [**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭**]। ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, নামধাতু (**ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**)। ভাববিশেষ্য ; ভাববিশেষণ , নামবিশেষণ , সাকল্যবাচক সর্বনাম ; আত্মবাচক সর্বনাম , কর্তৃনিষ্ঠ অসমাপিকা ক্রিয়া ; সাপেক্ষিকা বা অবস্থাত্মিকা অসমাপিকা ক্রিয়া ; ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য : ক্রিয়াবাচক বিশেষণ বা ভাববচন ; অনুধাবনাত্মক অব্যয় ; বাক্যালংকারে ব্যবহৃত অব্যয় ; অনুমোদনজ্ঞাপক অব্যয় , আহ্বানদ্যোতক অব্যয় , অনুকারবাচক অব্যয় , সমুচ্চয়ী অব্যয় , অনন্বয়ী অব্যয় , নিরপেক্ষ অব্যয়।

[আট] অনুকার-অব্যয়গুলির যথাযথ প্রয়োগ দেখাও (যে কোন চারিটির) :— কিল্‌বিল্‌ ; খিল্‌খিল্‌ ; গম্‌গম্‌ ; গল্‌গল্‌ ; ছম্‌ছম্‌ ; ঝম্‌ঝম্‌ ; ঝল্‌মল্‌।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫

[নয়] মোটা মোটা হরফে লিখিত পদগুলির ব্যাকরণ-ঘটিত বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর :—এ চিত্রের ওষ্ঠাধরে **যদি** ভাষা থাকিত ! তীর্থস্থানের পাপ প্রায়শ্চিত্তে **খণ্ডায়** না। গুরু **বলিয়া** আজকাল কেহ ভক্তি করে না। চক্রবর্তী কোম্পানীর বই **বাঁধাই** ভাল। **এত** তাড়াতাড়ি করিয়া চলিতেছ কেন ? **আমরা সবাই** তাঁহার কর্মনীতি সমর্থন করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

একই শব্দের বিভিন্ন পদে প্রয়োগ

জোর—[বি]—নৃপেনেব 'গায়ে খুব 'জোব' আছে। [বিণ]—আজ তোব 'জোব' ববাত। [ক্রি-বিণ]—মোটর গাডীখানি তখন 'জোব' চলিতেছিল।

কিছু—[বিণ]—তাহাব কাছে 'কিছু' টাকা পাই। [সর্ব]—তিনি আমায় কিছু' দিলেন। [বিণ-বিণ]—খববটি পাইয়া তিনি 'কিছু' বিষণ্ণ হইলেন।

নাই—[বিণ]—'নাই' মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল। [অ]—নবেন বাজাবে যায় 'নাই'। [ক্রি]—ভিক্ষা কবা ছাডা বিধবা বমণীটিব কোন উপায় 'নাই'। [বি]—সংবৎসরই তো তোমার সংসারে 'নাই নাই' শুনিতেছি।

ফলে—[ক্রি]—এই গাছে লিচু 'ফলে' না। [বি]—'ফলে' লোভ কবিলে কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে না। [অ]—সে যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে পারিল না—'ফলে' গন্তব্য স্থানে পৌছাইতে একদিন বিলম্ব হইয়া গেল।

যে—[অ]—তিনি বলিলেন 'যে', তাঁহাব ছুটি নাই। [বিণ]—'যে'-কথা, সেই কাজ। [সর্ব]—'যে' প্রিয় বাক্য বলে, সে জনপ্রিয় হয়।

বিলক্ষণ—[বিণ] আশুতোষেব 'বিলক্ষণ' চবিত্রগৌরব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। [বিণ-বিণ]—গোপার ন্যায় 'বিলক্ষণ' ভাল মেয়ে কদাচিৎ পবিদৃষ্ট হয়। [ক্রি-বিণ]—কৃতকার্য হই 'বিলক্ষণ', আব না হই তো এ ছাব প্রাণ বিসর্জন করিই। [অনন্বয়ী অব্যয়]—'বিলক্ষণ'। একাজ তুমি কববে?

পশ্চাৎ—[বি]—'পশ্চাতে' দৃষ্টিপাত কব। [বিণ]—আততায়ী 'পশ্চাৎ' দিক হইতে তাঁহাকে নিহত কবিল। [ক্রি-বিণ]—আমি তাহাব 'পশ্চাৎ পশ্চাৎ' চলিলাম। [অ]—এখন থাক, 'পশ্চাৎ' তোমার বাসায় যাইব।

বড়—[বি]—'বড' আর ছোটর বন্ধুত্ব কখনও টেকে না। [বিণ]—টাকাই কি 'বড' মানুষের পরিচয়? [ক্রি-বিণ]—হেমেনের মেয়েটি 'বড' কাঁদে। [বিণ-বিণ] সুধন 'বড়' ভাল ছেলে।

ঠিক—[বি]—রাগেব সময় তাহার মাথার 'ঠিক' থাকে না। [বিণ]—চাকুবী পাইবার 'ঠিক' খবব আজই পাইয়াছি। [ক্রি-বিণ]—কাল তোমার বাসায় 'ঠিক' যাইব। [অনন্বয়ী অব্যয়]—"সাধু ফুকারিয়া বলে, 'ঠিক' বটে ঠিক।"

কত—[বি-বিণ]—সভায় 'কত' লোক আসিয়াছিল। [বিণ-বিণ]—তুমি যে 'কত' বড় শয়তান, তাহা আমি আগে বুঝিতে পারি নাই। [সর্ব-বিণ]—সে যে

আমার 'কত' আপন, তাহা তুমি ধারণাও করিতে পারিবে না। [ক্রি-বিণ]—ক্রোধে জ্ঞানশূন্যা হইয়া মাতা ছেলেটিকে 'কত' মারিলেন। [ক্রি. বিণ-বিণ]—সেতুর উপর দিয়া 'কত' সাবধানে ওপারে পৌছিলাম। [অ-বিণ]—পাগলে 'কত' কি বলে।

উপর—[বি]—তিনি আজকাল 'উপরে' থাকেন, নীচে নামেন না। [বিণ]—আমি 'উপর' তলায় যাই নাই। [ক্রি-বিণ]—পরীক্ষার খাতা 'উপর উপর' দেখা উচিত নয়। [বিণ-বিণ)—ছাত্রটি খুব 'উপর' চালাক।

পাপ—[বি]—'পাপে'র পরিণাম বড়ই ভয়ংকর। [বিণ]—'পাপ' কর্ম হইতে বিরত হওয়াই মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

পুণ্য—[বি]—'পুণ্যে'র মত আনন্দদায়ক আর কিছুই নাই। [বিণ]—রাজা অশোক অনেক পুণ্য কার্য করিয়াছিলেন।

গুরু—[বি]—'গুরু'র আদেশ শিরোধার্য করিবে। [বিণ]—লঘু পাপে 'গুরু' দণ্ড আদৌ ন্যায়সংগত নয়। [ক্রি-বিণ]—আকাশে মেঘ ডাকে 'গুরু গুরু'।

ঘোর—[বি]—তন্দ্রার 'ঘোর' এখনও কাটে নাই। [বিণ]—অমাবস্যার 'ঘোর' অন্ধকারের মধ্যে চলিতে চলিতে পথিক পথ হারাইয়া ফেলিল। [ক্রি]—কৃপণের কাছে যতই 'ঘোর' না কেন, কিছুতেই টাকা পাইবে না।

অনুশীলনী

[এক] 'ঘোর' শব্দের বিশেষ্য প্রয়োগের উদাহরণরূপে বাক্য রচনা কর।

ক. বি. বি. এ. '৫৭

[দুই] নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে বিশেষ্য এবং বিশেষণ রূপে ব্যবহার করিয়া বাক্য গঠন কর :—পাপ, পুণ্য, গুরু। **ক. বি. মাধ্যমিক '৩৩**

[তিন] 'বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ, এমন কি অব্যয়কেও একই বিশেষণ শব্দ বিশেষিত করিতে পারে।'—এই বিধি অনুসারে 'কত' (বিশেষণ) শব্দের সাহায্যে যে-কোন চারিটি প্রয়োগের উদাহরণ দিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর। **ক. বি. মাধ্যমিক (অতি) '৪৮**

[চার] 'বিলক্ষণ' শব্দটিকে বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও অব্যয়রূপে প্রয়োগ করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর। **ক. বি. (বিশেষ) '৫০**

[পাঁচ] নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন পদে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর :—কিছু, নাই, ফলে, যে, পশ্চাৎ, বড, ঠিক, উপর, ঘোর, বিলক্ষণ।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রিয়ার প্রকার ও কাল

ক্রিয়ার প্রকার

যে উপায়ে ক্রিয়ার কাজ ঘটিবার প্রকার বা রীতির বোধ ঘটে, তাহাকে বলা হয় ক্রিয়ার ভাবপ্রদর্শক **প্রকার** (Mood)। প্রকার তিন রকমের—(**ক**) **অবধারক** বা **নির্দেশক প্রকার**: যেমন,—'শিশু হাসে'। এখানে হাস্যক্রিয়া ঘটিবার সাধারণ অবধারণা বা নির্দেশ হইয়াছে। **(খ) আজ্ঞাদ্যোতক** বা **নিয়োজক প্রকার,** বা **অনুজ্ঞা**: যেমন,—'সে মরুক'। এখানে মৃত্যু-ঘটনা ঘটুক—ইহাই বলিয়া বক্তা অনুমোদন, প্রার্থনা বা অভিশাপ জানাইতেছে। (**গ**) **ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার** বা **সংযোজক প্রকার**: যেমন,—'যদি সে পড়ে, তবে সে পাশ করিবে।' এখানে পঠনক্রিয়া ঘটিবার অনিশ্চয়তা জানানো হইয়াছে।

ক্রিয়ার কাল

রূপ- এবং অর্থ -অনুযায়ী ক্রিয়ার কালবিভাগ
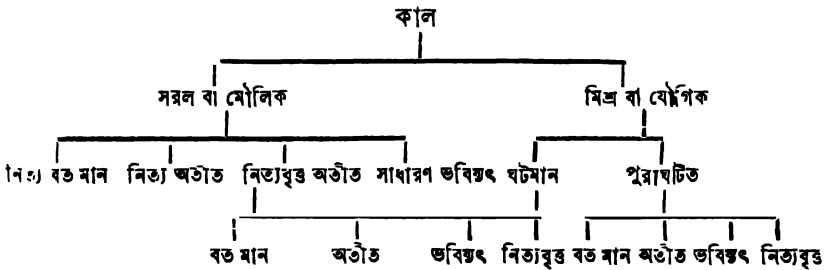
(১) **সাধারণ, সামান্য, মৌলিক** বা **নিত্য বর্তমান**—সাধারণ ভাবে কোনও ক্রিয়ার ব্যাপার ঘটিতে থাকিলে, নিত্য বর্তমান হয়: যেমন,—ছাত্রটি 'পড়ে'। অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিত্য বর্তমানের ব্যবহার হইতে দেখা যায়। (**ক**) **উত্তম পুরুষে** অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিবার ব্যাপারে নিত্য বর্তমান ব্যবহৃত হয়: যেমন,—তবে আমরা 'যাত্রা করি'। (**খ**) কোনও অতীত ঘটনা বা ঐতিহাসিক ঘটনা বুঝাইতে অতীত কালের ক্রিয়ার পরিবর্তে নিত্য বর্তমানের ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়: যেমন,—নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজ 'গঠন করেন'। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত স্বাধীন 'হয়'। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ সালে কাঁঠালপাড়া গ্রামে 'জন্মগ্রহণ করেন'। (**গ**) নঞ্-অর্থক অব্যয়যোগে অতীত কাল বুঝাইতে নিত্য

বর্তমানের ব্যবহার হয়: যেমন,—শেষ অবধি বৃটিশ সাম্রাজ্যও ভারতে স্থায়ী 'হয় নাই'। তিনি এ গান 'গাহেন নাই'। (ঘ) 'যখন, যতক্ষণ, যেন' প্রভৃতি যোগে সময়ে সময়ে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে নিত্য বর্তমানের প্রয়োগ ঘটে: যেমন,—যখন সে 'আসে', তখন আমার কনিষ্ঠ ভাই বাড়িতে ছিল না। যতক্ষণ গুলি-গোলা 'চলে', ততক্ষণ ছাত্রেরা কলেজেই ছিল। আশীর্বাদ করুন, যেন এবার ছাত্রটি 'পাশ করে'।

(২) **সাধারণ** বা **নিত্য অতীত**—কোনও ঘটনা বা কাজ অনির্দিষ্ট অতীত কালে ঘটিয়াছে, ইহাই বুঝাইবার জন্য সাধারণ বা নিত্য অতীত হয়। ঘটনার সাংগ বা সম্পূর্ণ হইয়া যাইবার কথা এই অতীতে প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাকে 'ঐতিহাসিক অতীত'ও বলা হয়: যেমন,—ভীমসেন তখন গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভংগ 'করিলেন'। রাম অস্পৃশ্যা শবরীকে 'দেখা দিলেন'। সময়ে সময়ে নিত্য অতীত ক্রিয়ায় 'এইমাত্র ঘটিল' ভাবটি প্রকাশিত হয়: যেমন,—বেতারে পংকজ মল্লিক 'গাইলেন'। আমি 'শুনিলাম'।

(৩) **নিত্যবৃত্ত** বা **পুরানিত্যবৃত্ত অতীত**—অতীতে কোনও কাজ নিয়মিত রূপে বা সর্বদা ঘটিত, ইহাই বুঝাইবার ক্ষেত্রে নিত্যবৃত্ত অতীতের ব্যবহার ঘটে: যেমন,—তিনি প্রতিদিনই প্রাতর্ভ্রমণ 'করিতেন'। মেয়েটি আগে খুব 'নাচিত', এখন আর পারে না। তাহার চিঠি সময়মত পাইলে আমি 'যাইতাম'।

(৪) **সাধারণ** বা **নিত্য ভবিষ্যৎ**—কোনও ক্রিয়ার ঘটনা এখনও ঘটে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটিবে, ইহাই বুঝাইতে সাধারণ ভবিষ্যৎ ব্যবহৃত হয়: যেমন,—পড়াশুনা না করিলে কিছুতেই 'পাশ করিবে' না। আমি কাল তোমাকে বইখানি 'দিব'।

(৫) **ঘটমান বর্তমান**—কোনও ক্রিয়ার ঘটনা এখনও চলিতেছে, তাহার সমাপ্তি ঘটে নাই, ইহাই বুঝাইতে ঘটমান বর্তমান ব্যবহৃত হয়: যেমন,—শিশুটি 'হাসিতেছে'। মুষলধারে বৃষ্টি 'পড়িতেছে'। আমি বই 'পড়িতেছি'।

(৬) **ঘটমান অতীত**—কোনও ক্রিয়ার ঘটনা অতীত কালে চলিতেছিল, তখনও তাহার সমাপ্তি ঘটে নাই, ইহাই বুঝাইতে ঘটমান অতীত ব্যবহৃত হয়: যেমন,—গত রবিবার সকালে যখন তাঁহার সংগে সাক্ষাৎকার হয়, তখন তিনি চা 'পান করিতেছিলেন'।

(৭) **ঘটমান ভবিষ্যৎ**—কোনও ক্রিয়ার ঘটনা ভবিষ্যৎকালে ঘটিতে থাকিবে, ইহাই বুঝাইতে ঘটমান ভবিষ্যৎ ব্যবহৃত হয়: যেমন,—কাল এমনি সময়ে আমি নৌকায় চড়িয়া নদী 'পার হইতে থাকিব'।

(৮) **পুরাঘটিত বর্তমান**—ক্রিয়ার ঘটনা কিছুকাল আগেই ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার জের ফল বা প্রভাব এখনও বিদ্যমান, ইহাই বুঝাইতে পুরাঘটিত বর্তমান ব্যবহৃত হয়: যেমন,—বৃষ্টির সাপটে বইগুলি 'ভিজিয়া গিয়াছে'। সে কালই তাহাকে 'মারিয়াছে'।

(৯) **পুরাঘটিত অতীত**—যখন কোনও ক্রিয়াব ঘটনা অতীতেই ঘটিয়াছিল এবং তাহার জের ফল বা প্রভাব অতীতেই শেষ হইয়াছিল, তখন পুরাঘটিত অতীত কাল হয়: যেমন,—পাঁচ বছর আগে মুন্সীদের বাড়ীতে একবার ডাকাত 'পড়িয়াছিল'। তুমি অতি শিশুকালে একবার কৃষ্ণনগরে 'গিয়াছিলে'। (ক) ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত কবিবার কালে পুবাঘটিত অতীতেব বদলে অতীতার্থে বর্তমানের প্রয়োগ খুব প্রচলিত আছে: যেমন,—তুর্কীবা ত্রয়োদশ শতাব্দীব গোড়ায় বাংলা দেশে 'আসিয়াছিল'। এই বাক্যের পুবাঘটিত অতীতেব বদলে বর্তমানেব প্রয়োগ ঘটাইয়া লেখা যায়: যেমন,—তুর্কীরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোডায় বাংলা দেশে 'আসে'।

(১০) **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ**—কোনও ক্রিয়াব ঘটনা হয়তো অতীত কালে ঘটিয়াছিল অথবা ঘটিয়া থাকিতে পাবে, ইহাই বুঝাইতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এই সংজ্ঞাটিতে স্ববিরোধ থাকায় **সন্দিগ্ধ অতীত কাল** বলাই সংগত: যেমন—বোধ হয় আইভ্যান্‌হোব গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেবেলায় সঞ্জীবচন্দ্রের নিকট হইতে 'শুনিয়া থাকিবেন'। আমি এই কথা 'বলিয়া থাকিব'।

(১১) **ঘটমান নিত্যবৃত্ত** বা **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত**—কোনও ক্রিয়ার কাজ বহুক্ষণ বা কিছুকাল ধরিয়া অতীতকালে চলিতেছিল, এই ভাবটি বুঝাইতে ঘটমান নিত্যবৃত্ত বা পুবানিত্যবৃত্ত ব্যবহৃত হয়: যেমন,—পবিবেশক পরিবেশন কবিতে থাকিলে, আমবাও 'খাইতে থাকিতাম'।

(১২) **পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত** বা **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত**—কোনও ক্রিয়ার কাজ অতীতেই সম্পন্ন করিয়া কর্তাব তিষ্ঠানের বা তিষ্ঠিবার সম্ভাব্যতা বুঝাইতে পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত বা পুরাসম্ভাব্য, নিত্যবৃত্ত ব্যবহৃত হয়: যেমন,—আসন্ন পরীক্ষার সময়ে সে সাঁরারাত 'জাগিয়া পড়িত'। গালিগালাজ সে যদিই-বা 'কবিয়া থাকিত', তাহা হইলেই বা কি দোষ হইত?

মন্তব্য: পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ এইরূপ:—(১) **'যে ক্রিয়াকাণ্ডটি সাধারণভাবে ঘটে, ঘটিয়াছিল অথবা ঘটিবে, এবং তাহার ফল কোথাও-বা প্রাপ্ত আবার কোথাও বা অপ্রাপ্ত—ইহাই বুঝাইবার জন্য সাধারণ বা নিত্য কালের প্রয়োগ ঘটে**। সাধাবণ বর্তমান—'রেণুকা আপিসে যায়'। সাধারণ অতীত—'রেণুকা আপিসে গেল'। সাধারণ ভবিষ্যৎ—

রেণুকা অপিসে যাইবে'। (২) **'নিত্যবৃত্ত' কথাটির মানে 'নিত্য অভ্যস্ত'**। অতীতে কোন ক্রিয়াকাণ্ড করিবার ব্যাপারে কর্তা অভ্যস্ত ছিলেন—এই রকমটি বুঝাইবার ক্ষেত্রে 'নিত্যবৃত্ত অতীতে'র ব্যবহার হয়: যেমন,—'তিনি রাত দশটায় খাইতেন'। অতীতে খাওয়া ক্রিয়াকাণ্ডটি রাত দশটায় সারিতে যে তিনি তথা কর্তা অভ্যস্ত ছিলেন, ইহাই 'খাইতেন' এই নিত্যবৃত্ত অতীতে বুঝা যাইতেছে। (৩) **'যে ক্রিয়াকাণ্ডটি কিছুকাল ধরিয়া সংঘটনশীল, অথচ তাহার ফল অপ্রাপ্ত'—ইহাই বুঝাইবার জন্য ঘটমান কালের প্রয়োগ ঘটে।** ঘটমান বর্তমান—'তিনি খাইতেছেন'। ঘটমান অতীত—'তিনি খাইতেছিলেন।' ঘটমান ভবিষ্যৎ—'তিনি খাইতে থাকিবেন।' ঘটমান নিত্যবৃত্ত—'তিনি খাইতে থাকিতেন।' বলা বাহুল্য, এই চার রকমের ঘটমানকালে 'খাওয়া' ক্রিয়াকাণ্ডটির সংঘটনশীলতাই প্রকট, কিন্তু সেই ক্রিয়াকাণ্ডের ফল অপ্রাপ্ত। (৪) **'যে ক্রিয়াকাণ্ডটি কিছুকাল ধরিয়া অথবা কোন এক ক্ষণে সংঘটনশীল এবং তাহার ফলও ইতিমধ্যে প্রাপ্ত'—ইহাই বুঝাইবার জন্য পুরাঘটিত কালের প্রয়োগ ঘটে।** পুরাঘটিত বর্তমান—'তিনি খাইয়াছেন।' পুরাঘটিত অতীত—'তিনি খাইয়াছিলেন।' পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—'তিনি খাইয়া থাকিবেন।' পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত—'তিনি খাইয়া থাকিতেন।' এই চার রকমের পুরাঘটিত কালেই 'খাওয়া' ক্রিয়াকাণ্ডটির সংঘটনশীলতায় বিরতি ও তাহার ফলপ্রাপ্তি লক্ষণীয়।

অনুশীলনী

[এক] ব্যাকরণে 'কাল' বলিতে কি বুঝায়? বাংলা বিভিন্ন কালের নাম লিখ এবং উদাহরণ দাও। **ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**

[দুই] নিম্নলিখিত ব্যাকরণের বিধিগুলির প্রত্যেকটিরই প্রয়োগের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও:—পুরাঘটিত বর্তমান; ভবিষ্যৎ বুঝাইতে বর্তমানের ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ, অনুজ্ঞা বুঝাইতে ভবিষ্যতের ক্রিয়ারূপে প্রয়োগ; অতীত বুঝাইতে বর্তমানের ক্রিয়া প্রয়োগ। **ক. বি. বি. এ. '৪৯, (অতি) '৪৮, '৪৮**

[তিন] নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের উদাহরণ দাও:—(ক) নঞ্-অর্থক অব্যয়যোগে অতীত বুঝাইতে বর্তমানের ক্রিয়া-প্রয়োগ। (খ) 'যখন, যতক্ষণ, যেন' প্রভৃতি যোগে অতীত ও ভবিষ্যৎ বুঝাইতে বর্তমানের ক্রিয়া-প্রয়োগ। (গ) পুরাঘটিত অতীতের বদলে অতীতার্থে বর্তমানের ক্রিয়া-প্রয়োগ। (ঘ) ঐতিহাসিক বর্তমান কাল। **ঢা. বি. বি. এ. '৫০**

[চার] বাংলায় অতীতকালের চারিটি বিভিন্ন রূপের প্রয়োগ দেখাইয়া চারিটি বাক্য রচনা কর। [**ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৭**]; বাংলা ক্রিয়াপদের অতীত কালের

বিবিধ রূপের অর্থপার্থক্য দেখাইয়া বাক্যাদি রচনা কর :—সাধারণ অতীত, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত ও পুরানিত্যবৃত্ত অতীত। **গৌ. বি. বি. এ. '৫০**

[**পাঁচ**] নিম্নলিখিত প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা ও দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও :— নির্দেশক প্রকার (**গৌ. বি বি. এ. '৫১**)। ঘটমান কালরূপ (**গৌ. বি. বি. এ. '৫১**)। ভবিষ্যৎ **অনুজ্ঞা (ঢা. বি. বি. এ. '৫০, মাধ্যমিক '৫৩**)। সংযোজক প্রকার ; পুরাঘটিত কালরূপ। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ [**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৩**]। ঘটমান অতীত-কাল [**মা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬**]। ঘটমান বর্তমান [**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭**]।

[ছয়] 'আমি এই কথা **বলিয়া থাকিব**', 'তাহার চিঠি সময় মত পাইলে আমি **যাইতাম**'—এই দুইটি বাক্যে ক্রিয়ার কাল নির্ণয় কর। **. বি (বিশেষ) '৫০**

[সাত] ঐতিহাসিক বর্তমান, ঘটমান বর্তমান ও পুরাঘটিত বর্তমানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫০

[আট] বাংলা ভাষায় ক্রিয়া-পদের বিভিন্ন কালরূপের শ্রেণী বিভাগ কর।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭

[নয়] নিম্নলিখিত ধাতুগুলির কালবিভাগগত পূর্ণ রূপ লিপিবদ্ধ কর :—কর্ ; বল্ ; খা ; যা, চাহ্ ; মিল্ ; শুন্, আস্, লিখ্, পড়্, দে ; চল্।

[দশ] নিম্ন নির্দেশানুসারে ধাতুরূপ লিখ :—(ক) 'আস্' ধাতুর মৌলিক কালগত নিত্য বর্তমানে সাধু রূপ, (খ) 'আস্' ধাতুর মৌলিক কালগত নিত্য অতীতে ও যৌগিক কালগত পুরাঘটিত অতীতে চলিত রূপ, (গ) 'চাহ্' ধাতুর মৌলিক কালগত নিত্য অতীতে ও যৌগিক কালগত ঘটমান ভবিষ্যতে ও পুরাঘটিত অতীতে চলিত রূপ ; (ঘ) 'যা' ধাতুর মৌলিক কালগত নিত্য অতীতে ও যৌগিক কালগত পুরাঘটিত বর্তমানে ও অতীতে চলিত রূপ ; (ঙ) 'শু' ধাতুর মৌলিক কালগত সাধারণ ভবিষ্যতে চলিত রূপ ; (চ) 'দে' ধাতুর মৌলিক কালগত পুরাঘটিত নিত্যবৃত্তে চলিত রূপ।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভক্তি ও কারক

বিভক্তি

বিভক্তি দুই জাতের :—একটি, **শব্দ-বিভক্তি** অর্থাৎ **সুপ্**, অপরটি, **ক্রিয়া-বিভক্তি** অর্থাৎ **তিঙ্**। শব্দ-বিভক্তির যোগে শব্দ বিশেষ্য বা সর্বনামপদে পরিণত হয়। শব্দ-বিভক্তির সংস্কৃত নাম 'সুপ্' বলিয়া বিভক্তিযুক্ত নাম বা সর্বনামপদ **সুবন্তপদ** রূপে পরিচিত। বিভক্তির প্রয়োগেই বিশেষ্য ও সর্বনামপদের বচন ও কারক নির্দেশিত হয় : যেমন,—মানুষ শব্দ+এর বিভক্তি=মানুষের, আমি শব্দ+তে বিভক্তি=আমাতে। ক্রিয়া-বিভক্তির যোগে ধাতু ক্রিয়াপদে পরিণত হয়। ক্রিয়া-বিভক্তির সংস্কৃত নাম 'তিঙ্' বলিয়া বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদ **তিঙন্তপদ** রূপে পরিচিত। ধাতু+কালবাচক প্রত্যয়+বিভক্তি=ক্রিয়াপদ : যেমন,—খা ধাতু+ইল প্রত্যয় (সাধারণ অতীতবোধক)+আম বিভক্তি='করিলাম' ক্রিয়াপদ, কর্ ধাতু+ইব প্রত্যয় (সাধারণ ভবিষ্যৎবোধক)+এন বিভক্তি='করিবেন' ক্রিয়াপদ। কিন্তু বর্তমানের ক্রিয়ার কালবাচক কোন প্রত্যয় না জুড়িয়া শুধু বিভক্তির যোগেই কাল ও পুরুষ নির্দেশ করা হয় : যেমন,—মার্+এ=মারে, মার্+ই=মারি। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি ও প্রত্যয়-সাহায্যে অসংলগ্ন শব্দ গঠিত হয় এইমাত্র আর বিভক্তিযোগেই ইহাদের পারস্পরিক সংযোগ বা সম্বন্ধ স্পষ্টীকৃত হয়, পূর্ণ অর্থ ধরা পড়ে। বাংলায় শব্দ বা ধাতুর পরে বিভক্তি না জুড়িলে অর্থই হয় না। বিভক্তির কার্য হইতেছে সম্বন্ধ ফুটাইয়া তোলা আর প্রত্যয়ের কার্য হইতেছে ধাতু বা প্রাতিপদিকের প্রকার ফুটাইয়া তোলা।

বাংলায় কোন কারকেরই একেবারে নিজস্ব কোন বিভক্তি নাই। একই বিভক্তি বিভিন্ন কারক বুঝায়। তবে, যে যে কারকে যে যে বিভক্তি সাধারণ ভাবে চলিত আছে, তাহা ধরিয়া মোটামুটি ভাবে কারকগত বিভক্তির একটা নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। এই বিভক্তিগুলির মধ্যে 'শূন্য, কে, রে, এরে, র, এর, কার, তে, এ, য়' ধাটি বাংলা **সুপ্** বা **যথার্থ বিভক্তি** আর 'দ্বারা, দিয়া, করিয়া, কর্তৃক হইতে, থেকে' বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত পদ, যাহাদিগকে বাংলায় বলা হয় **কর্ম-প্রবচনীয়, সম্বন্ধীয়, পরসর্গ** বা **অনুসর্গ**। মার্জিত ভাষায় কর্তৃকারকের একবচনের বড় একটা বিভক্তি-চিহ্ন থাকে না। বিভক্তির এই না-থাকাই শূন্য

বিভক্তির পরিচয় বহন করে। অতএব, 'শূন্য বিভক্তি' কর্তৃকারকের প্রথমা বিভক্তি। 'কে, রে, এরে' বিভক্তি কর্মকারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি। 'দ্বারা, দিয়া, করিয়া, কর্তৃক' অনুসর্গ তথা বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ করণকারকের তৃতীয়া বিভক্তি। কর্মকারকের 'রে, এরে' বিভক্তি সম্প্রদান কারকের চতুর্থী বিভক্তি। 'হইতে, থেকে' **অনুসর্গ** তথা বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ অপাদান কারকের পঞ্চমী বিভক্তি। 'র, এর, কার' বিভক্তি সম্বন্ধপদের ষষ্ঠী বিভক্তি। 'তে, এ, য়' বিভক্তি অধিকরণ কারকের সপ্তমী বিভক্তি।

কারক

কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ—এই ছয়টি কারক, কারণ,—ক্রিয়ার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু **সম্বন্ধপদ পদই, কারক নয়**, যেহেতু ইহার সংগে ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই—ইহার সম্বন্ধ থাকে অন্য পদের সংগে।

কারকের শ্রেণীবিভাগ
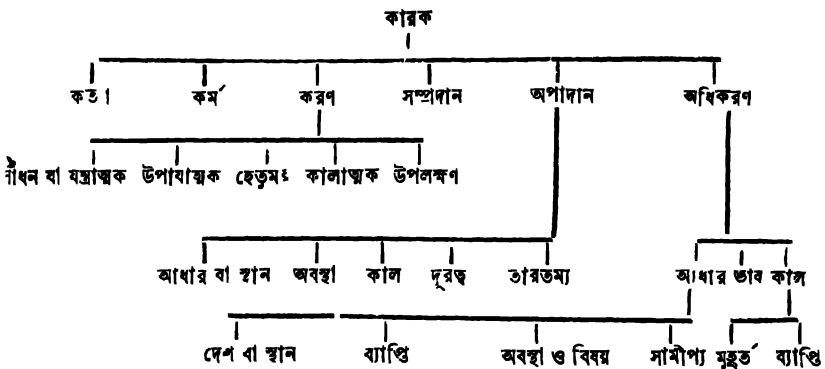
কর্তৃকারক—যখন কোন বিশেষ্য বা সর্বনামপদ বাক্যস্থিত ক্রিয়া সম্পাদন করে বা করায়, তখন তাহা হয় কর্তৃকারক: যেমন,—'অলকা' কলেজে পড়িতেছে। এখানে 'অলকা' কর্তৃকারক। (ক) প্রযোজক কর্তার দৃষ্টান্ত—'সাপুড়ে' সাপ খেলায়। (খ) সমধাতুজ কর্তা বা ক্রিয়াসম কর্তার দৃষ্টান্ত—মন্দিরে আরতির 'বাজনা' বাজিতেছে। (গ) নিরপেক্ষ কর্তার দৃষ্টান্ত—'গোলাগুলি' ছুটিলে শত্রুদল পলায়ন করিল। (ঘ) ব্যতিহার ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত—'মায়ে-পোয়ে' রওনা দিয়াছে।

কর্মকারক—যাহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়ার কর্ম সম্পাদিত হয় অথবা যাহার দ্বারা ক্রিয়া সম্পূর্ণতা পায়, তাহাই কর্মকারক: যেমন—গোপা 'চিঠি' পাইয়াছে। রাম 'শ্যামকে' মারিয়াছে। (ক) গৌণ কর্ম ও মুখ্য কর্মের দৃষ্টান্ত—শিক্ষক

'ছাত্রকে' 'প্রশ্ন' জিজ্ঞাসা করিলেন। এখানে 'ছাত্র' গৌণ কর্ম ও 'প্রশ্ন' মুখ্য কর্ম। (খ) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্মের দৃষ্টান্ত—গৃহশিক্ষক প্রতিদিনই ছাত্রকে অংক কষাইয়া থাকেন। (গ) উদ্দেশ্য কর্মের দৃষ্টান্ত—দুর্জনে কুবুদ্ধি দিয়া ভাল 'লোককে' মন্দ লোক করিতে পারে। (ঘ) বিধেয় কর্মের দৃষ্টান্ত -"যে ধনে হইয়া ধনী 'মণিরে' মান না মণি।" (ঙ) ক্রিয়াসম কর্ম বা সমধাতুজ কর্মের দৃষ্টান্ত—মরণের 'ভাবনা' আমি ভাবি না। (চ) দুইটি ক্রিয়ার একটি কর্মের দৃষ্টান্ত —'কাপড়টি' কিনিয়া আনিবে।

করণ কারক—যাহার সাহায্যে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাই করণ কারক: যেমন,—'বাতাসে' লঘু মেঘ উড়িয়া যায়। (ক) সাধন বা যন্ত্রাত্মক করণের দৃষ্টান্ত—চতুর ব্যক্তি 'কাঁটা দিয়া' কাঁটা তুলিতে পারে। 'বাষ্পে' রেলগাড়ী চালানো হয়। (খ) উপায়াত্মক করণের দৃষ্টান্ত—'সময়ে' মানুষ সবই ভুলিয়া যায়। (গ) হেতুময় করণের দৃষ্টান্ত- বড় 'দুঃখে' আজ আমি এখানে আসিয়াছি। (ঘ) কালাত্মক করণের দৃষ্টান্ত—চার 'দিনে' আমি কাজটি সারিয়া ফেলিলাম। (ঙ) উপলক্ষণ বা লক্ষণাত্মক করণের দৃষ্টান্ত -তিনি 'ধর্মপরায়ণতায়' যুধিষ্ঠির, 'শক্তিমত্তায়' ভীম এবং 'বীর্যবত্তায়' অর্জুন। (চ) একাধিক করণের দৃষ্টান্ত—তিনি 'একমনে' 'কলম দিয়া' চিঠি লিখিতেছেন।

সম্প্রদান কারক—দাবিদাওয়া একেবারে পরিহার করিয়া যাহাকে কিছু দান করা যায়, অথবা যাহার নিমিত্ত বা যাহার উদ্দেশ্যে কিছু করা যায়, তাহাই সম্প্রদান কারক: যেমন,—পিতা 'সৎপাত্রে' কন্যাদান করিলেন। সাঁঝের বেলায় পল্লীবধূরা 'জলকে' (=জলের নিমিত্ত) চলে। এখন 'ঘরকে' (=ঘরের উদ্দেশ্যে) যাও

অপাদান কারক—যখন কোন আধারবাচক, স্থানবাচক, কালবাচক বিশেষ্য বা সর্বনামপদ হইতে বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের দ্বারা অপসরণ বা সরিয়া যাওয়া বুঝায় তখন তাহা হয় অপাদান কারক: যেমন,—সে 'গেলাস হইতে' জল খাইল। 'ঢাকা হইতে' প্রতিদিনই উড়োজাহাজ কলিকাতায় আসিয়া থাকে। 'তিন দিন হইতে' আমার অসুখ হইয়াছে। (ক) আধার বা স্থানবাচক অপাদানের দৃষ্টান্ত—ঘুড়ি উড়াইবার কালে ছেলেটি 'ছাদ হইতে' পড়িয়া গেল। 'বংগীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে' প্রেরিত প্রতিনিধি দিল্লীতে পৌঁছিলেন। (খ) অবস্থাত্মক অপাদানের দৃষ্টান্ত—চলন্ত ট্রেনের 'কামরা হইতে' তিনি কথা বলিতে লাগিলেন। (গ) কালবাচক অপাদানের দৃষ্টান্ত—আমাদের 'গৃহ হইতে' আজানের ধ্বনি শোনা যায়। (ঘ) দূরত্ববাচক অপাদানের দৃষ্টান্ত—'কলিকাতা হইতে' দ্বারভাঙা তিন শত মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত। (ঙ) তারতম্যবাচক অপাদানের দৃষ্টান্ত—'মিনুর চেয়ে' গোপার বয়স বেশী।

অধিকরণ কারক—যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ বাক্যস্থিত ক্রিয়ার আধার, কাল বা ভাব বুঝায়, তাহাই অধিকরণ কারক: যেমন,—'অরণ্যে' ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বাস করে। আগামী 'বৎসরে' দুর্ভিক্ষ হইবে। একমাত্র পুত্র হারাইয়া বিধবা মাতা 'শোকসাগরে' নিমজ্জিত হইয়াছেন। (ক) আধারাধিকরণের দৃষ্টান্ত—'হিমালয়ে' কস্তুরী মৃগ পরিদৃষ্ট হয়। (—স্থানাধিকরণ)। 'ভারতবর্ষে' গংগা নদী বহিয়া যাইতেছে। (—দেশাধিকরণ)। 'সাগরে' লবণ আছে। (ব্যাপ্ত্যধিকরণ)। আজ বাজারে এক 'টাকায়' দশটি ল্যাংড়া আম পাওয়া যাইতেছে। (—অবস্থাধিকরণ)। রামানুজম্ 'গণিতে' অত্যন্ত কুশলী ছিলেন। (বিষয়াধিকরণ)। (খ) কালাধিকরণের দৃষ্টান্ত—সন্ধ্যা ছয় 'ঘটিকায়' ট্রেন ছাড়িবে। (—মুহূর্তাধিকরণ)। 'বর্ষাকালে' অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের ফলে বাড়ির বাহিরে যাইবার উপায় থাকে না। (ব্যাপ্ত্যধিকরণ)। (গ) ভাবাধিকরণের দৃষ্টান্ত—নববিবাহিতা নবনারী কিছুকাল 'আনন্দসাগরে' সন্তরণ করিয়া থাকে।

কারকাদিতে বিভক্তির প্রয়োগ

কর্তৃকারক

(ক) কর্তৃবাচ্যের কর্তায় 'শূন্য, এ, য, তে' বিভক্তির প্রয়োগ: যেমন,—'বৃষ্টি' পড়ে। 'ছাগলে' ঘাস খায় (কর্তায় সপ্তমী—কর্তৃকারকে বহুত্বের আভাস লক্ষণীয়)। 'লোকে' এই কথা বলে (কর্তায় সপ্তমী, এখানেও কর্তৃকারকে বহুত্বের আভাস লক্ষণীয়)। এইরূপ 'ঘোড়ায়' গাড়ী টানে; 'পাখীতে' ধান খায়। (খ) কর্মবাচ্যের কর্তায় 'কর্তৃক' ও 'কে, এর' প্রত্যয়ের প্রয়োগ: যেমন—'রাম কর্তৃক' শ্যাম বিতাড়িত হইয়াছে (কর্তায় তৃতীয়া)। 'আমাকে' এখনই কাপড় কিনিতে হইবে (কর্তায় দ্বিতীয়া)। 'রজনী' গ্রন্থখানি 'বঙ্কিমচন্দ্রের' প্রণীত (কর্তায় ষষ্ঠী)। (গ) ভাববাচ্যের কর্তায় 'কে, র' প্রত্যয়ের প্রয়োগ: যেমন,—'তোমাকে গান করিতে হইবে (কর্তায় দ্বিতীয়া)। 'তাহার না থাকিলে নয় (কর্তায় ষষ্ঠী)। (ঘ) কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তায় 'শূন্য' বিভক্তির প্রয়োগ: যেমন,—'সুন্দর' মানায়। 'শাঁখ' বাজে।

কর্মকারক

কর্মকারকে 'শূন্য, কে, রে, এ' বিভক্তির প্রয়োগ: যেমন,—গোরু 'দুধ' দেয় (কর্মে প্রথমা)। 'অরুণকে' সকলে ভালবাসে। 'তারে' মেরো না। 'বাঘেরে' বশীভূত করা যার তার কর্ম নয়। "ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী 'তরুবরে'?" (কর্মে সপ্তমী)।

করণ কারক

করণ কারকে 'এ, য়, তে, র, এর, শূন্য' বিভক্তি এবং 'দ্বারা, দিয়া, করিয়া, হইতে' ইত্যাদি অনুসর্গের প্রয়োগ : যেমন,—'কলমে লিখ' (করণে সপ্তমী)। মূর্খ ছেলের চেয়ে শিক্ষিতা 'মেয়েতে' বংশের মুখ উজ্জ্বল হয় (করণে সপ্তমী)। 'টাকায়' কি না হয় (করণে সপ্তমী)। 'সেবা-দ্বারা' গুরুজনকে পরিতুষ্ট করিবে। আত্মীয় অপেক্ষা 'অনাত্মীয় দিয়া' উপকার হয়। 'চাকরকে দিয়া' মাছ কিনিয়া আন। 'পায়ে করিয়া' জুতাসমূহ সরাইয়া রাখ। 'আমা হইতে' তোমার কোন অপকার হইবে না (করণে পঞ্চমী)। 'কালির' দাগ দাও (করণে ষষ্ঠী)। 'নখের' আঁচড় দিও না (করণে ষষ্ঠী)। গৃহস্থ চোরকে 'লাঠি' মারিল (করণে প্রথমা)। **মন্তব্য :** সময়ে সময়ে করণ কারক ও অধিকরণ কারকের ভিতর পার্থক্য নির্দেশ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। তাই অধিকরণ কারকের বিভক্তি করণ কারকেও সম্প্রসারিত হয় : যেমন,— তাঁহার আত্মোৎসর্গের কথা জলন্ত 'অক্ষরে' লিখিত থাকিবে। 'পীড়ায়' তিনি অত্যন্ত দুর্বল। তিনি প্রতিদিন 'নৌকাতে' নদী পারাপার করিয়া থাকেন।

সম্প্রদান কারক

সম্প্রদান কারকে 'কে, রে, এরে, তে, এ, য' বিভক্তি এবং 'জন্য, তরে, লাগিয়া' ইত্যাদি অনুসর্গের প্রয়োগ হয় : যেমন,—'বস্ত্রহীন'কে বস্ত্র দাও। "তোমার পতাকা 'যারে' দাও 'তারে' বহিবারে দাও শকতি।" 'বাস্তুহারা সমিতিতে' তিনি অনেক টাকা দান করিয়াছেন (সম্প্রদানে সপ্তমী)। 'অন্ধজনে' ধন দান কর (সম্প্রদানে সপ্তমী)। সে 'ঘরকে' গেল। 'আমায়' একটু জল দাও। 'যার জন্য' এত টাকা খরচ করিলাম, সে-ই আমাকে পথে বসাইল। 'দরিদ্রের তরে' ধনীর প্রাণ কাঁদে না। 'মানুষের লাগিয়া' মানুষ ব্যথা পায়।

অপাদান কারক

অপাদান কারকে 'হইতে, থাকিয়া, থেকে, হতে, চাহিয়া, চেয়ে, কাছে, অপেক্ষা, দিয়া' ইত্যাদি অনুসর্গ এবং 'এ, তে, য, এর, শূন্য' বিভক্তির প্রয়োগ : যেমন,— ছাত্রেরা 'কলেজ হইতে' বাহিরে আসিল। 'নদী থেকে' জল আন। কূপ 'হ'তে' জল তোল। 'নীরেনের চেয়ে' হরেন বয়সে বড়। 'রাম অপেক্ষা' শ্যাম অনেক ভাল। 'বীরেনের কাছে' কর্জ পাওয়া গেল না। এরূপ কথা আমার 'মুখ দিয়া' বাহির হইতে পারে না। 'তিলে' তেল হয় (অপাদানে সপ্তমী)। 'খনিতে' কয়লা পাওয়া যায়। (অপাদানে সপ্তমী)। সে 'ভূতের' ভয়ে রাত্রিতে পথে চলে না (অপাদানে ষষ্ঠী)। 'পড়ায়' কখনও বিরত হইবে না (অপাদানে সপ্তমী)। 'বাড়ি' ঘুরে এলেই টের পাবে। (অপাদানে প্রথমা)।

অধিকরণ কারক

অধিকরণ কারকে 'তে, য়, এ, শূন্য' বিভক্তি এবং 'হইতে, মধ্যে, কাছে' অনুসর্গ প্রভৃতির প্রয়োগ : যেমন,—আমি তাঁহার 'বাড়িতে' যাইব। দত্তবাবুদের 'দরজায়' হাতী বাঁধা থাকে। 'জলে' কুমীর থাকে। আমার 'সর্বাংগে' ব্যথা হইতেছে। রাত্রি নয়টা বাজিয়া তিন 'মিনিটে' ট্রেন ছাড়ে। এই 'বৎসর' দেশের অবস্থা বড়ই খারাপ (অধিকরণে প্রথমা)। বাঁদর গাছের 'ডাল হইতে' ঝুলিতেছে (অধিকরণে পঞ্চমী)। "হেন কালে 'গগনেতে' উঠিলেন চাঁদা।" আনন্দময়ীর 'আগমনে' আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে হাসি ফুটিয়াছে। ভারতীয় 'কবিদের মধ্যে' কালিদাস শ্রেষ্ঠ। 'মানুষের কাছে' মানুষ যায়। **বীপ্সায় সপ্তমী**—বীপ্সা (=প্রত্যেক) অর্থে সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পদের দ্বিরুক্তি হয়। ফলে প্রথম পদটি অপাদানের ও দ্বিতীয় পদটি অধিকরণের কার্য সম্পাদন করে : যেমন,—'হাতে হাতে ; কোণে কোণে ; ঘর ঘর ; কুঞ্জে কুঞ্জে।' **মন্তব্য :** অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা বা গভীর অন্তরংগতা বুঝাইতেও এহেন দ্বিরুক্তি ঘটে : যেমন,—'মনে মনে, কানে কানে, চোখে চোখে, হাতে হাতে (=সংগে সংগে)'

সম্বন্ধপদ ও সম্বোধনপদ

সম্বন্ধপদ

যাহার অধিকারে কোনও পদার্থ থাকে অথবা যাহার সংগে কোনও পদার্থের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকে এবং উক্ত পদার্থকে যাহা বিশিষ্ট করে, তাহাই সম্বন্ধ পদ। সম্বন্ধ পদে 'র, এর, কার' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। সম্বন্ধ নানা রকমের : যেমন,—(১) কারক সম্বন্ধ :—(ক) কর্তৃ-সম্বন্ধ—শিশুর খেলা। (খ) কর্ম-সম্বন্ধ—ঈশ্বরের উপাসনা। (গ) করণ-সম্বন্ধ—কলমের লেখা। (ঘ) অপাদান-সম্বন্ধ—ভূতের ভয়। (ঙ) অধিকরণ-সম্বন্ধ—মাথার ব্যথা। (২) রূপক-সম্বন্ধ, অভেদ-সম্বন্ধ বা নিত্য-সম্বন্ধ—বিদ্যার সাগর। (৩) কার্য-কারণ-সম্বন্ধ—পাপের শাস্তি। (৪) উপাদান-সম্বন্ধ—মাটির পুতুল। (৫) নিমিত্ত-সম্বন্ধ—সখের যাত্রা। (৬) যোগ্যতা-সম্বন্ধ—খাইবার ঔষধ। (৭) গতি সম্বন্ধ—কলের জাহাজ। (৮) বিশেষণ-সম্বন্ধ—সুখের সংসার। (৯) ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ—দশদিনের পথ। (১০) তারতম্যমূলক সম্বন্ধ—সে 'রামের চেয়ে' বড়। সে 'রামের অপেক্ষা' বড়। 'দুইজনের মধ্যে' সেই বড়। (১১) অব্যয়-যোগে সম্বন্ধপদ - জোরের সংগে। কলেজের নিকটে। মাতার তুল্য। বেবার নিমিত্ত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ভারতের পশ্চিমে। (১২) বাক্য-বিবক্ষায়—হবেন যে বিশেষ দুঃখিত 'তাহার' (=তাহাতে) আর কোন সন্দেহ নাই। 'কার' বিভক্তির প্রয়োগেও সম্বন্ধ হয় : যেমন,—'পরশুকার ; উপরকার ; প্রথমকার ; সেখানকার' ইত্যাদি। এই পদগুলি বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত

হয়। আবার সম্বন্ধপদে শূন্য বিভক্তিও দেখা যায়: যেমন,—'খাজনা বাবত; ভাড়া বাবত; তোমা অপেক্ষা।'

সম্বোধনপদ

বাক্যের গতিভংগ করিয়া যাহাকে বিশেষরূপে আহ্বান করা হয়, তাহাকে বলা হয় সম্বোধন পদ। ক্রিয়াপদের সহিত সম্পর্ক থাকে না বলিয়াই, সম্বোধনও সম্বন্ধ পদের ন্যায় কারক নয়, পদই। খাঁটি বাংলা শব্দে সম্বোধনে মূল শব্দের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, তবে কয়েকটি বিশেষ অব্যয় পদকে মূল শব্দের পূর্বে অথবা পরে বসাইয়া সম্বোধন পদকে ফুটাইয়া তোলা হয়। বলা বাহুল্য, এগুলি অব্যয়যোগে প্রথমার উদাহরণ: যেমন,—'হাঁগা মাসী। অরে মন্মথ। আলো খেঁদী। হ্যাবে ছোঁড়া। হ্যালা ছুঁড়ী! বাপ্ আমার। মা গো। মানুষ রে।'

বি দ্র. কোন কোন ব্যাকরণে, এমন কি প্রশ্নপত্রেও, 'কে, রে, এ, য়, তে' প্রভৃতিকে 'বিভক্তি' না বলিয়া অত্যন্ত আলগাভাবে 'প্রত্যয়' বলা হয়। কিন্তু এরূপ বলা অযৌক্তিক ও অসংগত। 'বিভক্তি' এবং 'প্রত্যয়' একার্থক নয়, ভিন্নার্থক।

অনুশীলনী

[এক] 'কারক' ও 'বিভক্তি' বলিতে কি বুঝ? সম্বন্ধপদ ও সম্বোধনপদ কারক কি? উদাহরণ-যোগে বুঝাইয়া দাও।

[দুই] বিভিন্ন কারকে 'এ' বিভক্তির (অর্থাৎ সপ্তমী বিভক্তির) উদাহরণ দাও।

ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৩, '৫৭

[তিন] নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের উদাহরণ দাও:—(ক) বহুত্বের আভাস বুঝাইতে কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি। (খ) বিশেষণ-সম্বন্ধ বুঝাইতে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ। (গ) 'তে' প্রত্যয়যোগে কর্তৃকারক নিদেশ। **ক বি. বি. এ '৪৯, '৪৮**

[চার] ব্যাখ্যা সহ উদাহরণ দাও:—অপাদান কারক, অধিকরণ কারক (**ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৭**)। দ্বিকর্মক ক্রিয়া, সমধাতুজ কর্ম [**ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭**]। প্রযোজক কর্ম, অপাদান কারক [**রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প '৫৬**]। অপাদান কারক, কর্মকারক (**ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৬**]। প্রযোজক কর্তা, গৌণ কর্ম, সমধাতুজ কর্ম, নির্ধারণে পঞ্চমী (**ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৩**)। প্রযোজক কর্তা, সমধাতুজ কর্ম, একদেশাধিকরণ, ভাবে সপ্তমী (**ঢা. বি. বি. এ. '৫০**)। দুইটি ক্রিয়ার একটি কর্ম, অনুসর্গ (**গৌ. বি. বি. এ. '৫.**)। মুখ্য কর্ম, উদ্দেশ্য কর্ম, সমধাতুজ বা ক্রিয়াসম কর্তা (**ক. বি. বি. এ. '৫৫**)।

[পাঁচ] 'পাইলটে' কালি ধরে বেশী. শেফারে লেখা হয় ভালো'—'পাইলটে' ও

'শেফাবে' কি কাবক ? (উত্তর—'পাইলটে' অধিকবণ কাবক ও 'শেফাবে' কবণ কারক।) **ক. বি. বি. এ. '৫৬**

[ছয়] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটিতে নিম্নরেখ পদসমূহের বিভক্তি নির্ণয় কবিয়া সেই বিভক্তিগুলি কোন্ কোন্ কাবকে কি অর্থে ব্যবহৃত হইযাছে লিখিয়া দাও :—

তাস খেলে পড়া নষ্ট—কত ছেলে করে,
পরীক্ষা আসিলে চোখে তাই জল ঝরে।
সর্ব শিষ্যে জ্ঞান দেন গুরু মহাশয়,
শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয়। **ব্‌া. বি. বি. এ. (বিশেষ পত্র) '৫৪**

[সাত] 'সে তাস খেলে'; 'সে লাঠি খেলে'—এখানে 'তাস' ও 'লাঠি' কি একই কাবক বা বিভিন্ন কাবক হইবে এ বিষয়ে যুক্তিসহ তোমাব মত ব্যক্ত কব। (উত্তব। 'সে তাস খেলে'—এই উদাহবণটিতে 'তাস' ছাড়া খেলা ক্রিযাটি সম্পাদিত হইতে পাবে না বলিযা 'তাস' কবণ কাবক। অন্য কিছুর দ্বারা নয—তাসের দ্বাবাই খেলা—এখানে তাস সামগ্রীটি 'খেলা' ক্রিযা-সম্পাদনেব সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়; তাই 'তাস' কবণ কাবক। পক্ষান্তবে, 'সে লাঠি খেলে'—এই উদাহবণটিতে 'লাঠি খেলাব' অর্থ প্রকৃত খেলা কবা নয়—লাঠিকে ঘোবানো তথা নৈপুণ্য দেখানো; তাই 'লাঠি' 'খেলে' ক্রিয়াব কর্ম।) **ক. বি. (বিশেষ) '৫০**

[আট] অধিকবণ-কাবক বুঝাও এবং আধাব-অধিকবণ, ব্যাপ্ত্যধিকবণ, কালাধিকবণ এবং ভাবাধিকবণ-এব একটি কবিযা উদাহবণ দাও।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭

[নয] বিভিন্ন অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তিব প্রয়োগ, উদাহবণ-সমেত প্রদর্শন কব।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৭

[দশ] পার্থক্য দেখাও :—(ক) 'একদিন' যাব। 'একদিনে' যাব। (খ) কোন্ 'সময়' যাইব ? 'সময়ে' সবই ভুলিবে। (গ) 'বাড়ি' যাও। 'বাড়িতে' যাও।

[এগাবো] নিম্নলিখিত প্রযোগসমূহেব উদাহবণ দাও :—অপাদানে সপ্তমী, অব্যযযোগে প্রথমা, বিশেষণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী, অভেদে ষষ্ঠী (**ক. বি বি. এ. '৫৫**)। অভেদে ষষ্ঠী, অব্যযযোগে প্রথমা, সমধাতুজ কর্ম (**ক. বি. বি. এ. '৫৭**)। কর্তায় দ্বিতীয়া, তৃতীযা ও সপ্তমী, কর্মে সপ্তমী, কবণে প্রথমা, ষষ্ঠী ও সপ্তমী; সম্প্রদানে সপ্তমী; অপাদানে প্রথমা, ষষ্ঠী ও সপ্তমী; অধিকবণে প্রথমা ও পঞ্চমী; বীপ্সায় সপ্তমী।

[বাবো] নিম্নলিখিত প্রযোগসমূহেব উদাহবণ দাও :—(ক) 'য' বিভক্তি-যোগে কর্তৃকারক। (খ) 'এ, য়, তে, ব, এর, শূন্য' বিভক্তি-যোগে কবণ কারক। (গ) 'কবিয়া, হইতে' অনুসর্গ-যোগে করণকারক। (ঘ) 'তে, এ, য' বিভক্তি-যোগে সম্প্রদানকারক

পঞ্চম পর্ব

বাক্য-প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

বাক্যপরিচয়

যে পদ বা শব্দসমষ্টির সাহায্যে কোন বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্যকরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে বলা হয় **বাক্য**। প্রতিটি বাক্যেই দুইটি বস্তু থাকে—একটি, উদ্দেশ্য এবং অপরটি, বিধেয়, যাহার উদ্দেশ্যে বা সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাহাই **উদ্দেশ্য**, আর যাহা কিছু বলা হয়, তাহাই **বিধেয়**। সাধারণতঃ উদ্দেশ্য আগে ও বিধেয় পরে বসে ; যেমন,—রাম হাসিতেছে। 'রাম' উদ্দেশ্য এবং 'হাসিতেছে' বিধেয়। সম্বন্ধ-পদ, বিশেষণ, কৃদন্ত প্রভৃতির দ্বারা উদ্দেশ্যকে আর কর্ম, সম্প্রদান বা অপর কারকে প্রযুক্ত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম বা অব্যয়-দ্বারা বিধেয়কে সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে ; যেমন,—বীরেনবাবুর নিদর্শী পুত্র রাম এখন মনোযোগসহকারে পরীক্ষার পড়া পড়িতেছে।

আকাংক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি

আকাংক্ষা, যোগ্যতা এবং আসত্তি—এই তিনটি গুণ না থাকিলে সার্থক বাক্যরচনা হয় না। **প্রথমত**, বাক্য এমন হওয়া উচিত যাহাতে বক্তার পূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রোতার আগ্রহ বা **আকাংক্ষা** মিটিয়া যায়। যতক্ষণ অবধি এই আকাংক্ষা না মিটে, ততক্ষণ তক অপর নূতন পদ আসিবার আবশ্যকতা থাকে। শ্রোতার আকাংক্ষা না মিটা অবধি বাক্য সম্পূর্ণ হয় না ; যেমন,—'আমি কলেজে যাইয়া' এই অবধি বলিয়া বক্তা যদি থামিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পূর্ণ উদ্দেশ্য জানিবার জন্য শ্রোতার আগ্রহ বা আকাংক্ষা থাকে। পক্ষান্তরে, 'আমি কলেজে যাইয়া পড়িব' এই ভাবে বাক্যটিকে শেষ করিলে শ্রোতার আকাংক্ষা বা আগ্রহের নিবৃত্তি হয়। **দ্বিতীয়ত**, বাক্যের মধ্যে পদসমষ্টিকে ব্যাকরণমতে পরস্পরের সংগে সংগত করিয়া বসাইলেই চলিবে না, অভিজ্ঞতা ও সুযুক্তির অনুসারী না হইলে ব্যাকরণ-অনুযায়ী বাক্যের অবয়ব হইবে সত্য, কিন্তু অর্থগত ও ভাবগত বিপত্তিহেতু বাক্যটি উন্মাদের প্রলাপোক্তিতে পরিণত হইবে। অর্থগত ও ভাবগত মেলবন্ধনকেই বাক্যের **যোগ্যতা** বলা যাইতে পারে ; যেমন,—'ছাগল গোরুকে খাইতেছে'। ব্যাকরণমতে

ইহা বাক্য হইলেও, গোরুকে খাইবার যোগ্যতা ছাগলের নাই। এহেন বাক্য পাগলের প্রলাপোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, বাক্যরচনায় **অর্থগত** ও **ভাবগত যোগ্যতা** অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। **তৃতীয়তঃ,** বাক্যের অর্থবোধের নিমিত্ত পদগুলিকে ভাষায় স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পর পর সাজাইয়া পরস্পরের সহিত অন্বিত বা সম্পর্কিত করিতে হয়। ইহাকেই বলা হয় বাক্যের **আসত্তি** বা **নৈকট্য** রক্ষণ : যেমন,—'পরশু হইতে মাসীর আসিয়াছে বাড়ি হরেন'—ইহাতে পদগুলির যথাযোগ্য নৈকট্য রক্ষিত না হওয়ায় বাক্যটি অর্থহীন হয়। পক্ষান্তরে, 'হরেন পরশু মাসীর বাড়ি হইতে আসিয়াছে'—এইরূপ বলিলে আসত্তি বজায় থাকে এবং বাক্যটিও অর্থপূর্ণ হয়।

বাক্যের গঠনমূলক শ্রেণীবিভাগ

বাক্য

সরল বা সাধারণ | মিশ্র বা জটিল | যৌগিক বা সংযুক্ত

(১) যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ও একটিমাত্র বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া) থাকে, তাহাই **সরল** বা **সাধারণ** বাক্য : যেমন,—'সে ঘোড়ায় চড়ে।' (২) যে বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়সংবলিত প্রধান অংশ ছাড়াও এক বা ততোধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য বা বাক্যাংশ প্রধান বাক্যের অংগ হিসাবে থাকিয়া সম্পূর্ণ বৃহত্তর বাক্য গঠন করে, তাহাকে বলা হয় **মিশ্র** বা **জটিল বাক্য**। এই বৃহত্তর বাক্যের অংগীভূত অপ্রধান বাক্যাংশ বা খণ্ডবাক্যকে বলা হয় **উপাদান-বাক্য** বা **আশ্রিত বাক্যাংশ**। এই উপাদান বাক্যও তিন শ্রেণীর : (**ক**) যে খণ্ডবাক্য বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের সহিত অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহাকে বলা হয় **বিশেষ্যস্থানীয় উপাদান বাক্য** : যেমন,—'তপন ঢাকুরিয়ায় থাকে', ইহা আমি জানি। এখানে 'তপন ঢাকুরিয়ায় থাকে' এই খণ্ডবাক্যটি বিশেষ্যধর্মী উপাদান-বাক্য ; ইহা কর্মকারক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। (**খ**) যে খণ্ডবাক্য বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যের অন্তর্গত কোন পদকে বিশেষিত করে, তাহাকে বলা হয় **বিশেষণ-স্থানীয় উপাদান-বাক্য** : যেমন,—'যে লোক পরোপকার করে,' সে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়। (**গ**) যে খণ্ডবাক্য ক্রিয়াবিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়ার অবস্থা প্রকৃতি প্রভৃতি নির্দেশিত করে, তাহাকে বলা হয় **ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় উপাদান-বাক্য** : যেমন,—'যখন আমরা স্টেশনে পৌঁছিলাম,' তখন ট্রেন ছাড়িল। এখানে 'যখন আমরা স্টেশনে

পৌঁছিলাম'—এই খণ্ডবাক্যটি 'ছাড়িল' ক্রিয়ার বিশেষণ। (৩) যে বাক্যে দুই বা ততোধিক সরল, মিশ্র, অথবা সরল ও মিশ্র বাক্যকে সংযোজক অথবা প্রতিষেধক অব্যয়-যোগে সংযুক্ত করিয়া, একটি দীর্ঘ প্রস্তাব বাক্যের ন্যায় গঠিত করা হয়, তাহাকে বলা হয় **যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য**: যেমন,—'মঞ্জুশ্রী বেলুড়ে যাইবে ও অলকাকে সংগে লইবে।' 'মঞ্জুশ্রী না থাকিলে অলকা যাইবে না, কিন্তু অলকা বলিয়া পাঠাইয়াছে যে, তাহার আসিতে বিলম্ব হইবে।'

বাক্যের উদ্দেশ্যগত বা অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ
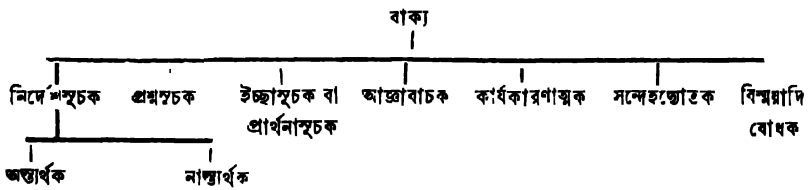
(ক) নির্দেশসূচক অস্ত্যর্থক বাক্য—'সে স্কুলে যায়।' (খ) নির্দেশসূচক নাস্ত্যর্থক বাক্য—'সে স্কুলে যায় না।' (গ) প্রশ্নবোধক বাক্য—'সে কখন স্কুলে যাইবে?' (ঘ) ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য—'কাল আমার কাছে পড়িতে আসিও।' 'মা সিদ্ধেশ্বরী তোমার কল্যাণ করুন'। (ঙ) আজ্ঞাবাচক বাক্য—'অধ্যক্ষ-মহাশয়ের সংগে এখনই দেখা কর।' (চ) কার্যকারণাত্মক বাক্য—'কষ্ট না করিলে কেষ্ট মিলে না।' (ছ) সন্দেহদ্যোতক বাক্য—'বোধ হয় কাল তোমার বাড়িতে যাইব। (জ) বিস্ময়াদি-বোধক বাক্য—'পুরীর সমুদ্রদৃশ্য কি মনোহর।'

অনুশীলনী

[এক] এমন একটি বাক্য রচনা কর যাহাতে 'বিধেয়' অংশ আগে ও 'উদ্দেশ্য' অংশ পরে থাকিবে। **ক. বি. বি. এ. '৫৬**

[দুই] দৃষ্টান্তসহকারে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি ব্যাখ্যা কর:—উদ্দেশ্য; বিধেয়; আকাংক্ষা; যোগ্যতা; আসত্তি; সরল বাক্য, মিশ্র বাক্য। যৌগিক বাক্য [**ঢা. বি. বি. এ. '৫০**]। বিশেষ্যস্থানীয় উপাদান-বাক্য, বিশেষণস্থানীয় উপাদান-বাক্য; ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় উপাদান-বাক্য।

[তিন] বাংলা বাক্য কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার বাক্যের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। **রা. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫**

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাক্যপরিবর্তন

অর্থরক্ষা করিয়া বাক্যপরিবর্তন করা যাইতে পারে। এই বাক্যপরিবর্তন তথা বাক্যান্তরীকরণের পদ্ধতি নানাবিধ: **প্রথমত**, বাক্যের গঠন বদলাইয়া বাক্যান্তরীকরণ অর্থাৎ সরল বাক্য, মিশ্র বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তরীকরণ, **দ্বিতীয়ত**, বাক্যের নিশ্চয়াত্মক ও নিষেধাত্মক, নির্দেশাত্মক ও প্রশ্নাত্মক আকারের মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তরীকরণ; **তৃতীয়ত**, উক্তি-পরিবর্তন করিয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, স্বকীয়, সরল বা অপরোক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ, পরকীয় বা বক্র উক্তিতে এবং পরোক্ষ উক্তিকে প্রত্যক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করিয়া বাক্যপরিবর্তন, **চতুর্থত**, বাচ্যপরিবর্তন করিয়া কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে, কর্মবাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে, কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে, ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে রূপায়িত করিয়া বাক্যপরিবর্তন, **পঞ্চমত**, অর্থরক্ষা করিয়া, ভাবসংগতি বজায় রাখিয়া, যথেচ্ছভাবে বাক্যপরিবর্তন।

প্রথম পর্যায়

সরল বাক্য হইতে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তরকালে সরল বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কোন পদ বা পদসমষ্টিকে ভাঙিয়া **নিরপেক্ষ** অপ্রধান বাক্যে পরিণত করা দরকার। প্রয়োজনমতে সংযোজক, বিয়োজক বা নিমিত্তার্থক অব্যয়ের ব্যবহার অনিবার্য: যেমন,—

সরল বাক্য—নশ্বরদেহ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কীর্তি অবিনশ্বর।
যৌগিক বাক্য—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দেহ নশ্বর ছিল, কিন্তু তাঁহার কীর্তি অবিনশ্বর।
সরল বাক্য—পিতৃবিয়োগে শোকার্ত সমর এবার পরীক্ষা দিবে না।
যৌগিক বাক্য—সমর পিতৃবিয়োগে শোকার্ত আছে, সেই নিমিত্ত পরীক্ষা দিবে না।

সরল বাক্য হইতে জটিল বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তরকালে সরল বাক্যের অন্তর্ভুক্ত কোনও একটি পদ বা পদসমষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া একটি অংশকে প্রধান বাক্য হিসাবে রাখিয়া অপর অংশকে অপ্রধান বাক্যে তথা **উপবাক্যে** পরিণত করা দরকার। এই উপবাক্য হয় বিশেষ্যধর্মী, নয় বিশেষণধর্মী, নয়তো-বা ক্রিয়াবিশেষণধর্মী হইবে: যেমন,—

সরল বাক্য—আমি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক।
জটিল বাক্য—আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করি।

সরল বাক্য—পরোপকারীকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।
জটিল বাক্য—যিনি পরের উপকার করেন, তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।
সরল বাক্য—গৃহস্থের নিদ্রাকালে চোর আসিয়াছিল।
জটিল বাক্য—গৃহস্থ যখন নিদ্রা যাইতেছিল, তখন চোর আসিয়াছিল।

যৌগিক বাক্য হইতে সরল বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তরকালে যৌগিক বাক্যের অন্তর্ভুক্ত নিরপেক্ষ অপ্রধান বাক্যকে পরিহার করিয়া একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া রাখিতে হইবে আর পরিত্যক্ত অপ্রধান বাক্যকে পদে বা পদসমষ্টিতে রূপায়িত করিতে হইবে। সংযোজক বিয়োজক বা নিমিত্তার্থক অব্যয়ের চিহ্নমাত্র থাকিবে না: যেমন,—

যৌগিক বাক্য—'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে'।
সরল বাক্য—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য না হইলে খরচ বাড়ে।
যৌগিক বাক্য—বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নাই।
সরল বাক্য—তাহার বয়স বাড়িলেও বুদ্ধি বাড়ে নাই।

যৌগিক বাক্য হইতে জটিল বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তরকালে যৌগিক বাক্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে একটিকে ছাড়া অপর বাক্য বা বাক্যগুলিকে উপবাক্যে রূপায়িত করিতে হইবে। 'যখন—তখন', 'যদিও—তথাপি', 'যদি—তাহা হইলে' ইত্যাদি অপেক্ষাসূচক অব্যয় থাকিবে, অর্থাৎ,—ইহা যেন নিরপেক্ষ না হয়: যেমন,—

যৌগিক বাক্য—তিনি ধনী, কিন্তু তাঁহার মন দরিদ্রের জন্য কাঁদে।
জটিল বাক্য—যদিও তিনি ধনী, তথাপি তাঁহার মন দরিদ্রের জন্য কাঁদে।
যৌগিক বাক্য—বর্ষায় ছাতা লইয়া যাও, নইলে পথে দাঁড়াইতে হইবে।
জটিল বাক্য—যদি বর্ষায় ছাতা না লইয়া বাহিরে যাও, তাহা হইলে পথে দাঁড়াইতে হইবে।

জটিল বাক্য হইতে সরল বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তরকালে জটিল বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্যধর্মী, বিশেষণধর্মী ক্রিয়াবিশেষণধর্মী অপ্রধান বাক্য তথা উপবাক্যকে সংকুচিত করিয়া সমাসবদ্ধ পদ বা পদসমষ্টিতে পরিণত করিয়া কেবলমাত্র একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া রাখিতে হইবে: যেমন,—

জটিল বাক্য—সূর্য যে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, ইহা কে না জানে।
সরল বাক্য—পশ্চিম দিকে অস্তগামী সূর্যের কথা কে না জানে।
জটিল বাক্য—যে বইখানি আমি কিনিয়াছি, তাহা আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।
সরল বাক্য—মৎক্রীত বইখানি আর কোথাও মিলিবে না।

জটিল বাক্য—অভাব আছে বলিয়াই জগৎ এরূপ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে।

সরল বাক্য—অভাবের দরুণ জগৎ এরূপ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে।

জটিল বাক্য হইতে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

এই জাতীয় রূপান্তব করিতে হইলে জটিল বাক্যেব অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক ক্ষুদ্রতর উপবাক্যকে একটি বৃহত্তর বাক্যের অংগীভূত করিয়া প্রযোজনমতে সংযোজক অথবা বিযোজক অব্যয় জুড়িয়া নিরপেক্ষ অপ্রধান বাক্যাদিতে পবিণত কবিতে হয়। সময়ে সময়ে অব্যয যোগ না কবিয়াও 'কমা' বা 'সেমিকোলন' দেওযা হয : যেমন,—

জটিল বাক্য—যদি সুনাম পাইতে চাও, তাহা হইলে নামের প্রাত লোভ ছাড়।

যৌগিক বাক্য—সুনাম পাইতে চাও, নামের প্রতি লোভ ছাড়।

জটিল বাক্য—সেদিন কলেজে যে ছাতাটি হারাইযা গিযাছিল, তাহা আজ পাইযাছি।

যৌগিক বাক্য—সেদিন কলেজে এই ছাতাটি হারাইযাছিল, আজ ইহা পাইয়াছি।

জটিল বাক্য—যখন বড় ডাক্তার আসিয়াছেন, তখন আর রোগীর জীবনশংকা নাই।

যৌগিক বাক্য—বড ডাক্তার আসিয়াছেন, এখন আর রোগীর জীবনশংকা নাই।

দ্বিতীয় পর্যায়

নিশ্চয়াত্মক বাক্য	নিষেধাত্মক বাক্য
(ক) দরিদ্রসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।	(ক) দরিদ্রসেবা অপেক্ষা আর কোনও ধর্ম বড় নয়।
(খ) তাঁহারা দুইজনেই সমান বলশালী।	(খ) বলের দিক দিয়া তাঁহারা দুইজনেই কেহ কাহারও অপেক্ষা কম নহেন।
(গ) তাঁহার ন্যায় কর্মবীর অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।	(গ) তাঁহার ন্যায় কর্মবীর বড একটা কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।
(ঘ) এই কাযের পরিণাম অতি ভয়াবহ।	(ঘ) এই কাযের পরিণাম আদৌ সুখদাযক নয়।

নিষেধাত্মক বাক্য	নিশ্চয়াত্মক বাক্য
(ক) মাতাপিতার প্রতি তাহার ভক্তির সীমা ছিল না।	(ক) মাতাপিতার প্রতি তাহার অসীম ভক্তি ছিল।
(খ) তাহাকে পরাস্ত না করিযা আমি নিশ্চিন্ত হইব না।	(খ) তাহাকে পরাস্ত করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব।
(গ) ইহা অপেক্ষা সুন্দর বস্তু আর নাই।	(গ) ইহা সুন্দরতম বস্তু।
(ঘ) গৃহকার্যে তাহার মন নাই।	(ঘ) গৃহকার্যে সে উদাসীন।

নির্দেশাত্মক বাক্য	প্রশ্নাত্মক বাক্য
(ক) মাহাত্মা গান্ধী অহিংসার পূজারী ছিলেন।	(ক) মহাত্মা গান্ধী কি অহিংসার পূজারী ছিলেন না ?
(খ) ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা।	(খ) ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই কি তপস্যা নয় ?

প্রশ্নাত্মক বাক্য	নির্দেশাত্মক বাক্য
(ক) মানুষ কি দুর্গ সেতু পরিখা প্রণালী পথ ঘাট মাঠ নির্মাণ করিয়াছিল ?	(ক) মানুষই দুর্গ সেতু পরিখা প্রণালী পথ ঘাট মাঠ নির্মাণ করিয়াছিল।
(খ) জগতের পাপ তাপ জগতেই শেষ ?	(খ) জগতের পাপ তাপ জগতেই শেষ হয়।

তৃতীয় পর্যায়

বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ উক্তির উদাহরণ প্রচুর মিলে। কিন্তু পরোক্ষ বা বক্র উক্তির উদাহরণ কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। হয়তো-বা বাংলা ভাষার আত্মধর্মের সংগে প্রত্যক্ষ উক্তিরই আনুকূল্য আছে। সে যাই হোক,—ইংরাজির প্রভাবে আজকাল বাংলা সাহিত্যে পরোক্ষ উক্তির যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহার হইতেছে, কিন্তু এখনও জোর প্রয়োগ দেখা যায় না।

উক্তি-পরিবর্তনের বিধি

প্রত্যক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ-চিহ্ন [" "] থাকে, কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে ঐ চিহ্নের স্থানে 'যে'—এই সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ উক্তির প্রথম ক্রিয়াপদের কাল পরিবর্তিত উক্তিতে অর্থাৎ পরোক্ষ উক্তিতেও অনেক স্থলে বজায় থাকে। প্রত্যক্ষ বাক্যের 'আজ', 'আগামী কাল', 'গতকাল', 'এখানে', 'এখন' পরোক্ষ বাক্যে যথাক্রমে 'সেই দিন', 'পর দিন', 'পূর্বদিন', 'সেখানে', 'তখন' ইত্যাদি রূপে দেখা দেয়। জিজ্ঞাসা, আদেশ প্রভৃতি মনের বিচিত্র ভাব বুঝাইবার ব্যাপারে সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ উক্তির প্রধান বাক্য ও উদ্ধরণ-চিহ্নের অন্তর্গত কথা মিলিয়া পরোক্ষ উক্তিতে একটি বাক্যরূপে প্রকাশ পায়। **সব চেয়ে বড় কথা এই যে, বাক্যের অর্থ অনুযায়ী পরোক্ষ উক্তিতে অনেক সময়েই নূতন নূতন শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হয়।**

প্রত্যক্ষ উক্তি হইতে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন

(ক) সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি খুব বই পড় ?

রমণী কহিল, ইংরাজি জানিনে ত, বাঙলা বই যা' বেরোয়, সব পড়ি। এক একদিন সারারাত্রি পড়ি—এই যে বড় রাস্তা—চল না আমাদের বাড়ি, যত বই আছে, সব দেখাব।

সত্য চমকিয়া উঠিল—তোমাদের বাড়ি ?

হাঁ, আমাদের বাড়ী—চল, যেতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ সত্যের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে বলিয়া উঠিল,—না না, ছি ছি—

[—শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' হইতে উদ্ধৃত।]

উত্তর। সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া দ্বিধাজড়িত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে খুব বই পড়ে কি না। রমণী প্রত্যুত্তরে জানাইল যে, ইংরাজি তো তাহার জানা নাই—তাই বাংলা বই যাহা বেরোয়, সবই সে পড়ে। এক একদিন সারারাত্রি সে পড়ে—সেই যে বড় রাস্তা—তাহা ধরিয়া তাহাদের বাড়িতে যাইবার জন্য সে সত্যকে অনুরোধ করিয়া এই প্রতিশ্রুতি দিল যে, বাড়িতে গেলে যত বই আছে সব সে দেখাবে। সত্য চমকিয়া উঠিয়া অস্ফুটকণ্ঠে তাহাদের বাড়ি যাইবার কথা উচ্চারণ করিল। ইহাতে রমণী তাহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আরও দৃঢ়তার সহিত জানাইল যে, নিশ্চয়ই তাহাদের বাড়িতে তাহাকে (অর্থাৎ সত্যকে) যাইতে হইবে। রমণীর উক্তি শুনিয়া হঠাৎ সত্যের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে ধিক্কারব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করিয়া যাইতে অস্বীকার করিল।

(খ) এক ফাঁকে লীলা দুধের-গ্লাস হাতে তুলিয়া বলিল—তুমি খেয়ে নাও আদ্দেকটা—

অপু লজ্জিত সুরে বলিল—না।

—তোমাকে ভারি খোসামোদ কর্তে হয় সব তাতে—কেন ওরকম ? আমাদের মুলতানী গরুর দুধ—খেয়ে নাও—ক্ষীরের মত দুধ, লক্ষ্মী ছেলে—

অপু চোখ কুঁচকাইয়া বলিল—ইঃ, লক্ষ্মী ছেলে! ভারি ইয়ে কিনা ? উনি আবার—

লীলা দুধের-গ্লাস অপুর মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর লজ্জায় কাজ নেই—আমি চোখ বুজে আছি, নাও—

[—'পথের পাঁচালি' হইতে উদ্ধৃত।]

উত্তর। এক ফাঁকে লীলা দুধের-গ্লাস হাতে তুলিয়া অপুকে আদ্দেকটা খাইয়া লইতে খোসামোদ করিল। অপু লজ্জিতস্বরে খাইতে অস্বীকার করিল। লীলা বিরক্তিসূচক কণ্ঠে জানাইল যে, তাহাকে সব তাতে ভারি তোসামোদ করিতে হয় এবং জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে চাহিল যে, কেনই-বা ওরকম করে। অতঃপর লীলা অপুকে লক্ষ্মী ছেলে বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহাদের মুলতানী গরুর দুধ—ক্ষীরের মত দুধ খাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিল। অপু চোখ কুঁচকাইয়া মনঃকষ্টব্যঞ্জক স্বরে সেই আপ্যায়নসূচক সম্বোধনের পুনরাবৃত্তি করিয়া লীলাকে লক্ষ্য করিয়া নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত করিবামাত্রই লীলা দুধের-গ্লাস অপুর মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া প্রবোধ দিল যে, আর তাহার লজ্জায় কাজ নেই—সে চোখ বুজিয়া আছে। অতঃপর লীলা অপুকে খাইয়া লইতে অনুরোধ করিল।

পরোক্ষ উক্তি হইতে প্রত্যক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন

ব্রজ মাষ্টার বলেন, পূর্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতার গংগার ধারে মাষ্টার-মহাশয় নাকি বেড়াইতেছিলেন, তখন এক সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সাহেব তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া লাট সাহেবের নিকট সে গল্প করিয়াছিল। লাট সাহেব মাষ্টার মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইয়া ডেপুটি কালেক্টরি পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তিনি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা ছিল না, এই প্রস্তাব তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫ টাকার চাকরি তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। পুরুষস্য ভাগ্যং। [—"মাষ্টার-মহাশয়" গল্প হইতে উদ্ধৃত।]

উত্তর। ব্রজ মাষ্টার বলেন, "পূর্বে পিতার জীবিতকালে, একদিন কলিকাতার গংগার ধারে আমি তো বেড়াচ্ছি—হেথায় এক সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। সাহেব আমার ইংরাজি শুনিয়া লাট সাহেবের নিকট এ গল্প করিল। লাট সাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে ডেপুটি কালেক্টরি পদ দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন আমি বাপের বেটা, সংসারের চিন্তা নাই, এই প্রস্তাব আমি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করি। আজ অভাবে পড়িয়া এই ২৫৲ টাকার চাকরি আমাকে স্বীকার করিতে হয়। পুরুষস্য ভাগ্যং।"

চতুর্থ পর্যায়

যে বাক্যে কর্তৃপদের প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ কর্তাই ক্রিয়ার কাজ করে আর ক্রিয়া কর্তার অনুসরণ করে, তাহা **কর্তৃবাচ্য**। কর্তার যে-পুরুষ, ক্রিয়ারও সেই পুরুষ হয়: যেমন,—'আমি বইখানি এখনও পড়ি নাই।' যে বাক্যে কর্তা অপেক্ষা কর্মেরই সংগে ক্রিয়ার ঘটনার প্রধান ভাবে যোগাযোগ থাকে, তাহা **কর্মবাচ্য**। কর্মবাচ্যে কর্তৃপদ হয় উহ্য থাকে, নয় করণকারকের বিভক্তিযুক্ত হয় আর কর্মপদ কর্তৃকারকের বিভক্তিযুক্ত হয়; ক্রিয়াপদও কর্মপদের অধীন হইয়া থাকে। কর্মে যে-পুরুষ, ক্রিয়ারও সেই পুরুষ হয়: যেমন,—'বইখানি এখনও পড়া হয় নাই।' (—এখানে কর্তৃপদ উহ্য আছে।) 'বইখানি এখনও আমা-কর্তৃক পড়া হয় নাই।' (—কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি।) যে বাক্যে ক্রিয়ারই প্রাধান্য থাকে, বক্তার নিকটে ক্রিয়ার ঘটনাই হয় প্রধান, কর্তা বা কর্ম প্রধান নয়, সেখানে হয় **ভাববাচ্য**। ভাববাচ্যের ক্রিয়া প্রথম পুরুষের হয় এবং কর্তায় দ্বিতীয়া, তৃতীয়া বা সপ্তমী বিভক্তি হয়: যেমন,—'আমার বইখানি এখনই পড়িতে হইবে।' যে বাক্যে ক্রিয়ার কর্তাকে নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া —যেন কর্মপদই কর্তৃপদের ন্যায় কাজ করে— সেখানে হয় **কর্মকর্তৃবাচ্য**: যেমন,—'পা আর চলে না। শাঁখ বাজে। কলসী ভরে। বইখানি বেশ কাটে। বরাতে আর কষ্ট সয় না।' মনে রাখিতে হইবে যে, **বাংলা ভাষার বাগ্‌ধারায় ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্যের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। সাধারণ কথোপকথনে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার**ও **যথেষ্ট ব্যবহার আছে।** এক্ষণে বাচ্য-পরিবর্তনের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাক্।

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
(ক) ও গান সে জানে।	(ক) ও গান তাহার জানা আছে।
(খ) এই বইখানি আমি লিখিয়াছি।	(খ) এই বইখানি আমারই লিখিত।
(গ) বইখানি এখনও পড়ি নাই।	(গ) বইখানি এখনও তোমার পড়া হয় নাই।

কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
(ক) বইখানি পড়া হোক্।	(ক) বইখানি পড়।
(খ) গানটি আগেই আমার শোনা।	(খ) আমি আগেই গানটি শুনিয়াছিলাম।
(গ) চোর গৃহস্থ কর্তৃক প্রহৃত হইয়াছে।	(গ) গৃহস্থ চোরকে প্রহার করিয়াছে।

কর্তৃবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
(ক) ক্লাসে গল্প করিও না।	(ক) ক্লাসে গল্প করিতে নাই।
(খ) রাম কি বাজারে যাইবে?	(খ) রামের কি বাজারে যাওয়া হইবে না?
(গ) কখন আস্ছেন?	(গ) কখন আসা হচ্ছে?

ভাববাচ্য	ভাববাচ্য
(ক) অবশেষে রণে ভংগ দিতে হইল।	(ক) অবশেষে আমি রণে ভংগ দিলাম।
(খ) ভোঁদড়কে দেখ্লেই হাসি পায়।	(খ) ভোঁদড়কে দেখলেই আমি হেসে উঠি।
(গ) কি কাজ করা হয়?	(গ) কি কাজ তুমি কর?

পঞ্চম পর্যায়

তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন—তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। তিনি অমরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ইহজীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মা দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে।

ক. বি. মাধ্যমিক '৩৬

অনুশীলনী

[এক] সরল বাক্যে রূপান্তরিত কর:—(ক) যাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল সর্বদাই উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের অধীন থাকে, সেইরূপ চেষ্টা করিবে। (খ) অবজ্ঞাতে যেরূপ হৃদয় পীড়িত হয়, তদ্রূপ প্রায় আর কিছুতেই হয় না।

[দুই] মিশ্র বাক্যে রূপান্তরিত কর:—(ক) নিত্যবাবুর বয়স বেশী ছিল, পাকা বুদ্ধি ছিল না। (খ) প্রেমহীন জীবন নিরর্থক।

[তিন] যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত কর:—(ক) তাহার থাকা-খাওয়ার কোন অভাব নাই। (খ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে মনোযোগসহকারে পড়।

[চার] নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ পরিবর্তন না করিয়া প্রয়োজনমতে হয় নিষেধাত্মক বাক্যে, নয় নিশ্চয়াত্মক বাক্যে রূপান্তরিত কর:—দেশসেবা আমার জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। মহম্মদ মহসীনের ন্যায় দানবীর কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেন।

তাহাকে প্রহার না করিয়া আমি জলগ্রহণ করিব না। কায়েদে আজম জিন্নার প্রতি তাঁহার ভক্তির সীমা ছিল না। তাহারা দুইজনেই সমান মিথ্যাবাদী।

[পাঁচ] নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ পরিবর্তন না করিয়া প্রয়োজনমতে হয় প্রশ্নাত্মক বাক্যে, নয় নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তরিত কর :—শিশিরকুমারই বংগ বংগমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। বংগসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ চলিতেছে। গুরুর প্রতি মর্যাদাজ্ঞাপন কি উচিত নয়? কায়েদে আজম জিন্না কি রাজনীতিবিশারদ ছিলেন?

[ছয়] উক্তি পরিবর্তন কর :—আকবর কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—"কারে বেইমান কয়, দিদি? ঘরের মধ্যে ব'সে বেইমান কইচ, বড়বাবু, চোখে দেখ্‌লি জান্‌তি পার্‌তে ছোটবাবু কি।" বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—"ছোটবাবু কি? তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বল্‌বি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোরে মেরেচে।" আকবর জিভ কাটিয়া বলিল,—"তোবা তোবা। দিন্‌কে রাত কর্‌তি বল, বড় বাবু?"

[সাত] বাচ্যপরিবর্তন কর :—(ক) সভাপতিমহাশয় রমেনকে পুরস্কার দিলেন। (খ) পত্রখানি ডাকে দাও। (গ) এই সবাক্ চিত্রখানি এখনও আমার দেখা হয় নাই। (ঘ) 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের রচিত।

[আট] অর্থসংগতি বজায় রাখিয়া প্রতিটি বাক্য যথেচ্ছভাবে গঠন কর :—(ক) তিনি বিবাহ করিয়াছেন। (খ) সদা সত্য কথা কহিবে।

[নয়] দৃষ্টান্তযোগে ব্যাখ্যা কর :—প্রত্যক্ষ উক্তি; পরোক্ষ উক্তি; কর্তৃবাচ্য; কর্মবাচ্য; ভাববাচ্য। কর্মকর্তৃবাচ্য [ক. বি বি. এ '৪৮, ঢা. বি. বি. এ. '৫১; ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫)]।

তৃতীয় অধ্যায়

বাক্য-সংকোচন

উপকার করিবার ইচ্ছা—উপচিকীর্ষা

জয় লাভের ইচ্ছা—জিগীষা

হনন করিবার ইচ্ছা—জিঘাংসা

জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা

লাভ করিবার ইচ্ছা—লিপ্সা

ভোজন করিবার ইচ্ছা—বুভুক্ষা

বমন করিবার ইচ্ছা—বিবমিষা

পরিচর্যা করিবার ইচ্ছা
শুনিবার ইচ্ছা } —শুশ্রূষা

গোপন করিবার ইচ্ছা—জুগুপ্সা

ভৃগুর পুত্র—ভার্গব

ইতরার পুত্র—ঐতরেয়

জমদগ্নির পুত্র—জামদগ্ন্য

ব্যাসের পুত্র—বৈয়াসকি

পৃথার পুত্র—পার্থ

সূর্যের উপাসনা করেন যিনি—সৌর

তমঃ দূর করে যে—তমোঘ্ন

আকাশে চরে যে—খেচর

জলে ও স্থলে চরে যে—উভচর

স্থলে চরে যে—ভূচর

রজনীতে চরিয়া বেড়ায় যে—নিশাচর

যে নারীর সুন্দর দন্ত আছে—সুদতী

যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে—প্রোষিতভর্তৃকা

যে নারীর পঞ্চ স্বামী—পঞ্চভর্তৃকা

যে নারী প্রিয় বাক্য বলে—প্রিয়ংবদা

যে নারী কখনও সূর্যের মুখ দেখিতে পায় না—অসূর্যম্পশ্যা

যে নারীর সন্তান হয় না—বন্ধ্যা

যে নারীর একটিমাত্র সন্তান হইয়াছে—কাকবন্ধ্যা

যে নারী বিবাহের সম্পূর্ণ যোগ্যা—সমকন্যা

যে নারীর বিবাহ হয় নাই—অনূঢ়া

যে নারীর সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে—নবোঢ়া

যে নারী স্বয়ং পতিকে বরণ করে—স্বয়ংবরা

যে নারী অপরের অর্থে জীবনধারণ করে—পরভৃতিকা

যে নারী পতিপুত্রহীনা—অবীরা

যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে—বীরপ্রসূ

পূর্বে যাহা দেখা যায় নাই—অদৃষ্টপূর্ব, অদৃষ্টচর

পূর্বে যাহা কখনও অনুভব করা যায় নাই—অননুভূতপূর্ব

পূর্বে যাহা শোনা যায় নাই—অশ্রুতপূর্ব

পূর্বে যাহা আস্বাদিত হয় নাই—অনাস্বাদিতপূর্ব

পূর্বে যাহা ভস্ম ছিল না, কিন্তু এখন ভস্মে পরিণত হইয়াছে—ভস্মীভূত

পূর্বে যাহা দৃঢ় ছিল না, কিন্তু এখন দৃঢ় হইয়াছে—দৃঢ়ীভূত

যে পুনঃ পুনঃ কাঁদিতেছে—রোরুদ্যমান

যাহা বাষ্প উদ্গমন করিতেছে—বাষ্পায়মান

যাহা পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছে—জাজ্বল্যমান

যাহা শ্যাম হইতেছে—শ্যামায়মান

যাহা ধূম উদ্গারণ করিতেছে—ধূমায়মান
যাহা অমৃতের মত কাজ করে—অমৃতায়মান
যাহা বিনা কষ্টে লাভ করা যায়—অনায়াসলভ্য
যাহা উচ্চারণ করা যায় না—অনুচ্চার্য
যাহা শোকের যোগ্য নয়—অশোচ্য
যাহা লাভ করিতে পারা যায় না—অলভ্য
যাহা বর্ণনা করা যায় না—অবর্ণনীয়
যাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না—অনির্বচনীয়
যাহা ধ্যানের যোগ্য—ধ্যেয়
যাহা ধ্যানের দ্বারা জানা যায়—ধ্যানগম্য
যাহা প্রশংসার যোগ্য—প্রশস্ত, প্রশংসনীয়
যাহা চিরকাল মনে রাখিবার যোগ্য—চিরস্মরণীয়, প্রাতঃস্মরণীয়
যাহা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে—ক্রমবর্ধমান
যাহা সহজে অতিক্রম করা যায় না—দুরতিক্রমণীয়
যাহা সহজে নিবারণ করা যায় না—দুর্নিবার
যাহা সহজে দমন করা যায় না—দুর্ধর্ষ, দুর্দম
যাহাকে সহজে শাসন করা যায় না—দুঃশাসন
যাহা সহজে সাধন করা যায় না—দুঃসাধ্য
যাহা সহজে জানা যায় না—দুর্জ্ঞেয়
যাহা সহজে পাওয়া যায় না—দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ
যাহা সহজে অপনীত হইবার নয়—দুরপনেয়
যাহা সহজে পরিপাক হয় না—দুষ্পাচ্য
যাহা সহজে উচ্চারণ করা যায় না—দুরুচ্চার্য
যাহা সহজে লংঘন করা যায় না—দুর্লংঘ্য
যাহা সহজে চিকিৎসার দ্বারা প্রতিকার-প্রাপ্ত হয় না—দুশ্চিকিৎস্য
যাহা সহজে ভাঙিয়া যায়—ক্ষণভঙ্গুর
যাহা বাক্য ও মনের অতীত—অবাঙ্‌মনসগোচর
যাহা মর্মকে আঘাত করে—মর্মন্তুদ, অরুন্তুদ

যাহার বুদ্ধি কুশের অগ্রভাগের মত তীক্ষ্ণ—কুশাগ্রধী
যাহার জন্ম সুক্ষণে হইয়াছে—ক্ষণজন্মা
যাহার দুই হাত সমান চলে } —সব্যসাচী
যাহার বাঁ হাতও চলে }
যাহার সহিত গোত্র সমান—সগোত্র
যাহারা একই সময়ে একই গুরুর শিষ্য—সতীর্থ
যাহার চক্ষুলজ্জা নাই—চশমখোর
যে ব্যক্তি উপকারীর উপকার স্বীকার করিতে চায় না—অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন
যে মৃগকে বিদ্ধ করে—মৃগাবিৎ
যে আতপ হইতে ত্রাণ করে—আতপত্র
যে উষ্ণ সহ্য করিতে পারে না—উষ্ণালু
যে বাস্তু হইতে উৎখাত—বাস্তুহারা, উদ্বাস্তু
যে ভাঙের নেশা করে—ভাঙড়
যে গলায় ফাঁসি দিয়া মারে—ফাঁসুড়ে
যে রোগনির্ণয়ে হাতড়াইয়া মরে—হাতুড়ে
যে সাপ খেলাইয়া জীবিকা অর্জন করে—সাপুড়ে
যে নৌকা চালাইয়া জীবিকা অর্জন করে—নাবিক
যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে—মরণোত্তরজাতক
যে অন্তে (নিকটে) বাস করে—অন্তেবাসী
যে অভ্র লেহন করে—অভ্রংলিহ
যে অপরকে পোষকতা করে—পৃষ্ঠপোষক
যে হাতে-কলমে কাজ করিয়া দক্ষতা লাভ করিয়াছে—করিৎকর্মা
যে আটমাসে জন্মিয়াছে—আটাসে
যে মায়া বা কাপট্য জানে না—অমায়িক
যে মমতা জানে না—নির্মম
যে সকল বস্তু ভক্ষণ করে—সর্বভুক্
যে কি করিবে তাহা বুঝিতে পারে না—কিংকর্তব্যবিমূঢ়

যে পারে গমন করে—পারগ
যে গমন করে না—নগ
যে ত্বরায় গমন করে—তুরগ, তুরংগ, তুরংগম
যে বক্রভাবে গমন করে—ভুজগ, ভুজংগ, ভুজংগম
যে বুকে হাঁটিয়া গমন করে—উরগ
যে পূর্বজন্মের কথা মনে করিতে পারে—জাতিস্মর
যে শুনিবামাত্র মনে রাখিতে পারে—শ্রুতিধর
যে গাছ ফল পাকিবামাত্র মরিয়া যায়—ওষধি
যে গাছ অপর একটি গাছের উপরে জন্মে—পরগাছা, উপবৃক্ষক
যিনি পূর্বে অধ্যাপক ছিলেন—অধ্যাপকচর
যিনি সেনার চালনা করেন—সেনানায়ক, সেনানী,
যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে—মুমূর্ষু
যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন—যুধিষ্ঠির
যিনি অতীত জানেন—অতীতবেদী
যিনি অধিক কথা বলেন না—মিতভাষী
যেখানে মাছিটি অবধি প্রবেশ করিতে পারে না—নির্মক্ষিক
বিধি অতিক্রম না করিয়া—যথাবিধি
দিবসের প্রথম ভাগ—পূর্বাহ্ন
দিবসের মধ্য ভাগ—মধ্যাহ্ন
দিবসের শেষ ভাগ—অপরাহ্ন
যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন—নৈয়ায়িক
যিনি স্মৃতিশাস্ত্র জানেন—স্মার্ত
যিনি ব্যাকরণ জানেন—বৈয়াকরণ
যিনি আপনাকে পণ্ডিত মনে করেন—পণ্ডিতম্মন্য
যিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন—কৃতার্থম্মন্য
যিনি পরের মুখ চাহিয়া কাজ করেন—পরমুখাপেক্ষী

দিনের আলো ও রাতের আঁধারের সন্ধিক্ষণ—গোধূলি
রাত্রির প্রথম ভাগ—পূর্বরাত্র
রাত্রির মধ্য ভাগ—মধ্যরাত্র
রাত্রির শেষ ভাগ—পররাত্র
গভীর রাত্রি—নিশীথ
দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া—দিবারাত্র, অহোরাত্র
সন্তান হইতে ভেদ না করিয়া—অপত্যনির্বিশেষে
পুরোহিতের বৃত্তি—পৌরোহিত্য
কোন্‌টা দিক্ কোন্‌টা বিদিক্, এই জ্ঞান যাহার নাই—দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য
যাহার স্বাভাবিক বর্ণ প্রকাশ পায় না—বর্ণচোরা
যাহার স্বভাবের সহিত নামের মিল আছে—স্বভাবসংগতনামা
যাহার গোঁফদাড়ি গজায় নাই—অজাতশ্মশ্রু
যাহার উপস্থিত বুদ্ধি আছে—প্রত্যুৎপন্নমতি
যাহার অন্য কোন সহায় নাই—অনন্যসহায়
যাহার পত্নীলাভ হয় নাই—অকৃতদার
যাহার পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছে—বিপত্নীক, মৃতদার
যাহার স্পৃহা দূর হইয়াছে—বীতস্পৃহ
যাহার কোন বিষয়ে শ্রদ্ধা নাই—বীতশ্রদ্ধ
যাহার হৃদয় শোভন—সুহৃৎ
যাহার কিছুই নাই—নিঃস্ব, অকিঞ্চন
যাহার প্রতিবিধান করা যায় না—অপ্রতিবিধেয়
যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে—আস্তিক
যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই—নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী
যাহার প্রভা দীর্ঘকাল থাকে না—ক্ষণপ্রভা
যাহার দুই প্রকার অর্থ হয়—দ্ব্যর্থক
যাঁহার অনেক দেখাশুনা আছে—বহুদর্শী
যাঁহার নয়ন কর্ণ অবধি বিস্তৃত—আকর্ণবিস্তৃতনয়ন

যাঁহার বাহু জানু অবধি লম্বমান—আজানুলম্বিতবাহু

যাঁহার ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা দেখিবার শক্তি নাই—অদূরদর্শী

যাঁহার পরিণামে কি হইবে তাহা দেখিবার ক্ষমতা নাই—অপরিণামদর্শী

যাহা অস্ত যাইতেছে—অস্তগামী, অস্তায়মান, অস্তোন্মুখ

যাহা মাটি ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে উঠে—উদ্ভিদ

যাহা হইবে—ভাবী

যাহা অবশ্যই হইবে—অবশ্যম্ভাবী

যাহা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না—অনন্যসাধারণ

যাহা হৃদয়কে বিদীর্ণ করে—হৃদয়বিদারক

যাহা সারাদিন ব্যবহার করা হয়—আটপৌরে

যাহা সসম্মানে শিরে রাখিবার যোগ্য—শিরোধার্য

যাহা চাটিয়া খাইতে হয়—লেহ্য

যাহা চিবাইয়া খাইতে হয়—চর্ব্য

যাহা চুষিয়া খাইতে হয়—চুষ্য

যাহা লাফাইয়া চলে—প্লবগ, প্লবংগ

যাহা মুষ্টির দ্বারা পরিমাপ করা যায়—মুষ্টিমেয়

যাহা লোকে বিদিত নয়—অলৌকিক

যাহা দ্বারা জানা যায়—বিদ্যা

যাহা দ্বারা লেখা যায়—লেখনী

যাহাতে পারিশ্রমিক শুধু দুইবেলা পেটের ভাত—পেটভাতা

যে বিচার না করিয়া কার্য করে—অবিমৃষ্যকারী

যে শত্রুকে পীড়া দেয়—পরন্তপ, অরিন্দম

যে সব সহ্য করে—সর্বংসহ

চক্ষু দ্বারা গৃহীত—গোচর, প্রত্যক্ষীভূত

অন্য ভাষায় রূপান্তরিত—অনূদিত

মনে যাহার জন্ম—মনসিজ

কুসুম ধনু যাহার—কুসুমধন্বা, পুষ্পধন্বা

গাণ্ডীব ধনু যাহার—গাণ্ডীবধন্বা

পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি যাহার—পুণ্ডরীকাক্ষ

ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় রঙ যাহার—ময়ূরকণ্ঠী

বৃহৎ অরণ্য - অরণ্যানী

অতি শীতলও নয়, অতি উষ্ণও নয়—নাতিশীতোষ্ণ

কষায় বর্ণে রঞ্জিত—কাষায়

কোথাও উন্নত, কোথাও নত—বন্ধুর, উচ্চাবচ

কোথাও হইতে যাহার ভয় নাই—অকুতোভয়

পথে বা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা—প্রত্যুদ্গমন

সাক্ষাৎ যে দেখে – প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী

স্থান হইতে স্থানান্তরে যাহারা সর্বদা গমন করে – যাযাবর

নদীই মাতা যাহার (যে দেশের)—নদীমাতৃক

বৃষ্টির দেবতা মাতা (যে দেশের)—দেবমাতৃক

প্রথমে মধুর, কিন্তু পরিণামে নয় / যাহা আপাতত মধুর } —আপাতমধুর

যে সময়ের মধ্যে সূর্য দ্বাদশরাশি অতিক্রম করে—সংবৎসর

এক হইতে শুরু করিয়া – একাদিক্রমে

পংক্তিতে বসিবার অনুপযুক্ত—অপাংক্তেয়

আয়ুর পক্ষে হিতকর—আয়ুষ্য

বিশ্বজনের পক্ষে হিতকর—বিশ্বজনীন

সর্বজনের হিতকর—সর্বজনীন

ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার প্রীতিময় সম্পর্ক—সৌভ্রাত্র

বর্ণমালার ক্রম বা পরম্পরা রক্ষা করিয়া – বর্ণানুক্রমিক

আদর্শ রাজা যে ভূমির—রাজন্বতী

নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে—নিদাঘ

স্বর্ণকারকে দেয় দক্ষিণা—বানী

গয়ার বাড়ি যাহার—গয়ালী

অস্থায়ী ভাবে থাকিবার স্থান—বাসা

ছাইয়ের মত বর্ণ যাহার—খাকী
শিয়ালের মত বৃত্তি যাহার—শিয়ালে
হাতের অনুকল্প—হাতল, হাতা
বালকের অহিত—বালাই
কন্যাকালে জাত—কানীন
হেমন্তে জাত—হৈমন্তিক
চৈত্র মাসের ফসল—চৈতালি
এক মনুর শাসনকালান্তে অন্য মনুর শাসনারম্ভকাল—মন্বন্তর
হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক, এই কয়েকটি সেনার সমাহার—চতুরংগ
পা ধুইবার জল—পাদ্য
একই সময়ে বর্তমান—সমসাময়িক
স্বয়ং হয় যে—স্বয়ংভূ
ঈষদূন শিক্ষিত—শিক্ষিতকল্প
প্রায় আচার্যের ন্যায়—আচার্যকল্প
দুইয়ের মধ্যে একটি—অন্যতর, একতর
বহুর মধ্যে একটি—অন্যতম, একতম
ছোট কোষা—কুষি
ছোট ছোরা—ছুরি
যাহা তর্কবিচারের অতীত—অপ্রতর্ক্য
যেখানে মৃত জন্তু ফেলা হয়—শূল্যা, ভাগাড়
যে শিক্ষা করিতেছে—শিক্ষানবীশ
যে বৃক্ষের ফুল হয় না, ফল হয়—বনস্পতি
যে সুপথ হইতে বিচলিত হইয়াছে—উন্মার্গগামী
যে নারীর হাস্য পবিত্র—শুচিস্মিতা
যাহার চোখ হইতে বারিধারা গড়াইয়া পড়ে—গলদশ্রু
যাহা প্রমাণ করা যায় না—অপ্রমেয়
যাহার মন এক বিষয়ে নিবিষ্ট—একাগ্রচিত্ত
সবচেয়ে বেশী—ভূয়িষ্ঠ
সবচেয়ে ছোট—কনিষ্ঠ
পূর্বকাল-সম্পর্কিত—প্রাক্তন
হৃদয়ের প্রীতিকর—হৃদ্য
বাঘের চামড়া—কৃত্তি
হরিণের চামড়া—অজিন
পরিব্রাজকের ভিক্ষা—মাধুকরী
সন্ন্যাস লইয়া ভ্রমণ—প্রব্রজ্যা, পরিব্রজ্যা
পিষ্ট দ্রব্যের গন্ধ—পরিমল, সৌরভ
অশ্বের ধ্বনি—হ্রেষা
হস্তীর চীৎকার—বৃংহিত, বৃংহণ
পক্ষীর কলরব—কূজন, কাকলি
ময়ূরের স্বর—কেকা
নূপুরের ধ্বনি—নিক্বণ, রুণুঝুনু
ভূষণাদির শব্দ—শিঞ্জিত, শিঞ্জন
জনরব শুনিয়া যে আসিয়া হাজির হয়—রবাহূত
হুজুর জল উঁচু বলিলে যে জল উঁচুই বলে—জলউঁচু
চৌতিশ অক্ষরের স্তব—চৌতিশা
বার মাসের (সুখ-দুঃখের) কাহিনী—বারমাস্যা
যাহা বিনা আদরে উৎপন্ন হয়—অযত্নসম্ভূত
যে অপরের আশ্রয় ছাড়া থাকে—নিরালম্ব
সন্দেহ সত্ত্বেও পারদর্শিতা—অনিশ্চিতপটুত্ব
যে তীর নিক্ষেপ করে—তীরন্দাজ
যাহাতে পাঁচ রকমের জিনিস মিশ্রিত আছে—পাঁচমিশালি
যে পাপ দূর করে—পাপঘ্ন
যে আপনাকে হত্যা করে—আত্মঘাতী
যে মায়া জানে—মায়াবী
ঋষি দ্বারা উক্ত—আর্ষ
যাহার বসন আলগা—অসংবৃত

অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির প্রতিশব্দ লিখ :—সেনার চালনা যিনি করেন, যাহা অস্ত যাইতেছে, যে মমতা জানে না; যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই; যাহার দুই হাত চলে; ঈশ্বরে যাহার আস্থা নাই; যে সাপ খেলাইয়া জীবিকা অর্জন করে; হরিণের চামড়া; হস্তীর চীৎকার; বৃহৎ অরণ্য; উপকারের ইচ্ছা; ধ্যানের যোগ্য; বাঘের চামড়া; পরিব্রাজকের ভিক্ষা; গভীর রাত্রি; নূপুরের ধ্বনি;

পিষ্ট দ্রব্যের গন্ধ; অশ্বের ধ্বনি, ময়ূরের স্বর; পক্ষীর কলরব; ভূষণাদির শব্দ; যিনি পরিণাম দেখিয়া কার্য করেন না; যিনি পরের মুখ চাহিয়া কাজ করেন: যে অন্যকে পোষণ করে, শুনিবামাত্র যাহার মুখস্থ হইয়া যায়; পূর্ব জন্মের কথা যে স্মরণ করিতে পারে; বিধি অতিক্রম না করিয়া; যাহার সহিত গোত্র সমান; বর্ণমালার ক্রম বা পরম্পরা রক্ষা করিয়া; কিছুই যাহার নাই; নদীই মাতা যাহার (যে দেশের), কোথাও যাইতে যাহার ভয় নাই; যাহার দুই প্রকার অর্থ হয়; যাহারা একই সময়ে একই গুরুর শিষ্য, যাহারা জলে স্থলে উভয় স্থানেই বিচরণ করে, যাহা বর্ণনা করা যায় না, যাহা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে, যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, প্রাতঃকালে যাহার নাম স্মরণ করা উচিত; পুরোহিতের বৃত্তি; জয়লাভের ইচ্ছা; হনন করিবার ইচ্ছা, সন্তান হইতে পৃথক না করিয়া।

ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬, '৪৯, (বিকল্প) '৫৩, (বিজ্ঞান)'৫৭, বি. এ. '৪১, '৫০

[দুই] নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ প্রকাশপূর্বক এক একটি বাক্য রচনা কর:— যাযাবর; উপচিকীর্ষা; পরিপন্থী, বেপথু, ভংগুর, বহিত্র; পুষ্পধন্বা, লোকপরম্পরা; ক্ষণভংগুর; অপৌরুষেয়, সর্বভুক্, সুদূরপরাহত।

ক. বি. বি. এ. '৪৯, '৪৬, '৪২, '৪১

[তিন] যে কোন পাঁচটির একটি করিয়া শব্দ লিখ—ময়ূরের স্বর; গোপন করিবার ইচ্ছা; চক্ষু দ্বারা গৃহীত; যে নারী প্রিয়বাক্য বলে; কোথাও উন্নত কোথাও অবনত; ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়, অন্য ভাষায় রূপান্তরিত, যাহার কিছুই নাই; মনে যাহার জন্ম; যাহার দুই প্রকার অর্থ। ঢা. বি. বি. এ. '৪৯

[চার] নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে যে কোন পাঁচটি লইয়া তাহাদের পরিবর্তে একটিমাত্র করিয়া শব্দ বসাও এবং তাহাদের দ্বারা পৃথক্ বাক্য রচনা কর— যে বাষ্প উদ্গমন করিতেছে, যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে, যে বিচার না করিয়া কার্য করে; প্রায় আচার্যের ন্যায়, সূর্যের উপাসনা করেন যিনি; কন্যাকালে জাত; ভগবানে যাহার বিশ্বাস আছে, সাক্ষাৎ যে দেখে; সর্বজনের হিতকর, কুসুম ধনু যাহার। গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫০

[পাঁচ] নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলিকে এক একটি শব্দে পরিণত করিয়া উহাদের সার্থক প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর (যে কোন পাঁচটি):—কি করিতে হইবে নির্ণয় করিতে পারে না যে, যে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করে, অস্ত যাইতেছে এমন, যাহার দাড়ি গোঁফ উঠে নাই, যাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, নদী যে দেশের মায়ের মতো, মুক্তি পাইতে ইচ্ছা যাহার, যাহার শত্রু জন্মে নাই, যাহা দুঃখে লাভ করা যায়, যাহা পূর্বে ছিল কিন্তু এখন আর নাই। ঢা. বি মাধ্যমিক '৫৬

চতুর্থ অধ্যায়

বাক্য-সংযোজন ও বাক্য-বিয়োজন

বাক্যসংযোজন

পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অথচ বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলীর সংযোজন তথা একবাক্যে পরিণত করিতে হইলে কোন বাক্যকে সমাসবদ্ধ, কোন বাক্যকে তদ্ধিত পদে, কোন বাক্যকে কৃদন্ত পদে, আবার কোথাও-বা সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করিতে হয়। সময়ে সময়ে আপেক্ষিক অব্যয়পদ বর্জনও বিধেয়। তবে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, **সংযুক্ত বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য বা কর্তা এবং একটিমাত্র বিধেয় বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকিবেই :** যেমন,—

(ক) নাবিকেরা নৌকা সাম্‌লাইতে পারিল না। প্রবল জলপ্রবাহ-বেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে যাইতে লাগিল। একজন আরোহী কহিল, 'নবকুমার রহিল যে।' একজন নাবিক কহিল, 'আঃ, তোর 'নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।' **ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬**

উত্তর। নৌকা সামলাইবার ব্যাপারে নাবিকগণের অক্ষমতাবশত প্রবল জলপ্রবাহ-বেগে রসুলপুর নদীর মধ্যে তাড়িত তরণীর একজন আরোহী পরিত্যক্ত নবকুমার সম্পর্কে আশংকা প্রকাশ করিলে একজন নাবিক বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠে শৃগালভক্ষ্য হইয়া নবকুমারের নিধন-সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিল।

(খ) আজিকালি অনেকে জনসাধারণের হীন অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। যাহাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি পড়িয়াছে; জনসাধারণের শিক্ষা দিবার কথা উঠিয়াছে। বড় আহ্লাদের কথা। **ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬ (কলিকাতা কেন্দ্র)**

উত্তর। জনসাধারণের ভীতিপ্রদ হীনাবস্থা দেখিয়া, তাহাদের উন্নয়নের দিকে আজিকালি অনেকের দৃষ্টি পড়ায়, জনসাধারণের শিক্ষামূলক প্রসংগের উত্থাপন সত্যই বড় আহ্লাদের কথা।

(গ) তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর একটা আসিল। তারপর আর একটা আসিল। কত আসিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই গৃহ নিশীথশ্মশানের মত ভয়ংকর হইয়া উঠিল।

ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬ (মফঃস্বল কেন্দ্র)

উত্তর। তখন প্রথম ছায়ার পাশে তাহারই প্রতিচ্ছায়া একটির পর একটি করিয়া আরও কত আসিয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে থাকায় সেই গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ংকর হইয়া উঠিল।

(ঘ) সেই রজনী শুভ্র জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ছিল। উহা রজনীগন্ধা, চম্পক, পারুল এবং কুন্দকুসুমে ভূষিত ছিল। উহা বহু সুহৃৎ-সমাগমে মুখরিত ছিল। সেই রজনী আমাদের স্মৃতিপথে চিরদিন বিরাজিত থাকার যোগ্য। **ক. বি. বি.এ. '৩৬**

উত্তর। রজনীগন্ধা-চম্পক-পারুল-কুন্দকুসুম-ভূষিত, বহু—সুহৃৎ-সমাগম-মুখরিত সেই শুভ্র জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনী আমাদের চিরস্মরণীয়।

বাক্য-বিয়োজন

যে-ভাব একটিমাত্র বাক্যের মধ্যে ধৃত আছে, তাহাকে পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত অথচ বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলীতে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইহাকেই বলা হয় বাক্য-বিয়োজন। এক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ, তদ্ধিত, কৃদন্ত পদসমূহকে বিভিন্ন বাক্যে এবং অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করিতে হয়। প্রয়োজনমতে, আপেক্ষিক অব্যয় পদ-সংযোগও বিধেয়: যেমন,—

'সুশীল লক্ষ্মণ ইহা দেখিয়া-শুনিয়া দুঃখে নিতান্ত কাতর ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া অবিরলধারে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং রামচন্দ্রের অদৃষ্টচর ও অভূতপূর্ব লোকানুরাগপ্রিয়তাই এই অভূতপূর্ব অনর্থের মূল, ইহা ভাবিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণপ্রায় হইয়া কহিতে লাগিলেন, "যদি ইতিপূর্বে আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে এই লোক-বিগর্হিত ও ধর্ম-বিবর্জিত বিষম কাণ্ড দেখিতে হইত না।"

উত্তর। সুশীল লক্ষ্মণ ইহা দেখিলেন ও শুনিলেন। তিনি দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন। তাই তিনি অবিরলধারে বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের লোকানুরাগপ্রিয়তা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। এই লোকানুরাগপ্রিয়তার কথা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। এই লোকানুরাগপ্রিয়তাই অনর্থের মূল। এইরূপ অনর্থ ইতিপূর্বে কখনও ঘটে নাই। ইহার কথা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। ফলে তিনি যার পর নাই বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণপ্রায় হইয়া পড়িলেন। তাই তিনি কহিতে লাগিলেন, "এই বিষম কাণ্ড জনগণের নিন্দার যোগ্য। ইহাতে ধর্ম নাই। ইতিপূর্বে আমার মরণ হওয়া ভাল ছিল। কারণ তাহাতে এহেন কাণ্ড দেখিতে হইত না।"

অনুশীলনী

[এক] বাক্য-সংশ্লেষণ কর:—আমি তোমার বাড়িতে যাইব। তারপর তথায় আহার করিব। দুই প্রহরের পর পর্যন্ত তোমার বাড়িতে অপেক্ষা করিব। শেষে নদীতীরে বেড়াইতে যাইব। ক. বি. মাধ্যমিক '৩০

[দুই] বাক্য-বিয়োজন কর:—'তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশানপ্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসংগ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।'

পঞ্চম অধ্যায়

বাক্যবিন্যাসে সাধু ও কথ্য রীতি

প্রায় হাজার বছর আগে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। অবশ্য ইহারও আগে দলিল-দস্তাবেজে, চিঠিপত্রে, দৈনন্দিন জীবনের ভাব-বিনিময়ের ব্যাপারে বাংলা গদ্যরীতির প্রচলন ছিল। পদ্যচ্ছন্দে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ধরিতে গেলে, বাংলা গদ্যের বয়স দেড়শত বছরের বেশি নয়। নিখিল বিশ্বের সমুন্নত ভাষাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, ইহার রূপ নানাভাবে বিকশিত হইয়াছে। মোটামুটি ভাবে ভাষার দুইটি রূপ—একটি, সাহিত্যিক রূপ; অপরটি, প্রাত্যহিক প্রয়োজনানুগ রূপ। পৃথিবীর অপরাপর ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষাও সাহিত্যিক রূপ বা রীতি এবং ব্যবহারিক তথা কথ্য রূপ বা রীতি লাভ করিয়াছে। **সাহিত্যিক বা 'লেখ্য ভাষা** সচরাচর বহু শ্রোতা বা পাঠকের উদ্দেশে লিখিত হয়, তাই ইহার ছাঁদ কথ্য ভাষার ধরণ হইতে কতকটা স্বতন্ত্র রকমের, অনেকটা প্রাচীন আদর্শের হইয়া থাকে। **কথ্য ভাষায়** স্থান এবং গোষ্ঠীবিশেষে কমবেশি স্বতন্ত্রতা থাকে, কিন্তু লেখ্য ভাষায় কথ্য ভাষার মৌলিক, সর্বজনীন রূপটিই পরিগৃহীত হয়। **সাধু ভাষা বা মার্জিত ভাষা** লিখিবার ভাষা।'

উপভাষা হইতে ভাষার বিবর্তন

পূর্ববংগ এবং পশ্চিমবংগ লইয়া এই যে সমগ্র বাংলা দেশ, এখানকার অঞ্চলভেদে বাংলা ভাষার বিভিন্ন মৌখিক বা কথ্য রীতি প্রচলিত। বাংলা ভাষারই অন্তর্গত ছোট ছোট দল বা অঞ্চলবিশেষে যে প্রচলিত রূপান্তর দেখা যায়, তাহার নাম **উপভাষা**। ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি কারণে ভাষা হইতে যেমন উপভাষার উদ্ভব হইয়া থাকে, তেমনি নানা কারণে কোন একটি উপভাষা শক্তিশালী হইয়া অপর উপভাষাগুলিকে আওতায় ফেলিয়া বা বিনষ্ট করিয়া ভাষায় পরিণত হইতে পারে। …যেখানে একাধিক উপভাষা আছে, সেখানে ভাষার অর্থাৎ লেখাপড়ার ভাষার, মূলে থাকে একটি বিশেষ উপভাষা, তাহার মধ্যে অন্যান্য উপভাষাগুলির শব্দ বা বিশিষ্ট প্রয়োগ বা ইডিয়ম কমবেশি আসিয়া যায়।……যে-যে কারণে কোন একটি বিশেষ উপভাষা ভাষায় উন্নীত হয় তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে সেই উপভাষায় উন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি,……অপর প্রধান কারণ হইতেছে, অঞ্চল-

বিশেষের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি।......এমনি করিয়াই পশ্চিমবংগের উপভাষা বাঙালা ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনি করিয়াই কলিকাতার উপভাষা আজ সমগ্র বাঙালী শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বাঙালার অধিকাংশ কবি পশ্চিমবংগের লোক ছিলেন, সুতরাং পশ্চিমবংগের উপভাষাই বাঙালা সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গদ্যরচনার প্রথা চলিত হয় এবং বাঙালা আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকগণ প্রায় সকলেই পশ্চিমবংগের সন্তান, সুতরাং পশ্চিমবংগের উপভাষা হইতে জাত বাঙালা সাহিত্যের ভাষার পক্ষে বাঙালা সাধুভাষায় পরিণত হইতে কোনই বাধা রহিল না। কিন্তু তাই বলিয়া একথা বলিলে চলিবে না যে, অন্য উপভাষার প্রভাব বাঙালা সাহিত্যের ভাষায় মোটেই পড়ে নাই।'

সাধু ও কথ্য রীতি

বর্তমানে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক অথবা সাধু রীতির পাশাপাশি বাংলা দেশের বহুবিচিত্র আঞ্চলিক ভাষা অথবা উপভাষা থাকিলেও বাংলার সাম্প্রতিক শিক্ষিত সমাজে কথ্য ভাষারও একটা শিষ্ট রীতি উদ্ভূত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বীরবল হইতে সুরু করিয়া অতি-আধুনিক কালের বহু খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাগণ এই কথ্য ভাষার শিষ্ট রীতিরই পক্ষপাতী। ফলে কথ্য ভাষার শিষ্ট রীতি আজিকার বাংলা সাহিত্যে লেখ্য ভাষা হিসাবে এমন দৃঢ়রূপে তাহার স্থান করিয়া লইতেছে যে, বাংলা ভাষার সাধু রীতি বুঝিবা অদূরভবিষ্যতে তাহার সহিত আঁটিয়াই উঠিতে পারিবে না। কলিকাতা অঞ্চলের এবং ভাগীরথী-তীরবর্তী স্থানের শিক্ষিত জনগণের মৌখিক ভাষা বর্তমানে বাংলা কথ্য ভাষার শিষ্ট রূপ গঠনে সহায়তা করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আজিকার বাংলা সাহিত্যে বাংলা বাক্যবিন্যাসের যে দুইটি রূপ কমবেশি ভাবে চলিতেছে, তাহার একটি হইতেছে সাধু রীতির (Standard literary style) এবং অপরটি হইতেছে কথ্য বা মৌখিক রীতির (Standard colloquial style)।

বাংলা ভাষার সাধু এবং চলিত রীতির মধ্যে যে তারতম্য ও পারস্পরিক প্রভাব দেখা যায়, তাহা মোটামুটি এইরূপ :—[এক] উভয় রীতির সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের রূপের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সাধু রীতিতে সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদগুলির পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হইলেও চলিত রীতিতে উহাদের বেশ খানিকটা সংকোচ সাধিত হয় : যেমন,—সাধু রীতিতে প্রচলিত 'আসিয়াছি, শুনিবে, গাহিলাম' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ এবং 'ইহারা, তাহাতে' প্রভৃতি সর্বনামপদ চলিত রীতিতে হয় 'এসেছি, শুনবে, গাইলাম' এবং 'এরা,

ভাতে'। [দুই] বাংলা ভাষার সাধু রীতিতে অবশ্য চলিত রীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদ পরিলক্ষিত হয়ঃ যেমন,—আশুতোষকে বিশ্বতোষ যে চেনে, সে-ও আমি জানি।' এখানে বিশুদ্ধ সাধু রীতিতে 'চেনে'র পরিবর্তে 'চিনে,' 'সে-ও'-এর পরিবর্তে 'তাহা-ও' ব্যবহৃত হওয়া সমীচীন। [তিন] সাধু রীতির চেয়ে চলিত রীতিতে স্বরসংগতি অভিশ্রুতি-মূলক স্বরধ্বনির পরিবর্তন সমধিক লক্ষিত হয়। [চার] সাধু রীতিতে তৎসম শব্দের ঘনঘটা বড়ই বেশি, কিন্তু চলিত রীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বড়ই অল্প। বিদেশী শব্দ সাধু রীতি অপেক্ষা চলিত রীতিতেই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। [পাঁচ] সাধু রীতি খানিকটা কৃত্রিম সত্য এবং কৃত্রিম এইজন্য যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথোপকথনের সংগে ইহার সংগতি নাই। তবু এই রীতির যে গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্যজনিত সৌষ্ঠব আছে তাহাকে অস্বীকার করা চলে না। পক্ষান্তরে, চলিত রীতি সাধু রীতির চেয়ে জীবন্ত হইলেও হাল্‌কা চালে ইহা চলে এবং প্রাত্যহিক মৌখিক আলাপ-আলোচনার রীতির সংগে ইহার সংগতি বড়ই নিবিড। 'The real and natural life of language is in its dialects.'—Maxmuller-এর এই উক্তিটি যে একান্তভাবে সত্য, ইহা বাংলা ভাষার চলিত বা কথ্য রীতি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই অনুভূত হয়। বাংলা বাক্যবিন্যাসের সাধু রীতি এবং চলিত রীতির উদাহরণ এইরূপ :

সাধু রীতির উদাহরণ

'আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত। অধিত্যকা-প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সততস্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরংগ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।'—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কথ্য বা চলিত রীতির উদাহরণ

'যারা ভারি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধ'রে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে' নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চল্লনা, বিষম অন্ধকার না ব'লে বলতে হ'ল বিশদ অন্ধকার—যদিও ভাষাতত্ত্ববিদ্ এরূপ কথায় দোষ দেখবেন। কালো দিয়ে যে আলো এবং রঙ সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো এর সাধনা বড় কঠিন।'

—অবনীন্দ্রনাথ।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিকে সাধু রীতি হইতে কথ্য রীতিতে, নয় কথ্য রীতি হইতে সাধু রীতিতে পরিবর্তিত কর :—

(ক) একদা মধুমাসের সমাগমে কমলবন বিকশিত হইলে; চূত-কলিকা অংকুরিত হইলে; মলয়মারুতের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আহ্লাদিত হইয়া কোকিল সহকার-শাখায় উপবেশনপূর্বক সুস্বরে কুহুরব করিলে; অশোক কিংশুক প্রস্ফুটিত, বনমুকুল উদ্গত এবং ভ্রমরের ঝংকারে চতুর্দিক প্রতিশব্দিত হইলে, আমি মাতার সহিত এই অচ্ছোদসরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। ক. বি. মাধ্যমিক '২৭

(খ) ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ কর; আমাদের পূর্বে ইক্ষ্বাকুবংশে যে মহানুভব নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহতভাবে প্রজাপালন ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্মসমুদায়ের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। ক. বি. মাধ্যমিক '২৭

(গ) "দিব্য লাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিকিরণপূর্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও-বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিতরণ করিতেছিলেন।"
ক. বি. মাধ্যমিক '৪৫

(ঘ) আমরা যাদৃশ বন্ধুলাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই, যদিও তাদৃশ বন্ধু ধরণীমণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ বন্ধু-ব্যতিরেকে জীবিত থাকা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়।
ক. বি. মাধ্যমিক (মফঃস্বল কেন্দ্র)'৪৬

(ঙ) সেবার মাহেশে রথ দেখ্‌তে গিয়ে এমন ফ্যাসাদে পড়া গিছলো যে সে আর কহতব্য নয়। এক বাবু তাঁর তিন ইয়ার নিয়ে মোদের নায়ে চড়লেন আর নাওখানি সেই মোটাসোটা বাবুদের ভীষণ চাপে ডুব্‌তে ডুব্‌তে রয়ে গেল। তাই না দেখে সেই ভদ্রবেশী বাবুর দল হি হি করে হাসতে সুরু ক'রে দিলেন।
ক. বি. মাধ্যমিক '৩৫

(চ) "আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে ব'সে আছ। কারু মানা শুনবে না। যেখানে যত হতভাগা আছে, দেখ্‌লেই তার দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে। আজ বৌ-ঠান আমাকে না-হক্ দশ কথা শুনিয়ে দিলেন।" ক. বি. মাধ্যমিক '৪৫

(ছ) ছেলেটি দলে পড়ে একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে। নাই দিয়ে মাথায় তুলে এখন গোল্লায় গেল ব'লে, বুক চাপড়ালে চলবে কেন?
ক. বি. মাধ্যমিক (কলিকাতা কেন্দ্র) '৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাক্যে ছেদচিহ্নের প্রয়োগ-বিধি

কমা বা প্রথম ছেদের (,) ব্যবহার

"১"—এই সংখ্যাটির উচ্চারণে যেটুকু সময় লাগে, ঠিক ততটুকু সময়ই 'কমা-চিহ্ন' জিহ্বাকে বিরাম দিয়া থাকে। (ক) যখন একটি বিশেষ্য পদকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আর একটি বিশেষ্য পদ বসে, তখন শেষের বিশেষ্য পদের আগে-পিছে কমা বসে: যেমন,—দিল্লী, ভারতের রাজধানী, ইতিহাস-বিখ্যাত নগরী। (খ) পর পর কয়েকটি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই পরে কমা বসানো হয়: যেমন,—আমি ইস্কুলে যাইয়া, প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের সংগে দেখা করিয়া, দোকানে যাইব। (গ) বাক্যের গোড়াকার ক্রিয়া-বিশেষণের পরে কমা বসে: যেমন,—বাস্তবিক, মহাত্মা গান্ধী অহিংসা-মন্ত্রের পূজারী ছিলেন। (ঘ) সম্বোধন-সূচক পদের পরে কমা বসে: যেমন,—নন্দ, এখন ওখানে যেয়ো না। (ঙ) প্রত্যক্ষ উক্তির উদ্ধরণ-চিহ্নের আগে কমা বসানো হয়: যেমন,—বীণার মা বলিলেন, "আজ বীণা নিমন্ত্রণ খাইতে পারিবে না।" (চ) ঠিকানা লিখিবার বেলায় কমার ব্যবহার হয়: যেমন,—৬/১ বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা (৬)। (ছ) একই জাতের কয়েকটি বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়া ঠিক পর পর থাকিলে, কমা বসে: যেমন,—মিনতি, প্রণতি, বিনতি ইস্কুলে গিয়াছে। দিন যায়, রাত্রি যায়, আয়ু হয় ক্ষীণ। (জ) সহজবোধ্য করিবার জন্য মিশ্র ও যৌগিক বাক্যের ভিতরে কমা দিয়া ছোট ছোট বাক্য আলাদা করিয়া দেখানো হয়: যেমন,—যখন আমি স্টেশনে পৌঁছিলাম, তখন ট্রেন ছাড়িয়া ছিল। হরি নির্বোধ বটে, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়। (ঝ) কাহারও নামের শেষে উপাধি জুড়িতে হইলে উপাধির আগে কমা বসাইতে হয়: যেমন,—ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট্.।

সেমিকোলন বা দ্বিতীয় ছেদের (;) ব্যবহার

সেমিকোলনে কমার ডবল সময় জিহ্বাকে বিরাম দিতে হয়। (ক) দুই অথবা ততোধিক বাক্যের মধ্যে অর্থের নিকট-সম্পর্ক থাকিলে সেমিকোলন বসাইয়া তাহাদিগকে পৃথক্ করা হয়: যেমন,—পানু পড়াশুনা একেবারে করে না; পরীক্ষায় তাহার পাশ করিবার আশা নাই। (খ) পর পর রচিত বাক্যগুলির মধ্যে যখন একই ভাব বিদ্যমান অথচ কমা বা দাড়ির কোনটিই বসে না, তখন সেমিকোলন হয়: যেমন,—গত তিন দিন হইতেই শরীরটা ভাল নয়; জ্বর ছাড়িয়া আবার জ্বর আসে।

দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের (।) ব্যবহার

যেখানে বাক্য একেবারে শেষ হইয়া যায়, সেখানে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ বসে : যেমন,—আমি ওখানে যাইব না।

কোলন (ঃ) এবং কোলন ড্যাশের (ঃ—) ব্যবহার

(ক) কমা ও সেমিকোলনের চেয়ে বেশি সময় বিরাম বুঝাইতে হইলে কোলনের ব্যবহার ঘটে, তবে বাংলায় ইহার ব্যবহার কদাচিৎ করা হয় : যেমন,—অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐ-কার হয় : ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। (খ) কোন-কিছুর উদাহরণ দিবার ক্ষেত্রে অথবা পূর্বলিখিত কোন বিষয়কে স্পষ্ট করিয়া জানাইতে হইলে কোলন-ড্যাসের ব্যবহার হয় : যেমন,—পদ পাঁচ প্রকার :—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়।

প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) ব্যবহার

(ক) প্রশ্ন করিতে হইলে বাক্যের শেষে এই চিহ্ন বসাইতে হয় : যেমন,—তুমি কোন্ পাড়ায় থাক ? (খ) প্রশ্নের ভাব বুঝাইতে একটিমাত্র শব্দেরও পরে এই চিহ্ন বসে : যেমন,—মরণ ? মরণ কি আর বিধবার কপালে আছে ? (গ) সন্দেহ অথবা শ্লেষ বুঝাইতে এই চিহ্ন বসানো হয় : যেমন,—তোমার এই গবেষণাটি (?) ছাপাইবে না কি ?

বিস্ময়সূচক চিহ্নের (!) ব্যবহার

(ক) ভয়, বিস্ময়, হর্ষ, বিষাদ, ঘৃণা প্রভৃতি প্রকাশক অব্যয়শব্দের পরে এবং বাক্যের শেষে এই চিহ্ন বসাইতে হয় : যেমন,—ছি ! ছি ! তোমার এই কাজ ! (খ) ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্বোধনপদের পরে এই চিহ্ন বসানো হয়। যেমন,—প্রভো ! আমায় রক্ষা করুন।

উদ্ধরণ-চিহ্নের (" ") ব্যবহার

(ক) বক্তার বক্তব্য কোন বাক্যের ভিতরে অবিকল উদ্ধৃত করিতে হইলে উদ্ধরণ-চিহ্নের প্রয়োগ হয় : যেমন,—ঠাকুরদা মশাই দুই এক টান টানিয়া বলিতেন, "বেশ ভাই, বেশ তামাক।"—রবীন্দ্রনাথ। (খ) অন্য লেখকের মন্তব্য কোন বাক্য বা অনুচ্ছেদের মধ্যে যদি কেহ অবিকল উদ্ধৃত করিতে চাহেন, তাহা হইলে উদ্ধরণ-চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয় : যেমন,—মোগল বাদশাহেরা "সমুদয় মানবজাতির স্বর্গতুল্য বংগভূমি" বলিয়া অনুশাসনপত্রে যাহার উল্লেখ করিতেন, সে স্বর্গ এখন গৌরবচ্যুত।—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। (গ) প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে উদ্ধৃত বাক্য বা বাক্যাংশের আগে কেবলমাত্র ড্যাশ (—) অথবা কমা ও ড্যাশ (,—) অথবা

শুধু কমা-চিহ্ন (,) বসাইয়াও, অর্থাৎ উদ্ধরণ-চিহ্ন একেবারে ব্যবহার না করিয়াও উদ্ধরণচিহ্নের কাজ করা যায়: যেমন,—অপু বলিল—হোক্‌গে ঝড়, ঝড়েই তো ভালো, চল আরও যাই। —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ, বাবুমশায়!—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বন্ধনীর [( )] ব্যবহার

বাক্যের ভিতরকার পদ বা পদসমষ্টির ব্যাখ্যার ব্যাপারে বন্ধনী বসানো হয়: যেমন,—পণ্ডিতমহাশয় শাস্ত্রগ্রন্থাদি (ন্যায়, স্মৃতি, মীমাংসা, উপনিষদ প্রভৃতি) পড়েন।

লোপচিহ্নের (') ব্যবহার

পদমধ্যবর্তী কোন অক্ষরের লোপ হইলে এই চিহ্নের ব্যবহার হয়: যেমন,—আমি এখন বাড়ি যা'ব না। এখানে লোপচিহ্নটি 'ই' অক্ষরের লোপ বুঝাইতেছে।

সংযোগচিহ্নের (-) ব্যবহার

এই সংযোগচিহ্নটি—যাহাকে ইংরাজিতে বলা হয় হাইফেন—দুই বা ততোধিক পদের সংযোগ বুঝায়; সমাসবদ্ধ পদে সংযোগচিহ্নের ব্যবহার সুপ্রচলিত: যেমন,—রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ।

অনুশীলনী

যথাস্থানে ছেদচিহ্ন বসাও:—

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঁচিশ দিন পূর্বের কথা যুধিষ্ঠির সকালবেলা তাঁর শিবিরে বসে আছেন সহদেব তাঁকে সংগৃহীত রসদের ফর্দ পড়ে শোনাচ্ছেন এমন সময় প্রতিহার এসে জানালে ধর্মরাজ এক অভিজাতকল্প কুব্জপুরুষ আপনার দর্শনপ্রার্থী পরিচয় দিলেন না বললেন তাঁর বার্তা অতি গোপনীয় সাক্ষাতে নিবেদন করবেন

যুধিষ্ঠির বললেন এখনই তাঁকে নিয়ে এস

আগন্তুক বক্রপৃষ্ঠ প্রৌঢ় বলিকুঞ্চিত শীর্ণ মুণ্ডিত মুখ মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি গলায় নীলবর্ণ হার পরণে ঢিলে ইজের তার উপর লম্বা জামা যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন কে আপনি সৌম্য

আগন্তুক উত্তর দিলেন মহারাজ ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন আমার বক্তব্য কেবল রাজকর্ণে নিবেদন করতে চাই

যুধিষ্ঠির বললেন সহদেব তুমি এখন যেতে পার

সহদেব বিরক্ত হয়ে সন্দিগ্ধমনে চলে গেলেন

[—রাজশেখর বসু রচিত 'তৃতীয় দ্যূতসভা' গল্প হইতে উদ্ধৃত।]

ষষ্ঠ পর্ব

বাগ্‌ধারা-প্রকরণ

প্রথম অধ্যায়

পদাদির শিষ্ট প্রয়োগ

বিশেষ্যপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

মন

(১) মন উঠা [তুষ্ট হওয়া]—মেয়েটি এত আদুরে যে কিছুতেই তার মন উঠে না। (২) মন যোগানো [খুশী রাখা]—আপিসের বড় বাবুর মন যুগিয়ে চল্‌লে তোমার ভালই হবে। (৩) মন হওয়া [ইচ্ছা হওয়া]—মন হয়েছে বলে এবার পুরীভ্রমণে যাচ্ছি। (৪) মন করা [সংকল্প করা]—আমি দ্বারভাঙায় যেতে মন করেছি। (৫) মন লাগানো [মন দেওয়া]—পড়ায় সে মন লাগায় না। (৬) মন যাওয়া [পছন্দ হওয়া]—যাতেই মন যায়, তাই সে করে। (৭) মন রাখা [বাহ্য ভালবাসা বজায় রাখা]—ছেঁদো কথায় মন রাখ্‌তে চাও। (৮) মন পোড়া [অন্তর্দাহ হওয়া]—পুত্রের মৃত্যুতে মাতার মন পোড়ে। (৯) মনে ধরা [পছন্দ হওয়া]—অধিবাসের ডালা কনেপক্ষের মনে ধরেছে। (১০) মনে আনা [স্মরণ করা]—তোমার শৈশবকালের সেই কচি মুখখানিকে কিছুতেই মনে আন্‌তে পারছি না।

মাথা

(১) মাথা দেওয়া [মৃত্যু বরণ করা]—দেশের জন্য ক্ষুদিরাম মাথা দিয়েছেন। (২) মাথা ধরা [মাথা ভারি মনে হওয়া]—সর্দিতে মাথা ধরেছে। (৩) মাথা ঠেকানো [প্রণাম করা]—দেশের মাটিতে মাথা ঠেকাই। (৪) মাথা খাওয়া [সর্বনাশ করা]—নাই দিয়ে ছেলেটির মাথা খাচ্ছ। (৫) মাথা কোটা [দুঃখে মাটিতে মাথা ঠোকা]—স্বামীর গঞ্জনাবাক্য শুনে অভিমানিনী স্ত্রী মাথা কুট্‌তে লাগ্‌লেন। (৬) মাথা কাটা যাওয়া [খুব লজ্জা পাওয়া]—চুরির দায়ে পুত্রের কারাবাস হওয়ায় পিতার মাথা কাটা গেল। (৭) মাথায় ওঠা [অযথা প্রশ্রয় পাওয়া]—প্রশ্রয় দিলে ঝি-চাকর মাথায় ওঠে। (৮) মাথায় ঢোকা [বোধগম্য হওয়া]—আমার উপদেশ রবীনের মাথায় ঢোকে নাই।

চোখ

(১) চোখ টাটানো [পরশ্রীকাতর হওয়া]—বাঙালী এমনই জাত্ যে, প্রতিবেশীর উন্নতি দেখ্লেই তার চোখ টাটায়। (২) চোখ খোলা, চোখ ফুটা, [প্রকৃত অবস্থা বোঝা]—গত দশ বছর ধ'রে আত্মীয়পোষণ করবার পর আজ্কের এই ঘটনায় আমার চোখ খুলেছে (বা চোখ ফুটেছে)। (৩) চোখ উঠা [চক্ষুরোগবিশেষ হওয়া]—তার চোখ উঠেছে। (৪) চোখ খাওয়া, চোখের মাথা খাওয়া [কানা বা অন্ধ হওয়া]—আ মোলো! চোখ খেয়েছিস্ (বা চোখের মাথা খেয়েছিস্] নাকি। (৫) চোখ রাঙানো [রাগ দেখানো]—চোখ রাঙিয়ে ছেলেকে কখনও বশে রাখা যায় না। (৬) চোখ রাখা [দৃষ্টি রাখা]—আমি ফিরে না আসা অবধি জিনিষগুলোর দিকে একটু দয়া করে চোখ রাখবেন। (৭) চোখ ঠারা [চোখ নেড়ে ইসারা করা]—সর্বসমক্ষে রেগে উঠতেই সে আমায় শান্ত হবার জন্য চোখ ঠারতে লাগল।

দাঁত

(১) দাঁত ফুটানো [সমাধান করা]—পরীক্ষার প্রশ্নগুলো এত কঠিন হয়েছে যে দাঁত ফুটানো যায় না। (২) দাঁত খিঁচানো [উষ্মা প্রকাশ করা]—ভাল কথা বললেও কোপনস্বভাব ব্যক্তি দাঁত খিঁচিযে থাকে। (৩) দাঁত লাগা [মূর্ছাপন্ন হওয়া]—যখনই সে খুব উত্তেজিত হয়, তখনই তার দাঁত লাগে। (৪) দাঁত ওঠা [দন্তোদ্গম]—শিশু সাধনের দাঁত যখন ওঠে, তখন তার বয়স মাস ছয়েক। (৫) দাঁত বসানো [কামড়ানো]—রামবাবুর কুকুরটি হঠাৎ আমার পায়ে দাঁত বসিয়ে দিল। (৬) দাঁত ভাঙা [দর্পচূর্ণ করা]—আমি তার দাঁত ভাঙব। (৭) দাঁত পড়ে যাওয়া [বৃদ্ধ হওয়া]—তার দাঁত পড়ে গিয়েছে।

বুক

(১) বুক দিয়া পড়া [পরোপকার করা]—পাড়াপ্রতিবেশীর আপদে-বিপদে একমাত্র নীরেনবাবুকেই বুক দিয়ে পড়তে দেখা যায়, অপর কাউকেই দেখা যায় না। (২) বুক ফাটা [দুঃখে হৃদয় ভেঙে যাওয়া]—বাংলা দেশের মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না। (৩) বুক ফোলানো [গর্বপ্রকাশ]—পুত্রের চাকুরী পাওয়ার সংবাদে পিতার বুক ফুলে উঠল। (৪) বুক বাঁধা [বিপদে মন দৃঢ় করা]—দুঃখের রাতে যদি বুক বাঁধো, তবেই না সুখের দিন দেখবে। (৫) বুক ঠোকা [সাহস প্রকাশ] —বন্দুক হাতে নিয়ে বুক ঠুকে সে একাই সশস্ত্র ডাকাতদলের পিছু ধাওয়া করল। (৬) বুক বাড়া [সাহস বৃদ্ধি হওয়া]—মায়ের আদরে ছেলের বুক বেড়েছে। (৭) বুক ভাঙা [সাহসহীন হওয়া]—মায়ের মৃত্যুতে ছেলের বুক ভেঙেছে।

মুখ

(১) মুখ করা [ভৎর্সনা করা]—মাতা পুত্রের দুর্ব্যবহারে মুখ করতে লাগলেন। (২) মুখ চাওয়া [কাহারও নিমিত্ত অপেক্ষা করা বা কাহাকেও খাতির করা]—বেলা বারোটা অবধি আমি তার মুখ চেয়ে রইলাম, তবু তার পাত্তা পেলাম না। মনে করো না যে, আমি সুধীরবাবুর মুখ চেয়ে তাঁকে কম দামে জিনিষ বেচেছি। (৩) মুখ রাখা [মান রাখা]—ছাত্রটি পাশ করে আমার মুখ রেখেছে। (৪) মুখ খাওয়া [বকুনি খাওয়া]—পুত্রবধূ প্রতিদিনই শাশুড়ীর মুখ খায়। (৫) মুখ ছুটা [অসংযত ভাষা ব্যবহার করা]—ছোট লোকের মত মুখ ছুটিও না। (৬) মুখ তাকানো [মুখাপেক্ষা করা]—তার মুখ তাকিয়ে কোন লাভ নেই। (৭) মুখ ফোটা [কথা বাহির হওয়া]—বেকায়দায় পড়লে নিরীহ ছেলেরও মুখ ফোটে। (৮) মুখ চলা [ভক্ষণ করা]—হাভাতের বেটার আজ দেখছি সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি মুখ চল্‌ছেই। (৯) মুখ লাগা [মুখ কুট্‌কুট্ করা]—বুনো ওল খেয়ে এমনই মুখ লেগেছে যে, আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। (১০) মুখ দেখা [আশীর্বাদের জন্য দেখা]—ভাবী শ্বশুর কনের মুখ দেখে একটি স্বর্ণহার দিলেন। (১১) মুখ চুন করা [লজ্জাদিতে মুখ পাঁশুটে হওয়া]—টাকাটি হারিয়ে রমেন মুখ চুন করে রয়েছে।

হাত

(১) হাত গোনা [ভবিষ্যৎ গণনা করা]—আমাদের পাড়ার জ্যোতিষীটি ভাল হাত গোনেন। (২) হাত চলা [প্রহার করা]—একটুতেই তার হাত চলে। (৩) হাত পাকানো [অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধ হওয়া]—গল্প লেখায় সে হাত পাকিয়েছে। (৪) হাত করা [বশে আনা]—বাদীপক্ষের প্রধান সাক্ষীটিকে যদি হাত করতে পার, তা'হলে এই মকদ্দমায় তোমার জয় অনিবার্য। (৫) হাত দেখা [নাড়ী দেখা]—কবিরাজ হাত দেখে বললেন, জ্বর নেই। (৬) হাত থাকা [কর্তৃত্ব থাকা]—আমার যদি হাত থাকত তো তোমায় নিশ্চয়ই চাকরী দিতাম। (৭) হাত পাতা [প্রার্থনা করা]—প্রজা জমিদারের কাছে খাজনা রেহাইয়ের জন্য হাত পাতিল।

গলা

(১) গলা কাটা [ঠকানো]—আজকালকার অধিকাংশ দোকানদার খরিদ্দারের গলা কাটে। (২) গলা চাপা [কণ্ঠস্বর নীচু করা]—রোগীর ঘরে জোরে কথা বলতে নেই, গলা চেপে কথা বলিস্। (৩) গলা ছাড়া [কণ্ঠস্বর উঁচু করা]—ভদ্রপরিবারে গলা ছেড়ে কথা বলা শোভনীয় নয়। (৪) গলা সাধা [গীত অভ্যাস

করা]—প্রতিদিন সকালে ও-বাড়ির মেয়েটি হারমোনিয়মের সংগে গলা সাধে। (৫) গলা ধরা [কণ্ঠস্বর বিকৃত হওয়া]—রাত্তিরে ঠাণ্ডা লেগে আমার গলা ধরেছে। (৬) গলায় পড়া [দায়িত্ব পড়া]—বিত্তহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায়, তার অবিবাহিতা ষোড়শী কন্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গলায় পড়ল।

গা

(১) গা করা [মনোযোগ করা]—জমিদারবাবু যদি একটু গা করেন, তা হলে এই গ্রামেই একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় বসতে পারে। (২) গা জুড়ানো [শান্তি ও আরাম জন্মানো]—ছেলেটি এযাত্রা রক্ষা পেয়েছে জেনে আমার গা জুড়াল। (৩) গা ঢালা [শয়ন করা]—ভিখারী বটবৃক্ষের ছায়ায় গা ঢেলেছে। (৪) গা বসা [মন সংলগ্ন হওয়া]—কাজে আমার গা বসে না। (৫) গা ভাঙা [হাই ওঠা]—দুপুরবেলায় আহারের পর তোমার বড়ই গা ভাঙে। (৬) গা তোলা [উঠা]—গা তুলে এখন ভগবানের নাম কর। (৭) গা ঢাকা দেওয়া [অজ্ঞাতবাস করা]—পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিপ্লবকুমার মেদিনীপুরের এক গাঁয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। (৮) গায়ে মাখা [গ্রাহ্য করা]—পরনিন্দকের কথা গায়ে মাখ্‌তে নাই। (৯) গায়ে ফুঁ দেওয়া [বিনা দায়িত্বে]—বাপ যে কদিন বেঁচে আছেন, সেই কদিনই গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াও। (১০) গা-ঝাড়া দেওয়া [উঠ্‌বার উপক্রম করা]—সন্ধ্যাবেলায় নির্জন নদীতীর থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতেই কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল! (১১) গায়ে থুতু দেওয়া [ছি ছি করা]—যে গুরুজনকে অপমান করে, লোকে তার গায়ে থুতু দেয়।

পা

(১) পা উঠা [পদাঘাতবোধক]—বিড়ালকে মারবার জন্য সে পা উঠাল। (২) পা বাড়ানো [অগ্রসর হইবার জন্য পদসঞ্চালন]—সে ষ্টেশনে যাবার জন্য পা বাড়াল। (৩) পা চাটা [হীনতা স্বীকার করিয়া তোষামোদ করা]—বড় সাহেবের পা চেটে বেশ কাজ গুছিয়ে নিচ্ছ তো? (৪) পা চালাইয়া যাওয়া [দ্রুতবেগে চলা]—ট্রেনের সময় হয়ে গেছে, পা চালিয়ে যাও। (৫) পা ভারী হওয়া [উচ্চ পদের জন্য গর্ববোধ]—সাধারণ কর্মী হয়ে মন্ত্রিত্বলাভ করায় আজ তাঁর পা ভারী হয়েছে। (৬) পায়ে রাখা [আশ্রয় দেওয়া]—হুজুর যদি পায়ে রাখেন তো এযাত্রা বেঁচে যাই। (৭) পায়ে তেল দেওয়া [তোষামোদ করা]—বড়লোকের পায়ে তেল দিও না। (৮) পায়ে ধরা [অত্যন্ত তোষামোদ করা]—মরে গেলেও তোমার ন্যায় অর্থপিশাচের পায়ে ধরতে যাব না। (৯) পায়ে ঠেলা [অনাদর করা]—আজ সে নিঃস্ব হওয়ায় লোকে তাকে পায়ে ঠেলে।

কান

(১) কান পাতা [শুনিতে মনোযোগী হওয়া]—জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে কি শুনছ (২) কান ভাঙানো [বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দেওয়া]—আসামী পক্ষ ফরিয়াদীর প্রধান সাক্ষীর কান ভাঙিয়েছে। (৩) কান দেওয়া [শোনা]—ঝগড়াঝাঁটিই কর, কি কান্নাকাটিই কর, তোমার কথায় আমি কান দেব না। (৪) কানে লাগা [শ্রুতিমধুর বোধ করা]—কুমার শচীন দেব বর্মণের গানই সব চেয়ে বেশি আমার কানে লাগে। (৫) কানে উঠা [কর্ণগোচর হওয়া]—এ কথাও তোমার কানে উঠেছে দেখছি! (৬) কানে তোলা [উত্থাপন করা]—একথা আমি কর্তৃপক্ষের কানে তুলেছি।

ঠোঁট

(১) ঠোঁট ফুলানো [কান্না অভিমান আদরের উপক্রম করা]—বাপের গালাগালি শুনে ছেলেটি ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। (২) ঠোঁট উল্টানো [অবজ্ঞা প্রকাশ করা]—কুৎসিত লোকটিকে দেখে সে ঠোঁট উল্টাল। (৩) ঠোঁট-কাটা [স্পষ্টভাষী]—নেহাৎ ঠোঁট-কাটা বলেই সে অমন কথা লোকের মুখের উপর বলতে পেরেছে।

নাক

(১) নাক তোলা [অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা]—হীন আচরণ দেখলে কে-না নাক তোলে? (২) নাক-কাটা [নির্লজ্জ]—তার মত নাক-কাটা আমি আর দেখি নি। (৩) নাক-ঝাম্‌টা [তিরস্কার]—তার নাক-ঝামটা আমি সইব না।

হাড়

(১) হাড় জ্বালানো [অত্যন্ত জ্বালাতন করা]—ছেলেটি মায়ের হাড় জ্বালাচ্ছে। (২) হাড়ে হওয়া [সামর্থ্যে কুলানো]—এ কাজ তার হাড়ে হবে না। (৩) হাড়-পেকে [অতিশয় কৃশ]—শরণার্থীরা অনাহারে অনিদ্রায় হাড়-পেকে হয়ে পড়েছে। (৪) হাড়-ভাঙা [অতীব শ্রমসাধ্য]—মজুরেরা হাড়-ভাঙা মেহনত করে।

বিশেষণ পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

উচ্চ—উচ্চ মূল্য, উচ্চ কণ্ঠ, উচ্চ বেতন, উচ্চ মন, উচ্চ কুল, উচ্চ পদ, উচ্চ শিক্ষা।

কড়া—কড়া রোদ, কড়া পাক, কড়া আঁচ, কড়া ওষুধ, কড়া মনিব, কড়া শাসন।

কাঁচা—কাঁচা বয়স, কাঁচা বুদ্ধি, কাঁচা মাল, কাঁচা ঘুম, কাঁচা রং, কাঁচা সর্দি, কাঁচা রাস্তা, কাঁচা খাতা, কাঁচা হাত, কাঁচা ছেলে, কাঁচা কাজ, কাঁচা গাঁথুনি, কাঁচা ইঁট, কাঁচা কথা, কাঁচা টাকা, কাঁচা বাড়ি, কাঁচা মাংস।

খোলা—খোলা কথা, খোলা মন, খোলা বাতাস, খোলা ঘর, খোলা চুল।

ছোট—ছোট নজর, ছোট সাহেব, ছোট মন, ছোট বোন, ছোট মা, ছোট ঘর, ছোট আদালত, ছোট কথা, ছোট কাজ, ছোট মোট, ছোট লোক, ছোট মুখ, ছোট কাকা, ছোট ঠাকুর, ছোট ঠাক্‌রুণ, ছোট ননদ।

নরম—নরম বাজার, নরম মাছ, নরম মেজাজ, নরম গলা, নরম সুর, নরম বিছানা, নরম মাটি, নরম দেহ, নরম হাওয়া, নরম হৃদয়, নরম দর।

পাকা—পাকা ঘুঁটি, পাকা মাথা, পাকা সোনা, পাকা খাতা, পাকা ওজন, পাকা কথা, পাকা চোর, পাকা রং, পাকা হাড়, পাকা ব্যবস্থা, পাকা ফোড়া, পাকা রাস্তা, পাকা মাছ, পাকা দলিল, পাকা দানা, পাকা মাটি, পাকা মাল, পাকা লেখা, পাকা হাত, পাকা রান্না, পাকা লোহা, পাকা বাড়ি।

বড়—বড় বিদ্যা, বড় কুটুম, বড় দিন, বড় ঠাকুর, বড় লাট, বড় মন, বড় বৌ, বড় কথা, বড় গলা, বড় ডাল, বড় কারখানা, বড় চিংড়ি, বড় জোর, বড় দরের, বড় মুখ, বড় চাল, বড় ছেলে, বড় কাণ্ড, বড় দি, বড় মা।

ভাঙা—ভাঙা মন, ভাঙা হাট, ভাঙা আসর, ভাঙা টাকা, ভাঙা বাড়ি, ভাঙা বুক, ভাঙা কপাল, ভাঙা মন, ভাঙা মাথা, ভাঙা কথা, ভাঙা ঘর, ভাঙা মাল।

মোটা—মোটা বুদ্ধি, মোটা কাপড়, মোটা ভাত, মোটা বেতন, মোটা টাকা, মোটা গলা, মোটা কথা, মোটা কাজ, মোটা মাথা, মোটা ধার।

সাদা—সাদা কথা, সাদা চোখ, সাদা মন, সাদা মাথা, সাদা রং, সাদা কাপড়, সাদা কাগজ, সাদা রোসনাই, সাদা হাত, সাদা জাতি।

হাল্‌কা—হাল্‌কা হাসি, হাল্‌কা গহনা, হাল্‌কা কাজ, হাল্‌কা স্বভাব, হাল্‌কা কথা, হাল্‌কা হৃদয়, হাল্‌কা মাথা, হাল্‌কা লোক, হাল্‌কা পেট।

প্রয়োগ

কড়া মনিবের **কড়া** হুকুম তামিল করবার জন্য সেই **কড়া** রোদের মধ্যেই চাকরটি আবার বাজারে গেল। **কাঁচা** ছেলের চীৎকারে মায়ের **কাঁচা** ঘুম ভাঙল। **নরম** মাছ কিনে ফেলায় কর্তাবাবু গৃহিণীর ভয়ে **নরম** মেজাজেই গৃহে প্রবেশ ক'রলেন। **বড়** কুটুম শেষ অবধি **বড়** বিদ্যাও শিখেছে! **পাকা** চোর চৌকিদারের ভয়ে সময়ে সময়ে **পাকা** রাস্তা না ধরে **কাঁচা** রাস্তাই ধরে।

ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

উঠা—খরচ উঠা, দোকান উঠা, খড়ি উঠা, লাটে উঠা, টাকা উঠা, রং উঠা, অম্ল উঠা, জাতে উঠা, দাঁত উঠা, নাম উঠা, পাট উঠা, রক্ত উঠা, রব উঠা।

কাটা—রাত কাটা, তেড়ি কাটা, বই কাটা, পোকায় কাটা, চিম্‌টি কাটা, তাল কাটা, ধারে কাটা, ভারে কাটা, ধান কাটা, বিপদ কাটা, মেঘ কাটা,

সুতো কাটা, চরকা কাটা, চেক কাটা, ছক কাটা, ছানা কাটা, জল কাটা, জিভ্ কাটা, ডানা কাটা, তিলক কাটা, দর কাটা, দাগ কাটা, দিন কাটা, নাড়ী কাটা, নাম কাটা, নেশা কাটা, পথ কাটা, ফুল কাটা, ভেংচি কাটা।

খাওয়া—ধমক খাওয়া, খাবি খাওয়া, নুন খাওয়া, চাকরী খাওয়া, খাপ খাওয়া, কিল খাওয়া, ঘুরপাক খাওয়া, টাকা খাওয়া, হাওয়া খাওয়া, হিম খাওয়া।

ছাড়া—জ্বর ছাড়া, গাড়ী ছাড়া, বাড়ি ছাড়া, মদ ছাড়া, হাল ছাড়া, গলা ছাড়া, সংগ ছাড়া, ডাক ছাড়া, ধাত্ ছাড়া, নজর ছাড়া, পেট ছাড়া, ভিটা ছাড়া।

ডাকা—বান ডাকা, বাজ ডাকা, ডাক্তার ডাকা, ভগবানকে ডাকা।

তোলা—তন্নী তোলা, পটোল তোলা, চাঁদা তোলা, হাই তোলা, জাতে তোলা, দুধ তোলা, গাছে তোলা, ঘর তোলা, ছবি তোলা, পাল তোলা, সুর তোলা।

দেওয়া—ছুটি দেওয়া, ডাকে দেওয়া, চম্পট দেওয়া, সাড়া দেওয়া, আক্কেল দেওয়া, কাঁধ দেওয়া, লম্বা দেওয়া, দম দেওয়া, দুধ দেওয়া, ফক্কি দেওয়া, আঙুল দেওয়া, কোল দেওয়া, ছাড় দেওয়া, জাত দেওয়া, ডালি দেওয়া, তা দেওয়া, তেল দেওয়া, থুতু দেওয়া, দিন দেওয়া, মাই দেওয়া, নাম দেওয়া, পিঠ দেওয়া, ফাঁক দেওয়া, টেক্কা দেওয়া, ভাতকাপড় দেওয়া।

ধরা—মদ ধরা, ট্রেন ধরা রোগে ধরা, মাছ ধরা, যমে ধরা, কলম ধরা, গাল ধরা, ঘাড় ধরা, চাল ধরা, জন ধরা, হ্যাঁপা ধরা, তাল ধরা, দোর ধরা, ধামা ধরা, নাম ধরা, লাঙল ধরা, হাল ধরা, ধুয়ো ধরা।

পড়া—শীত পড়া, গরজ পড়া, টান পড়া, ধার পড়া, মারা পড়া, টাক পড়া, গরম পড়া, ছাই পড়া, পাখি পড়া, পাতা পড়া, পাত পড়া, ওষুধ পড়া, পেট পড়া, পেটে পড়া, বেলা পড়া, হাত পড়া, হাতে পড়া, রৌদ্র পড়া।

মারা—ঢুঁ মারা, ভাত মারা, ভাতে মারা, ডুব মারা, পকেট মারা, চাল মারা, ঢিল মারা, জাত মারা, টাকা মারা, পেটে মারা, হাত মারা, হাতে মারা, মটকা মারা, চাকা মারা, বোমা মারা, পাহাড় মারা, পুকুর মারা, জড় মারা।

রাখা—মান রাখা, কথা রাখা, নাম রাখা, তোয়াক্কা রাখা, টিকি রাখা, লেজ রাখা, চাকর রাখা, মজুত রাখা, হৃদয়ে রাখা, হিংসা রাখা, টাকা রাখা, পা রাখা, পায়ে রাখা, ভাব রাখা, চোখ রাখা, প্রাণ রাখা, মুখ রাখা।

লাগা—দাগ লাগা, মন লাগা, বিষম লাগা, তাক লাগা, পিছনে লাগা, ভাল লাগা, বন্দরে লাগা, চারা লাগা, গ্রহণ লাগা, খোঁচা লাগা, কাঁটা লাগা, গান লাগা, ওল লাগা, শাঁপ লাগা, আগুন লাগা, ঘুম লাগা, চমক লাগা, জোড়া লাগা, নোনা লাগা, নজর লাগা, প্যাঁচ লাগা, পিছু লাগা, ভাব লাগা, ভেলকি লাগা।

প্রয়োগ

মন একবার ভাঙ্‌লে কি আর জোড়া **লাগে**! ভায়ে-ভায়ে ঝগড়াঝাঁটি করে নিজেদের মুখে চুনকালি **লাগিও** না। বাগবাজারে কাঠের আড়তে আগুন **লেগেছে**। সাবধান না হ'লেই চোখে খোঁচা **লাগবে**। খেতে বসে বিষম **লাগায়** সে যায় আর কি! পাট-বোঝাই নৌকা ঘাটে **লেগেছে**। আশা করা যায়, এই বইখানি ভালই **কাটবে**। ছোটবেলায় যার নুন **খেয়েছি**, এখন তার গুণ গাইবই। বড় হয়ে বাপের নাম **রাখা** চাই। অন্ধকারে ঢিল **মেরে** কোন লাভ আছে কি? থাত্‌ ছেড়ে পটোল **তুলবার** আগে মুমূর্ষু ব্যক্তি হাই তুলে। চল্‌তি বাংলায় লক্ষ্যার্থ ক্রিয়ার প্রয়োগমাধুর্য অবাঙালীকে তাক **লাগিয়ে** দেবার ক্ষমতা রাখে।

শিষ্ট প্রয়োগ কিনা, তাহার বিচার-পদ্ধতি

(১) অত্যন্ত অত্যাচার—কাহারও কাহারও মতে, 'অত্যাচার' বলিলেই যথেষ্ট। নচেৎ Tautology বা পুনরুক্তিদোষ হয়। 'অতি' ও 'আচার'—এই দুইটি শব্দের সন্ধিজাত শব্দ হইতেছে 'অত্যাচার'; কিন্তু বাংলায় এই সন্ধিজাত শব্দ একটি পৃথক্‌ শব্দই সৃষ্টি করিয়াছে। ইংরাজি 'Oppression'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'অত্যাচার'; 'Great Oppression'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'অত্যন্ত অত্যাচার' ধরিতে বাধা কি? (২) অসম্ভব শীত—'চলন্তিকা'র মতে, ইহার শুদ্ধ রূপ 'অসম্ভাবিত শীত'। (৩) অসাধ্য রোগ—ইহা অশিষ্ট প্রয়োগ নয়, শিষ্ট প্রয়োগই। 'অসাধ্য' শব্দের একটি মানে 'অপ্রতিকার্য'। অতএব, 'অসাধ্য রোগ' কেন লেখা যাইবে না? তাহা ছাড়া, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে 'অসাধ্য রোগে'র কথা আছে। 'মাধব-নিদানম্‌' গ্রন্থে মাধব কর সাধ্য রোগ, অসাধ্য রোগ, সুখসাধ্য রোগ, কষ্টসাধ্য রোগ—এই চারিটি জাতের রোগের কথা বলিয়াছেন। (৪) পঞ্চমবর্ষীয় শিশু—'পঞ্চবর্ষীয় শিশু' হওয়াই সমীচীন। (৫) ভীষণ বিভীষিকা—এই প্রয়োগটিও 'অত্যন্ত অত্যাচার' প্রয়োগেরই মত। 'বিভীষিকা'র মূল অর্থ যাহাই হোক না কেন, ইংরাজি 'Terror' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে যদি 'বিভীষিকা' শব্দটি হয়, তাহা হইলে ইংরাজি 'Great terror' শব্দদ্বয়ের বাংলা প্রতিশব্দ 'ভীষণ বিভীষিকা' কেন হইবে না? (৬) বিশিষ্ট শিষ্ট—'চলন্তিকা'র মতে, 'বিশিষ্ট' শব্দের একটি মানে 'বিলক্ষণ বা অতিশয়' আর 'শিষ্ট' শব্দের মানে 'শান্ত বা ভদ্র'। অতএব 'বিশিষ্ট শিষ্ট' শুদ্ধ প্রয়োগ। (৭) বিশ্রী গন্ধ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে, এই প্রয়োগটি শিষ্ট। 'চলন্তিকা'র মতে, 'বিশ্রী' শব্দের একটি মানে 'দূষ্য'। ইংরাজি 'Foul smell'-এর বাংলা অনুবাদে 'বিশ্রী গন্ধ' হইবে না কেন। (৮) সমূহ সমস্যা—সংস্কৃত-মতে 'সমূহ' শব্দের মানে 'গণ', কিন্তু বাংলায় ইহার অর্থ 'বহু'ও হয়। তাই 'সমূহ সমস্যা' প্রয়োগটি 'চলন্তিকা'র

মতে অশুদ্ধ নয়। (৯) যথেষ্ট ক্ষতি—'চলন্তিকা'য় 'যথেষ্ট' শব্দের অপরাপর অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হইতেছে 'প্রচুর বা ঢের'। অতএব, 'যথেষ্ট ক্ষতি' কেন হইবে না? (১০) সুবর্ণ সুযোগ—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে 'সুবর্ণময় সুযোগ' হওয়া উচিত। কিন্তু 'দারুময় মূর্তি'র '-ময়ট্' প্রত্যয়টি উহ্য রাখিয়া যদি 'দারুমূর্তি' ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে 'সুবর্ণময়' শব্দের '-ময়ট্' প্রত্যয় উহ্য রাখা যাইবে না কেন? আবার সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, কেবলমাত্র 'সুযোগ তথা সু+যোগ' শব্দের দ্বারাই 'সুবর্ণ সুযোগ'-এর অর্থ ফুটিয়া উঠিতে পারে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এরূপ প্রয়োগ থাকিলেও যোগাভ্যাসের 'যোগ' বা অংকের 'যোগ'-এর সহিত 'সুযোগ'-এর 'যোগ' জড়াইয়া যাইবে না তো? তাহা ছাড়া, অভিধান-বিশেষে 'সুবর্ণ' শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ 'Fair' থাকায়, 'Fair opportunity' অর্থে 'সুবর্ণ সুযোগ' কেন হইবে না? 'সোনার দেশ, সোনার তরী, সোনার চাঁদ' প্রভৃতিতে যদি আপত্তি না থাকে তো 'সুবর্ণ সুযোগ' প্রয়োগটিতেই-বা আপত্তি থাকিবে কেন? (১১) স্বপ্নাদ্য ঔষধ—'স্বপ্নে লব্ধ' এই অর্থে ইহার প্রয়োগ শিষ্ট। (১২) সাংঘাতিক লোক—'সাংঘাতিক' শব্দের মানে 'মারাত্মক।' অতএব, এই প্রযোগ শুদ্ধ। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ও এবিষয়ে একমত। এই 'সাংঘাতিক' শব্দের সহিত সংস্কৃত 'সংহন' শব্দের কোন যোগাযোগ নাই। 'সাংখ্য বা সাঙ্খ্য' নামক পৃথক্ শব্দ হইতে ইহা আসিয়াছে। ক. বি. মাধ্যমিক (অতি)'৪৮

বিশিষ্ট প্রয়োগমূলক অর্থ-পার্থক্য

গলা ধরা [স্বরবদ্ধ হওয়া]—সর্দিকাসিতে আমার গলা ধরেছে।
গলায় ধরা [গলদেশ ধারণ]—সে বালকটির গলায় ধ'রল।

গায়ের জল [স্বাস্থ্য]—ছেলেটির গায়ের জল ভাল বলে অল্প বয়সেই সে বড় দেখায়।
গায়ে জল [অংগে জল]—গায়ে জল দিও না।

গা দেওয়া [মন লাগানো]—সে কোন কথায় গা দেয় না।
গায়ে দেওয়া [পরিধান করা]—সে চাদর গায়ে দেয়।

গা-সওয়া [অভ্যস্ত]—তোমার গালাগালি আমার গা-সওয়া।
গায়ে-সওয়া [অংগে সহ্য হওয়া]—গায়ে-সওয়া উত্তাপ দেবে।

গা লাগা [প্রবৃত্তি জন্মানো]—কাজে গা লাগাও।
গায়ে লাগা [আঘাত করা]—ঢিলটি আমার গায়ে লেগেছে।

গায়ে হাত তোলা [প্রহার করা]—স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলবে না।
গায়ে হাত দেওয়া [অনুভব করা]—নিন্দা ক'রবার পূর্বে নিজের গায়ে হাত দেও।

গায় পড়া [গাত্রস্পর্শ করা]—টিকটিকি সরমার গায়ে প'ড়ল।
গায়ে-পড়া [অত্যন্ত মিশুক]—মেয়েটি বড়ই গায়ে-পড়া।

চোখ দেখা [চক্ষু চিকিৎসা করা]—চিকিৎসককে বন্ধুর চোখ দেখ্‌ল।
চোখের দেখা [মুহূর্তের দেখা]—জবাহরলালকে চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই।

দাঁত দেখা [দন্ত চিকিৎসা করা]—ডাক্তারকে দাঁত দেখাতে যাব।
দাঁত দেখানো [দাঁত খিঁচানো]—হনুমান ছেলেটিকে দাঁত দেখাচ্ছে।

পায় পড়া [পাদস্পর্শ করা)—পুত্র পিতার পায় প'ড়ল।
পায়ে-পড়া (খোসামুদিয়া)—এরূপ পায়ে-পড়া লোক আমি দেখি নি।

মন লাগা (মনোযোগ দেওয়া)—পড়ায় মন লাগে না।
মনে লাগা (পছন্দ হওযা)—কচি ছেলেটি আমার মনে লেগেছে।

মন পড়া (স্নেহ জন্মানো)—শিশু সাধনের উপরে আমার মন পড়েছে।
মনে পড়া (স্মরণে আসা)—উত্তরটি আমার মনে পড়েছে।

মন জানা (অন্তরের কথা অবগত হওয়া)—আমি তার মন জানি।
মনে জানা (অনুভব করা)—সবই আমি মনে জানি।

মন লওয়া (অন্তরের রহস্য জানা)—সে আমার মন লইয়াছে।
মনে লওয়া (যুক্তিসংগত বোধ করা)—তাহার কথাটি আমার মনে লইয়াছে।

মাথা রাখা (শয়ন করা)—সে বিছানায় মাথা রেখেছে।
মাথায় রাখা (অতীব শ্রদ্ধা করা)—দেবী চিত্তেশ্বরীর চরণামৃত মাথায় রাখ।

মাথা করা (পণ্ড করা)—তুমি অভিনয় ক'র্‌বে, না মাথা করবে!
মাথায় করা (অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়া)—ছেলেটিকে অত মাথায় করো না।

মাথা খেলানো (মাথা ঘামান)—এই সমস্যার সমাধানে তিনি মাথা খেলাচ্ছেন।
মাথায় খেলা (মনের মধ্যে নানা যুক্তি বা কৌশলের উদয় হইতে থাকা)—দাবা খেলবার সময় অনেক চালই তার মাথায় খেল্‌তে লাগল।

মুখ বন্ধ করা (চুপ করা)—গোলমাল না করে মুখ বন্ধ কর।
মুখবন্ধ করা (ভূমিকা লেখা)—লেখকেরা সাধারণত মুখবন্ধ ক'রে থাকেন।

মুখ মারা (মুখের দিক মজবুত করা)—ভাল অভিনেতামাত্রেই অভিনয়ে মুখ মারেন।
মুখে মারা (বদনমণ্ডলে আঘাত করা)—রমেন হরেনের মুখে মেরেছে।

মুখ রাখা (মান রক্ষা করা)—তুমি আমার মুখ রেখেছ।
মুখে রাখা (আহার করা)—সে রসগোল্লা মুখে রাখ্‌ল।

মুখ দেওয়া (খাওয়া—তুচ্ছার্থে)—বিড়ালটা দুধে মুখ দিয়েছে।
মুখে দেওয়া (খাওয়া—গৌরবার্থে)—ছেলেটি দুধ মুখে দিয়েছে।

বুক লাগানো (ঐকান্তিক সাহায্য করা)—অপরের বিপদে সে বুক লাগায়।
বুকে লাগা (অন্তরে আঘাত পাওয়া)—তোমার কটুবাক্য সুরেনের বুকে লেগেছে।

হাড় জোড়া (ভগ্নাস্থি জোড়া লাগা)—তার হাড় জুড়েছে।
হাড় জুড়ানো (শান্তি ও আরাম পাওয়া)—তার হাড় জুড়িয়েছে।

হাত খোলা (অভ্যাসে হাতের সংকোচ না করা)—সে হাত খুল্‌ল।
হাতে-খোলা (সর্বস্বান্ত)—দান করে আজ সে হাতে-খোলা।

হাত ধরা (হস্ত গ্রহণ করা)—সে আমার হাত ধরল।
হাতে ধরা (মিনতি করা)—সে আমার হাতে ধরল।

হাত আসা (অভ্যাস হওয়া)—কাজে তার হাত এসেছে।
হাতে আসা (দখলে আসা)—জমিটি তাহার হাতে এসেছে।

হাত করা (হস্তগত করা)—জমিটি সে হাত করেছে।
হাতে-করা (হস্তদ্বারা নির্মিত)—হাতে-করা পুতুলটি আমি চাই।

গালে হাত (বিস্ময়ে)—বোকা ছেলেটির পাশের সংবাদ শুনে সে গালে হাত দিল!
পায়ে হাত (পাদস্পর্শ)—পুত্র পিতার পায়ে হাত দিল।

বুকে হাত (সাহস প্রকাশে)—ডাকাত পড়েছে শুনে সে বুকে হাত দিল।
মাথায় হাত (দুর্ভাবনায়)—ব্যাংক্ ফেল মেরেছে শুনে সে মাথায় হাত দিল।

অনুশীলনী

[এক] 'কাটা' বা 'তোলা' ক্রিয়াপদকে ভিন্নার্থে প্রয়োগ করিয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬

[দুই] নিম্নলিখিত ইডিয়মগুলির স্পষ্টার্থবোধক বাক্যাদি রচনা কর :—মুখ রাখা, ধুয়ো ধরা, পায়ে-ঠেলা, পটোল-তোলা, নাম ডুবানো, হাড় জুড়ানো, গা করা, তাক লাগ, টেক্কা দেওয়া। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬, বি. এ. '৫৭

[তিন] 'মাথা' শব্দটির পাঁচ রকম অর্থ বুঝাইতে পাঁচটি বাক্য রচনা কর। ক. বি. বি. এ. '৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ও প্রবচন

ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে 'ঈডিয়ম্', বাংলায় তাহাকেই বলে 'বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ'। বাংলা ভাষার ইহা এক অপরিমেয় মূল্যবান সামগ্রী। সাধু ভাষায় নয়, চলিত ভাষাতেই ইহার যাহা-কিছু প্রচলন। আবার ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কোন কোন বিশিষ্টার্থক ব্যাক্যাংশ ভুল অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার যথাযথ অর্থ সম্পর্কে বক্তার মূঢ়তা ও অনভিজ্ঞতাই দায়ী। বাচ্যার্থের মধ্য দিয়া নয়, লক্ষ্যার্থ বা ব্যংগার্থের মধ্য দিয়াই ইহার সার্থকতা। ইংরাজি রচনা-রীতির 'ঈডিয়মের' ন্যায় বাংলা রচনারীতিতেও যাহাতে এই বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের সার্থক এবং বহুল প্রয়োগ ঘটে, তাহার প্রতি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনকারী মাত্রেরই সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত। ইহা ছাড়া, আমাদের প্রাত্যহিক কথোপকথনে সুপ্রচলিত প্রবচনও এক অমূল্য ভাণ্ডার। ইহাদেরও সার্থক অর্থ আমাদের জানা থাকা সমীচীন। নিম্নে অল্প কয়েকটি বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ও প্রবচনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ দেওয়া হইল। বাগ্‌ধারার প্রয়োগ-কালে এই কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, যেন তেন প্রকারেণ না করিয়া উহার বিশিষ্ট অর্থটি যাহাতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ পায় এমন ভাবেই বাক্য রচনা করা উচিত।

অকাল কুষ্মাণ্ড—(অকর্মণ্য)—ধনী পিতার 'অকাল কুষ্মাণ্ড' পুত্র হওয়া—ইহাও বুঝিবা প্রকৃতির এক খেয়াল। **অক্কা পাওয়া**—(ঈশ্বর-প্রাপ্তি)—ও-বাড়ির বুড়ীর 'অক্কা পাওয়া'র সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। **অগস্ত্য যাত্রা**—(একেবারে প্রস্থান, ফিরিয়া আসিবার কোন প্রশ্ন নাই)—ছাত্রটি শিক্ষকমহাশয়ের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া বিদ্যালয় হইতে 'অগস্ত্য যাত্রা' করিল। **অগাধ (বা গভীর) জলের মাছ**—(যে-ব্যক্তি কোন বিষয়ে ভাসা-ভাসা চিন্তা না করিয়া উহার গভীরতম প্রদেশে যাইয়া সার মীমাংসায় উপনীত হয়)—'অগাধ (বা গভীর) জলের মাছে'র ন্যায় চাণক্যের মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশস্থিত বুদ্ধির নিশানা করিবার ক্ষমতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তেরও ছিল না। **অন্তরটিপুনি**—(অন্তর্নিহিত খোঁচা, যাহা মর্মপীড়াদায়ক)—স্ত্রীর কথাগুলির 'অন্তরটিপুনি' তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া বিবাগী হইয়া গেলেন। **অন্ধের নড়ি (বা যষ্ঠি)**—(অসহায়ের সহায়)—পিতার বার্ধক্যে পুত্রই 'অন্ধের নড়ি (বা যষ্ঠি)'। **অমাবস্যার চাঁদ**—(অদর্শনীয় ঘটনা)—যে না পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা রাখে, সে 'অমাবস্যার চাঁদ'ই দেখে। **অরণ্যে রোদন**—

(নিষ্ফল রোদন, বৃথা অনুনয়-বিনয়)—এবারকার আরব্যে আলোচনা-উপলক্ষে ভারতীয় লোকসভা-'অরণ্যে' দেশের প্রতিনিধিরা যথারীতি 'রোদন' করিয়াছেন। **অর্ধচন্দ্র দান করিয়া বিদায়**—(গলাধাক্কা দিয়া বিতাড়ন)—বিত্তশালী শ্বশুর দীনদরিদ্র ঘরজামাতাকে লাঠি-জুতায় আদর সুরু করিয়া শেষে 'অর্ধচন্দ্র দান করিয়া বিদায়' দিলেন। **অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী**—(স্বল্প বিদ্যার শোচনীয় পরিণতি)—তোমার 'অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী' বলিয়াই ছাত্রাবস্থায় তুমি বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক মেঘনাদকে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছিলে। **অষ্টবজ্র-সম্মিলন**—(প্রতিভাধর ব্যক্তিগণের একত্র সমাবেশ)—কবি-সমালোচক মোহিতলালের শোকসভায় বংগ-সাহিত্যের 'অষ্টবজ্র-সম্মিলন' হইয়াছিল। **অহি-নকুল, সাপে-নেউলে, দা-কুমড়া, আদায়-কাচকলায় সম্পর্ক**—(শাশ্বত বিরোধ বা বৈরীভাব)—আমেরিকা ও রাশিয়ার রাজনীতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় দেশবাসীর মধ্যে 'অহি-নকুল (বা সাপে-নেউলে, বা দা-কুমড়া বা আদায়-কাঁচকলায়) সম্পর্ক আছে।

আক্কেল-সেলামী—(নির্বুদ্ধিতার নিমিত্ত দণ্ড)—ভোলার কথামত শেয়ার-বাজারে নামিয়া আমাকে হাজার টাকা 'আক্কেল-সেলামী' দিতে হইল। **আকাশ থেকে পড়া**—(অনভিজ্ঞতার ভাণ করা)—তাঁর চাকরি গিয়েছে শুনে যে তুমি একেবারে 'আকাশ থেকে পড়লে।' **আকাশ-কুসুম**—(কাল্পনিক বিষয় বা বস্তু)—অলস চিন্তার প্রশ্রয়ে যাহা কিছুই করা যাক্ না কেন, তাহা 'আকাশকুসুম' রচনার ন্যায় ব্যর্থতায় ও হতাশায় পর্যবসিত হয়। **আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হওয়া**—(অল্পদিনে অথবা অচিরে দরিদ্রের হঠাৎ ধনী হওয়া)—মাসিক তিরিশ টাকা বেতনের ঐ বিত্তহীন কেরাণী তিন লক্ষ টাকা লটারিতে পাওয়ায়, তাহার 'আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে'। **আঠারো মাসে বছর**—(দীর্ঘসূত্রী, কুঁড়ে স্বভাব)—যেখানে পরীক্ষার আর কয়েক মাস ব্যবধান, সেখানে 'আঠারো মাসে বছর' করিলে অকৃতকার্য হইবে। **আদা জল খেয়ে লাগা**—(উঠিয়া পড়িয়া লাগা)—গত বছর ব্যবসায়ে লোকসান হলেও, এবার সে লাভ করবার জন্য 'আদা জল খেয়ে লেগেছে'। **আদার ব্যাপারী**—(সামান্য বিষয়ে ব্যাপৃত ব্যক্তি)—'আদার ব্যাপারী' প্রজা জমিদার-জাহাজের সংবাদ লইতেও শংকাবোধ করে। **আদিখ্যেতা**—(ন্যাকামি)—মেয়েটির 'আদিখ্যেতা' দেখে আমার গা জলে যায়। **আমড়া কাঠের বা গাছের ঢেঁকি, জরদগব**—(অপদার্থ)—ছাত্র যদি 'আমড়া কাঠের বা গাছের ঢেঁকি (বা জরদ্গব)' হয়, তাহা হইলে তাহাকে যতই পড়ানো যাক্ না কেন, বছরের পর বছর সে অনুত্তীর্ণই হয়। **আমড়াগাছি করা**—(তোষামোদে আত্মবিস্মৃত করা)—নির্বোধ ধনী ব্যক্তিকে 'আমড়াগাছি করিয়া' চতুর ব্যক্তিরা নিজেদের কাজ হাসিল করিয়া থাকে। **আদালের**

ঘরের দুলাল—(আদুরে ও আব্দারে ছেলে)—সন্তানকে 'আলালের ঘরের দুলাল' করিয়া তুলিলে তাহার সর্বনাশই সাধিত হয়। **আষাঢ়ে গল্প**—(অবিশ্বাস্য কাহিনী) —রাঘব বোয়ালে হাতীকে গ্রাস করিয়াছে, এইরূপ 'আষাঢ়ে গল্প' গাঁজাখোরেরাই বিশ্বাস করিয়া থাকে। **আসলে মুষল নেই ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া**—(যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব)—নিজের সংসারের প্রতি নজর না দিয়া অপরের সংসার চালানোর এই প্রচেষ্টার মর্মকথা হইতেছে—'আসলে মুষল নেই, ঢেঁকিঘরে চাঁদোয়া'।

ইঁচড়ে পাকা—(অকালপক্ব)—হরেনবাবুর দ্বাদশবর্ষবয়স্ক 'ইঁচড়ে পাকা' পুত্রটি বৃদ্ধের ন্যায় হুঁকা টানিতে শিখিয়াছে। **ইতরবিশেষ**—(ভেদাভেদ)—বিমাতা নিজের সন্তান ও সপত্নীর সন্তানের মধ্যে সাধারণত 'ইতরবিশেষ' করিয়া থাকে। **ইঁদুরকপালে**— (মন্দভাগ্য)—'ইঁদুরকপালে' মেয়ে বলিয়াই নীলার অদৃষ্টে এত বিড়ম্বনা !

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ—(যাহা হাতছাড়া হইতেছে তাহা স্বেচ্ছায় সৎকার্যে নিয়োগ ও দান করার ভান)—তামাদিপ্রাপ্ত দশ হাজার টাকা তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়া 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' করিলেন। **উত্তম মধ্যম**—(বিলক্ষণ প্রহার)—চোরকে ধরিয়া 'উত্তম মধ্যম' দেওয়া হইল। **উনপাঁজুরে**—(দুর্বল, হতভাগ্য)—'উনপাঁজুরে' মেয়েটির ক্ষীণা নামটি সার্থক। **উপরোধে ঢেঁকি গেলা**—(নির্বন্ধাতিশয় রক্ষা করা)—প্রধান পরীক্ষক মহাশয় সেন সাহেবের ছেলেটিকে পাশ করাইয়া দিয়া 'উপরোধে ঢেঁকি গিলিলেন'। **উলুবনে মুক্তো ছড়ানো**—(অস্থানে অমূল্য জিনিষ ছড়ানো)—চাষীমজুরদের সভায় তিনি 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে মিষ্টিকতা' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া 'উলুবনে মুক্তো ছড়াইলেন'।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো—(সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট)—এই পাঁচজন ব্যক্তি কেবল যে সহপাঠী তাহাই নয়, ইহারা 'এক ক্ষুরে মাথাও মুড়াইয়াছে'। **এক ঢিলে দুই পাখি মারা**—(একটিমাত্র উপায় বা কৌশলে উভয় দিক রক্ষা করা বা দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা)—এই বইখানি ইন্‌টারমিডিয়েট্ ও বি. এ. পরীক্ষার্থীদের জন্য লিখিয়া আমি 'এক ঢিলে দুই পাখি মারিতেছি'। **এক মাঘে শীত যায় না** —(বিপদের সম্ভাব্যতা)—দাগী চোর দারোগাবাবুকে ঘুষ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্তি পাইয়া যখন তাঁহাকে কিছুই দিল না, তখন তিনি বলিলেন—"আচ্ছা ! 'এক মাঘে শীত যায় না' !" **এক হাত (দেখে) লওয়া**—(বিদ্রূপ করিয়া দোষকীর্তন করা ; জব্দ করা)—নিরুপায় নিঃসহায় ব্যক্তিকে 'এক হাত (দেখে) লওয়ার' মধ্যে কোন বাহাদুরী নাই। **একচোখো**—(পক্ষপাতদুষ্ট, অনুদার)—

'একচোখো' হাকিমের কাছে কোন সুবিচার আশা করা যায় না। **একাঘরের গিন্নি**—(স্বচ্ছন্দ প্রভু)—যে ছোট্ট কোম্পানীতে তুমি ইতিপূর্বে কাজ করিতেছিলে, সেখানে তো ছিলে 'একাঘরের গিন্নি'। **একাদশে বৃহস্পতি**—(অত্যন্ত সৌভাগ্যের সময়)—প্রথম বিভাগে আই. এ. পরীক্ষায় পাশ, তিন শত টাকা মাহিনার চাকুরী, ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যাসন্তানকে বিবাহ—এই সব দেখিয়া মনে হয় যে, তোমার এখন 'একাদশে বৃহস্পতি।' **একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ**—(যে যাহার বিরুদ্ধ, তাহার কাছে তাহাই করা)—বিধবা-বিবাহের বিরোধী পণ্ডিত মহাশয়কে বিধবা-বিবাহের পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করায় ব্যাপারটি ঘটিয়াছে এই যে, 'একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ'। **এলোপাথারি, এলোধাবাড়ি**—(বিশৃংখল)—উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভংগ করিবার জন্য পুলিশ 'এলোপাথারি (বা এলোধাবাড়ি)' গুলি চালাইতে লাগিল।

ওজন বুঝে চলা—(আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করা)—এই সংসারে আপনার 'ওজন বুঝিয়া চলিতে' না পারিলে মানসম্ভ্রম বজায় রাখা খুবই কঠিন। **ওষুধ করা**—(তুক করা)—নিশ্চয় কোন দুষ্ট লোক তাকে 'ওষুধ করেছে' বলেই সে অমন ভ্যাবা গংগারাম হয়ে পড়েছে। **ওষুধ ধরা**—(ঈপ্সিত ফললাভ)—শিক্ষকমহাশয়ের তিরস্কারে ছাত্রটি যখন পড়াশুনায় মন দিয়েছে, তখন 'ওষুধ ধরেছে' বলেই তো মনে হয়। **ওষুধ পড়া**—(যথাযোগ্য প্রভাবে পড়া)—এবার যে 'ওষুধ পড়েছে', তাতে ছেলেটি নিশ্চয়ই শোধরাবে।

ক-অক্ষর গোমাংস—(বর্ণপরিচয়হীন)—এত বড়ো বিদ্বান্ পিতার ছেলে কি না 'ক-অক্ষর-গোমাংস'! **কংস মামা**—(নির্মম আত্মীয়)—'কংস মামা'র হাতে যখন পড়েছ, তখন আর তোমার উদ্ধার নেই। **কই মাছের প্রাণ**—(যাহা সহজে মরিবার নয়)—দরিদ্রের 'কই মাছের প্রাণ' বলিয়াই তো সে এই সাত দিনব্যাপী উপবাস করিয়াও জীবিত আছে। **কড়ায়-গণ্ডায়**—(পুরোপুরি হিসাব)—দেনাদার পাওনাদারের পাওনা 'কড়ায়-কণ্ডায়' পরিশোধ করিয়া দিয়াছে। **কত ধানে কত চাল তার খবর**—(ধানের পরিমাণ অনুসারে চাল অনেক কম হয়, এই তত্ত্ববোধ যাহার নাই অর্থাৎ সাংসারিক আয়-ব্যয় সম্বন্ধে যে দায়িত্বজ্ঞানহীন তাহার প্রতি এই ব্যংগোক্তি)—পরের টাকায় যে কাপ্তেনী করে, সে 'কত ধানে কত চাল তার খবর' রাখে না। **কথায় চিঁড়ে ভিজে না**—(ফাঁকা আওয়াজে কাজ হয় না)—পরোপকারী হইতে হইলে, শুধু 'কথায় চিঁড়ে ভিজে না', সক্রিয়ভাবে লোকহিতৈষণা করিতে হয়। **কলুর বলদ**—(যাহার স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত গতি নাই)—সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া মানুষ 'কলুর বলদে'র ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

কল্কে পাওয়া—(পাত্তা পাওয়া)—বাঙালী জাতি আজ কোন প্রদেশেই 'কল্কে পাইতেছে' না। **কাকভুষণ্ডী**—(দীর্ঘজীবী ব্যক্তি)—মহাত্মা গান্ধী অন্তত একশত পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়া 'কাকভুষণ্ডী' হইতে চাহিয়াছিলেন। **কান-পাতলা**—(অতিশয় বিশ্বাসপ্রবণ)—তিনি 'কান-পাতলা' বলিয়াই প্রতিটি লোকের কথা বিশ্বাস করেন। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে**—(বেদনার উপরে বেদনা দেওয়া)—টাকা হারাইয়া ব্যথাহত, তাহার উপরে ভর্ৎসনা করিয়া 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' না দেওয়াই ভাল। **কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা**—(যে জাতীয় বস্তু-দ্বারা অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সেই জাতীয় বস্তু-দ্বারাই কার্যসিদ্ধি করা)—ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজনকে সরকারী সাক্ষীরূপে নিয়োগ করিয়া সমগ্র ষড়যন্ত্রকে এইভাবে প্রকাশ করা, ইহাই 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'। **কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা**—(অল্প বয়সে বিগ্‌ড়ানো)—শৈশবকাল হইতে ছেলেদের দিকে নজর না রাখিলে অবশ্যই 'কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিবে'। **কাঁঠালের আমসত্ত্ব, সোনার পাথরের বাটি**—(বে-খাপ সামগ্রী ; অসম্ভব বস্তু)—বিশ্বসভার বিশ্বশান্তি স্থাপনের প্রয়াস 'কাঁঠালের আমসত্ত্বের (বা সোনার পাথরের বাটির)' ন্যায় নিতান্তই বে-খাপ হইয়া উঠিয়াছে। **কাঠের পুতুল**—(কাঠের ন্যায় অসাড় মূর্তি)—পাপিয়া তাহার স্বামীর তিরস্কারে 'কাঠের পুতুলে'র ন্যায় বসিয়া রহিল। **কানু ছাড়া কীর্তন নাই**—(একই বিষয়ের বার বার অবতারণা)—পরীক্ষায় পাশ করিতে হইলে বোধিনী-সহায়িকা অবশ্যই চাই—এ যেন 'কানু ছাড়া কীর্তন নাই'। **কালনেমির লংকাভাগ**—(কর্মানুষ্ঠানের আগেই কর্মের ফলাকাংক্ষা)—গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিকে পরাজিত করিয়া অক্ষশক্তি যে দেশগুলি আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার আশা পোষণ করিয়াছিল, তাহা 'কালনেমির লংকাভাগ'ই বটে। **কাষ্ঠহাসি**—(কপট হাস্য)—ভোটদাতার 'কাষ্ঠহাসি' দেখিয়া অনেক সময়েই নির্বাচনপ্রার্থীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝিতে পারেন না। **কুলকাঠের আঙার (বা আগুন)**—(তীব্র জ্বালা)—আমার প্রাণের ভিতর 'কুলকাঠের আঙার (বা আগুন)' জ্বলিতেছে। **কুলায় শুইয়া তুলায় করিয়া দুধ খাওয়া**—(কপট সারল্য প্রকাশ করা)—কর্তৃপক্ষস্থানীয় হইয়াও তুমি এমনভাবে কথা কহিতেছ যেন 'কুলায় শুইয়া তুলায় করিয়া দুধ খাইতেছ।' **কুণোবেঙ, কূপমণ্ডূক**—(সীমাবদ্ধ জ্ঞান)—সংস্কার অথবা কুসংস্কারের বশীভূত হইলে আমরা এমনই 'কুণোবেঙ (বা কূপমণ্ডূক)' হইয়া পড়িব যে, আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। **কেঁচে গণ্ডূষ করা**—(পুনরায় আরম্ভ)—এই কবিতার মর্মার্থটি 'কেঁচে গণ্ডূষ করিয়া' লিখ। **কেঁচো খুঁড়্‌তে সাপ**—(তুচ্ছ ব্যাপার হইতে গুরুতর বিষয়ের উদ্ভব)—সামান্য চুরির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া রাজনৈতিক দলবিশেষের সক্রিয়তা বুঝা গেল—এ যেন 'কেঁচো খুঁড়্‌তে সাপ' বাহির হইল।

খয়ের খাঁ—(ধামা-ধরা)—ইংরাজ আমলের 'খয়ের খাঁ'রা স্বাধীন ভারতে ঘোর কংগ্রেসী হইয়া উঠিয়াছেন। **খাল কেটে কুমীর আনা**—(স্বকৃত দোষে বিপদাপন্ন হওয়া)—দুষ্টপ্রকৃতি মৈত্রেয়-ভ্রাতাকে জমিদারী দেখ্‌তে দিয়ে আমি 'খাল কেটে কুমীরই এনেছি'। **খুঁড়িয়ে বড়ো হওয়া**—(প্রকৃত বড়ো বা মহৎ নয়, কিন্তু গায়ের জোরে বড়ো হওয়া)—জমিদারের ছেলের বাবুগিরির সংগে পাল্লা দিয়ে দরিদ্র ব্যক্তির সন্তানের বাবুগিরি করা তো 'খুঁড়িয়ে বড়ো হওয়ার'ই সামিল।

গংগাজলে গংগাপূজা—(অপরের সামগ্রী দিয়াই অপরের তুষ্টিসাধন)—কবি-সমালোচক মোহিতলালের শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার লেখা কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া আমি 'গংগাজলে গংগাপূজা' সাংগ করিলাম। **গড্ডলিকা-প্রবাহ**—(নিজে বিবেচনা না করিয়া ভেড়ার পালের ন্যায় পূর্ব-প্রচলিত মতের অন্ধ অনুগমন)—আধুনিক চলচ্চিত্রশিল্প 'গড্ডলিকা-প্রবাহে' ভাসিয়া চলিয়াছে। **গণেশ উলটানো, লাল বাতি জ্বালানো**—(বিনষ্ট হওয়া)—কামিনীবাবুর গুড়ের ব্যবসায়টি 'গণেশ উলটাইছে (বা লালবাতি জ্বালিয়াছে)'। **গন্ধমাদন বহিয়া আনা**—(অবান্তর অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বহন)—আজিকার হনুমানবৃত্তিক ছাত্রেরা কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার কালে গোটা বস্তুসংক্ষেপ লিখিয়া 'গন্ধমাদন বহিয়া আনিয়া' থাকে। **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল**—(পাইবার কোন স্থিরতা নাই, অথচ সেই বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হওয়া)—আই. এ. পরীক্ষা দিবার সংগে সংগেই সে বি. এ. শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক কিনিয়া 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' মাখিল। **গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়**—(সমুদয় আত্মসাৎ করা)—সরকারী চাকুরিয়া উচ্চপদস্থ কোন কোন ব্যক্তি 'গাছেরও খান তলারও কুড়ান'। **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—(অত্যন্ত ভয় পাওয়া)—নির্জন শ্মশানে অকস্মাৎ মনুষ্যকণ্ঠের ধ্বনি শুনিয়া আমার 'গায়ে কাঁটা দিয়াছিল'। **গায়ে-গায়ে শোধ**—(দেয় না দেওয়া ও প্রাপ্য না লওয়া, অথচ দেনাপাওনার শোধবোধ)—তুমি আমার কাছে যে পঞ্চাশ টাকা পাইবে, তাহা তোমার খোরাকি বাবদে খরচ করিয়া 'গায়ে-গায়ে শোধ' দিতে চাই। **গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না**—(স্বদেশে গুণীর আদর নাই)—নোবেল-পুরস্কার না পাওয়া অবধি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না'—কথাটির সার্থক প্রতিপত্তি ছিল। **গোঁয়ারগোবিন্দ**—(কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি)—'গোঁয়ারগোবিন্দ' রামলোচন শূন্যহস্তে বন্দুকধারী পুলিশকে আক্রমণ করিল। **গোঁফ-খেজুরে**—(নিতান্ত অলস)—বাহিরে না গিয়া ঘরের মধ্যে যাহারা লেজ নাড়ে, তাহাদের ন্যায় 'গোঁফ-খেজুরে'র দ্বারা এই পৃথিবীতে কি কাজ হইতে পারে? **গোকুলের ষাঁড়**—(স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি)—লেখাপড়া না শিখিলে হলধর 'গোকুলের ষাঁড়ে'র

হায় পাড়ায় পাড়ায় যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইবে। **গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া**—(জ্ঞাতসারে অনিষ্ট করিয়া পরে সংশোধনের বৃথা প্রয়াস)—শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থনা করা 'গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া'রই সামিল। **গোবর-গণেশ**—(জড়বুদ্ধি)—কাজের চাপে না রাখিলে তোমাদের ছেলেটি ধীরে ধীরে 'গোবর-গণেশ' হইয়া পড়িবে। **গোবরে পদ্মফুল**—(কুৎসিত পরিবারে সুন্দর বালক বা বালিকা; নীচকুলে মহৎ ব্যক্তি)—মুলোর বংশে এমন সুন্দর ছেলে, এ যে সত্যই 'গোবরে পদ্মফুল'। **গোলে হরিবোল, গোলেমালে চণ্ডীপাঠ**—(বিশৃংখল কার্য)—প্রশ্নটির উত্তর যথাযথ হয় নাই, 'গোলে হরিবোল (বা গোলমালে চণ্ডীপাঠ)' হইয়াছে। **গৌরচন্দ্রিকা**—(মুখবন্ধ)—'গৌরচন্দ্রিকা' না করিয়াই তিনি আমার কাছে মূল বক্তব্য বিষয়টি বলিলেন।

ঘর থাকিতে বাবুই ভিজা—(অবিমৃষ্যকারিতা; মূর্খতা)—বিরাট প্রাসাদের অধিকারী হইয়াও প্রকাশবাবু খোলার ঘরে তাঁহার মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করিয়া 'ঘর থাকিতে বাবুই ভিজিতেছেন'। **ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়**—(বিপদাশংকা করা)—যেমন 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়', তেমনি কোন প্রকাশকের হাতে বই দিবামাত্র আমি শংকিত হই। **ঘরভেদী বিভীষণ**—(যে গৃহ-বিবাদ বাধায়)—কংগ্রেসের মধ্যে এখনও অনেক 'ঘরভেদী বিভীষণ' আছেন। **ঘোড়ার ঘাস কাটা**—(বাজে কর্ম করা)—সর্বদা মনে রেখো যে, কলেজে তোমরা পড়তে এসেছ, 'ঘোড়ার ঘাস কাটতে' এসো নাই। **ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া**—(বৃথা বা নিষ্ফল চেষ্টা করা)—তোমার জরিমানা মাপ করাইবার জন্য কলেজের উপাধ্যক্ষকে অতিক্রম করিয়া সরাসরি অধ্যক্ষের কাছে গিয়াছ সত্য, কিন্তু ইহাতে 'ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া'ই হইয়াছে। **ঘোড়ারোগ**—(অবস্থার অতিরিক্ত বিষয়ে সাধ)—প্রতিদিন সিনেমা দেখিবার এই 'ঘোড়ারোগ' তোমার ন্যায় গরীবের পক্ষে সর্বতোভাবে পরিহার্য। **ঘোড়া দেখে খোঁড়া**—(সুযোগসন্ধানী)—নিপুণ সহকারী পাওয়ায় আপিসের বড়বাবু তাঁর উপরে সব কাজের ভার দিয়ে 'ঘোড়া দেখে খোঁড়া' হলেন। **ঘোড়ার ডিম**—(অলীক পদার্থ)—হলধরের ন্যায় কৃপণ ব্যক্তির কাছে তুমি 'ঘোড়ার ডিম' পাবে।

চক্ষুদান করা—(চুরি করা)—পকেটমারে আমার তিন তিনটি কলম 'চক্ষুদান করিয়াছে'। **চক্ষে সরিষাফুল দেখা**—(অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ অনুভব করা)—নিশীথকালে প্রতিবেশী মাধবের বাড়ির ভাঙা সদর দরজার প্রতি নজর পড়িবামাত্র আমি 'চক্ষে সরিষাফুল দেখিলাম'। **চাটি-বাটি গুটান**—(বাসত্যাগ

করা)—ওপাড়ার দুষ্ট ছেলেদের অত্যাচারে তিনি 'চাটি-বাটি গুটাইয়া' সপরিবারে এপাড়ায় আসিয়াছেন। **চিত্রগুপ্তের খাতা (বা খতিয়ান)**—(যে খাতায় যমের লেখক চিত্রগুপ্ত নাকি মানুষের পাপপুণ্য বা জীবনমরণের হিসাব রাখে)—পোড়ারমুখোর মরণও হয় না—নিশ্চয়ই 'চিত্রগুপ্তের খাতা (বা খতিয়ান ,' বন্ধ রয়েছে। **চিনির বলদ**—(কেবলমাত্র ভারবাহী, অথচ ফলভোগী নয়)—শ্রমিক-সম্প্রদায় 'চিনির বলদে'র ন্যায় শ্রমজাত দ্রব্য ভোগ করিতে পারে না। **চুল-পাকানো**—(অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা)—সুদীর্ঘ এক যুগ ধরিয়া অধ্যাপনায় 'চুল পাকাইয়াছি'। **চোখে ধুলা দেওয়া**—(ধোঁকা দেওয়া)—বাল্যকালে যে-ব'লক গুরুজনের 'চোখে ধুলা দেয়', তাহার পরিণাম ভয়াবহ। **চোখের মাথা খাওয়া**—(কানা বা অন্ধ হওয়া)—'চোখের মাথা খেয়েছ' বলেই বই-খানি আলমারি থেকে দেখেশুনে আনতে পারলে না। **চোখের পর্দা**—(লজ্জা)—'চোখের পর্দা' নাই বলিয়াই সে তাহার শ্যালকের কাছে এক সপ্তাহের খাওয়া-খরচ আদায় করিয়াছে। **চোখের নেশা**—(মোহ)—যেদিন চোখের নেশা কাটিল সেদিন বিল্বমংগলের ভগবদ্‌প্রাপ্তি ঘটিল। **চোখের বালি**—(চক্ষুশূল, অপ্রিয়)—ও-বাড়ির নূতন বউ সকলের 'চোখের বালি' হওয়ায় তাহার দুঃখকষ্টের অন্ত নাই। **চোরাবালি**—(প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ)—আধুনিক সিনেমা ব্যভিচারের 'চোরাবালি'তে মানুষকে আটকাইয়া ফেলিতেছে। **চোরের মায়ের কান্না**—(যে-বেদনা কাহাকেও জানাইবার নয়)—যে-ব্যক্তি তাহার পুত্রকে শৈশবকাল হইতে অসৎকার্যে প্রবৃত্তি দিয়া আসিয়াছে, পরিণামে তাহাকে 'চোরের মায়ের কান্না'ই কাঁদিতে হয়।

ছ'কড়া ন'কড়া—(সস্তা দরে)—তোমার অত বড়ো বাড়িখানি 'ছ'কড়া ন'কড়ায়' বেচে ফেললে! **ছাপোষা**—(সংসার প্রতিপালনে রত)—আমার ন্যায় 'ছা-পোষা' কেরাণীর কাছে আর পঞ্চাশ টাকা চাঁদার প্রত্যাশা ক'রো না। **ছাই-চাপা আগুন**—(প্রচ্ছন্নতেজা)—ছেলেটি 'ছাই-চাপা আগুন'—ভবিষ্যতে সে কীর্তিমান হইবেই। **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো**—(অতি অকিঞ্চিৎকর কাজের জন্য নিয়োজিত অকিঞ্চিৎকর বা অপদার্থ পাত্র)—জমিদারবাবুর তামাক সাজিবার জন্য বৃদ্ধ নিবারণ নিযুক্ত হওয়ায় 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর'ই ব্যবস্থা হইল। **ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়**—(সামান্যরূপে প্রবেশ করিয়া পরে বৃহৎ অনিষ্ট সাধন করিয়া প্রস্থান)—চল্লিশ টাকা মাহিনার কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইয়া কালক্রমে প্রধান পরিচালকরূপে লক্ষ লক্ষ টাকা চক্ষুদান দিয়া যখন সে ব্যাংকে লাল বাতি জ্বালাইল, তখনই বুঝা গেল যে, সে 'ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়'। **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা**—(নীচ ও ঘৃণিতকে দণ্ড দিতে গেলে নিজেরই হাতে গন্ধ হয়—ইহাতে গৌরব নাই)—এই দাগী চোরকে পুলিশের হাতে না

দিয়া স্বহস্তে শিক্ষা দিলে 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করাই' হইবে। **ছেলের হাতের মোয়া**—(প্রবঞ্চনাবোধক)—লেখাপড়া ব্যাপারটি 'ছেলের হাতের মোয়া' নয় যে, ফাঁকি দিয়াই পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করিবে!

জগাখিচুড়ী পাকানো—(জট পাকানো)—আলমারির মধ্যে জামা-কাপড়ে, কাগজপত্তরে 'জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে' রেখেছ। **জলাঞ্জলি দেওয়া**—(বিসর্জন দেওয়া ; অপব্যয় করা)—শেয়ার-বাজারে রামবাবু প্রভৃত টাকাকড়ি 'জলাঞ্জলি দিয়াছেন'। **জিলাপীর পাক (বা প্যাঁচ)**—(কুটিল বুদ্ধি)—তোমার পেটের ভিতরে যে এত 'জিলাপীর পাক (বা প্যাঁচ) আছে, এ তো আমি আগে জানতামই না।

ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো—(ইশারায় বা ঠেস দিয়া তিরস্কার করা)—প্রতিবেশী রমেন্দ্রনাথের পুত্র নষ্টচন্দ্র-উপলক্ষে অপরের বাগান হইতে যে-তরিতরকারী চুরি করিয়াছিল, তাহার জন্য নগেন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্রকে শাসাইয়া দেওয়ায় 'ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো' ব্যাপারটিই যেন ঘটিল। **ঝোপ বুঝে কোপ মারা**—(অবস্থা বুঝিয়া তাহার সুযোগ গ্রহণ করা)—গত য়ুরোপীয় মহাসমরের ফলে ব্রিটিশ রাজশক্তি হীনবল হইয়া পড়িলে গান্ধী-জিন্না 'ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া' স্বাধীন ভারতবর্ষ ও স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টি করিলেন।

টইটম্বুর—(জলে ভরপুর)—বর্ষাকালে নদী খাল বিল এমন কি প্রান্তরভূমিও জলে 'টইটম্বুর' হইয়া পড়ে। **টনক নড়া**—(সজ্ঞান হওয়া)—শ্রমিকেরা ধর্মঘট সুরু করিয়াছে, অথচ এখনও কর্তৃপক্ষদের 'টনক নড়ে' নাই। **টাকার কুমীর**—(প্রচুর টাকার মালিক)—বারোয়ারী পূজা-সমিতিতে 'টাকার কুমীর'কে সভাপতি করিলে সব দিক দিয়া সুরাহা হয়।

ডান হাতের ব্যাপার (বা কাণ্ড বা কাজ)—(আহার)—অনেক রাত হওয়ায় আমরা তাড়াতাড়ি 'ডান হাতের ব্যাপারটি (বা কাণ্ডটি বা কাজটি)' সারিয়া লইলাম। **ডামাডোলের বাজার**—(গোলযোগের অবস্থা)—এই 'ডামাডোলের বাজারে' ছেলেপিলে লইয়া মহাচিন্তায় পড়িয়াছি। **ডালভাঙা ক্রোশ**—(অতি দীর্ঘ পথ) —সেই ভোরে রওনা দিয়া, এখনও ষ্টেশনে পৌঁছাইতে না পারায় বুঝিতে পারিতেছি যে, 'ডালভাঙা ক্রোশে'র পাল্লায় আমি পড়িয়াছি। **ডুবে ডুবে জল খাওয়া**—(অন্যের অগোচরে কোন গোপনীয় কু-কর্ম করা)—ছাত্রজীবনে অভিভাবকের অজ্ঞাতসারে প্রতিদিন সিনেমা দেখে যেভাবে 'ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ', তার পরিণাম আদৌ ভাল নয়। **ডুমুরের ফুল**—(কচিৎদৃষ্ট সামগ্রী)—টাকা ধার করিবার পর হইতেই বন্ধুটি 'ডুমুরের ফুল' হইয়া পড়িল।

ঢলাঢলি—(পরস্পরের কেলেংকারি)—সহশিক্ষা যদি তরুণ-তরুণীর 'ঢলাঢলিই' সৃষ্টি করে, তবে তাহা অবশ্য পরিত্যাজ্য। **ঢাক ঢাক গুড় গুড়**—(কপটতা)—যাহা বলিব স্পষ্ট কথা, আমার কাছে 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' নাই। **ঢাকের বাঁয়া**—(অকেজো)—আসলে বড় দা'ই সব করেছেন, মেজ দা' তো 'ঢাকের বাঁয়া'। **ঢিমে তেতালা, গদাইলস্করী চাল**—(খুবই মৃদুগতি)—'ঢিমে তেতালায় (বা গদাইলস্করী চালে)' চলিলে আজ আর সাত মাইল পথ অতিক্রম করা যাইবে না।

তামার বিষ—(ধনের বিষময় প্রভাব)—'তামার বিষে' অভিভূত ব্যক্তির হৃদয়ে মনুষ্যত্ব স্থান পায় না। **তালকানা**—(মাত্রাজ্ঞানহীন)—তুমি এমনই 'তালকানা' লোক যে, ট্যাঁকে চাবির গোছা থাকিতেও এখানে-সেখানে উহা খুঁজিয়া মরিতেছ। **তালপাতার সেপাই**—(অতি কৃশকায়)—সে 'তালপাতার সেপাই' হইলেও, তাহার গায়ে বেশ জোর আছে। **তাসের ঘর**—(কর্মানুষ্ঠানে বা পরিকল্পনায় ভংগুরত্ব)—'তাসের ঘরে'র ন্যায় এই জীবন মৃত্যুর স্পর্শমাত্রেই পরিসমাপ্ত হয়। **তিলকে তাল করা**—(তুচ্ছকে অতিরঞ্জন-দ্বারা বড করিয়া তোলে—এমন এক জাতের লোক এই পৃথিবীতে আছে, যাহাদের স্বভাবই হইতেছে 'তিলকে তাল করা'। **তীর্থের কাক**—(সাগ্রহ প্রতীক্ষাকারী, লোভী ব্যক্তি)—তেত্রিশ বৎসর বয়স অবধি 'তীর্থের কাকে'র ন্যায় পিতার অর্থোপার্জনের উপর নির্ভর করিয়াই যদি পুত্রকে দিনাতিপাত করিতে হয় তো সে নিজে রোজগার করিবে কবে? **তুলসীবনের কাক**—(বাহিরে আচারনিষ্ঠাসম্পন্ন, কিন্তু অন্তরে পশুবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি)—তিলককণ্ঠীধারী বৈষ্ণব হইলেই যে 'তুলসীবনের বাঘ' হইবে না, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। **তেলে-বেগুনে জলা**—(উত্তেজিত অথবা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হওয়ার ভাব)—বিত্তহীন প্রজার ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র পাঠ করিবামাত্র ঐশ্বর্যশালী জমিদার 'তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া' উঠিলেন।

থ হ'য়ে (বা খেয়ে, মেরে) যাওয়া, থতমত খাওয়া—(কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া)—ঐটুকু মেয়ের কথা শুনে আমি 'থ হয়ে (বা খেয়ে, মেরে) বা থতমত খেয়ে' গেলাম। **থ (বা থৈ) পাওয়া**—(তল পাওয়া, সীমা পাওয়া)—সারা দিনরাত খাটিয়াও কাজের 'থ (বা থৈ) পাইতেছি' না। **থাবাথুবি দিয়ে রাখা**—(পিঠ চাপড়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখা)—রোরুদ্যমান শিশুটিকে মাতা 'থাবাথুবি দিয়ে রাখলেন'।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার—(বিশৃংখল কাণ্ড)—দুই দল ছাত্রের দলাদলি শেষ অবধি হৈ-চৈ এবং মারামারির মধ্য দিয়া 'দক্ষযজ্ঞের ব্যাপারে' পরিণত হইল। **দশচক্রে ভগবান ভূত**—(সংস্কৃতে একটি প্রবাদ আছে, 'চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যা ন সেব্যঃ

.কবলং নৃপঃ। আহা চক্রস্য মাহাত্ম্যং ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥' 'ভালই হউক আর মন্দই হউক, কেহ দশজনের ষড়যন্ত্রে নির্যাতিত হইলে' এই উক্তিটি ব্যবহৃত হয়।) —যেমন 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হইয়াছিলেন সেইরূপ প্রতিভাবান ব্যক্তিও অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে বাতুলরূপে পরিগণিত হন। **দহরম-মহরম**—(মাখামাখি বন্ধুত্ব)—প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সংগে জ্ঞানদা'র যখন 'দহরম-মহরম' আছে, তখন তোমার একটা ভাল চাকুরী অবশ্যই হইবে। **দাঁও মারা**—(লাভ করা)—পুত্রের বিবাহে হরিচরণ বাবু টাকা-পয়সায় সোনাদানায় মোটা 'দাঁও মারিয়াছেন'। **দাঁতে কুটো কাটা**—(অতীব বিনীত হওয়া)—দুর্ধর্ষ ব্যক্তিও বেকায়দায় প'ড়লে 'দাঁতে কুটো কাটে'। **দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা**—(বিনাশের হেতুস্বরূপ খল বা শত্রুকে যত্ন করিয়া পালন করা)—যাহার অভাবের সময়ে ধনসম্পত্তি দিয়া আমি রক্ষা করিয়াছিলাম, সে-ই আজ আমার ক্ষতি করিতে অগ্রসর হওয়ায় প্রকৃতই বুঝিতেছি যে, এতদিন আমি 'দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষিয়াছি'। **দু-কানকাটা**—(অতুলনীয় বেহায়া)—প্রথমে সে গোপনেই মদ্যপান করিত, কিন্তু একবার মাতলামির জন্য জেল খাটিবার ফলে এখন সে সর্বসমক্ষেই মদ খাইয়া একেবারে 'দু-কানকাটা' হইয়াছে। **দু'-মুখো সাপ**—(যাহার মুখ দিয়া দুই রূপ বা বিপরীত কথা বাহির হয়)—রমেন যখন এর কথা ওর কাছে এবং ওর কথা এর কাছে লাগায়, তখন তাকে 'দু'-মুখো সাপ' অনায়াসেই বলা যায়। **দোহারা**—(স্থূল ও কৃশের মধ্যবর্তী)—'দোহারা' চেহারার মেয়েই দেখিতে ভাল।

ধরাকে সরাজ্ঞান করা—(সমগ্র পৃথিবীকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা)—সাধারণত, হাভাতের বেটা টাকার একটু মুখ দেখিলেই 'ধরাকে সরাজ্ঞান করে'। **ধরি মাছ না ছুঁই পানি**—(কিছুমাত্র বেগ না পাইতে হয় এমন কৌশলে কার্য সিদ্ধ করা)—বিশ্বরূপা রংগমঞ্চে যাঁহারাই 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' বুঝিয়া কাজ করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারাই শেষ অবধি টিকিয়া থাকিবেন। **ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির**—(মূলে 'আদর্শ সত্যবাদী' অর্থ থাকিলেও এক্ষণে 'ঘোর মিথ্যাবাদী' অর্থে বিদ্রূপোক্তি করা হয়)—বিপদে পড়িবে, অথচ এই ছোট্ট কথাটিকে একটু ঘুরাইয়া বলিতে পারিবে না—কি 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরই'-না তুমি হইয়াছ! **ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, ধর্মের ঢাক আপনি বাজে**—(পাপ কদাপি প্রচ্ছন্ন থাকে না)—পুলিশ-সাহেবের ঘুষ খাইবার কথা যখন প্রকাশিত হইল, তখন শহরের অনেক লোকই বলিতে লাগিল, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে (বা ধর্মের ঢাক আপনি বাজে)'।

ননীর পুতুল—(কোমলদেহ ব্যক্তি)—'ননীর পুতুল' হইলে রোদে দাঁড়াইয়া

কষ্টসাধ্য কাজ করা যায় না। **নয়-ছয়**—(ছড়াছড়ি)—খাটের উপরে জামাকাপড়-গুলা 'নয়-ছয়' হয়ে পড়ে রয়েছে। **নাই দেওয়া**—(অত্যধিক আদর দেওয়া)—কুকুরকে 'নাই দিতে' নাই! **নাকে তেল দিয়া ঘুমোনো**—(নির্ভাবনায় সময় কাটানো)—পরীক্ষার আর দেরি নাই, অথচ বীণাপাণি রাতে তো বটেই, এমন কি দিনেও 'নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছে'। **নিজের কোলে ঝোল টানা**—(স্বার্থপর হওয়া)—সার্থক জনসেবার ক্ষেত্রে 'নিজের কোলে ঝোল টানিতে' নাই। **নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভংগ**—(নিজের ক্ষতি করিয়া পরকে জব্দ করা)—আজিকার যুদ্ধনীতিতে যে পোড়া-মাটি রীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভংগ' করারই সামিল। **নিস্‌পিস্ করা**—(উস্‌খুস্ করা)—ছাত্রটিকে মারিবার জন্য পণ্ডিতমহাশয়ের হাত 'নিস্‌পিস্ করিতেছে'। **নেই-আকড়া**—(নাছোড়বান্দা)—যা' ধরবে তাই চাই, এমন 'নেই-আকড়া' ছেলেও তো কখনও দেখি নাই। **নেক নজরে পড়া**—(সুদৃষ্টিতে পড়া)—আফিসের বড় সাহেবের 'নেক নজরে পড়িতে' পারিলে তুমি অবশ্যই বড় বাবু হইতে পারিবে।

পগার পার—(ধৃত হইবার সম্ভাবনা অতিক্রম করিয়া পলায়ন)—খুনী এতক্ষণে 'পগার পার' হইয়াছে, পুলিশে আর তাহাকে ধরিতে পারিবে না। **পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা**—(পরকে দিয়া নিজের কাজ হাসিল করা)—নিজে উপার্জন না করিয়া আজীবন সে 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া' খাইয়া আসিয়াছে। **পরের মুখে ঝাল খাওয়া**—(নিজে ব্যক্তিগত ভাবে না বুঝিয়া পরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন)—'পরের মুখে ঝাল খাওয়া' যাহাদের অভ্যাস, তাহারা প্রতি পদে প্রতারিত হয়। **পাত্‌তাড়ি গুটানো**—(দ্রব্যসামগ্রী গুছাইয়া বাঁধা ও তোলা)—বিবাহ-শেষে বরযাত্রীরা 'পাত্‌তাড়ি গুটাইয়া' স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। **পাথরে পাঁচ কিল**—(অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকিলে কপাল ভাঙিবার প্রয়াস বৃথা ; কারণ, উহা পাথরের ন্যায় মজবুত)—চোরা-কারবার করিয়া হরেনের এখন 'পাথরে পাঁচ কিল' বলিয়াই তো যেখানে ছুঁচ না চলে, সেখানে সে বেটে চালায়। **পায়া ভারি**—(অহংকার, গুমর, মুরুব্বির জোর)—বড চাকুরী পাইয়া তাহার 'পায়া ভারি' হইয়াছে। বড় কাকা আপিসের বড় সাহেব—এই 'পায়া ভারি' থাকায় এত শীঘ্র তাহার উন্নতি হইয়াছে। **পুঁটি মাছের প্রাণ**—(ক্ষীণপ্রাণ)—ভারতবাসীদের যে 'পুঁটিমাছের প্রাণ' নয়, তাহা ইংরাজকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া তাহারা সপ্রমাণিত করিয়াছে। **পুকুর চুরি**—(কোন দ্রব্য বা বিষয় সমূলে ফাঁকি দেওয়া)—ব্যাংকের কোষাধ্যক্ষ এমন করিয়াই পুকুর চুরি করিল যে, লালবাতি জ্বালানো ছাড়া ব্যাংকের আর কোন গতি রহিল না। **পেঁজ-পয়জার দুইই হইল**—(পেটও ভরিল না, পৃষ্ঠেও সহিতে হইল)—মামলা-

মকদ্দমায় টাকার শ্রাদ্ধ ও জমিজমা বেদখলি হওয়ায় আমার 'পেঁজ-পয়জার দুইই হইল'। **পেট-ভাতা**—(উদরপূরণ মাত্র)—মাস-মাহিনায় নয়. 'পেট-ভাতায়' পূর্ববংগীয় একজন শরণার্থীকে এই দোকানে কাজ দেওয়া হইয়াছে। **পোয়া বারো**—(সর্ববিষয়ে প্রতুল)—গৃহিণী বাপের বাড়িতে গিয়াছেন বলিয়া ঝি-চাকরের 'পোয়া বারো' হইযাছে।

ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়—(ভিতরে যাহার কিছু নাই, তাহার বাহিবের শব্দ কিছু বেশি রকম)—ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও, ইংরাজি বুলি আওড়াইতে সে বেশ দড়—কারণ, 'ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়'। **ফুটো পয়সার লড়াই**—(অর্থহীন বিবাদ)—সামান্য বিষয় নিয়ে তোমাদের উভয়ের মধ্যে এই যে কথা কাটাকাটি, এ তো 'ফুটো পয়সার লড়াই'য়ের সামিল। **ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই, ভাজে ঝিঙে ত বলে পটোল**—(প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া মান রাখিবার জন্য মিথ্যাচার)—সংসারে এমন এক জাতেব কপটাচারী নিঃস্ব লোকসম্প্রদায় আছে যাহারা 'ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই (বা ভাজে ঝিঙে ত বলে পটোল)'। **ফোঁড়ন দেওয়া**—(উত্তেজনামূলক টিপ্পনী দেওয়া)—দুই ভায়ের ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে আমি 'ফোড়ন দিতে' চাই না। **ফোপোল-দালালী**—(উপর-পড়া হইয়া মধ্যস্থগিরি)—আমাদের আলাপ-অলোচনার মধ্যে তোমার আর 'ফোপোল-দালালী' করতে হবে না।

বকধার্মিক—(বাহিবে বৈরাগী, অথচ অন্তরে পাপাচারী)—অনেক 'বক-ধার্মিক'ই গংগায় পুণ্যস্নান করিবার সময় নানাবিধ পাপচিন্তা করিয়া থাকে। **বড় মাছের কাঁটাও ভাল**—(মহৎ ব্যক্তির তুচ্ছ কথাও মূল্যবান)—পরহিতৈষী জমিদার রাধামাধব তাঁহার এই দুর্দিনেও যে উপদেশ দান করেন, তাহা শুনিলে মনে হয় যে, 'বড় মাছের কাঁটাও ভাল'। **বড় মুখ**—(আস্ফালন)—'বড মুখ' করিয়া আসিয়াছিলে, কিন্তু এক্ষণে সরিযা পড়িতেছ কেন? **বর্ণচোরা আঁব (বা আম)**—(কপটী ব্যক্তি)—নির্বাচনকালে 'বর্ণচোরা আঁব (বা আম)'কে চিনিতে না পারিলে অবশ্যই প্রতারিত হইতে হইবে। **বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো**—(কঠিন সতর্কতা-সত্ত্বেও অসাবধানতা)—পিতা পুত্রকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিলেও, সিনেমা দেখিতে আপত্তি করিতেন না—এই 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'ই পুত্রের শোচনীয় পরিণতির কারণ। **বাগে পাওয়া**—(আয়ত্ত করা)—তাকে একবার 'বাগে পেলে' উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেব। **বাড়া ভাতে ছাই, পাকা ধানে মই**—(ফললাভের সময় বিঘ্ন)—আমি তাহার 'বাড়া ভাতে ছাই' দিতে যাই নাই, অথচ সে আমার 'পাকা ধানে মই' দিয়াছে। **বানরের গলায় মুক্তা-হার**—(অপাত্রে উৎকৃষ্ট সামগ্রী দান)—বেলার মত ডানা-কাটা পরীর বিয়ে হ'ল কিনা হাড়-হাবাতে সমরেন্দ্রনাথের সংগে—এ যেন

"বানরের গলায় মুক্তা-হার'! **বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো**—(ভবঘুরে অনাদৃত ব্যক্তি)—কে বলিতে পারে যে, এই 'বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো' ছেলেই একদিন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না! **বামন হয়ে চাঁদে হাত**—(অসম্ভব আশা)—সুশিক্ষিতা রূপবতী অলকাকে বিবাহ করিবার আশা পোষণ করিয়া তুমি 'বামন হ'য়ে চাঁদে হাত' বাড়াইতেছ। **বিনা মেঘে বজ্রাঘাত**—(আকস্মিক বিপৎপাত)—কায়েদে আজম জিন্নার আকস্মিক মৃত্যু 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে'র ন্যায় পাকিস্তানীদের প্রাণে শোকের শাওন ঘনাইয়া তুলিয়াছিল। **বিশবাঁও জলে**—(কার্যসিদ্ধির অসম্ভাব্যতা)—খুনী ব'লে যখন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তখন তোমার উদ্ধারলাভের আশা এখন 'বিশবাঁও জলে'। **বুদ্ধির ঢেঁকি**—(নিরেট বোকা)—বিদ্যুৎকুমারের পুত্র সুকুমার যেরূপ 'বুদ্ধির ঢেঁকি' তাতে করে তার পক্ষে এ ব্যবসায় চালানোই দুষ্কর। **বেগার ঠেলা**—(অযত্নের সংগে কাজ করা)—ফর্মা-পিছু যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণালাভে যাঁরা বোধিনী লেখেন, তাঁরা 'বেগার ঠেলে' থাকেন। **বাঁ হাতের ব্যাপার**—(ঘুষ)—আমাদের আপিসের বড়বাবু 'বাঁ হাতের ব্যাপার' করিয়াই বালিগঞ্জে একটি বড় বাড়ি ফঁদিয়াছেন। **বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা**—(যে বিষয়ে একবার লিপ্ত হইলে নানা বিপদে বা ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হয়)—আয়কর আইনের আওতায় একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই—একেবারে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'য়ের সামিল। **বাঘের আড়ি**—(না-ছোড়বান্দা শত্রুর শত্রুতা)—সে এমনই মামলাবাজ যে, সর্বস্ব হারাইয়াও রমাকান্তের বিরুদ্ধে 'বাঘের আড়ি' পাতিয়াছে। **বাঘের দুধ**—(দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী)—টাকা থাকিলে কলিকাতায় 'বাঘের দুধ' মেলে। **বাঘের মাসী হওয়া**—(নির্ভীক হওয়া)—নীলিমা বাপের বাড়িতে আসিয়া 'বাঘের মাসী' হইয়াছে। **বারো ভূত**—(অনাদরে বহুব্যক্তি-বোধক)—প্রৌঢ় পার্বতীনাথের পুত্রসন্তান হওয়ায় 'বারো ভূতে' আর তাঁহার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার সুযোগ পাইল না। **বালির বাঁধ**—(ক্ষণস্থায়ী)—শিবাজি ভেদবৈষম্য-মূলক ধর্মসমাজকে লইয়া সারা ভারতবর্ষে জয়ী হইবার চেষ্টা করিয়া 'বালির বাঁধ'ই বাঁধিয়াছিলেন। **বিড়ালতপস্বী**—(বাহিরে তপস্বীর আকার, কিন্তু অন্তরে কামক্রোধাদির বশীভূত; ভণ্ড তপস্বী)—অসৎকর্মে রত পিতার নীতি-উপদেশ শুনিলেও পুত্র তাঁহাকে 'বিড়ালতপস্বী' জ্ঞান করিয়া উপহাস করিবে। **বিদুরের ক্ষুদ**—(শ্রদ্ধাপূর্ণ সামান্য দান)—আপনার ন্যায় মহাশয় ব্যক্তি যদি আমার ন্যায় দীনদরিদ্রের গৃহে পদার্পণ করিয়া 'বিদুরের ক্ষুদ' গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত তৃপ্তি পাইব। **বিনা মেঘে জল**—(বিনা কারণেই কার্যের উৎপত্তি)—নূতন কেরাণীবাবু আপিসে প্রথম দিন যাইবামাত্রই বড়সাহেবের সুনজরে পড়িয়া

যাওয়ায় 'বিনা মেঘে জল' যেন বর্ষিত হইল। **বিন্দুবিসর্গ**—(সামান্য কিছু)—গত রজনীতে এত বড় কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল, অথচ তাহার 'বিন্দুবিসর্গ'ও আমি জানি না। **বিসমিল্লায় (বা গোড়ায়) গলদ**—(কোন কাজের শুরুতেই ত্রুটি)—'বিসমিল্লায় (বা গোড়ায় গলদ)' থাকিলে বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ রচনা করা আদৌ সম্ভব নয়। **বেঙের আধুলি**—(সামান্য ধনগর্বে গর্বিত ব্যক্তির ধন)—অক্ষক্রীড়ায় মাত্র পাঁচ শত টাকার বাজী জিতিয়া তাহার যে পরিমাণ বাবুগিরি বাড়িয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, সে 'বেঙের আধুলি' পাইয়াছে। **বেঙের সর্দি**—(অসম্ভাব্য ঘটনা)—হাজতেই যাহার যৌবনকাল কাটিয়া গিয়াছে, আবার হাজতবাস কি তাহার কাছে 'বেঙের সর্দি'? **বুক দশ হাত হওয়া**—(আনন্দে ও উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ ও প্রসারিত হওয়া)—এবারকার আই. এ. পরীক্ষায় পুত্র উদয়ন সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় পিতা পার্বতীনাথের 'বুক দশ হাত হইল'। **বুকের পাটা**—(সাহসের সীমা ; সাহস)—দশ বছরের ছেলের এমনই 'বুকের পাটা' যে সে একাকী অমাবস্যার রাতে গ্রামের একান্তে অবস্থিত শ্মশানে অনায়াসে উপনীত হইল। **বোঝার উপর শাকের আঁটি**—(অনেক-কিছুর উপরে অল্প-কিছু চাপানো)—নিমন্ত্রণ-বাড়িতে প্রকাশবাবু সত্তরটি রসগোল্লা খাইবার পরেও পঁচিশটি পানিতোয়া খাইয়া 'বোঝার উপরে শাকের আঁটি'ই যেন রক্ষা করিলেন!

ভরা-ডুবির মুষ্টিলাভ—(সর্বস্ব হারাইয়া সামান্য কিছু থাকা)—জমিদারের সহিত মামলায় হারিয়া সমগ্র বিষয়-আশয় যাইবার পরে এই বাস্তুভিটাটুকুই এক্ষণে 'ভরা-ডুবির মুষ্টিলাভ' হিসাবে রহিয়াছে। **ভস্মে ঘি ঢালা**—(যথাসময়ে কাজ না করিয়া, কাজ নষ্ট হইয়া গেলে তাহার জন্য পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করা কিংবা পরিশ্রম বা অর্থব্যয় ব্যর্থ হওয়া)—সারা বৎসর না পড়িয়া, পরীক্ষার পূর্বরাত্রে মাত্র পড়িয়া তুমি 'ভস্মে ঘি ঢালিতেছ'। **ভাঁড়ে মা ভবানী**—(ভাণ্ডারশূন্য)—ছাত্রটির বেশভূষার চাকচিক্য, অথচ মনের ভাণ্ডারে বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই—একেবারে 'ভাঁড়ে মা ভবানী'। **ভাইয়ের ভাত ভাজের হাত**—(যে স্ত্রীলোক ভ্রাতৃগৃহে বাস করে, সে ভ্রাতার অন্ন তো খায়ই, ভ্রাতৃজায়ারও কর্তৃত্ব সহ্য করে)—রমা আজ বিধবা অসহায় বলিয়া তাহার অদৃষ্টে 'ভায়ের ভাত ভাজের হাত'—দুইই জুটিতেছে। **ভাগের মা গংগা পায় না**—(ভাগাভাগির কাজে কাহারও আন্তরিকতা না থাকায় কাজ সুসিদ্ধ হয় না)—পাঁচ শরীকের জমিদারীতে কেহই লাটের খাজনা দিতে চায় না—এ যেন 'ভাগের মা গংগা পায় না'। **ভালুক-জ্বর**—(ক্ষণিক কম্পজ্বর, ক্ষণস্থায়ী জ্বর)—ম্যালেরিয়া-রোগী গফুর তাহার 'ভালুক-জ্বর' ছাড়িয়া যাইবামাত্রই ভাত খাইতে বসিল। **ভিজা বিড়াল** (কপটাচারী)—তাহার ন্যায় 'ভিজা বিড়াল'কে শায়েস্তা করা আমার

কর্ম নয়। **ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া**—(প্রতিশোধপরায়ণ জনমণ্ডলীর ক্রোধ উদ্রেক বা উত্তেজিত করা)—প্রচলিত জনমতের বিরোধী হওয়া আর 'ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া' একই কথা। **ভুঁই-ফোড়**—(নূতন অভ্যুদিত, অর্বাচীন)—সংগীতশাস্ত্রের অ-আ-ক-খ না শিখিয়াই নির্মলকুমার 'ভুঁইফোড়' ওস্তাদ বনিয়া গিয়াছে। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—(অপরিমেয় অপব্যয়)—অলিম্পিক-প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়েরা সরকারের টাকায় 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' করিয়াছে। **ভূতের বেগার**—(লভ্যহীন কঠোর পরিশ্রমসাধ্য কার্য)—যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার বিনিময়ে দীনদরিদ্র শিক্ষকসমাজ পুস্তক-প্রকাশকদিগকে যে গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহা মূলত 'ভূতের বেগার' খাটা ছাড়া আর কিছুই নয়। **ভুষণ্ডী কাক**—(অলস ব্যক্তি)—জগতের অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য তোমার এই যে নৈষ্কর্ম্য, ইহা 'ভুষণ্ডী কাকে'রই কথা মনে করাইয়া দেয়। **ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা**—(বিপদের প্রতিকার-চেষ্টা নাই, অথচ কোলাহল-সৃষ্টি)—সাপকে না মারিয়া এই যে চীৎকার, ইহা 'ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা'রই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মগের মুল্লুক—(অরাজক দেশ)—আমাদের এই দেশ 'মগের মুল্লুক' নয় যে, পাঁচ টাকা দামের সামগ্রী বিশ টাকায় বিক্রীত হইবে। **মণিকাঞ্চন-যোগ**—(স্বর্ণের সহিত মণির সংযোগের ন্যায় শোভন ও সংগত)—গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের সংগে আমেরিকার মিতালি 'মণিকাঞ্চন-যোগে'র ন্যায় হইয়াছিল। **মশা মারতে কামান দাগা (বা পাতা)**—('সামান্য কার্যে বৃহৎ আয়োজন করা'—এই উপহাস-ব্যঞ্জক অর্থে ব্যবহৃত হয়)—একটি ছিঁচকে চোরকে গ্রেপ্তার করবার জন্য গোটা সৈন্যবাহিনীর তলব হওয়ায় মনে হচ্ছে, এ যেন 'মশা মারতে কামান দাগারই (বা পাতারই)' সামিল। **মাকাল ফল**—(অন্তঃসারহীন ব্যক্তি)—পদ্মলোচন দেখিতেই সুন্দর, কিন্তু আকাট মূর্খ—ঠিক যেন 'মাকাল ফল'। **মাছের মার পুত্রশোক**—(অর্থহীন বেদনাবোধ)—চোরাবাজারের কৃপায় লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া যে কয়েকশত টাকা লোকসান দিয়াছে, তাহার অর্থশোক 'মাছের মার পুত্রশোকে'র সহিত তুলনীয়। **মাটির মানুষ**—(অতীব নিরীহ বেচারী)—হরিশবাবু অত্যন্ত ভদ্র, সত্যই 'মাটির মানুষ'। **মাঠে মারা যাওয়া**—(দেখাশোনা করিবার লোক নাই, এমন স্থানে দস্যু কর্তৃক নিহত হওয়া; এমনভাবে বিনষ্ট হওয়া যে তাহার কোন খোঁজ-খবর হয় না)—হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় পরীক্ষার্থী নরেনের সকল পরিশ্রম 'মাঠে মারা যাইবে' বলিয়াই মনে হয়। **মাণিক-জোড়**—('অভিন্নহৃদয় বন্ধুদ্বয়' অর্থে শব্দটি সাধারণ ব্যংগ-বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়)—পড়াশুনায় হেলাফেলা করিয়া ও খেলাধুলায় মাতোয়ারা হইয়া হরেন ও নরেন, এই দুটিতে যেন 'মাণিক-জোড়' হইয়াছে।

মাৎস্য ন্যায়—(বড়ো মাছ যেমন ছোটো মাছকে গ্রাস করে, সেইরূপ বলবান কর্তৃক দুর্বলকে নাশ করা অর্থাৎ অরাজকতা)—অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে 'মাৎস্য ন্যায়' সূচিত হইয়াছিল। **মাথার মণি, মাথার ঠাকুর**—(পরম শ্রদ্ধেয় বা ভক্তিভাজন)—স্বামী বিবেকানন্দ শুধু বাঙালী জাতির কেন, নিখিল বিশ্ববাসীর 'মাথার মণি (বা মাথার ঠাকুর)'। **মাথা নাই তার মাথা ব্যথা**—(কারণ অভাবে কার্যের কল্পনা, যাহা অকারণ ও উপহাস্যজনক)—তোমার এক কপর্দকের সংস্থান নাই, অথচ লক্ষ টাকার ব্যবসায় ফাঁদিবার এই যে সংকল্প, ইহা 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা'ই সামিল। **মাথা হেঁট করা**—(বশ্যতা স্বীকার করা)—যতই মারধোর করা যাক না কেন, উদ্ধত সন্তান কিছুতেই পিতার নিকট 'মাথা হেঁট করে' না। **মান্ধাতার আমল**—(অতি প্রাচীন কাল)—আমাদের দেশের চাষীরা 'মান্ধাতার আমলে'র সেই চাষ-পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়া থাকে। **মায়ের দয়া**—(মা শীতলার কৃপা অর্থাৎ বসন্তরোগ)—হরেনবাবুর গাত্রে 'মায়ের দয়া' বাহির হইয়াছে। **মিছরির ছুরি**—(অন্তরে মিষ্ট, অথচ বাহিরে বেদনাদায়ক)—'যেন জন্মান্তরে সুখী হই'—গোবিন্দলালের প্রতি মুমূর্ষু ভ্রমরের এই যে উক্তি, ইহাতে প্রেমের কোমলতা ও পুণ্যের কঠোরতা উভয়ই আছে—এ যেন 'মিছুরির ছুরি'। **মুখপাত্র**—(অগ্রণী, প্রধান)—হরেনকে আমাদের দলের 'মুখপাত্র' হিসাবে গণ্য করিয়া কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিলাম। **মুখে ফুল-চন্দন পড়া**—(শুভ সংবাদ শুনিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন)—পরীক্ষায় পাশ হইবার সংবাদ যখন আনিয়াছ, তখন তোমার 'মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক'। **মুসকিল আসান**—(বিপদের শান্তি ; আপদ নিবারণ)—বাত্যা-বিক্ষুব্ধ নদীবক্ষে মাঝিমাল্লারা শেষ অবধি পাঁচ পীরের নাম স্মরণ করিয়া 'মুসকিল আসান' করিবার প্রয়াস পাইল। **মেনিমুখো**—(সলজ্জ)—বিপিন এমনই 'মেনিমুখো' ছেলে যে সাহস করিয়া আপন মনের কথা সে কাহাকেও বলিতে পারে না। **ম্যাও ধরা**—(ঝক্কি পোয়ানো)—দিবারাত্র এত পরিশ্রম করবার দরুণ অসুখ হ'লে, শেষে 'ম্যাও ধ'রবে' কে ?

যখের বা যক্ষের ধন—(অতিশয় কৃপণের ধন)—মৃত্যুকাল অবধি জয়রাম আজীবন সঞ্চিত পাঁচ হাজার টাকা 'যখের বা যক্ষের ধনের' ন্যায় আগলাইয়া রাখিয়া ছিল। **যত গর্জে তত বর্ষে না**—(মুখে দড়, কিন্তু কাজে বড়ো নয়)—আপিসের বড় বাবুটি সাধারণ কেরাণীদিগকে খুবই শাসায়, কিন্তু আর্থিক ক্ষতি করে না দেখিয়া-মনে হয় যে, সে 'যত গর্জে তত বর্ষে না'। **যমের অরুচি, যমের ভুল**—('যাহার মৃত্যু নাই' এই ব্যংগার্থে)—ও-পাড়ার দুষ্টশিরোমণি বিনোদ বুঝিবা 'যমের অরুচি (বা যমের ভুল)'।

রণচটা—(কোপন-স্বভাব)—'রণচটা' ব্যক্তির সংগে নরম মেজাজে কথা কহিলে সুফল ফলে। **রক্তের টান**—(স্ববংশীয়ের প্রতি মমতা)—রক্তের টান' আছে বলিয়াই বিবাদ-বিসংবাদের পরেও আবার দুই ভাই মিলিয়াছে। **রাঘব বোয়াল**—(অতীব লোভী)—পুলিশের চাকুরীতে এমন অনেক 'রাঘব বোয়াল' আছেন, যাঁহারা যথেষ্ট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। **রাজযোটক**—(শুভ ফল-দায়ক মিলন)—গত সার্বিক যুদ্ধে ইংরাজশক্তির সংগে মার্কিনশক্তির সংযোগসাধনে যেন 'রাজযোটক' দেখা দিয়াছিল। **রাজা-উজীর মারা**—(লম্বা-চওড়া কথা বলা)—বেকার ব্যক্তি ঘরে বসিয়া যখন 'রাজা-উজীর মারিতে' থাকে, তখন তাহা শুনিয়া কৌতুক অনুভব করা যায়। **রাবণের চিতা**—(চির অশান্তি)—একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বিধবার অন্তরে যে 'রাবণের চিতা' জ্বলিতেছে, কোনদিনই তাহা নিবিবে না। **রাসভারী**—(গম্ভীরপ্রকৃতি)—সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্ব-চন্দ্র এমন 'রাসভারী' ব্যক্তি ছিলেন যে ছাত্রগণ কেন, অধ্যাপকেরাও তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে সাহসী হইতেন না। **রাহুর দশা**—(অতীব দুঃসময়)—'রাহুর দশায়' পড়িলে মানুষকে নাস্তানাবুদ হইতে হয়। **রুই-কাৎলা**—(নেতৃস্থানীয়)—কংগ্রেসের চুনোপুটি নয়, 'রুই-কাৎলা'রাই ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করিতেছেন।

লক্ষ্মীর বরযাত্রী, সুখের পায়রা, দুখের মাছি—(সুসময়ের বন্ধু, কিন্তু অসময়ের কেহ নয়)—ধনীর দুলালের হাতে যে কয়দিন ধনরত্ন থাকে, সেই কয়দিনই তোষামোদকারীরা 'লক্ষ্মীর বরযাত্রীর (বা সুখের পায়রার, দুখের মাছির') ন্যায় তাহার সংগে সংগে ঘুরিয়া থাকে। **লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগে**—(সংগতি-শালিনী রমণীর অভাব-জ্ঞাপক)—দশ-বিশটি বাড়ির অধিকারিণী হইয়া মেনকা যখন তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিতে থাকে, তখন মনে হয়, সত্যই বুঝিবা 'লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগে'। [**মন্তব্য :** 'লক্ষ্মীর মা' কথাটি প্রচলিত নয়, 'লক্ষ্মীর পুত' কথাটিই প্রচলিত।] **লগন-চাঁদ**—(ভাগ্যবান)—সাধনকুমার লগন-চাঁদ ছেলে বলিয়াই তো তাহার জন্মগ্রহণের সংগে সংগেই পিতা পার্বতীনাথ তিন হাজার টাকা পাইয়াছেন। **লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না**—(পদাঘাতের যোগ্য ব্যক্তি চড় খাইয়া কাজ দেয় না, অর্থাৎ লঘু শাসন মানে না)—'লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না'—এই কথাটি যে ব্যক্তি জানে, সে মিষ্টি কথায় নয়, প্রচণ্ড প্রহারে দুষ্ট জনকে শায়েস্তা করিবে। **লেফাফা-দুরস্ত**—(বাহিরের আচরণে দক্ষ, কিন্তু প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে বিপরীত)—হিতেন্দ্রনাথ এমন 'লেফাফা-দুরস্ত' যে, তাহার চালচলনে দারিদ্র্যের ক্ষীণ রেখাও ফুটিয়া ওঠে না।

শকুনিমামা—(অনিষ্টকারী ব্যক্তি)—গ্রামের বহুলোকের অনিষ্ট সাধন করিয়া যতীনবাবু সত্যই যে 'শকুনিমামা' তাহা সপ্রমাণিত করিলেন। **শনির দৃষ্টি**—(ধনক্ষয়ী ও সর্বনাশকর দৃষ্টি)—মাসখানেকের ভিতরেই তাঁহার পুত্রবিয়োগ ও চাকুরীতে জবাব ঘটায় বুঝিতে পারিতেছি যে, তাঁহার উপরে এক্ষণে 'শনির দৃষ্টি' পড়িয়াছে। **শাঁখের করাত, জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ, দোটানায় পড়া**—(উভয় সংকট)—বিদেশস্থিত মৃত্যুপথযাত্রী প্রিয়জনকে না দেখিলে প্রাণ বাঁচে না, আবার দেখিতে গেলেও এখানকার চাকুরী যায়—এ যেন 'শাঁখের করাত (বা জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ, দোটানায় পড়া)'। **শাক দিয়ে মাছ ঢাকা**—(গুরুতর কলংক সামান্য উপায়ে বা সহজে ঢাকিবার প্রচেষ্টা)—প্রচুর উৎকোচ খাইয়া বাড়িখানি হাল ফ্যাসানের আসবাবপত্রে সাজাইয়াছ অথচ বলিয়া বেড়াইতেছ যে, এসবই তোমার কোন বন্ধুর দান—এ যেন তুমি 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকিতেছ'! **শাপে বর**—(অকল্যাণের মধ্যে কল্যাণ)—নূতন ট্রামরাস্তা বাহির করিবার দরুণ আমার পুরাতন বাড়ি ধূলিসাৎ হইল সত্য, কিন্তু উহার তিনগুণ দাম পাওয়ায় আমার 'শাপে বর'ও হইল। **শিয়ালের যুক্তি** (অর্থহীন নিষ্ক্রিয় পরামর্শ)—তোমাদের এই নিত্যকার শলাপরামর্শ 'শিয়ালের যুক্তি' ছাড়া আর কিছু নয়। **শিরে সংক্রান্তি**—(আসন্ন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা)—কালবৈশাখীর মেঘে সমস্ত আকাশকে আচ্ছন্ন হইতে দেখিয়াও, তিনি 'শিরে সংক্রান্তি' রাখিয়া সুপরিসর নদীটি পার হইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন। **শূন্যে সৌধ নির্মাণ**—(অলীক কল্পনা)—যৌবনে যে সব সোনালী স্বপ্ন রচনা করিয়াছিলাম, আজ এই পরিণত বয়সে দেখিতে পাইতেছি যে, সে সমস্তই 'শূন্যে সৌধ-নির্মাণ'ই বটে!

ষণ্ডামর্ক—(একগুঁয়ে ও বলিষ্ঠ)—যতীন্দ্রনাথ এই পাড়ার 'ষণ্ডামর্ক' ছেলেদের লইয়া একটি ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। **ষাঁড়ের গোবর**—(অপদার্থ ব্যক্তি)—লেখাপড়া না শিখিলে পরিণামে 'ষাঁড়ের গোবর' হইতে হয়। **ষাটের (বা ষেটের) কোলে**—(ষষ্ঠীদেবীর কৃপারূপ অংকে)—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে 'ষাটের (বা ষেটের) কোলে' আমার নন্তু এই পনেরোয় পা দিয়েছে। **ষোল আনা**—(পুরাপুরি ; সম্পূর্ণ)—'ষোল আনা' মন দিয়া কাজ না করিলে কার্যসিদ্ধি হয় না। **ষোল কড়াই কাণা**—(সব ফাঁকি বা অসার)—বীরেনের হাবভাব কথাবার্তা চালচলন দেখিয়া মনে হয় যে, তাহার স্বভাবের 'ষোল কড়াই কাণা'। **ষোল কলায়**—(পুরাপুরি)—পুত্র শমীন্দ্রনাথ পিতা বীরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি একবারে 'ষোল কলায়' পাইয়াছে।

সবে ধন নীলমণি, শিবরাত্তিরের স'লতে—(জনক-জননীর একমাত্র

বংশধর)—সাধারণত বাপ-মায়ে তাহাদের 'সবে ধন নীলমণি (বা শিবরাত্রিরের স'লতে)' পুত্রকে নাই দিয়া তাহার পরকাল ঝরঝরে করিয়া থাকে। **সরফরাজি করা**—(মনে মনে বিরূপ, কিন্তু বাহিরে মিত্রতা)—আদালতে সেদিন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে এসে আজ তো বেশ 'সরফরাজি ক'রছ'! **স-সে-মি-রা অবস্থা**—(বাহ্যজ্ঞানশূন্য দশা)—একদা সে তাহার এক উপকারী বন্ধুর সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল বলিয়াই আজ বিধির বিধানে সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া 'স সে-মি-রা অবস্থা'য় কালাতিপাত করিতেছে। **সাক্ষীগোপাল**—(কর্তৃত্বশূন্য কর্তা)—প্রদেশের শাসন ব্যাপারে রাজ্যপালের কোন অধিকার না থাকায় তিনি নিছক 'সাক্ষীগোপাল'ই। **সাত খুন মাপ**—(গুরুতর অপরাধেও অব্যাহতিলাভ)—আপিসের বড় সাহেব তাহার বড় কুটুম্ব বলিয়া বিভাসের 'সাত খুন মাপ'। **সাত-সতের**—(নানান্)—প্রশ্নের উত্তর সোজা ভাবে না দিয়া 'সাত-সতেরো' ভাবে দিতেছ কেন? **সাপ হয়ে কামড়ানো রোজা হয়ে ঝাড়া**—(একই সময়ে শত্রুতা-সাধন ও মিত্রতা-প্রদর্শন)—হরিপ্রিয় মামলা বাধাইতেও যেমন ওস্তাদ, আপোষ করিতেও তেমনি নিপুণ বলিয়াই তো লোকে বলে যে, সে 'সাপ হয়ে কামড়ায়, রোজা হয়ে ঝাড়ে'। **সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে**—(বিনা ক্ষতিতে কার্যসিদ্ধি, দুই দিক বজায় রাখা)—ধরা পড়িয়া চাকুরী হারাইবে না, অথচ আপিসের গোপন তথ্যাদি বাহির করিতে পারিবে, তবেই তো 'সাপও মরে, লাঠি না ভাঙে'। **সাপের ছুঁচো গেলা**—(নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া কোন কাজ করা)—তিনশত পৃষ্ঠার বই ছাপিতে গিয়া শেষ অবধি তেরোশত পৃষ্ঠার বই ছাপিতে বাধ্য হইয়া পুস্তক-প্রকাশক মহাশয় 'সাপের ছুঁচো গেলা'র ন্যায় কাজ করিলেন। **সাপের পাঁচ পা দেখা**—(যাহা হয় না, গর্বান্ধ হইয়া তাহারই সম্ভাবনা দেখা)—ধনবান্ ব্যক্তিটির পুত্রাদি বর্তমানে তাঁহার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া রমেন 'সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছে'! **সুখে থাকিতে ভূতে কিলায়**—(স্বেচ্ছায় দুঃখবরণকারী)—'সুখে থাকিতে ভূতে কিলাইতেছে' বলিয়াই তিনি সরকারী চাকুরী ছাড়িয়াছেন। **'সুশীতল বারি নিক্ষেপ'**—(প্রশমন করা)—তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে আমি মিষ্টবাক্যরূপ 'সুশীতল বারি নিক্ষেপ' করলাম। **সোনা বাহির আঁচলে গেরো**—(মূল্যবান জিনিষ ফেলিয়া মূল্যহীন জিনিষের সমাদর)—মানসম্মান বিসর্জন দিয়া তুচ্ছ প্রাণের প্রতি এই যে মমতা, ইহা 'সোনা বাহির আঁচলে গেরো'রই সামিল। **সোনায় সোহাগা, চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা**—(দুইটি বিষয় বা বস্তুর সংস্পর্শ-জনিত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ-বোধক)—(ক) পৈত্রিক সম্পত্তি তো সে পাইলই, তদুপরি মাতুলের বিষয়-আশয়ও লাভ করিল—এ যেন 'সোনায় সোহাগা (বা চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা)'। (খ) চোরে তো তাহার সর্বনাশ করিলই, অধিকন্ত

বাটপাড়ের উপদ্রবে সে আরও উৎপীড়িত হইল—এ যেন 'সোনায় সোহাগা (ব চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা)'। **স্বখাত সলিল**—(নিজ হাতে খনিত)—ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে অতি সত্বর বৃহৎ করিতে গিয়া তিনি 'স্বখাত সলিলে' ডুবিয়া মরিলেন।

হ-য-ব-র-ল—(বিশৃংখলা)—এক আরিস্ততলকে রাজনীতি, দর্শনশাস্ত্র, ডাক্তারী-শাস্ত্রের উপরে লিখিতে দেখিয়া আমাদের মনে এই কথাই জাগে যে, তখনকার বিদ্যাগুলি 'হ-য-ব-র-ল' হইয়া একত্রে ঠাসাঠাসি করিয়া থাকিত। **হরিষে বিষাদ**—(আনন্দ বিষাদে পরিণত বা হর্ষশোকের মিশ্রণ)—বাংলায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়া পাশ করিবার খবর আসিবার পর পরই অসুস্থ ভূধর মৃত্যুপথযাত্রী হওয়ায় সমগ্র পরিবারে 'হরিষে বিষাদ' উপস্থিত হইল। **হস্তামলক**—(করায়ত্ত সামগ্রী) —লেখাপড়া না ক'রলে পরীক্ষায় পাশের ব্যাপারটি ঠিক 'হস্তামলক' হয়ে উঠবে না। **হাড়হদ্দ**—(নাড়ীনক্ষত্র)—জগন্নাথ আমাকে যতই জব্দ করিবার জন্য চেষ্টা করুক না কেন, আমি তাহার 'হাড়হদ্দ' জানি। **হাড় হাবাতে**—(হতভাগ্য)—উচ্চবংশের ছেলে হইলেও ঐ 'হাড়-হাবাতে'র সংগে তুমি একেবারে মিশিবে না। **হাড়ে দূর্বা গজানো**—(অতীব কুঁড়ের লক্ষণ)—কোন কাজকর্ম না করিয়া রাতদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে হাড়ে দূর্বা গজাইয়াছ'। **হাড়ির হাল**—(মলিন)—রোদ-বৃষ্টিতে কাজ করিতে করিতে তোমার চেহারাটি 'হাড়ির হাল' করিয়া তুলিয়াছ। **হাড়ে হাড়ে চেনা**—(মর্মান্তিক রূপে পরিচয় পাওয়া)—সেই নির্মম সুদখোর ব্যক্তিকে সর্বহারা জয়গোপাল 'হাড়ে হাড়ে চিনিয়াছে'। **হাত ধুইয়া বসা**—(একবারে নির্লিপ্ত হওয়া)—এই বৃদ্ধ বয়সে সংসার হইতে যখন 'হাত ধুইয়া বসিয়াছি', তখন আর আমায় সাংসারিক ক্রিয়াকাণ্ডে জড়াইও না। **হাতে মাথা কাটা**—(ঘোরতর অত্যাচার করা)—তাঁহার ন্যায় অহংকারী ব্যক্তি যদি এই আপিসের বড় বাবু হন, তাহা হইলে তিনি অধীনস্থ কর্মচারীদের 'হাতে মাথা কাটিবেন'। **হাতের পাঁচ**—(অধিকারের নিবিড়তা)—'হাতের পাঁচ' চাকুরী তো আছেই, তাহার উপর এই ব্যবসায়—তবে আর ভয় কি? **হাত দিয়া হাতী ঠেলা**—(অসম্ভবকে সম্ভব করিতে যাওয়া)—'হাত দিয়া হাতী ঠেলিবার' মত দুরাশা আমার নাই। **হাত পা বাহির করা**—(কল্পনাযোগে প্রকৃত বিষয়কে অতিরঞ্জিত করা)—মূল ঘটনাটির 'হাত পা বাহির করিয়াই' দেখিতেছি। **হাতে পাঁজি মংগলবার**—(জানিবার সুযোগ থাকিতে বৃথা তর্ক)—শব্দটির অর্থ লইয়া অত আলোচনা না করিয়া 'হাতে পাঁজি মংগলবার' ঐ অভিধানটি দেখিলেই তো চলে। **হাতের জল না গলা**—(কৃপণতা করা)—যাহার 'হাতে জল গলে না' এমন লোকের নিকট হইতে পাঁচ টাকা চাঁদা আদায় করিয়াছ? **হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা**—(উপস্থিত সুযোগ ত্যাগ

না করা)—আজ সরকারী চাকুরী করিতে অস্বীকার করিয়া 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছ', কিন্তু একদিন ইহার জন্য পস্তাইবে। **হাত ঝাড়া দিলে পর্বত**—(ধনাধিক্যের চিহ্ন)—ব্যাংক হইতে টাকা তুলিবার প্রয়োজন নাই, তোমার কাছে যাহা আছে, তাহাই 'হাত ঝাড়া দিলে পর্বত' হইবে। **হাতে-খড়ি**—(শিক্ষারম্ভ)—আগামী সোমবার দেবাশীষের 'হাতে-খড়ি' হইবে। **হাত-ধরা**—(বশীভূত)—আপিসের বড় সাহেব আমার 'হাত-ধরা' লোক হওয়ায় ছোট ভাইয়ের চাকুরি হইয়াছে। **হাত-টান**—(চৌর্যবৃত্তি)—সুলেখক মণিবাবুর 'হাত-টান' থাকায় তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা সর্বদাই তটস্থ থাকেন। **হাটে হাঁড়ি ভাঙা**—(গোপন তথ্য প্রকাশ করা)—মন্ত্রীমহাশয়ের সম্পর্কে 'হাটে হাঁড়ি ভাঙিলে'ও তিনি নির্বিকারই থাকিবেন **হাল ছাড়া**—(হতাশ হওয়া)—ভোট-গণনার সময়ে যখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাঁচ হাজার ভোটে অগ্রগামী হইতে দেখিলাম, তখনই আমি জয়লাভের ব্যাপারে 'হাল ছাড়িয়া' দিলাম। **হালে পানি পাওয়া**—(কোনরূপে সফল হওয়া)—সারা দুই বছর ধরিয়া যথানিয়মে না পড়িলে পরীক্ষাকালে 'হালে পানি পাওয়া' যায় না।

অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি প্রয়োগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্য রচনা কর :—চিনির বলদ ; কূপমণ্ডূক ; ডুমুরের ফুল ; পুকুর চুরি ; মণিকাঞ্চনযোগ সাপে-নেউলে ; অরণ্যে রোদন , বিড়াল-তপস্বী ; তাসের ঘর ; উত্তমমধ্যম ; অন্ধের যষ্ঠি ; সোনায় সোহাগা ; হাতের পাঁচ ; শাঁখের করাত ; মিছরির ছুরি ; আকাশ-কুসুম , ব্যাঙের আধুলি , রাজযোটক ; শিবে সংক্রান্তি , বিসমিল্লায় গলদ , তীর্থের কাক . গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ; ছেলের হাতের মোয়া ; আঠারো মাসে বছর ; দশচক্রে ভগবান ভূত ; সাপের পাঁচ পা ; কালনেমির লংকাভাগ ; বোঝার উপরে শাকের আঁটি , সুখের পায়রা , বিনা মেঘে জল , বালির বাঁধ , অমাবস্যার চাঁদ , তুলসীবনের বাঘ , গায়ে কাঁটা দেওয়া ; হাড়ে হাড়ে চেনা , অর্ধচন্দ্র দান ; ভিজা বিড়াল , 'সুশীতল বারি-নিক্ষেপ' , তালপাতার সেপাই , চক্ষে সরিষা ফুল দেখা , মাথা হেঁট করা ; মুখে ফুলচন্দন পড়া , হাত ধুইয়া বসা , ডালভাঙা ক্রোশ , কলুর বলদ ; বাঘের দুধ ; যখের ধন , বিদুরের খুদ ; রাবণের চিতা , জলাঞ্জলি দেওয়া ; হাতে-খড়ি , মশা মারতে কামান দাগা ; হাটে হাঁড়ি ভাঙা , মাঠে মারা যাওয়া।

ক. বি. মাধ্যমিক '৩৪, '৩৯, '৪১, '৪২, '৪৩, (অভি) '৪৯, '৫২, (বিকল্প)'৫৩

[দুই] প্রত্যেকটির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া অর্থোপযোগী এক একটি বাক্য গঠন কর :—সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে ; বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো ; এক মাঘে শীত যায়

ন, আক্কেলসেলামী, আদায় কাঁচকলায়, মুখ বক্ষা, হাতে মাথা কাটা, মুখ চুন, মুখে কালি, চোখের বালি; ঢলাঢলি; চোখ ফোটা, একচোখো; কেঁচে গণ্ডূষ করা; খুড়িয়ে বড় হওয়া; নিজের কোলে ঝোল টানা, শিয়ালের যুক্তি, ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো; সাপ হয়ে কামড়ানো, রোজা হয়ে ঝাড়া; সাপের ছুঁচো গেলা, ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা; স্বখাত সলিল; গৌরচন্দ্রিকা, চিত্রগুপ্তের খতিয়ান; কাক-ভূষণ্ডী, হস্তামলক; শাঁখের করাত; দক্ষযজ্ঞ; মুসকিল আসান; আকাশ থেকে পড়া; হাসের ঘর; চিনির বলদ, কাষ্ঠ হাসি। ক. বি. বি. এ '৪৪,'৪৫,'৪৬,'৪৮,'৫২,'৫৭

[তিন] নিম্নলিখিত যে কোনও পাঁচটি বাক্যাংশের অর্থ লিখ ও উদাহরণ-স্বরূপ বাক্য রচনা কর:—ভূঁই-ফোড়; অন্ধের নড়ি, ষাঁড়ের গোবর, দাকুমড়া, তেলে-বেগুনে; মাথার মণি, ছেলের হাতের মোয়া, সুখের পায়রা, তিলকে তাল; কাঁঠালের আমসত্ত্ব; ভস্মে ঘি ঢালা, ইঁচড়ে পাকা, বালির বাঁধ, আকাশকুসুম; মুখপাত্র, মাথা খাওয়া; যক্ষের ধন; মান্ধাতার আমল; মাটির মানুষ, মাৎস্যন্যায়; গোবরে পদ্মফুল, অমাবস্যার চাঁদ, মিছরির ছুরি, বাগে পাওয়া; চোখের মাথা খাওয়া; হাল ছাড়া; বুকের পাটা, তালকানা, বিড়ালতপস্বী; অকালকুষ্মাণ্ড।

ঢা. বি. মাধ্যমিক'৫০,'৫৬,'৫৭

[চার] যে কোনও পাঁচটি বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের পৃথক্ পৃথক্ অর্থপূর্ণ বাক্য রচনা কর:—ষোল আনা, বুক দশ হাত, ধরাকে সরা-জ্ঞান, কড়ায় গণ্ডায়, আক্কেল-সেলামী; ঘোড়ার ডিম; ছাই ফেলিতে ভাঙা কুলা, হাতের পাঁচ, গোবরে পদ্মফুল; ...মের অরুচি; মায়ের দয়া। গৌ. বি. বি. এ '৫১

[পাঁচ] যে কোনও পাঁচটি লইয়া স্বতন্ত্রভাবে পাঁচটি বাক্য রচনা কর:—কাঁচা হাত; মুখ চুন, ব্যাঙের সর্দি, বগচটা; হাতের পাঁচ, সাত-সতেরো, বড় মুখ; একচোখো; ধরি মাছ না ছুঁই পানি; জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ, ডুবে ডুবে জল খাওয়া, ভাইয়ের ভাত ভাজের হাত, ষাঁড়ের গোবর, ছেলের হাতের মোয়া; বর্ণচোরা আঁব; বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো, অন্ধের নড়ি; অকাল কুষ্মাণ্ড; গোবরে পদ্মফুল, বালির বাঁধ, কালনেমির লংকাভাগ; বিড়ালতপস্বী; মিছরির ছুরি; আক্কেলসেলামী; কল্কে পাওয়া; বিস্‌মিল্লায় গলদ; হ-য-ব র-ল; ডান হাতের কাজ, নেক নজরে পড়া, ফুটো পয়সার লড়াই; আমড়া গাছের ঢেঁকি, দহরম-মহরম; কাঁঠালের আমসত্ত্ব। রা. বি. মাধ্যমিক '৫৪, '৫৫, '৫৬, '৫৭

[ছয়] নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যে কোন চারিটিকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের ভিতরে ভাষাপ্রয়োগের বিশিষ্ট রীতিগত (idiom) কোনও ত্রুটি লক্ষ্য করিলে তাহার

সংশোধন কর :—(৵০) দেখে শুনে মনে করেছিলুম লোকটা খুবই ধার্মিক, এখন দেখ্‌ছি বাঁশবনের বাঘ। (৶০) কত দেশ, কত তীর্থ ঘুরিলাম,—কিন্তু কই, হৃদয়ের মানুষ ত পাইলাম না! (৷৶০) তুমি যে ঘিয়ের পুতুল হে, এইটুকু রোদের তাপেই অস্থির! (।০) দেখ্‌লেই বেশ বোঝা যায়, এ অতি অপক্ক হাতের কাজ। (।৵০) প্রেমগংগা আজ এমন করিয়া উদ্বেল হইল কেন? (।৶০) এই সামান্য ব্যাপারটাকে তিনি অদ্ভুতভাবে বাড়িয়ে তুলেছেন, একেবারে যেন এইটুকু সরষেকে তাল ক'রে তোলা। (।৷৶০) তাঁর সব ছেলেই কৃতী : এক ছেলে সাহিত্যিক, এক ছেলে বড় চাকুরে, এক ছেলে বৈজ্ঞানিক—আকাশে যেন সূর্যের মেলা বসে গেছে। [উত্তর। (৵০) 'বাঁশবনের বাঘ' স্থলে হইবে 'তুলসীবনের বাঘ'। (৶০) 'হৃদয়ের মানুষ' স্থলে হইবে 'মনের মানুষ'। (৷৶০) 'ঘিয়ের পুতুল' স্থলে হইবে 'ননীর পুতুল'। (।০) 'অপক্ক হাতের' স্থলে হইবে 'কাঁচা হাতের'। (।৵০) 'প্রেমগংগা' স্থলে হইবে 'প্রেমযমুনা'। (।৶০) 'সরষেকে তাল' স্থলে হইবে 'তিলকে তাল'। (।৷৶০) 'সূর্যের মেলা' স্থলে হইবে 'চাঁদের হাট'। **ক. বি. মাধ্যমিক '৫৪**

[সাত] নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ ও প্রবচনগুলির বিকল্প বাগ্‌ধারা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাদের অর্থ নির্ণয় কর :—

অকাল কুষ্মাণ্ড; আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক, আমড়া কাঠের ঢেঁকি; এলোপাথাড়ি; সোনার পাথরের বাটি; কূপমণ্ডূক; লাল বাতি জ্বালানো, গোলেমালে চণ্ডীপাঠ, ঢিমে তেতালা; ধর্মের ঢাক আপনি বাজে; ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই, পাকা ধানে মই; গোড়ায় গলদ; মাথার মণি; যমের ভুল, দুধের মাছি; শাঁখের করাত, শিবরাত্তিরের স'লতে; সোনায় সোহাগা।

সপ্তম পর্ব

অলংকার-প্রকরণ

অলংকারশাস্ত্র ও অলংকার

ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় 'কাব্যালোকে' বলিয়াছেন,—"সংস্কৃত 'অলম্' শব্দের এক অর্থ 'ভূষণ'।' অতএব, অলম্ বা ভূষণ করা হয় যাহা দ্বারা, তাহাই 'অলংকার'। 'অলংকার' শব্দের ব্যাপক অর্থ তাই 'সৌন্দর্য' সংকীর্ণ অর্থ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি বিশিষ্ট অলংকার-বস্তু। 'অলংকার-শাস্ত্র'—এর প্রকৃত অর্থ 'সৌন্দর্য-শাস্ত্র' বা 'কাব্যসৌন্দর্য-বিজ্ঞান', ইংরাজিতে যাহাকে বলা যাইতে পারে *Aesthetic of Poetry*। কারণ, প্রাচীন আচার্যগণ বাস্তবিকই অলংকারশব্দ সৌন্দর্য-অর্থে গ্রহণ করিয়া কাব্যশাস্ত্র বা *Poetics*-এর তদ্রূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। 'অলংকার' শব্দ বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করিয়া অনুপ্রাস-উপমাদি, ইংরাজিতে যাহাদের বলে *figures of speech*, তাহাও তাঁহারা বুঝাইয়াছেন, এবং একটি পৃথক্ অধ্যায়ে উহার আলোচনা সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রাচীনদের আলোচনা হইতে মনে হয়, তাঁহারা সকলেই বিশিষ্ট অলংকারকে কাব্যের অনিত্য বা অস্থির ধর্ম মনে করিতেন, তাহা যেন কাব্যশরীরে আত্মভূত বা অংগভূতও নয়, তাহা শোভাবর্ধক কটককুণ্ডলাদির ন্যায় আরোপ্য বস্তু। এই ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিয়া অলংকারের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করেন ধ্বনিবাদিগণ ধ্বনিকার, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি।··

"আমাদের মনে হয় আসল ভ্রম হইয়াছে অলংকারকে শব্দার্থ হইতে একেবারে পৃথক্ করিয়া বিচার করায়। অলংকারের অলংকারত্ব শব্দার্থের সাধনে, শব্দার্থের উপাদানে। বস্তুত অলংকার যেখানে কাব্যের সৌন্দর্যজনক, সেখানে তাহা কাব্যের শরীর শব্দার্থেরই অভিন্ন রূপ মাত্র। সে রূপ বাদ দিয়া রসের প্রকাশ হয় না। অবশ্য স্বভাবোক্তিময় নিরলংকার কাব্য হইতে পারে, কিন্তু অলংকার থাকিলে ভাষা হইবে কাব্যের ভাষা বা বাচ্য, রূপেরও রূপ, কাব্যের অভিন্ন সত্তা; অন্তত উত্তম কাব্যে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে কাব্যের কাব্যত্ব থাকিবে না। অলংকার থাকিলে কাব্যের রূপই হইবে অলংকারময়, তাহা খসাইয়া লইলে কাব্যের রূপই হয় অন্তর্হিত, সে ক্ষেত্রে কাব্য হয় রূপহীন রসহীন তত্ত্ব বা তথ্যমাত্র। তাই শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্য ও অলংকারে কোন প্রভেদ নাই, কবির রসপ্রকাশের ভাষা, অর্থাৎ 'ভাবের রূপের মাঝারে অংগ' লাভই প্রকৃত অলংকার। এই কথাটিই ধ্বনিকার ও আনন্দবর্ধন সুন্দর ও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন।"

শব্দালংকার ও অর্থালংকার

ডক্টর দাশগুপ্ত 'কাব্যশ্রী'তে বলিয়াছেন—'শব্দের দুইটি অংশ—ধ্বনি (sound) ও অর্থ (sense)। 'ধ্বনি' হইতেছে 'সংকেত', 'অর্থ' হইতেছে 'সংকেতিত'। শব্দের সংকেতরূপ যে ধ্বনি তাহার আশ্রয়ে শব্দালংকার, আবার শব্দের সংকেতিত রূপ যে অর্থ, তাহার আশ্রয়ে হয় অর্থালংকার। শব্দ যেখানে সংকেত-সংকেতিত সম্পর্ক ছাড়াই কেবল ধ্বনিরূপ বা sound value দ্বারা অর্থকে ধ্বনিত বা আভাসিত করিতে পারে, সেখানেই খাঁটি শব্দালংকার। ইহাতেই কাব্যের সংগীতধর্ম পরিস্ফুট। বাঙালায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ধ্বন্যুক্তি ও অনুপ্রাস অলংকার দ্বারা।......অনুপ্রাসে বিভিন্ন শব্দের বর্ণসাম্যের ফলে ধ্বনিসাম্য এবং ধ্বনিসাম্য-দ্বারা অর্থ আভাসিত হয়। শব্দালংকারের আর একটি ভেদ আছে, তাহা ধ্বনিচাতুর্যমাত্র, তাহা কদাচ অর্থের ইংগিত বহন করে না। যমক, শ্লেষ প্রভৃতি অলংকার উহার অন্তর্গত।—ইহাতে (অতিশয়োক্তি ইত্যাদিতে) কাব্যের চিত্রধর্ম পরিস্ফুট। ইহার আশ্রয়ে ব্যঞ্জনার দ্বারা সূক্ষ্ম বিলাসও আস্বাদন করা যায়। বস্তুত অনুপ্রাস ও উপমা—ইহারাই শ্রেষ্ঠ কাব্যালংকার। অনুপ্রাস যেমন বর্ণসাম্য বা ধ্বনিসাম্য, উপমা সেইপ্রকার রূপসাম্য বা অর্থসাম্য। একের কারবার শব্দ-জগৎ ও সংগীত লইয়া, অপরের কারবার দৃশ্য-জগৎ ও চিত্র লইয়া।"

শব্দালংকার

শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ধ্বন্যুক্তি ও পুনরুক্তবদাভাস—এই পাঁচটিই প্রধান। শব্দালংকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, শব্দটির পরিবর্তন ঘটিলে অলংকারবিচ্যুতি হয়। পক্ষান্তরে, অর্থালংকারের ব্যাপারই এই যে, শব্দের যোগ্য প্রতিশব্দ দিতে পারিলে অলংকার-বিচ্যুতি আদৌ ঘটে না।

অনুপ্রাস

একই বর্ণ অথবা বর্ণসমষ্টি, যুক্তভাবে বা ছাড়াছাড়ি ভাবে, যখন বারবার ধ্বনিত হয়, তখন হয় অনুপ্রাস অলংকার। বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির অনুপ্রাস হইবার ক্ষেত্রে সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টির সংগে মিলিত স্বরধ্বনি যদি আলাদাও হয়, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি নাই : যেমন,—

> 'কুটিল কুন্তল কুসুম কাছনি কান্তি কুবলয় ভাসায়।
> কুঞ্চিতাধর কুমুদকৌমুদী কুন্দকোরক হাসায়॥' —গোবিন্দদাস।

—এখানে স্বরধ্বনির বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও অনুপ্রাস হইয়াছে। সাতটি ক-ধ্বনির সংগে মিলিয়াছে উ-ধ্বনি, দুইটি ক-ধ্বনির সংগে মিলিয়াছে আ-ধ্বনি, একটি ক-ধ্বনির সংগে মিলিয়াছে ঔ-ধ্বনি আর একটি ক-ধ্বনির সংগে মিলিয়াছে ও-ধ্বনি।

অনুপ্রাস হয় নানা রকমের। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, অনুপ্রাসের পাঁচটি রূপ : সরল অনুপ্রাস, গুচ্ছানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস বা একানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, মালানুপ্রাস।

(১) **সরল অনুপ্রাসে** প্রধানত একটি বর্ণই দুই বা ততোধিক বার ধ্বনিত হয় : যেমন—

(ক) 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে' —বঙ্কিমচন্দ্র।

(খ) 'দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিনী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী। —বঙ্কিমচন্দ্র।

(গ) 'একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে
নীরবে।' —মধুসূদন।

(২) **গুচ্ছানুপ্রাসে** ব্যঞ্জনবর্ণের গুচ্ছ বা সমষ্টি একই ক্রমে অনেকবার আবৃত্তি হয়। দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণের এই গুচ্ছ হয় যুক্তভাবে, নয় অযুক্তভাবে, ধ্বনিত হইয়া থাকে : যেমন,—

(ক) 'না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মত।' —রবীন্দ্রনাথ।

(খ) 'নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অংগ।' —গোবিন্দদাস।

(৩) **ছেকানুপ্রাসে** দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণের একই ক্রমে একবার মাত্র আবৃত্তি অর্থাৎ দুইবার ধ্বনিত হয়। এইজন্য ইহাকে ছেকানুপ্রাসও বলা হয় : যেমন,—

(ক) 'যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে।' —কৃষ্ণকমল।

(খ) 'কংগ্রেসের এবার **ভোল ফিরেছে** এবং সেই সংগে তাদের **বোল ফিরেছে**।' —প্রমথ চৌধুরী।

(গ) 'আর এক ফল আছে নাম **আনারস**,
নন্দন-কানন থেকে বুঝি **আনা রস**।' —রংগলাল।

(৪) **শ্রুত্যনুপ্রাসে** কণ্ঠ তালু প্রভৃতি একই স্থান হইতে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশ হয় : যেমন,—

'মোরে হেরি' প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইলা সম্মুখে।'—রবীন্দ্রনাথ।

—এই উদাহরণের মধ্য-পংক্তিতে দাঁতের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থাৎ দন্ত্য বর্ণাদির (যথা,—'ধ' 'ধ' 'দ' 'ন' 'দ' 'ন') ধ্বনির সমাবেশ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী।

(৫) **মালানুপ্রাসে** দুই বা ততোধিক অনুপ্রাস একই বাক্যে থাকিয়া বার বার ধ্বনির পরিবর্তন ও সামঞ্জস্য ঘটাইয়া থাকে : যেমন,—

(ক) 'শিশির-**কণায় মাণিক ঘনায়, দূর্বাদলে দীপ জ্বলে**।' —সত্যেন্দ্রনাথ।
—এখানে 'ক', 'ণ', 'দ' ও 'ল'—এই চারিটি বর্ণে অনুপ্রাসের মালা রচিত হইয়াছে।

(খ) **কুসুম-কুন্তলা মহী মুক্তামালা গলে**।' —মধুসূদন।
—এখানে 'ক', 'ম' ও 'ল'—এই তিনটি বর্ণে অনুপ্রাসের মালা গাঁথা হইয়াছে।

যমক

সমোচ্চার্য অথচ ভিন্নার্থবোধক শব্দের পুনরাবৃত্তিফলে যে সৌন্দর্য তথা কবিচাতুর্য দেখা দেয়, তাহাই যমক অলংকাব নামে অভিহিত। 'যমক' মানে 'যুগ্ম'; শব্দেব দুইবার প্রয়োগ হয় বলিয়া এই 'যমক' নাম : যেমন,—

(১) '**আনা**-দরে **আনা** যায় কত আনারস।' —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
—এখানে 'আনা' মানে 'চার পয়সা,' আবাব 'আনা' মানে 'কেনা'। পক্ষান্তরে, শেষের 'আনারস' শব্দটির সংগে যমক অলংকার হয় নাই, হইয়াছে অনুপ্রাস অলংকার। চরণের আদিতে এই যমকটি থাকায় ইহার নাম **আদ্যযমক**।

(২) 'আহা তায় **রোজ রোজ** কত **রোজ** ফুটে।' —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
—এখানে ফারসী 'রোজ' শব্দেব মানে 'দিন' এবং ইংরাজি 'রোজ' শব্দের মানে 'গোলাপ ফুল'। চরণেব মাঝে এই যমকটি থাকায় ইহাব নাম **মধ্যযমক**।

(৩) 'যত কাঁদে বাছা বলি **সর সর**,
আমি অভাগিনী বলি **সর্‌ সর্‌**।' —কৃষ্ণকমল।
—এখানে প্রথম 'সর' শব্দের মানে 'দুধের সর' এবং দ্বিতীয় 'সর্‌' শব্দের মানে 'সরিয়া যাও'। চরণের শেষে এই যমকটি থাকায় ইহার নাম **অন্ত্যযমক**।

যমকের রাজা ঈশ্বর গুপ্ত একই স্থানে পব পর আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিন প্রকার যমকই ব্যবহার করিয়াছেন : যেমন,—

'**অচল অচল** অতি, **পাষাণ পাষাণ** মতি,
কি হবে দুর্গার গতি, **যেতে নারি জেতে নারী** আমি হে!'

শ্লেষ

যখন কোন শব্দ একটিবার মাত্র প্রযুক্ত হইয়া বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় ও সৌন্দর্য তথা কবিচাতুর্য দেখা দেয়, তখনই হয় শ্লেষ অলংকার। শ্লেষ-অলংকারময় বাক্যের দুইটি অর্থই প্রাসংগিক বা বক্তার অভিপ্রেত। নানা জাতের শ্লেষ অলংকার থাকিলেও, বাংলা ভাষায় তাহাদের অনেকগুলিই অসম্ভব বলিয়া অভংগশ্লেষ ও সভংগশ্লেষ—এই দুই জাতের শ্লেষের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে।

(১) **অভংগশ্লেষে** শব্দকে না ভাঙিয়া অর্থাৎ পূর্ণরূপে রাখিয়াই দুই বা ততোধিক অর্থে প্রয়োগ করা হয় : যেমন,—

(ক) "পূজাশেষে কুমারী বল্‌লে, 'ঠাকুর, আমাকে একটি মনের মত বর দাও।'"

—শ. চ.

—এখানে 'বর' শব্দের দুইটি অর্থ :—(১) আশীর্বাদ ; (২) স্বামী।

(খ) 'কে বলে ঈশ্বর **গুপ্ত** ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ?' —গুপ্তকবি।

—এখানে গুপ্তকবি দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া চরণ দুইটি রচনা করিয়াছেন—প্রথমত, ভগবানের মহিমা-প্রকাশ ; দ্বিতীয়ত, নিজ মহিমা-প্রকাশ।

(গ) 'যে **রস** অনেক কাল থেকে **নিম্নস্তরে** ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'রস' শব্দটির দুইটি অর্থ :—(১) জল ; (২) আনন্দ। এবং 'নিম্নস্তরে' শব্দটির অর্থও দুইটি :—(১) ভূমধ্যের নিম্নস্তরে ; (২) সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীতে।

(ঘ) '**মধু**হীন করো না, গো, তব মনঃ-কোকনদে !' —মধুসূদন।

—এখানে 'মধু' শব্দের দুইটি অর্থ :—(১) মধুসূদন দত্ত ; (২) মকরন্দ।

(২) **সভংগশ্লেষে** মূল শব্দকে ভাঙিয়া বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায় এবং এই উদ্দেশ্য লইয়াই বক্তা শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। তবে, বাংলায় সভংগশ্লেষের ব্যবহার খুবই কম : যেমন,—

'অপরূপ রূপ **কেশবে**।
দেখ্‌রে তোরা এমন ধারা কালো রূপ কি আছে ভবে॥' —দাশরথি।

—এখানে 'কৃষ্ণ' সম্পর্কে অর্থটি খুবই স্পষ্ট। পক্ষান্তরে, 'কেশবে' শব্দটিকে ভাঙিয়া লিখিলে দাঁড়ায় এইরূপ :—'কে শবে' অর্থাৎ শবে বা শিবাকার শবের উপরে কে ? শব্দটি ভাঙিবার পরে 'কালী'-সম্পর্কিত অর্থটিই সুস্পষ্ট। এই শ্লেষাশ্রিত রচনায় শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বনিরসন করিয়া কৃষ্ণ-কালীর অভিন্নত্ব বুঝানো হইয়াছে।

বক্রোক্তি

কোন উক্তির যে অর্থটি বক্তার ঈপ্সিত, সেই অর্থটিকে না ধরিয়া শ্রোতা যদি তাহার অন্য অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বক্রোক্তি অলংকার হয়। বক্রোক্তি দুই জাতের—(১) **শ্লেষ-বক্রোক্তি** ; (২) **কাকু-বক্রোক্তি**।

(১) যে-বক্রোক্তিতে শ্লেষ মেশানো থাকে, তাহাই **শ্লেষ-বক্রোক্তি**। বক্তা যে অর্থে শব্দ প্রয়োগ করেন, প্রতিবক্তা তাহা অন্য অর্থে গ্রহণ করিলে এই অলংকার হয়। **শ্লেষ-বক্রোক্তি ও শ্লেষ-অলংকারের মধ্যে পার্থক্য** এই দিক দিয়া

যে, শ্লেষ-বক্রোক্তিতে বক্তা ও প্রতিবক্তা—দুইই থাকা চাই এবং দুইটি অর্থেরই প্রাসংগিকতা বা বাচ্যত্ব দুই দিক হইতে সমর্থনীয়। কিন্তু শ্লেষ-অলংকারে উভয় অর্থই একমাত্র বক্তারই অভিপ্রেত—ইহাতে উত্তর-প্রত্যুত্তর থাকে না। শ্লেষ-বক্রোক্তির উদাহরণ—

(ক) প্রশ্ন—'দ্বিজরাজ হ'য়ে কেন বারুণী সেবন ?'
উত্তর—'রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।'
প্রশ্ন—'বলি এত সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?'
উত্তর—'সুর না সেবিলে তার কিসে মুক্তি হয় —হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।

—এখানে প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় অনুসারে দ্বিজরাজে'র অর্থ 'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ', 'বারুণী'র অর্থ 'মদ্য', 'সুরাসক্তে'র অর্থ 'সুরায় বা মদে আসক্ত'। কিন্তু প্রত্যুত্তরকারী প্রশ্নকর্তার প্রশ্নকে এড়াইয়া যাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই প্রতিবক্তা 'দ্বিজরাজে'র অর্থ ধরিয়াছেন 'চন্দ্র', 'বারুণী'র অর্থ ধরিয়াছেন 'পশ্চিম দিক্', 'সুরাসক্তে'র অর্থ ধরিয়াছেন 'সুর বা দেবতায় আসক্ত'।

(খ) 'রাজা। তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। এ কী চীনা অক্ষরে লেখা নাকি ?

নটরাজ। বলতে পারেন অচিনা অক্ষরে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে উচ্চারণকালে 'চীনা' ও 'চিনা' একই রকমের। রাজা 'চীনা অক্ষর' বলিতে চীনদেশের লিপি বুঝাইয়াছেন, কিন্তু নটরাজ 'অ—চিনা অক্ষর' অর্থাৎ অক্ষরটি যে তাহার চেনা নয়, তাহাই জানাইয়া দিয়াছেন।

(গ) 'সভাকবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ অর্থের বড়ো টানাটানি।

নটরাজ। নইলে রাজদ্বারে আসব কোন্ দুঃখে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে সভাকবি 'অর্থ' শব্দটিতে 'অভিধেয়, তাৎপর্য' বুঝাইয়াছেন; কিন্তু নটরাজ সভাকবির অভিপ্রেত অর্থ না ধরিয়া 'টাকাকড়ি' মানে ধরিয়া লইয়াছেন।

(২) যে বক্রোক্তিটি বক্তার কণ্ঠের স্বরভংগীর (কাকুর) উপরে নির্ভর করে, তাহাই **কাকু-বক্রোক্তি**। কাকু-বক্রোক্তিতে কণ্ঠধ্বনির বিশেষ ভংগীর গুণে নিষেধ (অর্থাৎ Negation) বিধি (অর্থাৎ Affirmation-এ)-তে, আবার বিধি নিষেধে রূপান্তরিত হইয়া শ্রোতার দ্বারা গৃহীত হয়। এই অলংকার সম্বন্ধে Walker বলিয়াছেন—'The most powerful engine in the whole arsenal of oratory.' ইংরাজি অলংকারশাস্ত্রে এই অলংকারটির নাম 'Interrogation' বা 'Erotesis': যেমন,—

(ক) 'কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?' —মধুসূদন।

—বলা বাহুল্য, কেহই ছেঁড়ে না। 'পর্ণ' অর্থাৎ 'পাপড়ি'ই যখন পদ্মের পদ্মত্বের পরিচায়ক, ইহাই যখন পদ্মের সর্বস্ব, তখন এই সর্বস্ব হইতে পদ্মকে বঞ্চিত করিবার প্রয়াসী কেহই নাই—প্রশ্নবোধক চিহ্নের মধ্য দিয়া যে-জিজ্ঞাসাটি অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার ভিতরে এই অর্থটিই পাওয়া যাইতেছে। এই ভাষণটি সরমার ভাষণ—নিরাভরণা সীতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

(খ) 'গান্ধারী। আমি কি মা নহি? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নি কি তারে?' —রবীন্দ্রনাথ।

—বলা বাহুল্য, গান্ধারীই মা এবং গর্ভধারিণী মাই বটে। এই প্রশ্নবোধক কাকু বা কণ্ঠস্বর-দ্বারা গান্ধারীর অভিপ্রেত অর্থের দৃঢ়ীকরণই হইয়াছে।

(গ) 'সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, একথা অগ্রাহ্য। উর্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে-অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে না?' —কাদম্বরী।

—এখানে প্রশ্নবোধক কাকু বা কণ্ঠস্বর-দ্বারা বক্তার স-বিস্ময় আনন্দ প্রকাশিত।

(ঘ) 'যশোদা। প্রাণের গোপাল আমার,
এত দিনে এলি কি ঘরে?
মনে কি তোর আছে বাছা,
এ দুঃখিনী জননীরে?' —কৃষ্ণকমল।

—এখানে গোড়াকার বাক্যে স-বিস্ময় আনন্দ এবং শেষের বাক্যে দৃঢ়-স্থাপন প্রকাশ পাইয়াছে।

ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি

যদি বর্ণ শব্দ বা বাক্যের ধ্বনিরূপ দিয়া আমাদের কর্ণপরিতৃপ্তির সংগে সংগে চিত্তে অর্থ ব্যঞ্জিত হয়, স্পষ্ট অর্থবোধ হয়তো-বা পরেই ঘটে, তাহা হইলে ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি অলংকার হয়। ইহাতে বর্ণের পুনরাবৃত্তির বিশেষ প্রয়োজন নাই। ভাবানুকারী যে কোন রকমের উৎকৃষ্ট বর্ণের প্রয়োগ ঘটিলেই যথেষ্ট। ইংরাজিতে যাহাকে বলে 'sound echoing the sense', সেই ভাবদ্যোতক ধ্বনিই এই অলংকারের বিশিষ্ট সৌন্দর্য। তাই এই অলংকারকে ইংরাজি অলংকারশাস্ত্রমতে Onomatopoeia বলা যায়: যেমন,—

(ক) 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'ঐ' স্বরধ্বনির সাহায্যে ও ছন্দের পর্বধ্বনির সহায়তায় বর্ষার আগমন ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

(খ) 'শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের **গর্জন** ;
সিংহনাদ ; জলধির **কল্লোল** , দেখেছি
দ্রুত **ইরম্মদে**, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এহেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-**টংকার** ।' —মধুসূদন।

—এখানে 'গর্জন', 'সিংহনাদ', 'কল্লোল', 'ইরম্মদ' ও 'টংকার'—এই শব্দগুলি যথাক্রমে অভিপ্রেত অর্থ ব্যঞ্জিত করিয়াছে ; শব্দগুলি ভাবানুকারী সৌন্দর্য ফুটাইয়াছে।

(গ) 'এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজগর-গরজে সাগর ফুলিছে ,
এ নহে কুঞ্জকুন্দকুসুমরঞ্জিত
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে ।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে প্রথম-তৃতীয় চরণ দুইটিতে রোমান্টিক স্বপ্নাবেশ এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণ দুইটিতে নূতন মহাজীবনের আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে।

(ঘ) 'চর্‌কার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর।
ঘর ঘর ক্ষীর-সর,—আপ্‌নায় নির্ভর !' —সত্যেন্দ্রনাথ।

—এখানে চরকার ঘর্ঘরধ্বনির তালটি পরিস্ফুট।

(ঙ) 'নদীর জল, অবিরল চল চল, চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্তে ডাকিতেছে ।' —বঙ্কিমচন্দ্র।

—এখানে স্বাভাবিক চঞ্চল প্রবাহ হইতে শুরু করিয়া আবর্তে ডাক অবধি নদীজলের প্রতিটি অবস্থাই ধ্বনির মধ্য দিয়া ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

(চ) 'টং—টং—ভোঁ—ভস্‌
টু-ডাউন ছাড়ে, ব্যস্‌ !
ভস্‌ ভস্‌ ঢক্কোর,
চলে যায় টক্কোর !
ঘ্যেস্‌ ঘ্যেস্‌ ঘ্যেস্‌ ঘ্যেস্‌ ;
গদিটায় দিই ঠেস্‌ ।' —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

—এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ-দ্বারা রেলগাড়ীর স্টেশন-ত্যাগের চিত্র ফোটানো হইয়াছে।

পুনরুক্তবদাভাস

যদি কোন বাক্য শুনিবামাত্রই মনে হয় যে, একাধিক শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত কিন্তু অর্থবোধ হইবামাত্র ঐ ধারণা অপসৃত হয়, তাহা হইলে পুনরুক্তবদাভাস অলংকার হয় : যেমন,—

'কোথা আজি পঞ্চশর অনংগ মদন ?' —শ. চ.
—এখানে এই বাক্যটি শুনিলেই মনে হয়, 'পঞ্চশর' 'অনংগ' ও 'মদন' শব্দত্রয়ের অর্থ একই অর্থাৎ 'কন্দর্প'। কিন্তু ইহার অন্যবিধ অর্থ জানিবামাত্র ঐ ধারণা চলিয়া যায়। অর্থটি হইতেছে—শিবের ললাটের আগুনে ভস্মীভূত, তাই অংগহীন মদনকে ইহাই কবির জিজ্ঞাস্য যে, কোথায় আজ তাঁহার পাঁচখানি তীর ?

অর্থালংকার

ধ্বনির উপরে নয়, অর্থের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল অলংকারই অর্থালংকার। ইহার বিশেষত্ব এই যে, কোন শব্দকে বদলাইয়া তাহার প্রতিশব্দ দিলেও অর্থালংকার বজায় থাকে। অর্থালংকারগুলিকে মোটামুটি ভাবে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন,—(১) সাদৃশ্যমূল অলংকার—ইহার ভিতরে পড়ে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ভ্রান্তিমান্, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, সন্দেহ, উল্লেখ, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক ও সমাসোক্তি। (২) বিরোধমূল অলংকার—ইহার ভিতরে পড়ে বিরোধাভাস, বিষম, বিভাবনা, বিশেষোক্তি ও অসংগতি। (৩) শৃংখলামূল অলংকার—ইহার ভিতরে পড়ে কারণমালা, একাবলী, সার, আরোহ। (৪) ন্যায়মূল অলংকার—ইহার ভিতরে পড়ে অর্থান্তর-ন্যাস ও কাব্যলিংগ। (৫) গূঢ়ার্থমূল অলংকার—ইহার ভিতরে পড়ে ব্যাজস্তুতি ও স্বভাবোক্তি অলংকার। অর্থালংকারের এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলংকারিকেরা প্রায় একমত। কিন্তু মতদ্বৈধও আছে। প্রতীপ অলংকারটি কাহারও মতে সাদৃশ্যমূল, আবার কাহারও মতে ন্যায়মূল ; অপ্রস্তুত-প্রশংসা ও আক্ষেপ অলংকারদ্বয় কাহারও মতে গূঢ়ার্থমূল, আবার কাহারও মতে ন্যায়মূল। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি অর্থালংকার আছে : যেমন,—বিরোধমূল প্রতিবিন্যাস বা বিরুদ্ধবিন্যাস অলংকার, গূঢ়ার্থমূল কাব্যস্মৃতি অলংকার, ন্যায়মূল অর্থাপত্তি অলংকার। এই মুখ্য অলংকারগুলি ব্যতিরেকে কয়েকটি গৌণ অলংকারও আছে : যেমন,—সহোক্তি, দীপক, তুল্য-যোগিতা, পরিবৃত্তি, পর্যায়, ভাবিক ইত্যাদি।

উপমা

ভিন্ন জাতীয় বস্তু দুইটির মধ্যে পারস্পরিক বৈধর্ম্য থাকা সত্ত্বেও যদি তাহা অনুল্লিখিত থাকিয়া কেবলমাত্র প্রসংগোচিত সাধর্ম্যই হয় উল্লিখিত, তাহা হইলে এহেন সাদৃশ্য-কথনের দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়, তাহাকেই বলা হয় উপমা অলংকার : যেমন,—'তাঁহার দাঁত মুক্তার ন্যায় শুভ্র।'—এখানে 'দাঁত' ও 'মুক্তা' ভিন্ন জাতীয় বস্তু—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈধর্ম্য যে অনেকটা রহিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। তবে উভয়ের মধ্যে সাধর্ম্য রহিয়াছে সৌন্দর্যসূত্রে অর্থাৎ শুভ্রত্বের দিক দিয়া।

উপমার সংজ্ঞা ও তাহার উদাহরণ লক্ষ্য করিলে **উপমার চারিটি অংগ** আমাদের নজরে পড়ে :—প্রথমত, **উপমেয়** বা বর্ণনীয় বিষয়; দ্বিতীয়ত, **উপমান** বা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আকৃষ্ট বাহিরের বস্তু; তৃতীয়ত, **সাধারণ ধর্ম** অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের সাধর্ম্য; চতুর্থত, **সাদৃশ্যবাচক** তথা সাধর্ম্যবাচক **শব্দ**।

উপমা অলংকারের উল্লিখিত দৃষ্টান্তে 'দাঁত' **উপমেয়**। কেন না,—এই 'দাঁত' বস্তুটিকেই তুলনা করা যায় অর্থাৎ ইহাই উপমার বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইহাই তো 'প্রকৃত' বিষয় বা বর্ণনীয় বিষয় অথবা সোজা কথায় 'বিষয়' নামেও হয় অভিহিত। আবার 'মুক্তা' শব্দটি **উপমান**। 'মুক্তা' জিনিষটি বর্ণনীয় 'বিষয়' দাঁতেরই সাধর্ম্যসূত্রে আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট বাহিরের পদার্থ; ইহারই সহিত দাঁতের তুলনা দেওয়া হইতেছে। এই যে উপমান, ইহাকে 'অপ্রকৃত' বা 'বিষয়ী' নামেও অভিহিত করা হয়। 'শুভ্র' শব্দটি উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্মবোধক। অর্থাৎ এই ধর্মটি উপমেয় 'দাঁতে' ও উপমান 'মুক্তা'য় সমভাবে বিদ্যমান। এই সাধারণ ধর্মেরই বলে বাহিরের একটি বিশেষ বস্তু (যেমন,—মুক্তা) বর্ণনায় আক্ষিপ্ত হইয়া তুলনা সম্পন্ন করে। বলা বাহুল্য, এহেন **সাধারণ ধর্মই** উপমার বনিয়াদ। আর সাদৃশ্যজ্ঞাপক শব্দটি উপমেয় ও উপমানকে সাধর্ম্যসূত্রে একত্রগ্রথিত করে। 'যথা, যেমন, জনু, যেন, হেন, মত, মতন, তুল্য, সদৃশ, সম, সমান, ন্যায, নিভ, সংকাশ, প্রায় বা পারা, ভাতি, রীতি, প্রতিম' প্রভৃতি শব্দ বা 'বৎ, ক্যঙ্' প্রভৃতি প্রত্যয় **সাদৃশ্যবাচক**।

উপমা চার জাতের : যথা—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মহোপমা এবং মালোপমা। স্মরণ অলংকারকেও স্মরণোপমা হিসাবে ধরিয়া আর একটি শ্রেণীর উপমা অলংকার স্বীকার করা যাইতে পারে।

পূর্ণোপমায় উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবোধক শব্দ—উপমার এই চারটি অংগই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে : যেমন,—

(ক) 'আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে উপমেয়—'ছুরি', উপমান—'প্রভাতরশ্মি', সাধারণ ধর্ম—'তীক্ষ্ণদীপ্ত'; সাদৃশ্যবাচক শব্দ—'সম'।

(খ) 'পক্ষ্ম-অগ্রভাগে
দুলিল অশ্রুর বিন্দু, শিশির যেমতি
শিরীষকেশরে।' —মোহিতলাল।

—এখানে উপমেয়—'অশ্রুর বিন্দু'; উপমান—'শিশির'; সাধারণ ধর্ম—'দুলিল (তথা দোলন)'; সাদৃশ্যবাচক শব্দ—'যেমতি'।

(গ) 'বিদ্যুৎঝলা সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে।' —মধুসূদন।

—এখানে উপমেয়—'কলম্বকুল' (= শরগুলি); উপমান—'বিদ্যুৎঝলা'; সাধারণ ধর্ম—'চকমকি (তথা দীপ্তি)'; সাদৃশ্যবাচক শব্দ—'সম'।

লুপ্তোপমায় উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই তিনটির মধ্যে একটি, দুইটি অথবা তিনটি অংশই লুপ্ত অর্থাৎ উহ্য থাকে : যেমন,—

(ক) 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' —সঞ্জীবচন্দ্র।

—এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'যেমন' লুপ্ত রহিয়াছে।

(খ) 'চুল যার শাওনের মেঘ' —জীবনানন্দ।

—এখানে পূর্ণ বাক্যটি হইতেছে—'চুল যার শাওনের মেঘের মত কালো'। অর্থাৎ 'মত' এই সাদৃশ্যবাচক শব্দ এবং 'কালো' এই সাধারণ ধর্মটি লুপ্ত রহিয়াছে।

(গ) 'তিলেক না দেখি ও চাঁদবদন
মরমে মরিয়া থাকি।' —চণ্ডীদাস।

—এখানে উপমেয় 'বদন' ও উপমান 'চাঁদ' থাকিলেও সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত রহিয়াছে।

(ঘ) 'বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে উপমেয় 'বাসনা', উপমান 'মরীচিকা' ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'সম' থাকিলেও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত রহিয়াছে।

(ঙ) 'তড়িতবরণী হরিণ-নয়নী
দেখিনু আঙিনা-মাঝে।' —চণ্ডীদাস।

—এখানে উপমেয় 'তড়িতবরণী' 'হরিণ-নয়নী' তথা রাধা থাকিলেও উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ উহ্য রহিয়াছে।

স্মরণোপমায় কোন সামগ্রীর অনুভব হইতে তৎসদৃশ অন্য কোন সামগ্রীর স্মৃতি মনে জাগিয়া ওঠে : যেমন,—

(ক) 'কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি॥' —চণ্ডীদাস।

—এখানে 'জল', 'কেশ' ও 'অঞ্জন' দেখিয়া বর্ণসাদৃশ্যহেতু কালাকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে রাধার মনে হয়। উপমেয়—'কালা', উপমান—'জল', 'কেশ' ও 'অঞ্জন'; সাধারণ ধর্ম—'কাল'।

(খ) পাখী তোর আনচানানির চঞ্চলতার চমকানিতে,
কবেকার চোখ দুটি কা'র ডাক দিয়ে যায় হাতছানিতে!
সে ছিল তোর মতনই মনমোহিনী কৃষ্ণকলি!' —যতীন্দ্রমোহন।

—এখানেও স্মরণোপমা হইয়াছে।

মহোপমায় উপমেয়কে ছাড়িয়া আক্ষিপ্ত উপমানের শক্তি ও সৌন্দর্য বিশদভাবে বর্ণিত হইবার ফলে তাহা একটি প্রায় স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ চিত্রের আকার লইয়া থাকে, তাহা "স্বয়ং একটি সৌন্দর্যের নন্দন-কানন হইয়া দাঁড়ায়, পাঠক সে মুহূর্তে উপমেয়কে ভুলিয়া গিয়া উপমানের প্রতি বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। পোপ বলেন,—He makes no scruple to play with the circumstances." এই মহোপমাই **হোমরীয় উপমা** বা **এপিক উপমা**: যেমন,—

'কাঁদিলা মাধব-প্রিয়া! উল্লাসে শুষিলা—
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।' —মধুসূদন।

মালোপমায় একই উপমেয়কে কেন্দ্র করিয়া দুই বা ততোধিক উপমান কখনও-বা অভিন্ন, কখনও-বা বিভিন্ন সাধারণ ধর্ম লইয়া আক্ষিপ্ত হয় ও বিশিষ্ট সৌন্দর্য সৃষ্টি করে অর্থাৎ উপমার মালাই হইতেছে মালোপমা: যেমন,—

(ক) 'দেখি, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায় বিকটমূর্তি এক সেনাপতি-সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ ও কদাকার শবরসৈন্য আসিতেছে।' —কাদম্বরী।

—এখানে উপমেয় 'সেনাপতি' এবং উপমান 'কৃতান্তের সহোদর', 'পাপের সারথি' ও 'নরকের দ্বারপাল'। বলা বাহুল্য, সাধারণ ধর্মটি অভিন্ন।

(খ) 'এ কার প্রতাপ তুমি না জানহ সতী,
একা সিংহে নাহি পারে অজার সংহতি,
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে,
একা হনুমান যেন দহিলেক লংকা,
সেই মতে নৃপগণে নাশিব কি শংকা?' —কাশীরাম।

—এখানে উপমেয় হইতেছে বক্তা 'অর্জুন' এবং উপমান 'সিংহ' 'গরুড়' ও

'হনুমান'। 'সিংহের সহিত যুঝিতে অসামর্থ্য', 'সকল পক্ষীনাশ' এবং 'লংকাদহন'—এ সব বিভিন্ন প্রকারের সাধারণ ধর্ম।

(গ) 'কুন্দেন্দু তুষার শংখ শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের রাণী,
মূর্তিমাঝে উর বীণাপাণি।' —যতীন্দ্রমোহন।

—এখানে উপমেয় 'বীণাপাণি' এবং উপমান 'কুন্দ', 'ইন্দু', 'তুষার' ও 'শংখ'।

(ঘ) 'উদয়শিখরে সূর্যের মত সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়নসম' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে উপমেয় 'প্রাণ' এবং উপমান 'সূর্য' ও 'নয়ন'।

(ঙ) 'সিংহপৃষ্ঠে যথা
মহিষমর্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্র উপেন্দ্ররমণী
শোভে বীরবতী সতী বড়বার পিঠে' —মধুসূদন।

—এখানে উপমেয় 'সতী (=প্রমীলা)' এবং উপমান 'দুর্গা' 'শচী' ও 'রমা'। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, নারীর সহিত নারীর তুলনায় বিজাতীয়ত্ব তো রক্ষিত হইল না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রমীলা রাক্ষসবধূ এবং দুর্গা, শচী ও রমা স্বর্গের দেবী; অতএব, উপমা অলংকারে যাহা আকাংক্ষিত, সেই বিজাতীয়ত্ব ঠিকই আছে।

উৎপ্রেক্ষা

প্রকৃত অর্থাৎ বিষয় বা উপমেয়কে প্রবল সাদৃশ্যহেতু পরাত্মা অর্থাৎ বিষয়ী বা উপমান বলিয়া উৎকট সংশয় দেখা দিলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। 'যেন, বুঝি, মনে হয়, মনে গণি, জনু' প্রভৃতি সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকিলে **বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা** বা **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা** হয়, আর যেখানে এই সম্ভাবনাবাচক শব্দ উহ্য অর্থাৎ প্রতীয়মান থাকিয়া অর্থের দিক দিয়া সম্ভাবনার ভাবটি ফুটাইয়া তোলে, সেখানে হয় **প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা** বা **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা**। একই উপমেয়কে কেন্দ্র করিয়া যখন অনেক উপমানের অভেদের সম্ভাবনা ঘটে, তখন হয় **মালা-উৎপ্রেক্ষা**।

(ক) 'রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি' মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি' সাজ। —মধুসূদন।

—এখানে 'তরুমূলে রাশি রাশি কুসুম পড়িয়া যাওয়া'—এই প্রকৃত বিষয়টিকে গৌণ করিয়া তাহারই সদৃশ ব্যাপার 'অংগের সাজ খুলিয়া ফেলা'—এই আক্ষিপ্ত

বস্তুকেই কল্পনা করা হইয়াছে। 'যেন' এই সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকায় একটি অভেদের 'সম্ভাবনা' স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।—ইহাই বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা।

(খ) 'ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার,
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার !' —নজরুল

—এখানে 'ধরণীর এগিয়ে আসা'—এই প্রকৃত বিষয়টিকে গৌণ করিয়া তাহারই সদৃশ ব্যাপার 'দুলালী কনিষ্ঠা মেয়ের এগিয়ে আসা'—এই আক্ষিপ্ত বস্তুই কল্পিত হইয়াছে। 'যেন' এই সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকায় একটি অভেদের 'সম্ভাবনা' ফুটিয়া উঠিয়াছে।—ইহাই বাচ্যা উৎপ্রেক্ষার দৃষ্টান্ত।

(গ) 'বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল।' —মধুসূদন।

—ইহাও বাচ্যা উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(ঘ) 'সীতাহারা আমি যেন মণিহারা ফণী।' —কৃত্তিবাস।

—ইহাও বাচ্যা উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(ঙ) 'এ নিদাঘ যেন প্রেমাভিনয়ের বিরহ অংকখানি ;
দুর্বাসা যেন অভিশাপ হানি' দেয় ব্যবধান আনি'।' —কালিদাস।

—ইহাও বাচ্যা উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(চ) 'এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা
গীতময় তরুলতিকা—
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।' —রবীন্দ্রনাথ।

—নবযৌবনা বর্ষার আবির্ভাবে বিশ্বে যে আনন্দগান বাজিয়া উঠিয়াছে তাহা এতই গভীর ও ব্যাপক যে কবির কাছে **মনে হইয়াছে যেন** যুগ-যুগান্তরের অসংখ্য কবি একই সাথে যুগযুগান্তরের গান ধ্বনিয়া তুলিয়াছেন।—এখানে 'যেন' এই সম্ভাবনাবাচক শব্দটি না থাকিলেও অর্থের দিক দিয়া সম্ভাবনার কথাটি ফুটিয়া উঠায় একটি অভেদের 'সম্ভাবনা' স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।—ইহাই প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা।

(ছ) 'লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে স্নানার্থিণী সুন্দরী সরোবরে অবতরণ করিবার কালে তাঁহার কটির মেখলাখানি খুলিয়া শিলাতলে রাখিয়া গিয়াছেন। সেখানে উহা নীরবে পড়িয়া রহিয়াছে। তাই কবির কাছে মনে হইয়াছে যেন ঐ মেখলা সুন্দরীর কটিতট হইতে বিচ্যুত হইয়া মৌনভাবে অপমান সহিয়া চলিয়াছে। 'যেন' এই সম্ভাবনাবাচক শব্দটি না থাকিলেও অর্থের দিক দিয়া সম্ভাবনার কথাটি ফুটিয়া উঠায় একটি অভেদের 'সম্ভাবনা' স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।—ইহাও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(জ) 'কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম— কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥' —গোবিন্দদাস।

—ইহাও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(ঝ) 'সহজহি আনন সুন্দর রে ভঁউহ সুরে খলি আঁখি।
পংকজমধ্য পিবি মধুকর রে উড়ইত পসারএ পাঁখি।'—বিদ্যাপতি।

—ইহাও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(ঞ) 'সারসন মণিময়, কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে, সারসন, স্মরি,
হায় রে, সরু কটি। কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগ।' —মধুসূদন।

ইহাও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ।

(ট) 'মলিন গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া যেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বোধ হইল যেন গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছে কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন কোথায় গোলাপজলের কার্বা মুখ-আঁটা ছিল, কে কার্বা ভাঙিয়া ফেলিল, যেন কে নিবান আগুনে ধূপ-ধুনা-গুগ্‌গুল্ ফেলিয়া দিল।' —বঙ্কিমচন্দ্র (আনন্দমঠ)।

—এখানে চারটি বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা পরম্পর-শৃংখলিত থাকায় মালা-উৎপ্রেক্ষা হইয়াছে।

রূপক

বর্ণনীয় বিষয়ে উপমান অর্থাৎ আক্ষিপ্ত বস্তুর অভেদ আরোপ হইলে, যখন সেই আরোপে বর্ণনীয় বিষয়ের অপহ্নুতি বা নিষেধ থাকে না, অর্থাৎ উপমেয়কে অস্বীকার না করিয়া স্বীকার করা হয় সত্য, কিন্তু তাহাকে অপ্রধান রূপে ধরিয়া আক্ষিপ্ত বস্তু বা উপমানকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা হয়, তখন হয় রূপক অলংকার। অতএব, মোটের উপর ইহাই বলা যায় যে, স্বরূপত অর্থাৎ বস্তুগত দিক দিয়া উপমেয় এবং উপমান আলাদা হইলেও, উভয়ের মধ্যে অতিসাম্য বুঝাইবার নিমিত্ত কাল্পনিক অভেদ আরোপ

করিবার নামই রূপক। রূপক অলংকার নানা রকমের : যেমন,—সাধারণ রূপক বা নিরংগ রূপক, সাংগ রূপক, পরম্পরিত রূপক, অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক।

সাধারণ রূপকে বা **নিরংগ রূপকে** একটি উপমেয়ে একটি উপমানের অভেদ নির্দেশিত হয়। এই রূপকে উপমেয়ে উপমানের অংগগুলির কোনও উল্লেখ না থাকায়, তাহাদের আশ্রয়ে নূতন রূপক সৃষ্টির কোন কথাই উঠে না। নিরংগ রূপক দুই জাতের :—(১) **কেবল** (২) **মালা**। যেমন,—

(ক) 'যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি।' —মোহিতলাল।

—এখানে 'যৌবনেরি মৌবনে' কথাটিতে নিরংগ (কেবল) রূপক অলংকার হইয়াছে।

(খ) 'আসল কথাটা চাপা দিতে, ভাই,
কাব্যের জাল বুনি' —যতীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'কাব্যের জাল' কথাটিতে নিরংগ (কেবল) রূপক অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'ফুটায় মনে কি মস্তরে খুসীর শতদল' —সত্যেন্দ্রনাথ।

—এখানে 'খুসীর শতদল' কথাটিতে নিরংগ (কেবল) রূপক অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন কবলগ্ন কাঁটা ?' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে নিরংগ (মালা) রূপক অলংকার হইয়াছে।

(ঙ) 'শেফালীসৌরভ আমি, রাত্রির নিঃশ্বাস, ভোরের ভৈরবী।'—বুদ্ধদেব।

—এখানে নিরংগ (মালা) রূপক অলংকার হইয়াছে।

(চ) 'অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে নিরংগ (মালা) রূপক অলংকার হইয়াছে।

সাংগ রূপকে মূল উপমেয়ে উপমানের অভেদ-নির্দেশের সংগে সংগে তাহাদের অংগগুলিরও যথাযথ ভাবে অভেদ দেখানো হয়। এই সাংগ রূপকটি পরস্পরসম্বদ্ধ অনেক রূপকের মালা। সাংগ রূপকও দুই জাতের—(১) **সমস্তবস্তুবিষয়ক** ; (২) **একদেশবিবর্তি**। আরোপিত উপমানগুলির সবই শব্দপ্রয়োগে প্রকাশিত হইলে সমস্তবস্তুবিষয়ক সাংগরূপক হয়। পক্ষান্তরে, উপমানগুলির কোনটি বা কোন-কোনটি ভাষায় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত না হইয়া অর্থে বা ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হইলে একদেশবিবর্তি সাংগরূপক হয় : যেমন,—

(ক) 'শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু : অশ্রু-বারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার-রব !' —মধুসূদন।

—এখানে 'শোক' হইতেছে মূল উপমেয় এবং 'ঝড' হইতেছে মূল উপমান। 'শোক' ও 'ঝড'—ইহারা উভয়ে অংগী। 'শোকে'র অংগ হইতেছে—বামাকুল, মুক্তকেশ, ঘন-নিশ্বাস, অশ্রু-বারি-ধারা, হাহাকার-রব। আবার 'ঝড়ে'র অংগ হইতেছে—সুরসুন্দরী (অর্থাৎ বিদ্যুৎ-রমণী), মেঘমালা, প্রলয়-বায়ু, আসার (অর্থাৎ বারিবর্ষণ), জীমূত-মন্দ্র (অর্থাৎ মেঘগর্জন)। এইভাবে শোকের প্রতিটি অংগের সংগে ঝড়ের প্রতিটি অংগের অভেদ নির্দেশিত হইয়াছে। আরোপিত উপমানগুলির সবই শব্দপ্রয়োগে প্রকাশিত হওয়ায় সমস্তবস্তুবিষয়ক সাংগরূপক অলংকার হইয়াছে।

(খ) 'দেহদীপাধারে জ্বলিত লেলিহ যৌবন-জয়শিখা' —অচিন্ত্যকুমার।

—এখানে উপমেয় 'দেহ' অংগী এবং তাহার অংগ 'যৌবন' আবার উপমান 'দীপাধার' অংগী এবং তাহার অংগ 'শিখা'। একদিকে অংগীতে অংগীতে এবং অন্যদিকে অংগে-অংগে সবই শব্দপ্রয়োগে প্রকাশিত হওয়ায় সমস্তবস্তুবিষয়ক সাংগ রূপক অলংকার।

(গ) 'অশান্ত আকাংক্ষাপাখী
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর-পিঞ্জরে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানেও সমস্তবস্তুবিষয়ক সাংগ রূপক অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'নীলপাহাড়ের ফুলদানীতে প্রফুল্ল জাফরাণীস্থান!' —সত্যেন্দ্রনাথ।

—এখানে 'নীলপাহাড়' 'ফুলদানী'রূপে কল্পিত হইয়াছে। ফুল তো ফুলদানীতেই থাকে। অতএব, জফরাণীস্থানে ফুলের কথা 'প্রফুল্ল' শব্দটিতেই নির্দেশিত হইতেছে। 'ফুল' শব্দটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হইলেও অর্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই একদেশবিবর্তি সাংগরূপক অলংকার হইয়াছে।

(ঙ) 'আকাশের সর্বরস রৌদ্ররসনায়
লেহন করিল সূর্য!' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানেও একদেশবিবর্তি সাংগরূপক অলংকার হইয়াছে।

পরম্পরিত রূপকে একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ অপর উপমেয়ে তাহার উপমানের আরোপের কারণ হইয়া থাকে : যেমন,—

(ক) 'চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,
অচেতন-নেপথ্যের অভিনয় কর প্রযোজন।' —বুদ্ধদেব।

—এখানে 'চেতনা'কে 'নটমঞ্চ' বলিয়া এই যে রূপক অলংকারটি করা হইয়াছে, ইহাই 'নিদ্রা'কে 'যবনিকা' আর 'অচেতন'কে 'নেপথ্য' বলিয়া রূপক করিবার কারণ। রূপকসমূহের এই পারম্পর্যের জন্যই পরম্পরিত রূপকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

(খ) 'ষড়ধ্যায়ের বিশ্বকাব্য নবরসে মহামেলা,
মাঝখানে তার এই নিদাঘের বীররৌদ্রের খেলা।' —কালিদাস।

—এখানে 'বিশ্ব'কে 'কাব্য' বলিয়া এই যে রূপক অলংকারটি হইয়াছে, ইহাই 'নিদাঘ' (=গ্রীষ্ম) কে 'বীররৌদ্ররস' বলিয়া রূপক করিবার কারণ। পূর্ববর্তী রূপকটি পরবর্তী রূপকের কারণ বলিয়া পরম্পরিত রূপক হইয়াছে।

(গ) 'বীর্যসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'জগদ্ধাত্রী'কে 'দয়া' বলিয়া এই যে রূপক অলংকারটি হইয়াছে, ইহাই জগদ্ধাত্রীর বাহন 'সিংহ'কে 'বীর্যে' আরোপিত করিয়া রূপক করিবার কারণ। তাই পরম্পরিত রূপক হইয়াছে।

(ঘ) 'যদিও সকল হাস্য ফেনপুঞ্জতলে
জানি ক্ষুব্ধ ব্যথাসিন্ধু দোলে।' —প্রেমেন্দ্র।

—এখানেও পরম্পরিত রূপক অলংকার হইয়াছে।

অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপকে উপমানে কোন বিশেষ গুণ বা অসম্ভব ধর্ম কল্পনা করিয়া সেই বিশেষ গুণ বা অসম্ভব ধর্মসম্পন্ন উপমান উপমেয়ে আরোপ করা হয়: যেমন—

(ক) 'ও নব জলধর অংগ।
ইহ থির বিজুরী তরংগ॥' —গোবিন্দদাস।

—এখানে 'ও (অংগ)' কৃষ্ণ, 'ইহ' রাধা। উপমান 'বিদ্যুৎতরংগ'কে 'থির' (অর্থাৎ স্থির) এই অসম্ভব কল্পনা করিয়া উপমেয় 'রাধা'য় আরোপিত হইয়াছে।

(খ) 'বয়ন শারদ সুধানিধি নিষ্কলংক' —জ্ঞানদাস।

—এখানে (রাধার) 'বয়ন' অর্থাৎ বদন 'শারদ সুধানিধি' অর্থাৎ শরতের চাঁদ। কিন্তু চন্দ্রে কলংক থাকিলেও রাধাবদনে নাই। চাঁদের পক্ষে নিষ্কলংক হওয়া অসম্ভব। চাঁদের মুখে এই অসম্ভব-কল্পনাই আরোপিত হইয়াছে।

(গ) 'নাহি কালদেশ তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।'

এখানেও অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক অলংকার হইয়াছে।

ভ্রান্তিমান

খুব সাদৃশ্যহেতু উপমেয়কে উপমান বলিয়া ভুল এবং সেই ভুল যদি বাস্তব ভ্রম না

হইয়া কবিকল্পনাজাত ভ্রম হইয়া চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে, তাহা ভ্রান্তিমান অলংকার হয়। 'ভ্রম', 'ভরম', 'ভ্রান্তি' প্রভৃতি শব্দাদির প্রয়োগে এই অলংকারটি গঠিত হয়। মনে রাখিতে হইবে, আঁধার পথে 'দড়ি'কে 'সাপ' বলিয়া এই যে ভ্রম, ইহা বাস্তব বা সাধারণ ভ্রম—ইহার ভিতরে কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব নাই; তাই ইহা ভ্রান্তিমান অলংকার নয়। ভ্রান্তিমান অলংকারের দৃষ্টান্ত এইরূপ:

(ক) 'দেখ সখে উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি—
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
জলে কুবলয়-ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করিছে যতন!'

—এখানে পদ্মলোচনা রূপসী জলে নিজ নয়নের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সেই প্রতিচ্ছবিকে সত্যকার পদ্ম ভাবিয়া বারবার ধরিবার প্রয়াস পাইতেছে।—কবি-প্রতিভায় উদ্ভূত এই যে মধুর ভ্রান্তির কল্পনা, ইহাই ভ্রান্তিমান অলংকারের জন্মকারণ। 'অক্ষি'র সংগে 'উৎপলে'র সাদৃশ্যই এই মধুর ভ্রান্তির মূলে বিরাজমান।

(খ) 'কোন কোন পক্ষিশাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে।' —কাদম্বরী।

—এখানে উদ্ভিন্নপক্ষ পক্ষিশাবকের সংগে বৃক্ষফলের সাদৃশ্য এক মধুর ভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া ভ্রান্তিমান অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস
চন্দ্রকলাভ্রমে রাহু করিলা গ্রাস?' —কৃত্তিবাস।

—এখানে ভ্রান্তিমান অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'মণিময় মুকুরে দেখি পুন নিজমুখ চাঁদভরমে মুরছায়।' —বিদ্যাপতি।

—এখানেও ভ্রান্তিমান অলংকার হইয়াছে।

অপহ্নুতি

বর্ণনীয় বস্তু তথা প্রকৃত বা উপমেয়কে অপহ্নব অর্থাৎ নিষেধ বা অস্বীকার করিয়া আক্ষিপ্ত বস্তু তথা অপ্রকৃত বা উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হইলে অপহ্নুতি অলংকার হয়। সরাসরিভাবে ইহাই বলা যায় যে, এই অলংকারে উপমেয়কে প্রতিষেধ করিয়া উপমানকে উজ্জ্বল করিয়া বর্ণনা করা হয়। উপমেয়কে এই যে অস্বীকার-কর্ম, ইহা (১) হয় প্রত্যক্ষভাবে 'না 'নয়' বা 'নহে' শব্দাদির সাহায্যে, (২) নয় অপ্রত্যক্ষ-ভাবে 'ব্যাজ', 'ছল', 'বুঝি', 'ছদ্ম' প্রভৃতি অসত্যবাচক শব্দাদির সাহায্যে বুঝানো হয়। প্রত্যক্ষ অস্বীকার-কর্মের ব্যাপারে উপমান-উপমেয় বিভিন্ন বাক্যে, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ

অস্বীকার-কর্মের বেলায় উপমান-উপমেয় একই বাক্যের মধ্যে থাকে। আমাদের সাহিত্যে প্রথম পদ্ধতির অপহ্নুতিই মেলে: যেমন,—

(ক) 'তারাই আজ নিঃস্ব দেশে কাঁদছে হয়ে অন্নহারা;
দেশের যত নদীর ধারা, জল না, ওরা অশ্রুধারা!' —নজরুল ইসলাম।

—এখানে নদীর ধারা 'জল না'—এই কথা বলিয়া বর্ণনীয় বস্তুকে অস্বীকার করিয়া, 'ওরা অশ্রুধারা' এই কথা জানাইয়া আক্ষিপ্ত বস্তু তথা উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে; 'জলধারা' ও অশ্রুধারা'র সাদৃশ্যই অপহ্নুতির মূলে বিদ্যমান।

(খ) 'হাসি যে রঙীন ধূলা, অশ্রু নয়, অভ্র সে কঠিন।' —মোহিতলাল।

—এখানে **প্রথম পদ্ধতির অপহ্নুতি** অলংকার হইয়াছে। হাসি 'অশ্রু নয়', এই কথা বলিয়া বর্ণনীয় বস্তুকে অস্বীকার করিয়া, 'অভ্র সে কঠিন' এই কথা জানাইয়া আক্ষিপ্ত বস্তু তথা উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

(গ) 'চোখে চোখে কথা নয় গো, বন্ধু, আগুনে আগুনে কথা।'
—অন্নদাশংকর।

এখানেও **প্রথম পদ্ধতির অপহ্নুতি** অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা' —মধুসূদন।

—এখানে **দ্বিতীয় পদ্ধতির অপহ্নুতি** অলংকার হইযাছে।

(ঙ) 'ষড় ঋতুছলে ষড় রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য।' —যতীন্দ্রনাথ।

—এখানেও **দ্বিতীয় পদ্ধতির অপহ্নুতি** অলংকার হইয়াছে।

নিশ্চয়

যদি উপমানকে নিষিদ্ধ করিয়া উপমেয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় অলংকার হয়। প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ের সুদৃঢ় নির্ধারণই নিশ্চয় অলংকারের লক্ষ্য। **নিশ্চয় অলংকারটি অপহ্নুতি অলংকারের বিপরীত**: যেমন,—

(ক) 'অসীম নীরদ নয়,
ওই গিরি হিমালয়!' —বিহারীলাল।

—এখানে উপমান 'নীরদ (=মেঘ)'-কে নিষিদ্ধ করিয়া প্রকৃত বর্ণনীয় বস্তু তথা উপমেয় 'হিমালয়'কে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

(খ) 'এ নহে অরুণ-আভা, নহে শশধর-বিভা,
হিমমাঝে বুঝি গৌরীর গৌর আভা হাসে রে!' —নবীনচন্দ্র।

—এখানে উপমানদ্বয়, 'অরুণ-আভা' ও 'শশধর-বিভা'কে নিষিদ্ধ করিয়া প্রকৃত বর্ণনীয় বস্তু তথা উপমেয় 'গৌরীর গৌর আভা' প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

সন্দেহ

যদি উপমেয় ও উপমান উভয়েতেই সমভাবে সংশয় থাকে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যে কোনটি হইবার সম্ভাবনা থাকে, আর সেই সংশয় কবি-প্রতিভাজাত হওয়ায় চমৎকার হয়, তাহা হইলে সন্দেহ অলংকার হয়। প্রসংগত, মনে রাখা সমীচীন যে, **সন্দেহ অলংকারে** উপমেয় এবং উপমান উভয় বিষয়েই সমান সংশয়, কিন্তু **উৎপ্রেক্ষা অলংকারে** কেবলমাত্র উপমান-বিষয়েই উৎকট সংশয়। ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

(ক) 'দুইধারে একি প্রাসাদের সারি ? অথবা তরুর মূল ?
অথবা, এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল ?' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে উপমেয় ও উপমান উভয় পক্ষেই সমান সংশয়। প্রাসাদের সারিও হইতে পারে, তরুর মূলও হইতে পারে।

(খ) 'সোনার হাতে সোনার চুড়ী, কে কার অলংকার ?' —মোহিতলাল।

—এখানেও সন্দেহ অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে ,—
নিশীথে কি উষা আসি উতরিল হেথা ?' —মধুসূদন।

—এখানে উপমেয় প্রমীলা নয়, প্রমীলাদূতী সুন্দরী 'নৃমুণ্ডমালিনী' উহ্য রহিয়াছে। তবে এই উহ্য উপমেয় 'নৃমুণ্ডমালিনী' এবং উপমান 'উষা' উভয়েতেই সমান সংশয় বিদ্যমান।

বহুবিধ গুণ থাকিবার ফলে একই বিষয় যদি (১) বিভিন্ন মানুষের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে গৃহীত হয় কিংবা (২) একই লোক যদি তাহাকে নানাবিধ দৃষ্টিভংগী দিয়া দেখে, তাহা হইলে উল্লেখ অলংকার হয় : যেমন,—

(ক) 'স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে চিত্রাংগদা বিভিন্ন মানুষের দ্বারা বিভিন্নভাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহাই **উল্লেখ অলংকারের প্রথম প্রকারের** দৃষ্টান্ত।

(খ) 'প্রভু মোর গুণের সাগর, রসময় রূপের নাগর,
রসিকের শিরোমণি, বিলাস ধনের ধন,—
নৃত্যগীতবাদ্যের আকর।' —ভারতচন্দ্র।

এখানে একই 'প্রভু' একই লোকের নানাবিধ দৃষ্টিভংগীতে পরিদৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাই **উল্লেখ অলংকারের দ্বিতীয় প্রকারের** দৃষ্টান্ত।

প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা

এই তিনটি অলংকারকে এক সংগে মিলাইয়া পড়িতে হইবে। ইহাদের সংজ্ঞা

বুঝিবার আগে **বস্তু-প্রতিবস্তু** এবং **বিম্ব-প্রতিবিম্ব**—এই দুইটি পারিভাষিক শব্দ বুঝা প্রয়োজন। যেখানে উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম আলাদা অথচ অনেকটা সমার্থক শব্দের দ্বারা প্রকাশিত এবং কার্যত একই বলিয়া সাদৃশ্য সহজেই বুঝা যায়, সেখানে উপমেয় ও উপমানের সম্বন্ধকে **বস্তু-প্রতিবস্তু-সম্বন্ধ** আর সাধারণ ধর্মকে **বস্তু-প্রতিবস্তু-ভাবাপন্ন** বলা হয়। আবার যেখানে উপমেয় ও উপমানের ধর্ম কিছুটা আলাদা আলাদা প্রকারের বলিয়া ভিন্ন শব্দের সাহায্যে প্রকাশিত হয় এবং কার্যত এক না হওয়ায় সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য হয় অর্থাৎ বুদ্ধির সাহায্যে ভাবিয়া চিন্তিয়া এই দূরগত সাদৃশ্য বুঝা যায়, সেখানে উপমেয় ও উপমানের সম্বন্ধকে **বিম্ব-প্রতিবিম্ব-সম্বন্ধ** আর সাধারণ ধর্মকে **বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন** বলা হয়। অতএব, কথাটি দাঁড়ায় এই যে, বস্তু-প্রতিবস্তু-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ফলিতার্থে অর্থাৎ কাজের দিক দিয়া সাধারণ ধর্ম অভেদ—তাই সাদৃশ্য বেশ প্রকট, অপর পক্ষে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য—তাই সাদৃশ্য দূরগত।

প্রতিবস্তূপমা অলংকারে উপমেয় ও উপমান পাশাপাশি দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে থাকে, তবে ইহাদের যে সাধারণ ধর্মটি উল্লিখিত হয়, তাহা একটিই কিন্তু প্রকাশিত হয় পৃথক্ অথচ সমার্থক ভাষায়, আবার 'সম', 'তুল্য' প্রভৃতি তুলনাবোধক শব্দেরও প্রয়োগ হয় না। **এই অলংকারে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শুধু সাধারণ ধর্মটি বস্তু-প্রতিবস্তু-ভাবাপন্ন ঃ** যেমন—

(ক) 'একটি মেয়ে চ'লে গেছে জগৎ হতে নৈরাশে ;
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজসাপের নিশ্বাসে।' —সত্যেন্দ্রনাথ।

—এখানে 'মেয়ে' উপমেয়, 'মুকুল' উপমান। পরস্পরসন্নিহিত দুইটি পৃথক্ বাক্যে ইহারা স্থান পাইয়াছে। তুলনাবোধক শব্দ নাই। সাধারণ ধর্ম—'লয়প্রাপ্ত হওয়া' ; কিন্তু এই সাধারণ ধর্মই প্রকাশিত হইয়াছে 'চ'লে গেছে' ও 'শুকিয়ে গেছে'—এই পৃথক্ পৃথক্ বাক্যাংশে।

(খ) 'গাভী যদি তৃণটি খায়, করে জল পান,
তা'র সার দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান।
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ,
জীবের মংগল-হেতু করেন অর্পণ।' —রজনীকান্ত।

—এখানে 'সাধু' উপমেয়, 'গাভী' উপমান। পরস্পরসন্নিহিত দুইটি পৃথক্ বাক্যে ইহারা স্থান পাইয়াছে। তুলনাবোধক শব্দ নাই। সাধারণ ধর্ম—'পরহিতৈষণা' ; ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে 'করে প্রতিদান' ও 'করেন অর্পণ'—এই দুইটি পৃথক্ বাক্যাংশে।

দৃষ্টান্ত অলংকারে উপমেয় ও উপমান পাশাপাশি দুইটি পৃথক্ বাক্যে থাকে, তবে ইহাদের সাধারণ ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সাহায্যে প্রকাশিত হয় এবং কার্যত উহা এক না হওয়ায় সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য হয়, আবার 'সম', 'তুল্য' প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দেরও প্রয়োগ থাকে না। **এই অলংকারে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উপমেয়-উপমান ও তাহাদের সাধারণ ধর্ম—উভয়তই বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাব বিদ্যমান থাকে :** যেমন,—

(ক) 'ছোট শিশু যদি উঠিতে না পারে মায়ের কোলে,
নুয়ে প'ড়ে মাতা চুমা দিয়ে তা'রে বক্ষে তোলে।
সিন্ধু যদি বা কল্লোল তুলি' ছুঁতে না পারে,
নামি দিগন্তে দেয় পরশন গগন তা'রে।' —কালিদাস।

—এখানে উপমেয় 'শিশু'র উপমান 'সিন্ধু' এবং উপমেয় 'মাতা'র উপমান 'গগন'। এক পক্ষের 'শিশু' ও 'মাতা' আর অপর পক্ষের 'সিন্ধু' ও 'গগন' —উভয়ের সাধারণ ধর্ম বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন। অর্থে একটি দূরগত সাদৃশ্য আছে। এক পক্ষে অর্থাৎ একটি বাক্যে আছে উপমেয়, এবং অপর পক্ষে অর্থাৎ অপর বাক্যে আছে উপমান। অর্থাৎ বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবটি দুইটি পৃথক্ স্বাধীন ও স্বয়ং-পূর্ণ বাক্যে আছে।

(খ) 'মনোভাব
যতক্ষণ মনে থাকে, দেখায় বৃহৎ ;
কার্যকালে ছোট হয়ে আসে। বহু বাষ্প
গলে গিয়ে এক ফোঁটা জল।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে উপমেয় এবং উপমান দুইটি পৃথক্ বাক্যে রহিয়াছে। তবে এক পক্ষের সংগে অপর পক্ষের সাধারণ ধর্ম বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন। অর্থে সাম্যবোধ হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'তব যোগ্যা কন্যা মোর, তারে লহ তুমি।
সহকার মাধবিকালতার আশ্রয়।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানেও দৃষ্টান্ত অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'সবহুঁ মতংগজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল-বাণী॥
সকল সময় নহ ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখনারী নহ গুণবন্ত॥' —বিদ্যাপতি।

—এখানে শেষ বাক্যে আছে উপমেয়—'পুরুখনারী'(=পুরুষনারী)। মোতির (=মুক্তার)

মর্যাদা, কোকিল-বাণীর মাধুর্য, বসন্তের সৌন্দর্য ও গুণবত্তা আলাদা হইলেও তাৎপর্যে সাম্য বুঝাইতেছে। এই উদাহরণটি **মালাদৃষ্টান্তের।**

নিদর্শনা অলংকারে দুইটি বস্তুর সাধারণত অ-সম্ভব, তবে কখনও-বা সম্ভব সম্পর্কে ব্যঞ্জনার সাহায্যে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাব অর্থাৎ উপমান-উপমেয়ভাব বোঝানো হয়। এই অলংকারে **বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবটি** সাধারণত একটি বাক্যে, তবে কখনও কখনও দুইটি বাক্যে থাকে। **দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনা অলংকার দুইটির মধ্যে পার্থক্য এইরূপ :** দৃষ্টান্ত অলংকারে দুইটি বস্তুর মধ্যে সর্বদা থাকে সম্ভবপর সম্বন্ধ, কিন্তু নিদর্শনা অলংকারে সম্বন্ধ সাধারণত অ-সম্ভব। দৃষ্টান্ত অলংকারে বাক্যার্থ শেষ হইয়া গেলে প্রণিধানের সাহায্যে তাৎপর্য গ্রহণান্তে সাদৃশ্যজ্ঞানের উপলব্ধি ঘটে, কিন্তু নিদর্শনার বাক্যার্থ শেষ হইবামাত্র সাদৃশ্যবোধ অনুভূত হয়; নিদর্শনার অর্থই হইতেছে 'নিশ্চয়পূর্বক দর্শন, অর্থাৎ সাদৃশ্য আবিষ্কার' : যেমন,—

(ক) 'শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব, বাহুযুগল কোমলবিটপশোভা ধারণ করিয়াছে।' —শকুন্তলা।

—এখানে শকুন্তলার অধর ও নবপল্লব, কিংবা তাঁহার বাহুযুগল ও কোমলবিটপ—একবাক্যগত এই বস্তু দুইটির সম্বন্ধ অ-সম্ভব সম্বন্ধ। কেননা,—অধরে নবপল্লবের শোভা আর বাহুযুগলে কোমলবিটপের শোভা ধরিতে পারে না—একের ধর্ম অপরে আরোপিত হইতে পারে না। এখানকার অর্থটি হইতেছে এইরূপ :—অধর নবপল্লবের শোভার ন্যায় শোভা, বাহুযুগল কোমলবিটপের শোভার ন্যায় শোভা ধরিয়াছে। অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধই উপমান-উপমেয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছে। এই সম্বন্ধটি বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন—তাই অলংকারটি নিদর্শনা অলংকার।

(খ) 'আলোক যেখানে অধিক ফুটেছে সেখানে দুখের বান'

—মোহিতলাল।

—এখানে একটি বাক্যে 'আলোক' এবং 'দুখ'—এই দুইটি বস্তুর অ-সম্ভব সম্পর্কের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় নিদর্শনা অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'অবরেণ্যে বরি'
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমলকানন।' —মধুসূদন।

—এখানেও নিদর্শনা অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'কিংবা কণ্টকিত, হায়! যে বিধি করিল
গোলাপকমল,
সে বিধি পাষাণ দাহিতে সুকবিগণে
কবিত্ব-অমৃতে দিলা দারিদ্র্য-অনল।' —নবীনচন্দ্র।

-এখানে একটিমাত্র বাক্যে গোলাপকমলে কাঁটা ও কবিত্ব-অমৃতে দারিদ্র্য-অনল বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবাপন্ন হওয়ায় নিদর্শনা অলংকার হইয়াছে।

অতিশয়োক্তি

বর্ণনীয় বস্তু এবং আরোপ্যমান বস্তুর অভেদ সিদ্ধ হইবার দরুণ যদি বর্ণনীয় বস্তুর পূর্ণগ্রাস বা লোপ ঘটে, কিংবা বস্তুর কল্পনার আশ্রয়ে যে কোন রকমে লৌকিক সীমা ছাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়। সৌন্দর্য সৃষ্টি করিবার জন্য আতিশয্যপূর্ণ উক্তির নাম অতিশয়োক্তি। উপমেয় ও উপমানের ভিতর ভেদ থাকলেও অভেদ সিদ্ধ হইলে এবং উপমান উপমেয়কে পূর্ণগ্রাস করিয়া তাহার জায়গা অধিকার করিলে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়। উপমানের দ্বারা উপমেয়ের এই যে পূর্ণগ্রাস—আলংকারিকদের মতে ইহারই নাম 'সিদ্ধ অধ্যবসায় বা অধ্যবসান'। **অতিশয়োক্তি অলংকার অভেদ-সর্বস্ব, পক্ষান্তরে রূপক অলংকার অভেদ-প্রধান**। অতিশয়োক্তি অলংকার দুই জাতের—রূপকাতিশয়োক্তি ও অতিশয়োক্তি। অবশ্য সত্য কথা বলিতে কি, রূপকাতিশয়োক্তি অতিশয়োক্তিরই অন্তর্গত। তবে, যে সকল অতিশয়োক্তি রূপকাশ্রিত এবং রূপকেরই পরিণত রূপ ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদের একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়; এই নামটিই হইতেছে **রূপকাতিশয়োক্তি**।

এখানে **একটি কথা স্মরণীয়** যে, রূপকাতিশয়োক্তির পূর্ববর্তী অলংকারটি রূপক অলংকার, আর পরবর্তী অলংকারটি ব্যতিরেক অলংকার। 'মুখ-চাঁদ'—এই রূপক অলংকারটি 'চাঁদ' (যেমন,—চাঁদের হাট)—এই অতিশয়োক্তি অলংকারের স্তরে যাইয়া 'মুখের নিকটে চাঁদ নগণ্য অথবা চাঁদ জিনিয়া মুখ'—এই ব্যতিরেক অলংকারের রূপ লইতে পারে।

এবার অতিশয়োক্তি অলংকারের উদাহরণ দেওয়া গেল :

(ক) 'দাসীর এ তৃষ্ণা তোষ সুধা-বরিষণে।' —মধুসূদন।

—এখানে 'দুর্নিবার ইচ্ছা' ও 'সুমিষ্ট ভাষণ' এই উভয় উপমেয়কে একেবারে গ্রাস করিয়া 'তৃষ্ণা' ও 'সুধাবরিষণ'—এই উপমানদ্বয় প্রকটিত হইয়াছে। —তাই রূপকাতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

(খ) 'সকলে কাঁদি বলে—দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরেও হানে!' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'কাশীরাজ' ও 'কোশল-নৃপতি' এই উভয় উপমেয়কে গ্রাস করিয়া 'রাহু' ও 'চাঁদ'—এই উপমানদ্বয় প্রকটিত হওয়ায় রূপকাতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'যে মন রস সম্ভোগ করে সে যাতায়াত সুরু করেছে আধুনিক ভোজের

নিমন্ত্রণশালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েচে সেই দিকটাতে যে-দিকে চলেছে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েচে মাতাল।'

—রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'আধুনিক গল্প-কবিতা-নাটকময় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য' ও 'যৌন-বাসনা-বিক্ষুব্ধ উগ্র উত্তেজক অথচ আপাতমধুর রসসাহিত্য', এই উভয় উপমেয়কে গ্রাস করিয়া 'আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালা' ও 'মদ', এই উপমানদ্বয় প্রকটিত হওয়ায় রূপকাতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তাব মুখে থুইল লুকাইল॥' —ভারতচন্দ্র।

—এখানে বিদ্যার মুখে সুধার সম্বন্ধ না থাকিলেও উহা ঘোষিত হওয়ায় অসম্বন্ধে সম্বন্ধ-রূপ অতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

(ঙ) 'দৃষ্টি হেথা পডিতে না পড়িতে তোমার,
আগেই হইল দেখি বিস্ময়ে প্রস্ফার!' —নিবাতকবচ-বধ।

—এখানে কারণের আগেই কার্যের উৎপত্তি হওয়ায় কার্যকাবণেব পৌর্বাপর্যেব ব্যতিক্রমজনিত অতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

(চ) 'এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥' —চণ্ডীদাস

—এখানে অভেদ-ভেদ অথবা সম্বন্ধে-অসম্বন্ধ ঘটায় অতিশয়োক্তি অলংকার হইয়াছে।

মন্তব্য: সাহিত্যদর্পণকারের মতে, অতিশয়োক্তির প্রকার পাঁচটি। ভেদে অভেদ রূপ, এই যে একটি প্রকারের অতিশয়োক্তি, ইহাকে রূপকাতিশয়োক্তি বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, অভেদে ভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং কার্যকারণের পৌর্বাপর্যেব ব্যতিক্রম-রূপ আরও চার প্রকার অতিশয়োক্তিকে নিছক অতিশয়োক্তি অলংকাব বলা হইয়াছে।

ব্যতিরেক

যখন উপমেয়কে উপমানের অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট অথবা অধিকতর নিকৃষ্ট করিয়া দেখানো হয়, তখন হয় ব্যতিরেক অলংকার। কোন্ কারণে তুলনায় উপমেয় অধিকতর উৎকৃষ্ট অথবা অধিকতর নিকৃষ্ট—সে কথা কোথাও-বা থাকে উক্ত, আবার কোথাও-বা থাকে অনুক্ত। ডক্টর সুধীরকুমার দাসগুপ্ত বলিয়াছেন—'**রূপকে** অভেদের আরোপ, **অতিশয়োক্তিতে** অভেদের সিদ্ধি, **ব্যতিরেকে** পুনরায় ভেদ, কিন্তু এই ভেদকথনই উপমেয় বস্তুর সর্বাতিশয়ী সৌন্দর্য বা মহিমা ঘোষণা করে। এই অলংকারের তুলনায় রূপকও যেন বাহুি। প্রথম প্রকার অতিশয়োক্তির সহিত ইহার সারূপ্য এত

পরিস্ফুট যে, ইহাকে ব্যতিরেক না বলিয়া বিশেষ অতিশয়োক্তি বলিলে যেন আরও র্থক নাম হয়।' উপমেয়ের উৎকর্ষ-বোধক ব্যতিরেক-জ্ঞাপক শব্দ হইতেছে— 'জিনি', 'নিন্দি', 'গঞ্জি', 'ছার' ইত্যাদি। ব্যতিরেক বুঝিবার উপায় তিনটি— **প্রথমত**, ব্যতিবেক-জ্ঞাপক বা সাদৃশ্যশব্দের দ্বারা; **দ্বিতীয়ত**, অর্থের সাহায্যে; **তৃতীয়ত**, ব্যঞ্জনাব গুণে: যেমন—

(ক) 'গতি জিনি গজবাজ কেশবী জিনিয়া মাঝ
মোতি-পাঁতি জিনিয়া দশন —মুকুন্দরাম।

—এখানে 'জিনি' 'জিনিয়া'—এই ব্যতিরেক-জ্ঞাপক শব্দাদির প্রয়োগ উপমেয়ের উৎকর্ষ বুঝাইতেছে।

(খ) 'অঙ্গনা-গঞ্জন জগজন-রঞ্জন
জলদ-পুঞ্জ জিনি ববণা
দেখ সখি নাগব-বাজ বিবাজে।
শুধুই সুধাময় হাস বিকশিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥
ইন্দীবব বব- গবব-বিমোচন
লোচন মনমথ ফান্দে।' —গোবিন্দদাস।

—এখানে 'গঞ্জন', 'জিনি', 'মলিন ভেল' ও 'গরববিমোচন'—এই চারিটি শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ কবিয়া চার বাবে চারটি ব্যতিবেক বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

(গ) 'শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘেব গর্জন,
সিংহনাদ, জলধির কল্লোল, দেখেছি
দ্রুত ইবম্মদ, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে, কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোব ঘর্ঘর কোদণ্ড-টংকার!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ংকর।' —মধুসূদন।

—এখানে মেঘেব গর্জন, সিংহনাদ, জলধিব কল্লোলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে কোদণ্ড-টংকার আবার ইরম্মদের গতিকে তুচ্ছ করিয়া ভয়ংকর শর ছুটিয়াছে। দুইটি ব্যতিরেক থাকায় **মালা-ব্যতিরেক** অলংকাব হইয়াছে।

(ঘ) 'দিনে দিনে শশধর হয় বটে তনুতর,
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু ক্রমশঃ হইলে তনু
আর ত নূতন নাহি হয়।' —হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।

—এখানে তুলনায় 'নরের তনু'—এই উপমেয়ের অপকর্ষ ও 'শশধর'—এই উপমানের উৎকর্ষ হওয়ায় ব্যতিরেক অলংকার হইয়াছে।

সমাসোক্তি

যদি বর্ণনীয় বস্তুতে তথা উপমেয়ে উপমান-বস্তুর ব্যবহার অর্থাৎ অবস্থা সমারোপ করা হয়, তাহা হইলে সমাসোক্তি অলংকার দেখা যায়। এই যে অবস্থা সমারোপ ব্যাপারটি—ইহা উভয় বস্তুব সমান কার্য, সমান বিশ্লেষণ, কখনও-বা সমান লিংগ-প্রয়োগের মধ্য দিয়া ঘটিয়া থাকে। আলংকারিকদেব মতে, 'ব্যবহার' শব্দের মানে 'অবস্থা বা অবস্থা-ভেদ'। এই 'ব্যবহারে'র আরোপ সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইলে সার্থক সমাসোক্তি অলংকার হয়। 'সমাস' কথাটির মানে 'সংক্ষেপ'। সমাসে তথা সংক্ষেপে উপমেয় ও উপমানের বিষয় উক্ত হয় বলিয়া, ইহাই সমাসোক্তি অলংকার। প্রসংগত, একটি কথা জানিয়া রাখা উচিত। এই সমাসোক্তি অলংকাব অবলম্বন কবিয়াই রবীন্দ্রনাথের লেখা 'নির্ঝবের স্বপ্নভংগ', 'চঞ্চলা', 'সমুদ্রেব প্রতি' প্রভৃতি কবিতাবলীব আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। এই অলংকাবের প্রধান রূপই হইতেছে—অচেতনে চেতনেব ব্যবহার সমারোপ। প্রকৃত সমাসোক্তিতে অচেতন বা নির্জীব বস্তুতে মানবধর্ম বা মানবব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়। এই অলংকাবটি ইংরাজি অলংকারশাস্ত্রের Personification, Personal Metaphor এবং Pathetic Fallacy-ব প্রায় তুল্য: যেমন,—

(ক) 'এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া
যেতো ছোট কলসীখানি কোমল তাহার কক্ষে নিয়া;
সোহাগে জল উথলে উঠি বক্ষে তাহাব পড়ত লুটি।' —কুমুদরঞ্জন।

—এখানে অচেতন 'জলে' চেতনধর্মী সোহাগময়ী 'সখী'ব ব্যবহাব সমারোপ কবা হইয়াছে।

(খ) 'চাহিয়া ঈর্ষার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে
পবিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে।' —যতীন্দ্রমোহন।

—এখানে অচেতন 'পদ্মদলে' চেতনধর্মী নায়কসংগসুখবঞ্চিত নায়িকার ব্যবহাব আরোপিত হইয়াছে।

(গ) 'বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে।' —ববীন্দ্রনাথ।

—এখানে অচেতন 'বসুন্ধরা'য় মানবধর্ম আবোপিত হইয়াছে।

(ঘ) 'কখন রস এল শুকিয়ে, এক পা এক পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক

বসনা মেলে লেহন করে নিলে প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে।'

—এখানে অচেতন 'মরু'তে চেতনধর্মী 'তৃষ্ণার অজগর সাপে'র ব্যবহার আরোপিত হইয়াছে।

প্রতীপ

যদি (১) উপমান উপমেয়-রূপে কল্পিত হয়, কিংবা (২) উপমেয় আপনার উৎকর্ষবশত উপমানকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ উপমানের নিষ্ফলতা বর্ণিত হয়, অথবা (৩) প্রসিদ্ধ বস্তুর অতিশয় উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়া তাহাকে উপমানরূপে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে প্রতীপ অলংকার হয়। প্রতীপের এই দ্বিতীয় লক্ষণটি দেখিয়া ব্যতিরেক অলংকারের কথা মনে জাগে। **প্রতীপ ও ব্যতিরেক অলংকার দুইটির মধ্যে পার্থক্য** এই দিক দিয়া যে, ব্যতিরেকে উপমেয়ের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়, কিন্তু প্রতীপে উপমান প্রত্যাখ্যাতই হয়। প্রতীপে উপমেয় 'স্বয়ং' এতই উৎকৃষ্ট যে তাহার কাছে উপমান নিষ্ফল; কিন্তু ব্যতিরেকে এই ভাবটি একেবারেই নাই। 'প্রতীপ' শব্দটির মানে 'বিপরীত'। অলংকারটির লক্ষণবিচারে এই নামটির সার্থকতা বুঝা যায়: যেমন,—

(ক) 'আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তল-সম
নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'মেঘ-সম কুন্তল' বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে 'কুন্তল-সম মেঘ'। ইহাই **প্রতীপের প্রথম প্রকারের** দৃষ্টান্ত।

(খ) 'অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেবদৈত্য;' —মধুসূদন।

—এখানে প্রসিদ্ধ উপমান-বস্তু অমৃতের নিষ্ফলতা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই **প্রতীপের দ্বিতীয় প্রকারের** দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য, ব্যতিরেক অলংকার হয় নাই। কারণ,—ব্যতিরেকে **সাক্ষাৎভাবে** উপমেয়ের অতিশয় উৎকর্ষটি দেখানো হয়, প্রতীপে উপমানের নিষ্ফলতা বা নিরর্থকতা দেখানো হইয়াছে।

(গ) 'সুদারুণ আছে যত, সকলের গুরু—
হলাহল। হেন গর্ব না করিও মনে,
তোমার সদৃশ বহু দুর্জয়-বচন
আছে, ইহা সুনিশ্চিত জানে ত্রিভুবনে।'

—এখানে প্রসিদ্ধ বস্তু হলাহলের বর্ণনা করিয়া তাহাকে উপমানরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাই **প্রতীপের তৃতীয় প্রকারের** দৃষ্টান্ত।

বিরোধাভাস

যখন দুইটি বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাৎপর্যে সে বিরোধের অবসান ঘটাইয়া চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে, তখন হয় বিরোধ বা বিরোধাভাস অলংকার। এই অলংকারে বাচনভংগী এক রকমের ছল আঘাত; ইহা হঠাৎ বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া অর্থের ঘনীভূত রূপের দিকে দৃষ্টি টানিয়া লইয়া যায়। মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবিক বিরোধে এই অলংকার হয় না। বিরোধাভাস অলংকারটি (১) হয় সমগ্র বাক্যগত, (২) নয় কেবলমাত্র নিকটবর্তী দুইটি শব্দগতও হইতে পারে। প্রথম জাতের বিরোধকে ইংরাজি অলংকারশাস্ত্রের Epigram-এর সহিত এবং দ্বিতীয় জাতের বিরোধকে Oxymoron-এর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে : যেমন,—

(ক) 'অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি।' —ভারতচন্দ্র।

—এখানে বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও সর্বশক্তিমান নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ-বর্ণন বলিয়া বিরোধ কাটিয়া গিয়াছে।

(খ) 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে 'মৃত্যুহীন প্রাণ' বাক্যাংশটি বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ঐহিক অমরতার কথা উদ্দিষ্ট হওয়ায় বিরোধ কাটিয়া গিয়াছে।

(গ) 'মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃতহ্রদে।' —মধুসূদন।

—এখানে 'হ্রদে পতন' ও 'গলিত না হওয়া' পরস্পরবিরোধী। কিন্তু হ্রদটি যে অমৃতময় —অমৃত বিনাশ করে না, অমরই করে।

(ঘ) 'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে—
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।'
—গোলাম মোস্তফা।

—এখানে বিরোধাভাস এবং ইংরাজি অলংকার-শাস্ত্রের Epigram লক্ষণীয়।

(ঙ) 'সৃষ্টি-ছাড়া সৃষ্টি-মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সংগিহীন রাত্রিদিন ; —রবীন্দ্রনাথ।

এখানে 'সৃষ্টি-ছাড়া সৃষ্টি' কথাটি বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও, সৃষ্টির অস্বাভাবিকতার কথা ব্যঞ্জিত হওয়ায় বিরোধ কাটিয়া গিয়াছে। বিরোধাভাসেরই একটি বিশিষ্ট জোরালো রূপ, ধরিতে গেলে চরম রূপই এখানে আছে। সন্নিহিত দুইটি শব্দগত এই যে বিরোধাভাস' অলংকার, ইহাকে **বিরোধোক্তিও** বলা যাইতে পারে। ইংরাজি অলংকার-শাস্ত্রে ইহারই নাম Oxymoron।

(চ) 'সেই দহনের মিঠা বিষে মোর মদনের আরাধনা!' —মোহিতলাল।

—এখানেও বিরোধাভাসের চরম রূপ লক্ষণীয়। ইহাও বিরোধোক্তি তথা Oxymoron।

(ছ) 'পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রহ রাজ্যহীন।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানেও বিরোধাভাস এবং ইংরাজি অলংকার-শাস্ত্রের Oxymoron লক্ষণীয়।

বিষম

যখন বি-ষম অর্থাৎ বি-সদৃশ বস্তু দুইটির বর্ণনা-বিশেষ হইতে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়, তখন হয় বিষম অলংকার। (১) কারণ ও কার্যের গুণ বা ক্রিয়া পরস্পর-বিরুদ্ধ হইলে, কিংবা (২) আরব্ধ কার্যের বিফলতা এবং নূতন অনর্থের উৎপত্তি হইলে, কিংবা (৩) পরস্পর-বিরুদ্ধ বস্তু দুইটির একত্র মিলন হইলে—অর্থাৎ এই তিন রকমে বিষম অলংকার হয়: যেমন,—

(১) 'উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালো বরণ-ঘটায়।।' —গিরিশচন্দ্র।

—এখানে 'কালো বরণ-ঘটা' এই কারণের কার্য হইল 'উজ্জ্বল আলোক-ঝলক'। কারণ ও কার্যের গুণের পরস্পর-বিরুদ্ধতা লক্ষণীয়।

(২) 'পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।' —জ্ঞানদাস।

—'মেঘ জল না দেওয়া'য় আরব্ধ কার্যের বিফলতা এবং 'বজ্র পড়ার কথায়' নূতন অনর্থের উৎপত্তি-কথা বলা হইয়াছে। তাই বিষম অলংকার।

(৩) 'অংগনা-জনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়! অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। তেজঃপুঞ্জ তপোরাশি মুনিকুমারই-বা কোথায়, সামান্যজনসুলভ চিত্তবিকারই-বা কোথায়।' —কাদম্বরী।

—এখানে একই আধার এই 'অংগনা-জনের অন্তঃকরণে' 'তপোরাশি' ও 'চিত্ত-বিকার'—এই বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের কথায় একান্তভাবে অসম্ভব ঘটনার একত্র সংঘটন ঘটিয়াছে।

বিভাবনা

কারণ ছাড়া অর্থাৎ প্রসিদ্ধ কারণ ছাড়া কার্যোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হইলে বিভাবনা অলংকার হয়। 'বিভাবনা'র মানে 'যাহাতে কারণ বিভাবিত বা বিচারিত' হয়। কার্যোৎপত্তির মূলে যে অপ্রসিদ্ধ অথচ প্রকৃত কারণটি আছে তাহা কোথাও-বা উক্ত, আবার কোথাও-বা অনুক্ত থাকে: যেমন,—

(ক) 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত,
বিনা বাতে নিবে গেল মংগল-প্রদীপ।' —অমৃতলাল।

—এখানে আশুতোষের আকস্মিক মৃত্যু, যাহা অপ্রসিদ্ধ অথচ প্রকৃত কারণ, তাহা অনুক্ত আছে।

(খ) 'সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে।' —কাদম্বরী।

—এখানে 'ধনমদ' যাহা অপ্রসিদ্ধ অথচ প্রকৃত কারণ, তাহা উক্ত হইয়াছে।

বিশেষোক্তি

কারণ-সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি তথা স্বাভাবিক কার্যোৎপত্তি না হইলে, এমন কি বিরুদ্ধ কার্যোৎপত্তি ঘটাইলে বিশেষোক্তি অলংকার হয়। কার্যোৎপত্তি অথবা ফলোৎপত্তি না হইবার প্রকৃত কারণটি কোথাও-বা উক্ত, আবার কোথাও-বা অনুক্ত : যেমন,—

(ক) 'মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,' —রবীন্দ্রনাথ।

—ঐশ্বর্য, দৈন্য, সম্পদ ও বিপদ এই কারণগুলির স্বাভাবিক ফল যথাক্রমে ঔদ্ধত্য, নতি, সাহস, ভয়। অথচ এই স্বাভাবিক কার্যোৎপত্তি না ঘটিয়া বিরুদ্ধ ফল নম্রতা, নতিহীনতা, ভয় ও নির্ভীকতা দেখা দিয়াছে।—তাই বিশেষোক্তি অলংকার। অবশ্য এই দৃষ্টান্তটির অন্তর্গত চারটি চরণের পরেই ব্যাপারটির প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম'—সেই মহামানব, বিরুদ্ধগুণের মিলনাশ্রয় রামচন্দ্রেই ইহা সম্ভব।

(খ) 'দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ
দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ।
তা'রা না হরিতে পারে তিমির আমার
একসীতা বিহনে সকলি অন্ধকার!' —কৃত্তিবাস।

—এখানে অন্ধকারনাশরূপ কার্যের প্রসিদ্ধ কারণগুলি থাকিলেও কার্য হইতেছে না। কার্য-কারণের এই আপাতবিরোধের অবসান অবশ্য শেষ চরণে ঘটিয়াছে।

অসংগতি

এক স্থানে কারণ এবং অন্য স্থানে কার্য থাকিলে অসংগতি অলংকার হয়। কারণ ও কার্য ভিন্নাশ্রয়ী বলিয়াই সংগতির অভাবজনিত এই অলংকারটির নাম অসংগতি। সময়ে সময়ে যমক বা শ্লেষ দ্বারা এই অলংকারটির পরিপোষণ হয় : যেমন,—

(ক) 'একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।' —ভারতচন্দ্র।

—এখানে আগুনটি শিবের ললাটে স্থিত, অথচ মদন ভস্মীভূত হওয়ায় স্ত্রী রতির

কপালে দাহকার্য দেখা দিল অর্থাৎ তাঁহার সর্বনাশ হইল। 'এক' শিবকে এবং 'আর' রতিকে বুঝাইতেছে। 'কপাল' শব্দটির প্রয়োগে যমক অলংকারটিও লক্ষণীয়।

(খ) 'হৃদয়-মাঝে মেঘ উদয় করি।
নয়নের পথে বরিখে বারি ॥' —জ্ঞানদাস।

—এখানে রাধার এই পূর্বরাগের বর্ণনায় ইহাই বলা হইয়াছে যে, হৃদয়ে শ্যাম-জলধর, নয়নে প্রেমাশ্রু। অর্থাৎ হৃদয়ে কারণ, কিন্তু নয়নে কার্য। তাই অসংগতি অলংকার।

কারণমালা

যদি কোন কারণের কার্য পরবর্তী কোন কার্যের কারণ হইয়া কারণ-পরম্পরা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে কারণমালা অলংকার হয় : যেমন,—

(ক) 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।
অতএব কর সবে লোভ-সংবরণ ॥' —হিতোপদেশ।

—এখানে লোভ কারণটির কার্য পাপ, আবার এই কার্য পাপ অপর কার্য মৃত্যুর কারণ হওয়ায় কারণমালা অলংকার হইয়াছে।

(খ) 'রণে যদি মর, ঘুষিবে যশ ; যশ যাব তাব দেবতা বশ,
যশ হ'লে দেব যাইবে দিবে, দিবে গেলে সদা সুখ ভুঞ্জিবে ॥
—নিবাতকবচ।

একাবলী

প্রত্যেক পূর্ববর্তী বিশেষ্য যদি পরবর্তী বিশেষ্যের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে একাবলী অলংকার হয়। 'একাবলী' মানে 'একের আবলী বা শ্রেণী' : যেমন,—

(ক) 'গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি
সুন্দর ধরাতল।' —যতীন্দ্রমোহন।

—এখানে পূর্ববর্তী বিশেষ্য 'ফুল' পরবর্তী 'অলি'র বিশেষণ। 'ফুল' 'অলির' বিশেষণ মানে ফুলসংযোগে অলি বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

(খ) 'তাঁর কাব্য বর্ণনা-বহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্র-বহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণ-বহুল।
—বুদ্ধদেব।

—এখানেও একাবলী অলংকার হইয়াছে।

(গ) 'দুঃখের মজা ক্রন্দনে ; ক্রন্দনের মজা কীর্তনে। —অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

—এখানেও একাবলী অলংকার হইয়াছে।

সার

বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণনা করা হইলে সার অলংকার হয়। ব্যঞ্জনা হইতেই উৎকর্ষের ধারণা হয় : যেমন,—

'পৃথিবীর মধ্যে আমার বাঙালা, বাঙালার মধ্যে আমার পল্লীখানি, পল্লীর মধ্যে আমার কুটীর, কুটীরে আমার মা জননী। জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ মানি।'

—এখানে উত্তরোত্তর কে শ্রেষ্ঠ এবং কেউ-বা পরম শ্রেষ্ঠ, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

আরোহ

বর্ণনা-গুণে যখন উদ্দিষ্ট ভাব বা অর্থ ক্রমে ক্রমে অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন ও হৃদয়গ্রাহী হইতে থাকে, তখন হয় আরোহ অলংকার। এই অলংকারে শুধু চিন্তা বা অর্থের আরোহই নয়, ধ্বনিরও আরোহ অর্থাৎ ক্রম-উত্থান দেখা যায়। ইংরাজি অলংকার-শাস্ত্রের Climax-এর অনুকরণে এই অলংকারটির নামকরণ হইয়াছে: যেমন,—

(ক) 'আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব।'

—বঙ্কিমচন্দ্র।

—এখানে অর্থ ও ধ্বনির ক্রম লক্ষণীয়, ইহাই তো আরোহ অলংকার।

(খ) 'ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর। ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।'—স্বামী বিবেকানন্দ।

অর্থান্তর-ন্যাস

বিশেষের দ্বারা সামান্য অথবা সামান্যের দ্বারা বিশেষ, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণ সমর্থিত হইলে অর্থান্তর-ন্যাস অলংকার হয়। 'অর্থান্তর' শব্দের মানে 'অন্য অর্থ বা বিষয়, 'ন্যাস' অর্থ 'নিক্ষেপ'। সমর্থন-মানসে অন্য বিষয় নিক্ষিপ্ত বা আক্ষিপ্ত হইলে অর্থান্তর-ন্যাস অলংকার হয়: যেমন,—

(ক) 'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ॥' —কৃষ্ণচন্দ্র।

এখানে বিশেষ উক্তির (Particular statement) দ্বারা সামান্য উক্তি (General statement) সমর্থিত হইয়াছে।—তাই অর্থান্তর-ন্যাস অলংকার।

(খ) 'একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলায় রতন ?' —ভারতচন্দ্র।

—এখানে সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থিত। তাই অর্থান্তর-ন্যাস অলংকার।

(গ) 'সবই যায়,' কিছুই থাকে না; থাকে শুধু কীর্তি। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে।' —চন্দ্রশেখর।

—এখানে বিশেষের দ্বারা সামান্য সমর্থিত হইয়াছে।

(ঘ) 'দুঃসহ এ কাজ—তাই তো তোমার 'পরে
দিতেছি দুরূহ ভার। অয়ি প্রাণাধিকে,
মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহাক্লেশ যত।' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে সুমিত্রার প্রতি কুমারসেনের উক্তিতে সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থিত হইয়াছে।

(ঙ) 'সদ্‌বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়—একথা অগ্রাহ্য। উর্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে না?' —কাদম্বরী।

—এখানে দুইটি বিশেষের দ্বারা সামান্য সমর্থিত হওয়ায় **মালা-অর্থান্তর-ন্যাস** হইয়াছে।

(চ) 'সহসা কোন কার্য করিবে না, কেন না, অবিবেচনা পরম বিপদের কারণ হয়, লক্ষ্মী গুণলুব্ধা হইয়া নিজেই বিমৃশ্যকারীকে বরণ করিয়া থাকেন।'—কিরাতার্জুনীয়।

—এখানে প্রথমে বিমৃশ্যকারিত্ব-রূপ কারণ এবং পরে উহার কার্য বা ফল বিবৃত হইয়াছে। তাই কার্যের দ্বারা কারণ সমর্থিত হওয়ায় অর্থান্তর-ন্যাস অলংকার হইয়াছে।

কাব্যলিংগ

যদি কোন পদ বা বাক্যের অর্থকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে কোন বর্ণনীয় বিষয়ের কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে কাব্যলিংগ অলংকার হয়। পদটি সমাসবদ্ধ অথবা একক হইতে পারে। ব্যঞ্জনা থাকিলেই অলংকার হয়, সরাসরি কারণে অলংকার হয় না। কাব্যলিংগ অলংকারকে কেহ কেহ 'হেতু অলংকার'ও বলিয়া থাকেন: যেমন,—

(ক) 'কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে?' —মধুসূদন।

—এখানে ব্যঞ্জনা-গুণে 'পাবক-শিখা-রূপিণী' বিশেষণ পদটি মূল বর্ণনীয় বিষয়ের হেতু-রূপে দেখানো হইয়াছে। কবি বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই পাবক-শিখার নিমিত্তই 'হৈম গেহ' অর্থাৎ স্বর্ণলংকা ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছে।

(খ) 'গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সেথা থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম ..' —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে ব্যঞ্জনাগুণে 'এ সংসারে যেথা…' এই বাক্যটি মূল বর্ণনীয় বিষয়ের হেতু-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। রাজা বিক্রমাদিত্য বলিতে চাহিয়াছেন যে, ঐ হেতুটির জন্যই গৃহহীন পলাতক কুমারসেন তাঁহার চেয়ে অধিকতর সুখী।

ব্যাজস্তুতি

ব্যাজে স্তুতি অর্থাৎ (১) নিন্দাচ্ছলে স্তুতি এবং (২) ব্যাজরূপা স্তুতি অর্থাৎ স্তুতিচ্ছলে নিন্দা প্রতীয়মান হইলে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়ঃ যেমন,—

(ক) 'সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥' —ভারতচন্দ্র।

—এখানে বক্তা দক্ষ শুধু নিন্দা-অর্থেই বাক্যপ্রয়োগ করিযাছেন, কিন্তু কবির বাচনভংগীর গুণে স্তুতি-অর্থটিও প্রতীয়মান হইয়াছে।—অর্থাৎ নিন্দাচ্ছলে স্তুতি হওয়ায় **প্রথম প্রকারের ব্যাজস্তুতি** অলংকার হইযাছে।

(খ) 'শুনহে কুমার! তোমার আজ কুলের উচিত হইল কাজ।
তব হে জনম অতি বিপুলে ভুবন-বিদিত অজের কুলে।
জনক-দুহিতা বিবাহ করি তাহাতে ভাসালে যশের তরী॥' —হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

—এখানে বালকগণ বিবাহ-প্রত্যাগত রামচন্দ্রের নিন্দা-পক্ষে 'অজ = ছাগ, জনক-দুহিতা = ভগিনী' শব্দার্থ যেমন ধরিয়াছে, আবার তেমনি স্তুতি-পক্ষে 'অজ = রামচন্দ্রের পিতামহ; জনক-দুহিতা = জনকরাজকন্যা সীতা' এই অর্থও ধরিয়াছে।—এখানে স্তুতিচ্ছলে নিন্দা হওয়ায় **দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাজস্তুতি** অলংকার হইয়াছে।

অপ্রস্তুত-প্রশংসা

অ-প্রস্তুত মানে অ-প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রশংসা অর্থাৎ বর্ণনা হইতে প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতীতি হইলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকার হয়। ব্যঞ্জনার দ্বারা এই প্রতীতি বা বোধ হয়। অ-প্রস্তাবিত বিষয় হইতে প্রস্তাবিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান পাঁচ রকমে হইতে পারেঃ—(১) অপ্র-স্তাবিত সামান্য অথবা সাধারণ পদার্থ হইতে প্রস্তাবিত বিশেষ পদার্থের বোধ; (২) অ-প্রস্তাবিত বিশেষ পদার্থ হইতে প্রস্তাবিত সামান্য পদার্থের বোধ; (৩) অ-প্রস্তাবিত কার্য হইতে প্রস্তাবিত কারণের বোধ, (৪) অ-প্রস্তাবিত কারণ হইতে প্রস্তাবিত কার্যের বোধ, (৫) অ-প্রস্তাবিত সমান পদার্থ হইতে প্রস্তাবিত সমান পদার্থের বোধঃ যেমন,—

(ক) 'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়াছে পায়,
তা ব'লে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়?' —সত্যেন্দ্রনাথ।

—এখানে কুকুরঘটিত বিশেষ অ-প্রস্তাবিত বিষয়ের দ্বারা সামান্য প্রস্তাবিত বিষয় অর্থাৎ অধমের আচরণ উত্তম অনুসরণ করে না, এই সাধারণ সত্যটি বর্ণিত হইয়াছে।

(খ) 'ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে ;—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে।' —মধুসূদন।

—এখানে ব্যঞ্জনার দ্বারা অ-প্রস্তুত 'চূড়া', 'বজ্রাঘাত', 'ভূধরে'র বর্ণনা হইতে প্রস্তুত 'বীরবাহু', 'রামচন্দ্র' ও 'রাবণে'র অনুভূতি পাওয়া যাইতেছে। বিশেষ হইতে বিশেষের এই যে উপলব্ধি, ইহাই তো অ-প্রস্তুত সমান পদার্থ হইতে প্রস্তুত সমান পদার্থের উপলব্ধি। তাই কাহারও কাহারও মতে, ইহা 'সাদৃশ্যমাত্র-মূলক অপ্রস্তুত-প্রশংসা' বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

(গ) 'পায়ের তলার ধূলা—সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে।'—যতীন্দ্রমোহন।

—এখানে প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয় কিন্তু 'ধূলা' নয়—'ধূলা' তো অ-প্রস্তুত তথা অ-প্রস্তাবিত বিষয়। তবে,—প্রশংসা অর্থাৎ ব্যঞ্জনা-দ্বারা বর্ণনা করিয়া বুঝানো হইয়াছে—'মানুষ কি সেই ধূলি চেয়ে হীন, সহিবে যে অপমান ?'—তাই বিশেষ অ-প্রস্তুত বিষয় হইতে সামান্য প্রস্তুত সম্পর্কে উপলব্ধি হওয়ায় অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকার হইয়াছে।

(ঘ) 'চাতক যাচিলে জল হইয়া কাতর,
মৌনভাবে কভু কি থাকয়ে জলধর ?' —উদ্ভট।

—এখানে ব্যঞ্জনাবলে অ-প্রস্তুত 'চাতক' ও 'জলধরে'র উপরে প্রস্তুত যাচক ও দয়ালু চেতন মানুষের ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে। তাই এখানে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকার হইয়াছে।

(ঙ) রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থে বিশেষ হইতে সামান্যের উপলব্ধিবোধক অপ্রস্তুত-প্রশংসার অনেক উদাহরণ মিলে। 'উদারচরিতানাম্', 'কর্তব্যগ্রহণ', 'কুটুম্বিতা' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা অপ্রস্তুত-প্রশংসার উদাহরণ-রূপে স্মরণীয়।

মন্তব্য : সমাসোক্তি ও অপ্রস্তুত-প্রশংসা—এই দুইটি অলংকারের পার্থক্য লক্ষণীয়। সমাসোক্তি অলংকারে প্রস্তুত বা প্রকৃত বিষয় হইতে অ-প্রস্তুত বা অপ্রকৃত বিষয়ের অনুভব ঘটে, পক্ষান্তরে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলংকারে অ-প্রস্তুত বা অপ্রকৃত বিষয় হইতে প্রস্তুত বা প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধি হয়। ইহার কারণ এই যে, সমাসোক্তিতে প্রস্তুতের উপরে অ-প্রস্তুতের এবং অপ্রস্তুত-প্রশংসায় অ-প্রস্তুতের উপরে প্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হয়।

স্বভাবোক্তি

পদার্থসমূহের স্বভাব-বিষয়ক উক্তি অথবা বর্ণনার দ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি হইলে স্বভাবোক্তি অলংকার হয়। নিসর্গ, মানুষ বা যে কোন প্রাণী-জাতি-গুণ-দ্রব্যসম্পন্ন সৃষ্টির যে-কোন বস্তুই 'পদার্থ'। বস্তুর অ-সাধারণ ধর্ম বা আপন মহিমা, যাহার দরুণ সে অথবা তাহার সৃষ্টির ভিতরে তুলনাহীন—অর্থাৎ বস্তুর বিশিষ্ট আকৃতি, প্রকৃতি, গতি, বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড ও সূক্ষ্ম হাব-ভাব—ইহাই হইতেছে পদার্থের 'স্বভাব'। সাক্ষাৎ বিবরণ, যাহার দরুণ অন্তরে ছবির রস সঞ্চারিত হয়, তাহাই 'উক্তি'। এই অলংকারে বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া কবিমানস বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয় না, কবিমানসকে কেন্দ্র করিয়া বস্তুই স্বমহিমায় শোভমান হয়। দণ্ডীর মতে, ইহাই 'আদ্য অলংকার': যেমন,—

(ক) 'কপোতদম্পতী
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু চুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন। —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে কপোত দম্পতীর মধুর বর্ণনা রহিয়াছে।

(খ) 'দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরংগেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে,
মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতায় নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে,
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে,
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাংক্ষায় নেমে আসে।'
—জীবনানন্দ।

—এইভাবে স্বভাবোক্তি অলংকারে লিখিত এই 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি শুধুই যে 'চিত্ররূপময়' তাহা নয়, গন্ধস্পর্শময়ও বটে।

অনুশীলনী

[এক] নিম্নলিখিত যে কোন দুইটি অলংকারের বিশদ ব্যাখ্যা কর ও উদাহরণ দাও :—সমাসোক্তি ; দৃষ্টান্ত ; নিদর্শনা ; বিষম, ব্যতিরেক ; অতিশয়োক্তি ; অর্থান্তর-ন্যাস ; বিরোধাভাস ; অনুপ্রাস ; শ্লেষ ; উপমা , রূপক , ব্যাজস্তুতি ।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫০, '৫৫, '৫৬, '৫৭

[দুই] উদাহরণসহ যে-কোন তিনটি অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর :— ছেকানুপ্রাস ; ব্যাজস্তুতি , সাংগ-রূপক , সমাসোক্তি ; নিদর্শনা , অর্থান্তর-ন্যাস ; সন্দেহ ; উৎপ্রেক্ষা ; ব্যতিরেক ; অপহ্নুতি ; মালোপমা , বিরোধ , স্বভাবোক্তি , বিভাবনা , প্রতীপ , লুপ্তোপমা . অপ্রস্তুত-প্রশংসা , অতিশয়োক্তি , রূপক . স্বভাবোক্তি , দৃষ্টান্ত , ভ্রান্তিমান্ ; অসংগতি ; নিশ্চয় , বিষম , আক্ষেপ ।

ক. বি বি. এ. (পাস) '৫০. '৫১, '৫৫. '৫৬, '৫৭ , (অনার্স) '৫৬. '৫৭

[তিন] নিম্নলিখিত পদ্যাংশগুলির মধ্যে যে কোন একটিতে ব্যবহৃত অলংকারগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর :—

(ক) কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে , দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি । কভু বা উঠিয়া
পর্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে , কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? **ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫**

(খ) পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া ।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস ।
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস ॥
দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে ।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে ॥

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬

[চার] সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে-কোন দুইটির অলংকার নির্ণয় কর :—

(ক) দেবতা আজি জীবন-ধারা বরিষে মরুক্ষেত্রে।

(খ) দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।

(গ) বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

(ঘ) হরি হরি বোলি ধরণী ধরি উঠই বোলত গদগদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরমভরে বিহি সঞে মাগয়ে পাখ।

(ঙ) হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিপাসা॥

(চ) অসীম নীরব নয়,
ওই গিরি হিমালয়।

(ছ) করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।

(জ) ফাঁকের মধ্য দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখির মত হুশ্‌ ক'রে উড়ে পালায়।

(ঝ) অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

(ঞ) জড়তার পাষাণ-প্রাচীর দিয়ে ঘেরা
দুর্গমাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যেরা।

(ট) সুদূর গোঠের শ্যামবার্তা কি
স্মরিছে রে বার্তাকু!
কচি বুক হাটে সুলভ করিতে
ফলে ফালা দিল চাকু!

(ঠ) সভাকবি—ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ! অর্থের বড় টানাটানি
নটরাজ—নইলে রাজদ্বারে আস্‌ব কোন্‌ দুঃখে।

(ড) লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি।
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।

(ঢ) সেই অপদার্থ ক্লীব হবে সেনাপতি?
শ্রেষ্ঠ যত বীর রণে হইবে চালিত
তাহার ইংগিতে, শশক হইবে নেতা
মৃগেন্দ্রকুলের?

(ণ) হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিংগল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত ভানু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

(ত) নয় নয় ওতো আষাঢ়-গগনে
জলদের গরজন ;
দুনিয়াব যত চাপা ক্রন্দন
গুমরি উঠিছে শোন্।

(থ) সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুব,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে।

(দ) যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়েব পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,
ফিরে না ফিবে না আব ফিরে না যৌবন।

(ধ) বনে-জংগলে মৃগ আছে কত,
কস্তূরী-মৃগ কয়টা মেলে ?
মানুষ ত কত দেখিলে জীবনে,
বসিক-মানুষ কয়টা মেলে ?

(ন) হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা-পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে। ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধবি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র-মেখলা-পরা তব কটিদেশ।

(প) সঘন মেঘে বরষা আসে, বরষে ঝর ঝর,
কাননে ফুটে নবমালতী কদম্বকেশর।
স্বচ্ছহাসি শরৎ আসে পূর্ণিমা মালিকা,
সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।

(ফ) হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীম নাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥

(ব) অগ্নি-আঁখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
চেন' কি তাদের ভাই?
দুই তুরংগ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েবি বল্গা নাই?

(ভ) ঘুমাও বন্ধু, ঘুমাও বন্ধু, সবই বন্ধন-লীলা,
চরকা ঘোরে ত ঘোবে নাকো টাকু রসি যদি হয় ঢিলা।

(ম) নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনেব মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখ্‌তে পাচ্ছেন।

(য) তার চেয়ে এস প্রভাত-আলোকে চেয়ে থাকি দূরে—
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জরিব ডুরে।

(র) কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে?

(ল) বন্ধন চাহে না কেহ, মুক্তি চায় সবে।
ভুজবন্ধনের মাঝে কিন্তু তব হায়
কে না চায় ধরা দিতে?

(ব) পাণ্ডবের সখা তুমি, গোপিকা-মোহন
যশোদা-নয়নমণি, দুর্জনেব সাক্ষাৎ শমন।

(হ) চাঁদের ছায়াটি আসি পড়িয়াছে সরসীর বুকে,
যেন কোন্ দেববালা পরম কৌতুকে
দেখিতেছে নিজ-মুখ জলের মুকুরে
চুপি চুপি।

(শ) মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা-আঁধার পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নবপ্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

(ষ) নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদবেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্তসন্ধ্যা স্বপ্নের ভেলায়,
বনের মঞ্জীর ধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়
শ্রান্তিক্লান্তিভবে ॥

(স) সুকৃষক যেই হয়, পরিপক্ক শষ্যায়,
সে করে ছেদন সুসময় ।
তুই কাল নিদারুণ নাহি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্যচয় ॥

ক. বি. বি এ. (পাস) '৫০, '৫১, '৫৬, '৫৭ , (অনার্স) '৫১, '৫৬, '৫৭

[ছয়] দুইটি বিরোধমূলক অলংকারের উল্লেখ কর ও উদাহরণসহ সেই দুইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । **ক. বি. (অনার্স) '৫১**

[সাত] সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও অতিশয়োক্তির উপমেয় ও উপমানের সম্পর্ক-বিচারে কিরূপ ক্রমোৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়, তাহা উপযুক্ত উদাহরণ-সহযোগে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া লিখ । **উ. বি. বি. এ. (সাপ্লি) '৫৬**

[আট] নিম্নলিখিত অলংকারগুলি উদাহরণ-যোগে ব্যাখ্যা কর :—ধ্বন্যুক্তি , পুনরুক্তবদাভাস , উল্লেখ , প্রতিবস্তূপমা , বিশেষোক্তি ; কারণমালা , একাবলী , সার , আরোহ , কাব্যলিংগ বা হেতু অলংকার , স্মরণ : আন্ত অলংকার ।

[আট] নিম্নলিখিত অলংকারগুলির পার্থক্য উদাহরণ-সহযোগে বুঝাইয়া দাও :—(ক) শ্লেষ-বক্রোক্তি ও শ্লেষ , (খ) শ্লেষ-বক্রোক্তি ও কাকু-বক্রোক্তি ; (গ) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা , (ঘ) সমস্তবস্তুবিষয়ক সাংগ রূপক ও একদেশবিবর্তী সাংগ রূপক , (ঙ) অপহ্নুতি ও নিশ্চয় , (চ) সন্দেহ ও উৎপ্রেক্ষা , (ছ) প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনা , (জ) অতিশয়োক্তি ও রূপক ; (ঝ) রূপকাতিশয়োক্তি ও অতিশয়োক্তি , (ঞ) ব্যতিরেক ও প্রতীপ ; (ট) বিরোধাভাস ও বিরোধোক্তি , (ঠ) সমাসোক্তি ও অপ্রস্তুত-প্রশংসা ; (ড) সার ও আরোহ ।

[দশ] অলংকারগুলির সংজ্ঞাসমেত উদাহরণ দাও :—মালানুপ্রাস , মালোপমা ; মালারূপক , মালা-উৎপ্রেক্ষা , মালাদৃষ্টান্ত ; মালাব্যতিরেক , মালা-অর্থান্তর-ন্যাস ।

[এগার] উদাহরণ-যোগে অলংকারগুলির বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় দাও :—অনুপ্রাস , যমক ; শ্লেষ ; বক্রোক্তি , উপমা , উৎপ্রেক্ষা ; রূপক , অপহ্নুতি ; উল্লেখ ; অতিশয়োক্তি , প্রতীপ ; বিরোধাভাস , বিষম , অর্থান্তর-ন্যাস , ব্যাজস্তুতি ; অপ্রস্তুত-প্রশংসা ।

[বারো] **অলংকারাদি নির্ণয় করিয়া সংজ্ঞাগুলি লিপিবদ্ধ কর :—**

(ক) 'বিকসিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার।' —রবীন্দ্রনাথ

(খ) 'রূপে হ'লে অপ্সরী, আর নৃত্যগীতে কিন্নরী,
শ্লোক-রচনায় সরস্বতী ধীশ্রীমতী সুন্দরী।' —সত্যেন্দ্রনাথ

(গ) 'বাঁধিলা কবরী
উঠাইয়া ভুজদ্বয় বাঁকিয়া পশ্চাতে
অনংগের ধনুপ্রায়—দু'টি পুষ্পকলি
শোভিল সে মনোহর অনংগ-ধনুকে
দু'টি সুবর্ণের শর নয়ন-বঞ্জন।' —কায়কোবাদ।

(ঘ) 'কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য? কিংবা মায়া?' —রবীন্দ্রনাথ।

(ঙ) 'ডালিমকন্যা! ডালিমের মত তোমার রঙীন ঠোঁটে—
কত আকাশের শত বসন্ত রামধনু হ'য়ে লোটে।' -আশ্‌রাফ সিদ্দিকী।

(চ) 'মেঘ-তাঞ্জাম চলে কার আর যায় কেঁদে যায় দেয়া
পরপার-পারাপারে বাঁধা কার কেতকী-পাতার খেয়া?' —নজরুল।

(ছ) 'অপলক নেত্র তার আলোকসুষমা
গণ্ডূষে সাগরসম করিল নিঃশেষ।' —মোহিতলাল।

(জ) 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' —চণ্ডীদাস।

(ঝ) 'একখানা হাসি,—যেন আকাশের একখানা মেঘ ছেয়ে,
পূর্ণ চাঁদের জোছনার জল পড়ছিল বেয়ে বেয়ে।' —জসীম উদ্‌দীন।

(ঞ) 'ভুরু দেখি ফুল-ধনু ধনু ফেলাইয়া
লুকায় মাজার মাঝে অনংগ হইয়া।' —ভারতচন্দ্র।

(ট) 'মায়ের মুখের হাসির মত কমল-কলি উঠ্‌ল ফুটে।' —গোলাম মোস্তফা।

(ঠ) 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অংগ লাগি কান্দে প্রতি অংগ মোর॥' —জ্ঞানদাস।

[তেরো] উপমেয় 'মুখ' এবং উপমান 'চাঁদ'কে অবলম্বন করিয়া রূপক, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, সন্দেহ ও উৎপ্রেক্ষা অলংকার-বোধক দৃষ্টান্তাদি রচনা কর। [উত্তর—(ক) রূপক—'মুখ-চাঁদ'; (খ) ব্যতিরেক—'চাঁদ জিনি মুখ'; (গ) অপহ্নুতি—'মুখ নহে, চাঁদ'; (ঘ) নিশ্চয়—'মুখই, চাঁদ নহে'; (ঙ) সন্দেহ—'মুখ? না চাঁদ?'; (চ) উৎপ্রেক্ষা—'মুখ যেন চাঁদ'।]

অষ্টম পর্ব

ছন্দ-প্রকরণ

যখন মানবহৃদয় জগৎ ও জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া ভাবাবেগে স্পন্দিত হইয়া ছন্দিত বাণী রচনা করে, তখনই হয় **কবিতার সৃষ্টি**। পরিমিত পদবিন্যাস, যাহা বাক্য-পরম্পরায় ভাষাগত ধ্বনিপ্রবাহের 'সুসমঞ্জস ও তরংগায়িত ভংগী রচনা করে, তাহাকেই বলা হয় **ছন্দ** (**Metre**)।' এই ধ্বনিগত সংগীতমধুর ও তরংগঝংকৃত ভংগীই **ছন্দোস্পন্দ** (**Rhythm**) নামে অভিহিত। 'ছন্দ' ও 'ছন্দোস্পন্দ' এক নয়—ভিন্ন। ছন্দোস্পন্দ বাক্য-পরম্পরায় পরিমিত পদবিন্যাসের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে ছন্দের সৃষ্টি হয়। গদ্য রচনাতেও অনেক সময় ছন্দ প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহা আকস্মিক। পদ্যের ছন্দ আকস্মিক নয়—রচনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সবটাই ছন্দোময়।

কবিতামাত্রেরই ছন্দসৌন্দর্য পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার **চরণকে কেন্দ্র** করিয়াই একটি পূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহ সঞ্জাত হয়—এই ধ্বনিপ্রবাহকে তরংগায়িত করিবার মূলে থাকে কতিপয় **পর্ব** আর এই পর্বগুলিকে একটি সামঞ্জস্যের মধ্যে বাঁধিয়া রাখে নির্দিষ্ট পরিমাণের **মাত্রা**। মোট কথা, পরিমিত মাত্রার পর্বযুক্ত চরণকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলা ছন্দের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পদ্যের ন্যায় গদ্যেও নানা প্রকারের পর্ব থাকে। কিন্তু পদ্যে বিভিন্ন পর্বের মধ্যে যেমন মাত্রাগত সমতা থাকে, গদ্যে তাহা থাকে না। পদ্যের পর্ববিভাগ নির্ভর করে তাহার **রূপকল্প** বা **আদর্শের** (**Pattern**) উপর, আর গদ্যের পর্ববিভাগ নির্ভর করে বাক্যাংশের ভাবের উপর। বিভিন্ন 'রূপকল্প' অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ছন্দের সৃষ্টি হয়। পদ্যে ছন্দের এক একটি 'রূপকল্পে'র পুনরাবৃত্তিতে বাক্যসমূহের মধ্যে একপ্রকার ছন্দোগত ঐক্য উদ্ভূত হয়। এই ঐক্যানুভূতির সাহায্যে ছন্দবোধ জন্মে। ছন্দে স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি বজায় রাখা প্রয়োজন। উচ্চারণের পার্থক্য-অনুসারে এবং ধ্বনিপ্রকৃতির জন্য বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ছন্দগঠনের বিভিন্ন অংশ

অক্ষর (Syllable)

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় উচ্চারিত ধ্বনিকে **অক্ষর** বলে। অর্থাৎ—'উচ্চারণ-সাধ্য হ্রস্বতম ধ্বনি'ই 'অক্ষর'। অক্ষর দুই প্রকার :— **স্বরান্ত** এবং **ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত**। স্বরান্ত অক্ষর 'বিবৃত' (open syllable) : যেমন,—'না, কে, ল' ইত্যাদি। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর 'সংবৃত' (closed syllable) : যেমন,—'হাত্, বল্, নীচ' ইত্যাদি।

অনুপ্রাসের উপর নির্ভর করিয়া অক্ষরকে আরো দুইভাগে ভাগ করা যায়: যেমন,—**মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর**। **মিত্রাক্ষর**—সমধ্বনিময় অক্ষরসমূহকে **মিত্রাক্ষর** বলে। এই জাতীয় মিত্রতা বা মিল সৃষ্টি করিতে হইলে—(ক) শব্দের শেষে হলন্ত (হসন্ত) অক্ষর থাকিলে শেষের ব্যঞ্জন ও ঠিক তাহার পূর্ববর্তী স্বরটি একজাতীয় হইবে; (খ) শব্দের শেষে স্বরান্ত অক্ষর থাকিলে শেষের ব্যঞ্জন ও তাহার ঠিক পূর্ববর্তী স্বর এবং শব্দের সর্বশেষ স্বর একজাতীয় হইবে: যেমন,—(হলন্ত অক্ষরের মিত্রতা) 'ধন ও জন'; 'বসন ও ভূষণ' ইত্যাদি: (স্বরান্ত অক্ষরের মিত্রতা) 'বাকা ও ঢাকা; 'বালা ও কালা' ইত্যাদি। এই জাতীয় মিত্রাক্ষর অনুপ্রাস-সৃষ্টির জন্য পদ্যে চরণের শেষে বা চরণের মধ্যস্থ পর্ব বা পর্বাংশের শেষেও ব্যবহৃত হয়। মিত্রাক্ষর সৃষ্টির নিয়ম এবং অনুপ্রাস গঠনের নিয়ম কিন্তু একই। পদ্য-রচনায় প্রতি দুই চরণে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে, প্রথম ও তৃতীয় চরণে সাধারণত অনুপ্রাস বা মিত্রাক্ষর থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মিলকে **মধ্যসম**, প্রথম ও তৃতীয় চরণের আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের মিলকে **পর্যায়সম অনুপ্রাস** বা **মিত্রাক্ষর** বলে। **অমিত্রাক্ষর**—পদ্য-রচনায় বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে পূর্বোক্ত মিত্রতা বজায় না থাকিলেই **অমিত্রাক্ষর** হয়।

যে-ছন্দে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার থাকে, তাহাই **মিত্রাক্ষর ছন্দ**। তেমনি অমিত্রাক্ষরও একটি ছন্দের নাম। পয়ার বা মহাপয়ারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত চরণান্তিক অনুপ্রাসহীন পদ্যের ছন্দকে **অমিত্রাক্ষর ছন্দ** বলে।

মাত্রা (Mora বা Instant)

অক্ষর উচ্চারণের সময়কে (Duration) **মাত্রা** বলে। হ্রস্ব-স্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণের প্রয়োজনীয় সময়কে **এক মাত্রা** ধরা হয়: যেমন,—মনে পড়ে (১+১, ১+১)। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর (ঐ, ঔ) উচ্চারণের সময়কে **দুই মাত্রা** ধরা হয়। কিন্তু পদ্যরচনায় ব্যঞ্জনান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরকে প্রয়োজন-বোধে এক মাত্রারও ধরা হয়। শব্দের শেষ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর দুই মাত্রার এবং শব্দের মধ্যবর্তী অন্য সব ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে এক মাত্রার বলিয়া ধরা হয়: যেমন,—দীপ্+তি (১+১), কিন্তু অঞ্জন—অন্+জন্ (১+২)। যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষর সাধারণত দ্বিমাত্রিক। যেমন—বন্ধ, তপ্ত, মন্দ প্রভৃতি শব্দের 'ব', 'ত', 'ম' অক্ষরগুলি দুই মাত্রার। অবশ্য ইহাও ধরাবাঁধা নিয়ম নয়। কারণ,—তানপ্রধান বা পয়ার জাতীয় ছন্দে এই অক্ষরগুলি একমাত্রিক। প্রসংগত, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে

গ, শ্বাসাঘাতপ্রধান বা স্বরবৃত্ত ছন্দে শব্দশেষের হলন্ত অক্ষর, যাহা সাধারণত দ্বিমাত্রিক, তাহা একমাত্রিকও হইতে পারে।

উচ্চারণকালে সংস্কৃত, গ্রীক, আরবী, ফারসী, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষায় অক্ষরের মাত্রা সম্পর্কে পূর্বনির্দিষ্ট কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। **বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বা ঢঙের উপরে নির্ভর করিয়াই অক্ষরের মাত্রা স্থিরীকৃত হয়।** ছন্দের প্রকৃতি-ভেদে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরের (অ, আ, ই, উ ইত্যাদির) এক মাত্রা দুই মাত্রায় আবার যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের (ঐ, ঔ ইত্যাদির) দুই মাত্রা এক মাত্রায় পরিণত হইতে পারে: যেমন,—'**আ**সিল যত। **বী**রবৃন্দ। **আ**সন তব। **ঘে**রি'—এই চরণটিতে 'আ', 'বী', 'আ', ও 'ঘে'—এই চারিটি মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরের প্রত্যেকটিই **দ্বিমাত্রিক**। আবার 'ফেরে দূরে, মত্ত সবে। উৎসব-**কৌ**তুকে'—এই চরণটিতে 'কৌ'—এই যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরটি **একমাত্রিক**। ছন্দের প্রকৃতি-ভেদে দীর্ঘ অক্ষরের এই যে হ্রস্ব অক্ষরে এবং হ্রস্ব অক্ষরের এই যে দীর্ঘ অক্ষরে পরিণতির ব্যাপারটি, ইহাই যথাক্রমে **হ্রস্বীকরণ** ও **দীর্ঘীকরণ** নামে পরিচিত। অবশ্য হ্রস্বীকরণ সম্পর্কে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন পর্বে পর পর তিনটি হলন্ত অক্ষর থাকিলে, উহাদের মধ্যে দুইটিকে একমাত্রিক তথা হ্রস্ব ধরিয়া, বাকিটিকে দ্বিমাত্রিক তথা দীর্ঘ বলিয়া ধরিতেই হইবে। যেমন,—'চঞ্চল মন = চন্ + চল্ + মন্'—ইহাতে আছে ১ + ১ + ২ মাত্রা।

শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, প্রস্বর বা বল (Accent বা Stress)

শব্দের উচ্চারণে অনেক সময় কোন কোন অক্ষরে একটু বেশী ঝোঁক পড়ে। এই ঝোঁককেই **শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, প্রস্বর** বা **বল** বলে। বাংলা শব্দ উচ্চারণে সাধারণত প্রথম অক্ষরেই ঝোঁক পড়ে, কিন্তু বাক্য বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত হইলে, পর্বের প্রথম অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়ে। বলা বাহুল্য, সজোরে উচ্চারণ করিতে গেলে সেই শ্বাসাহত স্বরের গাম্ভীর্য পর্বের অপরাপর অক্ষরের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করিবেই। হলন্ত অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়িলে তাহার মাত্রাসংখ্যা এক হয়। শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে পর্বের হলন্ত অক্ষরে ঝোঁক পড়িলে ঐ পর্বস্থ সকল অক্ষরই এক মাত্রার হইয়া যায়। শ্বাসাঘাতের দৃষ্টান্ত :—

'/রাত পোহাল। /ফরসা হল
/ফুটল কত। /ফুল',

ছেদ (Sense-Pause) ও যতি (Metrical Pause)

'ধ্বনিগত সমগ্র অংশ বা অর্থাংশ প্রকাশের প্রয়োজনে ধ্বনিপ্রবাহে যে উচ্চারণ-বিরতি আবশ্যক হয়, তাহার নাম **অর্ধযতি**—ইহার প্রচলিত নাম **ছেদ**।' অর্থাৎ নিশ্বাস-গ্রহণের সুবিধার জন্য **অর্থবোধের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া** বিভিন্ন বাক্যাংশের শেষে যে-বিরাম ব্যবহার করা হয়, তাহাকে **ছেদ** বা **অর্থ-যতি** বা **ভাব-যতি** বলে। ছেদের সংগে বাক্যের অন্তর্গত ভাবের সম্পর্ক থাকে। বাক্যের শেষে **পূর্ণচ্ছেদ** এবং বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন বাক্যাংশের পরে **উপচ্ছেদ** ব্যবহার করা হয়: যেমন,—

'ছিঁড়িয়াছি ফুলমালা, জুড়াতে মনের জ্বালা,

চন্দনে চর্চিত দেহে ভস্মের লেপন।

কবিতায় অনেক সময় ছেদ এবং যতি একই সংগে পড়ে: যেমন,—

'গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা, ॥

কূলে একা বসে আছি | নাহি ভরসা।' ॥

তবুও **ছেদ এবং যতির পার্থক্য** লক্ষণীয়। ছন্দের বিভিন্ন আদর্শের (**Pattern**) প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পদ্যপাঠকালে নিশ্বাসের বিরামকে **যতি** বলে। যতির ব্যবহার বাক্যে **অর্থগ্রহণের উপর নির্ভর করে না**—এখানে লক্ষণীয় ছন্দের **রূপকল্পটি** (**Pattern**)। কবিতায় ধ্বনিপ্রবাহ যখন এক-একবারের ঝোঁকে (**Impulse**) কিছুটা উচ্চারিত হইবার পর জিহ্বা ক্ষণিক বিরাম গ্রহণ করে, তখনই পড়ে **যতি**। চরণের শেষে যে-যতির ব্যবহার হয়, তাহাকে **পূর্ণযতি** বলে। চরণের মধ্যস্থ পর্বের শেষে যে-যতি ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **অর্ধযতি** বলে।

[অর্ধযতি স্থাপনের সংকেত—(|) এবং পূর্ণযতি স্থাপনের সংকেত— (॥)। দৃষ্টান্ত:

'মহাভারতের কথা | অমৃত-সমান ॥

কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান ॥]

পর্ব (Bar) বা পদ (Foot) ও পর্বাংগ (Beat)

চরণস্থ অর্ধযতি-দ্বারা বিচ্ছিন্ন ধ্বনিপ্রবাহকে **পর্ব** বলে। কাহারও কাহারও মতে, পর্বেরই অপর নাম **পদ (Caesuric Foot)**। পর্বের ছোট ছোট বিভাগকে **পর্বাংগ** বলে। পর্বাংগের পরে যতির ব্যবহার হয় না। কিন্তু কবিতা পড়িবার সময় ইহা কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে অনুভূত হয়। **ইহা একান্তভাবে স্মরণীয়** যে চার মাত্রার কমে **পর্ব গঠিত হয় না এবং পর্বে দশের বেশী মাত্রা-সমাবেশ করা যায় না।** দৃষ্টান্ত:

পর্ব

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ললাটে : জয়টীকা | প্রসূন : হার গলে চলেরে : বীর চলে

পর্বাংগ পর্বাংগ

—এখানে পর্বাংগদ্বয়ের একটিতে তিন মাত্রা এবং অপরটিতে চার মাত্রা থাকায় পর্বে মোট সাত মাত্রার সমাবেশ হইয়াছে। [:]—এই চিহ্নের সাহায্যে পর্বের বিভাগ অর্থাৎ পর্বাংগ প্রদর্শিত হইয়াছে।

চরণ (Verse), পংক্তি (Line) ও স্তবক (Stanza)

ছন্দের পূর্ণরূপ প্রকাশে যতগুলি পর্বের প্রয়োজন, ততগুলি পর্বকে লইয়া এক একটি **চরণ** গঠিত হয়। পূর্ণযতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহেরই নাম **চরণ**। চরণ কতকগুলি পর্বের সমষ্টি। সাধারণত একটি চরণে দুই, তিন, চার এবং কদাচিৎ পাঁচটি পর্ব থাকে। **পংক্তি এবং চরণ এক কথা নয়**। অনেক সময় চরণকে ভাঙিয়া বিভিন্ন **পংক্তিতে (Line)** সাজানো হয়: যেমন,—ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দ। ত্রিপদীর চরণস্থিত তিনটি পর্বকে আলাদা করিয়া দুইটি পংক্তিতে সাজানো যায়। এইরূপ চৌপদীর চরণস্থ চারিটি পর্বকেও আলাদা করিয়া দুইটি পংক্তিতে সাজানো যায়। সাধারণত চরণ-মধ্যবর্তী অনুপ্রাসের অবস্থান বুঝাইবার নিমিত্তই চরণকে ভাঙিয়া বিভিন্ন পংক্তিতে রাখা হয়। প্রসংগত একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কবিতাবিশেষের চরণগুলির দৈর্ঘ্য একই রূপ না-ও হইতে পারে। কারণ,—চরণের দৈর্ঘ্য নয়, পরিমিত মাত্রায় গঠিত পর্বই বাংলা ছন্দের মূল বনিয়াদ। দুই বা ততোধিক চরণ সুশৃংখল ভাবে পর পর সন্নিবেশিত হইলে একটি **স্তবক** বা **চরণগুচ্ছ** গঠিত হয়। কবির ইচ্ছানুসারে দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় প্রভৃতি যে কোন সংখ্যক চরণ লইয়া **স্তবক** গঠন করা চলে। স্তবকের অন্তর্গত চরণগুলি নির্দিষ্ট হয় চরণশেষের অন্ত্যপ্রাস বা মিলনের সাহায্যে।

বাংলা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ

মনে হইতে পারে যে, বাংলা ভাষার সংগে সংস্কৃত ভাষার যখন একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, তখন সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় বাংলা ছন্দের প্রকার-ভেদ বা শ্রেণী দুইটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃত ছন্দের সহিত বাংলা ছন্দের মিল থাকিলেও উভয় ছন্দেরই প্রকৃতি প্রকৃতই পৃথক্। বলা বাহুল্য, উভয় ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি ও উচ্চারণ-রীতির পার্থক্যই এই গরমিলের কারণ।

সংস্কৃত ছন্দের দুইটি বিভাগ বা **শ্রেণী:** যথা,—'বৃত্ত' ও 'জাতি'। অক্ষর-সংখ্যার দ্বারা **বৃত্তচ্ছন্দ** আর মাত্রাসংখ্যার দ্বারা **জাতিচ্ছন্দ** নিয়মিত হয়। বৃত্তচ্ছন্দ অক্ষরসর্বস্ব ও জাতিচ্ছন্দ মাত্রাসর্বস্ব। বৃত্তচ্ছন্দের অপর নাম **অক্ষরবৃত্ত** বা **বর্ণবৃত্ত** আর মাত্রাচ্ছন্দের অপর নাম **মাত্রাবৃত্ত**। বৃত্তচ্ছন্দের শ্রেণীতে পড়ে তোটক, স্রগ্বিণী, তূণক, রুচিরা, মালিনী, পঞ্চচামর, মন্দাক্রান্তা, ভুজংগপ্রযাত প্রভৃতি আর জাতিচ্ছন্দের শ্রেণীতে পড়ে পজ্ঝটিকা, আর্যা প্রভৃতি।

কিন্তু বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগ বা **শ্রেণী:** যথা,—তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও শ্বাসাঘাতপ্রধান। **তানপ্রধান ছন্দের অপর নাম অক্ষরবৃত্ত, অক্ষর-মাত্রিক, সংকোচনপ্রধান, যৌগিক** বা **মিশ্র-প্রকৃতিক ছন্দ**। বাংলা কাব্য-কবিতায় এই বহুল-ব্যবহৃত পয়ার জাতীয় ছন্দকে ইংরাজিতে **Mixed Metre** বা **Composite Metre** বলা হয়। **ধ্বনিপ্রধান ছন্দের অপর নাম মাত্রাবৃত্ত, ধ্বনিমাত্রিক** বা **বিস্তারপ্রধান ছন্দ**। ইংরাজিতে এই ছন্দের নাম **Moric Metre**। **শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের অপর নাম স্বরবৃত্ত, স্বরমাত্রিক, বলপ্রধান** বা **স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ**। অতি-ব্যবহৃত এই বাংলা **লৌকিক ছন্দটিকে** তথা **ছড়ার ছন্দটিকে** ইংরাজিতে **Stressed Metre** বা **Syllabic Metre** বলা হয়।

[এক] তানপ্রধান ছন্দ

তানপ্রধান ছন্দে প্রতিটি অক্ষর (**Syllable**) একমাত্রিক; তবে শব্দের শেষের ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক। এই ছন্দের চালও দ্বিমাত্রিক; অর্থাৎ তান-প্রধান ছন্দে কবিতা পাঠ করিবার সময় যে কোন দুই মাত্রার পরে থামা যায়। এই ছন্দের প্রতিটি পর্বে যতই কেন না যুক্ত ব্যঞ্জন, যৌগিক স্বর অথবা যুগ্মধ্বনি সন্নিবেশিত হোক, উহাদের স্বরধ্বনিকে সর্ব স্থানেই হ্রস্ব ধরা হয়—তাই প্রতিটি অক্ষর এক মাত্রার। অক্ষর উচ্চারণের ধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া একটা **অতিরিক্ত** তান বা সুরের তরংগ চরণগুলির মধ্যে খেলা করে বলিয়াই এই ছন্দের নাম **তানপ্রধান**। তাই হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের বেলাতেই শুধু নয়, যুগ্মধ্বনির ক্ষেত্রেও সংকোচন-প্রসারণ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে। অন্য কোন প্রকার ছন্দেই অক্ষরের এতখানি স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয় না। তানপ্রবাহেরই দরুণ লঘু-গুরু অক্ষরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধিত হয়। তান-প্রভাবে যুগ্মধ্বনি অথবা যুক্তাক্ষরের এই যে একমাত্রায় সংকোচনশীলতা, ইহাই রবীন্দ্র-নাথের মতে, **'পয়ারের শোষণশক্তি'**।

অতিরিক্ত সুর অর্থাৎ তানপ্রবাহ থাকায় ও দীর্ঘ পর্ব ব্যবহৃত হওয়ায় তানপ্রধান ছন্দের গতি মন্থর অর্থাৎ এই ছন্দটি ধীর লয়ে চলে; আবার ধ্বনিও বেশ গম্ভীর হয়

বলিয়া এই তানপ্রধান ছন্দ গম্ভীর ভাবময় উচ্চশ্রেণীর কবিতার যথোপযুক্ত বাহন। সত্য কথা বলিতে কি, এই ছন্দের পর্বমধ্যে যে-কোন মাত্রার পর ছেদকে বসানো যায় এবং অর্ধযতি অথবা পূর্ণযতির অধীনতা হইতে ছেদ অনায়াসেই মুক্ত থাকে বলিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনাকালে তানপ্রধান ছন্দই ব্যবহার করিতে হয়।

পূর্বে অক্ষরের (বর্ণের) সংখ্যা-অনুযায়ী মাত্রা-সমাবেশ করা হইত বলিয়া তান-প্রধান ছন্দকে **অক্ষরবৃত্ত ছন্দও** বলে। অবশ্য তখন **'Syllable'** অর্থে 'অক্ষর' শব্দটি ব্যবহৃত হইত না।

তানপ্রধান ছন্দের কয়েকটি উদাহরণ

লঘু পয়ার বা **দ্বিপদী**—পয়ারের প্রতিটি চরণ দ্বিপর্বিক। চরণের মাত্রাসংখ্যা চোদ্দ। দুই চরণে স্তবক গঠিত হয়। চরণশেষে অন্ত্যানুপ্রাস থাকে। এই ছন্দের লয় অর্থাৎ গতি ধীর। চরণস্থ পর্বের মাত্রা-সংকেত—(৮ + ৬) : যেমন,—

'কে যেন রচিতেছিল | ছায়া-রৌদ্রকরে ॥
অরণ্যের সুপ্তি আর | পাতার মর্মরে।' ॥

তরল পয়ার—ইহা লঘু পয়ারেরই একটি রূপভেদ। এই ছন্দে লঘু পয়ারের ন্যায় চরণশেষে অন্ত্যানুপ্রাস তো থাকেই, অধিকন্তু চতুর্থ এবং অষ্টম অক্ষরেও অতিরিক্ত অনুপ্রাস থাকে : যেমন,—

'দেখ দ্বিজ মনসিজ | জিনিয়া মুরতি ॥

পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র | পরশয়ে শ্রুতি' ॥

মালঝাঁপ পয়ার—ইহা লঘু পয়ারেরই আর একটি রূপভেদ। এই পয়ারে চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে অনুপ্রাস থাকে। অর্থাৎ লঘু পয়ারের চরণান্তিক মিল ও তরল পয়ারের বৈশিষ্ট্য (চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষরে মিল) ছাড়াও দ্বাদশ অক্ষরে একটা অতিরিক্ত মিল সংযোজিত হয় : যেমন,—

'গুণহীন চিরদিন | পরাধীন রয় ॥

নাহি সুখ ম্লানমুখ | চিরদুখ সয়' ॥

পর্যায়সম পয়ার—এই পয়ারে প্রথম-তৃতীয় চরণে এক ধরণের অনুপ্রাস এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে আর এক ধরণের অনুপ্রাস থাকে : যেমন,—

'মা আমার স্নেহময়ী | করুণারূপিণী, ॥
এ জগতে কোথা আছে | তুলনা তোমার ? ।
স্নেহের মূরতিরূপে | আছ গো জননী—॥
অনুপম স্নেহ তব | অনন্ত অপার ।' ।

মধ্যসম পয়ার—এই পয়ারে দ্বিতীয়-তৃতীয় চরণে এক রকমের অনুপ্রাস এবং প্রথম-তৃতীয় চরণে আর এক রকমেব অনুপ্রাস থাকে : যেমন,—

'স্বপনে ভ্রমিনু আমি | গহন কাননে ॥
একাকী দেখিনু দূরে | যুবা একজন, ॥
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে | প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ॥
দ্রোণ যেন ভয়শূন্য | কুরুক্ষেত্র-রণে ।' ॥

দীর্ঘ পয়ার বা **দীর্ঘ দ্বিপদী** বা **মহাপয়ার**—এই পয়ারেব মাত্রা-সংখ্যা আঠারো। চরণস্থ পর্বের মাত্রা-সংকেত—(৮+১০) : যেমন,—

'পূর্ণিমা-নিশীথে যবে | দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি ॥
দূরস্মৃতি কোথা হতে | বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি ।' ॥

অমিল মহাপয়ার—এই পয়ারে চরণান্তিক অনুপ্রাস থাকে না : যেমন,—

'এই বাণী গাব আমি | প্রভাতে প্রথম জাগা পাখী ॥
যে সুর ঘোষণা করে | আপনাতে আনন্দ আপন' ॥

[বি. দ্র. মহাপয়াব **সমিল** ও **অমিল**—দুই রকমেরই হইতে পারে।]

লঘু ত্রিপদী—প্রতি চরণে তিনটি পর্ব। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শেষে অনুপ্রাসের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য প্রতিটি চরণ ভাঙিয়া দুই পংক্তিতে সাজানো। পর্বের মাত্রা-সংকেত—(৬+৬+৮)। চরণান্তিক অনুপ্রাসও লক্ষণীয় : যেমন,—

সৌভাগ্যের দ্বার | খোলা অনিবার |
আছে সকলের তরে, ॥
উদ্যোগী যেজন | কর্মপরায়ণ |
'প্রবেশিতে সেই পারে !' ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী—প্রকৃতিগত দিক দিয়া নয়, মাত্রাগত দিক দিয়াই লঘু ত্রিপদীর

সংগে এই দীর্ঘ ত্রিপদীর পার্থক্য লক্ষণীয়। দীর্ঘ ত্রিপদীর পর্বস্থ মাত্রা-সংকেত—(৮+৮+১০): যেমন,—

'বলো না কাতর স্বরে | বৃথা জন্ম এ সংসারে |
এ জীবন নিশার স্বপন, |
দারা পুত্র পরিবার | তুমি কে, কে তোমার |
ব'লে জীব ক'রনা ক্রন্দন।' ||

লঘু চৌপদী—প্রতিটি চরণে চারিটি করিয়া পর্ব থাকে। চরণান্তিক অনুপ্রাসের ব্যবহার আছে। চরণগুলি ভাঙিয়া দুই পংক্তিতে সাজানো হয়। পর্বের মাত্রা-সংকেত—(৬+৬+৬+৫): যেমন,—

'চিরসুখী জন | ভ্রমে কি কখন |
ব্যথিত বেদন | বুঝিতে পারে |
কি যাতনা বিষে | বুঝিবে সে কিসে |
কভু আশীবিষে | দংশেনি যারে' ||

দীর্ঘ চৌপদী—এখানের প্রকৃতির দিক হইতে নয়, মাত্রার দিক হইতেই লঘু চৌপদীর সংগে এই দীর্ঘ চৌপদীর পার্থক্য লক্ষণীয়। এই চৌপদীর পর্বের মাত্রা-সংকেত—(৮+৮+৮+৬) বা (৮+৮+৮+৭) বা (৮+৮+৮+১০): যেমন,—

(ক) 'মিছা দারা সুত লয়ে | মিছা সুখে সুখী হয়ে |
যে রহে আপনা কয়ে | সে মজে বিষাদে' |

—ইহার মাত্রা-সংকেত (৮+৮+৮+৬)।

(খ) 'ভরদ্বাজ-অবতংশ | ভূপতি রায়ের বংশ |
সদা ভাবে হত-কংস | ভুরশুটে বসতি' ||

—ইহার মাত্রা-সংকেত—(৮+৮+৮+৭)।

(গ) 'দুর্জয়ের জয়মালা | পূর্ণ করে মোর ডালা |
উদ্দামের উতরোল | বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে'।

—ইহার মাত্রা-সংকেত—(৮+৮+৮+১০)।

একাবলী—পয়ার এবং ত্রিপদীর ন্যায় এই ছন্দেও দুইটি মিত্রাক্ষর চরণ এবং প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব থাকে। চরণান্তিক অনুপ্রাস ব্যবহৃত হয়। পর্বের মাত্রা-সংকেত—(৬+৫): যেমন,—

'যখন বিশ্বের | যে দিকে চাই |
সে দিকে তোমারে | দেখিতে পাই' ||

দীর্ঘ একাবলী—প্রকৃতির দিক দিয়া নয়, কেবলমাত্র মাত্রার দিক দিয়াই একাবলীর সংগে দীর্ঘ একাবলীর পার্থক্য লক্ষণীয়। দীর্ঘ একাবলীর পর্বস্থ মাত্রা-সংকেত—(৬+৬): যেমন,—

'চলে কালস্রোত | নাহি দয়া-মায়া ॥
চলে সুখে নিয়া | শিশুবৃদ্ধকায়া' ॥

অমিত্রাক্ষর ছন্দ (**Blank Verse**)

(১)

প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনাকালেই মহাকবি মধুসূদন বুঝিয়াছিলেন যে, বাঁধনহারা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত না হইলে বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মধুকবি একথাটি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকেও জানাইয়াছিলেন, এমন কি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনার প্রতিজ্ঞাও তিনি করিয়া বসিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার পূর্বে মধুকবি তাঁহার অন্তরংগ বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,—'I want the public ear to be attuned to the melody of the Blank Verse.' কিছুদিনের মধ্যেই যখন মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করিলেন, তখন অনেকেই মধুপ্রতিভাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছিলেন, বন্ধু রাজনারায়ণ তো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মধুকবির এ কাব্যকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন,—'Your reward is very great indeed—immortality'. তবে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ পরবর্তী কালে রচিত 'মেঘনাদবধকাব্যে'ই সার্থক পরিণতি লাভ করিয়াছে।

এই ছন্দটি পয়ারের পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'যে পয়ার বা মহাপয়ারের চরণে চরণান্তিক ছন্দোযতির (=পূর্ণযতির) সহিত অর্থগত ছেদের (=ভাবযতির) মিত্রতা বা একত্র অবস্থান অবশ্যম্ভাবী নহে, সেই পয়ার বা মহাপয়ারের বিশেষ নাম **অমিত্র ছন্দ**। অন্য কোন ছন্দে, চরণান্তিক যতি ও ছেদের অমিত্রতা ঘটিলেও তাহাকে অমিত্র ছন্দ বলা চলিবে না।' মাইকেল প্রতিটি চরণে চোদ্দটি করিয়া অক্ষরের ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি চরণান্তিক অনুপ্রাস ব্যবহার করেন নাই। প্রতিটি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব থাকে এবং পর্বের মাত্রা-সংকেত—(৮+৬)। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ছেদ এবং যতির ব্যবহার একই সংগে সর্বত্র দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন পয়ার ছন্দে ছেদ এবং যতি একই সংগে ব্যবহার করা হইত। মধুসূদন এই রীতির প্রথম পরিবর্তন করিয়া ছেদ এবং যতি স্থাপনের বিপর্যয় দ্বারা বাংলা ছন্দে প্রবহমানতা আনিয়াছেন। আধুনিক কবিগণ যে পয়ার ছন্দ ব্যবহার করেন, তাহা প্রায় ক্ষেত্রেই **প্রবহমান পয়ার**। এই জাতীয় পয়ার **লঘু** এবং **দীর্ঘ**, দুইই হইতে পারে।

যতিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে পয়ার ছন্দ ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

উভয় ছন্দেই প্রতি চরণের মাত্রা-সংকেত—৮+৬=১৪ আবার অর্ধযতি এবং পূর্ণযতির অবস্থানও একই রূপ : যেমন,—অমিত্রাক্ষর ছন্দে পাই—

'সম্মুখ-সমরে পড়ি, | +বীর-চূড়ামণি ॥
বীরবাহু,+চলি যবে | গেলা যমপুরে ॥
অকালে,+কহ,+হে দেবি | অমৃতভাষিণি ! ॥+
কোন্ বীরবরে বরি | সেনাপতি-পদে, ॥+
পাঠাইলা রণে পুনঃ | রক্ষঃকুলনিধি ॥+
রাঘবারি ?'+ +

আবার পয়ার-ছন্দে পাই—

'মহাভারতের কথা | অমৃত-সমান, ॥+
কাশীরাম দাস কহে,+ | শুনে পুণ্যবান। ॥ + +

উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্বয়ে যতির দিকে লক্ষ্য করিলে পয়ার ও অমিত্রচ্ছন্দের মধ্যে **সাদৃশ্য** অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু ছেদের দিকে নজর দিলে উভয় ছন্দের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে **বৈসাদৃশ্যও** পরিলক্ষিত হয়। অর্ধযতি ও পূর্ণযতি বুঝাইবার জন্য যথাক্রমে একটি দাঁড়ি ও দুইটি দাঁড়ি এবং উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ বুঝাইবার জন্য যথাক্রমে একটি যোগ-চিহ্ন ও দুইটি যোগচিহ্ন প্রয়োগ করিয়া ইহাই দেখানো হইয়াছে যে, এক ঝোঁকে চরণের যতটুকু অংশ উচ্চারণ করা যায়, ঠিক ততটুকুরই পরে পড়িয়াছে যতি-চিহ্ন, কিন্তু বাক্যের অর্থানুযায়ী পড়িয়াছে ছেদ-চিহ্ন। উদ্ধৃত নমুনা দুইটি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পয়ারে যতি ও ছেদ একই স্থানে পড়ে, পক্ষান্তরে অমিত্রাক্ষর ছন্দে যতি ও ছেদ সর্ব সময়ে একই স্থানে পড়ে না। ছেদকে যতির পারবশ্য হইতে বিমুক্ত করিয়া ভাব-প্রকাশের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই যে মুক্তি-সাধনা, ইহাই প্রাচীন পয়ার ছন্দকে **প্রবহমান** করিয়াছে। তাই তো,—'বাংলা কবিতার প্রথম ছন্দোমুক্তিসাধক—মাইকেল মধুসূদন। তাঁহার ছন্দোমুক্তির চেষ্টার ফলেই অমিত্র-ছন্দের জন্ম। তিনি ছন্দকে ভাঙিতে না পারিলেও চরণান্তিক অনুপ্রাস ও ছেদের বিপর্যয় ঘটাইয়া কবিতার অর্থকে স্বাধীনতা দিয়াছেন ও কবিতাকে করিয়াছেন অপেক্ষাকৃত জীবনোপযোগী।' মধুকবির এই অমিত্রচ্ছন্দকে **চরণান্তিক অনুপ্রাসহীন প্রবহমান পয়ার** বলা চলে।

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরংগিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ-হ্রস্বতা এবং যুক্ত-অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তথ্যটি অবগত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার মেঘনাদবধকাব্যে ছন্দের এমন তরংগিত গতি অনুভব করা যায়।' স্বয়ং মধুকবি লিখিয়াছেন,—'Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of

Blank Verse in English is the *toughest* of poets I mean old John Milton.' চতুর্দশাক্ষর এই অমিত্রচ্ছন্দের বিরাম সম্বন্ধে মধুকবি নিজেই বলিয়াছেন,—'I find that যতি, instead of being confined to the 8th syllable *naturally* comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 8th, 10th, 11th, 12th and so on.' ডক্টর সুকুমার সেনের মতে,—'অমিত্রাক্ষর বিদেশী আমদানী নয়, ইহা পয়ারই। তফাতের মধ্যে এই যে, পয়ারের যেমন দুই চরণে (অর্থাৎ আটাশ অক্ষরে) শেষ যতি পড়ে, অমিত্রাক্ষরে তেমন নয়। অমিত্রাক্ষর পয়ারের শম যত খুশি চরণের পর যে-কোন পূর্ণযতিতে—অর্থাৎ প্রথম আট বা শেষ ছয় অক্ষরের পরে, অথবা অর্ধযতিতে—অর্থাৎ প্রথম অর্ধে চার ও শেষ অর্ধে তিন অক্ষরের পরে, হইতে পারে। পয়ারের মিলযুক্ত দুই-চরণের মধ্যে ভাবকে পুরিয়া রাখিতে হয়। পয়ারের এই দুই-চরণের নিগড় ভাঙিয়া মধুসূদন ছন্দের প্রসার বাড়াইয়া ভাব-প্রসারের অবকাশ দিলেন—ইহাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের আসল কথা। বস্তুত মিল না থাকাটাই বড় কথা নয়, যতির স্বাধীনতা অর্থাৎ ছন্দের প্রবহমানতাই অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য।'

মোটের উপর, মধুকবির **অমিত্রাক্ষর ছন্দের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য** লক্ষণীয় :—**প্রথমত**, এই ছন্দে ভাব এবং বাক্য যতির বশীভূত নয়, পক্ষান্তরে যতিই ভাব এবং বাক্যের বশীভূত। প্রতিটি পদেই যেমন যতির বৈচিত্র্য, তেমনি ভাবপ্রকাশের স্বাভাবিকতা পরিদৃষ্ট হয়। **দ্বিতীয়ত**, এই ছন্দে যেমন আছে সংগীতের স্বাদ, তেমনি আছে রসবৈচিত্র্যানুযায়ী কখনও-বা সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে শব্দচয়ন, আবার কখনও-বা ইংরাজি ভাষার অনুকরণে নব নব পদ গঠন। **তৃতীয়ত**, অমিত্রচ্ছন্দে নূতন নূতন ক্রিয়াপদ গঠিত হইয়াছে। ইংরাজিতে যেমন বিশেষ্য বিশেষণ পদাদি হইতে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তেমনি মধুকবিও এহেন বহু ক্রিয়াপদ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। **চতুর্থত**, এই ছন্দে বাক্যবিন্যাসের স্বাভাবিকতা গুণ থাকায় সর্বজাতীয় রসই উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। **পঞ্চমত**, এই ছন্দে মধুকবি মোটামুটি সংযমের সহিত অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া ইহার মধ্য হইতে হীরক-জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে।

অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মধুকবির প্রবর্তিত এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা অমিত্রচ্ছন্দের এক নবতর নাম দিয়াছেন **অমিতাক্ষর**। এই ছন্দে অক্ষর বা মাত্রার সংখ্যা ছেদের সম্পর্কে সুনিয়ন্ত্রিত নয় বলিয়াই অর্থাৎ **অমিত** হওয়াতেই সম্ভবত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই নবতর নামকরণের পক্ষপাতী। অবশ্য কবি-সমালোচক মোহিতলাল 'অমিতাক্ষর' নামকরণটি সম্পর্কে ঘোর আপত্তি তুলিয়াছেন।

(২)

মধুকবির অমিত্রাক্ষর ছন্দ হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র, উভয়েই তাঁহাদের কাব্যসাধনায় প্রয়োগ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু কেহই সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার-কাব্যে' বা নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক—কুরুক্ষেত্র—প্রভাস' কাব্যত্রয়ে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইযাছে, তাহা মধু-প্রবর্তিত সামগ্রী নয়—পয়াব ছন্দেরই যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র যাহা প্রকৃতপক্ষে মিলহীন পয়াবই। সত্য কথা বলিতে কি, বাংলা কাব্য-কবিতায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রয়োগ-ব্যাপাবে মধুসূদন ব্যতিরেকে আর কোন কবিই কৃতকার্য হইতে পাবেন নাই। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দেব উদ্ভব ও পরিণতির জন্য প্রতিভাধব মধুসূদন সকল কৃতিত্বের অধিকাবী।

(৩)

গৈরিশ ছন্দটিও পয়াবেব ভিত্তিব উপর প্রতিষ্ঠিত। মাইকেলের অমিত্রাক্ষরেব প্রবহমান রীতির অনুসরণ কবিয়া এই ছন্দে গিবিশচন্দ্র ছন্দ-মুক্তিকে আরো কিছুটা অগ্রসব কবিয়া দিয়াছেন। এই ছন্দকে **ভাঙা-অমিত্রাক্ষরও** বলা হয়। ইহাতে পংক্তির পর্বসংখ্যা এবং দৈর্ঘ্য এক রকম নয় এবং অন্ত্য অনুপ্রাসেব ব্যবহারও সর্বত্র দেখা যায় না। অভিনয়েব সুবিধার জন্য গিবিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকে প্রথমে এই ছন্দের ব্যবহার কবেন। এই ছন্দেব আব একটি লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে এই যে, ইহার পংক্তিগুলি ভাবযতিকে অনুসবণ করে: যেমন,—

'ব্রহ্ম সনাতন, |
রাজীব-লোচন |
ধ্যানে জ্ঞানে হেবিছেন মোবে।' ॥

নাট্যকার গিবিশচন্দ্র নিজেই 'গৈরিশ ছন্দে'র যে কৈফিয়ৎটি কবিবর নবীনচন্দ্র সেনকে দিযাছিলেন তাহা এই প্রসংগে স্মবণীয়। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"আমি বিস্তব চেষ্টা কবে দেখেছি, গদ্য লিখি সে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাষা-কথা কইতে পারি না। চেষ্টা ক'রলেও ভাষা-কথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্য ছন্দে কথা নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা যাক্—কোন্ ছন্দে অধিক কথা কয়। দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী বা যে যে ছন্দ বাঙালায় ব্যবহার হয়, সকলগুলি পয়াবের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পডবার সময় আমার যেমন ভাঙা লেখা, তেমনি ভেঙে ভেঙে পডতে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু—যেখানে কথাবার্তা, সেইখানেই ছন্দ ভাঙা। তাবপর দেখা যাক্—কোন্ ছন্দ অধিক। দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতায় চরণের সহিত শেষ চরণে মিলিত হয়ে অধিকাংশ কথা হয়।'

'দেখিলাম সরোবরে কমলিনী বান্ধিয়াছে করী।'

লঘু ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক সময় মিলিত হয়।

'বিরস বদন রাণীর নিকট যায়।'

এ সওয়ায় পয়ার লঘু ত্রিপদীর এক এক পদ বিশেষত শেষ পদ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। আমার কথা এই যে, এস্থলে নাটকের চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায়—সময়ে সময়ে সরল যতি থাকে না।

'বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।'

এরূপ হাঙ্গামাই হবে। বাংলা ভাষার ক্রিয়া 'হইয়াছিল' প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করবে। কিন্তু গৈরিশ ছন্দে সে আশংকা নাই। যতি সম্পূর্ণ করে সহজেই লেখা যাবে। আর এক লাভ, ভাষা নীচ হতে বিনা চেষ্টায় উচ্চ স্তরে সহজেই উঠ্‌বে। সে সুবিধা চৌদ্দর কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন।"

(৪)

রবীন্দ্রনাথও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অমিল নয—সমিল। মধুসূদন প্রাচীন পয়ারের যতি হইতে ছেদকে বিযুক্ত তো করিয়াছেনই, তদুপরি চরণান্তিক অক্ষরধ্বনির মিত্রতা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন, পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ ঐ অক্ষরধ্বনির মিত্রতাকে আবার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাই রবি-কবির অমিত্রচ্ছন্দকে **চরণান্তিক অনুপ্রাসযুক্ত প্রবহমান পয়ার** বলা চলে। **মধুকবির অমিল অমিত্রচ্ছন্দে** পর্বমধ্যে যুগ্মমাত্রিক ও অযুগ্মমাত্রিক যে কোন দৈর্ঘ্যের শব্দের পরে ছেদ বসিয়াছে, কিন্তু **রবিকবির সমিল অমিত্রচ্ছন্দে** যুগ্ম মাত্রিক শব্দের পরেই সাধারণত ছেদ বসিয়াছে। ইহাও সবিশেষ লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের সমিল অমিত্রচ্ছন্দে পর্বমধ্যে পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার প্রায়শঃই হয় না। পর্ববিন্যাসকালে রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানেই পয়ারের ছয় মাত্রার শেষের পর্বটিকে আট মাত্রার প্রথম পর্বের আগে বসাইয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার জন্য সচেষ্টিত হইয়াছেন। মধুকবির অমিল অমিত্রচ্ছন্দে পর্বোদ্ভূত ধ্বনিতরংগ উদাত্ত গাম্ভীর্যের সহিত প্রবল বেগে উৎসারিত হইয়াছে, আর রবিকবির সমিল অমিত্রচ্ছন্দে চরণান্তিক অক্ষরের মিত্রতাহেতু কোমল গীতিধর্মী সুর স্পন্দিত হইয়াছে।

অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই **সমিল অমিত্রাক্ষরছন্দ** তথা চরণান্তিক অনুপ্রাসযুক্ত প্রবহমান পয়ার ছন্দকে নাম দিয়াছেন **মিত্রাক্ষর—অমিত্রাক্ষর**। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ছন্দ মূলত এই সমিল অমিত্র-ছন্দেরই ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মিত্রাক্ষরের অবস্থান বুঝাইবার নিমিত্তই পয়ার

ও মহাপয়ারের অন্তর্গত পর্বাদিকে ভাঙিয়া তিনি নানা পংক্তিতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ফলে পংক্তিশেষে অনুপ্রাস থাকিলেও বিভিন্ন পংক্তির অক্ষরসংখ্যা অসমান এবং পর্বের অক্ষরসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। এহেন পংক্তিসজ্জায় ভাবধারা পংক্তি লংঘন করিয়া অগ্রসর হওয়ায় এই ছন্দকে **ধাবমান পয়ারও** বলা হয়। তবে 'বলাকা'র প্রত্যেকটি কবিতাতেই যে পয়ার অথবা মহাপয়ারের নির্দিষ্টসংখ্যক মাত্রা-বিন্যাস করিয়া চরণ সংগঠন করা হইয়াছে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। অর্থাৎ 'বলাকা'য় অনুসৃত ছন্দের চরণাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপূর্ণপদী। কাহারও কাহারও মতে, 'বলাকা' কাব্যের ছন্দটি **মুক্তক ছন্দ**।

(ক) পয়ার-ভিত্তিক সমিল অমিত্রচ্ছন্দ তথা চরণান্তিক অনুপ্রাসযুক্ত প্রবহমান পয়ার ছন্দের এই দৃষ্টান্তের মাত্রা-সংকেত—(৮+৬): যেমন,—

'—আকাশের দূরান্তরে ॥
একে একে অন্ধকারে | হতেছে বাহির ॥
একেকটি দীপ্ত তারা, | সুদূর পল্লীর ॥
প্রদীপের মত | —' —রবীন্দ্রনাথ।

(খ) মহাপয়ার-ভিত্তিক সমিল অমিত্রচ্ছন্দ তথা চরণান্তিক অনুপ্রাসযুক্ত প্রবহমান পয়ার ছন্দের এই দৃষ্টান্তের মাত্রা-সংকেত—(৮+১০): যেমন,—

'এবার ফিরাও মোরে, | লয়ে যাও সংসারের তীরে, ॥
হে কল্পনে, রংগময়ী। | দুলায়ো না সমীরে সমীরে, ॥
তরংগে তরংগে আর, | ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়, ॥
বিজন বিষাদ-ঘন | অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায় ॥
রেখোনা বসায়ে আর।' | —রবীন্দ্রনাথ।

(গ) 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত ধাবমান পয়ার বা মুক্তক ছন্দের দৃষ্টান্ত:

'যদি তুমি মুহূর্তের তরে।
ক্লান্তিভরে।
দাঁড়াও থমকি,' ॥
তখনি চমকি,'।
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব | পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে,' ॥ —রবীন্দ্রনাথ।

চতুর্দশপদী কবিতা (Sonnet)

কবিতা চতুর্দশপদী হইলেই **সনেট** হয় না। একটিমাত্র অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতি-কণা যখন একটি বিশেষ গঠনভংগির মধ্যে দিয়া সমগ্রতায় ফুটিয়া উঠে, তখন তাহাকে বলা হয় **সনেট**। 'সনেট' কথাটি ইতালীয় 'সনেত্তো' (অর্থাৎ গীতময় মৃদুধ্বনি)

হইতে আসিয়াছে। অনেকে মনে করেন, পেত্রার্কাই ইতালীয় সনেটের জন্মদাতা; কিন্তু ইহা ভুল ধারণা। পেত্রার্কা ১৩০৪ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৩৪৬ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু দান্তে তাঁহারও আগেকাব লোক—দান্তের আয়ুষ্কাল ১২৫৫ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৩২১ খ্রীঃ অঃ অবধি। দান্তে বিয়াত্রিচ-কে এবং পেত্রার্কা লরা-কে উদ্দেশ করিয়া প্রেম ও সৌন্দর্যভূয়িষ্ঠ সনেট তথা চতুর্দশপদী কবিতাদি বচনা করিয়াছিলেন।—ঐগুলিই ইতালীয় সনেটেব গৌববময় প্রথম স্তর। আবাব কেহ কেহ মনে করেন, একাদশ শতাব্দীব পর্তুগীজ কবি Guido D' Arezzoই সনেটের আদিস্রষ্টা। কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতাব আদিযুগেব একটি ইতিবৃত্ত কোন সমালোচক নিম্নলিখিত ভাবে দিয়াছেন—"অনেকে গ্রীক কবিতার Epigram-এব সংগে ইতালীয় সনেটের বিলক্ষণ মিল দেখিতে পান; এবং কোনো প্রাচীন কবি নাকি সনেট লিখে এপিগ্রাম নামে চালিয়েছেন। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেব পূর্বে গ্রীক্ কালচাব ইতালীতে অজ্ঞাত ছিলো, কাজেই দান্তেব পূর্বপুরুষগণ নিশ্চয়ই গ্রীক্ নন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, প্রভঁস প্রদেশের ত্রবাদুর (Troubadour)-গণ তাদের মাতৃভাষায় যে গান ও ছড়া বেঁধে মুখে মুখে ছড়িয়ে বেড়াতো, তারি প্রভাবে ইতালীয় সনেট-এব আবির্ভাব। অন্য দলের মতে (দান্তে ও পেত্রার্কা দু'জনেই নাকি এ-মতের পরিপোষক ছিলেন), সিসিলিতে আরবদের সংস্পর্শে এসেই ইতালিয়নরা সনেট লিখ্‌তে শেখে। প্রাচীনতম ইতালিয়ন কবিতায় আরবিয়ানা খুব বেশি ব'লে আজকাল এ মতই অভ্রান্ত বলে দাঁড়িয়ে গেছে।"

সনেটের গঠনকারুকলার দিক দিয়া যদিও পেত্রার্কাই মধুসূদনের গুরু, তবু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতাব দিক দিয়া তিনি মিল্‌টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স, শেলী প্রভৃতি ইংরাজ কবিদের মন্ত্রশিষ্য। কেন না,—পেত্রার্কাব ন্যায় মধুকবির সনেটগুলির বিষয়বস্তু নিছক প্রেমেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রসংগত, ইহাও বলিয়া রাখি যে, ছন্দপ্রকরণের দিক দিয়া পেত্রার্কার হুবহু অনুসবণ মধুকবি খুব কমই করিয়াছেন, বরং স্পেন্‌সার সেক্‌স্‌পীয়র ব্যতীত অন্যান্য ইংরাজ কবিদের তিনি অনেকখানি অনুসরণ করিয়াছেন। তবু সত্যের খাতিরে ইহা বলিতেই হইবে যে, চতুর্দশপদীর আত্মা মধুসূদনের নজরে পড়ে নাই। Theodore Watts Dunton নিজের লেখা একটি সনেটের ষট্‌পদী বা ষড়কে বলিয়াছেন—

'A sonnet is a wave of melody
From heaving water of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the 'Octave''; then returning free;

Its ebbing surges in the "Sestet" roll
Back to the deeps of Life's tumultuous sea.'

অষ্টপদী বা অষ্টকের (Octave) উচ্ছ্বাস, ষট্‌পদী বা ষড়কের (Sestet) অবরোহণে শেষ হয় ; অথচ এই দুই ধাবার মাঝে অন্তর্নিহিত মেলবন্ধন থাকিলেও ইহারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন—এই মূল তত্ত্বটিকে মধুসূদন্ বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই বলিয়াই আমাদের ধারণা। তাই সময়ে সময়ে এই প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে—সনেট লিখিবার মত সত্যকার তাগিদ কি তাঁহাব অন্তবে ছিল ?

গীতিকাব্যে আত্মকেন্দ্রিকতা থাকা চাই। তাই সনেটও আত্মকেন্দ্রিক কবিতা। কিন্তু মনে রাখা দবকার যে, আত্মকেন্দ্রিক কবিতা হইলেই সনেট হইবে না। সনেটের শবীরটি তথা আংগিকটি যেমন হইবে নিখুঁত, অন্তরটিও হইবে তেমনি খাঁটি—এই দুইটি সামগ্রীব মেলবন্ধনেই তো চতুর্দশপদীব সফলতা। কোন সমালোচক কহিয়াছেন, —'উচ্ছ্বসিত আবেগেব সংগে প্রশান্ত সংযমেব উদ্বাহ্-বন্ধনেই সনেটেব সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যসৃষ্টির কৌশল আয়ত্ত কবার ধৈয অসংযত প্রতিভাব পক্ষে অসম্ভব। বসিক মধুসূদন বিদেশী ভাষায় লেখা চতুর্দশপদী কবিতার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, দেশপ্রেমিক মধুসূদন মাতৃভাষাব উৎকর্ষ-সাধনের তাগিদে য়ুরোপেব কাব্য-কানন থেকে সনেট আহবণ করেছিলেন, কবিত্ব-শক্তি-গর্বিত মধুসূদন সনেটেব ছাঁচে ঢেলে কিছু কবিতাও লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি কবিতার জন্মলগ্নে আবেগ-স্পন্দিত সংযম-শাসিত কবিচিত্তেব হিমাংশুকিরণপাত সম্ভব হয়েছে।'

সনেটে চোদ্দটি পংক্তি থাকে—ইহাব বিভাগ দুইটি। প্রধান বিভাগ, যাহাকে অষ্টপদী বা Octave বলা হয়, তাহাতে থাকে ভাব-কল্পনাব সংকেত, আব দ্বিতীয় বিভাগ, যাহাকে ষট্‌পদী বা Sestet বলা হয়, তাহাতে থাকে সেই সংকেতের বিস্তৃতি, ব্যাখ্যা বা সম্প্রসারণ। অষ্টপদীতে থাকে দুইটি কবিয়া চৌপদী বা Quatrain এবং ষট্‌পদীতে থাকে দুইটি করিয়া ত্রিপদী বা Tercet। সনেটের পংক্তিগুলির 'ছন্দপ্রকরণ' মোটামুটি হয় এইরূপ :—

অষ্টপদী			ষট্‌পদী		
চৌপদী	+	চৌপদী	ত্রিপদী	+	ত্রিপদী
ক খ খ ক		ক খ খ ক	গ ঘ ঙ		গ ঘ ঙ
ক খ খ ক		ক খ খ ক	গ ঘ ঙ		ঘ গ ঙ
ক খ খ ক		ক খ খ ক	গ ঘ গ		ঘ গ ঘ

চরণে চরণে মিলের সংখ্যা মোট চার অথবা পাঁচ রকমের। ইহা ছাড়া, চৌপদীর পরে পূর্ণচ্ছেদ বিধেয়। মিল্‌টন এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইতালীয় পন্থা প্রায়ই মানিয়াছেন ;

কিন্তু সেক্‌স্‌পীয়ব এই বিষয়ে একেবারেই বেপরোয়া। সেক্‌স্‌পীয়র অষ্টপদী ও ষট্‌পদীর বিভাগ তো স্বীকার করেনই নাই, উপরন্তু তাঁহাব সনেটের পংক্তিব সাধাবণ রূপ হইতেছে এইরূপ :—

ক খ ক খ   গ ঘ গ ঘ   ঙ চ ঙ   চ ছ ছ

ইংবাজি Sonnet-এর অনুসবণে মধুসূদন বাংলায় এই ছন্দের প্রবর্তন কবেন। এই ছন্দ পয়ারেব ভিত্তির উপব প্রতিষ্ঠিত। প্রতি চবণে চোদ্দ মাত্রা থাকে। চবণস্থ পর্বেব মাত্রা-সংকেত—৮+৬। চরণান্তিক অনুপ্রাসেব ব্যবহাব কবা হয় এই ছন্দে। মধুসূদনেব প্রবর্তিত বীতি-অনুযায়ী ববীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুবী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল প্রভৃতি কবিগণ চতুর্দশপদী কবিতা বচনা কবেন। ববীন্দ্রনাথের লেখা কবিতায় রীতিব কিছু কিছু পবিবর্তন দেখা যায়। ববীন্দ্রনাথ সনেট-বচনায় মাইকেল-প্রবর্তিত বিধান পুরোপুবি অনুসরণ কবেন নাই। সনেটেব একটি দৃষ্টান্ত :

কবি

'কে কবি—কবে কে মোবে ? | ঘটকালি কবি' ॥
শবদে শবদে বিয়া | দেয় যেই জন, ॥
সেই কি সে যম-দমী ? | তাব শিরোপবি ॥
শোভে কি অক্ষয় শোভা | যশের বতন ? ॥
সেই কবি মোর মতে, | কল্পনাসুন্দবী
যার মনঃ-কমলেতে | পাতেন আসন, ॥
অস্তগামী-ভানু-প্রভা- | সদৃশ বিতবি ॥
ভাবেব সংসারে তাব | সুবর্ণ-কিবণ। ॥
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, | যাব আজ্ঞা মানে ; ॥
অবণ্যে কুসুম ফোটে | যাব ইচ্ছা-বলে , ॥
নন্দন-কানন হতে | যে সুজন আনে ॥
পারিজাত কুসুমেব | রম্য পরিমলে ; ॥
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে | যাহার ধেয়ানে ॥
বহে জলবতী নদী | মৃদু কলকলে।' ॥

—মধুসূদন

[দুই] ধ্বনিপ্রধান ছন্দ

যে ছন্দেব চবণস্থ পর্বসমূহে প্রতিটি অক্ষরধ্বনিই বিশেষ প্রাধান্য লাভ কবে, সেই ছন্দের নাম **ধ্বনিপ্রধান ছন্দ**। অক্ষরধ্বনির অতিরিক্ত কোন সুর এই ছন্দে থাকে না। স্পষ্টভাবে উচ্চারিত অক্ষরধ্বনিসমূহ হইতেই মাত্রার পরিমাণ

স্বীকৃত হয় বলিয়া এই ছন্দ শুধু ধ্বনিপ্রধানই নয়, **ধ্বনিমাত্রিকও** বটে। ইহাতে সমস্ত যৌগিক অক্ষরকেই দীর্ঘ অর্থাৎ দুই মাত্রার বলিয়া ধরা হয়, পক্ষান্তরে অন্যান্য সমস্ত অক্ষরই হ্রস্ব অর্থাৎ এক মাত্রার। অবশ্য মাত্রা-সম্পর্কিত এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। কারণ, মৌলিক স্বর, যাহা সাধারণত হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রিক তাহাও সময়ে সময়ে দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক হইয়া থাকে। তবে, সাধারণত ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মাত্রা হিসাব করা হয় এইরূপ: (ক) একই শব্দের অন্তর্ভুক্ত যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বর দ্বিমাত্রিক, (খ) ব্যঞ্জনান্ত অর্থাৎ হসন্ত অক্ষরের স্বর, (গ) অনুস্বার ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হলন্ত অক্ষরের স্বর, এবং (ঘ) ঐ ঔ স্বরদ্বয়—এই চার রকমের ক্ষেত্রেই দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক ধরা হয়, এছাড়া অবশিষ্ট স্বরগুলি হ্রস্ব বা একমাত্রিক। এই ছন্দের এহেন মাত্রাসর্বস্বতার জন্য ইহা **মাত্রাবৃত্ত ছন্দ** নামেও পরিচিত। যৌগিক অক্ষর সর্বত্র সম্প্রসারিত হয় বলিয়াই এই ছন্দকে বলা হয় **বিলম্বিত লয়ের ছন্দ**। [**মন্তব্য:** কিন্তু 'বিলম্বিত' শব্দটি ঠিক খাপ খায় না। ইহার বদলে বলা উচিত 'মধ্য' বা 'মধ্যম'। সংগীতশাস্ত্রের সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়াই ছন্দঃশাস্ত্রের বিষয়াদি ব্যাখ্যাত বা বিবৃত হওয়া সমীচীন।]

ধ্বনিপ্রধান ছন্দের দৃষ্টান্ত:

(ক) 'শরৎ ডাকে | ঘর-ছাড়ানো ডাক। |
কাজ-ভোলানো সুরে ॥ (৫+৭+৭—মাত্রাবিন্যাস)

চপল করে | হাঁসের দুটি পাখা, |
ওড়ায় তারে দূরে' ॥ (৫+৭+৭—মাত্রাবিন্যাস)

[রেখা-চিহ্নিত শব্দগুলির শেষ যৌগিক অক্ষরকে দুই মাত্রার বলিয়া ধরা হইয়াছে।]

(খ) 'দক্ষিণবায়ে | করে যাব দান, ॥ (৬+৬—মাত্রাবিন্যাস)

রবিরশ্মিতে | কাঁপিবে যে তান, ॥ (৬+৬—মাত্রাবিন্যাস)

। । । । । ।　　। । । । ॥
কুসুমে কুসুমে　　ফুটিবে সে গান ।

লতায় গাছে,' ॥　　(৬+৬+৫—মাত্রাবিন্যাস)

[রেখা-চিহ্নিত শব্দগুলির মধ্যস্থিত যৌগিক অক্ষরে দুই মাত্রার সমাবেশ হইয়াছে।]

প্রতি পর্বে মাত্রা-পরিমাণ যেমন তানপ্রধান ছন্দে, তেমনি ধ্বনিপ্রধান ছন্দে ঠিক রাখিতে হয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া **উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বড় কম নয়**। **প্রথমত,** তানপ্রধান ছন্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুগ্মধ্বনিসমূহ হ্রস্ব—তাই একমাত্রিক, কিন্তু ধ্বনিপ্রধান ছন্দে যুগ্মধ্বনিমাত্রেই দীর্ঘ—তাই দ্বিমাত্রিক। **দ্বিতীয়ত,** তানপ্রধান ছন্দে অক্ষরধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি তানপ্রবাহ তথা টানের স্রোত সমগ্র চরণের মধ্যে প্রবলভাবে বহিয়া চলে, পক্ষান্তরে ধ্বনিপ্রধান ছন্দে প্রত্যেকটি স্পষ্ট উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনিই হয় প্রকটিত। তানপ্রবাহ ধ্বনিপ্রধান ছন্দে না থাকায়, ইহাতে 'পয়ারের শোষণশক্তি'ও নাই। **তৃতীয়ত,** অক্ষরের দীর্ঘীকরণের ঝোঁকটি তানপ্রধান ছন্দের চেয়ে ধ্বনিপ্রধান ছন্দেই অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। বহু ক্ষেত্রেই ধ্বনিপ্রধান ছন্দে স্বভাবতই হ্রস্ব মৌলিক স্বরকে টানিয়া দীর্ঘরূপে উচ্চারণ করিতে হয়; নচেৎ ছন্দপতন অবধারিত। **চতুর্থত,** তানপ্রধান বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে আছে **তানের বিস্তার**, পক্ষান্তরে ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আছে **ধ্বনির বিস্তার**—তাই স্বরধ্বনিগুলিকে প্রয়োজনমতে প্রসারিত করিয়া টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করিতে হয়। এইজন্য ধ্বনিপ্রধান ছন্দটি **বিস্তারপ্রধান ছন্দ** নামেও পরিচিত হইয়া থাকে। **পঞ্চমত,** ধ্বনিপ্রধান ছন্দের চেয়ে তানপ্রধান ছন্দেই অধিক মাত্রা-সংবলিত দীর্ঘ পর্বের সন্নিবেশ করা যায়। তানপ্রধান ছন্দে অসম মাত্রার পূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু ধ্বনিপ্রধান ছন্দে পাঁচ, সাত প্রভৃতি অসম মাত্রার পূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হয়। **ষষ্ঠত,** তানপ্রধান ছন্দ স্বভাবতই উদার-গম্ভীর বলিয়া ধীর লয়-সংবলিত উচ্চশ্রেণীর কবিতামাত্রেই ইহার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়, পক্ষান্তরে ধ্বনিপ্রধান ছন্দ মূলত ললিতমধুর বলিয়া উচ্ছল গীতিস্পন্দিত কবিতামাত্রেই ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

[তিন] শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ

যে-ছন্দের প্রত্যেকটি চরণের প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় একটি করিয়া শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত পড়ে, তাহার নাম **শ্বাসাঘাতপ্রধান** বা **স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ**। শ্বাসাঘাত পড়িবার ফলে পর্বস্থ শব্দের ব্যঞ্জনান্ত বা হসন্ত অক্ষর হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রিক হয়। এই শ্বাসাঘাত বা বলই স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দের পরম বৈশিষ্ট্য। শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে প্রতি পর্বে সাধারণত চার মাত্রার সমাবেশ থাকে। চরণস্থ শেষ পর্ব অপূর্ণ এবং চরণে চারটি

করিয়া পর্ব বিদ্যমান। অবশ্য প্রতি চরণে চারটি করিয়া পর্বসমাবেশের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এই ছন্দের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায় প্রতি পর্বেই একটি করিয়া যুগ্মধ্বনির ব্যবহার হয়; অনেক ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও থাকে; কিন্তু তাহাতে ছন্দের মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়। শ্বাসাঘাত ও যুগ্মধ্বনির প্রভাবে এই ছন্দে একপ্রকার ধ্বনিতরংগের প্রকাশও এই শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দেব আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চাবণ-বৈশিষ্ট্য এই ছন্দে সমধিক পরিমাণে বজায় থাকে। নির্দিষ্ট সময়েব ব্যবধানে প্রত্যেকটি পর্বেব গোড়াতেই শ্বাসাঘাত পড়ে বলিয়া শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দেব কিছুটা বৈচিত্র্যহানি ঘটিয়াছে। ইহাতে বেশী মাত্রার পর্ব একেবারে অচল। দীর্ঘস্বরেব সংগে যেন এই ছন্দের একটা সহজাত বৈরিতা আছে। স্বর-ধ্বনির পরিমিত সংখ্যাব উপরে এই ছন্দ নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকটি পর্বের স্বরধ্বনি গণনা করিলে মাত্রাবিন্যাসেব একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায় বলিয়া ইহা **স্বরমাত্রিক** বা **স্বরবৃত্ত ছন্দ** নামে পরিচিত। আমাদের লোকসাহিত্য ও গ্রাম্য ছড়া এই ছন্দেই সাধারণত রচিত হওয়ায় ইহা **ছড়ার ছন্দ** বা **লৌকিক ছন্দ** নামেও সুপরিচিত। এই ছন্দটি **দ্রুত লয়ের**। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থে এই ছন্দের সার্থক রূপ পরিলক্ষিত হয়। রবিকবি দুইটি হইতে সুরু করিয়া পাঁচটি, এমন কি ছয়টি পর্ব অবধি এক-একটি চরণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের দৃষ্টান্ত:

/।   । । । | /। । ।।   /। । ।।   /। ।।।
(ক) 'বাত্ পোহাল | ফর্সা হল   ফুট্‌ল কত   ফুল—'

[এখানে চরণে চারটি পর্বের ব্যবহার লক্ষণীয়। ৪+৪+৪+৪—মাত্রাবিন্যাস। শেষের পর্বটি অপূর্ণ। এক মাত্রা আছে, কিন্তু বাকি তিন মাত্রাই উহ্য।]

/   / | /   /
(খ) 'রে সতি রে সতি | কাঁদিল পশুপতি

/   /   /
কাঁদিল শিব প্রেম থেশ—'

[এখানে চরণে চারটির অধিক পর্বের ব্যবহার লক্ষণীয়। ৪+৪+৪+৪+৪+৪—মাত্রাবিন্যাস। শেষের পর্বটি অপূর্ণ—দুই মাত্রার সমাবেশ আছে, কিন্তু বাকি দুইমাত্রা উহ্য।]

/   /
(গ) 'টিয়ের মার বিয়ে—

/   /
লাল্ গামছা দিয়ে—॥'

[এখানে চরণে চারটির কম পর্বেরও ব্যবহার আছে। ৪+৪—মাত্রাবিন্যাস কিন্তু শেষের পর্বে দুই মাত্রা করিয়া উহ্য]

/। । । । /। । । ।
(খ) 'খোকা নাচে কোন্ খানে
/। । । । /। । । ।
শতদলের মাঝখানে'

[এখানে প্রতি চরণের দুইটি পর্বই পূর্ণ। ৪+৪—মাত্রাবিন্যাস]

/ /
(ঙ) '(আমি) সোনার বাঁশি বাঁধিয়ে দেব
/ /
মুক্তা থবে থবে—'

[এখানে অতি-মাত্রার পর্বের ব্যবহার লক্ষণীয়। রেখা-চিহ্নিত অংশটি অতি-মাত্রার পর্ব। এই অতিরিক্ত অংশটি শ্বাসাঘাতের বহির্ভূত।]

তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও শ্বাসাঘাতপ্রধান—এই ছন্দত্রয়ের পার্থক্য স্বরধ্বনির প্রাধান্য, অক্ষরের হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ ইত্যাদির আলোচনায় বুঝা যাইবে না। **পার্থক্যের ধারাটি মোটামুটি এইরূপ:** শ্বাসাঘাতের দরুণ পর্বস্থিত শব্দের হলন্ত অক্ষর একমাত্রিক, কিন্তু তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দে হলন্ত অক্ষর সাধারণত দ্বিমাত্রিক। তানপ্রধান এবং ধ্বনিপ্রধান ছন্দের পর্বগুলিতেও শ্বাসাঘাত পড়ে সত্য, কিন্তু ইহার প্রাবল্য শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দেই সবিশেষ পরিদৃষ্ট হয়। তাই তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দের পর্বগুলি Syllabic অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তিক এবং শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের পর্বসমূহ Stressed অর্থাৎ ঝোঁক-সমন্বিত। তানপ্রধান ছন্দে স্বরধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া অতিরিক্ত একটা স্বরপ্রবাহ বহিয়া থাকে, কিন্তু শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে ইহার স্থান নাই।

ছন্দোলিপি (Scansion)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উত্তর-সহ ছন্দোলিপি রচনা করিতে হইবে :—

(১) ছন্দের নাম ও লয় ;
(২) চরণের পর্ব-বিভাগ ;
(৩) পর্বে মাত্রাবিন্যাস ;
(৪) চরণের পর্বগুলি সমমাত্রিক, না অসমমাত্রিক ;
(৫) স্তবকের চরণ-সংখ্যা ;
(৬) অতিমাত্রার পর্বের ব্যবহার আছে কি না ;

উদাহরণ :—

(ক) 'কোথাও-বা বন্যা এসে ফসল গিয়েছে ভেসে
তার সাথে সব আশা সাধ,
কোথাও হয়নি বৃষ্টি পড়েছে শনির দৃষ্টি
জলাভাবে হয়নি আবাদ।'

অক্ষরবৃত্তের দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ও ধীর লয় ; প্রতি চরণে তিনটি করিয়া পর্ব, পর্বের মাত্রাবিন্যাস—৮+৮+১০, সমমাত্রিক ও অসমমাত্রিক পর্বের ব্যবহার ; দুই চরণের স্তবক।

(খ) 'এল আঁধার, দিন ফুরালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই তামসীরে।'

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও বিলম্বিত লয় ; চরণে দুইটি করিয়া পর্ব, পর্বের মাত্রা-বিন্যাস—৬+৫, কিন্তু শেষ চরণের পর্বস্থ মাত্রাবিন্যাস ৬+৪ ; সমমাত্রিক ও অসমমাত্রিক—দুই প্রকার পর্বেরই সমাবেশ, চার চরণের স্তবক।

(গ) 'খোকা গেছে মাছ ধরতে দেব্‌তা এল জল্—
(ঙ) দেবতা তোর্ পায়ে ধরি খোকন্ আসুক ঘর—'

স্বরবৃত্ত ছন্দ ও দ্রুত লয় ; প্রতি চরণে চারটি করিয়া পর্ব ; পর্বের মাত্রাবিন্যাস—৪+৪+৪+৪, কিন্তু প্রত্যেক চরণের শেষ মাত্রাগুলি অপূর্ণমাত্রিক—এক মাত্রার সমাবেশ আছে, বাকি তিন মাত্রাই উহ্য ; চরণের পর্বগুলি সমমাত্রিক ; দুই চরণের স্তবক : দ্বিতীয় চরণের রেখা-চিহ্নিত অংশটি অতি-মাত্রার পর্ব।

অনুশীলনী

[এক] বাংলা পয়ার-ছন্দের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া তাহার বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

অথবা, বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া তাহার প্রয়োগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬

[দুই] নিম্নের ছন্দঃশাস্ত্রীয় প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

'পর্ব' সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

অথবা, বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া 'স্তবক' সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

রা. বি. মাধ্যমিক '৫৬

[তিন] "বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতি—এই দুই রকম বিভাগস্থল স্বীকার করিতে হইবে।" বাংলা ছন্দে এই উভয়ের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনপূর্বক বিস্তারিত আলোচনা কর।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬

[চার] বাংলা ছন্দোবিভাগে 'পর্ব' ও 'পর্বাংগ' কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও। অক্ষরবৃত্তে ও মাত্রাবৃত্তে প্রভেদ কি? উদাহরণ সাহায্যে উভয়ের ব্যবহার স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ কর। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫

[পাঁচ] 'যতি' কাহাকে বলে? বাংলা ছন্দে 'যতির' বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

অথবা, বাংলা পয়ার জাতীয় ছন্দে স্বরের ঝংকারের প্রাধান্য নির্ণয় কর।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫২

[ছয়] 'অক্ষর-সংখ্যা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয়।'—বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এই মন্তব্য কতদূর সংগত তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত-সহযোগে আলোচনা কর।

অথবা, ছন্দঃশাস্ত্রে মাত্রার তাৎপর্য কি? বাংলা ভাষায় অক্ষরের মাত্রা স্থির, অর্থাৎ পূর্বনির্দিষ্ট কিনা তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাও।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫১

[সাত] পয়ার ছন্দ হইতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

অথবা, ধ্বনিপ্রধান ছন্দে ধ্বনির প্রাধান্য সর্বত্রই কিভাবে স্বীকার করিতে হয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। ক. বি. বি. এ. (পাস) '৫৬

[আট] বাংলা ছন্দের বিচারে হ্রস্বমাত্রা ও দীর্ঘমাত্রা এইরূপ ভেদ করা চলে কি? এ-বিষয়ে আলোচনা কর।

অথবা, বাংলা ছড়ার ছন্দের বৈশিষ্ট্য কি? দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া বল। ক. বি. বি. এ. (পাস) '৫৫

[নয়] বাংলা ছন্দে মৌলিক স্বর ও যৌগিক স্বর কাহাকে বলা হয়? মৌলিক স্বর এবং যৌগিক স্বরের মাত্রাবিচার সাধারণত কিরূপ হইয়া থাকে, উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

অথবা, ধ্বনিপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য কি? এই ঢঙের ছন্দে মাত্রা-হিসাবের পদ্ধতি কি? দৃষ্টান্তের দ্বারা তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও। ক. বি. বি. এ. (পাস) '৫৫

[দশ] বাংলা ছন্দে শ্বাসাঘাতের (Stress) দ্বারা অক্ষরের মাত্রা কি ভাবে প্রভাবিত হয়, তাহা উদাহরণ-সহকারে বুঝাইয়া দাও।

অথবা, বাংলা ছন্দে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ও কি কি নিয়মানুসারে মৌলিক দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত হইতে পারে, দৃষ্টান্ত-সহ বুঝাইয়া দাও। ক. বি. বি. এ. (পাস) '৫০

[এগারো] বাংলা কবিতার ছন্দকে তিনটি 'বৃত্তে' ভাগ না করিয়া তিন 'ঢঙ্'-এর বলিয়া বর্ণনা করার সার্থকতা কি? সংক্ষেপে এই বিষয়ে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা কর।

অথবা, রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' বা 'পলাতকা'র কবিতার ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। ক. বি. বি এ. (অনার্স)'৫৬

[বারো] বাংলা পয়ার ছন্দ, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও গদ্য ছন্দের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

অথবা, বাংলার কোন্ জাতীয় ছন্দের কোনও রূপ শোষণ-শক্তি নাই? শোষণ-শক্তি না থাকিবার ফলে মাত্রার বিচার কিরূপ হইয়া থাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও। ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৫৭

[তেরো] নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলির উদাহরণ-যোগে ব্যাখ্যা কর :—ছন্দ ; অক্ষর ; মিত্রাক্ষর ; অমিত্রাক্ষর ; শ্বাসাঘাত ; ছেদ ; চরণ ; স্তবক।

[চোদ্দ] বাংলা ছন্দের প্রকার কয়টি? উদাহরণ-সহযোগে তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

[পনেরো] দৃষ্টান্ত-সহযোগে নিম্নলিখিত ছন্দগুলির পরিচয় লিখ :—মালঝাঁপ পয়ার ; পর্যায়সম পয়ার ; মধ্যসম পয়ার ; প্রবহমান পয়ার ; ধাবমান পয়ার ; লঘু ত্রিপদী ; দীর্ঘ ত্রিপদী ; দীর্ঘ চৌপদী ; একাবলী ; দীর্ঘ একাবলী ; অমিল ও সমিল অমিত্রাক্ষর ; মহাপয়ার-ভিত্তিক অমিত্রাক্ষর ; চতুর্দশপদী কবিতা (সনেট) ; গৈরিশ ছন্দ।

[ষোলো] ছন্দোবিভাগ কর এবং বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর :—

(ক)/ আজ্‌কে তোমায় দেখ্‌তে এলাম জগৎ-আলো নূরজাহান!
সন্ধ্যা-রাতের অন্ধকার আজ জোনাক্-পোকায় স্পন্দমান!

বাংলা থেকে দেখ্‌তে এলাম মরুভূমির গোলাপ ফুল,
ইরাণ দেশের শকুন্তলা! কই সে তোমার রূপ অতুল?

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬

(খ) অবগাহি' নীল পাবন প্রবাহে এ অধম আজি ধন্য,
উধাও ছুটিছে মানস-তুরগ লংঘিয়া মায়ারণ্য।
আরাত্রিকের উদার শংখ
ঘোষিছে কাহার অভয়-ডংক,
কোথা হিরণ্যবর্ণ মহান, সৌম্য সুপ্রসন্ন? ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প)'৫৫

[সতেরো] নিম্নের উৎকলিত অংশগুলিব মধ্য হইতে যে-কোন একটির ছন্দো-বিশ্লেষণ কর:—

(১) উঠ্‌তি-বেলা পডতি-বেলা খেল্‌ছে খেলা দুই পাখায়,
কাজের খেলা নেইকো শুরু-শেষ।
আঁক্‌ছি ছবি আকুল প্রাণে বুলিয়ে তুলি ভুল-রেখায়
আলো-ছায়াব আব্‌ছা নিরুদ্দেশ॥

(২) হল্‌কুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে?—
আফ্‌তাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে॥
আস্‌মান ভবে গেল গোধূলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে॥

(৩) বউদের আজ কোনো কাজ নাই, 'বেড়ায়' বাঁধিয়া বসি,
সমুদ্রকলি শিকা বানাইয়া নীরবে দেখিছে বসি।
কেউবা রঙীন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,
তারে ভাষা দেয় দীঘল সুতার মায়াবী আখর টানি।

রা. বি. মাধ্যমিক '৫৬

[আঠারো] যে কোন দুইটি বাক্যাংশের ছন্দোবিশ্লেষ কর এবং অতি সংক্ষেপে সেই ছন্দের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর:—

(ক) আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম পাড়াত নয়ন চুমে',
চুমুর পরে চুম্‌ দিয়ে ফের হান্‌ত আঘাত ভোরের ঘুমে।
ভাব্‌তুম তখন এ কোন্‌ বালাই!
করত এ প্রাণ পালাই পালাই।
আজ সে কথা মনে হ'য়ে ভাসি অঝোর নয়ন-ঝারে!
অভাগিনীর সে গরব আজ ধূলায় লুটায় ব্যথার ভারে॥

(খ) নীল নবঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউশের খেতে জলে ভরভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে, দেখ্‌ চাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে॥

(গ) দ্রাক্ষাপায়ী পারসীক
গোলাপকাননবাসী তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান
কর্ম-অনুরত,—সকলের ঘরে ঘরে
জন্ম লাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।

(ঘ) দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরংগম-অশ্বন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাংগী, হায়রে মরি, তরংগ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে। রা. বি. বি. এ. (বিকল্প) '৫৬

[উনিশ] যে কোন দুইটি কাব্যাংশের ছন্দোবিশ্লেষ কর এবং অতি সংক্ষেপে সেই ছন্দের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর :—

(ক) ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর,
যা কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, "কেষ্টা বেটাই চোর"।

(খ) ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায় করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইল যে সুখ আমারে!

(গ) বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান॥

(ঘ) পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছো একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়ায়ে ;
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি'
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

ক্যা. বি. বি. এ. (পাস) '৫৬
[*For Irregular candidates*]

[কুড়ি] যে কোনও তুইটি ছন্দোলিপি কর :—

(ক) একে কুল কামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর ॥

(খ) ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।

(গ) ইন্দ্রলোকের রীত একি !
লুকিয়ে যেতে আস্‌তে হয় !
দেবতা হয়েও তোর, দেখি,
লুকিয়ে ভালো বাস্‌তে হয় !

(ঘ) চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥

(ঙ) অন্ধ যে, কি রূপ কভু তার চক্ষে ধরে
নলিনী ? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে ?
কি কাক, কি পিকধ্বনি সমভাব তার।

(চ) উড়িয়ে ধোঁয়া ঘুরিয়ে ধোঁয়া
আকাশে আঁকি গাঙ
ভস্মাবৃত বহ্নি আর
রাংতা-মোড়া রাঙ্।

(ছ) অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ॥
নয়নে গড়য়ে লোর গদগদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥

(জ) নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘবভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

(ঝ) কেবা শোনে কার কথা? কাঁদিস্‌নে ফুঁপিয়ে;
কোপের উপরে কোপ ফ্যাল ঝুপ্ ঝুপিয়ে।
কোদালের মুখ হ'তে নে-রে চাপ লুফিয়ে,
চল্ মাটি কুপিয়ে;—
চৌকোর চার কোণ ঠিক মাপ জুপিয়ে।

ক. বি. বি. এ. (পাস) '৫৭, '৫৬, '৫৫

[একুশ] যে কোনও দুইটির ছন্দোলিপি কর এবং উহাদের ছন্দোবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও:—

(ক) কুন্দ-বল্লী তরু ধবল নিশান।
পাটল তূণ অশোক-দল বাণ॥
কিংশুক নবংগলতা এক সংগ।
হেরি শিশির-ঋতু আগে দিল ভংগ॥

(খ) প্রাণ্-প্রণবের দ্রষ্টা নব!
গান সে অসপত্ন তব,—
অমৃত-সমুদ্ভব! জয়! জয়!
যুবন্ প্রাণের গাও আরতি,—
যে প্রাণ বনে বনস্পতি.
নবীন সবনের ব্রতী! জয়! জয়!

(গ) বাজ্‌ছে শূন্যে অভ্র-কম্বু
কাঁপ্‌ছে অম্বর কাঁপ্‌ছে অম্বু;
লক্ষ ঝর্ণায় উঠ্‌ছে ঝংকার
"ওম্ স্বয়ম্ভূ!" "ওম্ স্বয়ম্ভূ!"

(ঘ) চঞ্চল চরণ কমল-তলে ঝংকরু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর॥

(ঙ) কে নারী অংগনে এলো, চিনিতে না পারি।
অংগনে দাঁড়াইয়ে—এ নয় আমার প্রাণকুমারী।
দশ দিক্ দীপ্ত করা, এ রমণী দশ-করা,
বিবিধ আয়ুধ-ধরা, দনুজ-দলনী হেরি।

(চ) ঢং ঢং ওঁ কৈলাসচূড়া ক্রাং ক্রাং—
হিমজটা বিগলিত গংগা—ঝাংসিকিয়াং,
হর হর হর থর গোমুখীপ্রপাতে
ভেসে-আসা পারিজাত পরে উমা খোঁপাতে।

ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৫৬

[বাইশ] নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশ দুইটি মিত্রাক্ষর-বর্জিত। উভয়ের মধ্যে ছন্দোগত কোন মৌলিক পার্থক্য আছে কি ?

(অ) 'যোজন সহস্র কোটি পরিধি বিস্তার—
বিস্তৃত সে রসাতল বিধুনিত সদা,
চারিদিকে ভয়ংকর শব্দ নিরন্তর
সিন্ধু আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত।'

(আ) 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে।
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে,
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?

ক. বি. বি. এ. (পাস) '৫২

[তেইশ] মুক্তবন্ধ ছন্দ (Free Verse) কাহাকে বলে ? নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশটি মুক্তবন্ধ ছন্দে রচিত হইয়াছে কি ?

'যতটুকু পাই ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
নাই বা উচ্ছলিল,
সারা জীবনের দৈন্যের শেষে সঞ্চয় সে যে
সারা জীবনের স্বপ্নের আয়োজন।'—রবীন্দ্রনাথ।

অথবা, নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশটিতে কোন ছন্দোদোষ আছে কিনা বিচার কর :—

'সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা।
ইটের পরে ইট মাঝে মানুষ-কীট
নাই কো ভালবাসা নাই কো খেলা।'

ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৫১

[চব্বিশ] ছন্দোলিপি রচনা কর ও ছন্দোবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও :—

(ক) 'লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্তকেশজালিকে।
ধক্ক ধক্ক তক্ক ভক্ক অগ্নিচণ্ডভালিকে ॥
লীহ লীহ লোক জীহ লক্ক সাজিকে।
স্বক্ক ঢক্ক ভক্ক ভক্ক রক্তরাজিরাজিকে ॥' —ভারতচন্দ্র।

(খ) 'ফলকের, ঝলকের, আলোকের ছাঁদ।
যেন জলে, সিন্ধুজলে, তারাদলে চাঁদ ॥
কটাকট্, চট্ চট্, পট্ পট্ শব্দ
মার মার, শোর শার, চারি ধার স্তব্ধ।' —রংগলাল।

(গ) 'শোকের ঝড় বহিল সভাতে ;
শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে
বামাকুল ; মুক্তকেশে মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু ; অশ্রুবারিধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার-রব।' —মধুসূদন।

(ঘ) 'সখিরে—
বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে।
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে।
চল লো জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে ॥' —মধুসূদন।

(ঙ) 'আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল।
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমিকম্প।' —নজরুল।

(চ) 'সেই নদী-তটে দাঁড়ায়ে কখনো হেরিব সুদূর পারে
ক্ষীণ বালু-লেখা কল-ঢেউ সনে দুলিছে রূপালী হারে।
সেথা হ'তে কভু দূরাগত কোন্ গেঁয়ো রাখালের বাঁশী
আধ বোঝা-যা'য় আধ না-বোঝায় শ্রবণে পশিবে আসি।'

—জসীম উদ্‌দীন

(ছ) 'তাল সোনাপুরের তালেব মাষ্টার আমি
আজ থেকে আরম্ভ করে বহু দিবসযামী
যদিও করছি লেন নয়—শিক্ষার দেন
মাফ্ কোরবেন।
নাম শুনেই চিনবেন
এমন কথা কেমন করে বলি।
তবু যখন ঝাড়্তে বসি স্মৃতির থলি
মনে পড়ে অনেক অনেক চপল চোখ, সুন্দর মুখ
শুনেছি তাদের মধ্যে অনেকেই এখন বিখ্যাত লোক।
দোয়া করি খোদা তাদের আরও বড় করেন।'

—আশ্‌রাফ্ সিদ্দিকী।

(জ) 'হায়!
হৃদয় শুকায়!
নাহি বল, নাহিক সম্বল,
অন্তরে আনন্দ নাই, চক্ষে নাহি জল।
মূক হয়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,
বিস্মৃত সুখের স্বাদ হৃদি অমুৎসুক,—ধুক্ ধুক্ করে শুধু প্রাণ।
কে করিবে অনুযোগ? দেবতার কোপ; কোথা বা করিবে অনুযোগ?
চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিঃস্ব নিরুদ্‌যোগ।
নাহি বাষ্পবিন্দু নভে,—বরষা সুদূর;
দগ্ধ দেশ তৃষায় আতুর,
ক্লান্ত চোখে চায়;
হায়।'

—সত্যেন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদ

অবতরণিকা

একটি ভাষার বক্তব্য বিষয়কে অপর ভাষায় যথাযথভাবে রূপান্তরিত করা খুবই আয়াসসাধ্য ব্যাপার। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ভাষারই আছে ভাব-প্রকাশের নিজস্ব রীতি, বাক্যগঠনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি, শব্দ ও বাক্যাংশ-বিশেষের বিশিষ্ট অর্থ। তাই দেখি,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদ নিছক কথার কথার মানে হইয়া দাঁড়ায়, সাহিত্যরসমধুর হয় না। এ কথা খুবই সত্য যে, অনুবাদককে উভয় সংকটের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। মূল ভাষার যথাযথ অনুবাদও যেমন চাই, আবার অনুবাদ-ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং সৌন্দর্যও তেমনি চাই। প্রথম প্রথম অনুবাদ-শিক্ষার্থীর নিকটে ভাষা অস্পষ্ট, দুর্বল ও আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে, মূল ভাষার ভাব ও ব্যঞ্জনা ঠিক মত বজায় থাকিবে না সত্য, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। অভ্যাসবলে অনুবাদ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিবে। অনুবাদকালে মূল ভাষার বাক্যগঠনরীতি ও বাধিবিধি অনুবাদকের অনুবাদপ্রয়াসী বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এহেন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকিয়াও **যে-অনুবাদক মূলের সহিত অনুবাদের যাথার্থ্য বজায় রাখিয়া অনুবাদভাষার রীতি, সংগতি ও সৌন্দর্য পূর্ণমাত্রায় পরিবেশন করিতে পারে, সেই অনুবাদকই যথার্থ অনুবাদক এবং তাহার অনুবাদই সার্থক অনুবাদ।**

অনুবাদ-সমস্তার স্বরূপ ও সার্থক অনুবাদের লক্ষণ

অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ হইবে, না ভাবানুবাদ হইবে—ইহাই লইয়া ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ই বিপাকে পড়িয়া থাকে। পরীক্ষাপত্র পরীক্ষা করিবার কালে দেখি, আক্ষরিক অনুবাদ সম্পর্কে যাহারা চরমপন্থী, তাহারা বাংলা হরফে লিখে সত্য, কিন্তু তাহাদের দুর্বোধ্য আড়ষ্ট ভাষার মধ্যে বক্তব্য বিষয়টি তলাইয়া যায়; আবার ভাবানুবাদ সম্বন্ধে যাহারা চরমপন্থী, তাহারা ভাবের পাখনায় ভর দিয়া এমন ভাবে চলে যে, মূলের বক্তব্য বিষয়ের সহিত অনুবাদের বক্তব্য বিষয়ের যোগসূত্র বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, এইরূপ অনুবাদ একেবারেই অচল।

আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ

অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক হওয়াই উচিত। তবে আক্ষরিক অনুবাদ করিবার ফলে অনুবাদ-ভাষার আত্মধর্ম যেন কোন রকমেই ক্ষুণ্ণ না হয়। ইংরাজি অনুচ্ছেদের বাংলা অনুবাদে বাংলা ভাষার নিছক আত্মধর্ম—তাহার স্বতন্ত্র শব্দসম্পদ, বাগ্‌ধারা ও বাক্যগঠনপ্রণালী—যেন বজায় থাকে। আসল কথাটি এই যে, যে-ভাষাতেই অনুবাদ করা যা'ক্ না কেন, সেই ভাষার নিজস্ব রীতি, সংগতি ও শ্রুতিমাধুর্যও যেমন চাই, আবার অনুবাদেও তেমনি যথাযথতা বা যথার্থতা থাকা চাই। এক কথায় বলা যায় যে, অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক হইলেও, অনুবাদ-ভাষার আত্মধর্মের তাগিদের দরুণ ভাবানুবাদকে একেবারে পরিহার করা চলে না। এই মধ্যপন্থী রীতিই সার্থক অনুবাদের বাহন। এই যোগ্য বাহনটিকে বাগ্ মানাইতে হইলে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীকে নিয়মিত ভাবে অনুবাদ আরম্ভ করিতে হইবে। অতঃপর অনুবাদকে অনুবাদ বলিয়া যখন মনে হইবে না, অনুবাদ যখন মূলেরই ন্যায় স্বাধীন ও মৌলিক রচনা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তখনই অনুবাদক-অনুবাদিকার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইবে।

মধ্যপন্থী পদ্ধতিই সার্থক অনুবাদের বাহন

অনুবাদের ভাষা কিরূপ হইবে, ইহা লইয়াও সমস্যা আছে। আমার মনে হয় মূলের ভাষার উপরেই অনুবাদের ভাষা নির্ভর করে। মূলের ভাষা যদি হয় সহজ, সাবলীল ও লীলায়িত, তাহা হইলে অনুবাদের ভাষাও হওয়া উচিত প্রাঞ্জল, বেগবান ও লীলাচঞ্চল। আবার মূলের ভাষা যদি হয় গুরুগম্ভীর, ওজস্বিনী ও গূঢ়ার্থক, তাহা হইলে অনুবাদের ভাষাও হওয়া উচিত গুরুগম্ভীর, ওজস্বিনী ও গূঢ়ার্থক। সম্প্রতি কথ্য ভাষায় অনুবাদ করিবার ঝোঁকও দেখা দিয়াছে। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কথ্য ভাষায় অনুবাদ আদৌ অনায়াসসাধ্য নয়। সাধু ও মার্জিত ভাষায় অনুবাদ করিতে করিতে অনুবাদের হাত যখন পাকা হইয়া উঠিবে, কেবলমাত্র তখনই কথ্য ভাষায় অনুবাদ করিতে যাওয়া সমীচীন, তৎপূর্বে নয়। কাহিনীর কথনবিন্যাসের কালে কথ্যভাষার প্রয়োগ সাহিত্যরস সঞ্চারিত করে; এইরূপ সুযোগ থাকিলে অনুবাদে কথ্যভাষার প্রয়োগ রচনারীতির শ্রী ও সৌষ্ঠব বাড়াইয়া তুলে।

অনুবাদের ভাষা

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ইংরাজি অনুচ্ছেদের বাংলা অনুবাদ করিতে বলা হয়। অনুবাদে থাকে সাধারণত পনেরো নম্বর। কখনও-বা সঠিক অনুবাদের নিমিত্ত দশ নম্বর আর রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্যের উপরে পাঁচ নম্বর, এইভাবে পনেরো নম্বরের পূর্ণমান ধরিয়া থোকনম্বর দিবার নির্দেশ থাকে। আবার কখনও-বা ভাষান্তরিত অনুচ্ছেদের প্রতিটি বাক্যে স্বতন্ত্রভাবে নম্বর দেওয়া হয় এবং অনুবাদ-প্রশ্নের উত্তরের বাম দিকে ঐ স্বতন্ত্র নম্বরসমূহের মোট সংখ্যা লিখিত হয়; তদুপরি বাক্যের পর

বাক্য পরীক্ষা করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে নম্বর দিবার পরেও, সমগ্র অনুবাদ সম্পর্কে পরীক্ষক বা পরীক্ষিকা যে অখণ্ড ধারণা পোষণ করেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি বাক্যপরম্পরায় প্রদত্ত নম্বরসমূহকে আর একবার মিলাইয়া লইয়া প্রয়োজনমত পরিবর্তন করেন। নম্বর দিবার এই পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, পরীক্ষার্থী-পরিক্ষার্থিনীরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, অনুবাদে মূলের বাক্যগত বক্তব্য বিষয়ের যথার্থতা ও অনুবাদভাষার আত্মধর্ম উভয়ই বজায় রাখা চাই। অতএব, তাড়াতাড়িতে সমগ্র অনুচ্ছেদের অধম অনুবাদ করা অপেক্ষা সতর্কতা-সহকারে কয়েকটি বাক্যের উত্তম অনুবাদ করাও শ্রেয়তর।

পরীক্ষায় অনুবাদে নম্বর দিবার নিয়ম ও সেই নিয়মানুসারে অনুবাদ রচনা

সার্থক অনুবাদ করিতে হইলে, ছাত্রছাত্রীগণকে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি সম্পর্কে অতীব সচেতন থাকিতে হইবে:—(ক) কোন্ অনুচ্ছেদটি অনুবাদ করিবে, তাহা প্রথম অথবা দ্বিতীয় বার পড়িবার পর সাব্যস্ত কর। (খ) সমগ্র অনুচ্ছেদ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পড়িয়া বাক্যপরম্পরাগত বক্তব্য বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা কর। যে সকল শব্দ ও বাক্যাংশের অর্থ তুমি জান না, তাহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বক্তব্য বিষয়াদি বুঝিয়া লইয়া উহাদের যথাযোগ্য অর্থ অনুমান কর। (গ) অনুচ্ছেদটি অন্তত-পক্ষে চারবার পড়। (ঘ) মূলের গুরুত্বপূর্ণ দুরূহার্থক শব্দ ও বাক্যাংশাদির নীচে দাগ কাট এবং অনুবাদকালে তাহাদের যথাযোগ্য অবস্থান্তর কর। (ঙ) বংগানুবাদে বাংলা বাক্যগঠনপ্রণালীকে ও বাংলা বাগ্বিধিকে অনুসরণ কর। (চ) ইংরাজি রচনা-রীতির অন্তর্গত Phrase, Clause এবং Compound words-কে বাংলায় যথাসম্ভব সমাসবদ্ধ পদাদির সাহায্যে অনুবাদ কর। (ছ) ইংরাজির Direct Narration এবং Indirect Narration-কে বাংলায় যথাক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির মাধ্যমে অনুবাদ কর। (জ) মূলে যে বাচ্য ও ক্রিয়ার প্রকার থাকিবে, অনুবাদেও সেই বাচ্য ও ক্রিয়ার প্রকার রক্ষা কর। (ঝ) বাংলা বাক্যে অনেক সময় ক্রিয়াপদ দিবার প্রয়োজন নাই। বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার খুবই বেশী। তবে পর পর কতকগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে রচনা শ্রুতিকটু হয়—এই কথাগুলি স্মরণ রাখিও। (ঞ) মূলের জটিল ও মিশ্র বাক্যকে অনুবাদেও যতটা সম্ভব রক্ষা কর। যদি এইরূপ করিতে নাই পারা যায় তো অনুবাদে ইহাকে পৃথক্ পৃথক্ সরল ও যৌগিক বাক্যাদিতে রূপান্তরিত কর। (ট) ইংরাজি বাক্যের শেষাংশ বাংলা বাক্যের প্রথমাংশ-রূপে আসিবার দাবি করিতেছে কিনা, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া যথাযথ ভাবে বংগানুবাদ কর। (ঠ) যে সকল ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের বাংলা পরিভাষা

অনুবাদ-রচনা সম্পর্কে ইতিবাচক ত্রয়োদশ [illegible]

সুপ্রচলিত, তাহা লিখ। পক্ষান্তরে, যেখানে বাংলা পরিভাষা সুস্থির নয়, সেখানে ইংরাজি পারিভাষিক শব্দকেই বাংলা বানান দিয়া লিখ। (ড) প্রথমে সমগ্র অনুচ্ছেদের একটি খসড়া অনুবাদ কর; তারপর মূলের ভাবের সহিত এই অনুবাদের ভাব-সংগতি আছে কিনা, তাহাই বাক্য-পরম্পরায় বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনমত সংশোধন কর। সংশোধন-শেষে অনূদিত অনুচ্ছেদকে পরিষ্কার করিয়া লিখ।

ইহা ছাড়া, আরও কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিণীকে অবহিত হইতে হইবে :—(ক) মূলের বাক্যগঠনরীতি ও বাগ্বিধিকে অনুবাদে হুবহু অনুসরণ করিও না। (খ) অনুবাদকালে মূলের একটি বাক্যের সংগে অপর বাক্যকে জুড়িয়া দিও না। (গ) অনুবাদ-কালে মূলের ব্যাখ্যা অথবা ভাবার্থ লিখিও না। (ঘ) মূলের কোন বিশেষ শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের অর্থ বুঝিতে না পারিলে হতাশ হইও না। (ঙ) ইংরাজি নাম বাংলায় অনুবাদ করিও না। (চ) ইংরাজি ভাষার নিজস্ব বাক্-পদ্ধতি ও বাক্যাংশের আক্ষরিক অনুবাদ করিও না। কারণ,—এইরূপ অনুবাদের ফলে অর্থহীন ও হাস্যকর অবস্থা গড়িয়া উঠে। পক্ষান্তরে, আক্ষরিক অনুবাদের স্থলে ভাবানুবাদ করিলে ভাষার নিজস্ব রীতি ও সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়া রচনাকে সাহিত্যপদবাচ্য করিয়া তুলে।

অনুবাদ-রচনা সম্পর্কে নেতিবাচক ষষ্ঠ নির্দেশ

পরিশেষে, ছাত্রছাত্রীগণকে আর একটি কথা জানাইয়া রাখি। অনুবাদকে যাচাই করিয়া লইবার একটি চমৎকার পদ্ধতি আছে। মনে মনে বংগানুবাদের ভাষাকে পুনরায় অনুবাদ করিয়া মূল ইংরাজি ভাষার আত্মধর্মে তথা বাক্যগঠনপ্রণালী ও বাগ্বিধিতে যদি ফিরিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে বাংলায় কৃত অনুবাদের যাথার্থ্য সার্থকতা ও গৌরব বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। অনুবাদের সার্থকতা বিচারের এই ক্রিয়াকাণ্ডটিকে রাসায়নিক দৃষ্টিভংগিতে বলা যায় যে, ইহাই অনুবাদের "য়্যাসিড্ টেস্ট্"।

অনুবাদ-ক্রিয়ার "য়্যাসিড্ টেস্ট্"

প্রথম অধ্যায়

সহজ অনুচ্ছেদাদির অনুবাদ

আদর্শমালা

[এক]

A generation ago little or nothing was known in Europe of this great faith of Asia, which had nevertheless existed during twentyfour centuries, and at this day surpasses, in the number of its followers and the area of its prevalence, any other form of creed. Four hundred and seventy millions of our race live and die in tenets of Gautama; and the spiritual dominions of this ancient teacher extend, at the present time, from Nepal and Ceylon, over the whole of the Eastern Peninsula, to China, Japan, Tibet, Central Asia, Siberia and even Swedish Lapland. India itself might fairly be included in this magnificent Empire of belief; for though the profession of Buddhism has for the most part passed away from the land of its birth the mark of Gautama's sublime teaching is stamped ineffaceably upon modern Brahmanism.

[tenets of Gautama—গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম; creed—ধর্মমত, বিশ্বাস; ineffaceable—অনপনেয়।]

চতুর্বিংশ শতাব্দীব্যাপী বিদ্যমান এশিয়ার এই মহান্ ধর্মমতের প্রায় কিছুই এক পুরুষ পূর্বেও ইউরোপে জ্ঞাত ছিল না এবং অধুনা অন্য যে কোন ধর্মমত অপেক্ষা ইহার অনুসরণকারীর সংখ্যা ও বিস্তৃতির ক্ষেত্র অধিকতম। মানবজাতির প্রায় সাতচল্লিশ কোটি লোক গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মে বিশ্বাস রাখিয়াই জীবনযাপন ও মৃত্যুবরণ করে এবং প্রাচীন এই আচার্যের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য বর্তমানে নেপাল এবং সিংহল হইতে সমগ্র প্রাচ্য ভূমণ্ডলের মধ্য দিয়া চীন, জাপান, তিব্বত, মধ্যএশিয়া, সাইবেরিয়া, এমন কি সুইডেনীয় ল্যাপল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতবর্ষও এই গৌরবময় ধর্মসাম্রাজ্যের প্রায় অন্তর্গত; কারণ, যদিও বৌদ্ধধর্মের চর্চা তাহার উৎপত্তিস্থল হইতে বেশীর ভাগই অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাপি গৌতমের মহান্ শিক্ষার চিহ্ন আধুনিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনপনেয়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

[দুই]

The Emperor of Persia was sitting one day with his august feet in a basin of rose-water, an ingenious method which he employed in

order to cause happy ideas to occur to him when he was troubled. Half-slumbering by reason of the sublime thoughts which crowded to his brain, he nodded two or three times, rubbed his eyes and reclining his head on a cushion, fell asleep. The court with silent respect contemplated the gentle sleep of His Majesty, when a loud sneeze filled the courtiers with horror and suddenly awakened His Majesty.

"Who was it ?" asked the monarch.

"Sire !" exclaimed the youth, "it was I, I could not help it."

"You have just interrupted the sweetest dream of my life. Your duty is now to guess my dream. If you can remind me of it, I forgive you ; but if not, I will have your nose shortened so that you will never sneeze again as long as you live." *C. U. Inter. (Arts) '57*

একদা পারস্যের সম্রাট গোলাপজলের একটি পাত্রে মহান্ পাদযুগল স্থাপিত করিয়া বসিয়াছিলেন, যখনই কষ্টবোধ করিতেন তখনই আনন্দদায়ক ভাবোদয়ের জন্য তিনি এই চাতুর্যপূর্ণ উপায়টি অবলম্বন করিতেন। তাঁহার মস্তিষ্কে যে মহান্ ভাবরাশি ভিড় করিতেছিল, তাহাদের প্রভাবে অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া তিনি দুই তিনবার মাথা নাড়িয়া চোখ দুইটি রগড়াইয়া তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। সভাসদ্গণ নীরব শ্রদ্ধাসহকারে মহামান্য সম্রাটের নিদ্রা নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় একটি হাঁচির উচ্চ শব্দে সভাসদ্গণ আতংকিত হইলেন এবং সম্রাটের হঠাৎ নিদ্রাভংগ হইল।

সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ইহা করিল ?"

যুবক বলিল, "মহারাজ আমি। নিরুপায় হইয়া আমিই হাঁচিয়াছি।"

"তুমি আমার জীবনের মধুরতম স্বপ্ন ভংগ করিয়াছ। আমার স্বপ্নটি অনুমান করাই তোমার এখন কর্তব্য। যদি তুমি আমাকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে পার, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব ; কিন্তু যদি তাহা না পার, তাহা হইলে তোমার নাক এত ছোট করাইয়া দিব যে, তুমি যতকাল বাঁচিবে ততদিন আর কখনও হাঁচিতে পারিবে না।"

[তিন]

The Suez Canal has been the highway of shipping between East and West for nearly a century, but some of the most interesting travellers through this famous waterway between Asia and Europe pay no tolls and cannot be checked by any embargoes or military force. They are the marine creatures which have thereby gained access to the Mediterranean, not just as rare stragglers, but have spread up the Palestine coast to Syria and appear regularly on the fish markets of

the Levant. Along this 100-mile waterway more than a score of kinds of fish, crabs, prawns and other forms of marine life have travelled from the salty waters of the Red Sea to the sweeter waters of the Mediterranean. *C. U. Inter. (Science) '57*

[embargo—নিষেধাজ্ঞা ; to straggle—দলছাড়া হওয়া ; the Levant—ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলবর্তী দেশসমূহ ।]

প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী সুয়েজখাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে জাহাজ চলাচলের প্রশস্ত জলপথ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী এই বিখ্যাত জলপথে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ভ্রমণকারিদের মধ্যে কিছুসংখ্যক কোন শুল্কই দেয় না এবং কোনও নিষেধাজ্ঞা বা সামরিক শক্তির দ্বারা উহাদিগকে বাধা দেওয়া যায় না। উহারা সামুদ্রিক প্রাণী—তাই ভূমধ্যসাগরে কেবলমাত্র বিরল দলভ্রষ্ট হিসাবেই প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে তাহা নয়, বরং প্যালেষ্টাইনের উপকূল হইতে সিরিয়া পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলবর্তী দেশসমূহের মাছের বাজারে নিয়মিত ভাবেই উহাদের আগমন ঘটে। এই শত মাইল জলপথ দিয়া বিশ রকমেরও বেশী মাছ, কাঁকড়া, বাগ্‌দা চিংড়ি এবং অন্যান্য রকমের সামুদ্রিক প্রাণী লোহিত সাগরের লবণাক্ত জল হইতে ভূমধ্যসাগরের মিষ্টতর জলে গমন করে।

[চার]

When Napoleon Bonaparte after his defeat at Waterloo by the British and Prussians was sent off to St. Helena, not many people were very sorry. Even the French people, who had admired Napoleon and were very proud of the glory he had conferred on France, were tired of constant war ; and so they were inclined to say, "Well, he was a great man, but he turned the world upside down too much."

The kings, statesmen and nobles of Europe, of course, were very glad indeed to get rid of Napoleon. They regarded the French Revolution of 17:9 as a kind of wild outburst of anarchy and Napoleon's exploits as the natural result of the Revolution. After Napoleon's fall for the first time they felt secure. *C. U. Inter. (Science) '57*

প্রুশীয় ও ব্রিটিশদিগের দ্বারা ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে যখন সেন্ট-হেলেনায় পাঠানো হইল, তখন বেশী লোক খুব দুঃখিত হয় নাই। এমন কি, যাহারা নেপোলিয়নকে প্রশংসা করিত এবং ফরাসীদেশকে গৌরব-মণ্ডিত করার জন্য গর্ব অনুভব করিত, সেই ফরাসীরাও অবিরাম যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; সুতরাং তাহাদেরও এইরূপ বলার প্রবণতা দেখা গেল,—"হ্যাঁ, তিনি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি পৃথিবীকে অত্যধিক বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।"

নেপোলিয়নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ায় ইউরোপের রাজন্তবর্গ, রাজনীতিবিদ্‌গণ এবং অভিজাতরা অবশ্য খুবই খুশী হইয়াছিলেন। তাঁহারা ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবকে অরাজকতার একপ্রকার বন্ত বহিঃপ্রকাশ এবং নেপোলিয়নের কার্যাবলীকে বিপ্লবের স্বাভাবিক ফলরূপে মনে করিতেন। নেপোলিয়নের পতনের পর সর্বপ্রথম তাঁহারা নিরাপত্তা বোধ করিলেন।

[পাঁচ]

The tiger sprang at me and buried its teeth, one under my right eye, one in my chin and the other two here at the back of my neck. Its mouth struck me with a great blow and I fell over on my back, while the tiger lay on top of me chest to chest, with its stomach between my legs. When falling backwards I had flung out my arms and my right hand had come in contact with an oak sapling. My legs were free, and if I could draw them up and insert my feet under and against the tiger's belly, I might be able to push the tiger off, and run away. The pain, as the tiger crushed all the bones on the right side of my face, was terrible; but I did not lose consciousness.

বাঘটি আমার দিকে তাড়া করিয়া আমার ডান চোখের নীচে একটি দাঁত, আমার গালে একটি এবং আর দু'টি দাঁত এখানে ঘাড়ে ফুটাইয়া দিল। ইহার মুখের খুব জোর এক আঘাতে আমি চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলাম, এবং বাঘটি আমার পায়ের মধ্যে উদরটি রাখিয়া আমার বুকের উপর বুক রাখিল। পিছনে ফিরিয়া পড়িবার সময় আমি হাতগুলি ছড়াইয়া দিয়াছিলাম এবং ডান হাত দিয়া একটি ওক গাছের চারা স্পর্শ করিয়াছিলাম। আমার চরণদ্বয় মুক্ত ছিল, সুতরাং বাঘের পেটের নীচে এগুলিকে যদি গুটাইয়া আনিতে পারিতাম, তাহা হইলে বাঘকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইতাম এবং পলাইয়া যাইতে পারিতাম। আমার মুখের ডানদিকের হাড়গুলিকে বাঘটি ভাঙিয়া দেওয়ায় অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল; কিন্তু জ্ঞান হারাই নাই।

[ছয়]

The famous traveller and discoverer, Sir Walter Raleigh, lived in the reign of Queen Elizabeth. He was the first man to indulge in the habit of smoking in England. He brought tobacco with him from the newly discovered continent of America and introduced the use of if it in Europe. One day he sat smoking in his garden. A servant passed by, carrying a pail of water. The man had not yet heard of his master's strange habit. He glanced at his master. He

saw a cloud of smoke and thought his clothes must have caught fire. He was a man of great quickness and presence of mind. He rushed to his beloved master and raising the pail of water, flung the contents over him and without waiting for thanks, fled away for some more.

সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী এবং আবিষ্কারক স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডে ধূমপানের অভ্যাস আরম্ভ করেন। নবাবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশ হইতে তিনিই স্বয়ং তামাক আনিয়া ইহার ব্যবহার ইউরোপে প্রবর্তন করেন। একদিন তিনি বাগানে বসিয়া ধূমপান করিতে-ছিলেন। একটি চাকর এক বাল্‌তি জল লইয়া পাশ দিয়া যাইতেছিল। চাকরটি তখনও অবধি তাহার প্রভুর এই বিচিত্র নেশার কথা শোনে নাই। সে প্রভুর দিকে তাকাইল। ধোঁয়ার মেঘ দেখিয়া সে ভাবিল যে, তাঁহার পরিচ্ছদে নিশ্চয়ই আগুন লাগিয়াছে। সে খুব ছট্‌ফটে এবং উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। সে তাহার প্রিয় প্রভুর নিকট ছুটিয়া গিয়া জলের বাল্‌তিটি উঠাইয়া তাঁহার উপর জল ফেলিয়া দিল এবং ধন্যবাদের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আরও আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

[সাত]

Although no amount of theoretical knowledge of the technique of cooking, it is rightly held, can make a good cook of a person if he or she has no native talent for cooking—just as no amount of book knowledge of the technicalities of music can make a good musician—cookery, it is suggested, can be learnt by any one who will seek to learn it in the true spirit of genuine devotion. A person who learns to cook in this way will not only know how to prepare all the well-known and traditional dishes, but will invent new preparations and thus augment the literature of cookery. A good cook has a hand which is quick, yet sure, preparing many dishes simultaneouely, yet preserving clean hands and a clean kitchen, making his taste the test not of his own pleasure but of others. *C. U. Inter. (Arts)'56*

যদিও একথা সত্য যে, কোন ব্যক্তির বা মহিলার রন্ধন-বিষয়ে কোন জন্মগত প্রতিভা না থাকিলেও রন্ধনকৌশল সম্বন্ধে যত বেশীই পুঁথিগত জ্ঞান তাঁহার থাকুক না কেন, সে কখনও ভাল রাঁধুনী হইতে পারে না—যেমন সংগীতবিদ্যার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে খুব বেশী পরিমাণে পুঁথিগত জ্ঞান থাকিলেও ভাল গায়ক হওয়া যায় না—রন্ধনবিষয় সম্বন্ধেও বলা হয় যে, যে-কেহ সত্যিকারের আগ্রহ এবং যথার্থ অনুরাগের সহিত যদি ইহা শিখিতে চায়, সেই রন্ধন শিখিতে পারে। যে ব্যক্তি এই ভাবে রন্ধন করিতে শিখে, সে যে কেবল সমস্ত সুপরিচিত ও গতানুগতিক খাদ্যগুলি প্রস্তুত করিতে শিখিবে

তাহাই নয়, পরন্তু নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া এইভাবে রন্ধনসাহিত্যকে পুষ্ট করিবে। ভাল রন্ধনকারীর হাত দ্রুত অথচ নির্ভুল; সে একই সংগে অনেকগুলি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারে অথচ হাত এবং রন্ধনগৃহ পরিষ্কার রাখে, তাহার রুচি স্বীয় আনন্দের মাপকাঠি নয়—বরং অপরেরই।

[আট]

Most newspapers which you read so freely every morning and every evening, contain nothing but abuse of the other side. If, for instance, you read some extremist organs, there is nothing but abuse of the other fellows. They are all people that are accustomed to wait in the anti-cnambers of big officials, people that make private applications for titles and honours, or ask for consideration in a sympathetic and favourable spirit of the applications that their nephews and sons-in-law are sending up. It would appear the accusers are above all such considerations. It is all angels on one side and devils on the other, upon one side all unworthy citizens, upon the other all saints. *C. U. Inter. (Arts)* '56

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় যে সংবাদপত্রগুলি তোমরা অবাধে পাঠ কর, তাহার অধিকাংশতেই অপর পক্ষের নিন্দাবাদ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যদি কোন চরমপন্থীর মুখপত্র পড়, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের নিন্দা ছাড়া আর কিছুই তাহাতে পাওযা যায় না। যেন তাহারা সকলেই এমন লোক যাহারা বড় বড় রাজকর্মচারীর বসিবার স্থানের পাশের ঘরে সর্বদা অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা উপাধি ও সরকারী সম্মানের জন্য গোপনে আবেদন করিয়া থাকে, অথবা তাহাদের ভাইপো-ভাগ্নে-জামাইরা যেসব দরখাস্ত পাঠাইতে থাকে সেগুলিকে সহানুভূতিপূর্ণ এবং অনুগ্রহপূর্ণভাবে বিবেচনা করিয়া থাকে—এই অনুরোধ করিতেই আসে। যেন অভিযোগকারীরা নিজেরা এই রকম ব্যবহার কখনই করে না। যেন একদিকে সকলেই দেবতা, আর অপরদিকে সকলেই দানব; একদিকে সকলেই অপদার্থ নাগরিক, অপরদিকে সকলেই মহাত্মা সাধুব্যক্তি।

[নয়]

The joys of freedom are indeed difficult to describe; they can only be fully appreciated by those who have had the misfortune to lose them for a time. With grief and sorrow I occasionally notice that here and there are people who speak of freedom as though it were a mechanical invention, or a quack specific for which they have taken a patent. "Our ancestors," say they, "have fought, have struggled, and

have suffered for freedom. It is ours exclusively. We will not share it with those who have not shared our troubles, trials and misfortunes to attain it." I take it that that is not an exalted view of freedom. What a man has fought for and won he must without reserve share with his fellowmen. *C. U. Inter. (Science) '56*

স্বাধীনতার আনন্দ বাস্তবিকই বর্ণনা করা কঠিন; ইহাকে তাহারাই সম্পূর্ণভাবে সমাদর করিতে পারে, যাহাদের ইহাকে সাময়িকভাবে হারাইবার দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। দুঃখ এবং বেদনার সহিত আমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি যে, এখানে সেখানে লোকেরা স্বাধীনতা সম্বন্ধে এরূপ কথা বলে যেন ইহা একটি যান্ত্রিক উদ্ভাবন অথবা যেন রোগীর উপরে প্রযোজ্য একটি হাতুড়ে দাওয়াই। তাহারা বলিয়া থাকে, "আমাদের পূর্বপুরুষগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, সংগ্রাম করিয়াছেন এবং কষ্টভোগ করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণভাবে আমাদেরই। যাহারা ইহা অর্জন করিবার জন্য আমাদের সহিত কষ্ট দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যের অংশভাগী হয় নাই, তাহাদিগকে আমরা ইহার অংশ দিব না।" আমি মনে করি যে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে উহা একটি অতি উচ্চ ধারণা নয়। মানুষ যাহা-কিছু সংগ্রাম করিয়া অর্জন করিয়াছে, তাহা সঞ্চয় না করিয়া সংগিগণকে ভাগ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

[দশ]

The standard of living and hours of working of an English farmer of three centuries ago would probably not do for us to-day. Nor, I imagine, would his stay-at-home life. Outside their own little world everything was just a blank to our forefathers; a man from a neighbouring country was a foreigner. New ideas seldom came their way, and when they did they distrusted them—they were foreigners too, in fact. But whatever had been tried and found to work, they stuck to with dogged persistence. Their life was a round of routine, ordered by countless generations who had gone before them. Probably this all sounds terribly narrow and dull. Yet when one examines their life a little more closely, one finds it to have been far more rich than one had at first supposed. *C. U. Inter. (Science) '56*

তিন শতাব্দী পূর্বের একজন ইংরাজ কৃষকের জীবনধারণের মান ও কর্মসময় আমাদের পক্ষে আজকাল উপযোগী হইবে না। আমার মনে হয়, তাহার ঘরকুণো জীবনও আমাদের কাজে লাগিবে না। আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট স্বীয় ক্ষুদ্র পৃথিবীর বাইরের আর কিছুই জ্ঞাত ছিল না এবং প্রতিবেশী দেশের যে কোন লোকই ছিল বিদেশী। নূতন চিন্তাধারা কদাচিৎ তাঁহাদের কাছে পৌঁছাইত এবং আসিলেও উহাকে তাঁহারা অবিশ্বাস করিতেন—বস্তুত তাঁহাদের কাছে উহা বিজাতীয়ই ছিল।

কিন্তু যাহা-কিছুই পরীক্ষা-দ্বারা স্থিরীকৃত এবং কার্যকর হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহারা নাছোড়বান্দার ন্যায় লাগিয়া থাকিতেন। পূর্বতন অসংখ্য পুরুষ কর্তৃক স্থিরীকৃত বিধিব আবর্তনই তাঁহাদের জীবন। বোধ হয় ইহা শুনিতে অত্যধিক সংকীর্ণ ও নীরস লাগে। কিন্তু কেহ যদি একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহাদের জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহা হইলে পূর্বানুভূত ধারণার চেয়ে ইহাকে অধিকতর সমৃদ্ধ মনে হইবে।

[এগারো]

There is an old legend that soon after creation the gods announced that mankind would, on a given day, be permitted to divide the earth between them. As soon as the appointed time arrived, the agriculturists—occupied the fertile fields ; merchants the roads and seas, monks the valleys suitable for vines ; noblemen the woods and forests for the sake of the game ; kings the bridges and defiles where they could raise taxes. The poet who was deep in meditation, came when all was over and lamented his lot What was to be done ? The gods had nothing more to give. "Come", they said, "and live with us in eternal heaven." *R. U. Inter. '56*

একটি প্রাচীন কিম্বদন্তী আছে যে, সৃষ্টির পর পরই দেবতাগণ ঘোষণা করিয়া দিলেন, মনুষ্যজাতি একটি নির্দিষ্ট দিনে নিজেদের মধ্যে পৃথিবী ভাগ করিবার অনুমতি পাইবে। নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হওযার সংগে সংগেই কৃষকগণ উর্বর ভূমিসকল, বণিকগণ পথ এবং সমুদ্রসমূহ, সাধুগণ দ্রাক্ষালতাব উপযোগী উপত্যকাসমূহ, অভিজাতগণ শীকারের জন্য বনজংগল এবং রাজারা রাজস্ব আদায়ের জন্য সেতু ও গিরিসংকট দখল করিয়া লইলেন। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন কবিরা সব শেষ হইয়া যাইবার পর আসিলেন এবং দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ করিতে লাগিলেন। এখন কি কর্তব্য? দেবতাদের এখন দিবার কিছুই নাই। তাঁহারা বলিলেন, "আইস, আমাদের সহিত শাশ্বত স্বর্গে বাস কর।"

[বারো]

What happened in Spain happened also in other places. Wherever the Muslims entered a change came over the countries ; order took the place of lawlessness, and peace and plenty smiled on the land. As war was not the privileged profession of one caste, so labour was not the mark of degradation to another. The pursuit of agriculture was as popular with all classes as the pursuit of arms.

D. U. Inter. '56

স্পেনে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অন্যান্য স্থানেও ঘটিয়াছিল। যেখানেই মুসলমানেরা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দেশেই পরিবর্তন আসিয়াছিল; অরাজকতার পরিবর্তে

আসিয়াছিল শৃংখলা এবং শান্তি ও প্রাচুর্যে দেশ গিয়াছিল ভরিয়া। সংগ্রাম যেমন কোন জাতির বিশেষ অধিকৃত পেশা নয়, তেমনি শ্রমও অন্য জাতির পক্ষে অধোগতির পরিচায়ক নয়। অস্ত্রানুশীলনের ন্যায় কৃষিকার্যও সর্বশ্রেণীরই নিকট জনপ্রিয়।

[তেরো]

All such knowledge should be given to a young girl as may enable her to undestand, and even to aid, the work of men : and yet it should be given, not as knowledge,—not as if it were, or could be, for her an object to know ; but only to feel, and to judge. It is of no moment, as a matter of pride or perfectness in herself, whether she knows many languages or one ; but it is of the utmost, that she should be able to show kindness to a stranger, and to understand the sweetness of a stranger's tongue. It is of no moment to her own worth and dignity that she should be acquainted with this science or that ; but it is of the highest that she should be trained in habits of accurate thought ; that she should understand the meaning, the inevitableness, and the loveliness of natural laws , and follow at least some one path of scientific attainment. *C. U. Inter. (Arts) '55*

তরুণী বালিকাকে এরূপ শিক্ষাদান করা উচিত যাহাতে সে পুরুষের কর্মধারা বুঝিতে, এমন কি, তাহাতে সাহায্য করিতে পারে, তথাপি এই শিক্ষা, জ্ঞানের বিষয় হিসাবে—যেন তাহা তাহার পক্ষে জানিবার বস্তুই হইবে বা হইতে পারে—দেওয়া উচিত নয়, কেবল অনুভূতির বা বিচারের বিষয় হিসাবেই দেওয়া উচিত। সে অনেকগুলি ভাষা বা একটি ভাষা শিক্ষা করিয়া অহংকার বা আপনার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিল কি না তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়, তবে সে যে বিদেশীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে পারিবে এবং তাহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে, ইহাই খুব বেশী প্রয়োজনীয় ব্যাপার। সে যে কোনও বিশেষ বিজ্ঞানের পরিচয় লাভ করিবে, তাহাতে যে তাহার বিশেষ মূল্য বা মর্যাদাবৃদ্ধি হইবে তাহা নয়, তবে সে যে নির্ভুলভাবে চিন্তা করিবার অভ্যাস গঠন করিবার শিক্ষা পাইবে, সে যে প্রকৃতির নিয়মগুলির তাৎপর্য এবং এগুলি যে অপরিবর্তনীয় এবং চিরসুন্দর—একথা উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং অন্তত বৈজ্ঞানিক সাফল্যের কোন একটি পথ অনুসরণ করিতে পারিবে, ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

[চোদ্দ]

Walled by the lofty range of the snow-capped Himalayas on the North, surrounded by seas and oceans on the other sides and thus cut off from the outer world, India has been the chosen land of Nature

herself. Freed from the struggle of existence and away from the tumult of the outside world, the mind of her people turned inward and investigated into her inner nature. Their intensive culture in that direction yielded in time a rich harvest from the fields of religion and philosophy, ethics and theology, science and astronomy, art and literature. India thus became the central seat of a culture and civilization that found their way through Arabia, Egypt and Assyria to the farthest corners of Europe, a culture and civilization that became her glory.

C. U. Inter. (Arts) '55

উত্তরে তুষারমৌলি হিমালয়-পর্বতমালার প্রাচীর দ্বারা এবং অন্যান্য দিকে সাগর মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত এবং এইভাবে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতভূমি স্বয়ং প্রকৃতিদেবীরই স্বনির্বাচিত লীলাক্ষেত্র। জীবনসংগ্রামের সমস্যা হইতে মুক্ত হইয়া এবং বহির্জগতের কোলাহল হইতে বহুদূরে ভারতের জনসাধারণের মন অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার স্বরূপের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। ঐ দিকে তাহাদের তীব্রগভীর অনুশীলনের ফলে ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, অধ্যাত্মজ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্প ও সহিত্যক্ষেত্রে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইতে পারিয়াছিল। এইভাবে ভারতবর্ষ সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারিয়াছিল, এই সংস্কৃতি ও সভ্যতা আরব, মিশর এবং আসিরিয়ার মধ্য দিয়া ইয়োরোপের দূরতম প্রান্তেও ছড়াইয়া পড়ে, এই সংস্কৃতি ও সভ্যতাই ভারতের গৌরবস্থল হইয়াছে।

[পনেরো]

It has been held authoritatively that the cloth we produce if hand-spun and hand-woven would not only provide part-time work for nearly 7 crores of people working three hours daily but, on top of that, would mean a saving of the many crores which the poorest of the poor have to spend out of their very slender earnings for buying their clothing. At the same time, it would also give them nearly double the amount of clothes they can afford to use to-day. The only expenditure to which they would be put would be the actual cost of the cotton and that for weaving the yarn spun by them. This would provide that spare time and profitable occupation of which the agriculturist of India stands in such sore need to-day.

C. U. Inter. (Science) '55

একথা প্রামাণ্যভাবে গৃহীত হইয়াছে যে, আমাদের পরিধেয় বস্ত্র যদি হাতে-কাটা সুতায় তাঁতে বোনা হইত, তাহা হইলে উহা প্রায় সাত কোটি লোকের রোজ তিন ঘণ্টা আংশিক কাজের সংস্থানই যে করিয়া দিতে পারিত তাহা নয়, অধিকন্তু দীনতম ব্যক্তিরা বস্ত্রক্রয়ের জন্য তাহাদের অতি সামান্য সংগতি হইতে যে বহু কোটি টাকা ব্যয়

করে তাহাও বাঁচিয়া যাইত। আবার, এখন তাহারা যে পরিমাণ বস্ত্র ক্রয় করিতে পারে, এই ব্যবস্থায় তাহারা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ বস্ত্র ব্যবহার করিতে পাইবে। কার্পাস কিনিতে ঠিক যতটুকু অর্থ লাগিবে এবং তাহাদের হাতে-কাটা সূতায় বুনিয়া কাপড় তৈয়ারী করিতে যে অর্থব্যয় হইবে, মাত্র এইটুকুই তাহাদের খরচ পড়িবে। অধুনা ভারতের কৃষকদের যাহা সর্বাপেক্ষা বেশি দরকার, সেই অবসর সময় যাপনের লাভজনক উপায় মিলিয়া যাইবে।

[ষোলো]

There is just now beginning a contact which may have important results in the future Climbers of the highest peaks have to employ as porters some of the hardier peoples of the Himalayas, and between European climbers and Himalayan porters a strong feeling of comradeship is growing up This is important enough ; but not nearly so important in its eventual results as the touch which is just beginning to be made between the European lover of the mountains and those spiritual Hindus from the plains of India who come to visit the sacred shrines of the Himalayas, and who, having come there, will be as impressed as their remote predecessors had been by the solemn grandeur of the mountains and by the exquisite beauty of the Himalayan scene. *C. U. Inter. (Science) '55*

জনতা-সংযোগের একটা সূচনা মাত্র সম্প্রতি দেখা দিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার খুব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফল ফলিবে বলিয়া মনে হয়। সর্বোচ্চ পর্বতশৃংগে আরোহণকারীদের হিমালয়বাসী কয়েকটি দৃঢ়শরীর জাতির ব্যক্তিদিগকে কুলী হিসাবে নিযুক্ত করিতে হয়। এবং ইয়োরোপীয় পর্বত-আরোহণকারীদের এবং হিমালয়বাসী কুলীদের মধ্যে একটা আন্তরিক প্রীতির ভাব বর্ধিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভবিষ্যৎ ফলপ্রসবের দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইতেছে ইউরোপীয় পর্বত-অনুরাগীদের এবং ভারতের সমতল প্রদেশ হইতে আগত ধার্মিক হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন; ইঁহারা হিমালয়ের পবিত্র তীর্থস্থানাদি দর্শন করিতে আসেন, ইঁহারা এখানে আসিয়া ইঁহাদের বহু অতীতের পূর্ব পুরুষেরা যেমন পর্বতমালার মহান্ গাম্ভীর্য এবং হিমালয়ের দৃশ্যাদির মনোরম সৌন্দর্যে অভিভূত হইতেন, তেমনি অভিভূত হইবেন।

[সতেরো]

Agamemnon set foot on the soil of his fathers with a happy heart and as he touched it kissed his native earth. The warm tears rolled down his cheeks, he was so glad to see his land again. But his

arrival was observed by a spy in a watchtower, whom Aegisthus had had the cunning to post therewith the promise of two talents of gold for his services. This man was on the look-out for a year in case the king should land unannounced, slip by, and himself launch an attack. He went straight to the palace and informed the usurper. Then Aegisthus set his brains to work and led a clever trap. *R.U. Inter.* '55

আগামেমনন তাঁহার পিতৃভূমিতে আহ্লাদিত চিত্তে পদার্পণ করিলেন এবং ইহা স্পর্শ করিবামাত্র তিনি তাঁহার জন্মভূমির মৃত্তিকা চুম্বন করিলেন। পুনরায় স্বদেশ দর্শন করিয়া তিনি এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, উত্তপ্ত অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ডদেশ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পাহারাদারের বুরুজ-ঘরে অবস্থিত জনৈক গুপ্তচর কর্তৃক তাঁহার আগমন পরিলক্ষিত হইয়াছিল—গুপ্তচরকে তাহার কাজের জন্য দুইটি স্বর্ণমুদ্রা (ট্যালেণ্ট) দিবার প্রতিশ্রুতিতে চতুর ঈজিস্থাস্ ঐ স্থানে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কি জানি রাজা যদি বিনা ঘোষণাতেই স্থলে অবতীর্ণ হইয়া গোপনে সরিয়া পড়িয়া নিজেই যুদ্ধে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়া পড়েন—তাই এই লোকটি বৎসরখানেক ব্যাপী সর্বদা সতর্ক ও অবহিত ছিল। সে সরাসরি প্রাসাদে গমন করিয়া রাজ্যাপহারককে জ্ঞাপিত করিয়াছিল। অতঃপর ঈজিস্থাস সক্রিয়ভাবে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া একটি নিপুণ ফন্দী আঁটিল।

আঠা.

The crowning glory of the reign of Shahjahan is the Tajmahal at Agra. It is looked upon as one of the seven wonders of the world. Everyone who has looked at it, whether in day-time or on a moonlit night when its beauty is enhanced, has marvelled at it. One cannot but be struck with the vision of the men who conceived it, the taste of the men who provided the material, and the skill of the workers who built it. It combines delicacy with beauty, grandeur with nobility, and its white marble, its fine domes and minarets, its screen and inlay work,—all fill one with wonder. It moves the heart, delights the eye, stirs up the imagination, and fills the soul with peace.
R. U. Inter. (*Special Paper*) '55 ; *C. U. Inter.*'45

আগ্রার তাজমহল শাহ্‌জাহানের রাজত্বের চরম গৌরব। ইহা পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য বলিয়া পরিগণিত হয়। দিবাভাগেই হোক্, অথবা জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনীতে যখন ইহার সৌন্দর্য বর্ধিত হয় তখনই হোক্, যে-কেহ ইহার পানে তাকাইয়াছে, সে-ই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যে লোক ইহার অবধারণা করিয়াছিলেন তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিতে, যে যে ব্যক্তি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সুরুচিতে এবং যে সকল কর্মী ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন

তাঁহাদের নৈপুণ্যে, কেহই বিস্ময়াপন্ন না হইয়া থাকিতে পারে না। ইহা সৌন্দর্যের সহিত লালিত্যকে, মহত্বের সহিত আড়ম্বরকে মিলাইয়াছে; এবং ইহার শ্বেতমর্মর, ইহার সুদৃশ্য গম্বুজ ও মিনারাদি, ইহার বহিরাবণের ও ভিতরের কারুকার্য—সকল-কিছুই যে-কেহকে বিস্ময়াপ্লুত করিয়া ফেলে। ইহা অন্তরকে দেয় দোলা, নয়নকে দেয় আনন্দ, কল্পনাকে করে উদ্দীপিত, এবং অন্তরাত্মাকে ভরিয়া দেয় শান্তিতে।

[উনিশ]

I could not refuse this challenge to my adventurous spirit. So off I went to the ship and the sea-shore. I found my good fellows by the ship in a woebegone state, with the tears streaming down their cheeks Indeed I was reminded of the scene at a farm when a drove of cows come home full-fed from the pastures to the yard and are welcomed by all their frisking calves, who burst out from the pens to gambol round their mothers and fill the air with the sound of their lowing. *D. U. Inter.'55*

আমার দুঃসাহসী অন্তরের প্রতি এই স্পর্ধিত আহ্বানকে আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। তাই আমি তৎক্ষণাৎ জাহাজ এবং সমুদ্রতীরের দিকে রওনা হইয়া পড়িলাম। জাহাজের নিকট আমার প্রিয় অনুচরদিগকে বিষণ্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইলাম, তাহাদের গণ্ডদেশ বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। বস্তুত একটি গোলাবাড়ির দৃশ্য আমার মনে পড়িয়া গেল, সেখানে সবেমাত্র এক পাল গাভী গোচারণ-ক্ষেত্র হইতে পেট ভরিয়া খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের বাছুরগুলি আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে থাকে, তাহারা খোঁয়াড় হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহাদের মায়েদের চারিদিকে উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে, এবং হাম্বারবে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলে।

[কুড়ি]

Three-fourths of the surface of our planet is covered by the sea, which both separates and unites the various races of mankind. The sea is the great highway along which man may journey at his will, the great road that has no walls or hedges hemming it in, and that nobody has to keep in good repair with the aid of axes and of tar and steam-rollers. The sea appeals to man's love of the perilous and the unknown, to his love of conquest, his love of knowledge, and his love of gold. Its green, and grey, and blue, and purple waters call to him and bid him fare forth in quest of fresh fields. Beyond their horizons he has found danger and death, glory and gain. *C. U. Inter. '54*

আমাদের গ্রহের (পৃথিবীর) উপরিভাগের তিন-চতুর্থাংশ সমুদ্রজলে পরিব্যাপ্ত, জলরাশি বিভিন্ন মানবজাতিকে পৃথক করিয়াও রাখিয়াছে, আবার সম্মিলিতও করিয়াছে। সমুদ্রই বিরাট্ রাজপথ, যে পথ দিয়া মানবজাতি স্বেচ্ছায় যেখানে খুশী যাইতে পারে, সমুদ্রই সেই বিশাল বর্ত্ম, কোন প্রাচীর বা বেড়া যাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখে নাই এবং যাহাকে কুঠার আলকাতরা ও স্টীম-রোলারের সাহায্যে মেরামত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না। সমুদ্রই মানবের বিপদসংকুল বস্তু ও অজানার প্রতি আকর্ষণকে, দেশজয়লিপ্সাকে, জ্ঞানস্পৃহাকে এবং অর্থলোভকে উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে। সমুদ্রের সবুজ, ধূসর, নীল এবং রক্তিম জলরাশি মানবকে আহ্বান করিতে থাকে, এবং তাহাকে নিত্য নূতন জগতের অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িতে আদেশ করে। সমুদ্রজলরাশির দিগন্তের পরপারে মানব বিপদ, মৃত্যু, যশ ও অর্থসম্পদ লাভ করিয়াছে।

[একুশ]

The greatest enemy to the man who has to carry on his body all his robe, is rain. He does not fear any ill consequences to health, but he does not like the uncomfortable sensation of shivering This unsettled feeling is often made worse by an empty stomach. In fact a full stomach is his one safeguard against the cold. To escape from the coming deluge he seeks shelter in the public library, which is the only free shelter available ; and there he sits for hours staring at one page, not a word of which he has read, or intends to read. If he cannot at once get a seat, he stands before a paper and performs that almost impossible feat of standing upright so as to deceive the attendants, and the respectable people who are waiting a chance to see that paper. *C. U. Inter. '54*

যে-মানবকে স্বদেহেই সমস্ত পরিধেয় বহন করিয়া বেড়াইতে হয়, তাহার পরম শত্রু হইল বৃষ্টিধারা। বৃষ্টির জন্য স্বাস্থ্যের যে অনিষ্ট হইতে পারে তাহাতে সে ভয় পায় না, কিন্তু কম্পনজনিত অস্বস্তিবোধটিকে সে একেবারেই পছন্দ করে না। খালি পেটে অনেক সময়েই এই অস্থির অবস্থা তীব্রতর হইয়া উঠে। বস্তুত পেটভরা থাকিলেই মানুষ শীতের হাত হইতে রক্ষা পায়। আসন্ন বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সে সাধারণ পাঠাগারে আশ্রয় সন্ধান করে ; বিনা খরচায় কেবলমাত্র ঐখানেই আশ্রয় মিলিয়া থাকে ; সেখানে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনও বইয়ের একটিমাত্র পাতার দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু সে তাহার একটি বর্ণও পড়িতে পারে না পড়িতে চায়ও না। যদি সে তৎক্ষণাৎ বসিবার আসন না পায়, তাহা হইলে সে একখানি সংবাদপত্রের সামনে দাঁড়াইয়া থাকে এবং খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাক

রূপ অসম্ভব কার্যটিকেও সম্ভব করিয়া তুলে, তাহাতে (পাঠাগারের) কর্মচারীদের এবং যে সমস্ত ভদ্রমহোদয় ঐ সংবাদপত্রখানি পড়িবার সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছেন, তাহাদের সে ফাঁকি দিতে সমর্থ হয়।

[বাইশ]

The great bulk of our town-dwellers are poor—terribly poor. They live huddled together in dismal, dark and smelly slums, sleeping four and five or even ten in a small, dark, smoky room, eating of the barest, their children denied education beyond what are called 'the three R s,' which, once they leave school, they soon forget. The lot of our common people is dreadful. The workers in the mills and factories of our towns, whom we—because we live in towns—are accustomed to think of as the poorest people, earn anything from fifteen to fifty rupees a month, with which to maintain a whole family. But the worker's wage is almost princely compared with the earnings of those crores and crores of our countrymen who live in villages and cultvate the land, producing food for us to eat and the cotton from which is made the cloth we wear.

R. U. Inter. '54, C. U. (Muff. Centre) '46

আমাদের শহরবাসীদের অধিকাংশই গরীব—ভয়ংকর গরীব। অন্ধকার ধোঁয়াচ্ছন্ন ছোট ছোট খোপে চার পাঁচ এমন কি দশজনও ঘুমাইয়া, স্বল্পতম আহার করিয়া, নিরানন্দ আলোকবিবর্জিত দুর্গন্ধ কদর্য বস্তিতে তাহারা একত্রে গাদাগাদি করিয়া বসবাস করে, যাহাকে বলা হয় 'ত্রয়ী আর' (অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ লেখা, পড়া ও অংক কষা), সেই শিক্ষার অতিরিক্ত শিক্ষা হইতে তাহাদের সন্তানেরা বঞ্চিত—এহেন শিক্ষাকেও তাহারা একবার পাঠশালা ছাড়িলেই অচিরাৎ ভুলিয়া যায়। আমাদের জনসাধারণের অদৃষ্ট ভয়াবহ। শহরাদিতে বাস করি বলিয়া আমাদের শহরের কলকারখানার যে সকল মজুরকে আমরা দরিদ্রতম ব্যক্তি রূপে ভাবিতে অভ্যস্ত, তাহারা মাসে পনেরো হইতে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে রোজগার করে—ইহারই সাহায্যে তাহারা সমগ্র পরিবার ভরণপোষণ করে। কিন্তু আমাদের দেশের কোটি কোটি লোক, যাহারা গ্রামে বাস করিয়া জমির চাষ-আবাদ করে, আমাদের আহারের জন্য খাদ্য এবং পরিধেয় বস্ত্রের জন্য তুলা উৎপাদন করে, তাহাদের উপার্জনের সহিত তুলনায় শ্রমিকের মজুরী অনেকটা রাজোচিতই বটে।

[তেইশ]

Now, Comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it: our lives are miserable, laborious, and short. We are born, we are given just so much food as will keep the breath in our bodies,

and those of us who are capable of it are forced to work to the last atom of our strength ; and the very instant that our usefulness has come to an end, we are slaughtered with hideous cruelty.

D. U. Inter. '54

অতঃপর, হে বন্ধুগণ, আমাদের এই জীবনের ধর্মটি কি? ইহার সম্মুখীন হওয়া যাক্। আমাদের জীবন ক্লেশকর, শ্রান্তিকর এবং স্বল্প। আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, আবার ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্যই আমরা পাইয়াছি, যাহা আমাদের দেহে জীবন রক্ষা করিবে, এবং আমাদের মধ্যে যাহারা ইহাতে সমর্থ, তাহারা তাহাদের শক্তির শেষ কণাটুকু অবধি কাজ করিতে বাধ্য হয়; এবং যে মুহূর্তে আমাদের কার্যকারিতার অবসান ঘটে, তখনই ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার সহিত আমরা বিনাশপ্রাপ্ত হই।

[চব্বিশ]

We do not judge a cricketer so much by the runs he gets as by the way he gets them. 'In literature as in finance,' says Washington Irving, 'much paper and much poverty may co-exist.' And in cricket, too, many runs and much dullness may be associated If cricket is menaced with dullness, it is because it is losing the spirit of joyous adventure and becoming a mere instrument of compiling high averages. There are dull, mechanical fellows who turn out runs with as little emotion as a machine turns out pins. There is no colour, no enthusiasm, no character in their play. Cricket is not an adventure to them , it is a business.

C. U. Inter '53

ক্রিকেট্-খেলোয়াড় যে কয়টি দৌড় (রাণ) সংগ্রহ করিল তাহার দ্বারা নয়, সে কি ভাবে সেই দৌড (রাণ) করিল সেই পদ্ধতি-দ্বারাই আমরা তাহাকে বিচার করিয়া থাকি। ওয়াসিংটন আরভিং বলিয়াছেন, 'অর্থনীতিক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যেও তেমনই, প্রচুর কাগজ ও তীব্র দৈন্য উভয়ে পাশাপাশি থাকিতে পারে। এবং ক্রিকেটেও, বিপুল দৌড় (রাণ) সংখ্যা এবং বিপুল নির্জীবতা একত্র বিরাজ করিতে পারে। ক্রিকেট্ খেলার যে নির্জীবতার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ এই যে ইহা হইতে আনন্দপূর্ণ দুঃসাহসিকতার ভাব অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে এবং কেবলমাত্র অধিক দৌড় (রাণ)-সংখ্যা সংগ্রহ করিবার যন্ত্রবিশেষমাত্রেই পরিণত হইয়া পড়িতেছে। কোন কোন নীরস যন্ত্রবৎ নির্জীব লোক আছে যাহারা, যন্ত্র হইতে যেমন পিন বাহির হইতে থাকে, তেমনই নিরুদ্বেগে দৌড় (রাণ) তুলিয়া থাকে। তাহাদের খেলায় না আছে বর্ণচ্ছটা, না আছে উৎসাহ, না আছে বৈশিষ্ট্য। ক্রিকেট্ তাহাদের পক্ষে দুঃসাহসের জিনিষ নয়, তাহাদের কাছে একটি পেশা মাত্র।

[পঁচিশ]

Very few of the civilisations of the ancient world have lasted, and one of the reasons why they did not last was that they were confined to very few people. They were like little oases in the deserts of barbarism. Now it is no good being civilised if everybody around you is barbarous. For the barbarians are always liable to break in on you, and with their greater numbers and rude vigour scatter your civilisation to the winds. Over and over again in history comparatively civilised people dwelling in cities have been conquered in this way by barbarians coming down from the hills and burning and killing and destroying whatever they found in the plains. *C. U. Inter.'53*

অতীত জগতের খুব কম সভ্যতাই টিকিয়া আছে, তাহারা যে স্থায়ী হয় নাই তাহার একটি কারণ এই যে, এই সব সভ্যতা খুব কম লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাহারা যেন বর্বরতার মরুভূমিতে অতি ক্ষুদ্র মরূদ্যান-বিশেষ। যদি চারিপাশের সকলেই বর্বর অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে নিজে সভ্য হইয়া কোনও লাভ নাই। কারণ বর্বরদের পক্ষে সর্বদাই সভ্য ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা থাকে, এবং তাহাদের জনসংখ্যা আরো বেশি বলিয়া তীব্র রুদ্র শক্তিতে তাহারা সভ্যতাকে উড়াইয়া দিতে পারিবে। ইতিহাসে বারংবার সহরবাসী অপেক্ষাকৃত অধিকতর সভ্যজাতিদিগকে এইভাবে বর্বরেরা পরাজিত করিয়াছে, এই অসভ্যেরা পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া সমতলভূমিতে যাহা-কিছু পাইয়াছে তাহাই পুড়াইয়া হত্যা করিয়া এবং ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে।

[ছাব্বিশ]

A man sitting in the market-place told the fortunes of the passers-by. A person ran up in great haste, and announced to him that the doors of his house had been broken open, and that all his goods were being stolen. He sighed heavily, and hastened away as fast as he could run. A neighbour saw him running, and said, 'Oh! You fellow there! You say you can foretell the fortunes of others; how is it you did not foresee your own?' *D. U. Inter. '53*

এক ব্যক্তি বাজারে বসিয়া পথিকদের ভাগ্যগণনা করিতেছিল। একটি লোক অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জানাইল, তাহার বাড়ির দরজা ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার সমস্ত জিনিষপত্র অপহরণ করা হইতেছে। সেই ব্যক্তি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া যথাশক্তি দ্রুত ধাবিত হইল। জনৈক প্রতিবেশী তাহাকে ছুটিতে দেখিয়া বলিল, "বলি, ওহে, তুমি ত বলিয়া থাক তুমি অপরের ভাগ্য গণনা করিতে পার। তুমি, তোমার নিজের ভাগ্যে কি আছে তাহা পূর্বেই দেখিতে পার নাই কেন?"

[সাতাশ]

In every land the lure of the mountains has been felt and men have risked their lives to reach the summit. Every unclimbed peak seems to send out a challenge to the men who gaze upon it, and there are always some men who cannot resist the challenge. They are not really eager for scientific discovery, for geographical measurements or other minor matters. No, the mountain seems to them to be challenging their skill and courage, and life itself is not too great a price to pay for victory. Above all, the two mountain crests of Everest and Kanchanjangha have cast their spell over many bold spirits; and there have been many brave men whose bodies lie among their icy walls. *C. U. Inter. '52*

প্রত্যেক দেশে পর্বতের প্রলোভন অনুভূত হইয়াছে এবং উহার শৃংগে আরোহণার্থ মনুষ্যাদি তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়াছে। উহার প্রতি উৎসুকদৃষ্টি মনুষ্যাদির কাছে প্রতিটি অলংঘিত শৃংগ এক স্পর্ধিত আহ্বান জানায় বলিয়া মনে হয় এবং সব সময়েই এমন কিছু মানুষ আছে, যাহারা স্পর্ধিত আহ্বানটিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। বস্তুত তাহারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ভৌগোলিক পরিমাপ অথবা ছোটখাটো ব্যাপারের জন্য উৎসুক নয়। সত্যই নয়; তাহাদের মনে হয় পর্বত মানুষের কৌশল ও সাহসকে যেন ধিক্কার দিতেছে এবং বিজয়গৌরবের জন্য যে মূল্য দিতে হয়, জীবন তাহার অপেক্ষা বেশী মূল্যবান নয়। সর্বোপরি, এভারেষ্ট ও কাঞ্চনজংঘার পর্বতশৃংগদ্বয় বহু শক্তিমান উদ্যমীকে কুহকে অভিভূত করিয়াছে; এবং উহাদের তুষার-প্রাকারের অভ্যন্তরে পড়িয়া রহিয়াছে বহু সাহসী অভিযাত্রীর মৃতদেহ।

[আটাশ]

In the past century life had become more comfortable for great numbers of men and women. Tasks which formerly had to be performed slowly and painfully by hand, often in the flickering light of candles or little oil-lamps, can now be performed simply by the pressing of an electric switch. Every detail can be supervised under the piercing glare of powerful elctric lights. The world grows smaller every year, we are told. People come more and more closely into touch with each other, and in a few minutes something that happens in an out-of-the-way corner can be causing reactions all round the globe. Even more important to the average citizen are the comforts and conveniences which science has brought into our homes.

C. U. Inter.'52

গত শতাব্দীতে বহুসংখ্যক নরনারীর নিকট জীবন অধিকতর আরামপ্রদ হইয়াছিল। পূর্বে যে কার্যাদি প্রায়ই বাতি অথবা ক্ষুদ্র তৈলপ্রদীপের কম্পমান আলোকে

ধীরে ও কষ্টে সম্পন্ন হইত, এখন তাহা শুধু একটি বৈদ্যুতিক 'সুইচ' (বা চাবি) টিপিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। প্রতিটি বিক্ষিপ্ত সামগ্রী শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোর সমুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় পর্যবেক্ষিত হইতে পারে। বলা হয় যে, পৃথিবী প্রতি বৎসরে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে। জনগণ পরস্পরের সহিত নিকট হইতে নিকটতর সংস্পর্শে আসিতেছে, এবং একটি সুদূর প্রান্তে যাহা ঘটে, তাহা কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারা বিশ্ব ব্যাপিয়া প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করিতে পারে। বিজ্ঞান যে আরাম ও সুযোগ-সুবিধা আমাদের গৃহে গৃহে আনিয়া দিয়াছে—সাধারণ নাগরিকের কাছে উহা আরও মূল্যবান।

[ঊনত্রিশ]

Only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary charm of the occasional outside walks and open views afforded to him. I loved these outings, and I did not give them up even during the monsoon, when the rain came down for days in torrents and I had to walk in ankle-deep water. I would have welcomed the outing in any place, but the sight of the towering Himalayas near by was an added joy which went a long way to removing the weariness of person. It was my good fortune that during the long period when I had no interviews, and when for many months I was quite alone, I could gaze at those mountains that I loved. I could not see the mountains from my cell, but my mind was full of them and I was ever conscious of their nearness, and a secret intimacy seemed to grow between us *C. U. Inter.'51*

বহুকাল সু-উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ বন্দীকে সুযোগ দিলে সে-ই কেবলমাত্র সাময়িক বহির্ভ্রমণাদি ও উন্মুক্ত দৃশ্যবলীর অপূর্ব মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারে। আমি এই বহির্ভ্রমণাদি পছন্দ করিতাম এবং এমন কি বর্ষাকালে বহুদিবসব্যাপী মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইলেও এবং পায়ের পাতা-ডোবা জলেই আমাকে হাঁটিতে হইলেও, আমি উহাদের ছাড়ি নাই। যে কোন স্থানে পরিভ্রমণই আমি আনন্দে উপভোগ করিতাম, কিন্তু নিকটবর্তী অভ্রভেদী হিমালয়পর্বতের দৃশ্য এমন একটি উপরি আনন্দস্বরূপ ছিল, যাহা কারাগারের অবসাদ বহুলপরিমাণে বিদূরিত করিতে প্রয়াস পাইত। আমার সৌভাগ্য যে, বহুকালব্যাপী যখন আমার কোন সাক্ষাৎকারী থাকিত না এবং বহুমাসাবধি যখন আমাকে একান্তভাবে নিঃসংগ জীবন যাপন করিতে হইত, তখন আমি আমার প্রিয় ঐ পর্বতগুলির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতাম। আমার প্রকোষ্ঠ হইতে পর্বতগুলিকে দেখিতে পাইতাম না, কিন্তু আমার মন উহাদের (পর্বতগুলির) দ্বারা ভরিয়া থাকিত এবং তাহাদের নৈকট্য আমি নিত্য অনুভব

করিতাম আর আমাদের মধ্যে যেন এক নিগূঢ় অন্তরংগতা গড়িয়া উঠিতেছিল বলিয়া মনে হইতেছিল।

[ত্রিশ]

The more ardent spirits may not be, and perhaps are not, satisfied with what has been achieved. They urge a more rapid pace, perhaps even a shorter cut to the goal. But that there has been a vast transformation none can gainsay. The world-forces may have helped the movement. But we too did our bit. Self-government was the end and aim of our political efforts : constitutional methods the means for its attainment.

But we cannot remain wedded to the past. We cannot remain where we are. There is no standing still in this world of God's Providence. Move on we must, with eyes reverentially fixed on the past, with a loving concern for the present and with deep solicitude for the future. *C. U. Inter.* '51

যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা লইয়া অত্যুৎসাহী ব্যক্তিরা সন্তুষ্ট হইতে পারে না এবং সম্ভবত হয়ও না। দ্রুত পাদবিক্ষেপে, এমন কি সম্ভবত সংক্ষিপ্ততর পথে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে তাহারা চায়। কিন্তু বিরাট্ পরিবর্তন যে সাধিত হইয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। বিশ্বব্যাপী শক্তিতে হয়তো-বা এই আন্দোলনের সহায়তা হইয়াছে। কিন্তু আমরাও আমাদের করণীয় খানিকটা করিয়াছিলাম। আমাদের রাজনৈতিক প্রয়াসাদির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ছিল স্বায়ত্ত-শাসন ; উহা পাইবার উপায় ছিল নিয়মতান্ত্রিক প্রণালী।

কিন্তু অতীতের সংগে আমরা গাটছড়ায় আবদ্ধ থাকিতে পারি না। যেখানে আছি সেখানেই আমরা (অচল) থাকিতে পারি না। ঈশ্বরের বিধান-নিয়ন্ত্রিত এই জগতে স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকা সম্ভব নয়। অতীতের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, বর্তমানের প্রতি সপ্রশ্রয় উদ্বেগ লইয়া এবং ভবিষ্যতের সম্পর্কে গভীর দুশ্চিন্তাকে অন্তরে বহিয়া আমরা অবশ্যই অগ্রসর হইব।

[একত্রিশ]

In thinking that the past was better than the present we are under a deception similar to that which misleads the traveller in the Arabian desert. In the adjoining places all is dry and bare ; but far in advance, and far in the rear, is the semblance of refreshing waters. The pilgrims hasten forward and find nothing but sand where an hour before they had seen a lake. They turn their eyes

back and see a lake, where, an hour before, they were toiling through sand. A similiar illusion seems to haunt nations through every stage of the long progress from poverty and barbarism to the highest degree of opulence and civilisation. *C. U. Inter. '50*

বর্তমানের চেয়ে অতীত ভাল ছিল, ইহা ভাবিলে আরব-মরুভূমিতে পথিককে যে-বঞ্চনা বিড়ম্বিত করে, ঠিক তাহাতেই আমরা পতিত হই। নিকটবর্তী স্থানসমূহে সবই শুষ্ক এবং ফাঁকা: কিন্তু সম্মুখে-পশ্চাতে বহুদূরে স্নিগ্ধ জলাশয়ের আবাস বিদ্যমান। যাত্রীরা দ্রুত অগ্রসর হইয়া দেখে যে, এক ঘণ্টা পূর্বে যেখানে তাহারা হ্রদ দেখিয়াছিল, সেখানে বালুকা ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহারা পিছনে তাকাইয়া দেখে যে, এক ঘণ্টা পূর্বে যে বালুকার মধ্য দিয়া তাহারা ক্লেশ স্বীকার করিয়া আসিয়াছে সেখানেও এক হ্রদ। দারিদ্র্য ও বর্বরতা হইতে ঐশ্বর্য ও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে পৌঁছাইবার দীর্ঘ অভিযানের প্রতিটি স্তরে এহেন মরীচিকাই জাতিসমূহকে পাইয়া বসে বলিয়া বোধ হয়।

[বত্রিশ]

Palmerston. The situation, Miss Nightingale, is this. Now, let us be perfectly frank. The war has been muddled. England for some reason always muddles at the beginning of a war. It's no good looking for scapegoats. The main thing to do now is to set matters straight. There are many problems ; but Herbert and I have decided that the most important thing to do is to check the appalling wastage in the Army. It means testing the whole medical and commissariat system with a fresh, vigorous mind already experienced in hospital management. Now, Herbert wants you, and I agree : and what we say will go in the cabinet.

Florence. You are sure, both of you, that you want me to do this—whatever I may discover, whatever I may advocate, whatever I may demand ? Am I to have complete control of the nurses ? *C. U. Inter. '50*

পামারস্টোন। শ্রীমতী নাইটিংগেল, এই তো অবস্থা। এক্ষণে পুরাপুরী খোলাখুলি ভাবেই আলোচনা করা যা'ক্। এই যুদ্ধে জগাখিচুড়ি পাকানো হয়েছে। কোন না কোন কারণে ইংলণ্ড সর্বদা যুদ্ধের প্রারম্ভে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে তোলে। শিখণ্ডীর সন্ধান করে লাভ নেই। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে ত্রুটি-সংশোধন। বহু সমস্যাই আছে ; হার্বার্ট এবং আমি ঠিক করেছি যে, সৈন্যবাহিনীতে ভয়াবহ অপচয় নিবারণ করাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এর অর্থ এই যে, ইতিপূর্বে হাসপাতাল পরিচালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক সতেজ বলিষ্ঠ মনোভংগী নিয়ে ভৈষজ্য ও রসদ-

-সরবরাহ-বিভাগীয় সমগ্র পদ্ধতিকে পরীক্ষা করা। এখন হার্বার্ট আপনাকে চায় এবং আমিও এর সমর্থন করি আর আমাদের মতই মন্ত্রিসভায় কার্যকরী হবে।

ফ্লোরেন্স। আপনারা উভয়েই কি সাব্যস্ত করেছেন যে, এবিষয়ে আমার সহযোগিতা আপনারা চান?—যা'-কিছু (ত্রুটি) আমি আবিষ্কার করতে পারি, যা'-কিছু (সংশোধন) আমি সুপারিশ করতে পারি, যা'-কিছু (পরিবর্তন) আমি দাবি করতে পারি, সে সমস্ত সত্ত্বেও? পরিচর্যাকারিণীদের উপরে কি আমার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে?

[তেত্রিশ]

A young American friend of mine offered to drive me down from San Francisco to Los Angeles in his motor car, I accepted—poor silly creature—with grateful alacrity The alternatives were the train, with which I was getting bored, and the aeroplane, of which I have always been afraid, and so the prospect of a pleasant couple of days, idling down the Pacific Coast, was alluring. Even when we were breakfasting together in San Francisco, at 7 A. M. on the day of our start, an obvious hint of what was ahead of me was dropped, but I, still wrapped in a fool's paradise and a European's idea of a moter-travelling, hardly noticed it. *C U. Inter.* (*Special*) '50

আমার একজন মার্কিন যুবক-বন্ধু তাঁহার হাওয়া-গাড়ীতে আমাকে সান্ ফ্রান্সিস্কো হইতে লস্ এঞ্জেলস্-এ লইয়া যাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। হতভাগ্য নির্বোধ জীব আমি—মধুর তৎপরতার সহিত সম্মতি দান করিয়াছিলাম। ট্রেণ, যাহাকে লইয়া আমি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম এবং বিমান, যাহার সম্পর্কে আমি সর্বদাই ভীত হইতাম—ইহারাই ছিল বিকল্প ব্যবস্থা; আর সেইজন্যই কয়েকটি মনোরম দিনের প্রত্যাশা—প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আলস্যে কালক্ষেপ—লোভজনক ছিল। এমন কি, আমাদের যাত্রাদিবসে সকাল সাতটায় সান্ ফ্রান্সিস্কোতে যখন আমরা একত্র প্রাতরাশ ভোজন করিতেছিলাম, তখন আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তখনও আকাশকুসুমের স্বপ্নে বিভোর ও ইউরোপীয়সুলভ মোটর-পরিভ্রমণের ভাবাবেশে নিমগ্ন থাকায় আমি ভ্রূক্ষেপ করি নাই।

[চৌত্রিশ]

We all love the country so much that we desire to live in it, if only during the night, when we are not at work. We build cottages, buy season tickets and bicycles to take us to the station. And meanwhile the country perishes. The Surrey I knew as a boy was full of wilderness. To-day it is hardly distinguishable from the out-

skirts of the city. There is no more country, at any rate within fifty miles of London. Our love has killed it.

Except in summer, when it is too hot to stay in town, the French, and still more, the Italians, do not like the country.

C. U. Inter. (Special) '50

আমরা সবাই গ্রাম এত ভালবাসি যে, এখানে থাকিতে চাই—চাই বিশেষত রাত্রে যখন আমরা কাজ করি না। আমরা কুটির নির্মাণ করি, সাময়িক টিকিট এবং ষ্টেশনে আমাদিগকে বহন করিয়া লইবার জন্য দ্বিচক্রযান ক্রয় করি। আর ইতিমধ্যে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইতে থাকে। আমার বাল্যকালে সারে অরণ্যানীতে ছিল সমাকীর্ণ। আজ ইহাকে শহরের উপকণ্ঠ হইতে পৃথগীভূত করা কষ্টসাধ্য। লণ্ডনের অন্তত পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এখন একটিও গ্রাম নাই। আমাদের ভালবাসাই ইহার কাল হইয়াছে।

গ্রীষ্মকালে, যখন এত গরম যে শহরে বাস করা দুঃসাধ্য তখন ছাড়া ফরাসীরা, বিশেষত ইতালীয়রা, গ্রাম ভালবাসে না।

অনুশীলনী

[এক]

In many parts of the world it is customary to put the extracted milk-teeth of the children in some place where they will be found by a mouse or a rat in the hope that through the sympathy which continues to subsist between the teeth and their former owner, the newly grown teeth of the owner may acquire the same firmness and excellence as those of rats. For example, in Germany the people will never forget to insert a tooth in a mouse's hole. In the Slav countries people go behind the store and throwing the extracted tooth backwards over their head say, 'Mouse, give me your iron tooth. I am giving you my bone tooth'. Far away from Europe at Raratonga in Pacific, when a child's tooth is extracted, the aborigines recite the following prayer, "Big rat, little rat, here is the old tooth ; give me a new one". In Basutoland, the Basuto natives conceal their extracted teeth inside the mole-mounds with the same belief. In some parts of India specially in Bengal and in Gujrat the same practice prevails. The prayer to the rat is of the following strain. "Take my flat tooth, and give me a tooth as such as yours." The Mexicans and Peruvians of South America throw their teeth on the rat-frequented thatches of farm-houses with the object that they would be touched by the sharp-toothed rats which would produce magical benefits on new grown tooth. —*Frazer, Golden Bough.*

[দুই]

There is no denying the fact that the standard of our education has suffered a deterioration. The causes are many. The most important of them is the system of private tuition. A student cannot now-a-days think of passing the examination without the help of a private teacher.

Our teachers are mostly poor. They cannot make their both ends meet without undertaking private tuition. Once appointed a tutor, he cannot generally assert himself before his student. He is asked by the student to suggest important questions. If the teacher is honest and cannot foretell exactly the same questions set in the examination, his service will be terminated by the recommendation of the ward on the plea of inefficiency. With these suggestions it becomes very easy for the students to know which of the pages of the books containing the answers are to be taken to the examination hall.

[তিন]

Mr. Jinnah had special regards for students and nothing gave him greater pleasure than addressing them. To the students he used to speak with great regard, but there is not a single instance he tried to drag them into active politics. He inspired with thousand massages, exhorted them to cultivate toleration and mutual respect and esteem. Addressing the "Muslim Youths' Majlis Branch" at Aligarh he told some home truths to them. "Try your level best to learn the sense of responsibility and duty. Build up your character, that is more than all the degrees. All degrees and no character is mere waste of time. You should also develop the sense of honour, integrity and duty."

[চার]

All art is creative and liteature which is art *par excellence* is creative in the extreme. It confers upon its votaries a sixth sense for seeing deeply into things. It is a bridge between the *here* and *here beyond*. It is a ladder which takes up from the world of familiar object to the unfamiliar world of spirit. It is in this sense, that by means of the study and enjoyment of literature mankind will be helped to realise its own unity. The fact that I can enjoy the Chinese, the Japanese and the Hindi literature as much as my own, appears to indicate that all Humanity is one and the differences that seem to differentiate one section of it form another are not real.

[পাঁচ]

In olden times the land of Egypt was ruled by a Sultan endowed with justice and generosity, who loved the pious poor and companied with the *Ulama* and learned men; and he had a Wazir, wise and experienced, well-versed in affairs and in the art of government. This Minister, who was a very old man, had two sons, as they were two moons; never man saw the like of them for beauty and grace, the elder called Shamsuddin Muhammad and the younger Nuruddin Ali; but the younger exalled the elder in handsomeness and pleasing appearance, so that people heard his fame in far countries and men flocked to Egypt for the purpose of seeing him.

[ছয়]

"When Russia took advantage of her pact with Bonaparte," explained Mr. Braun, "to fall upon Finland, I was one of those who fought. What use was it? What could Finland do against all the might of Russia? I was one of the fortunate ones who escaped. My brothers are in Russian gaols at this very minute if they are alive, but I hope they are dead. Sweden was in revolution—there was no refuge for me there, even though it has been for Sweden that I was fighting. Germany, Denmark, Norway were in Bonaparte's hands, and Bonaparte would gladly have handed me back to oblige his new Russian ally. But I was in an English ship, one of those to which I sold timber, and so to England I came. One day I was the richest man in Finland, where there are few rich men, and the next I was the poorest man in England where there are many poor."

[সাত]

If we are to discover the foundations of any system or cult, if we are to excavate the soil religious as we would the soil archaeological in the hope of coming upon the basis of any particular faith, we must undertake the work in a manner as thorough as that of the antiquary who, pick in hand, delves his way to the lowest foundations of palace or temple. The earliest Babylonian religious ideas—that is, subsequent to the entrance of that people into the country watered by the Tigris and Euphrates—were undoubtedly coloured by those of the non-semitic Sumerians whom they found in the country. They adopted the alphabet of that race, and this affords strong presumptive evidence that the immigrant Semites, as an unlettered people, would naturally accept much, if not all, of the religion of the more cultured folk whom they found in possession of the soil.

[আট]

It was half-past twelve in the morning and a cold night. I was almost frozen I took off my shoes, and walked to and fro upon the sand, barefoot and beating my breast with infinite weariness. There was no sound of man or cattle. Not a cock crew. I heard only the surf breaking in the distance. By the sea at that hour in the morning, and in a place so desert-like and lonesome, I had a kind of fear.

D. U. Inter '56

[নয়]

It happened one day, about noon, going towords my boat, I was exceedingly surprised with the print of a man's naked foot on the shore, which was very plain to be seen on the sand. I stood like one thunderstruck or as if I hand seen a ghost. I listened, looked round me, but I could hear nothing, nor see anything. I went up to a rising ground, to look further ; I went up the shore and down the shore, but it was all one ; I could see no other impression but that one. I went to it again to see if there were any more and to observe if it might not be my fancy, but there was no room for that, for there was exactly the print of a foot, toes, heel and every part of a foot How it came thither, I knew not, nor could I in the least imagine.

R. U. Inter. '56

দশ

It did me a world of good to be shown my manifest intellectual inferiority I had thought in my ignorance of all clergymen as simple-minded and imbecile. I found George far better read and far quicker-witted than I. I had but to go to his study and to look at the backs of the books that lined his shelves to be ashamed of the airy impudence with which I had hitherto dismissed Christinaity Like so many other moderns, I had carelessly dismissed it without ever bothering to inquire the names, let alone the arguments, of better men than I who had given their lives to the refutation of my doubts. *C. U. Inter. (Alter.) '56*

[এগারো]

Try to read only what is good. And by "good" you will not suppose me to mean what used to be called "improving books", books written in a sort of Sunday school spirit for the moral benefit of the reader. A book may be excellent in its ethical tone, and full of solid information, and yet be unprofitable, that is to say, dull, heavy, unins-

piring, wearisome. Contrariwise, a book is good when it is bright and fresh, when it rouses and enlivens the mind, when it provides materials on which the mind can pleasurably work, when it leaves the reader not only knowing more but better able to use the knowledge he has received from it. *C. U. Inter. (Alter.)'55*

[বারো]

My friends, I said East and West mean nothing to us here. Where the Sun is rising from, when he comes to light the world, and where he is sinking ; we do not know. So the sooner we decide on a sensible plan the better—if one can still be found (which I doubt) For when I climbed a crag to reconnoitre I found that this is an island, and for the most part lowlying, as all round it in a ring I saw the sea stretching away to the horizon. What I did catch sight of, right in the middle, through dense oak-scrub and forest, was a wisp of smoke.
R. U. Inter. '55

[তেরো]

It is impossible for any man to be a student without endangering the health. Man was made to be active. The hunter who roams the forest, or climbs the rocks of the Alps, is the man who is hardy, and in the most perfect health. The sailor, who has been rocked by a thousand storms and who labours day and night, is a hardy man. Any man of active habits is likely to enjoy good health, if he does not too frequently over-exert himself. But the students' habits are all unnatural ; and by them nature is continually restrained. There can be no room for doubt that one cause why so many of our promising young men sink into premature grave is that they try to do so much in so short a time. *R. U. Inter. (Special Paper) '55*

[চোদ্দ]

You are asking me about my early days. Let me give you the tale. There is an island called Syrie—you may have heard the name—out beyond Ortygie, where the sun turns in his course. It's not so very thickly peopled, though the rich land is excellent for cattle and sheep and yields fine crops of grapes and corn. 'Famine is unknown there and so is disease. No dreadful scourges spoil the islanders' happiness. *D. U. Inter. '55*

[পনেরো]

She then led the prince to a splendid hall, where a rith meal was set out, and whilst they ate and talked, a delightful concert of the sweetest music was gone through by a number of beautiful and

richly-dressed slaves. After this the princess showed her guest the chief sights of the handsome summerpalace she was now staying in, which was in country, away from the capital ; and although the prince admired the buildings and the gardens very greatly she told him that the royal palace of her father, the king of Bengal, was much more rich and splendid, and she hoped he would visit it presently. *R. U. Inter.* '54

[ষোলো]

Princes and princesses, statesmen and soldiers came from the world's capitals to-day to join Britain's festive millions for the coronation of Queen Eliz·beth. They found an excited, gay London—a city festooned in red, white and blue with great triumphal arches and a splash of banners in scarlet, gold, and purple. And all day, the crowds paraded, children pulling their parents excitedly to see the fairyland of decorations which has suddenly transformed London into a great glittering spectacle. *D. U. Inter.*'54

[সতেরো]

Law and order, we are told, are among the proud achievements of British rule in India. My own instincts are entirely in favour of them. I like discipline in life, and dislike anarchy and disorder and inefficiency. But bitter experience has made me doubt the value of the law and order that states and governments impose on a people. Sometimes the price one pays for them is excessive, and the law is but the will of the dominant faction and the order is the reflex of an all-pervading fear. Sometimes, indeed, the so-called law and order might be more justly called the absence of law and order.

C. U. Inter. (Addl. Alt.) '53

[আঠারো]

It was midday. The cruel sun like a huge furnace, was sending forth hot flames all around. There was hardly any breeze, the broad leaves of the tall palmyra hung quite motionless ; the cows were resting in the shade of trees, and were chewing the cud, and the birds were enjoying their midday nap At such a time, when all Nature seemed to be in a state of collapse, a solitary husbandman was seen ploughing a field. In the previous evening there had been a shower, accompanied by a thunderstorm, and Manik Samanta was taking advantage of that circumstance, to prepare the soil for the early crop [illegible] *Aush dhan*, so called from the fact of that sort of paddy ripening [illegible] less time than is taken by *Aman*, or the winter paddy.

D. U. Inter. '51

দ্বিতীয় অধ্যায়

কঠিন অনুচ্ছেদাদির অনুবাদ

আদর্শমালা

[এক]

An obvious characteristic of poetry of the Greeks was that it told some sort of story. It made some statements about the ways of gods or men or the emotions of the poet, which, even though it was not true, seemed true, The epic is a false history, and the drama a feigned action. The essence of poetry therefore seemed to the Greeks to be illusion, a conscious illusion.

To Plato this feature of the poet's art appeared so deplorable that he would not admit poets to his Republic. Such reactionary or Fascist philosophies as Plato's are always accompanied by a denial of culture

গ্রীকদেশীয় কবিতার একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ইহা কোন এক প্রকারের গল্প বলিত। ইহা মনুষ্য অথবা দেবতার জীবনধারা কিংবা কবির অনুভূতি বিবৃত করিত; এইগুলি সত্য না হইলেও সত্যরূপে বোধ হইত। মহাকাব্য হইল অলীক ইতিহাস এবং নাটক কৃত্রিম ক্রিয়াকলাপ মাত্র। সুতরাং গ্রীকদিগের নিকট কবিতার সত্তা ভ্রম এবং সজ্ঞান ভ্রম বলিয়া মনে হইত।

কাব্যকলার এই দিক প্লেটোর নিকট এতই শোচনীয় বলিয়া বোধ হইত যে, তিনি তাঁহার প্রজাতন্ত্রে কবিদিগের প্রবেশাধিকার দিবেন না। প্লেটোর দর্শনের ন্যায় এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল বা ফ্যাসীবাদী দর্শন কৃষ্টির অপহ্নৃতি-দ্বারা সর্বদাই সংগতি-প্রাপ্ত।

[দুই]

On the continent almost every nation whether little or great has openly declared at one time or another that it is superior to all other nations : the English fight heroic wars to combat these dangerous ideas without ever mentioning which is really the most superior race in the world. Continental people are sensitive and touchy ; the English take everything with an exquisite sense of humour—they are only offended if you tell them that they have no sense of humour. People on the continent either tell you the truth or lie ; in England they hardly ever lie, but the would not dream of telling you the truth.

D. U. B. A. '57

(ইউরোপ) মহাদেশে প্রায় প্রত্যেক ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ জাতি একদিন না একদিন প্রকাশ্যে নিজেকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে; জগতে কোন্ জাতি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা কখনও উল্লেখ না করিয়া ইংরাজগণ এই বিপজ্জনক ধারণা প্রতিরোধ করিবার জন্যই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করে। মহাদেশীয় জনগণ সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর; ইংরাজগণ সব-কিছুই কৌতুকরসবোধের সহিত গ্রহণ করে—কেবল যখন বলা হয় তাহাদের কৌতুকরসবোধ নাই—তখনই তাহারা অসন্তুষ্ট হয়। মহাদেশের লোকেরা হয় সত্য, নয় মিথ্যা বলে। ইংলণ্ডের লোকেরা কদাচিৎ মিথ্যা বলে কিন্তু তোমাকে সত্য বলিবার কথা স্বপ্নেও ভাবে না।

[তিন]

There was once in times of yore and ages long gone before, a great and puissant King, of the Kings of Persians, Sabur by name who was the richest of all the Kings in store of wealth and dominion and surpassed each and every in wit and wisdom. He was generous, openhanded and benificient, and he gave to those who sought him and repelled not those who resorted to him : and he comforted the broken-hearted and honourably treated those who fled to him for refuge.

বহু প্রাচীনকালে একদা পারসিকগণের নৃপতিবৃন্দের মধ্যে সাম্রাজ্যে ও ঐশ্বর্যে সর্বাপেক্ষা ধনী এবং বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে অদ্বিতীয় সবুর নামে এক মহান্ ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি উদার মুক্তহস্ত এবং দয়ালু ছিলেন, তাঁহার নিকট যাহারা প্রার্থী হইত, তাহাদিগকে তিনি দান করিতেন এবং যাহারা তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইত, তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না, এবং তিনি ভগ্নহৃদয় ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিতেন আর যাহারা তাঁহার নিকট আশ্রয়ের জন্য যাইত তাহাদিগকে সম্মান সমাদর করিতেন।

[চার]

Ours is a vast country with a population of 350 millions. Our vastness in area and population has hitherto been a source of weakness. It is to-day a source of strength if we can only stand united and boldly face our rulers. From the standpoint of Indian unity the first thing to remember is that the division between British India and the Indian States is an entirely artificial one. India is one and the hopes and aspirations of the people of British India and of the Indian States are identical. Our goal is that of an independent India and in my view that goal can be attained only through a federal republic in which the Provinces and the States will be willing partners. *C. U. B. A. '56*

আমাদের দেশ বিশাল এবং ইহার জনসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটি। সাম্প্রতিক কাল অবধি আয়তনের ও জনসংখ্যার বিশালতা আমাদের দুর্বলতার কারণস্বরূপ ছিল। বর্তমানে আমরা যদি কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ হইয়া সাহসভরে শাসকদের সম্মুখীন হইতে পারি, তাহা হইলে ইহা শক্তির উৎসস্বরূপ হইবে। ভারতীয় ঐক্যের দিক হইতে বিচার করিলে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষ এবং দেশীয় রাজ্যের বিভেদ সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম। ভারতবর্ষ অখণ্ড এবং ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের জনগণের আশা এবং উচ্চাকাংক্ষা অভিন্ন। স্বাধীন ভারতবর্ষই আমাদের লক্ষ্য এবং আমার মতে যে সংযুক্ত সাধারণতন্ত্রে প্রদেশসমূহ ও রাজ্যাদি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অংশীদার হইবে, তাহারই মাধ্যমে ঐ লক্ষ্য অর্জিত হইতে পারে।

[পাঁচ]

Now that you are going a little more into the world, I will take this occasion to explain my intentions as to your future expenses, that you may know what you have to expect from me, and make your plan accordingly. I shall neither deny nor grudge you any money that may be necessary for either your improvement or pleasures, I mean the pleasures of a rational being. Under the head of improvement, I mean the best books and the best masters, cost what they will, I also mean all the expenses of lodgings, coach, dress, servants, etc., which shall be necessary to enable you to keep the best company.

D. U. B. A. '56

তুমি এখন আরও একটু বেশী সংসারে প্রবেশ করিতেছ—আমি এই সুযোগে তোমার ভবিষ্যতের ব্যয় সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি যাহাতে তুমি আমার নিকট যতটুকু আশা করিতে পার সেই অনুযায়ী স্বীয় পরিকল্পনা নির্ধারণ করিতে পার। তোমার উন্নতি বা আমোদপ্রমোদের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা দিতে আমি অস্বীকার বা কুণ্ঠাবোধ করিব না, আমি বুদ্ধি-বিবেচনা-সম্পন্ন ব্যক্তির আমোদ-প্রমোদের কথাই বলিতেছি। উন্নতির দফায় সবশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং শিক্ষকদের কথাই বলিতেছি তাহাতে যত ব্যয়ই হউক না কেন, উত্তম সংগ রাখিবার জন্য তোমার আবাস, চতুর্চক্রযান, পোষাক, ভৃত্য, ইত্যাদির সমুদয় ব্যয়ের কথাও আমি বলিতেছি।

[ছয়]

A Farmer being on the point of death, and wishing to show his sons the way to success in farming, called them to him, and said, "My children, I am departing from this life, but all that I have to leave you, you will find in the vineyard." The sons, supposing that he referred to some hidden treasure, as soon as the old man was dead,

set to work with their spades and ploughs and every implement that was at hand, and turned up the soil over and over again. They found indeed no treasure; but the vines, strengthened and improved by this thorough tillage, yielded a finer vintage than they had ever yielded before and more than repaid the young husbandmen for all their trouble. So truly is industry in itself a treasure. *R. U. B. A. '56*

কৃষিকার্যে কিরূপে সফলতা লাভ করিতে হয় তাহা দেখাইবার জন্য একজন মুমূর্ষু কৃষক পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিল, "মোর বৎসগণ, আমি ইহজীবন ত্যাগ করিতেছি, কিন্তু তোমাদের জন্য যাহা কিছু রাখিবার তাহা তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পাইবে।" সে কোন গুপ্তধনের কথা বলিতেছে, ইহাই অনুমান করিয়া পুত্রগণ বৃদ্ধলোকটি মারা যাইবামাত্র তাহাদের কোদালি, লাঙল এবং হাতের কাছে বিদ্যমান যন্ত্রপাতি লইয়া বারবার ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা বস্তুত কোন গুপ্তধন দেখিতে পাইল না, কিন্তু এই সুগভীর কর্ষণের ফলে সতেজ ও পরিপুষ্ট দ্রাক্ষালতাগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দ্রাক্ষামদিরা উৎপন্ন করিল এবং কৃষকগণ তাহাদের সকল কষ্টভোগের জন্য অনেক বেশী প্রতিদান পাইয়াছিল, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পরিশ্রমই সম্পদ।

[সাত]

You always had the advantage You could hypnotize me when I was wide awake, so that I neither saw nor heard, but merely obeyed, you could give me a raw potato and make me imagine it was a peach, you could force me to admire your foolish caprices as though they were strokes of genius. But when at last I awoke, I realised that my honour had been corrupted and I wanted to blot out the memory by a great deed, an achievement, a discovery, or an honourable suicide. I wanted to go to war, but was not permitted. It was then that I threw myself into science. And now when I was about to reach out my hands together in its fruits, you chop off my arms.

C. U. B. A. '55

(আমার উপর) তোমার সর্বদাই অনেকটা জোর ছিল [অথবা আমার উপর তুমি সর্বদাই জোর খাটাইতে পারিতে]। যখন আমি সম্পূর্ণ জাগ্রৎ থাকিতাম, তখন তুমি আমাকে সম্মোহিত করিতে পারিতে, যাহার ফলে আমি কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইতাম না—কেবলমাত্র তোমার আদেশ পালন করিয়া যাইতাম, তুমি আমাকে একটা কাঁচা আলু দিয়া তাহাকে পিচ্ ফল বলিয়া কল্পনা করিতে বাধ্য করিতে পারিতে, তোমার নির্বোধের মত খেয়ালগুলিকে [বা ছেলেমানুষীকে] প্রতিভার দান বলিয়া প্রশংসা করিতে আমাকে বাধ্য করিতে পারিতে। কিন্তু শেষে যখন আমি জাগিয়া উঠিলাম, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার ধর্ম

নষ্ট হইয়াছে এবং আমি একটি মহৎ কার্য বা একটি কীর্তি বা একটি আবিষ্কার অথবা সসম্মানে আত্মহত্যার দ্বারা তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছিলাম। আমি যুদ্ধে যোগদান করিতে চাহিয়াও অনুমতি পাই নাই। তখনই আমি বিজ্ঞান-চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। আর এখন আমি উহার ফল আহরণ করিবার জন্য যেই হাত বাড়াইতে উদ্যত হইয়াছি, তখনই তুমি আমার বাহু দুইটিকে ফেলিলে।

[আট]

It was the night before the day fixed for his coronation, and the young king was sitting alone in his beautiful chamber His courtiers had all taken their leave of him, bowing their heads to the ground, according to the cermonious usage of the day, and had retired to the great hall of the palace to receive a few last lessons from the professor of etiquette ; there being some of them who had still quite natural manners, which in a courtier is, I need hardly say, a very grave offence. The lad—for he was only a lad, being but sixtten years of age—was not sorry at their departure. *D. U. B. A. '55*

তাঁহার অভিষেকের জন্য নির্দিষ্ট দিনটির পূর্বরাত্রে তরুণ নৃপতি একাকী তাঁহার সুদৃশ্য কক্ষে বসিয়াছিলেন। তৎকালীন প্রচলিত আনুষ্ঠানিক প্রথা-অনুসারে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সভাসদেরা সকলেই বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এবং আচার-ব্যবহারের শিক্ষকের নিকট হইতে শেষ উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য রাজপ্রাসাদের প্রকাণ্ড সভাগৃহে মিলিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের তখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণের অভ্যাস ছিল। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সভাসদের পক্ষে এরূপ ব্যাপার অতি সাংঘাতিক গুরুতর অপরাধ। বালকটি—নৃপতি তখনও বালকমাত্রই ছিলেন, মাত্র ষোড়শবর্ষের তরুণ—তাঁহাদের বিদায়গ্রহণে দুঃখিত বোধ করেন নাই।

[নয়]

The chief trouble in this perplexing world is that there are so many people afflicted with the mania of owning things that really do not need to be owned in order to be enjoyed. Their experience must be exclusive or they have no pleasure in them. I have heard of a man who countermanded an order for a portrait when he found that some one else in the same town had forestalled him in the possession of a copy. It was not the beauty of the painting that appealed to him · It was the petty and childish notion that he was the fortunate and privileged owner of a rare artistic specimen, and with the discovery that others also shared his good fortune his interest in the object of beauty vanished. *C. U. B. A. '54*

এই বিভ্রান্তকারী জগতে সর্বাপেক্ষা প্রধান বিপদ হইল এই যে, যে সব জিনিষকে উপভোগ করিতে হইলে তাহাদিগের অধিকারী হইবার প্রয়োজন নাই এমন জিনিষের মালিক হইবার বাতিক এত বেশী লোককে এই জগতে পাইয়া বসিয়াছে। তাহাদের অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র তাহাদের নিছক একারই হওয়া চাই, তাহা না হইলে তাহারা ইহাতে কোনই আনন্দ পায় না। আমি জানি, একটি সহরে যখন একটি লোক দেখিতে পাইল যে, সেই সহরের আর এক ব্যক্তি এই ছবির আর একটি প্রতিলিপি আগেই কিনিতে চাহিয়াছে, তখন সে নিজে এই ছবিটির অর্ডর বাতিল করিয়াছিল। ছবিটির সৌন্দর্যই যে তাহার কাছে আদরণীয় ছিল তাহা নয়। সে যে একটি অতি দুষ্প্রাপ্য শিল্পনিদর্শনের একমাত্র বিশেষ ভাগ্যবান্ অধিকারী, এই অতি হীন শিশুসুলভ ধারণাই তাহার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে যেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, অন্যেরাও তাহারই সৌভাগ্যের তুল্য অধিকারী, তখনই সেই সৌন্দর্য নিদর্শনের প্রতি তাহার আগ্রহ অন্তর্হিত হইয়া গেল।

[দশ]

I continue my letter. It is night, everybody is asleep · I am sitting up late writing to you, before the open window The garden is full of scents: the air is warm. Do you remember when we were children, whenever we saw or heard anything very beautiful, we used to say to ourselves, 'Thanks, Lord, for having created it.' To-night I said to myself with my whole soul, 'Thanks, Lord, for having made the night so beautiful!' And suddenly I wanted you there—close to me—with such violence that perhaps you felt it Yes, you were right in your letter when you said, 'In generous hearts admiration is lost in gratitude'.

D. U. B A '54

আমার চিঠি শুরু ক'রছি। এখন রাত, প্রত্যেকেই ঘুমন্ত; তোমাকে লেখার জন্য এত রাতে খোলা জানলার সামনে বসেছি। উদ্যানটি সৌরভে পরিপূর্ণ, বাতাস উত্তপ্ত। যখন আমরা শিশু ছিলাম, যেখানেই আমরা অতীব সুন্দর কিছু দেখ্‌তাম বা শুনতাম, আমরা নিজেদের মধ্যে ব'লতাম, 'হে প্রভো। এহেন সৃষ্টির জন্য তোমায় ধন্যবাদ!'—সে কথা কি তোমার মনে আছে? আজ রাতে আমার সারা অন্তর দিয়ে আমি আপন মনে ব'লছিলাম, 'হে প্রভো! রাতটিকে এত সুন্দর করে তৈরী করায় তোমায় ধন্যবাদ!' আর অকস্মাৎ তোমায় সেখানে চেয়েছিলাম—আমার ঠিক পাশেই—এমন দুরন্ত ব্যাকুলতা নিয়ে যে সম্ভবত তুমি এটা অনুভব করেও থাকতে পার! হ্যাঁ, 'মহান্ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার মাঝে বিস্ময় যায় হারিয়ে'—তোমার চিঠিতে এটা যা লিখেছিলে, তা ঠিক।

[এগারো]

In the last world war the Allies accused Germany of using poison gas and thus violating a sacred convention. The same charge was returned by Germany. Very likely both parties violated the law. What happened in the last war will be repeated in the next war. To prevent the use of atom bomb war itself must be outlawed. There is no other remedy. Possibly scientists are busy devising some defensive measures against atom bomb. In the last war we crawled in slit trenches as a measure of safety. In the next war we shall probably be asked to go down in deep under-ground caves to escape from atom bomb. *R. U. B. A. '54*

গত বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি এই অভিযোগ করিয়াছিল যে, জার্মানী বিষবাষ্প ব্যবহার করিয়া একটি পবিত্র নীতি লংঘন করিয়াছে। জার্মানী (উহাদের বিরুদ্ধে) পাল্টা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। সম্ভবত উভয় পক্ষই এই বিধিটি ভংগ করিয়াছিল। গত যুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, আগামী যুদ্ধেও তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে। আণবিক বোমার ব্যবহার বন্ধ করিতে হইলে যুদ্ধমাত্রকেই অবশ্য বর্জন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর কোনও প্রতিকার নাই। সম্ভবত বৈজ্ঞানিকেরা আণবিক বোমার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত আছেন। গত যুদ্ধে আমরা নিরাপত্তার জন্য পরিখা কাটিয়া তাহার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম। আগামী যুদ্ধে আণবিক বোমা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সম্ভবত গভীর ভূতলস্থ গহ্বরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে আমাদের বলা হইবে।

[বারো]

Cricket as I know and love it, is part of that holiday time which is the Englishman's heritage—a play-time in a homely countryside. It is a game that seems to me to take on the very colours of the passing months. In the spring, cricketers are fresh and eager; ambition within them breaks into bud. The showers of May drive the players from the field, but soon they are back again, and every blade of grass around them is a jewel in the light. I like this intermittent way of crickets beginning in spring weather. A season does not burst on us, as football does, full-grown and arrogant; it comes to us every year with a becoming modesty and hesitation. *C. U. B. A. '53*

ক্রিকেট্কে আমি যেভাবে জানি ও ভালবাসি, সেটি অবকাশের অংগ, ইংরাজদের ঐতিহ্য—সাধারণ গ্রামাঞ্চলে ক্রীড়াকৌতুকের সময়। আমার ত মনে হয়, এই খেলাটি তৎকালীন মাসগুলির বৈশিষ্ট্য দিয়াই রঞ্জিত হয়। বসন্তকালে ক্রিকেট্ খেলোয়াড়েরা সতেজ সজীব উন্মুখ থাকে। তাহাদের অন্তরের উচ্চাভিলাষ বিকচোন্মুখ হইয়া পড়ে।

যে মাসের বৃষ্টিধারা খেলোয়াড়দের ক্রীড়াভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য করে, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসে। আর তাহাদের চারিদিকে প্রত্যেকটি ঘাসের শীষ আলোয় রত্নের ন্যায় যেন ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠে। বসন্তকালে এইভাবে ক্রিকেটের আবির্ভাব আমার কাছে ভালই লাগে। ফুটবল খেলা যেমন সম্পূর্ণাংশ ভাবে সগর্বে আমাদের উপর আসিয়া পড়ে, ক্রিকেট্ খেলার মরসুম তেমনি করিয়া আমাদের উপর সহসা আসিয়া পড়ে না। প্রতি বৎসর যথোচিত নম্রভাবে এবং দ্বিধাসংকোচের সহিত ক্রিকেটের মরসুম আমাদের কাছে আসিয়া থাকে।

[তেরো]

Among the famous men of Bengal in the nineteeenth century no name deserves a more honoured place than that of Rājā Rām Mohan Rāy. At once the pioneer of the great Renaissance that was slowly dawning in Bengal and the first representative of India to the British people, he opened up to his fellow countrymen new paths of progress and reform. When as yet the old traditions and the old beliefs, clothed in the gathered ignorance of centuries, still held their ground unchallenged, he zealously sought fresh knowledge, and when found, proclaimed it unafraid. *D U. B. A. '53*

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের অপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধাভাজন আসনের দাবি আর কেহই করিতে পারেন না। বাংলায় ধীরে ধীরে যে মহান্ নবযুগের প্রভাত হইতেছিল, তিনি একাধারে তাহার পথপ্রদর্শক এবং বৃটিশজাতির নিকট ভারতের প্রথম প্রতিনিধি। তিনি স্বদেশীয়দের সম্মুখে উন্নতি ও সংস্কার-সাধনের নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যখন বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অজ্ঞতার মধ্যে প্রাচীন কুসংস্কার এবং প্রাচীন অন্ধবিশ্বাস অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করিতেছিল, তখন তিনি উৎসাহসহকারে নবীন জ্ঞানালোকের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, এবং সেই জ্ঞানালোক আবিষ্কার করিয়া নির্ভয়ে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন।

[চোদ্দ]

The day which had its special significance for me came with all its trivialities of the commonplace life. The ordinary work of my morning had come to its close, and before going to take bath I stood for a moment at my window, overlooking a market-place on the bank of a dry river-bed, welcoming the first flood of rain along its channel. Suddenly I became conscious of a stirring of soul within me. My world of experience in a moment seemed to become lighted, and facts that were detached and dim found a great unity of meaning. The feeling which I had was like that which a man, groping through a fog

without knowing his destination, might feel when he suddenly discovers that he stands before his own house. *C. U. B. A.'52*

আমার কাছে যে-দিনটির বিশেষ তাৎপর্য ছিল, তাহাই সাধারণ জীবনের সকল তুচ্ছতা লইয়া উপস্থিত হইল। আমার প্রাতঃকালীন সাধারণ কাজ সমাপ্ত হইলে, স্নান করিতে যাইবার পূর্বে আমি এক শুষ্ক নদীগর্ভের ধারে এক হট্টস্থলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, ইহার জলনালীপথে বর্ষাকালের প্রথম বন্যাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমার জানালার কাছে মুহূর্তেকের জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম। অকস্মাৎ আমার অন্তর্নিহিত আত্মার আলোড়নে সচেতন হইলাম। ক্ষণেকের মধ্যে আমার ভূয়োদর্শনের জগৎ যেন আলোকিত হইয়া উঠিল এবং যে-সমস্ত তথ্য বিক্ষিপ্ত এবং নিষ্প্রভ ছিল, তাহারা এক বিপুল সমন্বয়মূলক তাৎপর্যে ভরিয়া উঠিল। কোন মানুষ তাহার গন্তব্যস্থান বুঝিতে না পারিয়া নিবিড় কুয়াসার মধ্যে হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে যেমন অকস্মাৎ আবিষ্কার করে যে, তাহার নিজের গৃহেরই সম্মুখে সে দণ্ডায়মান, সেই রকমেরই অনুভূতি আমার হইয়াছিল।

[পনেরো]

To-morrow as yesterday, the fittest will survive in the struggle for existence. But whereas in the past selfishness was the measure of fitness, in the future survival value will be determined by breadth and depth of love. Modern science is teaching, as it never was taught before, that no one lives to himself alone Co-operation between individuals, and then between families, was essential to the life of man when he competed with the brutes of field and forests. Still greater co-operation between clans and nations is now essential to his continued life on the earth. Now, as always, individuals and peoples who are not in line with the great forward movements in the evolutionary trend are doomed to die. *R. U. B. A.'55 ; C. U. B. A.'51*

গতকালের ন্যায় আগামী কালেও জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন হইবে। কিন্তু অতীতে যেখানে স্বার্থপরতারই ছিল যোগ্যতার পরিমাপ, ভবিষ্যতে সেখানে প্রেমের প্রসারতা ও গভীরতা-দ্বারা উদ্বর্তন-মূল্য নির্ধারিত হইবে। ইহা পূর্বে কখনও শেখানো না হইলেও, আধুনিক বিজ্ঞান ইহাই শিক্ষা দিতেছে যে, কেহই একাকী বসবাস করে না। যখন প্রান্তর এবং অরণ্যাদির পশুদিগের সহিত মানুষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইয়াছিল, তখন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, পরিবারে-পরিবারে সহযোগিতা মানব-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। এক্ষণে জগতে ধারাবাহিক জীবনযাপনের জন্য সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাতিতে-জাতিতে আরও অধিকতর সহযোগিতা অপরিহার্য।

একণে এবং সর্ব সময়েই যে সকল ব্যষ্টি-মানুষ ও সমষ্টি-মানুষ ক্রমাভিব্যক্তির প্রশ্রয়ে বলিষ্ঠ অগ্রগতির সহিত পংক্তিবদ্ধ নয়, তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।

[ষোলো]

A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. The teacher who has come to the end of his subject, who has no living traffic with his knowledge, but merely repeats his lessons to his students, can only load their minds; he cannot quicken them. Truth not only must inform but also inspire. If the inspiration dies out, and the information only accumulates then truth loses its infinity. The greater part of our learning in the schools has been wasted because, for most of our teachers, their subjects are like dead specimens of once living things, but no communication of life and love. *U. U. B. A. '51*

শিক্ষক কথনও প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিতে পারেন না, যদি না তিনি নিজে সর্বদা জ্ঞানার্জন করেন। একটি বাতি অপর বাতিকে কথনও প্রজ্বলিত করিতে পারে না, যদি না ইহা আপন অগ্নিশিখায় প্রদীপ্ত থাকিতে পারে। যে-শিক্ষক তাঁহার পড়াশুনা শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন, বিদ্যার সংগে যাঁহার যথাযথ সংযোগ নাই অথচ ছাত্রদের নিকট যিনি প্রাত্যহিক শিক্ষণীয় পাঠ শুধু পুনরাবৃত্তি করেন, তিনি উহাদের মন ভারাক্রান্ত করিতে পারেন মাত্র, সচেতন করিতে পারেন না। সত্য কেবলমাত্র তথ্যবহনই করে না, উদ্দীপ্তও করে। উদ্দীপনা নির্বাপিত এবং তথ্যই শুধু সঞ্চিত হইলে সত্য ইহার অসীমত্ব হারায়। বিদ্যালয়াদিতে আমাদের পঠনপাঠনের অধিকাংশই অপচিত হইয়াছে এই কারণে যে, আমাদের শিক্ষকদিগের মধ্যে বেশীর ভাগেরই কাছে তাঁহাদের বিষয়াদি একদা সরল সরস সামগ্রীর নীরস ছাঁচের ন্যায়—প্রাণ এবং প্রীতির কোন সাহিত্যই তাহাতে নাই।

[সতেরো]

We do not know whether suitable physical conditions are sufficient in themselves to produce life. One school of thought holds that as the earth gradually cooled, it was natural, and indeed almost inevitable, that life should come. Another holds that after one accident had brought the earth into being, a second was necessary to produce life. The material constituents of a living body are perfectly ordinary chemical atoms—carbon, such as we find in soot or lampblack; hydrogen and oxygen, such as we find in water; nitrogen, such as forms the greater part of the atmosphere; and so on. Every

kind of atom necessary for life must have existed on the new-born earth. At intervals, a group of atoms might happen to arrange themselves in the way in which they are arranged in the living cell. *C. U. B. A. '50*

জীবন উৎপাদনের পক্ষে যথাযোগ্য নৈসর্গিক পরিবেশাদিই যথেষ্ট কিনা, তাহা আমরা জানি না। একটি চিন্তাশীল সম্প্রদায় মনে করেন যে, মৃত্তিকা ক্রমে ক্রমে শীতলতাপ্রাপ্ত হইলে জীবনের অভিব্যক্তি হইয়াছিল। ইহাই স্বাভাবিক এবং বস্তুত প্রায় অনিবার্য। অপরে ধারণা করেন যে, একটি বিপৎপাতে মৃত্তিকার উদ্ভবের পর জীবন উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় (বিপৎপাতের) প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। কার্বন, যাহা আমরা ঝুলে অথবা প্রদীপের কালিতে দেখি, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যাহা আমরা জলে পাই, নাইট্রোজেন, যাহা আবহাওয়ার বেশীর ভাগ রচনা করে এবং আরও অনেক—এই সাধারণ রাসায়নিক পরমাণুগুলিই নির্ভুল ভাবে সজীব দেহের বস্তুগত উপাদান। জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রত্যেক রকমের পরমাণু নবজাত মৃত্তিকার উপরে নিশ্চয়ই বিদ্যমান ছিল। সজীব কোষের মধ্যে পরমাণুরা যে ভাবে সজ্জিত থাকে, ঠিক সেইভাবে পরমাণুদল কাল-ব্যবধানে সজ্জিত হইয়া থাকিতে পারে।

[আঠারো]

The author's aim is to present the story of ancient India, as far as practicable, in the form of a connected narrative based upon the most authentic evidence available, to relate facts, however established, with impartiality, and to discuss the problems of history in a judicial spirit. He has striven to realize, however imperfectly, the ideal expressed in the words of Goethe,—The historian's duty is to separate the true from the false, the certain from the uncertain, and the doubtful from that which cannot be accepted. Every investigator must before all things look upon himself as one who is summoned to serve on a jury. He has only to consider how far the statement of the case is complete and cleverly set forth by the evidence. Then he draws his conclusion and gives his vote, whether it be that his opinion coincides with that of the foreman or not. *D. U. B. A. '49*

অত্যন্ত ব্যবহারযোগ্য বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণকে ভিত্তি করিয়া ধারাবাহিক বিবরণের ভংগীতে প্রাচীন ভারতের কাহিনী যথাসাধ্য উপস্থাপিত করা, তথ্যাদি যতই সুপ্রতিষ্ঠ হোক্ না কেন, নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করা; এবং বিচারকের মনোভাব লইয়া ইতিহাসের সমস্যাগুলিকে আলোচনা করাই তো লেখকের উদ্দেশ্য। সত্যকে

মিথ্যা হইতে, ধ্রুবকে অধ্রুব হইতে, সন্দেহজনককে গ্রহণাতীত হইতে বিচ্ছিন্ন করাই হইতেছে ঐতিহাসিকের কর্তব্য—গ্যয়টের ভাষায় পরিব্যক্ত (এই) আদর্শটি অন্তত ক্রটিপূর্ণ ভাবেও হৃদয়ংগম করিতে তিনি প্রয়াস পান। সর্বাগ্রে নিজেকে জুরীতে কার্য করিবার জন্য আহূত ব্যক্তির ন্যায় মনে করা প্রত্যেক গবেষকেরই উচিত। বিষয়ের বিবরণ কতদূর ক্রটিশূন্য এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা কতকটা চাতুর্যসহকারে সাজানো, ইহাই শুধু তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হইবে। অতঃপর ফোরম্যানের অভিমতের সহিত তাঁহার অভিমত মিলিয়া যাক্ বা না যাক্, তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মতামত জ্ঞাপন করেন।

[উনিশ]

England's chief glory is her Navy. This praise has since the defeat of the Spanish Armada been an article of faith with every true Briton. The mighty empires of Greece and Rome were each in its day invincible on land, and therefore arbitors of the world or rather of those portions of Europe, Asia, and Africa which constituted it in their eyes, though Alexander was inconsistent enough to weep for fresh worlds to conquer, while the mutinous state of his army prevented his marching across the Sutlej, to overthrow the great king who ruled over all that portion of India to the south of this river. *C. U. B. A.'49*

নৌশক্তি ইংলণ্ডের প্রধান গৌরব। স্পেনদেশীয় রণপোতবহরের পরাজয়ের পর হইতে প্রতিটি খাঁটি বৃটেনবাসীর কাছে এই সুখ্যাতি বিশ্বাসের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীস ও রোমের পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যাদির প্রত্যেকেই আপনার গৌরবময় যুগে স্থলপথে অজেয় থাকায়, তাহারা বিশ্বের অথবা বিশেষ করিয়া ইউরোপ, এসিয়া এবং আফ্রিকার যে সকল অংশ তাহাদের দৃষ্টিপরিধির মধ্যে সংগঠিত হইয়াছিল, তাহাদের সালিশ ছিল; তবুও নব নব জগৎজয়ের জন্য বিলাপ করিয়া আলেকজাণ্ডার অসংগতি প্রকাশ করিয়াছিলেন: শতদ্রুনদের দক্ষিণে অবস্থিত ভারতের সেই সমগ্র অংশের শাসনকর্তা শক্তিমান রাজাকে পরাভূত করিতে এককালে তাঁহার সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ-প্রবণ আচরণ তাঁহার শতদ্রু-পারের অভিযানকে প্রতিরোধ করিয়াছিল।

[কুড়ি]

A well-known journalist wrote an article recently, in which he described how, as he lay ill of influenza, all his wasted years passed before his imagination so that he was filled with a determination to become a better man. I envied him as I read, for I, too, was ill at the time and should have liked to think that my sufferings were

doing me some good. But, alas, when I am ill, it is not so much my past, as my present that troubles me. I repent of my sins most easily when I am feeling fairly well. When I am ill, I am far more interested in what the doctor hears through the stethescope than in the flutterings of my conscience. *C. U. B. A.* '48

জনৈক সুবিখ্যাত সাংবাদিক সম্প্রতি একটি নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পীড়িত হইয়া যখন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন তাঁহার সকল অপচিত বৎসর তাহার কল্পনায় এমন ভাবে ভাসিয়া উঠিয়াছিল যে, আরও ভাল লোক হইবার সংকল্পে তিনি কি পরিমাণ ভরিয়া উঠিয়াছিলেন—রচনায় ইহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। পড়িবামাত্রই আমি তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইলাম। কারণ, আমিও তৎকালে অসুস্থ ছিলাম এবং আমার দুঃখ-ক্লেশ আমারও কিছুটা ভাল করুক, ইহাই ভাবিতে ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু, হায়, যখন আমি পীড়িত হই, তখন আমার অতীত ততটা নয়, যতটা বর্তমান আমাকে উত্ত্যক্ত করে। যখন আমি মোটামুটি ভাল বোধ করিতে থাকি, তখন বেশ অনায়াসেই আমি আমার পাপাচারের কথা পরিতাপ-সহকারে স্মরণ করি। যখন আমি অসুস্থ থাকি, তখন আমার বিবেকের ব্যাকুলতা অপেক্ষা ষ্টেথিস্‌কোপের সাহায্যে চিকিৎসক যাহা শ্রবণ করেন, তাহাতেই অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হই।

[একুশ]

Burmese places of worship are called pagodas. All over the country there are thousands of them, some new, some in ruins, and some gradually falling down. As soon as a Burman makes money and becomes rich, he builds a pagoda ; but no one ever seems to think of repairing the old ones. Burmese girls have their ears bored. It is an important ceremony, though painful to the girl. Music is played while the ears are being pierced, in order to drown the girl's screams. The day after day the holes are made bigger and bigger by putting in them thicker and thicker reeds. When they are large enough a tube of an inch long and three-quarters of an inch wide is put in them.
C. U. B. A. '47

ব্রহ্মদেশীয় পূজাস্থানগুলি প্যাগোডা নামে পরিচিত। সারা দেশ জুড়িয়া তাহারা হাজারে হাজারে বিদ্যমান—কতকগুলি নূতন, কতকগুলি বিধ্বস্ত, এবং কতকগুলি ক্রমপতনোন্মুখ। কোন বর্মী অর্থসঞ্চয় করিয়া ধনী হইবামাত্রই প্যাগোডা নির্মাণ করে; কিন্তু পুরাতন প্যাগোডাগুলির মেরামতের চিন্তা কেহ কখনও করে না। বর্মী মেয়েরা বিদ্ধকর্ণা। মেয়েদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইলেও, ইহা একটি গুরুত্ববিশিষ্ট উৎসব।

মেষের যাতনাসূচক কণ্ঠস্বরকে চাপা দিবার নিমিত্ত কর্ণবেধকালে গীতবাদ্য ধ্বনিত হয়। অতঃপর দিনের পর দিন বন্ধ্রগুলির মধ্যে স্থূল হইতে স্থূলতর শর গুঁজিয়া উহাদিগকে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর করা হয়। উহারা বেশ বড় হইলে এক ইঞ্চি লম্বা ও তিন চতুর্থাংশ ইঞ্চি প্রস্থ একটি নল উহাদের ভিতরে রাখা হয়।

[বাইশ]

When the day-light was fading and the evening breeze stirred the great trees of the forest, Gotama seated himself and preached his first sermon. As the words flowed from his lips a thrill of joy ran through all. Nature—the flowers gave forth thir sweetest scents, rivers murmured soft music, the stars shone with unusual brightness, and there was a rushing sound in the air as the Devas came in thousands to hear the message of salvation. And the five disciples of Gotama bowed themselves before him and acknowledged him to be the Holy one—the Buddha. Long did the great teacher continue speaking in the stillness of that Indian night; and the words he uttered have ever since been treasured up in the hearts of those whom he has led into the way of Peace. *C. U. B. A '16*

দিনের আলো যখন ক্রমবিলীন হইতেছিল এবং সান্ধ্য বায়ু যখন বনের বড় বড় গাছকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তখন গৌতম সমাসীন হইয়া তাঁহার প্রথম ধর্মোপদেশ প্রচার করিলেন। তাঁহার মুখ হইতে বাণী বাহির হইবামাত্র সমগ্র প্রকৃতির মধ্য দিয়া একটি পুলক-শিহরণ ছড়াইয়া পড়িল—ফুলদল মধুরতম সৌরভ নিঃসৃত করিল, নদীমালা ললিত সংগীত গুন্ গুন্ স্বরে গাহিল, নক্ষত্রনিচয় অসামান্য দীপ্তির সহিত ঝক্‌মক্ করিল, এবং মোক্ষের বাণী শুনিবার জন্য হাজারে হাজারে দেবগণ আসিতে থাকায় বাতাসে হুড়াহুড়ির শব্দ ধ্বনিত হইল। আর গৌতমের পাঁচজন শিষ্য আপনাদিগকে আনত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল ও শুদ্ধ বুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইল। সেই ভারতীয় রজনীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মহান্ আচার্যের মুখ হইতে বহুক্ষণব্যাপী বাণী নিঃসৃত হইল, এবং যাহাদিগকে তিনি শান্তির পথে পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্তরে তৎকথিত বাণী তখন হইতে শাশ্বত কালের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

অনুশীলনী

[এক]

Not only has the religious belief declined, but the fear of consequences has declined, too. Prison is not so terrible a thought as it used to be. People believe that prisoners are fairly well treated and prison is no longer thought of as shameful. With this decline

of religion and failure of discipline has come greater temptation. Not only are many things scarce, but people need more pocket money than they used to do for cinemas, cigarettes, football pools, dog races, always travelling about by buses and so on. All this incessant need for money puts a premium on fraud.

[দুই]

There was once a musician named Kreuzberg. He was fond of sun and flowers and children; but he could not live on the Sunny side because of his delicate instruments. In a tall champagne glass with a gold rim he used to have a red rose standing every day as a memorial and an offering to her who had once been his life's sun. Now yesterday evening he had put an absolutely fresh rose in the water and to-day it was witherd, shrunken, dead, with its head bowed on its breast—a bad sign! He bought a new rose that evening, a really fresh one Next morning—alas! the petals of the rose had fallen from the stalk. He thought, 'She who was my all, my conscience, my muse, disapproves of me, what have I done ?'

[তিন]

There lived in the city of Baghdad, during the reign of the Commander of the Faithful, Harun-al-Rashid, a man named Sindabad, the Porter, one in poor condition who bore burdens on his head for hire. It happened to him one day of great heat that whilst he was carrying a heavy load, he became exceedingly weary and sweated profusely, the heat and the weight alike oppressing him. Presently, as he was passing the gate of a merchant's house, before which the ground was swept and watered, and there the air was temperate, he sighted a broad bench beside the door; so he set his load thereon, to take rest and smell the air. *R. U. B. A. '57*

[চার]

Rip Van Winkle was one of those happy mortals, of foolish, well-oiled dispositions, who take the world easy. If left to himself, he would have whistled life away in perfect contentment: but his wife kept continually dinning into his ears about idleness, his carelessness, and the ruin he was bringing on his family. Morning, noon, and night, her tongue was incessantly going, and everything he said or did was sure to produce a torrent of household eloquence. Rip had but one way of replying to all lectures of the kind, and that, by frequent use, had grown into a habit. He shrugged his shoulders, shook his head, cast up his eyes, but said nothing. *D. U. B. A. '56*

[পাঁচ]

Certain it is, that the whole of the most ancient literature of the Indians arose without the art of writing, and continued to be transmitted without it for centuries. Whoever wished to become acquainted with a text had to go to a teacher in order to hear it from him. Therefore, we repeatedly read in the older literature, that a warrior or a Brahman, who wished to acquire a certain knowledge, travels to a famous teacher, and undertakes unspeakable troubles and sacrifices in order to participate in the teaching, which cannot be attained in any other manner. Therefore to a teacher, as the bearer and preserver of the sacred knowledge, the highest veneration is due, according to ancient Indian law;—as the spiritual father he is venerated, now as an equal, now as a superior, of the physical father.

C. U B. A. '56

[ছয়]

There was a Prince who was very much famed throughout all the countries; he was a great conquerer, and was patent, rich and just. One day he said to his minister, "Put on the best speed, I will run my horse against thine, that we may see which is the swiftest, I have a long time had a strange desire to make this trial". The minister, in obedience to his master, spurred his horse, and rode full speed, and the king followed him. But when they were got at a great distance from the grandees and nobles that accompanied them, the king, stopping his horse, said to the minister, "I had no other design in this but to bring thee to a place where we might be alone, for I have a secret to impart to thee, having found thee more faithful than any other of my servants". *R. U. B. A. '56*

[সাত]

Oriental praise is apt to be somewhat high flown, but Cordova really deserved the praise that has been lavished upon it. In its present state it is impossible to form any conception of the extent and beauty of the old Moorish capital in the days of the great Khalif Its narrow streets of white-washed houses convey but a faint impression of its once magnificent extent, the palace, Alcazar, is in decay, and its ruins are used for the vile purpose of a prison; the bridge still spans the Guadalquivir, however, and the noble mosque of the first Omeyyad is still the wonder and delight of travellers.

D. U. B. A. '55

[আট]

The problem, which must be solved, if the future of the world is to be less terrible than its present, is the problem of preventing nations

from getting into the moods of England and Germany at the outbreak of the war. These two nations might be taken as almost mythical representatives of pride and envy—cold pride and hot envy. Germany declaimed passionately "You, England, swollen and decrepit, you overshadow my whole growth—your rotting branches keep the sun from shining upon me and the rain from nourishing me. Your spreading foliage must be lopped, that I too may have freedom to grow." *C. U. B. A. '55*

[নয়]

The choicest flowers were to be seen in the garden, and to the prettiest of these, little silver bells were fastened, in order that their tinkling might prevent any one from passing by without noticing them. Yes! Everything in the Emperor's garden was wonderfully well arranged; and the garden itself stretched so far that even the gardener did not know the end of it. Whoever walked farther than the end of the garden, however, came to a beautiful wood with very high trees, and beyond that to the sea. The tall trees went down quite to the sea, which was very deep and blue, so that large ships could sail close under their branches. *R. U. B. A. '51*

[দশ]

To the Arab Nation it was as a birth from darkness into light; Arabia first became alive by means of it. A poor shepherd people, roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world; a Hero-prophet was sent down to them with a word they could believe: See, the unnoticed becomes world-notable, the small has grown world-great, within one century afterwards, Arabia is at Grenada on this hand, at Delhi on that,—glancing in valour and splendour and the light of genius, Arabia shines through long ages over a great section of the world. Belief is great, life-giving. The history of a Nation becomes fruitful, soul-elevating, great, so soon as it believes.
R. U. B. A. (Special Paper) '54

[এগারো]

I sometimes look into the past for some set of memoirs out of which to make myself a story, but there are none in which I can recognize myself, none that contain my overflowing life. I realize then that I only live in each fresh succeeding moment. What people call 'withdrawing into oneself' is to me an impossible constraint; I can no longer understand the word 'solitude', to be alone with myself is to be nobody; I am peopled. For that matter, I am never at home save everywhere; and desire always drives me out.
D. U. B. A. '54

[বারো]

It is the imaginative people who suffer most from fear. Give them only a hint of peril, and their minds will explore the whole circumference of disastrous consequence. It is not a bad thing in this world to be born a little dull and unimaginative. You will have a much more comfortable time. And if you have not taken that precaution, You will do well to have prosaic person handy to correct your fantasies. Therein Donn Quixote showed his wisdom. In the romantic theatre of his mind perils rose like giants on every horizon, but there was always Sancho Panza on his donkey, ready to prick the bubbles of his master with the sword of his incomparable stupidity.

C. U. B. A. '54

[তেরো]

The Muhammadan community of Bengal owes a debt of gratitude to Nawāb Abdul Latif Bāhādur which it behoves it never to forget. He found it backward and apathetic, sunk in ignorance and prejudice and content to see itself surpassed in every walk of life by the non-Muslim community, helplessly clinging to its old ideals and traditions and obstinately refusing to recognize the march of events and the necessity of change. He left it awake and eager to regain its ground that had been lost, struggling manfully against great odds and assiduously equipping itself with the weapons which it had so long despised.

D. U. B. A. '57

[চোদ্দ]

A diary need not be a dreary chronicle of one's movements ; it should aim rather at giving a salient account of some particular episode, a walk, a book, a conversation It is a practice which brings its own reward in many ways ; it is a singularly delightful to look at old diaries, to see how one was occupied ten years ago ; what one was reading, the people one was meeting, one's earlier point of view And then further it has the immense advantage of developing style ; the subjects are ready to hand ; and one mav born, by diarizing, the art of sincere and frank expression.

C. U. B. A. '53

[পনেরো]

Who will care to assert that a few years hence he will be found still clinging to the attitude he adopts now ? A few years ago he probably held a different view, and held it equally firmly. In retrospect we can see that the tenacity of our beliefs is no measure of their accuracy. The fact that we have come to change our outlook is a good sign. Whether it be regarded as a progress or the reverse, however, what is inescapable is that beliefs can almost be dated.

They are events in our history, they are our land-marks. You can look back on that succession of finger-posts and recognise the *being* that was you gradually being transformed and culminating in the *being* that is you now. *C. U. B. A. '52*

[ষোলো]

It is worthy of note that those periods in human history in which power is invoked as the main support for carrying out national ambitions are not the ones marked by the best or the highest of human achievements. Rome was at her intellectual height before she entered upon the ruthless course of conquest and domination in Caesar's days, despite the glamour that her success in arms threw over her widely-extended dominions. Egypt produced her best works of art and literature before the extension of her dominions into Asia ; and Assyria, the greatest military power of antiquity was not a cultural force. It certainly cannot be said that the Germany after 1888 is greater in its intellectual achievements than the old Germany. *C. U. B. A. '51*

[সতেরো]

Freedom of thought is fundamental to Democracy. Thought precedes action, and without some degree of liberty in this respect progress of any sort would be impossible. Milton was right to prize it above all · 'Give me the right to know, to utter, and to argue freely according to the conscience, above all other liberties'. But thought is free by its own nature , what is essential is freedom to communicate one's own thoughts to others. Hence freedom of thought implies freedom of speech, and that implies freedom to print and to speak in public It was because of this fundamental character of the freedom of conscience that the demand for toleration was one of the chief motives in the creation of Democracy. *U. U. B. A. (Sup.) '51*

[আঠারো]

There is an incident which occurred at an examination during my first year at the high school, which is worth recording. Mr. Giles, the educational inspector, had come on a visit of inspection. He had set up five words to write as a spelling exercise. One of the words was 'Kettle.' I had mis-spelt it, the teacher tried to prompt me with the point of his boot, but I would not be prompted. It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbour's slate, for I thought that the teacher was there to supervise us against copying. The result was that all the boys except myself were found to have spelt each word correctly. Only I had been stupid. The teacher tried later to bring this stupidity home to me, but without effect. I never could learn the art of copying. *G. U. B. A. '51*

তৃতীয় খণ্ড

ভাব-সম্প্রসারণ ঃ ভাবার্থ ঃ সারাংশ ঃ বস্তুসংক্ষেপ ঃ ব্যাখ্যা ঃ গূঢ় মর্ম ঃ কেন্দ্রীয় ভাব ঃ ভাব-বিবৃতি

অবতরণিকা

[এক]

ভূমিকা

পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন পদ্যাংশ অথবা গদ্যাংশ হইতে ভাব-সম্প্রসারণ, ভাবার্থ, সারাংশ, বস্তুসংক্ষেপ, ব্যাখ্যা, ভাব-বিবৃতি ইত্যাদি লিখিবার প্রশ্ন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌টারমিডিয়েট্ ও বি. এ. পরীক্ষায় আসিয়া থাকে। এই প্রশ্নে থাকে পনেরো নম্বর। কিন্তু পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীগণ এই সামগ্রীগুলির সম্যক পরিচয় ও ইহাদের রচনা-পদ্ধতি জানে না বলিয়াই একটি লিখিতে বসিয়া লিখিয়া বসে অন্যটি। অবশ্য প্রশ্নকর্তাগণও প্রশ্নাদিতে ভাষা-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীগণের এই সামগ্রীগুলি সম্পর্কিত বোধশক্তিকে যাচাই করিয়া লইবার প্রয়াস পান। ফলে পরীক্ষামণ্ডপে ছাত্রছাত্রীগণ বড়ই বিপন্ন বোধ করে। তাই সর্বাগ্রে এই সামগ্রীগুলির স্বরূপ-পরিচয় নির্মাণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হইবার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য।

ভাব-সম্প্রসারণ

গোড়াতেই বলি ভাব-সম্প্রসারণের কথা। বীজাকারে যে ভাবটি কোন পদ্যাংশ অথবা গদ্যাংশের মধ্যে নিহিত থাকে, তাহাকে আরও বিস্তৃত, আরও সম্প্রসারিত, আরও স্ফীত করিয়া প্রকাশ করিবার নামই **ভাব-সম্প্রসারণ**। ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় Amplification of Idea অথবা Expansion of Idea। গভীর ভাব বা গূঢ় তত্ত্বকথাকে সংহত রচনার মধ্যে রাখিতে পারিলে ইহা সত্যই বিশিষ্ট সৌন্দর্যে বিমণ্ডিত হয়। ঠিক এই কারণেই আমাদের প্রবাদ-প্রবচনগুলির এত সৌন্দর্য, এত মাধুর্য। প্রচলিত ও স্বল্পপরিসর প্রবাদ-প্রবচনগুলির বাচ্যার্থ বা আভিধানিক অর্থ যাহাই হউক না কেন, উহাদের ভিতরকার অর্থ বা লক্ষ্যার্থই তো উহাদের আত্মা। উহাদের মধ্যে কি বিপুল ভাবই-না বীজের ন্যায় অবস্থান করে। এমনি ভাবে ছোট ছোট কবিতায়, বড় কবিতার অংশে অংশে, ছোট ছোট গদ্যাংশেও বিপুল ভাব ভ্রূণাকারে অধিষ্ঠান করে। ভাব-সম্প্রসারণ করিতে হইলে এই ভাববীজটিকে শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত এক বিরাট্ ভাববৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হয়। ভাব-সম্প্রসারণের বেলায় ইহাই সবিশেষ লক্ষণীয় যে, মূলভাবটি বুঝাইবার জন্য উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত হয় নাই এমন প্রসংগেরও অবতারণা করা হয়। 'ভাব-সম্প্রসারণ

কর'—এই নির্দেশটি 'মর্মবাণী বিস্তৃত কর', মর্মসত্য সম্প্রসারণ কর,' 'অর্থ সম্প্রসারণ কর,' 'ভাবার্থ সম্প্রসারিত কর,' ভাববিস্তার কর' ইত্যাদি রূপে প্রশ্নপত্রে লিখিত হয়।

অতঃপর ভাবার্থের কথা। উদ্ধৃতাংশের মধ্যে ব্যাপকভাবে, সাধারণরূপে যে মূলভাবটি সংগুপ্ত থাকে, তাহারই অর্থ লিখিতে বলা হয় বলিয়া এই সামগ্রীটির নাম **ভাবার্থ**। ভাবার্থে উদ্ধৃতাংশের কল্পনাবস্তু (Imagery) আদৌ থাকিবে না। উদ্ধৃতাংশের কোন বিশেষ নির্দিষ্ট ভাব নয়, নির্বিশেষ ব্যাপক ভাবটিই ভাবার্থে পরিস্ফুট করা হয়। উদ্ধৃতাংশের উপমা অলংকারাদি ভাবার্থ লিখিবার কালে বর্জন করিতে হয়। ভাবার্থে সাহিত্যশিল্পগত সৌষ্ঠব থাকা সমীচীন। ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় Sense।

ভাবার্থ

অনেকে মনে করেন, ভাবার্থ ও সারাংশ একই রকমের সামগ্রী। কিন্তু আকার ও প্রকার, কোনটিরই দিক দিয়া উভয়ে এক নয়, বিভিন্ন। ভাবার্থে নির্বিশেষ ব্যাপক ভাবটিরই অর্থ পরিস্ফুট করা হয়, কিন্তু সারাংশে কেবলমাত্র প্রধান ভাবটিই যুক্তিপরম্পরায় অভিব্যক্ত হয়। অর্থাৎ একটিতে হয় ভাবের অর্থ-পরিস্ফুটন, অপরটিতে হয় প্রধান ভাবের যুক্তিসংবলিত সার-সংকলন মাত্র। আবার ইহাও সবিশেষ লক্ষণীয় যে, সর্ব ক্ষেত্রেই সারাংশ উদ্ধৃতাংশের চেয়ে ক্ষুদ্রায়তন-বিশিষ্ট হইলেও, ভাবার্থের বেলায় ইহার আয়তন অনির্দিষ্ট। আয়তনের দিক দিয়া ভাবার্থ উদ্ধৃতাংশের চেয়ে ছোট বা বড়, অথবা সমানও হইতে পারে। তবে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীকে ভাবার্থ লিখিবার আয়তন সম্পর্কে প্রশ্নকর্তা সময়ে সময়ে নির্দেশ দিয়া থাকেন। 'ভাবার্থ লিখ', 'ভাবসত্য ব্যাখ্যা কর,' 'মর্মার্থ লিপিবদ্ধ কর' —এইরূপ প্রশ্ন থাকিলে অবশ্য ইহার আয়তন রচনা সম্পর্কে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীকে এক দিক দিয়া যেমন স্বাধীনতা দেওয়া হয়, অপর দিক দিয়া তেমনি তাহাদের বোধ-শক্তি ও মাত্রাজ্ঞান পরখ করা হয়। কিন্তু ভাবার্থের আয়তন ছোট, মাঝারি বা বড়, কিরূপ হইবে, সে সম্পর্কেও প্রশ্নকর্তা পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিয়া থাকেন : যেমন,— 'ভাবার্থ নিজ ভাষায় পরিস্ফুট কর,' 'ভাবার্থ বিশদভাবে ব্যক্ত কর', 'ভাবার্থ সংক্ষেপে লিখ' ইত্যাদি।

তারপরেই ধরা যাক্—সারাংশের কথা। উদ্ধৃতাংশের যে বিষয়টি নানা কথা, নানা যুক্তি, নানা দৃষ্টান্ত, নানা উপমা-অলংকার কল্পনা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে তাহারই একটি সংহত ক্ষুদ্র বাহুল্যবর্জিত রূপেরই নাম **সারাংশ**। ইহাতে উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত হয় নাই এমন কোন প্রসংগের অবতারণা তো চলিবেই না, এমন কি

সারাংশ

উদ্ধৃতাংশের অপ্রধান ভাবগুলি একেবারে পরিহার করিয়া কেবলমাত্র প্রধান ভাবটিকেই যুক্তিপরম্পরায় ব্যক্ত করিতে হয়। শাখা-প্রশাখা-সম অপ্রধান ভাবগুলির একেবারে বর্জন ও যুক্তিসংবলিত প্রধান

ভাবটিকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ—ইহাই সারাংশের মূল কথা। সারাংশের ইংরাজি নাম Substance। 'সারাংশ লিপিবদ্ধ কর'—এই নির্দেশটি 'মর্ম প্রকাশ কর,' 'মর্মবাণী লিপিবদ্ধ কর', 'মর্মসত্য লিখ' 'সারমর্ম লিখ,' ইত্যাদি রূপে প্রশ্নপত্রে লিখিত হইয়া থাকে।

সারাংশ ভাব-সম্প্রসারণের ঠিক বিপরীত কর্ম। উদ্ধৃতাংশের মূলভাবটিকে কল্পনাশক্তি ও যুক্তিশৃংখলার সাহায্যে বিশদভাবে বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করারই নাম ভাব-সম্প্রসারণ, কিন্তু সারাংশ লিখিবার কালে উদ্ধৃতাংশের যুক্তিপরম্পরাকে ও নানা কথার ভিতর হইতে কেবলমাত্র প্রধান ভাবটিকেই বাহির করিয়া লইতে হয়। মূলভাবের সহিত নানা কথা, নানা যুক্তি, নানা উপমা-অলংকার, নানা দৃষ্টান্ত জুড়িয়া ভাব-সম্প্রসারণ করা যায়, পক্ষান্তরে, নানা কথা, নানা বিষয়, নানা উপমা-অলংকার, নানা দৃষ্টান্তের ডালপালা ছাঁটিয়া দিয়া অর্থাৎ সম্প্রসারিত ভাবকে সংক্ষিপ্ত আকারে বদ্ধ করিয়া প্রধান ভাবটিকে প্রতিষ্ঠা করিলে সারাংশ-লিখন সমাধা হয়। ভাব-সম্প্রসারণ করিবার সময়ে ফাঁপাইয়া লেখা সহজতর, কিন্তু সারাংশ রচনাকালে স্বল্পায়ত করিয়া লেখা কঠিনতর। ভাব-সম্প্রসারণে নিজের ইচ্ছামত শব্দ ও বাক্যের আতিশয্য রাখিতে বাধা নাই। অপর পক্ষে, সারাংশ লিখিবার বেলায় এই সুযোগ নাই। তাই সারাংশ-লিখনের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণশক্তি প্রয়োগ করিয়া বেশ ওজন করিয়া শব্দবিন্যাস ও বাক্যগঠন করিতে হয়। অবশ্য ভাব-সম্প্রসারণের পদ্ধতিটি জানা থাকিলে ভাল হয়। কেন না,—ইহা পরোক্ষভাবে সারাংশ লিখিতে সাহায্য করে।

ভাব-সম্প্রসারণ ও সারাংশ-লিখনের মধ্যে পার্থক্য

অনেকের ধারণা, বস্তুসংক্ষেপ ও সারাংশ একই সামগ্রী। কিন্তু ধারণাটি ভ্রমাত্মক। উভয়ের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। **বস্তুসংক্ষেপে** প্রধান-অপ্রধান-নির্বিশেষে সকল ভাবই বিবৃত হয়। পক্ষান্তরে, সারাংশে কেবলমাত্র প্রধান ভাবটিই যথাযোগ্য যুক্তিপরম্পরায় প্রকট হয়। উভয়ের মধ্যে এই বৈসাদৃশ্যটুকু সবিশেষ লক্ষণীয়। তবে বস্তুসংক্ষেপ ও সারাংশ লিখিবার বেলায় এই দিক দিয়া সাদৃশ্য আছে যে, উদ্ধৃতাংশের সকল অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ, শব্দালংকার, ভাবাতিরেক ও বাগ্‌বাহুল্য একেবারেই বর্জন করিতে হয়। অল্প কথায় প্রধান ও অপ্রধান ভাবগুলিকে বস্তুসংক্ষেপে এবং কেবলমাত্র প্রধান ভাবটিকেই যুক্তিপরম্পরায় সারাংশে গুছাইয়া বলিতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই সামগ্রীর আয়তন উদ্ধৃতাংশ হইতে ছোট হইবে সত্য, তবে ক্ষুদ্রায়তন করিবার পদ্ধতিটি বিভিন্ন।[1] সারাংশ-লিখনে সাহিত্যশিল্পগত সৌষ্ঠব একান্তভাবে কাম্য, কিন্তু বস্তুসংক্ষেপে বিষয়গত সংহতিই সর্বাগ্রগণ্য। ইংরাজিতে বস্তুসংক্ষেপকে বলা হয়

বস্তুসংক্ষেপ ও সারাংশের মধ্যে পার্থক্য

Summary। 'বস্তুসংক্ষেপ কর'—এই নির্দেশটি 'বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে লিখ', 'সংক্ষেপে বিষয়বস্তু লিখ' ইত্যাদি রূপেও প্রশ্নপত্রে লিখিত হইয়া থাকে।

প্রশ্নপত্রে সময়ে সময়ে অপঠিত উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা লিখিবার নির্দেশও থাকে। পাঠ্যপুস্তক হইতে উদ্ধৃত কোন গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের ব্যাখ্যা লিখিতে হইলে, রচয়িতা ও রচনার নাম, প্রসংগ, উদ্ধৃতাংশের অর্থ, বিশিষ্ট ভাবপ্রকাশক বাক্য বা শব্দের প্রয়োগনৈপুণ্য, প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়ের উল্লেখাদি করিতে হয়। তবে, অপঠিত উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা করিবার কালে রচয়িতা বা রচনার নাম স্পষ্টভাবে জানা না থাকিলে দিবার প্রয়োজন নাই। অ-পূর্বপঠিত পদ্যাংশ বা গদ্যাংশের **ব্যাখ্যা** লিখিবার বেলায় উদ্ধৃতাংশের প্রধান-অপ্রধান-নির্বিশেষে সমগ্র ভাবেরই সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। অতঃপর ব্যাখ্যার শেষ অনুচ্ছেদটিতে উদ্ধৃতাংশের বিশিষ্ট ভাব-প্রকাশক শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগমাধুর্য বিশ্লেষণ করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা ছাড়া, উদ্ধৃতাংশে যদি কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয়ের উল্লেখ থাকে, তবে তাহাও ব্যাখ্যাত হওয়া চাই। এই ব্যাখ্যাকেই ইংরাজিতে বলা হয় Explanation। ব্যাখ্যা লিখিবার আয়তন সম্পর্কেও প্রশ্নকর্তা কখনও-বা নির্দেশ দিয়া থাকেন আবার কখনও-বা পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীর স্বাধীন বিচার-বিবেচনার উপরেও তিনি নির্ভর করেন। 'বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট কর', 'বিস্তৃত ব্যাখ্যা কর', 'আশয় বিশদ করিয়া সংক্ষেপে লিখ', 'ব্যাখ্যা কর' ইত্যাদি নির্দেশমূলক আয়তন সম্পর্কিত প্রশ্নাদির কথা এই প্রসংগে স্মরণীয়।

ব্যাখ্যা

ইহা ছাড়া, আরও কয়েক প্রকারের সামগ্রী আছে। **গূঢ় মর্ম** বা **ভাবসূত্র** বা **ভাবসংকেত**, যাহাকে ইংরাজিতে বলা হয় Gist, তাহা লিখিবার বেলায় নিছক বীজকল্প প্রধান ভাবের উল্লেখ থাকে। পক্ষান্তরে, সারাংশে প্রধান ভাবের সংক্ষিপ্ত সংহত পরিচয় থাকে আর ভাবার্থে নির্বিশেষে ব্যাপক ভাবটির অর্থ পরিস্ফুট করা হয়। সারাংশ এবং ভাবার্থ লিখিবার ক্ষেত্রে যুক্তিশৃংখলা থাকে সত্য, কিন্তু গূঢ় মর্ম রচনাকালে কোন রকমেরই যুক্তিশৃংখলা থাকে না। উদ্ধৃতাংশের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির সরল স্পষ্ট এবং অতীব সংক্ষিপ্ত নির্দেশই গূঢ় মর্ম রচনার লক্ষ্য। **কেন্দ্রীয় ভাব**, যাহাকে ইংরাজিতে বলা হয় Central Idea, তাহা লিখিবার বেলায় কেন্দ্রগত মূলভাবটি বিবৃত করিতে হয়। 'মর্মসত্য বিশদ কর', মর্মসত্য ব্যাখ্যা কর', 'কেন্দ্রীয় ভাব লিখ' ইত্যাদি প্রশ্নে কেন্দ্রগত মূলভাব-বিবৃতির আয়তন কিরূপ হইবে, তাহারই পরোক্ষ নির্দেশ দেওয়া থাকে। অবশ্য যেখানে 'ভাব বিবৃত কর' এইরূপ প্রশ্ন থাকে, সেখানে উদ্ধৃতাংশের প্রধান-অপ্রধান-নির্বিশেষে সমগ্র ভাবমণ্ডলেরই বিবৃতি লিখিতে হয়। ইহাই **ভাববিবৃতির মূল নীতি**।

গূঢ় মর্ম: কেন্দ্রীয় ভাব : ভাব-বিবৃতি

[দুই]

সার্থক ভাব-সম্প্রসারণ করিতে হইলে, তোমাদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি মনে রাখিতে হইবে:—(ক) ভাব-সম্প্রসারণ করিবার পূর্বে প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত পদ্যাংশ অথবা গদ্যাংশ মনোযোগসহকারে অন্তত চার বার পড়। (খ) প্রতিবারই পড়িবার কালে উদ্ধৃত অংশের ভিতরকার অর্থ তথা ভাববস্তুটি বুঝিবার চেষ্টা কর। (গ) প্রতিটি শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগ-সার্থকতা লক্ষ্য করিয়া সমগ্র উদ্ধৃতাংশটির যুক্তি-পরম্পরাগত অর্থ নিজের মনের মধ্যে ধারণা করিয়া ভাব-সম্প্রসারণ করিবার জন্য অগ্রসর হও। (ঘ) মূল ভাববস্তুর সংগে উদ্ধৃতাংশের প্রতিটি শব্দ ও ব্যাক্যাংশের যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র আছে তাহা তোমার লেখার মধ্যে ফুটাইয়া তোল। (ঙ) উদ্ধৃতাংশে যদি রূপক, উপমা প্রভৃতি অলংকার, কিংবা উদাহরণাদি থাকে, তাহা হইলে ভাব-সম্প্রসারণের বেলায় তাহাদিগের প্রয়োগ-সার্থকতা ফুটাইয়া তোল। (চ) উদ্ধৃতাংশের সহিত ইতিহাস-পুরাণ-গল্প-উপমার যদি কোন ভাবগত সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে ভাব-সম্প্রসারণ কালে তাহার উল্লেখ কর। (ছ) ভাবানুষংগের দরুণ অর্থাৎ ভাবের দিক দিয়া উদ্ধৃতাংশের সহিত কোন কবিতা বা কবিতাংশ, গদ্য-বাচন, কিংবা প্রবাদ-প্রবচনের মিল বা সাদৃশ্য থাকিলে তাহাও ভাব-সম্প্রসারণের বেলায় জুড়িয়া দাও। (জ) ভাব-সম্প্রসারণ করিবার কালে উদ্ধৃতাংশের তিনটি অংগকে ফুটাইয়া তোল। এই তিনটি অংগ হইতেছে—প্রথম, বাচ্যার্থ বা আভিধানিক অর্থ, দ্বিতীয়, লক্ষ্যার্থ বা অন্তর্নিহিত ভাববস্তু, তৃতীয়, লক্ষ্যার্থ বুঝাইবার উপযোগী কোন দৃষ্টান্ত।

ভাব-সম্প্রসারণ সম্পর্কে ইতিবাচক আটটি নির্দেশ

ভাব-সম্প্রসারণ করিবার কালে এই ইতিবাচক নির্দেশগুলি ছাড়া কয়েকটি নেতিবাচক নির্দেশও মনে রাখিবে। নেতিবাচক নির্দেশগুলি এইরূপ:—(ক) উদ্ধৃতাংশের মূল ভাববস্তুটি লিখিবার কালে এই মূলভাবের সহিত একান্তভাবে সম্পর্কিত কোন কথা বাদ দিও না, আবার নিঃসম্পর্কিত কথার অবতারণাও করিও না। (খ) উদ্ধৃতাংশের কথার কথার মানে দিয়া অথবা মূলের সহিত সম্পর্কিত নয় এমন শব্দাদির সম্মেলন ঘটাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করিও না। (গ) ভাব-সম্প্রসারণের আয়তন প্রবন্ধের ন্যায় বড় বা সারাংশের ন্যায় ছোট করিও না। অর্থাৎ সত্যকার ভাল ভাব-সম্প্রসারণ লিখিতে বিশ একুশ ছত্রের বেশী লিখিবার প্রয়োজন নাই। তবে যেখানে প্রশ্নকর্তা ভাব-সম্প্রসারণ করিবার পংক্তিসংখ্যা নির্দেশ করিয়া দেন, সেখানে তাঁহার কথা অবশ্যই মানিবে। (ঘ) একই কথা বারবার

ভাব-সম্প্রসারণ সম্পর্কে নেতিবাচক ছয়টি নির্দেশ

বিভিন্ন বাক্যের মধ্য দিয়া লিখিবার চেষ্টা করিও না। কেন না,—এইরূপ অপপ্রয়াসে যুক্তি-শৃংখলা নষ্ট হয়। (ঙ) কোন শব্দ বা বাক্যাংশের যদি আভিধানিক অর্থ তোমার মনে না জাগে, তাহা হইলে নিরাশ হইও না। মূল উদ্ধৃতাংশটি বারবার পড়িতে পড়িতে আসল ভাববস্তুটি মনের গভীরে প্রতিবিম্বিত হইবেই। (চ) 'কবি প্রার্থনা করিতেছেন,' 'কবি বলিতেছেন' ইত্যাদি ধরণের কথা ভাব-সম্প্রসারণ কালে কখনও লিখিবে না।

ভাবার্থ সম্পর্কে ইতিবাচক আটটি নির্দেশ

সার্থক ভাবার্থ লিখিতে হইলে তোমরা নিম্নলিখিত উপদেশানুযায়ী কার্য করিবে:—(ক) ভাবার্থ লিখিবার আগে প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত পদ্যাংশ অথবা গদ্যাংশ মনোযোগসহকারে অন্তত বার চারেক পড়। (খ) প্রতিবারই পাঠ করিবার সময়ে উদ্ধৃত অংশের অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝিবার চেষ্টা কর। (গ) প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগ-সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমগ্র উদ্ধৃতাং-শের যুক্তিপরম্পরাগত অর্থ উপলব্ধি কর ও ভাবার্থ লিখিবার জন্য অগ্রসর হও। (ঘ) উদ্ধৃতাংশের নির্বিশেষ ব্যাপক ভাবটির অর্থ ভাবার্থে ফুটাইয়া তোল। (ঙ) ভাবার্থ-রচনায় সাহিত্য-শিল্পগত সৌষ্ঠব রক্ষা কর। (চ) ভাবার্থের প্রারম্ভবাক্যটিতেই উদ্ধৃতাংশের মূলভাবটি প্রকট কর। প্রারম্ভবাক্যের ভাব ও ভাষার অপরূপ মেলবন্ধন যেন পরীক্ষক-পরীক্ষিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। (ছ) উদ্ধৃতাংশ যদি কথোপকথনের ভংগীতে লিপিবদ্ধ থাকে, তবে তাহার ব্যাপক নির্বিশেষ ভাবটির অর্থ নিজের জবানিতে ফুটাইয়া তোল। (জ) উদ্ধৃতাংশের মধ্যে কোন উদ্ধৃতি থাকিলে তাহারও ভাবার্থ লিপিবদ্ধ কর।

অবশ্য ভাবার্থ-লিখনের জন্য এই ইতিবাচক নির্দেশসমূহ ছাড়া কয়েকটি নেতিবাচক নির্দেশ তোমরা মনে রাখিবে:—(ক) উদ্ধৃতাংশের মূলভাবটির অর্থ লিখিবার সময়ে, ইহার সহিত নিঃসম্পর্কিত কোন কথার উল্লেখ করিও না। (খ) উদ্ধৃতাংশের কথাগুলিই তোমার উত্তরপত্রে সন্নিবেশিত করিবার অথবা উহাদের নিছক আভিধানিক অর্থ লিখিবার প্রয়াস পাইও না। (গ) একই কথা বার বার বিভিন্ন বাক্যের মধ্য দিয়া লিখিবার চেষ্টা করিও না। (ঘ) ভাবার্থের আয়তন

ভাবার্থ সম্বন্ধে নেতিবাচক ছয়টি নির্দেশ

উদ্ধৃতাংশের চেয়ে ছোট বা বড় হওয়া ছাড়া সমান সমানও হইতে পারে। মোটের উপর, উদ্ধৃতাংশের মূলভাবটি সংযত ও সংহত রূপে পরিস্ফুট করিতে হইলে যেরূপ আয়তন প্রয়োজনীয়, তাহা অবশ্যই গ্রহণীয়। অবশ্য প্রশ্নকর্তা ভাবার্থের আয়তন সম্পর্কে যদি কোন নির্দেশ দেন তো তাহা অবশ্যই পালনীয়। (ঙ) উদ্ধৃতাংশের মূল

ভাবটি বুঝাইবার জন্য বাহির হইতে কোন তথ্য, কোন দৃষ্টান্ত, কোন কল্পনাবস্তু ভাবার্থ-লিখনের মধ্যে আমদানী করিও না। (চ) উদ্ধৃতাংশের সহিত কোন পদ্যাংশ বা গদ্যাংশের ভাবগত সাদৃশ্য থাকিলে তাহার উল্লেখ আদৌ করিও না।

সার্থক **সারাংশ** লিখিবার কালে তোমরা নিম্নলিখিত উপদেশগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকিবে। উপদেশগুলি এইরূপ :—(ক) উদ্ধৃতাংশটি অন্তত বার চারেক অতীব যত্নের সহিত পাঠ কর। আর সেই সংগে উদ্ধৃতাংশটির সমগ্র বক্তব্যটি বুঝিবার চেষ্টা কর। (খ) তৃতীয় বার পাঠকালে বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্তবপরম্পরা ও ভাববস্তু বুঝিয়া লইয়া তাহাদের নিম্নে দাগ কাট। (গ) বক্তব্য বিষয়ের দাগ-দেওয়া এই যে গুরুত্বপূর্ণ স্তবপরম্পরা ও ভাববস্তু—ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার করিয়া বেশ একটি যুক্তিসিদ্ধ ক্রম নির্ধারণ করিয়া উত্তর লিখিবার জন্য অগ্রসর হও।

সারাংশ-লিখন সম্পর্কে ইতিবাচক এগারোটি নির্দেশ

(ঘ) সারাংশের প্রারম্ভবাক্যটি এমন ভাবে লিখিবে, যাহাতে গোড়াতেই উদ্ধৃতাংশের **মূলভাবটি** প্রকট হয়। ইহাতে ভাব ও ভাষার ঘন সন্নিবেশ-মাধুর্য ও বিস্ময়কর মৌলিকতা সঞ্চারিত হওয়া চাই। (ঙ) মূল ভাববস্তু বুঝিবার ব্যাপারে অসুবিধা না ঘটিলে অপ্রধান ভাবগুলি বাদ দাও। অথবা মূল ভাববস্তু যদি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত থাকে, তাহা হইলে অপ্রধান ভাবগুলি একেবারেই পরিত্যাগ কর। (চ) অবাস্তব প্রসংগমাত্রই বর্জন কর। (ছ) নিছক প্রধান যুক্তিগুলিই রাখ, আর অপ্রধান যুক্তিগুলি ছাঁটিয়া দাও। (জ) মূল উদ্ধৃতাংশের অন্তর্গত অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ, সর্বপ্রকার শব্দালংকার ও অর্থালংকার এবং দৃষ্টান্ত বর্জন কর। তবে,—মূল উদ্ধৃতাংশে যদি দৃষ্টান্তটি ফলাও করিয়া লেখা থাকে, সারাংশ-লিখনের সময়ে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ কর। (ঝ) সারাংশ-লিখনের বিষয়বস্তু যদি কথোপকথনের আকারে ব্যক্ত থাকে, তবে তাহা তোমার নিজের জবানিতে সংক্ষেপে প্রকাশ কর। (ঞ) মূল উদ্ধৃতাংশের মধ্যে যদি কোন উদ্ধৃতি থাকে তো সেই উদ্ধৃতির সংক্ষিপ্ত ভাবটুকু লিখ। (ট) সারাংশ লিখিবার পরে তোমার লেখা উত্তরটি পড এবং মূল বক্তব্য বিষয়ের কোন প্রধান অংশ বাদ পড়িয়াছে কিনা, তাহাই যাচাই করিয়া লইবার জন্য সাবধানতা-সহকারে মূল উদ্ধৃতাংশটি লক্ষ্য কর।

উপরিলিখিত ইতিবাচক নির্দেশ ছাড়াও নিম্নলিখিত নেতিবাচক নির্দেশগুলি স্মরণীয় :—(ক) সারাংশ-লিখনের সময়ে কোন জটিল বা অস্পষ্ট ভাবসম্পন্ন বাক্য লিখিবে না। (খ) মূল উদ্ধৃতাংশ হইতে বাক্য অথবা বাক্যাংশাদি বেমালুম লইয়া তোমার উত্তরের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবে না। মূলের শব্দাদি গ্রহণ করিও না। তবে, মূল উদ্ধৃতাংশের যে সকল শব্দে ভাববস্তুটি ঘনীভূত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে,

তাহা বাদ দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। (গ) নিছক কথার কথার মানে জুড়িয়া সারাংশ লিখিও না। (ঘ) ভাব ও ভাষার অসারতা আতিশয্য ও পুনরুক্তিকে আদৌ আমল দিবে না। (ঙ) কোন বিশেষ শব্দ বাক্যাংশ অথবা বাক্যের অর্থ যদি নাই বুঝিতে পার তো নিরাশ হইও না। মনে রাখিবে, সমগ্র উদ্ধৃতাংশের প্রধান ভাববস্তু প্রকাশই তোমার লক্ষ্য, অপ্রধান ভাবগুলি তোমার লক্ষ্যীভূত নয়। (চ) উদ্ধৃতাংশের অন্তর্গত কোন বিশেষ ভাব বা ভাবনিচয় ব্যাখ্যা অথবা বিশদ করিবার প্রয়াস পাইও না। (ছ) মূলের বক্তব্য বিষয়ের পারম্পর্য একেবারে অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিও না। (জ) সারাংশ-লিখনের আয়তন সম্পর্কে মাথা ঘামাইও না। প্রধান ভাবকথা প্রকাশই তোমার লক্ষ্য। উদ্ধৃতাংশের প্রকৃতির উপরে সারাংশের আয়তন নির্ভর করে। সাধারণত চিন্তামূলক উদ্ধৃতাংশের সারাংশ অপেক্ষা বর্ণনামূলক উদ্ধৃতাংশের সারাংশ ছোট হয়। উদ্ধৃত পদ্যাংশে সাধারণত মূলভাব একটিই থাকে, আবার অলংকার-বাহুল্য এবং পুনরাবৃত্তিও অনেকখানি স্থান জুড়িয়া অবস্থান করে—তাই গদ্য-রচনা অপেক্ষা পদ্য-রচনার সারাংশ বেশ ছোট হয়। তোমার লেখা সারাংশ যেন মূল উদ্ধৃতাংশের দৈর্ঘ্যকে কোনক্রমেই ছাপাইয়া না যায়। (ঝ) সারাংশ একেবারে ছোট করিয়া লিখিও না। সারাংশ-লিখনের মানে গূঢ় মর্ম রচনা নয়।

সারাংশ-লিখন সম্পর্কে নেতিবাচক নয়টি নির্দেশ

প্রথম অধ্যায়

ভাব-সম্প্রসারণ

আদর্শমালা

[এক] ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের মধ্যে যদি কিছু পরিমাণ কপটতাও থাকে, তবে সেই পরিমাণ কপটতা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। **ক. বি. মাধ্যমিক (অতি)'৫১**

এমন এক জাতের লোক এই পৃথিবীতে আছে, যাহারা স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়া মুখে যাহা আসে, তাহা বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ তো করেই না, বরং গর্বই অনুভব করে। তাহারা মনে করে, বাক্যের ঐ যে সংযম, যাহা ভদ্রসমাজে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার নামে সুবিদিত, তাহা কপটতারই নামান্তর। কিন্তু সমাজে যেখানে সকলের মন সমান নয়, তাহার অনুষ্ঠানে সদ্ভাবমূলক ও সুরুচিব্যঞ্জক লোকব্যবহার করিতে হয়। লোকের সংগে এই যে সদ্ব্যবহার, ইহারই নাম ভদ্রতা ও শিষ্টাচার। সত্য কথা বলিতে-

কি, মন ও মুখের মধ্যে একটা পাকা বাঁধ বাঁধিয়া রাখিতে না পারিলে দুই দিনও সমাজ টিকিতে পারে না। বাক্‌সংযম সব চেয়ে বড় জিনিস। বেশী করিয়া তলাইয়া বুঝিয়া লাভ নাই। কেন না,—অনেক সময়েই কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়ে। ফলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, সমাজে দেখা দেয় অকল্যাণ। তাই বাক্‌সংযমের মধ্যে কিছুটা কপটতা থাকিলেও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের মুখ চাহিয়া তাহা অবশ্যই বরণীয়।

[দুই] জাতীয় জীবনে সন্তোষ এবং আকাংক্ষা দুইয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ জন্মে। **ক. বি. মাধ্যমিক (অতি) '৫১**

অধিক লাভের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যখন কোন জাতি সাত্ত্বিক নিরাসক্ত ভাবে নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, জাতীয় জীবনের ঐ উন্নত অবস্থার মূলে রহিয়াছে সন্তোষ। কিন্তু জাতি যদি এই ভাবে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে জাতীয় জীবনে অভাববোধ না থাকায় কর্মোদ্যম নষ্ট হইয়া যায়। নিত্য নূতন অভাবের তাড়নাই নব নব সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়। প্রয়োজন-বোধের তাগিদই জাতিকে সক্রিয় রাখে। তাইতো দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—'অসন্তোষ উন্নতির মূল। ইহা কার্যটিকে উত্তেজিত করে, সভ্যতাপথ প্রশস্ত করে। কি রাজ-নৈতিক, কি সামাজিক, কি পারিবারিক উন্নতি সকলের মূলেই এই অসন্তোষ।' সন্তোষের আতিশয্য যেমন জড়ত্ব ও কর্মবিমুখতার কারণ-স্বরূপ এই জাতীয় জীবনকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লয়, অত্যাকাংক্ষা বা দুরাকাংক্ষার তাড়নাতেও তেমনি জাতি দিশাহারা হইয়া ক্ষমতার অতীত অনেক অকাজের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আকাংক্ষার পর আকাংক্ষা বাড়িয়া গেলে, ইহার নিবৃত্তি না ঘটিলে, 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব'। আগুনে ঘি ঢালিলে যেমন আগুন না নিবিয়া আরও দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠে, আকাংক্ষার আগুনও তেমনি একটি আকাংক্ষা পূর্ণ হইলে নূতনতর আকাংক্ষার শিখা বিস্তার করিয়া দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠে। উচ্চাকাংক্ষা পরিণতি লাভ করে দুরাকাংক্ষায়। সুতরাং সন্তোষের আতিশয্যের ন্যায় অতি-আকাংক্ষাও বর্জনীয়।

[তিন] অধিক বয়স না হইলে অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হয় না। কিন্তু ভয়ের সঞ্চার জন্মাবধিই হইয়া থাকে। **ক. বি. মাধ্যমিক '৫১**

জন্মগ্রহণসূত্রে জীব প্রাণ-ব্যতিরেকে আরও দুইটি জিনিষ পায়—একটি, দেহ এবং অপরটি, মন। শৈশবে জীব দেহকে লইয়াই, প্রবৃত্তির দাস হইয়াই, কালাতিপাত করে। কিন্তু ঐ জীবশিশুই সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে পড়িয়া কালক্রমে আপন অন্তরের মধ্যে দয়ামায়া, স্নেহমমতা প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিগুলি আত্মসাৎ করিয়া মনের দিক দিয়া সমুন্নত হয়। ভয় তো দেহগত ব্যাপার। তাই আত্মরক্ষার প্রেরণাবশে

অত্যন্ত নিরাপদ ও সুকোমল আশ্রয় পাইবার আশায় জীবশিশু মাতৃক্রোড় ভালবাসে। এমন কি, জৈব প্রবৃত্তির নিবৃত্তিসাধনের ক্ষেত্রে জননীর অভাবে যদি ধাত্রীমাতাও মিলে; তাহাতেও জীবশিশুর আপত্তি নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, স্বার্থপর জীবশিশুর অন্তরে সূক্ষ্মতর বৃত্তি সত্যই সুষুপ্ত। কিন্তু স্নেহ জিনিষটি স্বতঃস্ফূর্ত, দান-প্রতিদানের অতীত ও অনপেক্ষ। অন্তরের অন্তরতম কোণে, মনের নিভৃততম প্রদেশে ইহা উৎসরূপে থাকিয়া এই দুঃখের ধরণীতে জীবনকে রসায়িত করিয়া তুলে। তাই দেখি,—যতই দিন যায়, জীবের বয়স যতই বাড়িতে থাকে, এই স্নেহ যেন লক্ষকোটি ধারায় আত্মপরনির্বিশেষে সকলেরই উপর হয় বর্ষিত।

[চার]

কে লইবে মোর কায, কহে সন্ধ্যা-রবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

ক. বি. মাধ্যমিক (অতি) '৪৯ ; ব. এ. '৩৮ ; গৌ. বি. বি. এ. '৫১

শেষ বিদায়ের আগে আলো বিকিরণের ভার কে লইবে, সন্ধ্যা-রবি ইহাই সবাইকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন। সকলে নিরুত্তর। এমন সময়ে ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপ সবিনয়ে নিবেদন করে, 'প্রভু, আমার এই ক্ষীণ শিখায় যেটুকু আলো দান করিতে পারি, আমি তাহা যথাসাধ্য করিব।'

এই স্বল্পপরিসর জীবনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত কর্তব্যের শৃংখলেই-না মানুষ আবদ্ধ। সেই মানুষের শক্তিও আবার সীমাবদ্ধ, তাহাও সকলের একরূপ নয়। কিন্তু তাহাতেই-বা কি আসে যায়! কোন কর্তব্য, যত বৃহৎ, যত ক্ষুদ্রই হউক এবং সেই কর্তব্যপালনের শক্তিও যাহার যেমনই থাকুক, কর্মে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও একাগ্রতার মূল্যবিচারই সত্যকার বিচার। কর্মের আহ্বান যখন আসে, তখন আমাদের অনেকেই নানা হিসাব-নিকাশের মুসাবিদায় বসিয়া যায়, লাভ-ক্ষতির শক্তি-অশক্তির অংক কষিতে শুরু করে,—কর্তব্যপালনে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু মানুষ অপ্রমেয় শক্তির অধিকারী নয়—ইহা জানিয়া আত্মশক্তি-সচেতন যে-মানুষ নিছক ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাকে সম্বল করিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল কর্মের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে, সে-ই যথার্থ কর্মী, সে-ই খাঁটি মানুষ। সুতরাং কোন কর্তব্য-কর্মের বিচারে সফলতা বা বিফলতার বিচারই বড় কথা নয়, সেই কর্তব্যপালনের সাহসই গণনীয়—সামর্থ্যের ক্ষুদ্রতা বা অসীমতা নয়, সামর্থ্য-প্রয়োগের দক্ষতাই প্রশংসার্হ। রাত্রির অন্ধকারে সূর্যের বিপুল কিরণধারা ঢালিবার শক্তি কাহারই-বা আছে! ইহা জানিয়া, আপন তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও মাটির প্রদীপ কর্তব্যপালনের দায়িত্ব লইয়াছে।

[পাঁচ] পেঁচা রাষ্ট্র করে দেয় পেলে কোন ছুতা—
জান না আমার সংগে সূর্যের শক্রতা ?

ক. বি. বি. এ. মাধ্যমিক (বিকল্প)'৫১

পেঁচা দিনের আলো সহ্য করিতে পারে না, রাত্রির অন্ধকারে সে আত্মগোপন করিয়া থাকে। সুতরাং সূর্যের সংগে শক্রতা ছাড়াও সূর্যের আলোক যে তাহার দৃষ্টির পীড়াদায়ক।

যে ব্যক্তি নীচাশয়, অতিশয় ক্ষুদ্রমনা, তাহার দৃষ্টির আবিলতা হৃদয়ের সংকীর্ণতা যে মহত্তো মহীয়ানের সংস্পর্শকে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! চারিদিকে দুর্বলতা ও হীনতা, হৃদয়-মনের নীচতা ও ক্ষুদ্রতা ঢাকিবার জন্যই যে সে কেবলমাত্র উচ্চাশয় ব্যক্তির মহত্ত্ব ও চরিত্রশক্তিকে খর্ব করিতে চায় তাহা নয়, যাহা-কিছু বিরাট ও সংকীর্ণতার পরিপন্থী এবং মনুষ্যত্বের নিদান, তাহারও প্রতি একটা সহজাত বৈরভাব সে পোষণ করে। এই কারণেই বড়োর সংগে একটা কাল্পনিক শক্রতা সৃষ্টি করিয়া ছোটো আত্মশ্লাঘা বোধ করিয়া থাকে। কাল্পনিক শক্রতা এই জন্য যে, সত্যকার মহৎস্বভাব ও উদারচরিত ব্যক্তি কখনও ঈর্ষাপরায়ণ হয় না, কাহারও প্রতি সে শক্রভাবাপন্ন হয় না। ক্ষমা ও করুণা সেই চরিত্রকে শোভন-সুন্দর করিয়া তুলে।

[ছয়] প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্-ধিক্ করে তারে কাননে সবাই ;
সূর্য উঠি' বলে তারে, ভালো আছ, ভাই ? ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬,৪৮

প্রাচীরের গায়ে ফুটিয়াছে ছোট্ট একটি অনামা ফুল। তাহার না আছে রূপ-গন্ধ, না আছে আভিজাত্য-গৌরব। সযত্নরচিত কাননের ফুলেদের কত রূপ! কিই-না তাহাদের দেহ-সৌষ্ঠব! তাই বুঝি গরবিনীরা ঐ অযত্নবর্ধিত ফুলটির প্রতি এমন কৃপাকটাক্ষ হানে, তাহাকে দেয় ধিক্কার! কিন্তু তাহাতেই বা কি! প্রভাতের অরুণ তাহাকেই জানায় সস্নেহ প্রথম অভিনন্দন, কিরণ-সম্পাতে প্রথম চুম্বন আঁকিয়া দেয় তাহারই ললাটে।

সংসারে উদারচরিতদের ইহাই তো রীতি। তাঁহারা সমাজে ধন মান আভিজাত্যের মানদণ্ডে মানুষকে বিচার করেন না,—আপন হৃদয়ের মহত্ত্বে ও উদারতায় সকল মানুষকে সমজ্ঞানে বরণ করিয়া লন। কিন্তু যাহারা ক্ষুদ্রচেতা, মানুষের গড়া উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অনভিজাত ভেদবুদ্ধিই তাহাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন, তাহাদের বিচারশক্তিকেও করিয়া দেয় পংগু। কাননের ফুল যেমন আভিজাত্যগর্বে, বর্ণ ও গন্ধের মিথ্যা মোহে প্রাচীরের ফুলকে সগোত্র বলিয়া চিনিতে চা না, আপন জন

বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে, ক্ষুদ্রমনা সংকীর্ণচেতা ব্যক্তিও তেমনি ঐশ্বর্য আভিজাত্য ও বংশগৌরবের অলীক মোহে স্বজন-পরিজনকে ঘৃণায়-অবহেলায়, বিদ্রূপে-লাঞ্ছনায় পীড়িত করিয়া তোলে। কিন্তু উদারচরিত মহৎপ্রাণ ব্যক্তি অকৃপণ সূর্যালোকের মত উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল মানুষকে প্রাণের প্রীতিরসে সিঞ্চিত করিয়া থাকেন, উদারতার বৃহৎ ক্ষেত্রে সকলকেই সমজ্ঞানে হৃদয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া আপনিই ধন্য হন। জাগতিক যত-কিছুর যথার্থ মূল্যজ্ঞানের ফলে তাঁহার হৃদয়ে যে বিস্ফারণ হয়, যে আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহাতে সকল ভেদাভেদ-জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, সমগ্র জগৎ সেই হৃদয়ে আসিয়া কোলাকুলি করিতে থাকে। সংসার ও সমাজের মিথ্যা উচ্চ-নীচ-ভেদের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে তিনি তাঁহার শুচি-শুভ্র চরিত্রমাহাত্ম্যে সহজে অতিক্রম করিয়া যান, মানুষ হিসাবে মানুষের মহত্ত্বকে স্বীকার করিয়া, আপন অন্তরের অকলুষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আপনিই গৌরবান্বিত বোধ করেন—দীনদরিদ্র, খ্যাতিপ্রতিপত্তিহীন স্বজন-প্রতিবেশীকে ভ্রাতৃস্নেহে বুকে তুলিয়া লইয়া যেন তাহাদিগকে নয়, আপনাকেই সার্থক জ্ঞান করেন। এ যেন স্বামীজীর সেই বাণীই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়—দানগ্রহীতার সম্মুখে নতজানু হইয়া দানগ্রহণের জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করিতে হয়, তিনি কৃপা করিয়া দান গ্রহণ করিলে তবেই-না দাতার দান সার্থক হইয়া উঠে।

[৯৯] ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যংগ করে,
ধ্বনি-কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

ক. বি. মাধ্যমিক '৪৪, (বিকল্প) '৫২

ধ্বনিই প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। কিন্তু পাছে এই সত্যটুকু শ্রোতাদের নিকট ধরা পড়িয়া যায় অর্থাৎ প্রতিধ্বনি যে স্বয়ম্ভু নয়, ঐ ধ্বনি আছে বলিয়াই সে আছে এ সত্য গোপন করিবার জন্য সে ধ্বনির এমন আশ্চর্য অনুকরণ করিয়া থাকে যে, নিজেকেই ধ্বনি প্রতিপন্ন করিয়া সে যেন ধ্বনির নিকটে তাহার অস্তিত্বের সকল ঋণ মুছিয়া ফেলিতে চায়। আসলকে ব্যংগ করিয়া নকলের আসল সাজিবার এহেন প্রয়াস নিতান্তই উপহাসাস্পদ।

সমাজে এমন একদল মানুষ আছে, যাহারা সদাশয় মহৎ ব্যক্তির দয়া ও উপকারকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠে। তাহাদের জীবনে যাহা-কিছু গৌরব বা সাফল্য, তাহার মূলে ঐ সকল মহদাশয় ব্যক্তির অকপট আনুকূল্য এবং অকৃপণ ঔদার্য এমন গূঢ়-রসসঞ্চারী হইয়া থাকে যে, সেই ঋণ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই কারণেই অর্থাৎ উপকারীর ঋণ অবশ্য স্বীকার্য বলিয়াই যেন উপকৃত ব্যক্তি উপকারকের বিরুদ্ধে অন্তরে অন্তরে একটা গভীর বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করে। ঐ উপকার

গ্রহণ তাহার হৃদয়ে একটা অক্ষয় ক্ষতরূপে চিরকাল জড়াইয়া থাকে। এই কারণেই তাহার ঐশ্বর্য মান ও প্রতিপত্তির মূলে কোন ব্যক্তির আনুকূল্য ও দয়ার অপরিশোধ্য ঋণ যে রহিয়াছে, এরূপ বিন্দুমাত্র ইংগিতও সে সহ্য করিতে পারে না। তাই জীবনের সেই কলংকময় অধ্যায় নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার জন্য উপকৃত ব্যক্তি শুধু অকৃতজ্ঞতা তো দূরের কথা, এমন কি কৃতঘ্নতারও শরণাপন্ন হয়—উপকারীর দান বা ঋণ শুধু অস্বীকার করা নয়, তাহাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে নানা জঘন্য উপায়ও অবলম্বন করিয়া থাকে। উপকারীর উন্নত মহৎ চরিত্রকে নিন্দার দ্বারা কলুষিত করিতে সে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু উপকারীর উপকার স্বীকারে সত্যই অগৌরবের যে কোন কারণ নাই, বরং তাহাতে হৃদয়ের বিস্ফারণ ও মহত্বই সূচিত করে—এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিলে অকৃতজ্ঞতা বা কৃতঘ্নতাকে আশ্রয় করিতে হয় না। জীবনে যাহা-কিছু সুখ-সমৃদ্ধি সে অর্জন করিয়াছে, যে খ্যাতি ও যশের অধিকারী সে হইয়াছে, তাহাতে পরানুকূল্য বা পরঋণ স্বীকারের সংগে যে পরিমাণ আত্মশক্তির সংযোগ ঘটিয়াছে, তাহার গৌরবও তো কম নয়—ইহাই সত্যকার উপলব্ধি।

[আট] কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকাব থলিবে—
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কি রে।
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে॥ ক. বি. মাধ্যমিক '৪২

ভিক্ষার ঝুলি এবং টাকার থলি একই পদার্থে নির্মিত। দুয়ের উপাদানে সামান্যতা আছে, কিন্তু কৌলীন্যে কতই-না তফাৎ! এই ভিক্ষার ঝুলি যখন সগোত্রতার দাবিতে টাকার থলির আত্মীয়তা যাচ্ঞা করে, তখন ব্যংগ এবং লাঞ্ছনাই ঘটে তাহার ভাগ্যে। কেন না,—ভিক্ষার ঝুলি শূন্য, টাকার থলি পূর্ণ; শূন্যতা এবং পূর্ণতার মধ্যে বৈষম্য থাকিবেই—তাই কুটুম্বিতাও প্রায় অসম্ভব।

এই সংসারে অবয়ব ও জন্মের দিক দিয়া মানুষে মানুষে সত্যকার কোন ভেদ নাই, কোন বৈষম্য নাই। জীবনের ধারা দেশে ও কালে খণ্ডিত হইলেও যে মানবজাতি সেই ধারাকে বহন করিতেছে, তাহা অখণ্ড ও এক। জন্মলগ্নে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই বটে, যেমন ভিক্ষার ঝুলি ও টাকার থলিতে সত্যকার কোন বৈসাদৃশ্য নাই, তথাপি জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে—সমাজে ও রাষ্ট্রে, মানুষের গড়া বিধি-বিধানে, আকাশচুম্বী ব্যবধানের প্রাকার গড়িয়া উঠিয়াছে। এক দিকে দীন-দরিদ্রের শত লাঞ্ছনাপূর্ণ ধিক্‌কৃত জীবন, অন্য দিকে ধনীর অফুরন্ত ঐশ্বর্য-বিলাস; এক দিকে সর্বহারার মর্মভেদ হাহাকার, অপর দিকে প্রাচুর্যের অট্টহাসি।—মনে হয়,

দরিদ্র এবং ধনী এক জাতের মানুষ নয়। দীন-ভিখারী যখন ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে বহন করিয়া ধনীর দুয়ারে ভিক্ষার জন্য মাগিয়া ফিরে, যেন বলিয়া উঠে—'ওগো ধনীর দুলাল, একবার চাহিয়া দেখ, আমি তোমারই মত মানুষ, আমরা এক মানুষ জাতিরই বংশধর, তোমার ঐ টাকার থলিতে আর আমার এই ভিক্ষার ঝুলিতে কোন তফাৎ নাই'—তখন ঐশ্বর্যের বিদ্রূপে দারিদ্র্যের কণ্ঠস্বর যায় ডুবিয়া। জীবনের বৃহৎ ক্ষেত্রেই যে অর্থের বৈষম্য অনর্থতার কারণ হইয়াছে তাহা নয়, আমাদের পারিবারিক, সামাজিক আত্মীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেও একই নীতি মানুষে মানুষে দুর্লংঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। স্নেহ মমতা ও হৃদয়ের মধুর সম্পর্ককে আচ্ছন্ন করিয়া অর্থই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দরিদ্র আত্মীয় বিত্তবান ও অভিজাত আত্মীয়ের নিকটে কুটুম্বিতার পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায় হৃদয়হীন অমানুষোচিত ব্যবহার। কেন না,—ধনী আত্মীয়ের সংগে দরিদ্রের যে আত্মীয়তা তাহা গরজের আত্মীয়তা—সে আত্মীয়তা-স্পর্ধা দরিদ্রের নিকটে কখনও সম্মানজনক হয় না, বরং লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণই হইয়া থাকে। সমাজে সমানে সমানেই কুটুম্বিতার সম্পর্ক গৌরবজনক হইতে পারে, পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে। মানুষে মানুষে সত্যকার কোন প্রভেদ নাই বটে, কিন্তু লোকব্যবহারে, সামাজিক রীতিতে যে নীতি আজিও প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে, তাহাতে ধনী ও দরিদ্রে, সর্বহারা ও সর্বাধিকারীতে দুর্লংঘ্য ব্যবধান না থাকিয়া পারে না।

[নয়] কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,—
ভাই ব'লে ডাকো যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা;
কেরোসিন বলি' উঠে, "এসো মোর, দাদা।"

ক. বি. মাধ্যমিক '৪৬, '৪৭, '৪৯, বি. এ. '৩৬

কেরোসিন-শিখা যেমন প্রখর-উজ্জ্বল, মৃৎপ্রদীপের শিখা তেমনই মৃদু অথচ স্নিগ্ধ। কিন্তু এই উজ্জ্বলতার জন্য কেরোসিন-শিখার এমনই গর্ব, এমনই অহংকার ও ঔদ্ধত্য যে, সে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে। ঐ যে মাটির প্রদীপ—উহা তাহার সগোত্র হইলেও ক্ষুদ্র; তাই তাহার কুটুম্বিতাকে—'ভাই' সম্বোধনকে—কেরোসিন-শিখা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু এমনই কৌতুকের বিষয় যে, আকাশে যখন চাঁদ উঠে আর স্নিগ্ধ-মধুর আলোয় সমস্ত বিশ্বসংসার প্লাবিত হইয়া যায়, কেরোসিন-শিখা তখন অধীর হইয়া উঠে চাঁদের বন্ধুত্ব-কামনায়। মৃৎ-প্রদীপের 'ভাই' সম্বোধন যে সহ্য করিতে পারে নাই, সে-ই চাঁদকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতে কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করে না।

এমনই হয় বটে! মনুষ্যসমাজে ছোটো, বড়ো, আরো-বড়ো—বিভেদ-বৈষম্যের কত দুর্লংঘ্য প্রাচীরই-না কালে কালে গড়িয়া উঠিয়াছে! ফলে মানুষে মানুষে জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের নূতনতর মাপকাঠি গড়িয়া উঠিয়াছে—ধন, মান, পদমর্যাদা ও আভিজাত্য-গৌরব। এই মিথ্যা অহংকারের মোহে আমরা সহজ মনুষ্যত্ববোধ হারাইয়াছি—ধন নয়, মান নয়—মানুষ হিসাবেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি; দীন-দরিদ্র খ্যাতিহীন প্রতিবেশীর, এমন কি দারিদ্র্য-পীড়িত পরমাত্মীয় স্বজন-পরিজনেরও বন্ধুত্ব আমরা কামনা করি না, তাহাদের সাহচর্য সভয়ে পরিহার করি; আমরা চাই বড়োর, আরো-বড়োর সংগ-সুখ, তাহাদের কৃপালাঞ্ছিত সস্নেহ দৃষ্টি! কিন্তু একথা বুঝিতে চাই না যে, বড়ো হইলেও আরো-বড়োর তুলনায় আমরা ছোটোই; তাই যে-ছোটোকে আমরা মদগর্বে, আভিজাত্যের স্পর্ধায় ধিক্কৃত করি, আরো-বড়োর নিকট হইতে সেই ধিক্কার-লাঞ্ছনাই সহস্রগুণে জমা হইয়া উঠে, তাহার সংগকামনা আমাদের পক্ষে যতই স্বাভাবিক হউক না কেন, তাহাতে সত্যকার কোন গৌরব নাই। রাত্রির দেশে চন্দ্রের পার্শ্বে ক্ষুদ্র জোনাকি হইতে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যন্ত সকলেই স্ব স্ব গৌরবে ও মহিমায় অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছে; ঊর্ধ্ব আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রমালার মধ্যমণি চাঁদ, নিম্নে বনে-উপবনে জোনাকির পাঁতি—জ্যোতির্লোকে কি অপূর্ব সংগতি-সুষমা! এই বিধাতার রাজ্যে, মনুষ্যসংসারে, সকল বৈষম্য ও বৈরূপ্যের মধ্যেও একটি সংগতি-সুষমা আছে—ধন-মান-আভিজাত্যের মিথ্যা আত্মঘাতী মোহই সেই সংগতির ছন্দ-পতনের কারণ।

[দশ] উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

ক. বি. মাধ্যমিক '৪৪, (বিকল্প) '৫৬

সংসারে যত প্রকারের ভেদ-রীতি এযাবৎ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মূলগত শ্রেণীভেদ বোধ হয় উত্তম, মধ্যম এবং অধম। উত্তম ও অধমের পার্থক্য বা ভেদরেখা অতিশয় স্পষ্ট, কিন্তু গোল বাধে মধ্যমকে লইয়াই। কেন না, প্রথমত লোকনীতিতে উত্তম-মধ্যমে যে পার্থক্য নির্দিষ্ট হইয়া আছে, মধ্যম উহাকে আদৌ অর্বাচীন মনে করে, অতএব, ঐরূপ মানদণ্ড এবং সেই মানদণ্ডের বিচারে আখ্যাত যে উত্তম—দুয়ের প্রতি তাহার আক্রোশের সীমা নাই। মধ্যম উত্তমের সহিত তুলনায় নিজেকে মধ্যম বলিয়া কিছুতেই মানিয়া লইতে চায় না। কাজেই উত্তমের সংগে একপ্রকারের একটা ব্যবধান সে সযত্নে রক্ষা করিয়া চলে। ইহাকে একরূপ আত্মদৈন্যের অভিমান বলা যাইতে পারে। অপর দিকে মধ্যমের বিচারে অধম এতই অধম যে সে তাহাকে গণনীয় বলিয়াই মনে করে না এবং অতিশয় নগণ্য ও তুচ্ছ বলিয়াই অধম তাহার নিকট

অপাংক্তেয়; অতএব উহার কোনরূপ সান্নিধ্য বা সংস্পর্শ মধ্যমের পক্ষে সর্বথা বর্জনীয়। ইহাও একরূপ আত্মশ্লাঘা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই দ্বিবিধ কারণে উত্তম- ও অধমের নিকট হইতে মধ্যম একটা ব্যবধান রচনা করিয়া আত্মরক্ষার্থে সদা-সচেতন থাকে।

কিন্তু হৃদয়ের মহত্ত্বে ও চরিত্র-শক্তিতে যে মানুষ সকলের বরণীয় হইয়াছেন, সমাজে উত্তম বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তিনি আপামরসাধারণকে অভিনন্দন জানাইয়া থাকেন। লোকব্যবহারে যাহারা অধম, অতিশয় হেয় ও হীন বলিয়া অবজ্ঞাত, তাহারা সেই শক্তির সংগসুধা হইতে বঞ্চিত হয় না। বরং এমনও বলা যাইতে পারে যে, অধমকে সংগ ও সাহচর্য দিতে উত্তম যেন আগ্রহশীলই হইয়া থাকেন। সেই উত্তম পুরুষ নিশ্চিত জানেন, তাঁহার চরিত্রে নীচসংসর্গজনিত মালিন্যদোষ কখনও ঘটিবে না। বিরাট্ হৃদয়ের গভীর করুণা ও আকুল প্রেমের সংস্পর্শে লোহাও যে সোনা হইয়া যায়!—ইহার মত সত্য আর কি হইতে পারে। কিন্তু মাঝারির সতর্কতা কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। উত্তমের সুগভীর আত্মপ্রত্যয় ও হৃদয়ের প্রসার তাহার নাই বলিয়া সে যেমন উত্তমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় এবং ঈর্ষাপরবশ হওয়ায় উত্তম হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়, তেমনি আত্মস্খলন ও পতনের আশংকায় অধমের সংস্পর্শও সে সভয়ে পরিহার করিতে বাধ্য হয়।

[**এগারো**] বোল্‌তা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক।
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই।
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচ দেখে যাই। **ক. বি. বি. এ. '৩৯**

মৌমাছির এত যে আয়োজন, এত যে কর্মব্যস্ততা, দিবারাত্র এত যে অক্লান্ত গুঞ্জরণ—সে তো কেবল ঐ ক্ষুদ্র মৌচাক-সৃষ্টিরই জন্য।—বোল্‌তা এই বলিয়াই মৌমাছির সৃষ্টিকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে। জাঁকজমকের তুলনায় সৃষ্টির ক্ষুদ্রত্বকে সবিনয়ে স্বীকার করিয়া আরো-ছোটো একটি মৌচাক রচনা করিয়া দিবার জন্য মৌমাছি বোল্‌তাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। বোল্‌তা অনায়াসে বা স্বল্পায়াসে বৃহৎ চাক রচনা করিতে সক্ষম হইলে, মধুর উৎস ক্ষুদ্রতম 'মউ'-চাক রচনা করাও তো তাহার সাধ্যাতীত।

বোল্‌তা লোকসমাজে সেই জাতীয় মনুষ্যচরিত্রের প্রতিই ইংগিত করে, মৌমাছির মধুচক্র রচনাকর্মের মত কোন শুভ প্রচেষ্টাকে যাহারা ক্ষুদ্র বলিয়া বিদ্রূপের হুল ফুটাইতে পিছ্‌-পা হয় না। পরচ্ছিদ্রান্বেষণ করা, পরনিন্দায় পঞ্চমুখ হওয়াতেই তাহাদের সুখ। সাজসরঞ্জাম, জাঁকজমকের বাহুল্যের উল্লেখ করিয়া

তাহারই তুলনায় অনুষ্ঠিত কর্মকে হেয় ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিতে উহারা সদাসচেষ্ট, অথচ হাতে-কলমে অনুরূপ বা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র কর্ম সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তুচ্ছ ক্ষুদ্র বলিয়া যে-কাজকে তাহারা অবজ্ঞা ও অবহেলা করে, ব্যংগ ও বিদ্রূপের রসে রসান্বিত করিয়া লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই কর্মপ্রচেষ্টারই মাঝে আছে একটা নিজস্ব গৌরব। উহাতেই আছে সেই শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক সাধনার পরিচয়, যাহা না থাকিলে কোন রচনা বা সৃষ্টিকর্মই সার্থক হয় না এবং এই সত্যের উপলব্ধি সেই মানুষেরই ঘটে, যিনি নিজে পুণ্যকর্মা, যিনি নিজে যথার্থ সৃষ্টিকর্মের অধিকারী।

[বারো] আম্র কহে, একদিন হে মাকাল ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই ;
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি,—
মূল্যভেদ সুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি' ॥

আমও ফল, মাকালও ফল; দুয়েরই আদি নিবাস ছিল বনভূমি। তারপর একদা মানুষ বহুযত্নে আমকে আহরণ করিয়া আনিয়া আপন গৃহাংগনে ঠাঁই দিল। মাকাল পড়িয়া রহিল বনে আর মানুষের রুচিতে আম পাইল কৌলীন্য, সে হইল অমৃতফল। সেইদিন হইতে আম্রে এবং মাকালে সাম্য ঘুচিয়া গেল।

সংসারে মানুষের রুচি ও প্রয়োজনবোধের দ্বারাই যাবতীয় পদার্থের মূল্যনিরূপণ হইয়া থাকে, ফলে মূল্যভেদের কারণেই অসাম্যের সৃষ্টি অনিবার্য হইয়া উঠে—পাপ, পুণ্য; ধর্মাধর্ম, উচ্চ-নীচ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি নানা ভেদ-বৈষম্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ইহা জাগতিক সত্য, ব্যবহারিক সত্য। কালে কালে, দেশে দেশে মানুষের রুচি ও প্রয়োজন-বোধের পরিবর্তনের সংগে সংগে এই সত্যের নানা মূর্তি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, কিন্তু এক রূপে না এক রূপে এই বিভেদ বা বৈষম্য থাকিয়াই যায়। এই জাতিভেদ বা মূল্যভেদ কেবল বস্তুজগতেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের রসনার অধিকতর তৃপ্তিদায়ক বলিয়া আম্রফলই যে কেবলমাত্র আভিজাত্য-গৌরব লাভ করিয়াছে তাহা নয়, প্রাণিজগতের নিম্নতম হইতে উচ্চতম স্তর—পশুপক্ষী, কীট-পতংগ হইতে চেতনার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি যে-মানুষ, তাহারও মধ্যে ঐ মূল্য বা রুচিভেদে বহু স্তর ও বহু ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্য ঘুচিয়া গিয়াছে। যে-মানুষ জন্মলগ্নে এক ও অভিন্ন এবং সকল বৈষম্যের অতীত, সেই মানুষের মাঝে ব্রাহ্মণ্য, ক্ষাত্র, বৈশ্য, ও শূদ্রধর্মের অধিকারভেদে নানা জাত্যন্তর ঘটিয়া থাকে এবং কালের গতিধারায় রুচি ও মূল্যভেদের প্রয়োজনে এক এক সমাজে এক এক জাতি অপর জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকে।

[তেরো] যথাসাধ্য-ভালো বলে, ওগো আরো-ভালো,
কোন্ স্বর্ণপুরী তুমি করে থাক আলো ?
আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায় ॥

মানুষ 'ভালো' যাহা করিতে পারে, তাহা 'যথাসাধ্য-ভালোই', 'আরো-ভালো' নয়। কারণ,—'আরো-ভালো'র কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, উহা 'অসম্ভব-ভালো'রই সামিল। কিন্তু 'আরো-ভালো', 'অসম্ভব-ভালো' এই দুইটি কথাও মানুষের অভিধানে প্রচলিত আছে। যে-মানুষ 'যথাসাধ্য-ভালো' দূরের কথা, কোন-ভালোই করিতে পারে না, কেবল দম্ভই করিতে জানে এবং যে-যথাসাধ্য-ভালোই মাত্র মানুষের সাধ্যায়ত্ত, সে উহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া সকল কাজে আরো-ভালোর দাবি করে। কিন্তু এই আরো-ভালো যে অলীক কল্পনামাত্র, আকাশ-কুসুমের মতই রঙীন এবং সর্বৈব ভুয়া—তাহা ঐ মানুষ কিছুতেই স্বীকার করিতে চায় না। কোন মানুষ নিজের জীবনে শুভ ও পুণ্যের অনুষ্ঠান যদি সাধ্যানুসারে করিয়া থাকিতে পারে, তবে তাহাতেই তাহার চরম সার্থকতা ঘটিয়াছে। তদতিরিক্ত তাহার কাছে দাবি করিবার কিছু নাই। কারণ, সাধ্যের অতীত কে কবে করিতে পারিয়াছে ? আর করিতে পারাই কি সম্ভব ? কিন্তু যে-মানুষ নিজে কিছুই করিল না—সারা জীবন অলস কল্পনার রঙীন স্বপ্নে বিভোর হইয়াই কাটাইল, কোন ভালোই যে কাহারও কখনও করে নাই—আত্মশক্তির অনুশীলনে সেই ব্যক্তি অক্ষম বলিয়াই মানুষমাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত যাহা, তাহাও যেমন সে সম্পন্ন করিতে পারে না, তেমনই কোন অনুষ্ঠিত কর্মের মূল্যনিরূপণেও সে একটা মিথ্যা আদর্শের শরণাপন্ন হয়। বিধাতার এই সৃষ্টিকে, এই দুর্লভ মানবজন্মকে আমরা পরম রমণীয় ও সার্থক-সুন্দর করিয়া তুলিতে পারি, যদি আমরা সকলেই আপন আপন কর্তব্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত না হই।

[চোদ্দ] রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম,—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী ॥

জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব, মহা ধুমধাম, পথ লোকে লোকারণ্য। ভক্তজন দেবতার উদ্দেশে সাষ্টাংগে তাহাদের প্রাণের প্রণাম নিবেদন করিতেছে। পথ, রথ এবং রথারূঢ় মূর্তি প্রত্যেকেই আপন আপন মনে ভাবিতেছে সে-ই দেবতা, ভক্তের প্রণাম তাহারই উদ্দেশে, কিন্তু অন্তর্যামী ভগবান, যিনি সত্যস্বরূপ, তিনি জানেন

এই প্রণাম তাঁহারই কাছে পৌঁছিতেছে; ভক্ত যে তাঁহার—তিনিও যে ভক্তেরই। তাঁহাকে অন্তরংগভাবে পাইবে বলিয়াই-না তিনি ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে মূর্তিরূপে ধরা দিয়াছেন, ঐ রথ তো তাঁহারই বাহন হইয়াছে, ঐ পথ তো তাঁহারই যাত্রাপথ বলিয়া ধন্য; কিন্তু উহাদের কেহই ত তিনি নহেন, তাঁহার প্রতীক মাত্র।

সত্য শুভ্র নিরঞ্জন। সর্ব রূপ-রং-রেখা-বর্জিত সেই নিত্যবস্তু একমাত্র ধ্যানেরই গোচর, ভক্তহৃদয়ের অনুভূতিগোচর হইয়া থাকে। সেই সত্যকে সর্বজনহৃদয়সংবেদ্য করিয়া তুলিতে হইলে তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ চাই, মূর্তি চাই। সেই যে মহাকবি বলিয়াছেন—'রূপং-রূপবিবর্জিতস্য যন্ময়া ধ্যানেন কল্পিতম্'। তাই ভক্ত কবি সেই অব্যক্তকে নানা শাস্ত্র-সংহিতায় ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, সেই অরূপকে নানা রূপে ও মূর্তিতে কল্পনা করিয়াছেন, সেই অসীম চরাচরব্যাপ্তকে তীর্থসীমায় বাঁধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু লোকাচার উৎসব-অনুষ্ঠানের বহিরংগের নানা জাঁকজমক কালে কালে এমনই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে যে, নকল আসলের জায়গা জুড়িয়া বসে, প্রতীক প্রতীতিকে লংঘন করে।—আমরাও হই সত্যভ্রষ্ট। লোকাচারের বাহ্যাড়ম্বর আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে বলিয়াই সাধারণ মানুষ আমরা সেই জঞ্জালস্তূপ হইতে শাশ্বত-সনাতনকে, সেই শান্ত, শিব-অদ্বৈতকে চিনিয়া লইতে পারি না, কিন্তু ভক্ত জানে যে, পথ নয়, রথ নয়, মূর্তিও নয়, সে তাহার অন্তর্যামী ভগবানকেই ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে প্রাণের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া ধন্য হয়।

[পনেরো] শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির,—
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির ॥

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫২

দীঘির অগাধ জলে এক ফোঁটা শিশিরবিন্দু ঢালিয়া শৈবাল দীঘিকে বলে, সে যেন তাহার দানের কথা স্মরণ রাখে—ভুলিয়া না যায়। আশ্চর্যই বটে! দীঘির জলেই যাহার জন্ম স্থিতি ও লয়, তাহারই নাকি এমন উপকার-দম্ভ, এত স্পর্ধা—এক ফোঁটা জল দান করিয়াছে বলিয়া!

যে মানুষ পরের উপকার করিয়া সদম্ভে উহা প্রচার করিতে গর্ব বোধ করে, উপকৃতকে অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করে না, বুঝিতে হইবে তাহার হৃদয়ে বিরাটের স্পর্শলাভ ঘটে নাই, মনের আবিলতা ঘুচে নাই। কারণ,—উপকার করা ত নয়, সেবার সৌভাগ্য লাভ করাই তাহার লক্ষ্য। যাঁহার প্রাণে অপার করুণার উদয় হইয়াছে, বিরাট্-বিপুলের স্পর্শ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাতে আত্মপর-জ্ঞান ঘুচিয়া যায়, জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির সাধনায়, তাহার সর্বাংগীণ কল্যাণ-কামনায় তিনি নিয়তই সেবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ান, কোন আড়ম্বর আত্মপ্রচারের কোন মিথ্যা

মোহই যে তাঁহার থাকে না। একান্ত নিভৃতে লোকচক্ষুর অগোচরে পরের সেবায়, পরদুঃখ-মোচনের ও পরের উপকার-সাধনের পুণ্যকর্মে নিঃশেষে ও নিঃস্বত্বে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া তিনি ধন্য হন। দীঘির বিপুল জলভাণ্ডারের দ্বার জীবের সেবার জন্য তৃষিতের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য চির অবারিত। তৃষিতের তৃষ্ণা মোচন করিয়া মানুষের কাজে আপনাকে অকাতরে দান করিয়া সে শৈবালের মত সেই দানের হিসাব লিখিয়া রাখিতে বলে না। উদারচরিত মহৎপ্রাণ ব্যক্তির সেবা ও পরোপকারের ইহাই তো সত্যকার অভিজ্ঞান।

[ষোলো] নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,—
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে॥

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫

মানুষ কি চায় জিজ্ঞাসা কর, একবাক্যে সকলে বলিবে, সুখ। কিন্তু কোথায় সুখ, সন্ধানের তো শেষ নাই। আজিও সুখ মিলিল কই? নদীর এপার বলিতেছে, সুখ এপারে নয়, ওপারে; ওপার বলিতেছে, ওপারে নয়, এপারে। রামকে জিজ্ঞাসা কর,—কে সুখী? সে বলিবে শ্যাম। শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, রাম। আপনার পরমায়ু ও পরের বিত্ত ও সুখের প্রতি মানুষের অসাধারণ পক্ষপাতিত্ব আছে। সকলে মরিবে জানিয়াও মানুষ নিজের মৃত্যুভাবনাকে আমল দেয় না, বোধ হয় ভাবে মৃত্যুকে সে কোন-রকমে ফাঁকি দিতে পারিবে। তেমনই মানুষ নিজের চেয়ে পরের ঐশ্বর্য ও সুখ খুব বড়ো করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। সুখ মায়ামৃগের মত মানুষকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে আর মানুষ তাহারই পশ্চাতে অন্ধবেগে ছুটিতেছে। মায়ামৃগ দূর হইতে দূরান্তরে পলাইতেছে আর মানুষ অ-ধরাকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেছে না। কিন্তু সন্ধানেরও তো শেষ নাই। এমনি মারাত্মক মোহ মানুষকে পাইয়া বসিয়াছে—কিছুতেই ছুটি মিলিতেছে না। তাই দিবারাত্র এই অন্ত-হীন কোলাহল আর অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল। মানুষ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না বলিয়া, আপনার মধ্যে সুখের সন্ধান পাইতেছে না বলিয়াই, পরস্বের মধ্যে সুখ খুঁজিতেছে। তাই না আজ সমাজে-রাষ্ট্রে, মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে এত হানাহানি, এত মারামারি, এত রেষারেষি। তাই সেই যে মায়ামৃগ—এপার নয় ওপার, ওপার নয় এপার—উহার ছলনার কি আর শেষ আছে?

[সতেরো] হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা।
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।

কিসের স্তব্ধতা তব ওগো গিরিবর।
হিমাদ্রি কহিল, মোর চির-নিরুত্তর॥

সৃষ্টির রহস্য দুরবগাহ। এই রহস্য উন্মোচন করিবার জন্ত মানুষের কীই-না প্রাণান্ত প্রয়াস। একদিকে হাস্তলাস্তময়ী চিরচঞ্চলা প্রকৃতি, ভ্রুকুটিকুটিল কাল এবং নৃত্যোন্মত্তা মহামায়া—সমুদ্রের অনন্ত জিজ্ঞাসা; অন্তদিকে শান্তস্থির পুরুষ-আত্মা, ওষ্ঠলগ্ন-অংগুলি মহাকাল এবং নৃত্যোন্মত্তা মহামায়ার চরণতলে শায়িত নির্বিকার শিব চির-নিরুত্তর স্তব্ধ হিমাদ্রি। দুই-ই প্রশ্নের অতীত। প্রকৃতিপন্থী য়ুরোপ সমাজে ও সাহিত্যে, দর্শনে ও বিজ্ঞানে নিত্যচপল প্রকৃতির নব নব তত্ত্ব ও তথ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; সেই প্রকৃতির সাধনায় তাহার জিজ্ঞাসার যেমন অন্ত নাই, ক্ষুধারও তো তৃপ্তি নাই। কালের কুটিল চক্রান্তে সে নিরন্তর বিভ্রান্ত, কিন্তু প্রকৃতি আজও চিরদূরায়মান, চির-অলভ্য হইয়া আছে। এই জীবনসমুদ্রের তীরে বসিয়া মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নাই—প্রকৃতির ছলনারও অন্ত নাই। কিন্তু শাশ্বত মহাকাল নিত্যমুক্ত পুরুষের নিকটে প্রকৃতি তাহার সকল ছলনা নটীলীলা সংহরণ করিতে বাধ্য হয়, নৃত্যোন্মত্তা মহামায়ার চঞ্চল পাদক্ষেপ অটল শিবের বুকে আসিয়া থামিয়া যায়। ভারতবর্ষ কালের এই নৃত্যচ্ছন্দের মধ্যে মহাকালের লয় যুক্ত করিয়া দিয়া তালে-লয়ে সৃষ্টির সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে, নতুবা এই সৃষ্টির কোন অর্থই হয় না। কল্লোল-মুখর সমুদ্রের সম্মুখে যখন আমরা দাঁড়াই, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তখন অশেষ প্রশ্ন-কাতরতায় আমাদের মন উদ্বেল হইয়া উঠে, আবার সেই অশান্ত মন স্তব্ধ-মৌন হিমাদ্রির সম্মুখে মহাশান্তির স্নিগ্ধ সুষমায় ভরিয়া উঠে, সকল জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নকাতরতা তখন স্তম্ভিত হইয়া যায়। এই অনন্ত জিজ্ঞাসারও শেষ নাই, কিন্তু অধীরতা আছে, এই মহামৌন স্তব্ধতারও সমাপ্তি নাই, কিন্তু গভীর প্রশান্তি আছে।

[আঠারো] অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি'
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি॥

চন্দ্রসূর্য হইতে গ্রহ-উপগ্রহ পর্যন্ত, উদ্ভিদজীবন হইতে মনুষ্যজীবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় অবধি, সকলই অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ ও জীবন এক মহাকার্যকারণের নিয়মশৃংখলে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, ইহার কোথাও কোন আইন বা নিয়মের শাসন নাই, যেন এক অন্ধ নিয়তি জীবন ও জগৎ-ব্যাপারের অন্তরালে বসিয়া খেয়াল-খুশীর অমোঘ-নিষ্ঠুর রাজত্ব চালাইতেছেন। কিন্তু এই শাসন যতই অমোঘ, যতই নিষ্ঠুর হউক, তাহাতে খেয়াল-খুশীর স্থান নাই।

অকূলবিস্তার সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তরংগের পর তরংগ উঠিতেছে, মিশিয়া যাইতেছে; মনে হইবে, বুঝি ইহার কোন অর্থই নাই, কিন্তু একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায়, পশ্চাতের ঢেউ সম্মুখের ঢেউকে এক সুনিশ্চিত গতিমুখে ঠেলিয়া দিতেছে। এই জীবনের দিকে তাকাইলেও—আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত একটি মনুষ্যজীবন সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলেও—জানা যায়, এই মানুষ সারা জীবন ধরিয়া যাহা-কিছু করিয়াছে, উহার কোন কাজ, জীবনের কোন ঘটনাই স্বয়ম্ভূ নয়। প্রত্যেক অনুষ্ঠিত কর্মের, প্রত্যেক ঘটনার পিছনে রহিয়াছে কারণ-পরম্পরা, রহিয়াছে অচ্ছেদ্য নিয়মশৃংখল। পূর্বের কর্ম পরবর্তী কর্মধারাকে সুনির্দিষ্ট করিতেছে—আজিকার তুমি-আমি গতদিনের তুমি-আমির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। অতএব, কোন নিয়তির শাসন নয়, অদৃষ্টের কোন বিধানও নয়, মানুষই আপনাকে আপনি গড়িতেছে, ইটের পর ইট গাঁথিয়া ইমারত-রচনার মত, কর্মের সুদৃঢ় শৃংখলে সে জীবনেরই-সৌধ রচনা করিতেছে।

[উনিশ] রাত্রি যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য নাহি ফিরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা ॥

রাতের আকাশে অযুত নক্ষত্রের সভায় সূর্যের স্থান নাই—ইহা জানিয়াও যে মূর্খ অধ্রুব-দিবাকরের ধ্যান করে, সূর্যালোকের শোকে অধীর হইয়া উঠে, সূর্যকে সে তো ফিরিয়া পায়ই না, এমন কি ধ্রুবতারা-লোকের উপভোগ হইতেও হয় বঞ্চিত—দৃপ্ত জীবনরসায়ন সূর্যকিরণের সংগে নক্ষত্রের ক্ষীণালোকের কোন তুলনাই হয় না বটে, তথাপি সেই নয়নলোভাকর স্তিমিতালোকের যে একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আছে, তাহার মাধুর্য উপভোগ ঐ মূর্খের নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়।

আমরা নিকটকে করি তুচ্ছ, কিন্তু দূরের স্বপ্নেও তো মশগুল হই; বাস্তবের সত্যকে শ্রদ্ধার সংগে বরণ করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হই, কিন্তু আদর্শের কল্পনাতেও তো বিভোর হইয়া থাকি। চিরপরিচিত অ-পরিচিতের সুখস্বপ্নে হারাইয়া যায়,—সুলভকে দুর্লভের ভাবনায়, কণ্ঠলগ্নাকে চির-অধরার আকাংক্ষায় প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত করি। ফলে সেই অপ্রাপণীয়কেও যেমন পাই না, করায়ত্তকেও তেমনি হারাইয়া ফেলি। সহজ-সুলভকে অগ্রাহ্য করিয়া দুরূহ-দুর্লভের কামনা মানুষ অহরহ করিতেছে; কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে সহজ-সুলভ হইতে যেমন আমরা বঞ্চিত হইতেছি, আবার দুরূহ-দুর্লভকেও তেমনি লাভ করিতে পারি না—সহজ-সুলভ হইয়াও উঠে না। তাই বিশ্বকবি মানুষের এই দুরাকাংক্ষাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় লিখিয়াছেন,—

'যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।'

[কুড়ি]

শেফালি কহিল, আমি ঝরিলাম, তারা।
তারা কহে, আমারো তো হল কাজ সারা,—
ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
আকাশের তারা আর বনের শেফালি ॥

রজনীর শেষযামে শেফালি ঝরিয়া যাইবার কালে আকাশের তারাকে বলে, 'ভাই, চলিলাম।' তারা বলে, 'আমারও কাজ সারা হইল, রাত্রিও যাই যাই করিতেছে।'

এই সৃষ্টির অন্তর্গত সকল বস্তুই পরিণামশীল—সকল সামগ্রীই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়যুক্ত এক অমোঘ শাসনের অধীন হইয়া আছে, ইহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। কাজ সারা হইলেই ছুটি লইতে হইবে, এক মুহূর্তও তর সইবে না। ফুল ফোটে, গন্ধ বিলায়, ঝরিয়া পড়ে; সূর্য উঠে, সারাদিন অজস্র কিরণধারা ঢালিবার পর পশ্চিম দিগন্তে অস্তাচলশায়ী হয়। মানুষও কৈশোর যৌবন ও বার্ধক্যসমন্বিত জীবনের একটি পূর্ণমণ্ডল রচনা করিয়া অবশেষে জীবন হইতে অব্যাহতি পায়।—সকলেরই এক পরিণাম! বিধাতার এই অন্তহীন অখণ্ড সৃষ্টিধারাকে জড় ও চেতনে মিলিয়া নিজ নিজ অবদানের দ্বারা অব্যাহত ও অপ্রতিহত রাখিয়াছে। প্রকৃতির অন্তর্গত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল পদার্থই যেমন আপন আপন কাজ সম্পন্ন করিয়া একই নিয়মের অধীন হইতেছে, মনুষ্যসংসারেও তেমনি বলবান-দুর্বল, খ্যাত-অখ্যাত সকল মানুষই জীবনের ঋণ শোধ করিতেছে। ছুটি সকলকেই লইতে হইবে,—বনের শেফালি আকাশের তারা, ত্রিযামা যামিনী সকলই ফুরাইয়া যাইবে। কেবল যাইবার আগে নিজ নিজ কাজ শেষ করিতে চাই এবং বিধির বিধান এমনই অমোঘ যে কাজ সারা না হইলে ছুটিও মিলিবে না।

[একুশ]

ফুল কহে ফুকারিয়া, ফল, ওরে ফল,
কত দূরে রয়েছিস্ বল্ মোরে বল্।
ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি,—
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি ॥

ফুল খুঁজিয়া বেড়ায় আকুল হইয়া ফলকে। কারণ,—ফল-পরিণামেই ফুলের সার্থকতা। কিন্তু ফুল জানে না যে, ফলের বাস তাহারই অন্তরে। তারপর ফুলের সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় সেদিন, যেদিন ফুলের অন্তর হইতে ফল বাহিরিয়া আসে পরিপূর্ণ গৌরবে।

মানুষও এমনি করিয়া বিশ্বময় কস্তুরীমৃগসম আপন গন্ধে আকুল হইয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোথায় মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, কোথায় মনুষ্যত্বরূপ পরম ধন! এই আকুল অভিযানে কত দীর্ঘকাল ধরিয়া সে যে কত অ-বিদ্যার সাধনা করিতেছে, কত

অলীক মিথ্যার সুখস্বপ্ন বয়ন করিতেছে, কত দুরূহ জিজ্ঞাসায় আপনার যাত্রাপথ জটিল হইতে জটিলতর বন্ধুর করিয়া তুলিতেছে, তথাপি সেই প্রশ্নের জবাব এখনও তো মিলে নাই। সার্থকতার সন্ধানে, মনুষ্যত্বের সাধনায় বিজ্ঞানের দুর্গম পথে মানুষ যাত্রা সুরু করিয়াছে, দর্শনের সূক্ষ্মতম তর্কজাল সে বিস্তার করিয়াছে, সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির উন্মাদনায় সে উন্মত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে, ঐশ্বর্যের গগনস্পর্শী স্তূপ সে রচনা করিয়াছে। খ্যাতি ও অভিজাত্যের তাসের ঘর, ভেদ-বৈষম্যের দুর্লংঘ্য প্রাচীর সে গড়িয়া তুলিয়াছে। মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে হিংসা-হানাহানির দক্ষযজ্ঞে মাতিয়া উঠিয়াছে। মানুষ এখনও বুঝিতে পারে নাই—এই সন্ধানের শেষ কথাটি এখনও সে অনুভব করে নাই যে, সাধনার সিদ্ধি তাহার নিজেরই মধ্যে আছে লুকাইয়া অন্তশ্চৈতন্যের পূর্ণজাগরণে, প্রবুদ্ধ চেতনার শুভ লগ্নে, বাহিরে নয়—অন্তরেই মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসার, বিচিত্র সন্ধানের নির্বাণ ঘটিবে। সেইদিন সে বুঝিতে পারিবে যে, ধন নয়, মান নয়, জ্ঞান নয়, এমন কি বিজ্ঞানও নয়—অন্তরে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার উদ্বোধনেই মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা, দুর্লভ মনুষ্যত্বের পরম পরাকাষ্ঠা।

[বাইশ] সুখেতে আসক্তি যা'র আনন্দ তাহারে করে ঘৃণা।
কঠিন বীর্যের তারে বাঁধা আছে সম্ভোগের বীণা।

চা. বি. বি. এ. '৪৯

নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে মানুষের অন্তরাত্মা আলোড়িত হয়। পৃথিবীর অন্তহীন ভোগৈশ্বর্যের প্ররোচনায় মানুষ শেষ অবধি কিন্তু প্রবৃত্তিকেই দেয় প্রাধান্য। যে-আনন্দ তন্দ্রার ঘোর কাটাইয়া আনে কর্মমুখর জীবন, যে-আনন্দ সুপ্তির মাঝে দেয় আগামী দিনের পথ-চলার ইংগিত, যে-আনন্দ ক্লান্তির মাঝে আনে স্নিগ্ধ প্রশান্তি—সে-আনন্দ ভোগাসক্ত জীবনে নাই। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার পথে এই ভোগ দেখায় এক স্বপ্নবিধুর আনন্দের আলেয়া। ভোগবাদী জীবনযাত্রার মাঝে আছে জীবনের অভিশাপ-বাণী, আছে করুণ দীর্ঘশ্বাস, আছে হতাশার নির্মম অভিব্যক্তি। কিন্তু মানুষ এই দুরন্ত আলেয়ারই পিছনে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ছুটিয়া বেড়ায় এক অতৃপ্ত ভোগ-লালসার লোভে। আর অতৃপ্ত পিপাসা তাহাকে করে আরও শ্রান্ত—আরও নিরানন্দময়—আরও বিভ্রান্ত।

এই পৃথিবীতেই এক দিকে যেমন আছে ভোগাসক্ত জীবনের প্রাচুর্য, অন্য দিকে তেমনি আছে নিরাসক্ত জীবনের পরিমল আনন্দ। আসক্তিকে যে নিজের অন্তর হইতে দূর করিতে পারিয়াছে, যে আপন বীর্যবত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছে, সে-ই এই পৃথিবীতে নির্মল আনন্দের অধিকারী। ভোগাসক্তির বিষবাষ্পে তাহার জীবন বিষময় নয়। শাশ্বত প্রশান্তি তাহাকে দেয় নূতন জীবনের বাণী। সম্ভোগকে যে প্রশ্রয় দেয় না—সে

নিরাসক্ত জীবনে বীর্যকেই দেয় প্রাধান্য। ভোগলালসার অন্তিম পরিণতি তাহার জীবনে রূপায়িতও হয় না। সে পায় নির্মল আনন্দের মাঝে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার ইংগিত।

[তেইশ] নবোদিত সাহিত্যসূর্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্তী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র কুটিরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে। চা. বি. বি. এ. '৪৯

মানুষের বহুবিচিত্র কর্মধারার মধ্যে একদা সাহিত্যানুশীলনও প্রথম দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ঐ নবোদিত সাহিতসূর্যের কিরণে তখনও চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয় নাই। মানুষের সমগ্র সমাজজীবনে তখনও সাহিত্যেব আলোক বিকিরিত হইতে পারে নাই। কারণ,—সাহিত্যবিকাশের প্রাথমিক অবস্থা মুষ্টিমেয় প্রতিভাধর জনগোষ্ঠীর মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। সাহিত্যের ঐ প্রথম চর্চায় উহার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হয় নাই। তবে সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ফলে উহার বিভিন্ন দিক ধীরে ধীরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে চলিল। বিভিন্ন সাহিত্যিক তাঁহাদের স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ হইতে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। অতঃপর আসিল সমালোচক-গোষ্ঠী। অবান্তর অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সাহিত্যের বিস্তৃত চত্বর হইতে দূরীভূত হইল। সাহিত্যিকের সংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে এক্ষণে সমাজের বিভিন্ন স্তরেও সাহিত্যের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে। সমাজের নিছক নিম্নস্তরকে কেন্দ্র করিযাই এক শ্রেণীর লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। সত্যই সাহিত্য আজ এক বিশালতায় বিমণ্ডিত। সমাজজীবনে ও ব্যক্তিজীবনে সাহিত্যই আনিয়াছে নূতন আশার বাণী। সমষ্টি ও ব্যষ্টির সুখদুঃখ, তাহাদের আশা-নিরাশা, তাহাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিবার দায়িত্ব লইয়াছে সাহিত্যই। তাই আজ সাহিত্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে মানুষের প্রেম-প্রীতি, মানুষের স্নেহ-মমতা, মানুষেরই সংশয়-ভীতি।

প্রসংগত, বাংলা সাহিত্যের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। বাংলা সাহিত্যের সেই শৈশবে খুব কম ব্যক্তিই উহার চর্চা করিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় সাহিত্যসৃষ্টি হইত রাজকাহিনী বা ঈশ্বরস্তুতি লইয়া, আমাদের নিম্ন-স্তরের প্রসংগ উহাতে খুব কমই থাকিত। ক্রমে সাহিত্যের বিস্তৃতি ও প্রসারের সংগে সংগে সাহিত্য পূর্ণাংগ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকার, সাহিত্যকে ভাষা ভাব ও কল্পনা দিয়া, উহাকে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছে। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায়, উহার কত বিস্তৃতি—উহার কত সম্পদ। সমাজের উচ্চস্তর হইতে অতি নিম্নস্তর অবধি মানুষের জীবনের সহিত সাহিত্য অংগাগীভাবে বিজড়িত। শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, বিশ্বসাহিত্যেরও অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে ঠিক এমনি ভাবেই।

অনুশীলন

[এক] যা রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে সেই শুধু রবে—
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে।

ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৬

[দুই] দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাবো কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৬

[তিন] "অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজিকালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি।"

ক. বি. মাধ্যমিক (অতিরিক্ত বিকল্প) '৫৬

[চার] "জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে।
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে ॥

ক. বি. মাধ্যমিক (অতিরিক্ত বিকল্প) '৫৬

[পাঁচ] ভাবে শিশু বড় হলে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি সমস্ত খেলেনা।
বড় হ'লে খেলা যত ঢেলা বলি মানে,
দুই হাত তুলে চায় ধনজন পানে।
আরো বড় হবে নাকি যবে অবেহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে ॥

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬

[ছয়] তৃষিত গর্দভ গেল সরোবর-তীরে,
ছি ছি কালো জল, বলি চলি এলো ফিরে।
কহে জল, জল কালো জানে সব গাধা,
যে জন অধিক জানে বলে জল শাদা !

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬

[সাত] মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা উপাধি কিংবা ওকালতি, শুনতে মহা কঠিন ; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা অর্থাৎ কৃতী হওয়া। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সংগে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন ; কেননা, এ লড়াই চিরজীবনব্যাপী, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই। ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৬

[আট] আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার জন্যই উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৬

[নয়] মানুষ যেমন জানবার জিনিষ ভাষা দিয়ে জানায় তেমনি তাকে জানাতে হয় সুখদুঃখ ভালোলাগা—মন্দলাগা, নিন্দা-প্রশংসার সংবাদ। ভাবে-ভংগীতে, ভাষাহীন আওয়াজে, চাহনিতে হাসিতে চোখের জলে এই-সব অনুভূতির অনেকখানি বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু সুখদুঃখ ভালোবাসার বোধ অনেক সূক্ষ্মে যায়। তখন তাকে ইশারায় আনা যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণ্যে যতদূর সম্ভব নানা ইংগিতে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৬

[দশ] বক্তা ও লেখক একজাতীয় জীব নন ; ইঁহাদের পরস্পরের প্রকৃতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন, তিনি শ্রোতার মন জবরদখল করেন ; অপর পক্ষে লেখক পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না ; লেখক পাঠকের অবসরের সাথী।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৬

[এগারো] শর ভাবে, ছুটে চলি, আমি তো স্বাধীন,
ধনুকটা এক ঠাঁই বদ্ধ চিরদিন।
ধনু হেসে বলে, জান না সে কথা
আমারি অধীন জেনো তব স্বাধীনতা।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬

[বারো] প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অংগ। বিশ্বমানবকে দান করিবার সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সেই বিরাট্ মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অংগের ন্যায় সে কেবল ভারস্বরূপ বিরাজ করে। বস্তুত কেবল টিকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫

[তেরো] অক্ষমতাই মহত্ত্বের উপর বিরক্তির প্রধান কারণ। আলস্য পরিহার করিয়া কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নির্ভয়ে খাটিয়া খাওয়া অনেকের পোষায় না। তাহারাই আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় মহত্ত্বের নিন্দা রটাইয়া বেড়ায়।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫

[চোদ্দ] চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলোক দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলংক যা আছে, তাহা আছে মোর গায়ে।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫

[পনেরো] মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন,—তাহাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন। গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫১

[ষোলো] সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। ক. বি. মাধ্যমিক '৫১

[সতেরো] তোমার কে মা বুঝ্‌বে লীলে ?
তুমি কি নিলে—কি ফিরিয়ে দিলে ?
তুমি দিয়ে নিচ্ছ তুমি,
বাছ্‌ রাখ না সাঁঝ-সকালে—
তোমার অসীম কার্য অনিবার্য—
মাপাও যেমন যার কপালে !
তোমার অভিসন্ধি পদে-বন্দী ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে।
তুমি যেমন দেখাও তেম্‌নি দেখি, জলেই তুমি ভাসাও শিলে !
তোমার জারিজুরি আমার কাছে
খাটবে না, মা, কোন কালে ;
ও সব ইন্দ্রজালে যন্ত্র জানে—
রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে। ক. বি. মাধ্যমিক '৪৮

[আঠারো] একি রংগ! অফুরন্ত জন্মমৃত্যু-খেলা—
তরুবল্লী-পশুপক্ষী-পতংগের মেলা !
মুক্ত দ্বার, অবারিত প্রাণের ভাণ্ডার—
অকস্মাৎ যবনিকা মাঝখানে তার !
কবে বল কোথা কোন্‌ নেপথ্য-আড়ালে,
কোন্‌ রজনীর প্রান্তে দীপ্ত চক্রবালে

ফুরাইবে এ বিরহ ? পারাবার-শেষে
চুম্বিব অনন্ত বেলা তোমারি উদ্দেশে !

ক. বি. মাধ্যমিক (অতি) '৪৮

[উনিশ] আলো বলে, 'অন্ধকার, তুই বড় কালো !'
অন্ধকার বলে,—'ভাই, তাই তুমি আলো।' ক. বি. মাধ্যমিক '৪৩

[কুড়ি] খেয়া-নৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হ'তে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস,
রক্ত-প্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে।
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা,
উঠে কত হলাহল উঠে কত সুধা।
শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহাপানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম·
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হ'তে। ক. বি. মাধ্যমিক '৪১

[একুশ] শুনহ মানুষ ভাই,—
সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে বা নাই। ক. বি বি. এ. '৫৬

[বাইশ] লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে ; কুবেরের অন্তরের কথা হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। ক. বি. বি. এ. '৫৬

[তেইশ] প্রতিমার মাটি সত্য নয়, তাকে যতই গয়না দিয়ে সাজাইনে কেন ? অথচ প্রতিমার মধ্যে যে সত্য নেই এত বড়ো ঘোর ব্রাহ্মিক গোঁড়ামিও ঠিক নয়। আসল কথা তাকে আঁকড়ে ধরতে গেলেই ভুলটাকে ধরা হয়, তখনই সত্য দেয় দৌড়। যে পোকা বইএর কাগজ কেটে খায় সেই পৌত্তলিক, যে তাকে চিত্ত দিয়ে পড়তে পারে, কাগজ তার কাছে থেকেও নেই।—রবীন্দ্রনাথ।

ক. বি. বি. এ. (অনার্স) '৫৬

[চব্বিশ] বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন; শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ-সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন। ক. বি. বি. এ. '৫৬

[পঁচিশ] হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ ক'রে যাও গোপনে গোপনে। ক. বি. বি. এ. '৫৬

[ছাব্বিশ] বুদ্ধির জায়গায় বিধি এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবান্‌কে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যারা আত্মাবমাননা করে তারাই দুঃখ পায়, মনের জড়ত্ববশতই সে কথা তারা বোঝে না। বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে আর শাস্ত্রকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহ্নকালকেও সুপ্তির নিশীথরাত্রি বানিয়ে তোলে। ক বি বি. এ. (অনার্স)'৫৬

[সাতাশ] রাখালকে কেউ ভুলেও রাজসিংহাসনে আমন্ত্রণ করে না। এই জন্যেই বটতলায় সে বাঁশি বাজাবার সময় পায়। কিন্তু যদি দৈবাৎ কেউ করে বসে, তাহ'লে পাঁচনিকে রাজদণ্ডের কাজে লাগাতে গিয়ে রাখালি এবং রাজত্ব দুয়েরই বিঘ্ন ঘটে। ক. বি. বি. এ.'৫৫

[আটাশ] নাই ভগবান নাইকো যদি ধর্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা যে শুধু সয়তানী ইস্কুলে।
দূর করি সেই ঝুটো সভ্যতা যত ফুঁকো শিক্ষার,
দূর করি সেই ভেক্-নেওয়া যত অপমান ভিক্ষার,
আপনার মত আপন শিক্ষা নিজে নিতে হবে জিনে',
মুক্তির পথ মিলিবে তবে তো দেশজোড়া দুর্দিনে।

ক. বি. বি. এ. '৫৫

[উনত্রিশ] ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজ আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়াকেই সে ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে।

সে মনে করে যে, মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জলসেচন করিতেছে—গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা। ক. বি. বি. এ. '৫৪

[ত্রিশ] দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি,
সত্য বলে, তবে আমি কোথা দিয়ে ঢুকি ?
উভয় সংকটে পড়ি' দ্বার রাখি খুলি',—
ঘরের ভিতরে বেধে গেল চুলোচুলি। ক. বি. বি. এ. '৫৪

[একত্রিশ] ভয় হ'তে তব অভয়-মাঝারে
নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,
সংশয় হ'তে সত্য সদনে,
জড়তা হইতে নবীন জীবনে
নূতন জনম দাও হে। গৌ. বি. বি. এ. '৫০

[বত্রিশ] বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে ! ঢা বি. বি. এ. '৪৯

[তেত্রিশ] গৃহভেদ, জাতিভেদ, রাজ্যভেদ, ধর্মভেদ
নীচ মানবের নীচ দুষ্প্রবৃত্তিচয়,
জ্বলিছে যে মহাবহ্নি, করিবে নিশ্চয়
ভস্ম এই আর্যজাতি। চাহি আমি বক্ষ পাতি'
নিবাইতে সে বিপ্লব। ক. বি. বি. এ. '৪৮

[চৌত্রিশ] অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ-সম দহে। ক. বি. বি. এ. '৪৬

[পঁয়ত্রিশ] বাঙালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব-বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙালীরা মনে জানে যে, আমাদের পূর্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা-প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না। ক. বি. বি. এ. '৪৪

[ছত্রিশ] সুখ দুঃখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়ে যে করিবে আশ
দুঃখ যাবে তার ঠাঁই। ক. বি. বি. এ. '৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাবার্থ

আদর্শমালা

ঝর্ণার গান

[এক] পাহাড়! ওগো পাহাড়! তোমার বুকের নীড়ে
বৃথাই তুমি চাইছো মোরে রাখ্‌তে ঘিরে।
বাইরে যে-জন বেরিয়েছে সে ফিরবে নাক'
অচল তুমি, পথ-চলা সুখ পাওনিক' তাই দাঁড়িয়ে থাক';
সৃষ্টি-করার আনন্দ কি বিপুলতরা,—
—উষরমাটি শষ্পে-ভরা!
অরণ্য গো, অরণ্য! হায়, ডাকছো মোরে,
লক্ষ শাখার ব্যাকুল বাহু প্রসার ক'রে।
বিধুর তোমার ছায়া আমার পড়েছে বুকে,—
মর্মরিয়া দীন মিনতি গুঞ্জরিছ অ-বোল মুখে।
থামার সময় নেইক' আমার;—তোমার দেহে
বাড়িয়ে গেলাম সবুজ স্নেহে।
আকাশ আমায় আভাস দেছে সমুদ্ররূপ,—
বাতাস দেছে পৌঁছে অতল-বার্তা অনুপ।
গান গেয়ে ঐ ডাক্‌ছে বিহগ, —'আয়লো ত্বরা,
রত্নাকরে আপনা সঁপে ঊর্মিলা হও স্বয়ংবরা—'
ঢেউগুলি মোর ভাব্‌ছে—সাগর কখন্ পাবো;
যাবোই ওগো! যাবোই যাবো! গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫১

ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সীমিত জীবনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভগ্ন করিয়া সুদূর, বিপুল সুদূরের আহ্বানে মুক্ত প্রাণের অবাধ হিল্লোলে ছুটিয়া চলাতেই তো যত-কিছু সুখ, যত-কিছু আনন্দ। অচল পর্বতের ন্যায় স্থিরস্থাণু হইয়া জড়ের স্বস্তি পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু নিখিল বিশ্বের সংগে নিগূঢ় যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইলে প্রাণচঞ্চল মুক্তধারা নির্ঝরেরই ন্যায় অবারণ গতিতে, অজানার পানে, ভাবনাশূন্য হইয়া অগ্রসর হইতে হয়। পথিপার্শ্ববর্তী অরণ্যের বিপুল মায়া, তাহার কাতর মর্মরধ্বনি নির্ঝরের চলার উল্লাসকে

স্তম্ভিত তো করিতেই পারে না, পরন্তু বাঁধনহারা ঝর্ণাধারা তাহার নিরাসক্ত মুক্ত প্রাণের প্রীতিরসে অনুর্বরা ভূমিকে করে উর্বরা, করে শস্যশ্যামলা। ঠিক এমনি ভাবেই চলার-পথের অভিযাত্রী মুক্ত প্রাণের অবাধ হিল্লোলে শুধু যে ছোট আশা, ছোট সুখ, পিছনের স্নেহ-সুনিবিড় বেদনা-বিহ্বল আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া চলে তাহা নয়, যাত্রাপথে নব নব সৃষ্টির বিপুল আনন্দেও সে উঠে ভরিয়া। যে নিত্যপথের পথিক, উর্ধ্বে অনন্ত নীলাকাশ যাহাকে বিরাটের আভাস জানাইয়াছে, অপ্রতিহতগতি বায়ু যাহাকে গভীর-গহনের অতুলনীয় বার্তা শুনাইয়াছে, বিরাটের সহিত মহামিলনলাভের জন্য যাহার প্রাণ উতলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গতি অবরুদ্ধ করিবে কে ?

[দুই] একদল লোক আছেন যাঁরা বলেন 'আর্ট ক'রে কি পেট ভরবে?' এখানে একটি কথা মনে রাখ্‌তে হবে। ভাষা-চর্চার যেমন দুটো দিক আছে—একটি আনন্দ ও জ্ঞানের দিক আর একটি অর্থলাভের দিক, তেমনি শিল্পচর্চারও দুটো দিক আছে—একটি আনন্দ দেয়, আর একটি অর্থ দেয়। এই দুটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প। চারুশিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখ-দ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্য প্রয়োজনের জিনিষগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর ক'রে তোলে তাই নয়, অর্থাগমেরও পথ ক'রে দেয়।

শিল্পশিক্ষার অভাব যে শুধু আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা অসুন্দর ক'রে তুলেছে তাই নয়, আমাদের অতীত যুগের রসস্রষ্টাদের সৃষ্ট সম্পদ থেকেও আমাদের বঞ্চিত ক'রেছে। আমাদের চোখ তৈরি হয়নি, তাই দেশের অতীত গৌরব যে চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য, তা এতদিন আমাদের কাছে অবোধ্য ও অবজ্ঞাত ছিল, বিদেশ থেকে সমঝদার প্রয়োজন হ'ল সেগুলি আবার আমাদের বুঝিয়ে দিতে।

ক. বি. মাধ্যমিক '৫২

শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান নাই—ইহাই একদল লোকের ধারণা। কারণ, শিল্পচর্চা করিয়া অন্নসংস্থান হইবে না। কিন্তু এই ধারণা সর্বতোভাবে ভ্রমাত্মক। একথা মনে রাখা সমীচীন যে, শিল্পানুশীলন শুধু যে আনন্দই দেয় তাহা নয়, অর্থও দেয়। শিল্পের দুইটি দিক—যেটি আনন্দের দিক তাহার নাম চারুশিল্প আর যেটি অর্থের দিক তাহার নাম কারুশিল্প। চারুশিল্প প্রাত্যহিক দুঃখদ্বন্দ্বে কুণ্ঠিত আমাদের মনকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে; পক্ষান্তরে কারুশিল্প আমাদের নিত্য প্রয়োজনের সামগ্রীগুলিকে সৌন্দর্যে-মাধুর্যে ভরিয়া আমাদের চলার-পথে উপস্থাপিত করিয়া আমাদের অর্থোপার্জনেরও সুযোগ বহিয়া আনে।

বলিতে কি, শিল্পশিক্ষার অভাবই আমাদের জাতীয় জীবনকে দুই দিক দিয়া

বিধ্বস্ত করিতেছে : প্রথমত, আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার পথ অসুন্দর হইয়া উঠিতেছে ; দ্বিতীয়ত, চিত্রে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে আমাদের দেশ অতীতে যে কতখানি সমুন্নত হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার মত মনোভংগী হারাইয়া ফেলায় ঐ অবোধ্য অবজ্ঞাত স্বদেশীয় শিল্পকৃতিত্ব আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য বিদেশীয় সমঝদারের আসিবার প্রয়োজন ঘটিল। ইহা আমাদেরই লজ্জার কথা।

[তিন]

দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাহিক বিধাতা ;
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে;—'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায় ?
ধরণী নরের পদতলে।'
জ্ঞানী বলে,—'কার্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয় ;
এ জীবন প্রতীক্ষা-কাতর।'
ভক্ত বলে,—'ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর।'
ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান্।'
কবি বলে, 'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,—
'দয়াময় হও হে সদয়।'

ক বি. মাধ্যমিক '৫১ .

বিপুল এই বিশ্বসংসারে মানুষের মনোভংগীও বহুবিচিত্র। পারিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও মানস-অবস্থাই বিভিন্ন মানুষের অন্তরে বিভিন্ন মনোভাব সংক্রামিত করিয়া থাকে। ঈশ্বর আছেন কি নাই—থাকিলে তিনি কোথায়—কিই-বা তাঁহার স্বরূপ—কেমনই-বা তাঁহার রূপ—কখনই-বা তাঁহার প্রসাদ-লাভ ঘটিবে ইত্যাদি জিজ্ঞাসায় মানবমাত্রই মুখর। নিত্য দুঃখজ্বালায় জর্জরিত মানুষ বিধাতার বিধান সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়ে; সে মনে করে, এই পৃথিবী এক নিয়মবহির্ভূত নিষ্করুণ পদ্ধতিতে ঘূর্ণ্যমান। পক্ষান্তরে, যে-ব্যক্তির জীবন দুঃখকণ্টকে কণ্টকিত নয়, তাহার কাছে অদৃষ্ট বলিয়া কিছুই নাই। এহেন সুখী ব্যক্তি মনে করে, মানুষই বিশ্বেশ্বর। আবার যে-ব্যক্তি বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় বিচারশক্তিসম্পন্ন, সে কার্যমাত্রেরই কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য সমুৎসুক ; কিন্তু এই বিচিত্র বিপুল সৃষ্টিকার্যের সেই রহস্যময় স্রষ্টাকারণকে জানিবার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতীক্ষা করিতে থাকে। পক্ষান্তরে, যে-ব্যক্তি জ্ঞানের পথে না চলিয়া ভক্তির পথে চলে, সে অন্তরধর্মে বলীয়ান হইয়া অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে যে, এই পৃথিবী সেই আনন্দময়েরই লীলাপ্রাংগণ। যে-ব্যক্তি সত্যদ্রষ্টা ঋষি, সে কিন্তু

লীলাময় রসিকচূড়ামণির ধ্রুবত্ব, তাঁহার নিত্যতা, তাঁহার বিরাটত্ব কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে। আর কবি তো সেই অরূপকে রূপের অধিকারী, সকল শোভার মূলাধার, সকল সৌন্দর্যের কেন্দ্র রূপে কল্পনা করে। পরিশেষে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সংসারী ব্যক্তি ঐ অরূপ-সুন্দরকে করুণাময় ভগবান রূপে ভাবিয়া তাঁহার অকৃপণ করুণা যাচ্ঞা করে। দুঃখী, সুখী, জ্ঞানী, ভক্ত, ঋষি, কবি ও গৃহী—ইহাদেব প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভাব ও ভাবনার আশ্রয়ে এমনি ভাবেই অগ্রসর হইয়া থাকে।

[চার] বিদায় সিন্ধু! আসি,
প্রবাস-বন্ধু, লীলাছন্দের নীলানন্দের রাশি।
ফুরালো জীবনে নবনোৎসব লহরীপুঞ্জ গোণা
সন্ধ্যা-প্রভাতে তোমার নান্দী বন্দনা-গান শোনা।
তোমার কেশর ছুঁয়ে ভয়ে ভয়ে ফুরাইল ছেলেখেলা,
ফুরালো বালুকা-মন্দির-গড়া আনমনে সারা বেলা।
হেরিব না হায় তোমার ফণায় নিশীথে মণির দ্যুতি,
মহানীলিমায় ইন্দ্রিয়াতীত লভিব না অনুভূতি।
হেরিব না আর পুলিন-মাতার স্নেহের অংক 'পরে
ঊর্মিমালার ফেনিল মূর্ছা শ্রান্তি-হরণ তরে!
লভিব না আর প্রীতির শংখ শুক্তির উপহার,
ফুরালো অবাধ প্রাণের প্রসার মুক্তির অধিকার।

ক. বি. মাধ্যমিক '৫০

সমুদ্র নিছক সমুদ্রই নয, সে যে প্রবাসী কবির বন্ধু। উহার অসীম নীল বিস্তারে, অবিরাম তরংগভংগিতে, অশ্রান্ত কলগীতিতে কবির চক্ষু কর্ণ মন এমনই অভিভূত হইয়াছে যে, তাঁহার প্রবাসজীবন যাপনের একমাত্র বন্ধুই বুঝিবা ঐ সমুদ্র। সকাল-সাঁঝে সাগর-সংগীত শুনিয়া, সভয়ে ঊর্মিমালার সংগে খেলিয়া, বেলাভূমতে বালুকা-মন্দির গড়িয়া, নিশীথ-সমুদ্রের রূপবৈচিত্র্য দেখিয়া তীরদেশে ধাবমানা ঊর্মিমালার বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া, কূলে কূলে শংখ ও শুক্তি আহরণ করিয়া ধীরে ধীরে সমুদ্রের সংগে কবির এক নিবিড় মিতালি হইয়াছিল। কালক্রমে দিগন্তহারা সমুদ্রের বিরাট্ প্রাণের মধ্যে কবিচিত্ত শুনিয়াছে এক বিপুল মুক্তির সাড়া। তাই আজ সমুদ্রের কাছে বিদায় লইবার ক্ষণে এতদিনের বন্ধুত্ব, এতদিনের প্রীতি ও এতদিনের একাত্মতা স্মরণ করিয়া কবির অন্তর তীব্র বেদনায় বিমথিত হইয়াছে।

[পাঁচ] বুদ্ধদেবের সময়ে যদি সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাকৃত, ত'াহলে তাঁর খুব একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যেত। তাঁর চেহারা,

তাঁর চালচলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোটখাট ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগতাপ ক্লান্তিভ্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের সংগে মিল দেখতুম। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রমাণটাকেই যদি প্রামাণিক বলে গণ্য করা যায় তাহলে একটা মস্ত ভুল করি। সে ভুল হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের—ইংরেজিতে যাকে বলে পার্স্পেক্টিভ্। যে জনতাকে আমরা সর্বসাধারণ বলি, সে কেবল ক্ষণকালের জন্য মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। অথচ এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা শত শত শতাব্দী ধরে মানুষের চিত্তকে অধিকার করে থাকেন। যে-গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেই হল সাধারণ মানুষ, তাকে ডাঙায় তুলে মাছ কোটার মত কুটে বৈজ্ঞানিক যখন তার সাধারণত্ব প্রমাণ ক'রে আনন্দ করতে থাকেন তখন দামী জিনিষের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে এসেছে। সাধারণ সত্য মস্ত হস্তীর মত এসে এই বিশেষ সত্যের পদ্মবনটাকে দলন করলে সেটা কি সহ্য করা যাবে।

ক বি. মাধ্যমিক '৫০

সাধারণ মানুষ ও মহামানবকে একই মাপকাঠি দিয়া বিচার করা চলে না। প্রাত্যহিক জীবনের তথ্যস্তূপে ভারাক্রান্ত যে-মানুষটি, সে ঐ সাধারণ মানুষ ও মহামানব উভয়েরই মধ্যে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে, ক্ষণকালের এই প্রাকৃত জীবন, নিত্যধ্বংসশীল এই জনতা-জীবনকে এড়াইয়া যে গোপন মানুষটি শাশ্বতকালব্যাপী বাঁচিয়া থাকে, সে থাকে তাহার অন্তর্নিহিত বৃহত্তর মহত্তর ভাবজীবনকে কেন্দ্র করিয়া। অতএব, বুদ্ধদেবের ন্যায় মহাপুরুষের জীবনতথ্যের ছবি বা বিবরণ সম্ভব হইলে সিনেমা ও খবরের কাগজের কল্যাণে সংগ্রহ করা গেলেও, তাঁহার জীবনসত্যের পরিচয় ঐভাবে পাওয়া অসম্ভব। কেন না, জীবনতথ্য নয়, জীবনসত্যই কেবলমাত্র অনুভূতিগম্য। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণবুদ্ধির প্রাখর্যে সর্বসাধারণের সাধারণত্ব উদ্ঘাটিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু মহামানবের অসাধারণত্ব উদ্ঘাটন করা ঐ বিশ্লেষণবুদ্ধির অতীত। মহামানবজীবনের এই বিশেষ মূল্যবোধ অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই।

[ছয়] অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ-বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই

যে বাঙালীত্ব লইয়া অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল-গিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সে উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে। ক. বি. মাধ্যমিক (বিশেষ) '৫০

বাঙালী জাতির মধ্যে যাঁহারা কীর্তিমান খ্যাতিমান যশস্বী বলিয়া সুপরিচিত, তাঁহারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে যে কত তুচ্ছ, কত নগণ্য, তাহা বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত পাঠ করিলেই বুঝা যায়। বাঙালীত্বের তিনি সর্বোত্তম অধিকারী। চারিদিকের অধঃপতন হীনতা নীচতাকে উপেক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগর চারিত্রিক দৃঢ়বত্তার এমনই এক সু-উচ্চ আসনে সমাসীন যে, চরিত্রবত্তায় তাঁহাকে অতিক্রম করা অথবা তাঁহার সমকক্ষ হওয়া কোনও বাঙালীর সাধ্যায়ত্ত নয়।

[সাত] কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি'।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?"
দেবতা কহিল, "আমি।" শুনিলাম না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুকে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা, ওরে মায়ার ছলনা।"
দেবতা কহিল, "আমি।" কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি,' "তুমি কোথা প্রভু!"
দেবতা কহিলা, "হেথা।" শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি',
দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।" ক. বি. মাধ্যমিক (অতি) '৪৯

সুখদুঃখে-ভরা এই যে জীবন ও জগৎ—ইহাকে ভালবাসা, ইহার মহিমা অনুভব করা, ইহাই তো মানবজীবনের সব চেয়ে বড় কথা। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনেরই মধ্যে পাতা রহিয়াছে ভগবানের আসন। মায়ার ছলনা বলিয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ভগবানকেই পরিত্যাগ করা হয়। সংসারকে অস্বীকার করিয়া যে-বৈরাগ্য, তাহা ভগবানকেই করে ব্যথিত। কেন না,—এই জগৎ ও জীবন তো তাঁহারই অভিব্যক্তি—ইহারই মাঝে তিনি আত্মগুপ্ত। তাই ছোটো-বড়োতে, ভালো-মন্দে, দুঃখ-সুখে মেশানো এই যে জগৎ ও জীবন—ইহারই মাঝে হয় চিরসুন্দরের প্রকাশ আর সংসারের ভিতরে থাকিয়া আনন্দানুভূতিই তো সেই চিরানন্দময় ভগবানের উপাসনা।

[আট] পাখিটি মরিল। কোন্ কালে যে, কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখি মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, একটি কথা শুনি।"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ওকি আর লাফায়!"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম।"

"আর কি ওড়ে!"

"না।"

"আর কি গান গায়!"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়!"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আনো তো দেখি।"

পাখি আসিল। সংগে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়-সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তাব পেটের মধ্যে পুঁথির শুক্‌নো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৪৯

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক ধর্ম, স্বাভাবিক পরিবেষ্টনী হইতে যাহাকেই ছিন্নভিন্ন করিয়া আনিযা নূতন-কিছু প্রবৃত্তি, নূতন-কিছু ধর্ম, নূতন-কিছু পরিবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাক্ না কেন, মুক্ত জীবনের স্বাদ ও সহজাত প্রকৃতির ধর্ম সে কখনও ভুলিতে পারে না। লাফালাফি কবা, উড়িয়া বেড়ানো, গান গাওয়া, ক্ষুধায় চীৎকার—ইহাই তো মুক্ত পাখির জীবনধর্ম। এই জীবনধর্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া যে-শিক্ষাই তাহাকে দেওযা হোক্ না কেন, তাহার মৃত্যু তো ঘটিবেই। সেইরূপ যে মানুষ মুক্ত জীবনের স্বাদ বুঝিয়াছে, তাহাকে বন্ধনদশার মধ্যে রাখিয়া যে-শিক্ষাই দেওয়া হোক্ না কেন, সে শিক্ষা তাহার অন্তরকে ভরিয়া তুলে না। যেন একটি আলাদা ও স্বতন্ত্র সত্তা লইয়া সেই বহিরাগত শিক্ষা হয় প্রকটিত। হয়তো-বা এই যে শিক্ষা—ইহা শিক্ষার্থীর মৃত্যুরও কারণ হইয়া পড়ে। স্বভাবের সংগে শিক্ষার মেলবন্ধন না ঘটিলে এইরূপই হইয়া থাকে।

[নয়] বহু দিন গত চৈতি গাজন,
মেঘে-মাঠে আজ অম্বুবাচন
থামাও তোমার পাগুলে নাচন

বেঁধে নাও জটাজূট,
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া
প্রলয়-শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গ'ড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল
ধরো লাঙলের মুঠ।
আমাদেরি সাথে চলো গো ঠাকুর'
এই নাচে-পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল
পাথরও যেন গো ফাটে!
শংকর! হও সংকর্ষণ,
মাটি-ছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শস্যে শ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৪৯

চৈত্রমাসে হয় শিবের গাজন-উৎসব। বৈশাখে যে প্রচণ্ড সূর্যকিরণ পৃথিবীর বুকের উপরে পড়ে, তাহাতে সকল সরসতা উবিয়া গিয়া দেখা দেয় আত্যন্তিক নীরসতা। সংহারত্রিশূল-হস্তে রুদ্র ভৈরবের তাণ্ডবনৃত্য তখন প্রকৃতির রংগমঞ্চে সুরু হয়। ইহারই কিছু দিন বাদে আসে আষাঢ় মাস। তখন পৃথিবী হয় রজঃস্বলা। অবিরাম বারিবর্ষণে মাঠ ও প্রান্তর যায় জলে ভরিয়া, রৌদ্রদগ্ধ নীরস মাটি হয় সরস, অনুর্বরা ভূমি হয় উর্বরা। দিগন্তবিস্তৃত মেঘ আর তাহার বর্ষণ—এই সময়ে প্রলয়ংকর শিবকে হলধর বলরামের বেশে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হইতে হয়। নচেৎ,—ধরণী যে শস্যশ্যামলা হয় না। আর ধরণী যদি শস্যশ্যামলা না হয়, তাহা হইলে শিবগৃহিণী অন্নপূর্ণারও তো লজ্জা। তাই অন্নপূর্ণা যাঁহার নাম, তাঁহারই নামগৌরব রক্ষা করিবার জন্য রুদ্র শিবকে শেষ অবধি সৃষ্টিরূপ লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে হয়।

[দশ]

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি' সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষ্ণায় আকুল বংগ করিত রোদন
কঠোরে গংগায় পূজি' ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি ;
পবিত্রিলা আনি' মায়ে, এ তিন ভুবন ;

সেইরূপে ভাষাপথ খননি' স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি,
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়-ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্।। ক. বি. মাধ্যমিক '৪৯

গংগা ছিলেন মহাদেবের জটাজালের মধ্যে আবদ্ধ। ভগীরথ মহাদেবের কঠোর তপস্যা করিয়া গংগাকে সেই জটাজাল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া ভস্মীভূত সগর-সন্তানদিগকে শাপমুক্ত করিয়া তাহাদিগের মহদুপকার সাধন করেন। বেদব্যাস-রচিত মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাই কবি কাশীরাম দাস মূল সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারতের বাংলায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙালীর অতুলনীয় উপকার করিয়াছেন। এই জন্যই সগরবংশের শাপ-বিমোচনকারী ভগীরথের সহিত বাঙালীর অজ্ঞানতাবিতাড়নকারী কাশীরাম দাসের নাম একই সংগে স্মরণীয়।

[এগারো] সমস্ত সৌরজগৎ যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছে, তেমনই অন্য দিক দিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন মানবজীবনকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বিশ্বচরাচর দিবারাত্র ঘুরিতেছে। এই যে এক বিপুল বিশ্বব্যাপী নিগূঢ় আকর্ষণ, ইহাকে এক হিসাবে বিশ্বের কেন্দ্রগামিনী শক্তি বলা যাইতে পারে। মানব এই বহুধাবিভিন্ন শক্তিসংঘের অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাতে সর্বদা স্পন্দিত জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ। এই যে এক অচেনা অজানা বিপুল ব্রহ্মাণ্ড-শক্তিনিচয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া মানব ধীরে ধীরে আপনার শক্তি সঞ্চয়পূর্বক অন্য সকল শক্তিকে অভিভূত করিবার নিয়ত চেষ্টায় কখনও উঠিতেছে, কখনও-বা পড়িতেছে, ইহাই মানবের সংসার, ইহাই মানবের ভাগ্য। সুখ এবং দুঃখ এই ভাগ্যেরই অবস্থা-বিপর্যয়। কখনও সুখ-রবির খর-কিরণে সে ভাগ্য প্রসন্ন, নির্মল, জাজ্বল্যমান; আবার কখনও সে সুখ কেন্দ্রীয় ঊষার ন্যায় ক্ষণিক ম্লান আলোকে দুঃখের তমিস্র কথঞ্চিৎ অবসান করিয়া দেয়।

ক. বি. মাধ্যমিক (অতি) '৪৮

সারা বিশ্বচরাচর ব্যাপিয়া এক রহস্যময় শক্তিসত্তার তাহার লীলা প্রকটিত করে। আর মানুষ সেই শক্তি-অভিব্যক্তির মাঝে থাকিয়া আপন শক্তি আহরণ করিয়া জগতের সকল বিরুদ্ধ ও বিচিত্র শক্তির সহিত সংঘর্ষে কখনও-বা উত্থান, কখনও-বা পতন, আবার কখনও-বা সুখ, কখনও-বা দুঃখ, এই উভয়ের মধ্যে যে-কোন একটির সাক্ষাৎ লাভ করে। সংঘর্ষই তো মানুষকে করে আত্মপ্রবুদ্ধ। সংঘাতের মধ্য দিয়াই তো ঘটে মানবজীবনের অভিব্যক্তি। আর এই সংঘর্ষের ফলেই একটানা প্রগাঢ়

সুখ মানুষের অদৃষ্টে দেখা দেয় না, দেখা দেয় সুখের তারতম্য, দেখা দেয় দুঃখেরও মাঝে সুখের ক্ষীণ আলোক।'

[বারো] কলা সম্বন্ধে রাস্কিনের মত খুব প্রশস্ত এবং উদার। তাহাতে কোনরূপ সংকীর্ণতা নাই—কলাসম্ভোগ হইতে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতে চাহেন না। ধনী নির্ধন সকলেই তাহাতে আমন্ত্রিত। কেবল তাহাই নয়। পরম ভক্ত ভাগবতকার যেমন বলেন, 'ধর্ম' সম্যক অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি ভগবানে ভক্তি উৎপাদন না করে, তবে তাহা "শ্রম এবহি কেবলং", রাস্কিনও সেইরূপ বলেন, 'যে জীবনে পরিশ্রম নাই, সে জীবন যেন একটি গুরুতর অপরাধ ; এবং যে পরিশ্রমে কলার আনন্দ নাই, তাহা পশুত্ব।' তাঁহার সমুদয় শিক্ষার মধ্যে এই একটি কথা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত—মানব-চরিত্রের উন্নতিসাধনে কলাবিদ্যা শ্রেষ্ঠ সহায়। কারণ, এই জগতে যাহা কিছু আছে—অসীম বাহ্য প্রকৃতির বিরাট্ ব্যাপার হইতে সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্যন্ত, এবং অনন্ত দুরবগাহ মানবহৃদয়ের সুখ-দুঃখের গভীর আলোড়ন হইতে সামান্য সাধটি পর্যন্ত সকলই কলাবিদ্যার বিষয়ীভূত হইতে পারে। ক. বি. বি এ '৪৯

কলাবিদ্ রাস্কিনের মতে, নিসর্গজগৎ ও মানবজীবন উভয়ই ললিতকলার অংগীভূত। বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন রহস্য, সে এখন বৃহত্তমই হোক্, কি ক্ষুদ্রতমই হোক্ এবং অন্তহীন রহস্যে-ভরা সুখ-দুঃখের আলোড়নে আলোড়িত এই যে মনুষ্যচিত্ত—এ সকলেরই মাঝে আছে শিল্পবোধ ও শিল্পানুভূতির উপকরণ। এই কলাবিদ্যাই মানুষকে করে পূর্ণ, তাহার চরিত্রকে করে সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল। যে মানুষ তাহার সমগ্র জীবনানুশীলনের মধ্যে বা তাহার সকল প্রয়াসের মধ্যে শিল্পচর্চার আনন্দ উপভোগ করিতে না পারে, তাহার জীবন বৃথা ও ব্যর্থ। বলিতে কি, এহেন শিল্পবোধবর্জিত জীবন পশুত্বেরই নামান্তর। তাই শিল্পচর্চা এমনই একটি জিনিষ যে, ইহা একদিকে যেমন উচ্চনীচনির্বিশেষে সর্বজনভোগ্য, অপর দিকে তেমনি ইহার অভাব মানবজীবনের সর্বাংগীণ স্ফূর্তি এবং পূর্তির পথে দুর্লংঘ্য অন্তরায়ও বটে।

[তেরো] এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে

অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
ভয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম,—হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।

জন্মমাত্র ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে। ক. বি. বি. এ. '৪৯

বীরধর্মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, কর্তব্যের প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা রক্ষা করাই প্রকৃত বীর্য-শৌর্যের লক্ষণ। এই কর্তব্যপালনে স্নেহ-প্রীতি-প্রেমের কোন স্থান নাই। হয়তো-বা নিয়তির বিধানে শেষ অবধি নিশ্চিত পরাভবই দেখা দিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কর্তব্যবিমুখতা মানবধর্ম নয়। কর্মপ্রয়াসেরই মধ্যে মানুষের সত্যকার পরিচয় নিহিত থাকে। বিশেষত জন্ম হইতেই যে-জন তাহার জীবনে স্নেহ-প্রীতি-প্রেম হইতে বঞ্চিত, তাহার অভিমানাহত চিত্তে স্নেহ-প্রীতি-প্রেমের কোন আবেদন-নিবেদনই স্বীকৃত হইতে পারে না। তাই বীরধর্মের প্রতি তীব্র আকর্ষণই বীর জনের অন্তরে নিরংকুশভাবে জড়াইয়া থাকে।

[চোদ্দ] যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবনের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাংকুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন দেয়, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে। ক বি. বি. এ. '৫০, '৫২

সেই নিরাকার অরূপ-সুন্দর অনন্তকে অনুভব করা যায় কেবলমাত্র প্রেমেরই দর্শনে। নিসর্গজগতে প্রসারিত অন্তহীন সৌন্দর্যের মধ্যে ঘটিয়াছে সেই অরূপ-সুন্দরেরই রূপময় অভিব্যক্তি। যিনি প্রকৃতি-প্রেমিক, তিনি সেই প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরকে অনুভব করিতে সক্ষম। আবার যিনি মানব-প্রেমিক, তিনিও এই মনুষ্য-জগতের নরনারীগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বিভিন্ন সম্পর্কের অন্তরালে সেই অসীম প্রেম-স্বরূপেরই আবির্ভাব অনুভব করিতে সমর্থ। মানবপ্রেমের সীমায় সেই অসীমকে, সেই প্রেমময়কে উপলব্ধি করাই তো বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা। সন্তানের প্রতি মাতৃহৃদয়ের

অজস্র স্নেহধারা-সিঞ্চনে উদ্ভূত যে বাৎসল্যভাব, প্রভুর জন্য দাসের আত্মোৎসর্গে সৃষ্ট যে দাস্যভাব, বন্ধুর জন্য বন্ধুর স্বার্থবলিদানে বিকশিত যে সখ্যভাব, নরনারীর অকৃত্রিম আত্মসমর্পণে পরিস্ফূর্ত যে মধুর ভাব—এ সমস্তই তো প্রেমভাব। এই প্রেমানুভূতিই ঈশ্বরানুভূতির সোপান।

[পনেরো] ধরণীর শ্যাম করপুটখানি ভরি' দিব আমি সেই গীত আনি'
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী অর্থভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি' নব মায়া এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
ক'রে দিয়ে যাব বসন্তকায়া বাসন্তীবাস পরা
ধরণীর তলে গগনের গায়, সাগরের জলে, অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙীন করিয়া দিব।
সংসার-মাঝে কয়েকটি সুর রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর, তারপর ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ'পরে শিশিরের মত রবে।
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে, মাগিছে তেমনি সুর।
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা
বিদায়ের আগে দু'চারিটি কথা রেখে যাব সুমধুর।

ক বি. বি. এ. '৫০,'৫২

এই নিখিল বিশ্বের অন্তর্গত নিসর্গপ্রকৃতি ও মনুষ্যপ্রকৃতি হইতে সৌন্দর্য-সুষমা তিলে তিলে আহরণ করিয়া ছন্দে-গানে, ভাবে-ভাষায় আনন্দলোক-বিরচনই তো কবির কর্ম। নবীন আষাঢের মায়া-কুহেলিকা, ভূতল ও নভোমণ্ডলের সৌন্দর্য, সাগর ও বনানীর মাধুর্য—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে-ভরা এই যে বিচিত্রসুন্দর ধরণী, ইহা মনুষ্যমনে সঞ্চারিত করে বিস্ময়রস, জাগায় সীমাহীন ভাবাবেশ। ইহারই গীতি-ছন্দস্পন্দিত বাণীমূর্তি ফুটিয়া উঠে কবির কাব্য-কবিতায়। কিন্তু কেবলমাত্র নিসর্গ-প্রকৃতির কথা লইয়াই নয়, মনুষ্যপ্রকৃতির কথা লইয়াও কবি মুখর। রূঢ় বাস্তবতার আঘাতে জর্জরিত এই যে মনুষ্যজীবন, ইহাও কবির কাব্যকবিতায় রহস্যমধুর মোহমদির সুরঝংকারে যায় ভরিয়া। কবিই আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া মানুষের হর্ষবিষাদকে এমন সমুজ্জ্বল, মানুষের আনন্দবেদনাকে এমন সৌন্দর্যময় করিয়া তোলেন

.া, মানবসংসার স্নেহামৃতধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া যেন আরও আপনার হইয়া উঠে। প্রেয়সী নারীর অন্তরে প্রেমের উদ্বোধন, শিশুর সদাহাস্যময় বদনমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া স্নেহের পরিপ্রকাশ—এসবই তো কাব্য-কবিতার সামগ্রী। এক দিকে নিসর্গপ্রকৃতি এবং অন্য দিকে মনুষ্যপ্রকৃতি—ইহাদের সাহচর্যে আসিয়া সাধারণ মানুষের অন্তরের গভীর তীব্র ভাবানুভূতি অনুভূত হয় সত্য, কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিবার ভাষা সাধারণ মানুষের নাই। সেই নিগূঢ় অব্যক্ত প্রকাশ-বিহ্বল ভাবানুভূতিকে বাণীভংগির মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া, অনির্বচনীয়কে বচন মহিমায় বিমণ্ডিত করিয়া যে কবি-ভাষা স্ফূর্ত হয় তাহারই গুণে এই নিখিল বিশ্বপ্রকৃতি এক মধুর অর্থময়তায় উঠে ভরিয়া।

অনুশীলনী

[এক] ভূগর্ভের নিম্নস্তরে যেমন বহিরুপদ্রব হইতে নিরালায় বহু পূর্বতন যুগের কংকালাবশেষ পাষাণ হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মবিপ্লব সেইরূপ বহিঃশত্রুর নিরন্তর আক্রমণ হইতে দূরে উড়িষ্যার উপকূলে পাষাণখোদিত হইয়া কথঞ্চিৎ রহিয়া গিয়াছে। সিন্ধুপার হইতে মুসলমান আক্রমণের বন্যা এত দূরপ্রান্ত অবধি আসিয়া পঁহুছিত না, এবং কাঠজুড়ি ও মহানদীর তীর হইতে মুসলমান সেনাকে দুই চারিবার এমন বিফলমনোরথ হইয়াও ফিরিতে হইয়াছে। অবশেষে উড়িষ্যা যদিও মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তথাপি এই নদী-পাহাড় বন-জংগল সমাকীর্ণ ভূখণ্ডের সর্বত্র তাহার স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মন্দিরে মন্দিরে দেবতাগণ মধ্যে মধ্যে লাঞ্ছিত হইয়াছেন এবং প্রাচীন কীর্তিও দু'একটা বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত দেবমন্দিরের পাষাণে মসজিদের প্রাচীর নির্মাণ করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। সেই জন্যই উড়িষ্যা এখনও মন্দিরের দেশ। রাজধর্ম যখন যাহা প্রবল হইয়াছে, আপনার উন্নত মহিমা প্রচার করিতে অভ্রভেদী পাষাণ-শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে, এবং এইরূপে ভারতবর্ষের বিলুপ্তপ্রায় ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিনের জীবন-গৌরব রক্ষা করিতেছে। ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৬

[দুই] যুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আঁচল-ধরা, তারা মানসিক। আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেন দেশের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ এক সময় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অন্য যুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্বগৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে, স্পেনের চিত্ত ধর্মে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে অবরুদ্ধ, তাই তার চিত্তসম্পদের উন্মেষ হয়নি। যারা এমনিভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে হাস্যকর দুঃখকর লজ্জাকর ব'লে মনে করে, তারা জীবন্মৃত

জাতি। তাই ব'লে অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মানুষকে জানতে হবে যে, অতীতের সংগে তার সম্বন্ধ ভাবী কালের পথেই তাকে অগ্রসর করার জন্য। আমাদের চলার সময় যে পা পিছিয়ে থাকে সেও সামনের পাকে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সামনের পাকে পিছনে টেনে রাখ্‌ত তা হলে তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত। তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু নির্মাণ করে দিয়ে মানুষের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৬

[তিন] মৃত্যুর তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গেছে, তাহারা পাস মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত হইয়া গেছে। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে; যাহার প্রাণ আছে, তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয়, সে-ই মরিতে কৃপণতা করে। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬

[চার] নকল করার মধ্যে কোনও গৌরব বা মনুষ্যত্ব নাই। মানসিক শক্তির অভাববশতই মানুষে যখন কোনও জিনিষ রূপান্তরিত ক'রে নিজের জীবনের উপযোগী ক'রে নিতে পারে না, অথচ লোভবশত লাভ করতে চায়, তখন তার নকল করে। নকলে বাইরের পদার্থ বাইরেই থাকে, আমাদের অন্তর্ভূত হয় না, তার দ্বারা আমাদের মনের এবং চরিত্রের কান্তি পুষ্ট হয় না, ফলে মানসিক শক্তির যথেষ্ট চর্চার অভাববশত দিন দিন সে শক্তি হ্রাস হ'তে থাকে। ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৬

[পাঁচ] 'আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু
চিরকাল মনে রাখিবে, এমন কিছু,
মূঢ়তা করা তা নিয়ে মিথ্যে ভেবে।
ধুলোর খাজনা শোধ করে নেবে ধুলো
চুকে গিয়ে তবু বাকি র'বে যতগুলো
গরজ যাদের তারাই তা খুঁজে নেবে।
আমি শুধু ভাবি, নিজেরে কেমনে ক্ষমি,
পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি উঠেছে জমি',
কোন্‌ সৎকারে করি তার সদ্গতি।
করিব গর্ব নেই মোর হেন নয়,
করিব লজ্জা পাশাপাশি তারি রয়,
ভারতীর আছে এই দয়া মোর প্রতি।

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে
সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্যে যে জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।

ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৬

[ছয়] সেই কথা স্মরি বার বার আজ
লাগে ধিক্কার প্রাণে
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনোখানে।
এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।
কারো কবিত্ব কারো বীরত্ব
কারো অর্থের খ্যাতি,
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ্ সহায়
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি,
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া
ফুরাতে ফুরাতে র'বে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৬

[সাত] দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের বিরোধ ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধ প্রয়োজন; এইরূপ প্রতিরোধের অভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে শান্তি ও সুশাসন দুর্লভ ছিল। এই প্রতিরোধকে কার্যকর করিতে গেলে, ধীরভাবে সংযতভাবে চালাইতে গেলে, স্থায়ী করিতে গেলে, প্রতিরোধ যাহারা করিবে তাহাদের দলবদ্ধ হওয়া চাই। দল না থাকিলে, বহু সুচিন্তিত বিধান লিপিবদ্ধ হইতে পারিত না, সচ্ছন্দেশ্যে প্রণীত বিধি স্বপ্নপূর্ণ থাকিয়া যাইত, অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও সম্ভব হইত না, স্বাধীন

রাজ্যের নীতির কোনও স্বাধীনতা থাকিত না। সমাজ চপলমতির ক্রীড়নক হইয়া দাঁড়াইত। বিশেষত, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নির্ভর করে ইচ্ছামত কর্ম করিবার শক্তির উপর; সে শক্তি অর্জন করিতে হইলে জনগণের মধ্যে সমবায়ের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে থাকা চাই, নতুবা ভ্রান্ত, উন্মত্ত, অত্যাচারী যখন স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করিতে থাকিবে, তখন বিরোধী দলের সৃষ্টি না হইলে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে কে?

ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৫

[আট] [শরৎঋতুর বর্ণনা]

আমার কবির চিত্ত দেখেছে তোমার সত্য ছবি;—
তোমার হৃদয়ে সখা, নাই দৈন্য, নাই কোন ব্যথা,
লভিয়াছে আপনাতে আপনার পূর্ণ সার্থকতা,
হে শরৎ, হে কিশোর কবি।
মনের মাধুরী তব স্নিগ্ধতর করেছে জোছনা,
স্বর্ণাভ করেছে রৌদ্র দীপ্ত তব গোপন বাসনা।
মরমের গভীরতা একান্ত যা তোমারি আপনা,—
সে-ই তো করেছে এই নীল নভ সুনীল গভীর,
প্রাণের তারুণ্য তব শ্যামতর করেছে বচনা
শ্যামাঞ্চল এই পৃথিবীর।

ক. বি. মাধ্যমিক (কলা) '৫৫

নয়]

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে ঘেরা সহস্র কুটিরে,
দোহন-মুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে
গংগার পাষাণ-ঘাটে দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বংগজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।
শরৎ-মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাত, প্রফুল্ল অধরে

বাক্যহীন প্রসন্নতা ; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ করে বিকিরণ।
হেরি সে মংগলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৫

[**দশ**] আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপরে নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে ; মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই, এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। যাঁরা বলেন শ্রমিকরাজ বা গণরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে তাঁরাও বোধ হয় একটু ভুল করেন, কারণ 'রাজ' কথাটাই তো ঊর্ধ্বলোকের কথা। প্রকৃত সাম্যবাদের ভিত্তি যথার্থ সমানাধিকারের ওপরে গড়ে ওঠাই কাম্য। এ অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই এবং দ্রুত গতিতেই আসা খুবই বাঞ্ছনীয়। প্রতিশোধ-স্পৃহার মধ্য দিয়ে নয়, সর্ব মানবের যথার্থ কল্যাণ কামনার ভেতর দিয়েই যেন আমরা সমাজের একটি রুচ ও সুন্দর নতুন রূপকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। **ক. বি. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) '৫৫**

[**এগারো**]

ধুলোট হয়ে গেছে, ভাঙিয়া গেছে মেলা,
পাতের ঠোঙা লয়ে, কাকেরা করে খেলা।
ভাসান হয়ে গেছে, বিজন পূজাবাড়ি,
জাগিছে উৎসব-স্মৃতিটি বুকে তারি।
ফুরায়ে গেল ধীরে বিবাহ-উৎসব,
নীরব নহবৎ নীরব হুলুরব।
যেতেছে পায়ে পায়ে মুছিয়া আলিপনা,
বিদায় লোকজন, বিরল আনাগোনা।
এই তো শেষ ওগো, এই তো সমাপন,
হৃদয় খালি ক'রে কাঁদায় প্রাণমন !
সহে না প্রাণে ওগো, আসিয়া চলে-যাওয়া,
পাওয়ার চেয়ে ভাল ছিল যে পথ-চাওয়া।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫৫

[বারো]

এ যেন প্রভাতের মলিন বাঁকা-শশী,
সুখের চেয়ে এতে দুখ যে মাখা বেশী !
পরম আত্মীয় ব'লে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।
অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তার আমার জীবনে
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দুজনায়
তাহার অনন্ত গুণ চিনি নাকো হায়।
দুজনের একজন একদিন যবে
বারেক ফিরাবে মুখ, এ নিখিল ভবে
আর কভু ফিরিবে না মুখামুখি পথে,
কে কার পাইবে সাড়া অনন্ত জগতে।
এ ক্ষণমিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।
মুহূর্ত-আলোকে কেন হে অন্তরতম
তোমারে চিনিনু চিরপরিচিত মম।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প)'৫৫

[তেরো] একটা বরফের পিণ্ড ও ঝরণার মাঝে তফাৎ কোন্খানে ? না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এই জন্য বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে—এই জন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরণার যে গতি সে তার নিজের গতি ;—সেই জন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এই জন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মনেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনই সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে কাজ করায়, সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করিতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার-বিচার, যত শাস্ত্র-শাসন। তখন মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। ক. বি. মাধ্যমিক '৫৪

[চোদ্দ] শক্তি-দম্ভ স্বার্থ-লোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
দেহ হতে দেহান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।
যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।
বস্তুভারহীন মন সব জলেস্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে। আজি তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর। **ক. বি. মাধ্যমিক '৫৪**

[**পনেরো**] শত সহস্র বৎসরের মহারণ্য অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগ-যুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষারবত্রমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মত। চারিদিকের জগৎ নূতন থাকে আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলেছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারিদিকে বিরাট প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। এমনি করে মানুষই এক চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন—সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে উঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জনা সঞ্চিত থাকে—অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারিদিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। **ক. বি. মাধ্যমিক '৫৩**

[**ষোলো**] সভ্য জগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ এক হাতে গড়েনি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ, বিদেশি ভাষা ও বিদেশি সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিলে মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুণো হয়ে

পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডির মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই যে, মনোবাজ্যে কূপমণ্ডূক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক্ না কেন। এবং একথাও অস্বীকার করিবার জো নেই যে, যে জাতি মনে যতই বড় হোক্ না কেন, তার মনের একটা বিশেষ রকম সংকীর্ণতা আছে, এবং তার মনের ঘরের দেয়াল ভাঙবার জন্য বিদেশি মনের ধাক্কা চাই। বিদেশির প্রতি অবজ্ঞা বিদেশি মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে এবং এই সূত্রে জাতির প্রতি জাতির দ্বেষ হিংসাও প্রশ্রয় পায়। সুতরাং বিদেশি সাহিত্যের চর্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে, আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি।

ক. বি. মাধ্যমিক '৫৩

[সতেরো]

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সংগে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গংগা নামে সতা তার তরংগ এমনি।
জীবনস্বরূপা যে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প ৫২

[আঠারো]

বনের পাখি বলে, "আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তার।"
খাঁচার পাখি বলে, "খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।"
বনের পাখি বলে, "আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।"

খাঁচার পাখি বলে, "নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।"
বনের পাখি বলে, "না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই।"
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই।"

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫২

উনিশ

মনে হয় শেষ করি—কিন্তু কোথায়?
বলিবার যাহা ছিল সব বাকি যায়।
এ বাদলে কোনো কথা জমে নাকো ভালো,
এ বাতাসে আদ বক্ষে নাহি জ্বলে আলো।
নিবিড় তিমির ভরে মনায় যে ব্যথা
মন-অন্তস্তলে, ভাষা তার নাহি কোথা
পাই খুঁজে খুঁজে। মেঘমন্দ্রে, বৃষ্টিধারে,
তড়িত-চকিতে, সূচীভেদ্য অন্ধকারে,
ঘননীল মেঘে, নিবিড় তমাল বনে,
আর্দ্র-বসুধা সৌরভে, বিরহ-গহনে,
কোন্ ব্যথ অভিসারে, কখন কোথায়
ফুটে ফুটে কবি' যেন মিলাইয়া যায়।
মিছে আশে দিশে দিশে ঘুরিছে হৃদয়
বলিতে আসিয়া আর বলা নাহি হয়।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫১

কুড়ি

বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি,
হে ধরিত্রি, জীব-ধাত্রি! নিত্য দিবাযামী
মাতৃহৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান লাগি', নিয়ত ক্রন্দন
তারি নুপস্পর্শ তরে, কবি' দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহাশব্দময়
অনন্ত স্পন্দন মাঝে, শিখাও আমায়
সে পুণ্য-রহস্য-তত্ত্ব—যার মহিমায়

প্রত্যেক নিমেষে সহি' বিয়োগ-বেদন
লক্ষ কোটি সন্তানের, প্রশান্তবদন ,
তবু ফুটাতেছ ফুল জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রিদিন দ্যুলোক, ভূলোক।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫১

[**একুশ**] ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন!
দুর্বল মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না স্বজিত বিধি হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে,
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ-প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির-শোভা! পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস,
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস।

নিম্নরেখাংকিত বাক্যাংশগুলির অর্থ স্বতন্ত্রভাবে পরিস্ফুট কর।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিশেষ) '৫০

[**বাইশ**] মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃংখলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে?

ক বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫২

[**তেইশ**] সাহিত্য আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের, ছন্দের, আভাস-ইংগিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাটিকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী ও হ্রী, সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত, তাহা অলংকারকে অতিক্রম করিয়া উঠে—তাহা অলংকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রচলিত ভাষার দুইটি জিনিষ মিশাইয়া

থাকে—চিত্র ও সংগীত। চিত্র ভাবকে আকার দেয়, এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ, এবং সংগীত প্রাণ। সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র।

ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) '৫১

[চব্বিশ] বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি' দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে, গন্ধে, গানে,
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া। **ক. বি. বি. এ '৫১**

[পঁচিশ] মনুষ্য মাত্রেই পতংগ। সকলের এক একটি বহ্নি আছে। সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে।—কেহ মরে, কেহ কাঁচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাঁচময়। কাঁচ না থাকিলে সংসার এতদিনে পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানসপ্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞানবহ্নির আবরণ-কাঁচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়; সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, মানবহ্নিতে নিত নিত্য সহস্র পতংগ পুড়িয়া মরিতেছে, আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন-পতংগকে পোড়াইলেন;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত প্যারাডাইস্ লষ্ট্। ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি, সেন্ট্ পল। ভোগবহ্নির পতংগ এণ্টনি ক্লিওপেত্রা। রূপ-বহ্নির রোমিও-জুলিয়েত, ঈর্ষা-বহ্নির ওথেলো। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে স্নেহ-বহ্নিতে সীতা-পতংগের দাহ-জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতংগ না ত কি? **ক. বি. বি. এ. '৫১**

[ছাব্বিশ] বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সংগে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সংগে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ীর নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কি হইবে? এক-এক ঋতুতে এক-এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আসে, তখন মানুষ যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতে পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল? পুরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ-কথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সংকীর্ণ ধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন? কেন সে দম্ভ করিয়া বার বার একথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, আমি উদ্ভিদ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ—আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি। কেন সে এ-কথা বলে না, আমি সমস্তই, সকলের সংগেই আমার অবারিত যোগ আছে—স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে।

হায় রে সমাজ-দাঁড়ের পাখি। আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখ দু'টির মত স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মত নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মত চঞ্চল—তবু তোর পাখাদুটো আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্ঝন্ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম! ক. বি. বি এ. '৫৩

[সাতাশ] জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য-সংসারের মহানিকেতনে,
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মত।
তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি' নিরখিনু ধরা
কনক-কিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে-দুঃখে খচিত সংসার,
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমিষেই মনে হল, মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম।
রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরিছে আমার কাছে জননী-মূরতি। ক. বি. বি. এ. '৫৩

[আটাশ] বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যাপারে হাতের কাজ মাধ্যমমাত্র, শিশুশ্রম নিয়োগের

ছল উপায়মাত্র নয়, এই সত্যের উপর জোর দিবার ইচ্ছায়, এবং প্রয়োজনের বিশেষ তাগিদে, পুরাতন পদ্ধতির পুস্তকসর্বস্ব শিক্ষকদের কোন প্রকারে অসম্পূর্ণভাবে হস্তশিল্প শিখাইয়া, তাহাদের দ্বারা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করা হয়। তাহারা যাহাতে হস্তশিল্পের শিক্ষকের কাজ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য অল্পসময়ে একটা অসম্পূর্ণ শিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। হস্তশিল্পের জন্য এই উপায়ে তৈয়ারী করা শিক্ষকদের উপর আমার কোন আস্থা নাই। আমার ধারণা ইহাতে অর্থের অপব্যয় হইয়াছে এবং ইহাতে ওয়ার্ধা-পদ্ধতিকেই অশেষরূপে নিন্দনীয় করিয়া তোলা হইয়াছে। যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন প্রতারক নিজের শিক্ষাকে কাগজে-কলমে যোগ্যতা অর্জনের উপায় বলিয়া মনে করে, তাহার চেয়ে যে অক্ষরজ্ঞানহীন হস্তশিল্পী শিল্পকাজ করিয়া সংসার চালায় ও শিল্পকাজের আদ্যন্ত সব জানে তাহার নিকট হইতে নীরবে অনেক কিছু শেখা যায়, এই আমার দৃঢ় ধারণা। **গৌ. বি. বি. এ. '৫৫**

[**ঊনত্রিশ**] জীবন বৃথা গেল। যাইতে দাও। কারণ, যাওয়া চাই। যাওয়াটাই একটা সার্থকতা। নদী চলিতেছে—তাহার সকল জলই আমাদের স্নানে এবং পানে এবং আমন-ধানের ক্ষেতে ব্যবহার হইয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ জলই কেবল প্রবাহ রাখিতেছে। আর কোনো কাজ না করিয়া কেবল প্রবাহরক্ষা করিবার একটা বৃহৎ সার্থকতা আছে। তাহার যে জল আমরা খাল কাটিয়া পুকুরে আনি তাহাতে স্নান করা চলে, কিন্তু তাহা পান করে না, তাহার যে জল ঘটি করিয়া আনিয়া আমর জালায় ভরিয়া রাখি তাহা পান করা চলে, কিন্তু তাহার উপরে আলোছায়ার উৎসব হয় না। উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা কৃপণতার কথা, উদ্দেশ্যকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া গণ্য করা দীনতার পরিচয়। **গৌ. বি. বি. এ. '৫৬**

[**ত্রিশ**] এক সময়ে মনে ছিল আমার রাজা এবং রাজার কন্যে
পাবার আমার ছিল দাবি,
মনে ছিল ধনমানের রুদ্ধ ঘরের সোনার চাবি
জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে
আমায় গোপন শক্তিমাঝে ঢেকে।
আজকে দেখি নব্যবংগে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রহিল, চাবিটা তার সংগে।
মনে হচ্ছে ময়নাপাখির খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রংগে ময়ূরটাকে নাচায় ;
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা,
কোন্ কৃপণের রচনা এই নাট্যকলা।

কোথায় মুক্ত অরণ্যানী কোথায় মত্ত বাদল-মেঘের ভেরী।
এ কী বাঁধন রাখ্‌ল আমায় ঘেরি।

ক. বি. বি.এ. (অনার্স) '৫৬

[**একত্রিশ**] দণ্ডিতের সাথে

দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায়, তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে, সে কারে দিওনা।
যে তোমার পুত্র নহে, তারো পিতা আছে ;
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে,
বিচারক। শুনিয়াছি, বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা, পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ, ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার।

ক. বি. বি.এ. (অনার্স '৫৬

[**বত্রিশ**] সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালো মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হয়, শৃংখলিত পশুর শৃংখল যায় খুলে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ্ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তো দেখা দেয় তার ব্যাধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে তখন পাতায় পাতায় রঙিনতার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে, সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেই রকম কোনো জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে, তখন তার সাহিত্যে তার শিল্পে কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ করে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে, তারা মানুষের শত্রু। মানুষ যে কেবল ভোগরসের সমজদার হয়ে আত্মশ্লাঘা করে বেড়াবে তা নয়, তাকে পরিপূর্ণ করে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্যবান্ হয়ে সকল প্রকার অমংগলের সংগে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান না হয় নাই তৈরী হল।

ক. বি. বি.এ. (অনার্স)'৫৬

[তেত্রিশ] আজকের দিনে ইউরোপের কোনো ভাষাই অপর কোনো ভাষার আওতায় পড়ে নেই, সে ভূভাগে এখন সবাই স্বাধীন সবাই প্রধান ; অথচ সে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় এই জাতি-স্বাতন্ত্র্যের যুগেও স্বদেশি ভাষা ব্যতীত আরও অন্তত দুটি-তিনটি বিদেশি ভাষা সাগ্রহে এবং সানন্দে শিক্ষা করেন। এর কারণ কি ? এর কারণ, সভ্যজগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর এক-হাতে গড়েনি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ, বিদেশি ভাষা ও বিদেশি সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিলে মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুণো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডির মধ্যেই থেকে যায় এবং এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই যে, মনোরাজ্যে কূপমণ্ডূক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, সে কূপের পারসর যতই প্রশস্ত ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক না কেন।

গৌ. বি. বি. এ. '৫৬

[চৌত্রিশ]

অসীমের দান

ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
সময়ের মাপে নহে।
কাল ব্যাপি বহে নাই বহে
তবু সে মহান্,
যতক্ষণ আছে তারে মূল্য দাও পণ করি প্রাণ।
যায় যবে বিদায়ের রথ
জয়ধ্বনি করি তারে ছেড়ে দাও পথ
আপনারে ভুলি।
যতটুকু ধূলি
আছ তুমি করি অধিকার
তার মাঝে কী বহে না তুচ্ছ সে বিচার।
ছেড়ে এসো আপনার অন্ধকূপ,
মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দস্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, শেষে
শোকের বুদ্‌বুদ্ তোর অশোক-সমুদ্রে যাবে ভেসে।

ক. বি. বি. এ. (অনার্স)'৫৬

[পঁয়ত্রিশ]

কার্পণ্য কুঞ্চিত করে
তিন সন্ধ্যা কাঁচা পোয়া ছটাকের জপ
একদিন ভুলাও উৎসব।

দিনেকের তরে
ভারে ভারে সংগে সংগে মাঠের সম্পদ
বহিয়া আনহ মোর দ্বারে।
অনন্ত অসংখ্য ঋণ
এক পাত্রে গনি
এক রাত্রি করো মোরে ধনী,—
ঋণোজ্জ্বল পূর্ণচাঁদে পূর্ণিমা-রজনী সম।
মিথ্যা করি ভাগ্যলিপি, লংঘিয়া বিধাতা,
বারেক করহ মোরে দাতা।
ল'য়ে তুচ্ছ অকাঞ্চন কাচে
প্রাণ যদি এতকাল বাঁচে,
কাঞ্চনে করহ আজ কাচ,
কুবেরের কনক-মন্দিরে
লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে উড়ে লাগুক ছোঁয়াচ
হাঘোরিয়া উড়নচণ্ডীর।

ক. বি. বি. এ (অনার্স)'৫৬

[**ছত্রিশ**] মানুষ যে দিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সে দিন তার এক মহা দিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবা মাত্র, যে বোঝা সম্পূর্ণ মানবের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে। সেই তো ঠিক, কেননা জড়ই তো শূদ্র। জড়ের তো বাহিরের সত্তার সংগে সংগে অন্তরের সত্তা নেই, মানুষের আছে। তাই মানুষমাত্রই দ্বিজ, চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায়, স্থূল সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। এই ভারলাঘবের মতো ঐশ্বর্যের উপাদান আর নেই, এ কথা মানুষ বহু যুগ পূর্বে প্রথম বুঝতে পারলে যেদিন প্রথম চাকা ঘুরল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন-উৎপাদনের কাজে লাগল, ধন তখন থেকে চক্রবর্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। এই তথ্যটির মধ্যে কি কোনো তত্ত্ব নেই? বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম, তেমনি আর একটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পেলে অমনি সে অচলতা থেকে মুক্ত হল। এই অচলতাই হচ্ছে মূল দারিদ্র্য। সকল দৈব শক্তিই অসীম, এইজন্য চলনশীল চক্রের এখনও 'আমরা সীমায় এসে ঠেকিনি। এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিম কালের চরকাই শেষ তা হলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা

কখনোই পাব না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্ত্যলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে একথা যদি ভুলি, তা হলে পৃথিবীতে অন্য যে সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে। —রবীন্দ্রনাথ।

ক. বি. বি. এ. (অনার্স)'৫৬

[সাঁইত্রিশ] সেই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর আমি সাধনা করি—
যেখানে অন্নের সংগে পুষ্পের হয় না প্রতিদ্বন্দ্বিতা,
—একে হনন করে না অপরকে।
যেখানে মানুষ ভোলে না মধুপের আনন্দ,
মধুপ হরণ করে না মানুষের কর্মশক্তি। —অমিয়রতন।

[আটত্রিশ] সলজ্জ বধূর মত সন্ধ্যাতারা জাগে
সুদূরের আকাশের পূর্ব-প্রান্ত ভাগে,
নয়নে ক্ষরিছে তার শুধু কোমলতা;
বিশ্ব তার পানে চেয়ে ভুলেছে রুক্ষতা।
মাটির প্রদীপটিরে অতি ধীরে ধীরে
তুলিয়া ধরিল বিশ্ব মাটির মন্দিরে।
অনন্তের সাথে হলো অন্তের ইসারা,—
মাটির প্রদীপ আর আকাশের তারা।
পরস্পর কহে যেন আলোর শিখায়,
প্রতীক্ষা হইল পূর্ণ এবার সন্ধ্যায়। —সুধীর গুপ্ত।

[উনচল্লিশ] তৃপ্তিহীন বেদনায়
নিখিলের হিয়াখানি কাঁপে যেন মোর মর্মছায়।
নিখিল ভুবন
ঘিরিয়াছে যেন আজ অতীতের ব্যথার স্বপন।
জ্যোছনা—সে ব্যথায় উদাস,
অংগে অংগে চামেলির লাবণ্য-বিলাস,
মূর্ছাতুর যেন কোন্ প্রেমিকের স্মৃতি-সৌধ 'পরে,
করুণ কামনাটুকু লেগে আছে ব্যথিত অধরে
ধরায় কোমল প্রাণ পরশিছে আমার পরাণ
তাহার অন্তরে শুনি আমারি সে বেদনার গান।
আমারি অতৃপ্তিসুর মাখা আজি উদাস জ্যোৎস্নায়,
ধরিত্রীর বক্ষপাত্র ভরা মোর প্রেম-বেদনায়। —ধীরেন্দ্রনাথ।

[চল্লিশ] একা নই একা নই পত্রে পত্রে মহাবনস্পতি ;
মহাপ্রাণ বন্যাধারা ! প্রতি প্রাণশিরায় মিলন ।
স্পর্শমাত্র কেঁপে উঠি ; এক পত্র ছিঁড়ে আনো যদি
অমনি সমস্ত দেহে এক ব্যথা—একক ক্রন্দন ।
বিন্দু বিন্দু বারি নিয়ে গড়ে উঠি মহাজটাজাল
দুরন্ত ঝঞ্ঝার সনে ছেয়ে চলি নীল নীলাম্বর ।
ছোট ছোট পতংগ নিয়ে গড়ে উঠি মহাপতংগপাল
মেঘে মেঘে মন্দ্রিত বজ্রবাণে পৃথ্বী থরোথর ।
একা নই একা নই প্রতি অণু অণুতে বন্ধন—
সারাদেহে এক রক্ত, এক ব্যথা—একক স্পন্দন । —আশ রায় ।

[একচল্লিশ] বেদনার ধূপ জ্বালি পূজিনু তোমারে,
বেদনা ধরিল মোর সুরময় রূপ ।
হৃদয়-সর্বস্ব দিনু অর্ঘ্য-উপহারে,
শূন্য বক্ষে বাজে বাঁশী অপূর্ব অনুপ ।
দুঃখের প্রদীপ লয়ে করিনু বরণ,
দুঃখদীপ ঝলি উঠে চন্দ্র-করোজ্জ্বল ।
অশ্রুর মালিকা গাঁথি করিনু অর্পণ,
অশ্রু মোর ফিরে এল মুকুতা-ধবল ।
এই তো প্রেমের রীতি, সুধাবিষে ভরা,
এ জগতে সত্য কিবা আছে তার আগে ?
হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে, তবু মধুক্ষরা,
মনোহরা নাম তব জপি অনুরাগে ।
এরি লাগি যুগে যুগে জনম-কাঙাল
ঘুরিবারে চাহি আমি প্রেমের কাঙাল । —জীবনকৃষ্ণ শেঠ ।

[বিয়াল্লিশ] আজি কোথায় লুকালো সেই প্রাণধারা, সে নব-সঞ্জীবনী,
যুগের যাত্রীকণ্ঠে কেন এ আর্ত করুণ ধ্বনি !
দগ্ধ মরুর উষর উরসে যে-ধারা হয়নি হারা
কাজল-রেখার শ্যামল মায়ায় হারাইল গতিধারা !
ওগো নিখিলের প্রাণের উৎস ধরণীর মরু-রাণি !
মহতী স্মৃতির ধাত্রী-জননী যুগে যুগে তুমি জানি ।

গোপন উৎস খোল আরবার—সোমরস করি পান,
মহা-উৎসবে প্রাণ ভ'রে গাহি জীবনের জয়গান।

—শাহাদাৎ হোসেন।

[**তেতাল্লিশ**] নিয়তির নিয়ম হল বিধাতার নিয়ম, আর নিয়তির নিয়ম থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র নিয়ম হল আর্টের নিয়ম। কিন্তু একেবারে যে নিয়তির নিয়ম লংঘন করলে, সে আর্ট রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-নিরপেক্ষ আর্ট—হয়তো আছে হয়তো নেই। দুই সৃষ্টির নিয়মকে মানিয়ে যে আর্ট, তাই নিয়েই রূপদক্ষের কারবার। একটা মাটির খেলনা তাকে ছেলের সাথী হবার উপযুক্ত করে' ক্ষণিকের জীবন দিয়ে ছেড়ে দিলে আর্টিষ্ট—কেন না যুগ যুগ ধরে' মানুষের সংগে খেলার সম্পর্ক পাওয়া চাই তার। ঠিক এই নিয়ম দেখি বিধাতারও সৃষ্টির মধ্যে কাজ করছে। নক্ষত্র একটা গড়লেন বিশ্বকর্মা,—যুগ যুগ ধরে' ফুলঝুরি জ্বালিয়ে খেলে চল্লো সে, একটা খদ্যোত গড়লেন তিনি—ক্ষণিক খেলার অবসর পেলে সে বিধাতার কাছে। আর্টিষ্টও ঠিক এর জবাব দিলে, ঘরের মধ্যে তার সে ঘরের প্রদীপ তারার মতোই জ্বল্লো—শুধু রূপটি পেলে সে ক্ষণিকের।—অবনীন্দ্রনাথ।

তৃতীয় অধ্যায়

সারাংশ ও বস্তুসংক্ষেপ : ব্যাখ্যা : বিতর্ক-পরিস্ফুটন

আদর্শমালা ও অনুশীলনী

প্রথম পর্যায়—সারাংশ

[**এক**] বর্ণবিজ্ঞান জগতের বড়মহলে যাহা দেখে না, চিত্রকর তাহা দেখেন। শব্দবিজ্ঞান আকাশের শব্দভাণ্ডারে যাহা শুনিতে পায় না, গায়ক এবং সংগীতজ্ঞ তাহা শোনেন। দেহবিজ্ঞান বা অস্থিবিজ্ঞান জীবদেহের মধ্যে যে বস্তুর কোনও সন্ধান পায় না, চিত্রকর ও ভাস্কর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাতেই মজিয়া যান। জ্যোতির্বিদ্ গ্রহনক্ষত্রখচিত, শতরঞ্জিত গগনপটে যে ছবি দেখেন না, কবি তাহা দেখিয়া বিভোর ও বিহ্বল হইয়া যান। এইরূপ ভাবে, এ সকল ক্ষেত্রে চিত্রকর, গায়ক, ভাস্কর ও কবির অন্তরের প্রস্ফুট-রঞ্জিনী-বৃত্তি বর্ণের, স্বরের, জীবদেহের কিংবা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যাহা কেবল বাহ্য ও বাহিরের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাকে আপনার রসের রঙে রঞ্জিত করিয়া তাহার অদ্ভুত রূপান্তর ঘটাইয়া থাকেন। এই বস্তুকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলিতে পারা যায়। ক. বি. বি. এ. '৪৮

বিশ্বের আছে দুইটি দিক—একটি, বস্তুবিশ্ব; অপরটি, ভাববিশ্ব। বর্ণবিজ্ঞান, শব্দ-বিজ্ঞান, দেহবিজ্ঞান বা অস্থিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান বস্তুবিশ্বের যে পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা বাহিরের পরিচয়—ভিতরের পরিচয় নয়। ভাববিশ্বের রহস্যময় প্রকৃতির সন্ধান বিজ্ঞানী পায় না, পায় শিল্পী। বর্ণবিজ্ঞানেব বহির্ভূত বর্ণবৈচিত্র্য চিত্রশিল্পে, শব্দ-বিজ্ঞানের বহির্ভূত শব্দমাধুর্য গায়ক ও সংগীতবেত্তার শিল্পানুভূতিতে, দেহবিজ্ঞানেব অপরিচিত জীবদেহের সৌন্দর্য চিত্রকলায় মূর্তিশিল্পে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনধিগম্য গ্রহ-উপগ্রহ-শোভিত গগনপটের চমৎকারিত্ব কবির কাব্যশিল্পে সঞ্চারিত হয়। আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া বস্তুবিশ্বকে ভাববিশ্বের রহস্যময়তার মাঝে অভিসিঞ্চিত করিয়া এই যে চমৎকারিত্বে ভরা রূপান্তর, ইহাই সাহিত্যের রূপান্তর।

[দুই] পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত গতিবিজ্ঞানে একটা সিদ্ধান্ত আছে যে, সময় মত থাকিয়া থাকিয়া একটু একটু ধাক্কা দিলে হিমালয়ের মত প্রকাণ্ড পদার্থটাকেও কাঁপাইতে বা ধরাশায়ী করা যাইতে পারে। কৈলাসপর্বত তুলিবার জন্য রাবণের এবং গন্ধমাদন উত্তোলনের জন্য হনুমানের মত মহাবীরের দরকাব হইয়াছিল। কিন্তু পদার্থবিদ্যার পেণ্ডুলম-তত্ত্ব অবগত থাকিলে পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালকেও এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটা সহজেই সম্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারিত। মনস্তত্ত্ববিদেব ভ্রূকুটিভয় সত্ত্বেও আমি মনুষ্যের চিত্তটিকে একটা সুবৃহৎ মস্কোনগরের ঘণ্টার মত পদার্থ বলিতে চাহি অর্থাৎ অনেক সময়ে বাহ্যশক্তি প্রভূত পবিমাণে বলপ্রয়োগ করিয়া মানুষেব অন্তঃকরণকে স্থানভ্রষ্ট ও বিচলিত করিতে পারে না। আবার অতি মৃদু পবন-হিল্লোল যদি সময় মত আসিয়া আস্তে আস্তে ছোট ছোট ধাক্কা দেয়, তাহা হইলে ঘণ্টাটি বেগে আন্দোলিত হইয়া দিগন্ত নিনাদিত করিয়া তুলিতে পাবে। কোন কোন মহাকায় অর্ণবযান বড বড় ঝটিকার বেগ অতিক্রম করিয়া সামান্য হাওয়ায় জলমগ্ন হয়। আবার উত্তাল তরংগ-মালার উপর সের-কতক কেরোসিন ঢালিয়াও তাহাদের ক্ষোভ প্রশমিত হইতে দেখা যায়। মানুষের মনও কতকটা সেইরূপ। ক. বি. বি. এ. '৪৮

যত বড় কঠিন কাজই হোক্ না কেন, অনুকূল পরিবেশে ও উপযুক্ত সময়ে তাহা করিবার জন্য অগ্রসর হইলে সেই কঠিন কাজই অতি সহজে সম্পাদিত হয়। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে ও অনুপযুক্ত সময়ে তাহা শত চেষ্টাতেও সম্পন্ন করা যায় না। বিজ্ঞান-জগতে স্বীকৃত এই সত্যটি মনোজগতেও সমভাবে প্রকটিত। মানুষের মন জিনিষটি বড়ই রহস্যময়, সন্দেহ নাই। বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই মনকে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় না। মনেরও আছে গতি এবং সে গতিও বহুবিচিত্র রূপে প্রসারিত। ইহা না বুঝিয়া যত শক্তিই প্রয়োগ করা যাক্ না কেন, কোন ফলই হয় না। ভয় দেখাইয়া বা প্রলুব্ধ করিয়া যে-মানবমনকে আকর্ষণ করা যায় না, তাহাকেই

হয়তো-বা আকর্ষণ করা যায় সহৃদয় অন্তরের দরদভরা স্পর্শ লাগাইয়া। সমস্ত শক্তি-প্রাচুর্যের দ্বারা মানবচিত্ত জয় করা যায় না; মানবসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, স্থির বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তিকে লইয়া আগুয়ান হইলে দৃঢ়সংকল্প মানবমনকে বশীভূত করা যায়।

[তিন] ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অংগ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সংগ
সীমা চায় হোতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

রা. বি. মাধ্যমিক '৫৬

[চার] ধীরে ধীবে আত্মাকে উন্নত করতে হবে। চিন্তা ও দৃষ্টির সাহায্যে তোমার সকল দোষ হ'তে তুমি মুক্ত হও। গুরুর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের কোন মূল্য নাই। তুমিই তোমার শ্রেষ্ঠ গুরু। গুরু মানুষকে মুক্তি দেন না। মুক্তির মালিক তুমি—এ যদি না মানো, তাহলে বুঝবো তোমাব আত্মার মৃত্যু হয়েছে। জাতি যখন অন্ধ হ'য়ে যায় তখন তারা গুরুর নাম বেশী ক'বে নেয়। নিজের আত্মাকে সে একেবারে অস্বীকার করে।

চরিত্রকে উন্নত করো—মিথ্যা, নীচতা, অন্যায়, পরের ভাবের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঔদাসীন্য, অসভ্যতা, স্বার্থপরতা যাবে। ধার্মিক ও সাধক কোন আশ্চর্য জীব নয়।

নীচ, স্বার্থপর, মূর্খ, চোর, পরের সুখ ও পয়সা অপহরণকারী, ঘুষখোর, উপাসনা ও উপবাস করুক, তাতে কোন লাভ নাই। পরমেশ্বর তোষামোদে ভোলেন না—তিনি চান সত্য প্রাণ—তিনি চান মানুষ। শুধু উপাসনা ক'রে মানুষ মুক্তি পাবে না। তাকে কর্মী ও পরদুঃখকাতর, জ্ঞানী ও দৃষ্টিসম্পন্ন, চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী, মনুষ্যত্বসম্পন্ন এবং ন্যায়নিষ্ঠ হ'তে হবে। সে কখনও অন্ধের মত ধর্ম পালন করবে না। পিতা রৌদ্রের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে নিষেধ করেছেন—পিতৃ-আজ্ঞা লংঘন-ভয়ে সুবোধ বালকের মত অগ্নিদগ্ধ ঘরখানিকে রক্ষা ক'রতে সংকুচিত হয়ো না। আত্মার এই জ্ঞানমৃত্যু—জাতির পক্ষে সর্বনাশের কথা।

রা. বি. মাধ্যমিক '৫৬

[পাঁচ] সাধারণ মানুষ পুত্র পরিবারের সুখের জন্য হৃদয়ের রক্ত ঢালে, মহাপুরুষ মানুষের মংগলতরে জীবনশোণিত প্রদান করেন। অন্যের জন্য জীবনধারণে মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা, অন্যের মধ্যে ডুবিয়া ও মুছিয়া যাওয়া মানুষের পূর্ণানন্দময় পরিণাম।

আত্ম লইয়া আমি তৃপ্ত নহি, জীবন আমার আব কাহাকেও নিবেদন করিতে চাই। কে আমার বাঞ্ছিত জন, কাহাকে আমাব জীবন দিয়া জন্ম আমার সার্থক করিব? ক্ষুদ্র লইয়া আমি বাঁচিতে পারি না, নিজেই যে ভাঙিয়া ও মুছিয়া যায়, তাহার মধ্যে ডুবিয়া আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটিতে পাবে না। আমি চাই চিব সত্য ও চিবানন্দ, মরণে মহাজীবন। চাই সর্বাপেক্ষা মহৎ ও মধুর যে, আমার উৎস ও লক্ষ্য যে, সেই পবম পবিত্র মহামহীয়ান্ প্রভর কাছেই সর্বস্ব আমাব লুণ্ঠিত করি, তাহারই মধ্যে অস্তিত্ব আমার লুপ্ত করিয়া অক্ষয় আনন্দে মগ্ন হই। ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৬

[ছয়]

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ বলে অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর, বীর্য দেহ সুখের সহিতে
সুখেবে কঠিন করি। বীর্য দেহ দুঃখে
যাহে দুঃখ আপনাব শান্তস্মিত মুখে
পারি উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহ
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে উঠে ফুটি। বীর্য দেহ ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীন জ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহ চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার উর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহ তোমার চবণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনাবে রাখিবারে স্থির। ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫৬

[সাত] আজ ভোর বেলাতেই উঠে শুনি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজছে। বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সংগে প্রতিদিনের সুরেব মিল কোথায়। অতৃপ্তি, গভীব নৈরাশ্য, অবহেলা, অপমান, অবসাদ, তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য—বাঁশীর দৈববাণীতে এ-সব বার্তার আভাস কোথায়।

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠ্‌ল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম—তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দুগাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ ব'লে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য। —রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় পর্যায়—বস্তুসংক্ষেপ

[আট] এমন গাছ আছে, যে গাছে বোল ধরিয়াই ঝরিয়া যায়। ফল হইয়া ওঠা পর্যন্ত টেঁকে না। তেমনি এমন মনও আছে, যেখানে ভাবনা কেবলই আসে-যায়, কিন্তু ভাব আকার ধারণ করিবার পুরা অবকাশ পায় না। কিন্তু ভাবুক লোকের চিত্তে ভাবনাগুলি পুরাপুরি ভাব হইয়া উঠিতে পারে, এমন রস আছে, এমন তেজ আছে। অবশ্য অনেকগুলা ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কতকগুলা ফলিয়াও উঠে। গাছে ফল যে কয়টা ফলিয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে এই দরবার হয় যে, ডালের মধ্যে বাঁধা থাকিলেই আমাদের চলিবে না—আমরা পাকিয়া রসে ভরিয়া রঙে রঙিয়া গন্ধে মাতিয়া আঁটিতে শক্ত হইয়া গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব, সেই বাহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই। ভাবুকের মনে ভাবনাগুলা ভাব হইয়া উঠিলে, তাহাদেরও সেই দরবার। তাহারা বলে, কোনো সুযোগে যদি হওয়া গেল, তবে এবার বিশ্বমানবের মনের ভূমিতে নবজন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব। প্রথমে ধরিবার সুযোগ, তাহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ—এই তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের ভাবনা কৃতার্থ হয়। গৌ. বি. বি. এ. '৫১

[নয়] ভগবানের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে, মানবচরিত্রের মধ্যে, আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সৃজন করিবার, ব্যক্ত করিবার, চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার অন্ত নাই, ইহা বিচিত্র। কবিগণ মানবহৃদয়ের এই চিরন্তন চেষ্টার উপলক্ষ্য মাত্র।

ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত—মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়-বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে—সেই যে মানসসংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ।

বিশ্বের নিঃশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায়, আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

গ. বি. বি. এ. '৫০

তৃতীয় পর্যায়—ব্যাখ্যা

[দশ] আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সংগে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়; এইজন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে, আনন্দ সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে, এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আনন্দ দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে; এইজন্য কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আর আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুইই সমান। গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫৬

[এগারো]

কবি তবে দুই কর জুড়ি বুকে
বাণী বন্দনা করে নতমুখে,—
"প্রকাশো, জননী, নয়ন সমুখে
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানস-সরস-বাসিনী,
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা,
তোমার হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
খেপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।

চারিদিকে সব বাটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া,
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া,
পেয়েছি স্বরগসুধা।
সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি—
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী,
সুরের খাদ্যে জান তো, মা বাণী,
নরের মিটে না ক্ষুধা।
যা হবার হবে, সে কথা ভাবি না—
মাগো, একবার ঝংকারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনা
অমৃত উৎসধারা।"—রবীন্দ্রনাথ।

গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫৬

[**বারো**] বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগলাভ করে যে, তাহাব অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলষিতের অপূর্তির জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাই যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ হয় না।

যখন বাঙালীমাত্রেরই হৃদয়ে অভিলাষেব বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙালীই তজ্জন্য আলস্য সুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সংগে ঐক্য মিলিত হইবে।

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।

অতএব যদি কখনও বাঙালীমাত্রেরই হৃদয়ে জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোক প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, যদি এই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙালীর অবশ্য বাহুবল হইবে। —বঙ্কিমচন্দ্র।

গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫৬

[**তেরো**] পরাজিত তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর 'অ-পরাজিতা' নাম ?
গন্ধ কি তোর বিন্দুমাত্র আছে ?
বর্ণ—সেও ত নয় নয়নাভিরাম !

ক্ষুদ্র শেফালি, তারো মধু-সৌরভ ;
ক্ষুদ্র অতসী, তারো কাঞ্চন-ভাতি ;
গরবিনি, তোর কিসে তবে গৌরব—
রূপগুণহীন বিড়ম্বনার খ্যাতি।

কালো আঁখিপুটে শিশির-অশ্রু ঝরে—
ফুল কহে—মোর কিছু নাই কিছু নাই,
তোমরা যে নামে ডাকিয়াছ দয়া ক'রে
আমি শুধু ভাই, তাই—আমি শুধু তাই

ফুলসজ্জায় লজ্জায় যাইনাক,
পুষ্পমালায় নাহিক আমার স্থান ,
প্রিয়-উপহারে ভুলেও কি মোরে ডাক' ?
বিবাহ-বাসরে থাকি আমি ম্রিয়মাণ।

মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণ-তলে,
পূজা—শুধু পূজা জীবনের মোর ব্রত ;
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
অন্তরযামী,—তিনিও তোমারি মত ?

গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫৫

চোদ্দ] জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয় ; জ্ঞানের চরম ফল যে তা' চোখে আলো দেয়। জনসাধারণের চোখে জ্ঞানের সেই আলো আন্‌তে হবে, যাতে মানুষের সভ্যতার যা' সব অমূল্য সৃষ্টি,—তার জ্ঞানবিজ্ঞান, তার কাব্যকলা, —তার মূল্য জান্‌তে পারে। জনসাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল অন্ন থেকে বঞ্চিত ব'লে নয়, তার পরম দুর্ভাগ্য যে সভ্যতার এই সব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত। জনসাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্নই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হ'লেও, কাজে তার স্থান জনসাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যে সব দেশে আজ জনসংঘ মাথা তুল্‌ছে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝতে পেরে জনসাধারণ জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ সংখ্যার অনুপাতে জনসাধারণের সমাজে শক্তিলাভের যা গুরুতর বাধা অর্থাৎ সভ্যতালোপের আশংকা, শিক্ষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সে বাধার ভিত্তি ক্রমশই দুর্বল হ'য়ে আসে। গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫৫

[পনেরো] শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে ;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখি-জল—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুঃখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল। গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫২

[ষোলো] ফুল, তুমি মানব-গুরু। মানুষে মানুষ আছে, আর পশু আছে। মানুষের আকাংক্ষা সেই পশুত্বটুকু নষ্ট করিয়া মনুষ্যত্বটুকু প্রবল করে। সেই নিমিত্ত মানুষ পৃথিবীতে উদ্ভূত হইয়া আজ পর্যন্ত কত চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এই প্রভূত চেষ্টার প্রথম কার্য—ফুল তোলা। যেদিন আদিম মনুষ্য আদিম পশুর ন্যায় ক্ষুধার জ্বালায় মহারণ্যে বিচরণ করিয়া পশু বধ করিয়া কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইয়া…অপরাহ্নে সহসা অস্তাচলগামী সূর্যের সুবর্ণজ্যোতি দেখিয়া, কি জানি কেন, বিলম্বিত লতা হইতে একটি পুষ্প ছিঁড়িয়া মাথার চুলে গুঁজিল, সেইদিন মনুষ্যের বিশাল ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। সেইদিন জানা গেল যে সহচর সিংহ ব্যাঘ্র অনন্তকাল মহারণ্যেই বাস করিবে, কিন্তু তাহাদের আদিম সহচর মানুষ মহারণ্য বিনষ্ট করিয়া মহাসম্পদ সৃষ্টি করিবে। গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫২

[সতেরো] জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তানসহ পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারাই হ'ন্—
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান্।
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান!
ভগবান্! ভগবান্! গৌ. বি. মাধ্যমিক '৫১

[আঠারো] তুমি বনের পাখীর মতন স্বাধীন,
খাঁচা তোমার মনের বাঁধা ;
নয়নে তোমার কুহকের জাল
মুখ তোমার কেবলি ধাঁধাঁ।

চা. বি. মাধ্যমিক '৫০

[ঊনিশ] মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে' যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত।
বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?

ঢা. বি. মাধ্যমিক '৫১

[কুড়ি] "হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা।
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি না সেবা।"
শিশির কহিল কাঁদিয়া—
"তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিকো আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল।"
"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।"
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া—
"ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি'
তোমার ক্ষুদ্র জীবন্ গড়িব হাসির মতন করি।"

গৌ. বি. বি. এ. '৫১

[একুশ] ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ, বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারাই পঞ্চভূত, আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নূতন বিজ্ঞানশাস্ত্র আসিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর কেহ তাঁহাদিগকে মানে না। নূতন বিজ্ঞানশাস্ত্র বলেন, "আমি বিলাত হইতে নূতন ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে?" যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, "আমরা প্রাচীন ভূত কণাদ-কপিলাদির দ্বারা

ভৌতিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীবশরীরে বাস করিতেছি," বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, "তোমরা আদৌ ভূত নও। আমার Elementary Substances দেখ— তাহারাই ভূত; তাহাদের মধ্যে তোমরা কই? তুমি আকাশ—তুমি কেহই নও—সম্বন্ধ-বাচক শব্দমাত্র। তুমি তেজঃ, তুমি কেবল একটি ক্রিয়া, গতিবিশেষ মাত্র। আর ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ—তোমরা এক-একজন দুই তিন বা ততোধিক ভূত-নির্মিত। তোমরা আবার ভূত কিসের?' গৌ. বি. বি. এ. '৫১

[বাইশ] এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি'
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার,
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুব শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি' অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে' যাবো যবে ধরণীব
ব'লে যাবো, "তোমার ধূলিব
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।"
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি ॥

শান্তিনিকেতন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। গৌ. বি. বি. এ. '৫২

[তেইশ] বাঙলার তথা ভারতের এক মহাগৌরবময় যুগের প্রবর্তয়িতা রামমোহন। সে সম্মান তাঁকে সবাই অকুণ্ঠিতচিত্তে নিবেদন ক'রে থাকেন। আজকার এই স্মরণ-বাসরে যদি শুধু এই ব্যাপারটাই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি, তবে তাতেও তাঁর মহিমা-কীর্তন কম হবে না। কাল তো চির-পরিবর্তনশীল। বহুকাল পূর্বে গ্রীক্ দার্শনিক ব'লেছিলেন, আমরা একই নদীতে দুইবার স্নান করি না। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এ স্বীকৃত সত্য। তাই রামমোহন যদি বাঙলার ও ভারতের এই গৌরব-যুগের প্রবর্তয়িতা মাত্র হন,—অন্য কথায়, তাঁর দেশ যদি কর্মে ও চিন্তায় কালে কালে

এতখানি ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে থাকে যে তাঁর সেই শতবর্ষ পূর্বের নির্দেশ তার জন্ম আর সার্থক নির্দেশ ব'লে গণ্য করা সম্ভবপর না হয়, তবে তাও তাঁর জন্ম শোচনীয় নয়, বরং শ্লাঘনীয়;—পুত্র ও শিষ্যের কাছে পরাজিত হওয়া তো মানুষের সৌভাগ্যের কথা। গৌ. বি. বি. এ. '৫২

[চব্বিশ] প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সহিত আমাদের এতই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে যে, তাঁহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য উপলব্ধি কবিবার ক্ষমতাও আমবা হারাইয়াছি। আমরা মনে করি, সেকালেব ভারতবর্ষের সহিত এখনকার কালের কেবল নূতন পুরাতনের প্রভেদ। সেকালে যাহা উজ্জ্বল ছিল এখন তাহা মলিন হইয়াছে, সেকালে যাহা দৃঢ় ছিল এখন তাহাই শিথিল—অর্থাৎ, আমাদিগকেই যদি কেহ সোনার জল দিয়া পালিশ করিয়া কিঞ্চিৎ ঝক্‌ঝকে করিয়া দেয় তাহা হইলে সেই অতীত ভারতবর্ষ সশরীরে ফিরিয়া আসে। আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহারা কেবল শাস্ত্রের শ্লোক ছিলেন—তাঁহারা কেবল বিশ্বজগৎকে মায়া মনে কবিতেন এবং সমস্ত দিন জপতপ করিতেন। তাঁহাবা যে যুদ্ধ করিতেন, রাজ্যরক্ষা করিতেন, শিল্পচর্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন, সমুদ্র পাব হইয়া বাণিজ্য কবিতেন—তাঁহাদের মধ্যে যে ভালো-মন্দের সংঘাত ছিল, বিচার ছিল, বিদ্রোহ ছিল, মতবৈচিত্র্য ছিল—এক কথায়, জীবন ছিল, তাহা আমরা জ্ঞানে জানি বটে কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না।

উ. বি. বি. এ. '৫৫

চতুর্থ পর্যায়—বিতর্ক-পরিস্ফুটন

[পঁচিশ] প্রাচীনের বিরুদ্ধে আধুনিকেব অভিযোগ এই যে, তাঁহারা প্রধানত আকাশকুসুমই রচিয়া গিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের সৃষ্টি সুন্দর অর্থাৎ নয়নাভিরাম হইতে পারে; কিন্তু ঠিক এইজন্যই তাহা চিত্তের অন্তরংগ বস্তু হতেই পারে না। একালের শিল্পী বলিতেছেন, যেমন আছে তেমনটি করিয়া দেখাও, তাহা সুন্দব হইল কি না সেদিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই। জগতে অসুন্দর শ্রীহীন জিনিষের অভাব নাই—সৃষ্টিরহস্যের অনেকখানিই তাহারা জুড়িয়া আছে। সেগুলি বাদ দিয়া ফল কি? বা রাখিয়া ঢাকিয়া দেখাইবার চেষ্টাতেই বা লাভ কি? "যা বিরাজেন সর্বঘটে,"—সুতরাং দেখাও তাঁহার সত্যকার মূর্তি। সত্যের কোন অলংকাব, কোন প্রসাধনই প্রয়োজন নাই। শিশুর মত সত্যেরও উলংগ মূর্তিই স্বাভাবিক ও সুন্দর। সত্যকে সত্য হিসাবেই দেখাও, তাহাতেই সত্যের সৌন্দর্য। ক. বি. বি. এ. '৪৫

চতুর্থ খণ্ড

প্রবন্ধ

অবতরণিকা

[এক]

'প্রবন্ধ' এক জাতীয় 'রচনা' সত্য, কিন্তু 'রচনা'মাত্রই 'প্রবন্ধ' নয়। 'রচনা'র অর্থ খুবই ব্যাপক। যাহার সৃষ্টিমূলে আছে নির্মাণ-কৌশল তাহাই রচনা। তাই দেখি,—যেমন 'মাল্য-রচনা', 'শয্যা-রচনা', 'বেণী-রচনা' প্রভৃতির বেলায়, তেমনি 'কবিতা-রচনা,' 'গল্প-রচনা' 'উপন্যাস-রচনা' প্রভৃতির ক্ষেত্রেও কতকগুলি উপকরণ বা উপাদানকে সংগ্রহ করিয়া, নির্বাচন করিয়া, সংযোজন করিয়া, তাহাদের মধ্যে গঠনসৌষ্ঠব তথা সংগতি-সুষমা রক্ষা করিয়া বস্তু বা বিষয় নির্মাণ করিতে পারিলেই রচনা-কর্ম সম্পাদিত হয়। এহেন শিল্পকর্মের অবসর থাকায় প্রবন্ধও এক জাতের রচনা।

'রচনা'র ব্যাপক অর্থ

বাংলায় 'প্রবন্ধ' অর্থেই 'রচনা' শব্দটির প্রচলন। কিন্তু এমনি মজার ব্যাপার যে, 'রচনা' শব্দটির বিশেষ অর্থ-সম্বন্ধে প্রয়োগকর্তার কোন বিশেষ ধারণা নাই। রচনার আছে দুইটি দিক: প্রথমত, কোন ভাব বা বিষয় আশ্রয় করিয়া তাহাকে যুক্তিতথ্য-সহকারে, চিন্তাপারম্পর্যে সন্নিবেশিত করিতে হয়; দ্বিতীয়ত, সুরচিত বাণীভংগীও চাই। মনের উদ্ভাবন-নৈপুণ্য ও লিপিকৌশলেরই উপর নির্ভর করে রচনাসৌষ্ঠব। এই যে রচনাশক্তি, ইহার প্রাণরস যোগাইয়া থাকে ভাবুকতা। বিষয়ের উল্লেখকে নিছক একটি উপলক্ষ্য হিসাবে ধরিয়া ভাবুকতার পাখায় ভর করিয়া সহজ সাবলীল সরস-সুসম্বদ্ধ বাণীভংগীতে এই যে প্রকাশ-ব্যাপারটি, ইহা তো সাহিত্যিক প্রতিভারই পরিচায়ক। অবশ্যই এহেন রচনাশক্তি পরীক্ষামণ্ডপে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীর কাছে আশা করা যায় না। তাহাদিগের কাছে যে বস্তুটি প্রত্যাশিত, তাহা 'প্রবন্ধ'ই বটে, সার্থক 'রচনা' নয়। ইহাই সবিশেষ লক্ষণীয় যে, প্রশ্নকর্তা প্রবন্ধলিখনের সংকেত দিয়া একটি বিষয়গত বন্ধন ছাত্রছাত্রীদিগের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে সংক্রামিত করিয়া তাহাদিগের মনের উদ্ভাবননৈপুণ্যকে খর্ব করিয়া, ঐ বিষয়গত বিদ্যাবুদ্ধির বন্ধনকর্মকে

'রচনা' ও 'প্রবন্ধে'র স্বরূপ-প্রকৃতি

পরখ করেন। অতঃপর ভাষার একটু মাধুর্য, একটু লাবণ্য, একটু সৌষ্ঠব থাকিলেই পরীক্ষার 'প্রবন্ধ'কে 'রচনা' নামাংকিত করিয়া আমরা সাধারণত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। আবার 'ভাষা-রীতি' বলিতে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীগণ সাধারণত শব্দাড়ম্বরের ঢক্কা-নিনাদই বুঝিয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীগণ তথ্য সংগ্রহ করিয়া যদি তাহাদের সেই আহৃত জ্ঞান স্ব স্ব বুদ্ধিমত্তা ও ভাবগ্রাহিতার আলোকে রচনার ভংগীতে ফুটাইয়া তুলিতে পাবে, তাহা হইলে সেই নির্মাণ-কর্মটি তথ্যভাবপ্রপীড়িত লেখা হইবে না, হইবে স্বীয় ভাবচিন্তাসমৃদ্ধ বক্তব্য। কিন্তু পরীক্ষামণ্ডপে যে বস্তুটি পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা নির্মাণ করে, তাহা 'রচনা' নয়—একটি আত্যন্তিক শ্রমকর্ম, যাহা মুখস্থশক্তি ও সংগ্রহশক্তিরই চিরাচরিত সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এহেন লেখা 'রচনা' নয়—পরীক্ষায় পাশ করিবার ব্যায়ামমাত্র।

ইংরাজিতে যাহাকে আমরা বলি 'Essay', বাংলায় তাহারই নাম 'প্রবন্ধ'। ইংরাজি 'Essay' শব্দটির মূলগত অর্থ 'প্রয়াস'। ইহাতে লেখকের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় তো থাকেই, তাহা ছাড়া তাঁহার ব্যক্তিগত মনোভংগীও আছে। ফলে সকল তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশের মধ্য দিয়া লেখকের ব্যক্তিগত ভাবুকতা আমাদের মনের তারে করে আঘাত, ঘটে চিত্তচমৎকার। আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য লেখকের এই যে প্রয়াস, ইহা ভাষার একটি বিশিষ্ট ভংগী, যাহাকে বলা হয় 'স্টাইল', ইহাকেই অবলম্বন করিয়া আমাদের অন্তরে জাগে সাড়া। 'Essay'র মূলগত অর্থের দিক দিয়া ইহা রচনাই বটে। য়ুরোপীয় সাহিত্যেই ইহার উদ্ভব। উচ্চাংগের 'Essay'তে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশই ঘটিয়া থাকে। এহেন রচনায় বিষয়ের লঘু-গুরু বিচার নাই। মনের মাধুরী মিশাইয়া যে কোন বিষয়েরই উপরে খাঁটি সাহিত্যিক 'Essay' লেখা চলে। কিন্তু 'Essay'র ঐ মূলগত অর্থ-অনুযায়ী পরীক্ষামণ্ডপের 'Essay' লেখা হয় না বা বলা চলেও না। অন্তরের কথা নয়, নিজেরও কথা নয়—বাহিরের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান-বিচার বিদ্যা-বুদ্ধি খেলাইয়া তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজিত করিয়া যে কোন প্রকারে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারিলেই পরীক্ষার তথাকথিত 'Essay' হইল। অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে প্রকৃষ্টরূপে একটা বন্ধনকর্মই বর্তমানে 'Essayর' লক্ষ্য। এই হিসাবে 'Essay' এক্ষণে 'প্রবন্ধই' বটে।

'Essay' ও 'প্রবন্ধে'র স্বরূপ-বিচার

প্রবন্ধকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়: [এক] রচনাধর্মী প্রবন্ধ তথা খাঁটি সাহিত্যিক প্রবন্ধ, যাহাকে 'সন্দর্ভ'ও বলা চলে; [দুই] জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ। রচনাধর্মী প্রবন্ধ ফরমায়েসী সামগ্রী নয়। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব-লঘুত্বের উপর ইহার নির্মাণকর্ম নির্ভর করে না। মানসিক অবস্থায়, মনের খেয়ালে, অন্তরের অনুভূতিতে

লেখক রচনাধর্মী প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। কোথাও-বা ইহা হয় মনঃপ্রধান—খেয়াল-খুশীর উন্মাদনায়, বাক্‌চাতুর্যের বৈশিষ্ট্যে, গুরুগম্ভীর তত্ত্বের লঘু হাস্যরসাশ্রিত প্রকাশভংগীতে রচনাধর্মী প্রবন্ধ এক সাহিত্যগত কলাশিল্পের পরাকাষ্ঠা ফুটাইয়া তোলে। এই ধরণের লেখায় লেখকের 'অহং-বোধ' অত্যন্ত প্রকট। নানাবিষয়গত অভ্যস্ত সংস্কারকে আঘাত দিয়া বেশ একটি সাহিত্যিক কালোয়াতী এই ধরণের প্রবন্ধে মেলে। মনের বিশিষ্ট ভংগী ও ভাষার ছলাকলাই মনঃপ্রধান রচনাধর্মী প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য। বিষয় নয়, মনোবিলাসই এই ধরণের লেখায় মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া থাকে। বীরবলের অধিকাংশ রচনাই এই ধরণের। আবার কোথাও-বা রচনাধর্মী প্রবন্ধ হয় লেখকের অন্তররসে রসায়িত। তাঁহার হৃদয়ের আশা-আকাংক্ষা, ব্যথাবেদনা, হর্ষবিষাদ যেন লেখার ছত্রে ছত্রে হয় উৎসারিত। ইহা একটি অপূর্ব সামগ্রী—উচ্চস্তরের সাহিত্য-রসধারায় ইহা অভিসিঞ্চিত। লেখকের আত্মগত উপলব্ধির তাগিদে লেখা এই ধরণের রচনাধর্মী প্রবন্ধ আমাদের সাহিত্যে একরূপ নাই বলিলেই চলে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' ইহার খানিকটা আভাস মেলে মাত্র, কিন্তু আসলে উহা ভাবাবেগসমৃদ্ধ তরল গদ্যকাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র লেখাগুলিতে রচনাধর্মী প্রবন্ধের বহু লক্ষণ আছে। তবে উহা এমনই একটি সমন্বয়ধর্মী সাহিত্যিক রূপ যে গল্প, কাব্য, সমাজদর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমালোচনা, আত্মচিন্তা সব-কিছুই বিদ্যমান। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিছক হৃদয়রসে অভিষিক্ত কিছু কিছু রচনাধর্মী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মোহিতলালের 'জীবনজিজ্ঞাসা'ও এই ধরণের সার্থক শিল্পসৃষ্টি। ইংরাজি সাহিত্যকার Lamb-এর '*Essays of Elia*,' Oscar Wilde-এর '*De Profundis*'—এই জাতীয় খাঁটি সাহিত্যিক প্রবন্ধ।

প্রবন্ধের শ্রেণী-পরিচয়

(১) রচনাধর্মী প্রবন্ধ

আর এক জাতের প্রবন্ধ, যাহাকে জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ বলা যায়, তাহাই সাধারণত প্রবন্ধ নামে পরিচিত। এই জাতীয় প্রবন্ধে থাকে বস্তু বা বিষয়ের পরিচয়, মতবিশেষের উপস্থাপনা ও আলোচনা, তথ্য বা তত্ত্বের আবিষ্কার, বিদ্যা-বুদ্ধির প্রকাশ, চিন্তাশক্তির অভিব্যক্তি, ভাবুকতার আভাস এবং আরও থাকে যথাযোগ্য ভাষাজ্ঞান, অথবা লেখনী-চালনার অভ্যাস। এই ধরণের লেখায় তীক্ষ্ণ বোধশক্তি খুবই প্রয়োজনীয়। সাহিত্যিক প্রতিভা নয়, মনস্বিতাই জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধলিখনের নিদান। তবে একটি কথা। মননশক্তিসম্ভূত এই ধরণের প্রবন্ধলিখনের ক্ষেত্রে রচনা-

(২) জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ

ধর্মিতাও অর্থাৎ মানস-দৃষ্টিভংগীও সংক্রামিত থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধ-গ্রন্থখানি রসনিবিড়তা, চিন্তাগভীরতা, লিপিনৈপুণ্য এবং ভাবুকতায় ভরিয়া উঠিয়া প্রতিভা ও মনস্বিতার এক অপূর্ব সম্মেলন হইয়াছে। প্রসংগত মনে করা যাইতে পারে Oliver Wendell Holmes-এর লেখা '*Autocrat of the Breakfast Table*' এর কথা। ইহাও ঐ উভয় শক্তির সংমিশ্রণজাত।

জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক বা সাধারণ প্রবন্ধকে মোটামুটি সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: [এক] বিবৃতিমূলক প্রবন্ধ অর্থাৎ কোন কাহিনী বা ঘটনার সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্ট বিবরণ: যথা,—'মহাত্মা গান্ধীর জীবনবৃত্তান্ত'; 'কায়েদে-আজম জিন্নার জীবনকথা', '১৫ই আগষ্ট'; 'কাশ্মীর-ভ্রমণের কথা'।

জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ

[দুই] মত বা তত্ত্ববিশেষের ব্যাখ্যানমূলক প্রবন্ধ: যথা,—'সাম্যবাদ', 'ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', 'ভারতের জাতীয়তাবাদ'। [তিন] বর্ণনামূলক প্রবন্ধ: যথা—'বাংলায় ঋতুচক্রের আবর্তন-লীলা', 'সমুদ্রতীরে সূর্যোদয়'। [চার] তত্ত্ববিচারমূলক বা বিতর্কমূলক প্রবন্ধ: যথা,—'ছাত্র ও রাজনীতি'; 'আমাদের স্বাধীনতা', 'বিশ্বশান্তি ও যুদ্ধ'; 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি'; 'হিংসা ও অহিংসা'। [পাঁচ] ভাবনামূলক প্রবন্ধ: যথা,—'শ্রেষ্ঠ মানব'; 'জীবনের উদ্দেশ্য'; 'চরিত্র'। [ছয়] তথ্যবাহী প্রবন্ধ: যথা,—'বেতার ও বর্তমান জগৎ'; 'বাংলার উৎসব', 'ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাস ও ধারা', 'ভারতীয় চিত্রকলা'। [সাত] নীতিকথার ব্যাখ্যানমূলক প্রবন্ধ: যথা,—'যে সহে সে রহে', 'ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে'। অবশ্য জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধের এই শ্রেণীবিভাগটি যে একেবারেই ত্রুটিহীন, এমন কথা বলা চলে না। কারণ,—এমন বহু প্রবন্ধই আছে যাহাদের মধ্যে একাধিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, একটি শ্রেণীর উপকরণ অপর শ্রেণীরও মধ্যে সংক্রামিত। তাই এই শ্রেণীবিভাগ যুক্তিবিচারসহ নয়। তবে একটি কথা। শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকিলে প্রবন্ধের প্রকৃতি বুঝিয়া সেই অনুসারে উপযুক্ত তথ্য ও যুক্তির সমাবেশ, যথাযথ ভাষাবিন্যাসের সৌকর্য ফুটাইয়া তোলা যায়। এই জন্যই পরীক্ষামণ্ডপে প্রবন্ধরচনাকালে এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকিলে কাজের সুবিধা হয়।

[দুই]

যাহার কিছু বলিবার আছে, প্রবন্ধ লেখা কেবলমাত্র তাহারই সাজে। নচেৎ নানারঙ্গের যতিচিহ্ন বসাইয়া, কমবেশী বানান ভুল করিয়া, উপর্যুপরি বাক্যরচনা করিতে পারিলে কিছুটা সময় বেশ নষ্ট করা যায় সত্য, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই

হয় না। কয়েকটি শব্দের মালা গাঁথিয়া বাক্য, কয়েকটি বাক্যের মালা গাঁথিয়া অনুচ্ছেদ এবং কয়েকটি অনুচ্ছেদের মালা গাঁথিয়া একটি তথাকথিত প্রবন্ধ রচনা করিয়া কোন লাভই হয় না। নিজেকে প্রকাশ করিতে শিক্ষা করাই হইতেছে সব চেয়ে বড কথা।

প্রবন্ধরচনা-শিল্পের গুরুত্ব

ছাত্রছাত্রীরা শব্দ বাক্য অনুচ্ছেদাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের মাঝে তাহাদের নিজেদের কোন দৃষ্টিভংগী ফুটিয়া ওঠে না। বলিতে কি, আমরা ইট তৈয়ার করিতেই জানি, কিন্তু কেমন করিয়া সৌধনির্মাণ করিতে হয়, তাহার খবর রাখি না। আবার এই সৌধটি কোন্ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করিতে হইবে, তাহাও জানা দরকার। হাসপাতাল, না ইস্কুল-বাড়ী, না সিনেমা-বাড়ী, না গেরস্ত-বাড়ী—কোন্‌টির জন্য সৌধনির্মাণ, তাহা না জানা অবধি কোন কাজই তো হইতে পারে না। নিছক অনুশীলনী হিসাবে প্রবন্ধ-রচনা—কোন কিছু আন্তরিকতাপূর্ণ মূল্যবান সমৃদ্ধ বক্তব্য বলিবার নাই অথচ পরীক্ষার জন্য না লিখিয়াও তো উপায় নাই, এমনি ভাবে যাহা কিছুই লেখা যাক না কেন, সে লেখা পরীক্ষক-পরীক্ষিকার মনের মাঝে কোন দাগ না কাটিয়া এক গভীর বিতৃষ্ণাই ছড়াইয়া দেয়—ফলে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের আশা পূর্ণ হয় না। অতএব, প্রবন্ধ লিখিতে হইলে দুইটি জিনিষ জানা দরকার: একটি হইতেছে—'কি বলিতে হয়?' অপরটি হইতেছে—'কেমন করিয়া বলিতে হয়?' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌টারমিডিয়েট্ ও বি এ. বাংলা পরীক্ষায় যে প্রবন্ধ রচনা করিতে বলা হয়, তাহাতে এই দুইটি সামগ্রীই পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীর কাছে চাওয়া হয়। প্রবন্ধে থাকে ২০ নম্বর, তার মধ্যে বিষয়বস্তুর জন্য ধরা হয় ১২ নম্বর ও বাণীবিন্যাস তথা স্টাইলের জন্য ধরা হয় ৮ নম্বর। কিন্তু এমনই মজার ব্যাপার যে, নিরংকুশ স্টাইলের জন্য শতকরা প্রায় ৯০ জনই পায় শূন্য নম্বর আর বিষয়বস্তুর জন্য অনেকেই পায় ৫।৬ নম্বর। ফলে প্রবন্ধের ২০ নম্বরের মধ্যে অনেকেরই অদৃষ্টে একুনে ঐ ৫·৬ নম্বরই মিলিয়া থাকে। তাই বলি,—'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্'!

প্রবন্ধকারের দুইটি সমস্যা

[তিন]

লেখক সেই বিষয়টিকে লইয়াই মনের মত একটা প্রবন্ধ রচনা করিতে সমর্থ হন, যাহার সম্পর্কে তাঁহার কিছু জানা আছে, যাহার সম্পর্কে তাঁহার কিছু কৌতূহল আছে, যাহার ভিতরকার সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বেশ একটি জোরালো অভিমতও পোষণ করেন। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে জানে খুব

কমই—মনের মত প্রবন্ধ-রচনার উপযোগী বিষয়বস্তুর ভাণ্ডারীও তাহারা নয়। তাই দেখা যায়, পরীক্ষাগৃহে ছাত্রছাত্রীরা অপরিচিত প্রবন্ধ দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যায়। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, প্রবন্ধলিখন-বিদ্যার একটি অন্যতম লক্ষ্যই হইতেছে নিজের একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগী লইয়া জগৎকে বুঝা। উত্তরজীবন গড়িয়া তুলিবার পক্ষে যে সকল বিষয়বস্তু পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের অধিগত, তাহাদেরই সম্পর্কে তাহারা বেশ প্রাণ ভরিয়া লিখিতে পারে। কেননা,—এই সম্পর্কে বলিবার উপকরণে তাহাদের মনটি খুবই সমৃদ্ধ। সুতরাং জগৎ সম্পর্কে জানিতে হইলে আলোচ্য বিষয়মাত্রেরই পরিপ্রেক্ষিতে যে তথ্য ও ভাবমণ্ডল আছে, তাহা জানিবার জন্য মনটিকে সর্বদাই উন্মুখ করিয়া রাখিতে হয়। তারপর মনের কষ্টিপাথরে বিষয়গত সমস্যার সমাধানটিকে উপলব্ধি করিতে হয়। সমাধানে অগ্রসর হইতে হইলে প্রবন্ধের উপাদান তথা মালমশলার নির্বাচনপ্রক্রিয়ার দুইটি স্তর লক্ষ্য করা দরকার। **প্রথম স্তরটি হইতেছে—যথাযোগ্য মালমশলার যোগাড় অর্থাৎ ভাবসংগ্রহ এবং দ্বিতীয় স্তরটি হইতেছে যথাসাধ্য আহৃত এ উপাদান নিচয়ের মধ্যে প্রাসংগিক ও সংগত সামগ্রীমাত্রেরই নির্বাচন অর্থাৎ ভাবসজ্জা।**

প্রবন্ধের মালমশলা নির্বাচনপ্রক্রিয়ার দুইটি স্তর

ভাবসংগ্রহ ব্যাপারটিকে আর কিছু না বলিয়া অনেকটা প্রণালীরূপে, অনেকটা সুশৃংখল বিন্যাস বা পদ্ধতিরূপে দেখাই সংগত। ভাবানুসন্ধান, মনের গোপন মণি-কোঠার খবর বাহির করা—মোটামুটি প্রণালীসম্মত ভাবে করা যাইতে পারে। যখনই কোন প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিবে, তখনই ইহার সম্পর্কিত যত-কিছু প্রশ্ন তোমার মনে জাগে, তাহা লইয়া মানসগত একটা জিজ্ঞাসার পটভূমিকা রচনা করিবে। শিরোনামটি লইয়া এইভাবে ভাবিতে সুরু কর—'বিষয়টি কি?....ইহা ভাল, কি মন্দ?....ইহা কি আমার পছন্দসই?...অন্যান্য লোকেও কি ইহাকে পছন্দ করে?...ইহা কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়?'....এমনি করিয়া একটির পর একটি প্রশ্ন তুলিয়া জিজ্ঞাসার একটি পরিবেশ গড়িয়া তোল।

প্রথম স্তর—প্রবন্ধের ভাবসংগ্রহ-পদ্ধতি

আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্তই দেওয়া যাক। ধর, তোমার প্রশ্নপত্রে একটি প্রবন্ধের শিরোনাম দেওয়া আছে। সেই প্রবন্ধটির নাম—'কলিকাতার রাস্তা'। উপর উপর দেখিতে গেলে বলা যায় যে, বিষয়টি বড়ই অস্পষ্ট, বড়ই নিষ্প্রভ, বড়ই দুর্বল। কেননা,—এই প্রবন্ধটি লিখিবার প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহিতই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জড়াইয়া আছে। আমাদের প্রাত্যহিক

জীবনের অভিজ্ঞতাই এই প্রবন্ধের তথ্যভাণ্ডারী। সুতরাং খোলা মন লইয়া একবার এই প্রবন্ধটির পটভূমিকা তুমি রচনা করিবার চেষ্টা কর তো দেখি। নিজেকে এইভাবে প্রশ্ন করিতে থাক—'রাস্তা জিনিষটা কি?...আচ্ছা, কাহার সংগেই-বা ইহার তুলনা মিলে?....কলিকাতার রাস্তা ছোট, মাঝারি, বড়—এমন করিয়া নানা আয়তনের কেন?... এই বৈসাদৃশ্য এই বৈচিত্র্যের কিই-বা উদ্দেশ্য?...কেমন করিয়া এই রাস্তাগুলি নির্মিত হয়?...কলিকাতার রাস্তায় পথিকেরা পথ চলে কেন?....তাহাদের মতে, 'ভাল রাস্তা' কোন্‌টি এবং কেন?....হয়তো-বা এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে যে রাস্তাটি 'ভাল রাস্তা,' অপর শ্রেণীর লোকের পক্ষে তাহাই 'খারাপ রাস্তা'—এইরূপ ধারণাবৈষম্য ঘটিবার কারণ কি?·বিভিন্ন যানবাহনের সজ্জায় সজ্জিত৷ কলিকাতানগরীর রূপবৈচিত্র্য কিরূপ? কলিকাতার রাস্তায় কোন সময়ে বা কোন ঋতুতে চলাফেরা করিতে আমার অন্তর বিষিয়ে উঠে কি, বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যায় কি? যদি হয়ই তো কেন হয়? কোন বিশেষ রাস্তার চিন্তা কি আমাকে উত্তেজিত করে? দিনের কলিকাতার রাস্তা আর রাতের কলিকাতার রাস্তা কি একই ভাব পথিকের মন সঞ্চারিত করে?· যদি একই ভাব সঞ্চারিত না করে তো কি ভাববৈষম্য পথিকের মনে জাগায় এবং কেন?· কলিকাতার অনেক রাস্তাই তো পরিচিত—এই পরিচিত রাস্তাগুলির মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং কোন্‌টি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট?··উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রাস্তার মধ্যে পার্থক্য কিরূপ?· এই রকমের প্রশ্নপরম্পরার গুণে প্রবন্ধরচনার বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি সংগৃহীত হইয়া গেলে মানব-জীবনে রাস্তার কি মূল্য, তাহাই একবার ভাবিয়া দেখ তো·· ভ্রমণের জন্যই পথের সৃষ্টি—কিন্তু কেন লোক পথ চলে, কেনই-বা ভ্রমণ করে? কেহ-বা পথ চলিয়াই আনন্দ পায়, পথই হয় তাহার আনন্দের উৎস··কেহ-বা পথ চলে দুঃখের বোঝা অন্তরে বহিয়া...আবার কেহ-বা পথ চলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের, কাজ-কর্মের প্রয়োজনে।... ইত্যাদি ইত্যাদি।' অতঃপর এহেন ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতার রাস্তাও যে বহুকালের সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ, আনন্দবেদনার এক নীরব সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এই কথাটি তোমার মনে গভীরে আঁকিয়া যাইবে।

'কলিকাতার রাস্তা' এই প্রবন্ধটিকে লইয়া ভাব-সংগ্রহের পদ্ধতি প্রদর্শন

এমনি ভাবে মনের ভিতরে টানিয়া আনিলেই দেখিতে পাইবে যে, তোমার মন কলিকাতানগরীর রাস্তার স্মৃতির মাঝে বেশ আনাগোনা করিয়া এমন অনেক ভাবসম্পদ আহরণ করিয়াছে, যাহার বলে তুমি ইচ্ছা করিলে একখানি পূর্ণাবয়ব পুস্তকও রচনা করিতে পার। আহৃত এই ভাবসম্পদসমূহের মধ্যে কলিকাতার রাস্তা-সম্পর্কিত সহজে দৃষ্টিগোচর কিছু কিছু সামগ্রী থাকিলেও এমন অনেক সামগ্রীও থাকিবে

যাহা কেবলমাত্র তোমারই ভাব ও ভাবনারাজ্যে বিদ্যমান। অতঃপর প্রবন্ধের এই খসড়া সামগ্রী, যাহা তোমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে কাগজে একটু টুকিয়া রাখ এবং এই বিক্ষিপ্ত এলোমেলো উপাদানগুলিরই মধ্য হইতে একটি সুসমঞ্জসীভূত সুবিন্যস্ত যুক্তিধারা প্রতিষ্ঠা কর, যাহা অনুসরণ করিবামাত্রই পাঠক-পাঠিকার মন কৌতূহলে যাইবে ভরিয়া, সরসতায় যাইবে মজিয়া।

ভাবসংগ্রহ-পদ্ধতিতে স্বকীয়ত্বের ছাপ

ভাবসংগ্রহের পরেই আসে ভাবসজ্জার কথা। আহৃত মালমশলার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়, আর কোন্‌টিই-বা বর্জনীয়? এই ব্যাপারটি ঠিক করিতে পারিলেই ভাবসজ্জা সর্বাংগসুন্দর হয়। মনের গভীরে যে সকল ভাব ও ভাবনা উদিত হয়, তাহাদিগকে এলোমেলো ভাবে ঠাসাঠাসি করিয়া রাখা যায়, কিন্তু সেই বিশৃংখলা, সেই সংপ্রবের মধ্য হইতে একটি সুশৃংখলিত যুক্তিপরম্পরা রচনা করা খুব সহজ কথা নয়।

দ্বিতীয় স্তর—ভাবসজ্জা

বিভিন্ন মাসিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, দৈনিক পত্রিকার রচনাপদ্ধতির কথাই ধরা যাক্ না কেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকেরা কেবলমাত্র নিজেরই দৃষ্টিভংগী প্রকাশ করেন না, পক্ষান্তরে জনসাধারণ যাহা পছন্দ করে, তাহা জানিয়া লইয়াই তাঁহারা প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন। পাঠক সাধারণের মতানুসারী মন্তব্য যে শুধু নির্বাচন করিতে হয় তাহা নয়, সেই মন্তব্যের পরিপোষক তথ্য আহরণ এবং নির্বাচন করিতে হয়। 'সত্য, সমগ্র সত্য, সত্য ছাড়া অন্য কিছু নয়' এই মূল নীতিবাক্যের উপরে আধুনিক সাংবাদিকের ধর্ম নির্ভর করে না, পক্ষান্তরে 'যে সত্য আমি দেখি অথবা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের রুচিসংগত, যে-সত্যটি প্রতীয়মান' তাহারই উপরে আধুনিক সাংবাদিকের ধর্ম কেন্দ্রিত। অবশ্য এই প্রসংগের অবতারণা করিয়া ইহা আমি বলিতে চাই না যে, আধুনিক সাংবাদিকের পদ্ধতিকে পুরাপুরি অনুসরণ করিয়া তুমি প্রবন্ধ-রচনায় অগ্রসর হও, পক্ষান্তরে এই প্রসংগের মধ্য দিয়া ইহাই আমি বলিতে চাই যে, কি করিয়া প্রচুর মালমশলার পাহাড় হইতে কৌতূহলোদ্দীপক অংশবিশেষ বাছাই করিয়া পাঠকগোষ্ঠীর জন্য প্রবন্ধ লেখা যায়, এই সূক্ষ্ম শিল্পবোধটি আধুনিক সাংবাদিকের নিকট হইতে শিক্ষা করা যাইতে পারে।

সাংবাদিকের ভাবসজ্জার বৈশিষ্ট্য

যখনই কোন প্রবন্ধের শিরোনাম তোমায় দেওয়া হয়, তখন ইহাকে সাধারণ নিয়মগত একটা ধুঁয়ার, পরিবেশে দেখিবার চেষ্টা করিও না। 'দেশ ও নেতা' সম্পর্কে তোমাকে প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। বেশ, ভাল কথা। দেশকে তুমি নিজে যে-দৃষ্টিতে

দেখিয়া থাক আর তুমি নিজে যে সকল নেতাকে চোখে দেখিয়াছ—তাহার কথা ভাবিতে সুরু কর। 'বেতার ও বর্তমান জগৎ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে। বেশ তো। বেতারবার্তা তো অনেক সময়েই শুনিয়া থাক, বেতারবার্তায় যাহা শুনিতে পাও, তাহা তোমার ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে, এমন কি আন্তর্জাতিক জীবনেও কি প্রভাব সূচিত করিয়া থাকে, ইহাই একবার গভীরভাবে মনের মাঝে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কর। ধর, 'শিয়ালদহ ষ্টেশনের রেখাচিত্র', কি 'সাঁঝের চৌরংগীর ভাষাচিত্র' রচনা করিতে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতেই-বা ঘাবড়াইবার কি আছে? তোমার নিজের মনটিকে 'শিয়ালদহ ষ্টেশনে'র গণ্ডির মাঝে অথবা 'সাঁঝের চৌরংগী'র পাশে টানিয়া লইয়া গিয়া সব-কিছুকে বেশ একটু সরস ও সূক্ষ্ম মানসদৃষ্টির সাহায্যে ছাকিয়া লইয়া লিখিতে সুরু কর। 'বাংলার পল্লী' সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। তাহাতেই-বা চিন্তার কারণ কি? তোমার নিজের পল্লী কিংবা তোমার পরিচিত অন্যান্য পল্লীর কথা ভাবিতে সুরু কর।

প্রবন্ধাদির ভাবসংগ্রহে ও ভাবসজ্জায় ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগীর কৌলীন্য রক্ষা করিবার পদ্ধতি

দেখিবে, সেই চিন্তার মধ্য দিয়া প্রবন্ধরচনার অনেক মালমশলা তোমার আয়ত্তের ভিতর আসিয়া পড়িবে। এইভাবে যে সকল প্রবন্ধ তোমার নিজের ধারণাশক্তি, নিজের অভিজ্ঞতার নিবিড়তার মধ্যে পড়ে, সেগুলিকে তোমার নিজস্ব বোধ ও অনুভূতির স্রোতে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিবে। কেননা,—তোমার এই যে ভাব ও ভাবনা, ইহা প্রবন্ধকে এক দিক দিয়া যেমন বাস্তব পরিচ্ছদ পরাইবে, অপর দিক দিয়া তেমনি নিজস্ব দৃষ্টিভংগীর স্পন্দনে স্পন্দিত করিয়া তুলিবে। যে বিষয়টি ধারণার ও জ্ঞানের বহির্ভূত, সেখানে অপরের চিন্তাধারা অনুসরণ না করিয়া উপায় থাকে না, কিন্তু যাহা নিজের অনুভূতি ও বোধের অন্তর্গত, তাহাকে কোন প্রবন্ধ হইতে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবে না। হয়তো-বা 'রেলপথে ভ্রমণ' সম্পর্কে কাহারও লেখা কোন প্রবন্ধ তুমি পড়িয়াছ। 'রেলপথ মানবের জীবনে এক পরম আশীর্বাদ'—ঐ প্রবন্ধকারের এই মন্তব্যটি তোমার কাছে এতই ভাল লাগিয়াছে যে, শিথিলতানিবন্ধন তুমিও ঐ কথা বলিয়াই তোমার প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়া দিলে। কিন্তু একথা জানিয়া রাখিও যে, রেলপথ সম্পর্কে ভাবিতে বসিয়া কোনও জ্ঞানী হৃদয়বান্ ব্যক্তিই ঐ ভাবের ভাবনায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে না। বরং সেই সুধী ব্যক্তির ভাব ও ভাবনায় যাহা চমৎকারিত্বের আমেজ সংক্রামিত করিতে পারে, তাহা এইরূপ :—'প্রভাতরবির রশ্মিতে উজ্জ্বল ইস্পাতের রেলপথ····ইঞ্জিনের শব্দ ও ধুঁয়া····দ্রুতগামী ট্রেনের চাপে ধরণীর মর্মস্পর্শী শিহরণ·········

হয়তো-বা নিদাঘতাপে তাপিত দিনে কষ্টসাধ্য ভ্রমণ... ...দিগন্ত আচ্ছাদনকারী ধূলি... ষ্টেশনের অখাদ্য ও কুখাদ্য খাবার সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ·.....ইত্যাদি ইত্যাদি।' এই কথাটি সর্বদা মনে রাখিও যে, **নিজের অভিজ্ঞতা ও ধারণাই প্রকৃত প্র বন্ধ-লিখনের উপাদান; পুরাতন একঘেয়ে মন্তব্য দিলে নিজের চিন্তার জড়তাই প্রকাশ পায়।** এই কথাটি ছাত্রছাত্রীদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, **স্বীয় ভাব ও ভাবনাকে এড়াইয়া গেলে প্রবন্ধ রচনাশিল্পের আত্মধর্মকেই করা হয় অস্বীকার।**

অবশ্য যখন প্রবন্ধ-রচনার সংকেত-সূত্র প্রশ্নপত্রে দেওয়া থাকে, তখন ভাব-সংগ্রহ অনেকখানি সহজসাধ্য হয় সত্য, কিন্তু ভাবসজ্জায় ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগীর কৌলীন্য বজায় রাখা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, রচনার সাধারণ সংকেত-সূত্র থাকিলেই পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিণীরা আর মাথা খেলাইতে চাহে না। ঐ সংকেত-সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রতিটি সংকেতের ভাব সম্প্রসারণ করিয়া এবং সংকেত-পরম্পরার মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ না রাখিয়া প্রবন্ধ-রচনা করিতেই সাধারণত পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিণীরা অভ্যস্ত। ফলে চিন্তাভাবনাহীন, শিথিলবিন্যস্ত, যুক্তিলেশবিহীন, একঘেয়ে প্রবন্ধই বস্তুত পরীক্ষামণ্ডপে রচিত হইয়া থাকে। ধর, তোমাদের প্রশ্নপত্রে যে প্রবন্ধটি রচনা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার নাম 'বাংলা দেশে ছাত্রসংঘ-প্রতিষ্ঠান' এবং রচনাকল্পে যে সংকেত-সূত্র রহিয়াছে তাহা এইরূপ: 'স্কুল-কলেজে ছাত্রসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও নীতিগত আদর্শ—ছাত্রজীবনের মূল উদ্দেশ্যের সংগে ইহার সম্বন্ধ—ইহার দ্বারা ছাত্রসমাজের ঐক্যবোধ ও স্বাবলম্বনশক্তি কতটা স্ফুরিত হয়—ইহার হিতকর ও অনিষ্টকর দিক—বর্তমান অবস্থায় ইহার মৌলিক আদর্শের আংশিক বিকৃতি—ছাত্রদের মধ্যে বিভেদপরায়ণতার প্রবণতা পুষ্টি—স্বাধীন দেশে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কিরূপ আদর্শে পরিচালিত হওয়া উচিত।' এই সংকেত-সূত্রের মধ্যে মোট সাতটি সংকেত আছে। এই সাতটি সংকেতের প্রতিটি সংকেতের জন্য একটি করিয়া অনুচ্ছেদ এবং প্রতিটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় যোগসূত্র রচনা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিবে, যেখানে রচনার সংকেত-সূত্র দেওয়া থাকে, সেখানে তাহা অনুসরণ না করিয়া লিখিলে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিণীরা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়। এই প্রবন্ধটির যে সংকেত-সূত্র আছে, তাহার সহিত তোমার 'কলেজের ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন'-এর কার্যাবলী একটু মিলাইয়া দেখিলে এবং তোমার নিজস্ব চিন্তাধারা আরোপ করিলেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগীর কৌলীন্য প্রকট হইবে। অতঃপর তোমার সমগ্র বক্তব্য ঐ 'ছাত্রসংঘ প্রতিষ্ঠান' বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে পরিস্ফুট হয়,

সংকেতসূত্র-সংবলিত প্রবন্ধ-রচনার পদ্ধতি

সে দিকে লক্ষ্য রাখিলেই প্রবন্ধরচনা-কর্মটি একটি অখণ্ড সৌষ্ঠবময় রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিবে।

সময়ে সময়ে প্রশ্নকর্তা নির্দিষ্টসংখ্যক শব্দ লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিবার নির্দেশ দিয়া থাকেন। হয়তো-বা ৩০০।৩৫০ শব্দ লইয়া কোন প্রবন্ধ রচনা করিতে বলা হইল। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিণীরাই যাহাতে ভাব ও ভাষার সংযম রক্ষা করিয়া সুন্দর সুঠাম সুবলিত ব্যঞ্জনাময় প্রবন্ধ রচনা করে, তাহাই দেখা হয়। সংযম সকল শিল্পকর্মেরই বাহন, একথাটি সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। অনেক-কিছু জানা আছে, অনেক-কিছুই লিখিবার জন্য অন্তর ব্যাকুল হইতেছে, অথচ প্রশ্নকর্তার নির্দেশানুযায়ী নির্দিষ্টসংখ্যক শব্দ অতিক্রম করিবার উপায় নাই, এহেন বাঁধনের মধ্যে থাকিয়া যদি রচনাকর্ম সুসম্পন্ন করিতে পারা যায়, তবেই তো বাহাদুরী।

নির্দিষ্টসংখ্যক শব্দ লইয়া প্রবন্ধ-রচনার কথা

[চার]

প্রবন্ধ লিখিবার আগে একটি বিষয়ে সজ্ঞান থাকা দরকার। কোন্ শ্রেণীর পাঠকপাঠিকা তোমার প্রবন্ধের লক্ষ্য—এই বিষয়ে তোমার সম্যক ধারণা থাকা চাই। এই ধারণা না থাকার জন্যই অনেক প্রবন্ধ অস্পষ্টভাবে লিখিত হয় এবং পড়িতেও হয় ক্লেশদায়ক। কারণ,—নিছক শূন্যবিলম্বী যে প্রবন্ধ-রচনা, তাহাতে কোন পাঠক-পাঠিকাই উদ্দিষ্ট নয়। কিন্তু একটু ভাবিলেই টের পাওয়া যায় যে, বিষয়বস্তু ছাড়া যেমন কিছু লেখা যায় না, তেমনি পাঠকপাঠিকাকে অস্বীকার করিয়াও লেখা চলে না। নিজেকে প্রকাশ করাই যদি হয় লেখার উদ্দেশ্য, তাহা হইলে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রকাশের ব্যাপারটি তাহাও লেখকের জানা থাকা উচিত। যাহাই তোমার বক্তব্য হোক না কেন, তাহা একান্তভাবে নির্ভর করে তোমার লেখার লক্ষ্য ঐ পাঠক-পাঠিকারই উপরে। পাঠকপাঠিকাকে অস্বীকার করিয়া লেখা চলে না। অবশ্য পরীক্ষার 'হলে' যে প্রবন্ধ লিখিতে হয়, তাহার লক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষক বা পরীক্ষিকাই সত্য, কিন্তু প্রবন্ধের মালমশলা সংগ্রহ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই কথাটি সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, পরীক্ষক বা পরীক্ষিকা ছাড়া পরোক্ষভাবে আরও অনেক বুদ্ধিমান ও সুধী ব্যক্তির জন্যই যেন তোমার প্রবন্ধটি লিখিত।

পাঠকসমাজই প্রবন্ধের লক্ষ্য

একটি নূতন বাড়ি তৈয়ার করিতে হইলে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়া যায় তাহার নক্সা করিতেই। কামরাগুলির যথাযথ সন্নিবেশ, দরজা-জানালাগুলিকে যথাস্থানে

বসানো, এমন কি নানাবিধ দেওয়াল ও মেঝে তৈয়ার করিবার ব্যাপারে কতটুকু পরিমাণ মালমশলা লাগা সম্ভব, তাহারও একটা বরাদ্দ করিয়া গৃহস্থকে জানাইয়া দেওয়া হয়। সত্য কথা বলিতে কি, নক্সা ছাড়া সামান্য একটা রান্নাঘরও তৈয়ার করা কঠিন। প্রস্তাবিত নূতন বাড়ির সমগ্র কাঠামোটির একটা নক্সা যদি বেশ যত্ন ও সতর্কতা-সহকারে কাগজের উপরে আঁকিয়া না লওয়া হয় তো ইটের পর ইট গাঁথিয়া শেষ অবধি এক মারাত্মক অবস্থারই সম্মুখীন হইতে হয়। হয়তো-বা নূতন বাড়ি তৈয়ার হইবার পরে টের পাওয়া যায় যে, বাড়িটি আদৌ বাসযোগ্য নয়—তাহার নানা গলদ, নানা অব্যবস্থা, নানা প্রতিবন্ধক। আবার এমনও হইতে পারে যে, বাড়িটি সম্পূর্ণরূপে শেষ হইবার আগে গৃহস্থের আর্থিক অভাবহেতু উহা অসমাপ্তই রহিয়া যায়। ঠিক এইরূপেই প্রবন্ধরচনারও আছে পরিকল্পনা, আছে খসড়া, আছে নক্সা। যুক্তির নানা স্তর, একটি যুক্তিসূত্র হইতে অপর যুক্তিসূত্রে আগাইয়া যাওয়া—এই ব্যাপারটি সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে প্রবন্ধ-রচনার পূর্বে একটা খসড়া তৈয়ার করা দরকার। সকল পদ্ধতিকে অতিক্রম করিয়াই হয় প্রতিভার প্রকাশ—কেহ কেহ এই কথা বলিয়া হয়তো-বা শৃংখলাসম্মত ব্যক্তি-মানসকে আমল দিতে চাহিবেন না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তিমাত্রেরই মানসে আপাতদৃষ্টিতে কোন নির্দিষ্ট প্রণালী দেখা না গেলেও, ইহা গভীর ভাবেই অনুভব করা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট রীতিই প্রতিভাধরদিগের অন্তরে প্রবাহিত থাকে। একথা খুবই সত্য যে, বড় বড় চিন্তাশীল লোকমাত্রেই শৃংখলাসম্মত ভাবে চিন্তা করেন, ইঁহারা ইঁহাদিগের প্রবন্ধের জন্য কোন 'পরিকল্পনা' না করিতে পারেন, কিন্তু খসড়া না করিবার কারণ হইতেছে এই যে, ইঁহাদের মনটিই আসলে সু-পরিকল্পিত। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাধর হইবার দাবি করেন না, কোন-কিছু লিখিবার আগে তাঁহাদিগকে লেখার কাঠামোটি সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হইতে হইবে—ইহাই বলিতে চাই। অনুশীলন বা অভ্যাস যখন বেশ পাকাপোক্ত হইয়া যায়, তখন কাগজে কোন খসড়া না করিয়াই প্রবন্ধ লিখিতে পারা যায়। কারণ,—খসড়াটি কাগজে লিখিত না থাকিলেও মনের নয়নে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যে প্রথম শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনী, যাহার মনে বিষয়গত কত কত সমস্যাই-না ঘা দিয়া থাকে, তাহাকে সম্যকরূপে এবং সুস্পষ্টভাবে প্রবন্ধের খসড়াটি করিয়া ও তাহারই অনুসরণ করিয়া যত্নসহকারে রচনাকর্মটি সম্পন্ন করিতে হইবে।

প্রবন্ধরচনার খসড়া বা পরিকল্পনার অনিবার্যতা

অতএব, প্রবন্ধ কেমন করিয়া লিখিতে হয়—এই অতিপরিচিত প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে চাই যে, রচনা-ব্যাপারটি একটি ধারাবাহিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ

করে। এই ধারাবাহিক ক্রিয়ার যে পাঁচটি স্তর আছে তাহাই অনুসরণ করিবে—প্রথমত, প্রবন্ধের শিরোনামটি কি অর্থ বহন করে, তাহা বুঝিয়া লও। কিন্তু এমনি মজার ব্যাপার যে, এই প্রথম স্তরটিকেই ছাত্রছাত্রীরা দারুণ উপেক্ষা করিয়া থাকে।

প্রবন্ধ রচনার মূলে আছে একটি ধারাবাহিক ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার আত্ম-প্রকাশ ঘটে পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়া

দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধের মালমশলা আহরণ কর। তৃতীয়ত, এই মালমশলাগুলির মধ্যে যেগুলি তুমি ব্যবহার করিতে চাও, মাত্র সেইগুলিই নির্বাচন কর। চতুর্থত, নির্বাচিত মালমশলাগুলিকে লইয়া একটা লক্ষ্যকেন্দ্রিক অবয়বের মাঝে সাজাইয়া রাখ অর্থাৎ সোজা কথায় একটি খসড়া তৈয়ার কর। পঞ্চমত, এবার তোমার প্রবন্ধটি লিখ। অর্থাৎ পর পর চারিটি ধাপ অতিক্রম করিয়া তোমার নির্বাচিত ভাব ও ভাবনাকে একটি প্রকৃষ্ট বন্ধনের মধ্যে বাঁধিয়া রাখ। আর এইরূপ করিতে পারিলেই তো 'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ফুটিয়া উঠিবে। তাই বলি,—নিছক প্রবন্ধলিখন ব্যাপারটি একটি সমগ্র ধারাবাহিক ক্রিয়ার পাঁচটি স্তরের একটি স্তরমাত্র। প্রথম চারিটি স্তর যদি তুমি সম্যকরূপে এবং মানসিক নৈপুণ্যসহকারে অতিক্রম করিতে পার তো শেষ স্তরটি অর্থাৎ নিছক প্রবন্ধলিখন ব্যাপারটি তোমার কাছে অতীব সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। অবশ্য রচনার ভাষারীতি সম্পর্কে যদি তোমার দক্ষতা থাকে, তবেই তাহা সম্ভব।

কোন্ শ্রেণীর অট্টালিকা নির্মাণ করিতে হইতে হইবে—এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াই যেমন স্থপতিকে নকসা করিতে হয়, তেমনি কোন প্রবন্ধের খসড়া রচনা করিবার আগে তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও যে, প্রবন্ধটিতে তুমি কি কি করিতে চাও। কেননা,—ভিন্ন ভিন্ন জাতের প্রবন্ধের লক্ষ্যও ভিন্ন ভিন্ন। ধর প্রবন্ধটি যদি হয় 'ভারতীয় সভ্যতার প্রাণধারা গংগা'র উপর, তাহা হইলে এই প্রবন্ধের শিরোনামটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিয়া লইয়া ধারাবাহিক ক্রিয়াটি ঠিক

নানা জাতের প্রবন্ধের নকসা রচনা করিবার পদ্ধতি

করিয়া লও। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধটির লক্ষ্য হইতেছে কাহারও কাছে কিছু বর্ণনা করা। সুতরাং তুমি তোমার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও যে, কোন্ কোন্ জিনিস তুমি বর্ণনা করিতে চাও এবং কাহার কাছে? কিংবা ধর, প্রবন্ধটি যদি হয় 'আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের' উপরে, তাহা হইলে এই বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখিবার সময় সর্বদাই এই কথাটি মনে রাখিবে যে, তুমি কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কিছু একটা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইতেছ। কিন্তু কি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছ এবং কাহার কাছেই-বা এই প্রমাণ করিবার প্রয়াস? এই প্রশ্নটি নিজের কাছে করিয়া তুমি তোমার যথাকর্তব্য স্থির কর। অথবা ধর,

'ঘট্কি-নাট্কির ওজর'—ইহারই উপর প্রবন্ধ লিখিতে বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই রচনাধর্মী প্রবন্ধে কোনরূপ বর্ণনা বা কোনরূপ প্রমাণ করিবার অবকাশ নাই—এখানে ব্যক্তির চিত্তবিনোদনই একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব, এইরূপ প্রবন্ধ-রচনার কালে তোমার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও যে, ঠিক কি ভাবে তুমি চিত্তবিনোদন করিবার জন্য অগ্রসর হইবে।

সময়ে সময়ে এমন প্রবন্ধও রচনা করিতে বলা হয়, যাহার সম্পর্কে বলিবার অনেক-কিছু থাকে। এই অনেক-কিছু বক্তব্য থাকায়, পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিণীরা খেই হারাইয়া ফেলে। কিন্তু খেই হারাইলে তো আর চলিবে না। লিখিতে তো হইবেই। একটা দৃষ্টান্তই লওয়া যাক্। ধর, 'বাংলার পল্লী'—ইহারই উপরে তোমাকে একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। পল্লীজীবনের যে বৈশিষ্ট্য তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং অপরের মনোযোগও ওতপ্রোতভাবে, অথচ খুব সহজেই, আহ্বান করিয়া থাকে, তাহারই মধ্যে তোমার প্রবন্ধের ভাব ও ভাবনাকে গড়াইয়া দিবে। প্রবন্ধের মালমশলাকে ধাপের পর ধাপ ধরিয়া এমনভাবে সাজাও, যাহাতে দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে পল্লীকথা স্বাভাবিক এবং ন্যায়সংগত রূপে আগাইয়া যায়। যদি তুমি পল্লীদৃশ্যের বিনম্র প্রশান্তির দিকটাই ফুটাইয়া তুলিতে চাও তো নীরব মাধুর্যে-ভরা দৃশ্যগুলিকেই এক সাথে জড় কর এবং তাহারই সংগে পল্লীর জীবন্ত দৃশ্যগুলিকে তুলনা করিয়া তোমার অন্তরের মূল কথাটিকে ফুটাইয়া তোল। অথবা, ধর তুমি পল্লীর সহজ জীবনটিকেই বর্ণনা করিতে চাও। তোমার এই বিশেষ মনোভাবটিকে কি ভাবে প্রবন্ধের স্তর-পরম্পরায় প্রকটিত করিয়া তুলিবে বল তো?...কিন্তু করা আদৌ কঠিন নয়। পল্লীর রাস্তাঘাট, হাট-বাজার, ঘরবাড়ী হইতে সুরু করিয়া পল্লীবাসীর পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার, জীবনধারার মধ্যে যে অপরিমেয় সারল্য ছড়াইয়া আছে তাহাকে ফুটাইয়া তোল। অগণিত পল্লীবাসী জনসাধারণের এই বিরাট্ সারল্যের সুযোগ লইয়াই হয়তো-বা দারিদ্র্য, সামাজিক পদমর্যাদা, অস্পৃশ্যতা আজ পল্লীজীবনকে তচ্‌নচ্ করিতে উদ্যত। অতঃপর তুমি তোমার প্রবন্ধের ক্রিয়াস্থলের আয়তন বাড়াইবার জন্য অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সাম্প্রতিক হরিজন-আন্দোলন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া পল্লী-উন্নয়ন-কথা বলিয়া সহজ সরল স্বচ্ছন্দ পরিষ্কৃত এবং শিক্ষাস্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল আদর্শ পল্লীর চিত্র তোমার প্রবন্ধে পরিস্ফুট কর। কিন্তু একটি কথা। প্রবন্ধের মধ্যে যাহা কিছুই বল না কেন, পল্লী-জীবনের সারল্য দেখানোই এই রচনাকর্মের উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধের প্রভূত মালমশলার মধ্য হইতে কি করিয়া প্রয়োজনীয় মালমশলা নির্বাচন করিতে হয়

বর্ণনামূলক প্রবন্ধের সব চেয়ে বড় ত্রুটি হইতেছে এই যে, কোন অতি-নির্দিষ্ট যোগসূত্র বজায় না রাখিবার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময়েই একটি নীরস তালিকা, একঘেয়ে পঞ্জিকা রচনা করিয়া বসে। এই একঘেয়ে তালিকা রচনা করিবার দুর্বুদ্ধি পরিহার করিবার একটিমাত্র সহজ উপায় আছে। তাহা হইতেছে—বর্ণিতব্য বিষয়-বস্তুর কোন বিশেষ গুণকে ধীরে ধীরে সব-কিছুর মধ্য দিয়া প্রতিফলিত করিয়া তোলা। এইরূপ করিতে পারিলে অযথা-বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলিকে একটি সূত্রে গাঁথিতে পারিবে, তোমার প্রবন্ধটিকে সহজপাঠ্য এবং সহজবোধ্য করিতে পারিবে, প্রবন্ধের মাঝে একটি স্পষ্ট মনোভাব ফুটিয়া উঠিবে। শুধু তাহাই নয়। পাঠকমনের উপরে বেশ একটি স্থায়ী ছাপও রাখিতে পারিবে। একথা স্মরণ রাখিও যে, প্রবন্ধের গোড়া হইতে যাহাই পড়িয়া আসা যাক্ না কেন, কাহারও মনে সে সকল কথা থাকে না—বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার এক গাদা খাতার মধ্যে সমাসীন পরীক্ষক বা পরীক্ষিকার মনে তো নয়ই। তাই যদি তোমার যুক্তিধারা স্পষ্টভাবে বিবৃত না হয়, তোমার প্রবন্ধের সমগ্র পরিবেশের মধ্য দিয়া যদি তাহা একান্তভাবে উৎসারিত না হয়, তাহা হইলে তুমি যে নিশ্চিত ভাবেই পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় নিরুদ্দেশের যাত্রী বা যাত্রিনী হইবে—একথা বলাই বাহুল্য। আর নিরুদ্দেশের যাত্রায় পরীক্ষার্থী-পরিক্ষার্থিণীরা শেষ অবধি অসীম ব্যর্থতাই বরণ করিয়া লয়।

বর্ণনামূলক প্রবন্ধ যাহাতে একঘেয়ে তালিকায় পরিণত না হয়, তাহার কৌশল সম্পর্কে ইংগিত

বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখিতে হইলে অবশ্য একটু আলাদা ধরণের প্রকাশভংগী অবলম্বন করিতে হয়। ধর, একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলা হইল, তাহার নাম—'ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগদান করা কি সমীচীন?' এখানে এই প্রবন্ধটির সকল দিক দিয়া আলোচনা করিয়া একটা নির্দিষ্ট মনোভাব শেষ অবধি তুমি গ্রহণ করিবে—ইহাই আশা করা যায়। এই সমস্যাটি এমন একটি সমস্যা যে, ইহা রাজনীতিতে অনুরাগী ছাত্রমাত্রেরই সহিত সম্পর্কিত। এই প্রবন্ধে যাহা তোমার বক্তব্য, তাহা বেশ প্রত্যক্ষভাবেই ছাত্রসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া—জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া নয়। এই সমস্যা সম্পর্কে যদি পূর্বেই তুমি বেশ কিছু চিন্তা করিয়া থাক, তাহা হইলে প্রবন্ধটির একটি খসড়া রচনা করিয়া রচনাকার্যটি সম্পন্ন করা খুবই অনায়াসসাধ্য। কিন্তু যদি তুমি এই সমস্যাটি সম্পর্কে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া থাক, তাহা হইলে প্রবন্ধ-রচনার পূর্বে তোমার মনোভাবটিকে সর্বাগ্রে স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লও। বুঝিয়া লইবার স্তর-পরম্পরা এইরূপ:

বিতর্কমূলক প্রবন্ধ-রচনার পূর্বকৃত্য—একটি প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা

'ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগদান করা কি সমীচীন'?'—এই নামটির ঠিক অর্থটিই-বা কি, তাহাই নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। 'ছাত্র' বলিতে কি বুঝ? 'ছাত্রধর্মই' বা কি?....' যখন এই সব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর তোমার মনের ভিতরে ফুটিয়া উঠিবে তখনই বুঝিবে যে, রাজনীতি ছাত্রদের পক্ষে ন্যায়সংগত ক্রিয়াকাণ্ড কিনা। সম্ভবত তুমি তোমার মনের মাঝে এই উত্তরটি পাইবে—'যাহারা শিক্ষা করে, যাহারা অনুশীলন করে, যাহারা পড়ে, তাহারাই ছাত্র।' বেশ কথা। আচ্ছা, 'কেন তাহারা শিক্ষা করে? কেনই-বা তাহারা পাঠ করে?' 'উত্তরজীবনে দেশের সেবায়, সমাজের সেবায়, জাতির সেবায় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবার জন্যই তাহাদের এই শিক্ষা, তাহাদের এই প্রস্তুতি। উত্তরজীবনে বুদ্ধিমত্তার সহিত নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অনেক বিষয়ই ছাত্রদিগের পঠনীয়। অতএব, ছাত্রদের পক্ষে পাঠই একান্তভাবে প্রয়োজন।'

পূর্ববর্তী বিতর্কমূলক প্রবন্ধের খসড়া রচনা করিবার পদ্ধতি—প্রথম স্তর

অতঃপর রাজনীতি যোগদানের প্রশ্নটি কিভাবে তুমি বিশ্লেষণ করিবে, তাহারই পন্থা বাত্‌লাইয়া দিতেছি। 'ছাত্রগণ যদি রাজনীতিতে যোগদানই করে, তাহা হইলে তাহারা কতটুকু অংশই-বা গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহারা ভোট দিতে পারিবে না, তাহারা পরিষদের সভ্য হইতে পারিবে না; তাহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহারা শাসননীতিকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিবে না। যেটুকু তাহারা করিতে পারিবে, তাহা তো হইতেছে এই—ঝাণ্ডা উড়ানো, রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া বেড়ানো, প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে 'পিকেট্ করা', ধর্মঘট চালানো এবং সময়ে সময়ে ছোট-বড় 'স্পিচ্' দেওয়া। এখন কথাটি হইতেছে এই যে, এই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড রাজনৈতিক অবস্থার সত্য তথ্যটিকে সংগ্রহ করিবার পক্ষে কতখানিই-বা সাহায্য করিয়া থাকে, অথবা কতটুকুই-বা জ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত বহন করিয়া আনে? বলা বাহুল্য,—কিছুই না। ভবিষ্যৎ-জীবনে ছাত্রকে যদি নেতা হইতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে জাতির জীবন-গঠনে ও জাতির চিন্তা-নিয়ন্ত্রণে কিছু-একটা মৌলিক দান দিতে হইবে। পূর্ববর্তী যুগের নেতারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই তোতাপাখীর মত মুখস্থ বলিয়া কোন লাভ নাই। যতদিন অবধি নিজস্ব, যুগোপযোগী, সুসমঞ্জসীভূত, সুবলিত, দৃঢ়মূল প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত কোন বাণী ছাত্রের অন্তরে ফুটিয়া না উঠে, ততদিন তাহাকে পড়িতেই হইবে, ভাবিতেই হইবে। আগে চাই বিদ্যাবুদ্ধির পরিস্ফুরণ, আগে চাই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়, তারপর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ।

পূর্ববর্তী বিতর্কমূলক প্রবন্ধের খসড়া রচনা করিবার পদ্ধতি—দ্বিতীয় স্তর

এই সমস্যাটি সম্বন্ধে তোমার চিন্তা যখন একটা স্পষ্ট আকার ধারণ করিবে, তখনই তোমার যুক্তিগুলিকে পারম্পর্য রক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠা কর। একটিমাত্র দৃষ্টিভংগী সরাসরিভাবে প্রকাশ করিও না। তোমার দৃষ্টিভংগীকে যাহারা সমর্থন করে না অর্থাৎ যাহারা বিরুদ্ধমতাবলম্বী, তাহাদের দাবিটিকেও তোমায় মিটাইতে হইবে। বিতর্কমূলক প্রবন্ধমাত্রেরই স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিধারা বিশ্লেষণ করিয়া তোমার নিজস্ব মনোভাবটিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবে—ইহাই তো পরীক্ষক বা পরীক্ষিকা তোমার কাছে আশা করেন। একপেশে যুক্তিধারায় বিতর্কমূলক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া ওঠে না। মনে রাখিবে, এই জাতীয় প্রবন্ধে বিতর্কের পরিবেশ থাকা চাইই। আলোচ্য প্রবন্ধটির খসড়া নির্মাণের পূর্বে তুমি বিপরীত যুক্তিধারাও টুকিয়া রাখিতে পার ঃ যেমন,—

পূর্ববর্তী বিতর্কমূলক প্রবন্ধের খসড়া রচনার পদ্ধতি—তৃতীয় স্তর

রাজনীতিতে যোগদানের স্বপক্ষে যুক্তি

[এক] অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজনীতিতে কিছু না কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

[দুই] ছাত্রেরা সভাসমিতিতে প্রস্তাবাদি 'পাশ' করিয়া জনমতকে প্রভাবিত করিতে পারে।

[তিন] ছাত্রেরা গণ-সমাবেশকে বেশ ফাঁপাইয়া তুলিয়া রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে।

রাজনীতিতে যোগদানের বিপক্ষে যুক্তি

[এক] কিন্তু ছাত্রসম্প্রদায় বুদ্ধিমান হইবার প্রণালী-অনুসরণকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

[দুই] কিন্তু ছাত্রদের এই যে প্রস্তাব, ইহা আরও সুন্দর এবং আরও জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিতে পারে, যদি রাজনীতিতে যোগদানেচ্ছু ছাত্রগণ আরও কিছুকাল অবস্থাটিকে পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তির মধ্য দিয়া আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে।

[তিন] কিন্তু অপরিণতবুদ্ধি ছাত্রেরা কেন অপরের নেতৃত্ব স্বীকার করিবে? সভাসমিতি শোভাযাত্রার হুজুগে না মাতিয়া আজিকার ছাত্রেরা যদি প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা আগামী কালের মনস্বী ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রেও মৌলিক দান দিবার সার্থক শক্তি বহন করিতে সক্ষম হইতে পারে।

তারপর কোন্ দিক দিয়া তুমি যাইবে, ইহা যখনই তোমার মনের মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিবে, তখনই তুমি একটা খসড়া-পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করিবে। ধর, পূর্বকথিত পর পর তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া আলোচ্য প্রবন্ধটির খসড়া-পরিকল্পনার চরম স্তরটি দাঁড়াইল এইরূপ :—(১) ভূমিকা। সমস্যার প্রকৃতি। প্রায় সকল ছাত্রেরই উপরে কমবেশী ভাবে, বিশেষ করিয়া যে সকল ছাত্র অর্থনীতি, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি পড়ে তাহাদেরই উপরে বেশী করিয়া, রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে। (২) ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য—শিক্ষা, যাহা উত্তরজীবনে দেশ ও সমাজের পূর্ণতর সেবার প্রস্তুতি আনিয়া দিয়া থাকে। ইহার আলোচনার মূলে আছে তিনটি জিনিষ—(ক) যথাসাধ্য তথ্য আহরণ; (খ) উন্নততর বিচার-বুদ্ধির অনুশীলন, (গ) মৌলিক নেতৃত্বের ভিত্তিভূমি গঠন। (৩) উক্ত প্রকার লক্ষ্য অনুসরণই ছাত্র কর্তব্য। এই কর্তব্যপালনে প্রতিবন্ধক এড়াইবার জন্য যথাসাধ্য বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ। (৪) কাহারও কাহারও ধারণা, কোন বিষয়ের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাকিলে সেই বিষয়টি অনুশীলন করা একেবারেই অসম্ভব। তাই ভবিষ্যতের উত্তম নাগরিক হইতে গেলে রাজনীতিতে যোগদান না করিয়া উপায় নাই। এই মতের বিরুদ্ধে ইহাই বলা যায় যে, সক্রিয়ভাবে যোগদান না করিয়াও উক্ত বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করিতে পারা যায়। বলিতে কি, রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের বেগপ্রচণ্ডতা এবং চাপপ্রাবল্যের বাহিরেই সত্যকার জ্ঞানবুদ্ধিসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব। (৫) উপসংহার। ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনে যাহাতে পূর্ণতম সত্য প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, তাহারই জন্য একটু সাময়িক ধৈর্য ধরিবার জন্য ছাত্রসমাজের কাছে আবেদন। খসড়ার এই পাঁচটি সংকেতকে অনুসরণ করিয়া এখন সম্পূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য অগ্রসর হও। সত্যানুরাগই যে ছাত্রধর্ম এবং মানুষের ধর্মও বটে—এই জিনিষটিই হইবে তোমার প্রবন্ধের মূল সুর। বিতর্কমূলক প্রবন্ধমাত্রই রচনা করিবার কালে অতীব যত্ন এবং সতর্কতার সহিত এমন ভাবে অগ্রসর হইবে, যাহাতে চূড়ান্তরূপে বিপরীতমুখী মতদ্বৈধের মধ্যে তোমার নিজস্ব মতটি যেন প্রতিবাদের অতীত বলিয়া প্রকটিত হয়।

পূর্ববর্তী বিতর্কমূলক প্রবন্ধের খসড়া রচনার পদ্ধতি—সর্বশেষ স্তর

কিন্তু যে প্রবন্ধ বর্ণনামূলক নয়, বা বিতর্কমূলকও নয়, পক্ষান্তরে কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনই যাহার লক্ষ্য, তাহা রচনা করাই সব চেয়ে কঠিন। ধর তোমায় 'নস্যি-ভরা নাকের' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে দেওয়া হইল। এক্ষেত্রে তুমি কি করিবে? এখানে তোমার মৌলিক অনুপ্রেরণা দ্বারা এই প্রবন্ধসমুদ্র পার হইতে পারিবে কি? এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, মনোহর হিউমার-রসভূয়িষ্ঠ

প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে প্রবন্ধরচনা-শিল্পে প্রভূত ও গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। যাঁহারা এই বিষয়ে প্রকৃত শিল্পী, কেবলমাত্র তাঁহারাই চিত্তবিনোদনকারী এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনা করিতে সক্ষম। প্রথম শিক্ষার্থী কদাচিৎ এই জাতীয় দু'চারটি প্রবন্ধ নিজে হইতে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ বড়ই কঠিন। তাই তোমায় এই কথাটিই জানাইয়া রাখি যে, পরীক্ষামণ্ডপে এই ধরণের প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়াস পাইবে না। তবে যদি এমন হয় যে, প্রবন্ধটি নিজে বাড়ি বসিয়া ইতিপূর্বেই ভাল করিয়া রচনা করিযাছ, তাহা হইলে পরীক্ষার খাতায় লিখিতে বাধা নাই। আসল কথা এই যে, এই জাতীয় প্রবন্ধ লিখিতে হইলে যে স্বতঃপ্রবৃত্তি ও উদ্দীপনাময় কৌতুকপরতা থাকা চাই, তাহা কখনও পরীক্ষাগৃহে ছাত্রছাত্রীদের অন্তরে থাকে না। মানুষের মন যখন শ্রান্তি-ক্লান্তির অতীত এক নিরবচ্ছিন্ন অবসরের মাঝে ঘুরিতে থাকে, তখনই এই জাতীয় প্রবন্ধ-রচনার একটি স্তর হইতে অপর স্তরে প্রাবন্ধিক মনটি দোল খাইতে খাইতে চলে। 'এই ধরণের প্রবন্ধ যদি পড়িতে চাও তো G. K. Chesterton, Hiliare Belloc, Robert Lynd, E. V. Lucas, বীরবল, মোহিতলাল প্রভৃতির লেখা কিছু কিছু সরস রচনা পড়িতে পার। তবে সাধারণত এই জাতীয় প্রবন্ধ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দেওয়া হয় না—তাই রক্ষে।

চিত্তবিনোদনকারী সরস প্রবন্ধের খসড়া রচনা করিবার কথা

খসড়া তৈয়ার করিবার পরে প্রবন্ধটি কি করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীরা হয়তো-বা লেখনীর পুচ্ছদেশ চিবাইয়া চিবাইয়া শেষ করিয়া ফেলে। হ্যাঁ,—কথাটি ঠিক যে, সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম বাক্যটি রচনা করা খুবই কঠিন। অবশ্য প্রারম্ভসূচক বাক্যটি ছাড়াও সমাপ্তিবোধক বাক্য সময়ে সময়ে লেখা কঠিন হইয়া পড়ে। এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শুধু এইটুকুই বলিয়া রাখি, প্রারম্ভ-বাক্যটি হইবে মনোমদ, চিত্তাকর্ষক এবং চমৎকারিত্ব-সঞ্চারী। প্রথম বাক্যটি যদি হয় একেবারেই শিথিল এবং দুর্বোধ্য, তাহা হইলে পরীক্ষক বা পরীক্ষিকার বিক্ষিপ্ত মনকে কি করিয়া তুমি আকর্ষণ করিবে? মনে রাখিও, তোমার প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটি যদি পরীক্ষক বা পরীক্ষিকার মনকে সম্মোহিত করিতে না পারে, তাহা হইলে তোমার অনেক বক্তব্যই এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ও মাঠে মারা যাইবে আবার সমাপ্তিবোধক বাক্যটিও যদি ধারালো ছুরির ন্যায় পরীক্ষক বা পরীক্ষিকার মনের মাঝে দাগ না কাটিয়া দিতে পারে তো প্রবন্ধ-রচনার সকল প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

প্রবন্ধরচনার প্রারম্ভ-বাক্য ও সমাপ্তি-বাক্য গঠন নৈপুণ্য

ধর, তুমি 'পর্বতারোহণ' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া লিখিলে "পর্বতারোহণ একটি চমৎকার ব্যায়াম" এই প্রারম্ভ-বাক্যটি। হ্যাঁ—ইহা যে একটি উত্তম ব্যায়াম, তাহা বালকেও বোঝে। ইহাই বুঝাইবার জন্য একটি বাক্যরচনার কসরৎ দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। তাই তোমার মনোভাবটিকে প্রকাশ করিবার জন্য একটা নূতন কোন পথ ধর। আচ্ছা যদি তুমি লেখ—"পর্বতারোহণ ক্রিয়াটি ঠিক যেন অংকশাস্ত্র শিক্ষা করিবারই মত, যতই আমরা উচ্চ হইতে উচ্চতরের দিকে আগাইয়া যাই, ততই ইহা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া পড়ে; কিন্তু লক্ষ্যস্থলে যখন পৌঁছানো যায়, তখন যে পুরস্কারটি মানুষের অদৃষ্টে মিলে, তাহা কি অতুলনীয় আনন্দই-না দেয়!" কিংবা ধর,—'বিশ্বশান্তি ও যুদ্ধ' সম্পর্কে একটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ তোমাকে রচনা করিতে দেওয়া হইয়াছে। হয়তো-বা তুমি গোড়াতেই লিখিয়া বসিলে—"আজিকার দিনে এই যুদ্ধপরবর্তী জগতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সমস্যা একটি অন্যতম জরুরী সমস্যা।" প্রবন্ধের এই প্রারম্ভবাক্যটি তোমার বেশ মনোমত হইয়াছে, তাই না? কিন্তু মুস্কিল হইতেছে কি জান? আজিকার দিনে শুধু এই একটিমাত্র সমস্যাই নয়, বহু জরুরী সমস্যাই জগদ্দল পাথরের মত বিশ্ববাসীর বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। সুতরাং ঐ ধরণের বিবৃতি এই সমস্যাটিকে কোন স্বাতন্ত্র্যই দেয় না। তাই তো বলি,—উহা অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক বাক্য রচনা কর। ধর, তুমি লিখিলে—"সংগ্রামমুখী মনোভাব মানুষ যতকাল অবধি সংযত করিতে না শিখিবে, ততকাল পর্যন্ত মানুষ যুদ্ধসজ্জা কখনও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে না।" কেমন?—প্রারম্ভবাক্যটি কি অধিকতর মনোমদ হইল না? মোট কথা, প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে তোমার আগ্রহ ও মনের সজীবতা ফুটাইয়া প্রারম্ভ-বাক্যটি রচনা করিবে। কখনও-বা বিষয়বস্তুর সংজ্ঞা আলোচনা অথবা উহার মূলগত অর্থ নির্দেশ করিয়া, কখনও-বা বিষয়বস্তু-সম্পর্কিত কোন মহাজন-বাক্য বা কবিবাণী উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া, কখনও-বা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন প্রচলিত ধারণার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া, কখনও-বা প্রবন্ধের উপসংহারে যে-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হইবে তাহারই সম্বন্ধে প্রারম্ভে আভাস দিয়া, কখনও-বা আপাত-দৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর সংগে নিঃসম্পর্কিত কোন বাক্য লিখিয়া—অবান্তর কথা সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া প্রারম্ভ-বাক্যটি রচনা করিতে হয়।

প্রবন্ধাদির আদর্শ প্রারম্ভ-বাক্য রচনা-সম্পর্কে নির্দেশ

প্রবন্ধের সমাপ্তি সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া রাখি। পরীক্ষার খাতা পড়িয়া ইহাই দেখিতে পাই যে, পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিণীরা যখন মনে করে যে, বেশ কয়েক পৃষ্ঠা প্রবন্ধ তাহারা লিখিয়া ফেলিয়াছে এবং হয়তো-বা অনেক-কিছুই বলিয়াছে, তখনই তাহারা প্রবন্ধের উপসংহার করিয়া বসে। কিন্তু আমি বলি অনেক-কিছু লিখিবার

ফাঁকে ইতিমধ্যেই প্রবন্ধটির সংহার-কার্য হইয়া গিয়াছে, তবে এই উপসংহারের মধ্য দিয়া সেই পূর্ববর্তী সংহার-কার্যেরই একটা আনুষ্ঠানিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইল এই মাত্র। তাই এইভাবে প্রবন্ধ শেষ করা আদৌ উচিত নয়। প্রবন্ধমাত্রকেই যুক্তিধারার পরিবেষ্টনে বেষ্টিত করিয়া এমন ভাবে সমাপ্তিতে টানিয়া আনিতে হইবে যে, সেই সমাপ্তিটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর শেষ কথাটিই বলিয়া দিবে। এমন হওয়া চাই যে, সমাপ্তিবোধক বাক্যের পরে আর একটিমাত্র বাক্যও জুড়িয়া দেওয়া চলে না। কেন না,—উহার মধ্য দিয়াই চূড়ান্ত বোধ সঞ্চারিত হইবে। এমন কি, প্রধান যুক্তির পরিবেশ যতই দুর্বল হোক্ না কেন, যত কথাই অকথিত হইয়া থাকুক না কেন, পরবর্তী কল্পনা বা কৈফিয়ৎ-জাত কোনও বাক্য বা বাক্যাদি জুড়িয়া দিবার অবকাশ যদি না থাকে, তবেই তো বুঝা যাইবে যে, প্রবন্ধটি সত্যই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কোঠায় উপনীত হইয়াছে। যেমন ধরা যাক, 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি' প্রবন্ধের একটি সমাপ্তি-বোধক বাক্যের কথা—"মানব-প্রয়াসের যেমন অন্ত নেই, ইতিহাসেরও সেইরূপ চলার বিরতি নেই। সংসারে যেদিন সুন্দর ও শিবের সত্যকার প্রতিষ্ঠা হবে সেদিন হয়তো-বা মিল্‌বে তার বিশ্রামের অবকাশ।" এইভাবেই প্রবন্ধের শেষে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ইংগিত ফুটাইয়া তুলিতে হয়। বর্ণনামূলক প্রবন্ধের সমাপ্তিতে একটা সাধারণ অথচ সমগ্র দৃষ্টিভংগীর ইংগিতমুখর প্রতিপত্তি থাকাই বিধেয়। তবে এমন যদি হয় যে, বর্ণিতব্য বিষয়ের অংশবিশেষের সৌন্দর্য-মাধুর্য এরূপ একটি পরিবেশ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহার স্মৃতি তোমার বর্ণনামুখর মনটির ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, তাহা হইলে তুমি সেই বিশেষ অংশটিকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনামূলক প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পার। অবশ্য বিতর্কমূলক প্রবন্ধের সমাপ্তিবোধক বাক্য রচনা করা খুবই সহজ। কারণ, নিছক যুক্তিপ্রবাহের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ দৃঢ়মূল বিবৃতি লইয়াই উপসংহার গঠিত হইয়া থাকে। আসল কথা হইতেছে এই যে, তোমার প্রবন্ধের শেষ কথাটিই যেন হয় শেষ কথা। কথার পরে কথা সাজাইয়া, শব্দের পর শব্দ জুড়িয়া যে বাক্য রচনা করা হয়, প্রবন্ধশেষের বাক্যটি সেরূপ বাক্য নয়। কেননা,—এই শেষ বাক্যটিই সমগ্র প্রবন্ধের একটি পূর্ণ রসরূপ লইয়া পরীক্ষক-পরীক্ষিকার অন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই যদি করিতে পার, তবেই-না তুমি আশানুরূপ নম্বর পাইবার অধিকারী হইবে।

প্রবন্ধাদির আদর্শ সমাপ্তি-বাক্য রচনা সম্পর্কে নির্দেশ

[পাঁচ]

বক্তব্য বিষয় কেমন করিয়া বলিতে হয়, এ সম্পর্কে তো অনেক কিছুই বলিয়াছি। কিন্তু আসল কথাটি এখনও বলা হয় নাই। ভাব ও ভাবনা লইয়াই

বক্তব্য বিষয় আর ইহা ব্যক্ত হয় ভাষারই দ্বারা। তথ্যতত্ত্ব, যুক্তিতর্ক সংবলিত এই যে ভাব ও ভাবনা, ইহাদের আহরণ নির্বাচন ও সংযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া সত্য, কিন্তু ইহাদিগকে পাঠক-পাঠিকাজনের বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতে হইলে ভাষাই তো সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। প্রবন্ধ-রচনা নিছক আত্মগত চিন্তা নয়। বক্তব্য বিষয় অপরের মনে সঞ্চারিত করাই প্রবন্ধ-লিখনের উদ্দেশ্য। অতএব, পাঠক-পাঠিকা যেখানে পাঠকালে লেখক-লেখিকাকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিয়া লইবার সুযোগ পাইতেছেন না, সেখানে লেখক-লেখিকাকে এমন সতর্কতার সহিত শব্দবিন্যাস ও বাক্য রচনা করিতে হইবে, যাহাতে পাঠক-পাঠিকা তাঁহাদের লেখা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। তাই তুমি নিজের মন দিয়া লিখিবে সত্য, কিন্তু পরীক্ষক-পরীক্ষিকার মন যাহাতে তোমার বক্তব্য বিষয় বুঝিবার সুযোগ পায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। একজন অন্যজনের সংগে কথোপকথনকালে যেমন অতি সহজেই তাহার ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিয়া থাকে, তেমনি সহজ সাবলীল ভাষাতেই প্রবন্ধ লিখিতে হয়। তবে একথা সর্বদা মনে রাখিও যে, তোমার চিন্তারাশিকে তোমার মস্তিষ্ক হইতে যত সহজেই পরীক্ষার খাতায় নামাইয়া দাও না কেন, উহাকে পরীক্ষার খাতা হইতে পরীক্ষক বা পরীক্ষিকার মস্তিষ্কে উঠাইয়া দেওয়া আবার ততটাই কঠিন। আপন অন্তরের ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষার স্বচ্ছতা সুপরিচ্ছন্নতা এবং বিশুদ্ধতাও যেমন চাই, তেমনি চাই ভাষার ঔজ্জ্বল্যও। শুধু জ্ঞানবিজ্ঞানের সংবাদ বহন করিয়াই নয়, তথ্য ও তত্ত্বের প্রাচুর্য সন্নিবেশিত করিয়াও নয়, প্রাঞ্জল ও সরল বাণীভংগীর গুণেই রচনা হয় মূল্যবান। ভাষায় প্রাঞ্জলতা ও সরসতা থাকিলে শুধু সাহিত্যের পুস্তক কেন, বিজ্ঞান-দর্শনের গ্রন্থও সহজবোধ্য এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে।

প্রবন্ধ-রচনায় ভাষার গুরুত্ব

বাংলা প্রবন্ধ লিখিবার ব্যাপারে আজকাল ভাষা-সমস্যা দেখা দিয়াছে। যে-ভাষায় লেখা হয়, তাহার দুইটি রূপ—একটি, সাধু ভাষা, অপরটি, চলিত ভাষা. পরীক্ষায় উভয়ের মধ্যে কোনটিই অপাংক্তেয় নয়। তবে বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভাষাবিন্যাস সমীচীন। সাহিত্যিক পত্ররচনায়, আত্মকথার বিবৃতিতে, গল্পরচনায়, মজলিসী আলাপ-আলোচনা ইত্যাদিতে চলিত ভাষার যোগ্যতা অবশ্য স্বীকার্য। আবার এই ভাষা-ব্যবহারে বিষয়বস্তুর বর্ণনার একটি উচ্ছল গতিও সংক্রামিত করা যায়। পক্ষান্তরে, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও গভীরতা, গাম্ভীর্য ও নিবিড়তা, মর্যাদা ও সংযম রক্ষা করিবার ব্যাপারে সাধু ভাষার শক্তি

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার যোগ্যতা বিচার

অনন্যসাধারণ। বর্তমানে অবশ্য সাধুভাষা ব্যবহার না করাই একটি 'ফ্যাশান' হইয়াছে। কারণ, সাধুভাষা নাকি কৃত্রিম। কিন্তু কথাটি এই যে আজিকার সাধুভাষা সেকালের সাধুভাষা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি যুগন্ধর সাহিত্যস্রষ্টাগণ চলিত বা মৌখিক ভাষার সকল বুলিকে লইয়াই এক নবতর সাধুভাষা, সুসংস্কৃত সাধুভাষা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই নবতর সাধুভাষা প্রাত্যহিক জীবনে প্রচলিত চলিত ভাষার সহিত ব্যবধান রক্ষা করিয়া যে আভিজাত্য লাভ করিয়াছে তাহা বক্তব্য বিষয়কে দীর্ঘস্থায়িত্ব দান করিতে সক্ষম। সত্যই সাধুভাষার বিরুদ্ধে কৃত্রিমতার অভিযোগ উপস্থাপিত করা যায় না। তাই বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া কোন প্রবন্ধ চলিত ভাষায়, আবার কোনটি-বা সাধু ভাষায় রচনা করা হইয়াছে। তবে পরীক্ষামূলক ভাবে দেখিবার জন্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও গভীরতা থাকা সত্ত্বেও গুটিকয়েক প্রবন্ধ চলিত ভাষায় রচিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই ইহা নজরে পড়িবে।

প্রবন্ধের ভাব ও ভাবনার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, শব্দবিন্যাস ও বাক্যরচনার ব্যাপারেও লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠা দরকার। নিজস্ব এই বাণীভংগীতেই প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। ভাষায় প্রাবন্ধিকের এই যে নিজস্ব ভাব ও ভাবনার সম্যক প্রকাশ, ইহাকেই ইংরাজিতে বলা হয় 'স্টাইল'। ভাব ও ভাবনা নিজের সামগ্রী হইলে, তাহার প্রকাশ আপনার স্বতঃস্ফূর্ত ভাষাতেই ঘটে। যেখানে অপরের ভাব ও ভাবনাকে অনুকরণ করিতে হয়, সেখানে যতই মনোহর ও চটকদার শব্দ প্রয়োগ করা যা'ক না কেন, ভাষার প্রাণহীনতা কৃত্রিমতা একঘেয়েমি দেখা দিবেই। পরের ভাব ও ভাবনার মুখোস পরিয়া, পরস্বাপহরণ করিয়া, কখনো সজীবতা রক্ষা করা যায় না। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কেহ কেহ ভাষাকে বিনা কারণে তির্যক ভংগীতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ-বা নিজস্ব ভাব ও ভাবনার বদলে নব নব শব্দ ও বাক্যাংশ সৃষ্টি করিয়া, ব্যবহার করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে তাক লাগাইবার চেষ্টা করেন। সাহিত্যের বাজারে সস্তায় কিস্তিমাৎ করিবার এই যে অপপ্রয়াস চলিতেছে, ইহাকেই আবার ছাত্র-ছাত্রীরা 'স্টাইল' মনে করিয়া অনুসরণ অনুকরণ করিয়া থাকে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের ইহা বুঝা উচিত যে, ভাব ও ভাবনায় যাহা নাই, তাহাই পাঠক-পাঠিকাদের মনের কাছে প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য ঐ জাতীয় লেখকেরা ভাষাকে ইচ্ছা করিয়াই তির্যক করিয়া থাকেন। পাঠক-পাঠিকাকে ধোঁকা দিয়া তাহাদের নিকট হইতে মর্যাদা লাভ করিবার ইচ্ছা এক প্রকার দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়া আর কি! তাই তোমরা এই কথাটি সব সময়ে

ভাষার 'স্টাইল' সৃষ্টির উপায়

মনে রাখিও যে, ঋজুতাই সৌষ্ঠব আর বক্রতাই অসৌষ্ঠব, ঋজুতাই সৌন্দর্য আর বক্রতাই কুৎসিত। গভীর জটিল সামগ্রীকে সহজ সরল করিয়া বলিতে পারিলেই তো যথার্থ শক্তির পরিস্ফুরণ। নিজের মত করিয়া সামান্য বক্তব্যকেও যদি সরল ভাবে বলা যায়, তবে সেই ছোট উক্তিটুকুই সৌন্দর্যে সৌষ্ঠবে ও সংযমে ভরিয়া উঠিবে। যেটুকু বলিবার, মাত্র সেইটুকুই বলিবে, তদতিরিক্ত নয়। এমন কি, বক্তব্যের পুরাপুরি না বলিয়া কিছু কম বলিলেও ক্ষতি নাই। ইহাতে এক দিকে যেমন লেখার ব্যঞ্জনাশক্তি প্রকাশ পাইবে, অপর দিকে তেমনি তোমার না-বলা বাণী হৃদয়ে অনুভব করিয়া পরীক্ষক-পরীক্ষিকা অন্তরে তৃপ্তি লাভ করিবেন। 'স্টাইল' বলিতে এই জিনিষটিই বুঝায়। আর ইহাতেই থাকে প্রবন্ধ-লিখনের মোট নম্বরের অর্ধেকের কিছু কম।

আজকাল একটা বিষয় প্রায়ই আমাদের নজরে পড়ে—ভাষায় না আছে বিশুদ্ধতা, না আছে সৌষ্ঠব। বানান সম্বন্ধে তো একেবারে অবাধ স্বাধীনতা। সংস্কৃত সাহিত্যেরই ছায়াতলে আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভাষা যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, একথা আমরা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকায় এই অপকাণ্ডটি দেখা দিয়াছে। অথচ সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার অতীব আপনার জন। তাহা ছাড়া, ঐ ভাষার শব্দসম্পদ যেমন অপরিমেয়, শব্দগঠনশক্তিও তেমনি অতুলনীয়। নব নব শব্দগঠন করিবার পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। এই জ্ঞানলাভ করিবার একটি সহজ উপায় আছে। প্রাচীন ও খ্যাতনামা লেখকদিগের বাংলা গ্রন্থ পাঠ করিলে ভাষার বিশুদ্ধতা ও সৌষ্ঠব রক্ষা করিবার আদর্শবোধটি স্বতই পাঠক-পাঠিকার মনে সঞ্চারিত হইবে। প্রসংগত, আর একটি কথাও বলিয়া রাখি। বাংলা ভাষার শব্দসম্পদ বাড়াইবার জন্য কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার উপরই নির্ভর করিতে হইবে, এমন কথা বলি না। বিদেশী শব্দও যে বর্তমান বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে, ইহা তো আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। তবে এক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন আছে খুবই। আমাদের ভাষায় যে শব্দটি নাই, সংস্কৃত ভাষা হইতে যাহা গঠন করিতে হইলে অবোধ্য অথবা দুর্বোধ্য হইয়া পড়িবে, কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বিদেশী শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। আর গ্রহণ-কালেও ঐ বিদেশী শব্দকে বাংলা ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে জারিয়া তুলিয়া আপনার করিয়া লইতে হইবে। বিদেশী শব্দকে অপ্রয়োজনে, বিনা বিচারে আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য পারিভাষিক শব্দের কথা আলাদা। কেননা,—প্রয়োজনের খাতিরেই বিদেশী পারিভাষিক শব্দ আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে এবং করিবেও।

ভাষায় সৌষ্ঠব ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার উপায়

ভাষাই ভাব ও ভাবনার বাহন। সুতরাং ভাষা-ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীগণকে অবশ্যই অবহিত হইতে হইবে। ভাষার প্রয়োগ-ব্যাপারে কি করা উচিত, প্রথমে তাহাই তোমাদিগকে বলি :—(ক) বক্তব্য বিষয়ের প্রতি একনিষ্ঠ থাকিয়া শিক্ষিত জনগণের ভাষারীতি প্রয়োগ করিবে। (খ) নিত্য-ব্যবহৃত, নিত্য-পরিচিত ভাষা যথাসম্ভব ব্যবহার করিবে। (গ) পরিমিত বাক্যব্যবহারই বাঞ্ছনীয় ; কেননা,—তাহাতে অর্থের নিবিড়তা ও সুস্পষ্টতা প্রকাশ পাইবে। (ঘ) প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষা, স্বচ্ছ সাবলীল বাক্য সংযোজনা করিবে। ইহাতে বক্তব্য বিষয়ের মর্যাদা থাকিবে। যেখানে বক্তব্য বিষয় নিতান্তই তুচ্ছ, ভাব ও ভাবনা একেবারেই নিঃস্ব, সেখানেই দেখা দেয় বাক্যাড়ম্বর, সেখানেই প্রকাশ পায় পাণ্ডিত্যাভিমান।

ভাষা-ব্যবহার সম্পর্কিত ইতিবাচক চারটি নির্দেশ

পরিশেষে ভাষার প্রয়োগক্ষেত্রে কি করা উচিত নয়, এবার তাহাই বলিতেছি :—(ক) ভাষার নবীকরণকে প্রশ্রয় দিবে না। ভাষার নবত্ব বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট তো করেই না, বরং দুর্বোধ্য, এমন কি অবোধ্যও, করিয়া তুলে। (খ) সামান্য বক্তব্য বলিতে গিয়া শব্দের ঢক্কানিনাদ ও অসামান্য বাক্যের গঠন করিবে না। (গ) একই ভাব ও ভাবনা বার বার বিভিন্ন উক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবে না। সমার্থবাচক শব্দাদি উপর্যুপরি ব্যবহার করিবে না। (ঙ) উপমা-অলংকার-বহুল ভাষা প্রয়োগ করিবে না। কল্পনা-সমৃদ্ধ অথবা কবিত্বময় রচনায় এই ভাষার খানিকটা মূল্য আছে সত্য, কিন্তু প্রবন্ধ-রচনায় উহার কোন মূল্য নাই। অবশ্য প্রবন্ধ-লিখনের বিষয়বস্তু যেখানে হয় কাব্যধর্মী, সেখানে এহেন ভাষার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য। (চ) অপ্রচলিত, দুরূহার্থক শব্দ আদৌ প্রয়োগ করিবে না। (ছ) তৎসম বা তদ্ভব নূতন নূতন শব্দ ও অপ্রয়োজনীয় বিদেশী শব্দ কখনও ব্যবহার করিবে না। এই দোষগুলি সম্বন্ধে সতর্ক থাকিলে তোমরা তোমাদের বক্তব্য বিষয়টিকে পরীক্ষক-পরীক্ষিকাদের মনে যথোচিত রূপে এবং ভাল ভাবেই তুলিয়া ধরিতে পারিবে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

ভাষা-ব্যবহার সম্পর্কিত নেতিবাচক সাতটি নির্দেশ

প্রথম কলেজীয় ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথা

প্রবেশিকা পরীক্ষা 'পাশ' করে কলেজে প্রবেশের পর যে স্মৃতি আমাদের মনে থাকে, তাতে আছে বেদনা এবং আনন্দ দুইই। অবিমিশ্র আনন্দ মাটির পৃথিবীতে পাওয়া যায় না—তিক্ততার স্বাদ আছে বলেই-না আনন্দ এত মধুর—ফেলে-আসা অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনে মানব-

ভূমিকা

মনের এই তো জাগ্রত প্রবণতা। প্রতিটি ছাত্রের প্রথম কলেজ-জীবনের স্মৃতির মালা এই একই সূত্রে পড়ে গাঁথা।

ইস্কুলে যখন পড়তাম, তখন কলেজে পড়া সম্পর্কে কি সব অদ্ভুত ধারণাই-না ছিল! কতই-না স্বপ্নের জাল বুনে যেতাম কল্পনায় কলেজের পড়ুয়া হবার ভাবনা ভেবে! শহরের গর্জনমুখর যান্ত্রিক জীবন থেকে অনেক দূরে—নাগরিক সভ্যতার চাঞ্চল্যস্পর্শহীন নগণ্য এক পল্লীগ্রামের ইস্কুলের ছাত্র ছিলাম আমি। শহরের মতো সারা বিশ্বের নাড়ীর সংগে যোগ ছিল না তার—রাজ্য-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, শিল্প-সাহিত্য-সমাজের নিত্যনূতন বিবর্তনের সংবাদ মিল্‌ত না খবরের কাগজের পাতায়। চারপাশের যে মানুষগুলির সংগে চ'ল্‌তো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দেনা-পাওনা, তাদের জীবনধারা ছিল স্রোতমন্থর বদ্ধ জলাশয়ের মতো। চেনা-পরিচিত মানুষের মধ্যে গ্রাজু'য়েটের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। ওদের মতো একজন হওয়াকে তখন মনে ক'রতাম জীবনের শ্রেষ্ঠতম স্বপ্ন, মহত্তম পরিচয়ের গৌরব-তিলক।……প্রবেশিকা পরীক্ষায় 'পাশ' করাব পর কলেজে প'ড়তে এলাম এই ভাবনার সম্বলকে পাথেয় করে। বিত্তহীন মধ্যবিত্ত-সন্তানের এই বিদ্যালাভের বাসনা সেদিন উপহসিত হয়েছিল শক্তির অযথা অপব্যয় বলে', মানসিক বিলাসের বড়লোকী চরিতার্থতা-রূপে। অভিভাবকেরা চেয়েছিলেন ছেলে চাকুরী করুক, ঘূর্ণায়মান সংসার-রথের চাকায় জোগাক আরও দু'চার বিন্দু তেল। নিজের অতীব নিকট জনের বিরুদ্ধতার কাঁটার মুকুট মাথায় পরে' চলে এলাম আজন্ম স্বপ্নের কল্পরাজ্যে—বড় হবার দুর্মর বাসনাকে সফল করবার জন্যে দুর্জয় সাহসে ভর করে' প্রবেশ ক'রলাম সরস্বতীর বাণীকুঞ্জে। সেদিন আমার সাথী ছিল তিনটি জিনিস—ভালো ছেলের সুনাম, বন্ধুদের উৎসাহ-বাণী আর সহজাত আত্মশক্তিতে দুর্জয় বিশ্বাস।

ইস্কুল-জীবন থেকে কলেজ-জীবনে উত্তরণ

কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় মনে হ'ল দরিদ্রের পাতার কুটির থেকে এসেছি যেন এক রাজ-রাজেশ্বরের সোনার প্রাসাদে। সুন্দর সুন্দর দালান, মস্তবড় খেলার মাঠ, বেড়াবার জন্যে চমৎকার গাছে-ঘেরা উদ্যান—কলেজের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কলনাদী স্রোতস্বিনী—তারই পাশে দোতালায় আমাদের ক্লাসঘর—জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় নদীতীরবর্তী ঝাউ-গাছের সারি, পাতায় পাতায় তার বাতাসের মর্মরসংগীত। নদীতে ছোটো-বড়ো কত নৌকো ভেসে চলেছে দেশে-দেশান্তরে—সাদাকালো ছোটো-বড়ো কত নৌকোর কত রঙ-বেরঙের পাল তুলে দেওয়া। আশ্চর্য [illegible] সে-দৃশ্য! জীবনে কত সুন্দর দৃশ্যই তো দেখেছি—কিন্তু 'নবিকে'র

নূতন পরিবেশ

অধ্যাপকের নীরস বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে বার বার তাকিয়ে দেখ্‌তাম সেই অপরূপ ছবি। চিত্রার্পিতের ন্যায় বসে' থাকতাম ভাবে বিভোর হয়ে—শান্তির কল্যাণস্পর্শে মুছে যেত দেহমনের সমস্ত গ্লানি আর অবসাদ। মনে প'ড়ত, আজ যে কলেজের ছাত্র আমি, এর প্রতিষ্ঠার পিছনে আছে কী গভীর আত্মত্যাগ আর দুঃখবরণের ইতিহাস! যে মফঃস্বল কলেজের নাম আজও দ্বিখণ্ডিত বাংলায় পরিচিত, সেখানে একদিন ছিল বিরাট্‌ শ্মশান আর ঘন জংগল—দিনের বেলায় অতিবড়ো সাহসী পুরুষেরও পর্যন্ত কাঁপুনি জাগ্‌ত বুকে; আর আজ সেখানেই এক মহাপ্রাণ স্থাপয়িতার অক্লান্ত চেষ্টায় ও অতুলনীয় সাধনায় গড়ে উঠেছে কলালক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠতম পাদপীঠ। মনে মনে গৌরবান্বিত বলে' ভাবতাম নিজেকে—কলেজের অতীত গৌরবে ফুলে উঠ্‌ত বুক। কলেজের সর্বব্যাপী সুনামকে যাতে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পারি, বাড়াতে পারি তার সম্মান ও মর্যাদা—এই ছিল আমাদের জাগ্রত চিন্তা। ইস্কুলে ছিলাম অনাথের মত ভিক্ষাপ্রার্থী—এখানে পেলাম অফুরন্ত জ্ঞানসম্পদের সন্ধান—নব নব সাহচর্যে নিজেকে গড়ে' তুলবার অপর্যাপ্ত সুযোগ ও সুবিধা।···শাসনে আর ধমকে শিক্ষা লওয়ার পালা হ'ল শেষ—অধ্যাপকদের সাথে ভিন্নতর পরিচয়ে জ্ঞানার্জনের নূতন অধ্যায় হ'ল সুরু। পরিচয় হ'ল এমন একজন মানুষের সংগে যিনি আজন্ম-তপস্বী। অধ্যাপনাকেই তিনি একান্তভাবে জীবনের ব্রত-হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বলে' কিছু ছিল না। তাঁরই চেষ্টায় বিনা বেতনে কলেজে পড়্‌বার সুযোগ পেলাম—পেলাম আরও নানা সুযোগ-সুবিধা।

জীবনের ক্ষুদ্রতার গণ্ডি গেল ভেঙে—পরিচয় হ'ল নানা মেজাজের অজস্র ছেলের সাথে—কেউ ক'রল সমাদর, কেউ-বা ক'রল শত্রুতা; পাঠ্য-তালিকার বহির্ভূত জীবনের বিবিধ কাজে চ'ল্‌ত সুতীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পাল্লা দিতে গিয়ে আমি টের পেতাম নিজের শক্তির দীনতা। প্রাণপণ চেষ্টায় তাকে বাড়িয়ে যেতাম—সাহায্য পেতাম অকৃত্রিম ভাবে প্রকৃত শুভার্থী বন্ধুদের কাছ থেকে।

কলেজের বিবিধ কর্ম

তখন আমি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সারা কলেজের ছাত্রদের নিয়ে বিতর্ক-প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। বিষয়বস্তু ছিল—'গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, মানবসভ্যতার উন্নতি তো হয়ই-নি, বরং প্রতিক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে।' বন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে নাম তো দিলাম প্রতিযোগীদের তালিকায়, কিন্তু ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে হয়ে গেল কাঠ। উপরের ক্লাসের কত সব নাম-করা ছাত্র-বক্তা ছিল—তাদের সংগে পাল্লা দিয়ে কি জিত্‌তে পারব আমি! সাহস করে দাঁড়ালাম বক্তৃতা দিতে—ইংরেজি ভাষায় ব'লতে গিয়ে বার বার ভুল

হ'তে লাগল প্রথম প্রথম। দেখলাম, ছেলেদের মধ্যে অনেকে হাসছে আমার শোচনীয় দুরবস্থা দেখে। হাজার গুণ সাহস ফিরে এল মনে। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ধ্বনি মন্ত্রিত হ'ল কণ্ঠে। বজ্রদীপ্ত ভাষার গাম্ভীর্য সকল কোলাহলকে দিল স্তব্ধ ক'রে। ভুল ইংরেজি বলার ত্রুটি ডুবে গেল সতেজ বক্তৃতা-ভংগীতে ও তেজস্বী বক্তব্যের তীব্রতায়। বিচারক ভুলে গেলেন সময়-নির্দেশক ঘণ্টা বাজাতে। ঘড়ি দেখে নিজেই নির্দিষ্ট সময়ে বক্তৃতা শেষ ক'রলাম। বন্ধুরা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। করতালিতে ভরে' গেল সারা ঘর। মনে হ'ল যেন বিশ্বজয় করে এলাম। বিচারে দেখা গেল, অনেক পয়েণ্ট বেশী পেয়ে আমিই হয়েছি প্রথম—প্রকাণ্ড একটা 'কাপ' পেলাম উপহার—আর পেলাম অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। এই একটিমাত্র ঘটনায় শহরের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীমহলে হয়ে পড়লাম অত্যন্ত সুপরিচিত, যার প্রভাব আজও আমার জীবনে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।......কলেজের বিবিধ কাজে কত জগদ্বিখ্যাত মানুষের সংগে প্রত্যক্ষভাবে মিশ্‌বার সুযোগ হয়েছিল। দেখেছিলাম বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে, অর্থনৈতিক বিনয় সরকারকে, কবি নজরুল ইসলামকে, কবি-সমালোচক সজনীকান্ত দাসকে, আরও অনেক অনেক মানুষকে।

স্মরণীয় ঘটনা

বাড়ি থেকে প'ড়তে এসেছিলাম বিদ্রোহ করে। মানুষ হ'বার সাধনায় ব্রতী হ'তে গিয়ে বঞ্চিত হয়েছিলাম নিতান্ত আপন জনদের স্নেহমমতা থেকে। তাঁরা ভেবেছিলেন গোকুলের ষাড়ের মতো বাজে সময় কাটানোর এ এক নিছক বাবুগিরি বিলাসিতা। একক শক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রতে গিয়ে বুঝেছিলাম আমার কর্মশক্তির জোর। একটির পর একটি বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে' আমার সাফল্যের জয়রথ যখন এগিয়ে চ'ল্‌ল পথে পথে, তখন তাঁরা বুঝলেন গোলামির শিকলে ধরা না দিয়ে এমন কিছু অন্যায় করিনি আমি। তাদের মনোভাব বদলাতে লাগল।......

ভবিষ্যতের স্বপ্ন

বড় হ'বার নূতন শিক্ষা পেলাম এই বিদ্যানিকেতনে। বি. এ., এম. এ. পাশ করাই যে বড়োত্বের মাপকাঠি নয়, জীবনের পরিপূর্ণতা যে আরও অনেক জিনিষের উপর নির্ভরশীল, সেই সুমহান্ জীবনমন্ত্রই আমি খুঁজে পেলাম এই কলেজের দু'টি বছরের স্বল্প-পরিধিতে। বাহির-বিশ্বের প্রাণচাঞ্চল্য অনুভব ক'রলাম ছত্রিশ নাড়ীতে। বুঝলাম বড়ো হ'তে হ'লে আমায় হ'তে হবে সত্যকার মানুষ, হ'তে হবে আত্মিক ভাবে বৃহৎ ও উদার মানুষ। আর সেই মানুষ হবার পথই সব চেয়ে বিঘ্নসংকুল ;—সেই পথেই জীবনের জয়যাত্রা চালানোর দৃঢ় সংকল্প নিলাম আমি মনে মনে।

শেষের কথা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

"কাহার কণ্ঠে গগন মন্দ্রে
নিবিড় নিশীথ টুটে,
কাহার মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে?"

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নবজাগৃতির কলধ্বনি জেগেছিল, যে নব-জীবনের সামঝংকার দিগ্‌বিদিক্‌ করেছিল মুখর ও প্রাণাবেগচঞ্চল, তার মর্মস্থলে ছিল বাঙালীরই সাধনা। সৌন্দর্যের সাধনা, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাধনা, কর্মের অচপল সাধনা—ভারতের প্রতি ক্ষেত্রেই সেদিন বাঙালী প্রতিভার অমর স্বাক্ষর রূপায়িত হল নানা ছন্দে নানা সুরে, বাংলার মনীষার গংগোত্রি সেদিন সমগ্র ভারতে আনল ভাবগংগার আপ্লাবন। এল রামমোহন, এল বিদ্যাসাগর। এল বঙ্কিম—জাতির কানে দিল 'বন্দে মাতরম্‌' মন্ত্র। শতাব্দীর জড়তা ও গ্লানি গেল কেটে। জাগ্‌ল বিস্ময়, উচ্চকিত হল আত্মচেতনা, চিত্তে দুলে উঠ্‌ল পুলকিত আশা। এল বিবেকানন্দ—তামসিক ধর্মান্ধতা গেল কেটে, পরাধীন ভারতের গণনারায়ণের ঘুমঘোর গেল টুটে। তারপরে অবিরাম জলোচ্ছ্বাসের মতোই শুরু হল মহামনীষার অবিচ্ছিন্ন অভ্যুদয়! সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ—বাংলার সেই প্রতিভার দেয়ালী-উৎসবে সমগ্র ভারত হল আলোকমণ্ডিত। জাতির জীবনে এল নবযৌবন-জলতরংগ; কিন্তু সবরমতীর জহ্নুমুনি সে ভাবগংগাকে অবরুদ্ধ করলেন নিজের অন্তরে। জনগণের আবেগ চাইল নিরংকুশ প্রকাশ। পথ কোথায়? কোথায় আলোকবর্তিকা? কোথায় পথিকৃৎ মহামানব? 'জয় হিন্দ'—ঐ শোন মহামানবের উদাত্ত আহ্বান, 'দিল্লী চলো'—ঐ শোন যুগসারথির অকুণ্ঠ পথনির্দেশ; 'তুম্‌ মুঝ্‌কো খুন দো, ম্যায় তুম্‌কো আজাদী দুংগা'—ঐ শোন নেতাজীর অমর আশ্বাস। জয়তু সুভাষ! জয়তু নেতাজী!!

প্রথম জীবনে সুভাষ

ধন্য সুভাষের বাংলা, ধন্য বাংলার সুভাষ, ধন্য সুভাষের জন্মস্থান কটক, ধন্য সুভাষ-মহিমাঝলকিত ভারত! বিবেকানন্দের উত্তরসাধক, চিত্তরঞ্জনের প্রিয় সহচর সুভাষচন্দ্র 'তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল'। বুদ্ধ, শংকরের মতো তিনিও বাল্যে অধ্যাত্মসাধনার আকর্ষণে করেছিলেন গৃহত্যাগ। কিন্তু নির্জন-সাধনা তো তাঁর পথ নয়। তাই

লোকালয়ে তাঁকে আসতে হল ফিরে। ছাত্রজীবনেই তাঁর স্বদেশপ্রাণতার বিদ্যুদ্দুন্মেষ আমরা দেখি ভারতবিদ্বেষী ওটেন সাহেবের স্পর্ধিত রসনা সংযত করার নির্ভীক প্রচেষ্টায়। ছাত্র সুভাষ বিলাতী আই. সি. এস্. পরীক্ষায় সার্থকতার স্বর্ণমুকুট লাভ করেও তা নিক্ষেপ করেছিলেন দূরে—দুরান্তরে। পরিপূর্ণ সাফল্যের ঐশ্বর্যের ভিতরে তিনি আপন অন্তরের মর্মবাণী শুনতে পেলেন কৈ? তাইতো তিনি দেশে ছুটে এসে যোগ দিলেন কংগ্রেসে, গান্ধীমন্ত্রে নিলেন দীক্ষা, চিত্তরঞ্জনের হলেন সহচর।

শুরু হল দেশমাতৃকার অক্লান্ত সেবা। কখনও-বা কারাদণ্ড, আবার কখনও-বা কারামুক্তি—এরই মধ্য দিয়ে চ'লল বিপ্লবী বীর সুভাষের অগ্নিসাধনা। ১৯৩৩ সালে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য য়ুরোপে যাবার তিনি অনুমতি পেলেন। তার পরে দীর্ঘ প্রবাসের পর সুভাষ ভারতে ফিরলেন ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে। পর বৎসর গান্ধীজীর মনোনীত পট্টভি সীতারামিয়া হলেন সভাপতিপদের জন্য সুভাষের প্রতিদ্বন্দ্বী। জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে সুভাষই হলেন ত্রিপুরী অধিবেশনে কংগ্রেস-সভাপতি। কিন্তু গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত মতবিরোধ ঘটায় তিনি সভাপতির লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করে নিজের আদর্শ অনুযায়ী 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন ক'রলেন। তাই দেখি,—ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের ন্যায় আর কেউই বিদেশী শাসক ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক যুগপৎ নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হন নাই। তাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের জীবন স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছে এক বিচিত্র অধ্যায়। সুভাষের অশান্ত অন্তরে যে কালবৈশাখীর ছায়াপাত হয়েছিল, তাই তাঁকে করল দেশছাড়া। পেশোয়ারী জিয়াউদ্দীনের বেশে ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করে বার্লিন, টোকিও এবং পরে সিংগাপুরে তাঁর গমন সর্বজনবিদিত। সেখানে তিনি 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' সংগঠন করলেন। তার পরে শুরু হল নেতাজী সুভাষের নেতৃত্বে স্বাধীনতার সশস্ত্র অভিযান। আরাকান, ইম্ফল, কোহিমার রণাংগনে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' যে বীর্যপরিচয় দিল, তা সমগ্র জগতে করল স্তব্ধ বিস্ময়ের সঞ্চার।

রাজনীতিক সুভাষ

জ্ঞান, শৌর্য, উচ্চ চিন্তা, সহজ সরল জীবনযাত্রা ও ন্যায়পরায়ণতার অপূর্ব সমন্বয়-সাধন সুভাষের চরিত্রে ঘটেছিল বলেই তো তিনি 'নেতাজী'। হিন্দু-মুসলমান-মিলনে আসামের মন্ত্রিসভা-গঠনে সুভাষ দেখিয়েছিলেন নিরপেক্ষ বিচারশক্তি ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয়—তাই তিনি 'নেতাজী'। 'ভারত ছাড়ো' এই আদেশ সুভাষচন্দ্রের মুখ থেকেই সর্বপ্রথম ধ্বনিত হয়েছিল—তাই তিনি 'নেতাজী'। অবিরাম বোমাবর্ষণের মাঝে অচল

সুভাষ কেন 'নেতাজী'?

অটল ভাবে দাঁড়িয়ে 'আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজে'র সর্বাধিনায়ক সুভাষ স্মরণ করিয়ে দেন 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য'—তাই তো তিনি 'নেতাজী'।

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও আদর্শ ভাবের বিলাসক্ষেত্র নয়, ইহা অমৃতের পিপাসায় ক্ষুরধার পিচ্ছিল পথে মৃত্যুঞ্জয়ী অভিসার। লক্ষ-কোটি মানবের দুর্গতি ও দুঃখমোচন, ভারতের চির-অবহেলিত জনসমষ্টিকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই যে মরণ পণ অসাধ্য সাধনের প্রয়াস—সুভাষচন্দ্র এরই ভাবঘন বিগ্রহমূর্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—'এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, ধ্যানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি, দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।' সভ্যতা ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে ইহাই ভারতবর্ষের দৃষ্টি। সুভাষচন্দ্র এই দৃষ্টি নিয়েই পৃথিবীকে দেখেছেন। ভারতীয় দৃষ্টি সমন্বয়ের দৃষ্টি। সমাজ ও ব্যক্তি, মানবসমাজ ও বাহ্য প্রকৃতি, ভারতের চিরন্তন চিন্তাধারা ও বিশ্বের ভাবধারা—এতগুলো বিভিন্ন ধারার সমন্বয় জটিল হলেও ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রয়েছে এরই পূর্ণতা-সাধনের প্রমাণ। বহুমুখী ভাবধারার পূর্ণ সমন্বয়সাধনই স্বাধীনতাকামী নেতাজীর জীবনবাদের মর্মকথা। তাই তিনি বলেছিলেন—'মানবজীবন একটি অখণ্ড পূর্ণতা মাত্র। তাকে বায়ুহীন পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে ভাগ করা চলে না। চলে না ভাগ ক'রে তার প্রতি দৃষ্টি প্রয়োগ করা। রাজনীতিক জীবন, নাগরিক জীবন ও সামাজিক জীবনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন জীবন মনে করা যেতে পারে না। ভিতর থেকে একটা বিরাট্ আদর্শ উদ্ভূত না হলে নাগরিক জীবন সুন্দর ও পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। স্বাধীনতা ছাড়া সেই আদর্শ উদ্ভূত হওয়া সম্ভব নয়।'

সুভাষের সাধনা ও জীবনবাদ

নেতাজী জীবিত কি মৃত, এ সম্বন্ধে অভ্রান্ত সংবাদ আমরা এখনও জানি না। কিন্তু নেতাজীর সাধনা, নেতাজীর কল্পনা কি সার্থক হয়নি? নেতাজীর সাধনাই ভারতকে দিয়েছে স্বাধীনতা। নেতাজীর 'দিল্লী চলো'-র সাধনা কি ব্যর্থ হ'তে পারে? যুগে যুগে দিল্লীর লাল কেল্লা শহীদের রক্তে হবে রঞ্জিত, স্বার্থান্ধ শোষক ও শাসকের রক্তে স্বাধীনতার তৃষ্ণা হবে সন্তৃপ্ত। এই মহামানবের অবিনশ্বর কীর্তি ও অবদানের কথা স্মরণ করে' আমাদের চিত্তের জড়তা, ভোগলিপ্সা ও স্বার্থানুসন্ধিৎসা হোক্ বিদূরিত, আমাদের আত্মঘাতী কলহের হোক্ অবসান। জয়তু নেতাজী! প্রণাম লহো—লহো প্রণাম!

শেষ কথা

জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত—ট্রেন ফেল

জীবনে এ ভাবে ছুটিনি কোনদিন। জীবন-পথে তো নয়ই, মাঠে ঘাটে পার্কেও নয়—তাহলে দৌড়বাজ হিসেবে হয়ত-বা একটা খ্যাতিই রেখে যেতে পারতাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কারুর আমবাগানের পাশ দিয়ে, ধানের ক্ষেতের আল্-পথে হোঁচট্ খেয়ে পথ ভুল করে যখন টিমটিমে তেলের আলো-জ্বলা প্লাটফর্মে এসে হাজির হলাম, তখন ক'লকাতায় যাওয়ার শেষ ট্রেন অনেক দূর। পেছনের লাল আলোটা ছুটে চলে যেতে যেতে যেন মিট্‌মিটে ঠাট্টা ক'রছে আমার দিকে চোখ টিপে!

ট্রেন চলে গেল

তাহলে সত্যিই ট্রেনটা ফেল ক'রলাম। ফিরে যাব সেই বন্ধুর বাড়ি, তার আর কো সম্ভাবনা নেই—এই অন্ধকারে অজানা মাঠ ভেঙে ট্রেন ধরবার আশায় যেভাবে ছুটেছি দু'মাইল পথ, ট্রেন ফেল-করা পাগুলো আর কোনক্রমেই পিছুপানে সেভাবে ছুটতে রাজী হবে না। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম,—আচ্ছা মশাই, ক'লকাতার যাবার আর গাড়ী নেই? ভদ্রলোক খাতাপত্রগুলো চাবিবন্ধ করতে করতেই বললেন—আছে বইকি! আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। কখন, কটায়? এবার তিনি মুখ তুলে তাকালেন। শীর্ণ কংকালের মুখের এক দিকের গোঁফটা যেন কে উপড়ে নিয়ে গেছে! হারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় উঁচু হনুর হাড় দু'টো জ্বল্‌জ্বল্ ক'রছে। কেমন একটা অদ্ভুত খন্‌খনে গলায় তিনি বলে উঠলেন—আছে—তবে কাল বেলা ৯টায়। হাঃ হাঃ করে তারপরে হেসে উঠলেন। হারিকেনটা তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন—কি মশাই, ভয় পেলেন নাকি? চোর ডাকাত এখানে আসতেই সাহস করে না। আমার বুকের মধ্যে একটা অজানা ভয় হাডুডু খেলতে লাগল। একটা কি পাখি কর্কশস্বরে ডেকে উঠে পাখা ঝাপটে কালো আকাশপথে চলে গেল। ওটার ডাকের সংগে ষ্টেশন মাষ্টারের গলার স্বরের মিল আছে আশ্চর্য। ঘরে তালা পড়'ল। বলহরি বলহরি—বলে তিনি আবার চেঁচিয়ে উঠলেন। আমার অবস্থাটা ভাবুন একবার। ক'লকাতার ছেলে, এ কী কাণ্ডের মধ্যে এসে প'ড়লাম, বাপ রে! মাটি ফুঁড়ে একটা মিশ্‌কালো সরু ঢ্যাঙা লোক উঠে এল যেন।—বলহরি, আমি চললাম, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে তুইও বাড়ি যা। ষ্টেশন মাষ্টার পথে বেরিয়ে প'ড়লেন। তাঁর হাতের লণ্ঠনটা একটা গাছের ছায়ায় কিংবা পথের বাঁকে হারিয়ে গেল। বলহরি পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে!

ষ্টেশন মাষ্টার

তারপরে কড়িকাঠের সংগে ঝোলানো ধোঁয়া-ওঠা লণ্ঠনটা নামাতে গেল। আমি

কাতর হয়ে ব'ললাম—বাবা হরিবোল, লণ্ঠনটা আর নিয়ে যেও না, বাপু। ওর তেলের জন্যে তো এত কষ্ট, সে পয়সাটা না হয় আমি তোমায় খুশি হয়ে দিয়েই দিলাম। বলহরির পলকহীন চোখটা ঝলসে উঠল। একটা কি ছুটে চলে গেল পেছন দিকে। আমি চমকে উঠলাম! বলহরি সান্ত্বনা দিয়ে বলে—ভয় কি বাবু, এ বেঞ্চের উপর দিব্যি শুয়ে থাকুন। আপনার ও ব্যাগের জন্যে ভাববেন না, চোর-ডাকাত এদিক পানে ভয়েই আসে না। আর ঐ দক্ষিণ দিকটায় না তাকালেই হল। ওদিকে গাঁয়ের সব বেওয়ারিশ শব-টব ফেলে যায় কিনা! আর ঐ পুবের উঁচু ভিটটার দিকে আদৌ যাবেন না, কোন চীৎকার চীৎকার শুনলেও নয়। খৃষ্টানদের পুরোনো গোরস্থান ছিল কিনা ওটা, ভর-দুপুরেও ওর কাছে লোক যায় না। আর......। আমি তখন কাঠ হয়ে গেছি।

বলহরির আশ্বাস

তাড়াতাড়ি আরও দুআনা পয়সা গুঁজে দিই। আর দরকার নেই, বিড়িটিড়ি খেও'খন। এমন? বলহরি সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল, যাবার আগে আর একবার আশ্বাস জানিয়ে গেল ভয়ের কোন কারণ নেই, চোর-ডাকাত তো আসবে না আর আলোটা তো রইছেই। আল্-পথে বলহরির উচ্চকণ্ঠ সংগীত শুনতে পেলাম—'হরি বল মন নিকটে শমন যাবে জীবন রবে না।' ও কি আমাকে উদ্দেশ করেই গাইছে নাকি?

ভীরু বলে একটা বদনাম আমার কোন কালেই ছিল না। এমন কি, ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক তর্কও করেছি। সে যাক্‌গে। এখন তা মনে না করাই ভাল। আশেপাশে যাঁরা কানখাড়া করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা এটা জানলে খুব ভাল কথা নয়। ক'লকাতার বিদ্যুতালোকে তর্ক করা চলে, কিন্তু এই পোড়ো ষ্টেশনে তা বিশ্বাসে পরিণত হবে যে!

ক'লকাতা আর এই পোড়ো ষ্টেশন

আকাশে ছেঁড়া মেঘের তলা থেকে চাঁদ উঁকি মারে। না মারলেই ভাল হত! পুবের ভিটের গাছপালা দেখা যায় যেন। কলার পাতাটাকেই একটা ৩০০ বছর আগের 'মা'ব বলে মনে হলে দোষ দেব কাকে?

একটা নেড়ী কুকুর ঘুরছিল চারদিকে। একবার আমার কাছে এসে কি শুঁকে গেল, তারপর কেঁউ কেঁউ করতে করতে লেজ নামিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলে গেল। ওদিক থেকে একদল শেয়ালের সোল্লাস ঐকতান শোনা গেল। আকাশের চাঁদ মেঘে ঢেকেছে। পাতায় পাতায় ঝোড়ো হাওয়ার কানাকানি চলছে। দূরের ঝাউগাছটায় কারা নাচুনি জমিয়েছে যেন! আলোটা খানিকটা ধোঁয়া আর কালি ছুড়ে দিল আমার দিকে। তারপরে বার দুই খাবি খেয়ে একেবারে ঘুরঘুট্টে অন্ধকার! ঝম্‌ঝম্ করে তখুনি বৃষ্টি নাম্‌ল। ঝড়ের শব্দে, শেয়ালের ডাকে, ব্যাঙের উল্লাসে

আলো নিভল, বৃষ্টি নাম্‌ল—তারপর? বেঁচে আছি

আর বিদ্যুতের চমকে সমস্ত ইন্দ্রিয় অসাড় হয়ে এল যেন। এক কথায়, আমার প্রাণপাখী 'ছাড়িল জীবন-আশা তরুণ যৌবনে।'......কখন ঘুমিয়ে প'ড়লাম কে জানে?...পরের দিন বলহরির ধাক্কায় যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা ৮টা এবং আমি বেঁচেই আছি' কিন্তু আমার ব্যাগটি অদৃশ্য।

ফেরিওয়ালার আত্মকথা

তখন সকাল হয়নি। সূর্য ওঠে নি। পুবের আকাশে লাল রঙ দেখা দিয়েছে সবে। ঘুমে-জড়ানো চোখ দুটো টেনে খুলে ফেলি। কাল রাতে বোধ হয় এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, গায়ের কাঁথাটা এখনও ভেজাভেজা। চোখে একটুখানি জল ছিটিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের ভাঙা-বেড়ার চারদিকে একবার ঘুর্ ঘুর্ করি। নাঃ, কোন আশা নেই। মা ওঠে নি এখনও, উঠ্‌লেও যে এমন কিছু আশা ছিল তা বলা চলে না। তবু একবার কেশে উঠি. কোন দিকের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। থলে দুটি কাঁধে নিয়ে তখন বেরিয়ে পড়ি বাড়ি থেকে। এখন সকাল হয়েছে বলা যায়।

ঘুম ভাঙে

বস্তীর কাঁচা রাস্তাটা পেরিয়ে চলি। থলের ফিতের সংগে সেফ্‌টি পিন দিয়ে ঝুলিয়ে দিই একের পর এক—বাঁশী, পুতুল, চুড়ি, ফিতে, ছুরি, আরও এমনি অনেক-কিছু। বস্তীর ঘুম তখন ভাঙোভাঙো। কলতলায় ভিড় জমেছে অনেক, ঝগড়া চ'লছে ওঘরের হিন্দুস্থানী মজুরটার সংগে রামের মা বুড়ির। কোথায় দু'চারজন ধর্মঘটের সম্ভাবনার কথা ব'লছে ফিস্‌ফিস ক'রে। একপাল ছাগল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রামধনিয়া। দাওয়ায় বসে একটা দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজছিল রাজু, হঠাৎ কাজ থামিয়ে বলল, "আরে ছাগ্‌লার মা, তোর রাম-লক্ষ্মণ তো বেশ নধরপানা হয়েছে রে!" 'ছাগ্‌লার মা' বলায় আপত্তি করে না রামধনিয়া; তবু খিঁচিয়ে ওঠে, "তোর চোখে পোকা পড়ুক রে লোভী বুড়ো!" রাম-লক্ষ্মণ দুটোর দিকে একবার সভয়ে-সস্নেহে তাকিয়ে সে এগিয়ে চলে। রাজু হো হো করে একচোট হেসে নেয়। আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই আবার বলে, "এই যে ছেলের মুখে হাসি আমার ভাঙা বাঁশী! হাঁক ছাড়ো ভাই, অমনি কি আর বিক্রী হয় ওসব ভাঙা জিনিস?" সকাল বেলাই এসব খারাপ কথায় মেজাজ যায় বিগ্‌ড়ে। তবু পেছু হটি না, ঠাট্টা করেই ব'লি, "আরে যা যা, এই ভাঙা জিনিস কিন্‌বার কি মুরোদ আছে তোর? হাঁক্‌ব কেন, দাম উঠবে, অমনি চেঁচায় না নীলু নাগ, তার হাঁকার দাম দিতে পারবি তুই?" রাজু আবার হো হো করে হেসে ওঠে।

বস্তীর পথে

বড় রাস্তায় গিয়ে প'ড়লাম। এখানে কিন্তু ভিড় জমেছে কোথাও কোথাও। এতক্ষণে

হাঁক ছাড়বার সময় হোল আমার,—বাঁশী কিনুন বাঁশী, ছেলের মুখে হাসি। কিগো খুকুমণি পুতুল কিনবে, পুতুল? আমার পুতুল শাড়ি পরে কথা বলে না, আমার পুতুল ঘুরে ঘুরে নাচে ঝমঝমা।" হাত ঘুরিয়ে পুতুলটাকে নাচাতে থাকি। ঝমঝম্ বাজনা বাজে। খুকুমণির দৃষ্টি লুব্ধ হয়ে ওঠে। বাবা ওকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। "না গো খুকু, তোমায় আমি ভালো পুতুল কিনে দেব, পচা পুতুল নেয় না।" আমি বাবুর কাছ দিয়ে বলি—"না বাবু, একেবারে জ্যান্ত পুতুল, পচা নয়। মাটিতে ফেলে দিন ভাঙবে না, আকাশে ছুঁড়ে দিন উড়বে না…"।

বড় রাস্তায় ফেরি শুরু

আমার দিন শুরু হয়। ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম গাড়ি চলে যায়। জুতো-বুরুশ ছোকরাদের চীৎকার তেমাথার মোড়কে আঁৎকে দেয় মাঝে মাঝে। পাশের রেঁস্তোরা থেকে সদ্যভাজা কাটলেটের গন্ধ নাকে এসে লাগে। আকাশের সূর্য আরও উঁচু হয়। খিদে বেড়ে চলে—বেড়েই চলে…

পেটে শুধু খিদে

এক দল ছেলে বইহাতে কলরব করতে করতে গেল চলে। আমারই বয়সী হবে। উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলাম। আর কত দীর্ঘশ্বাস ফেলব? দীর্ঘশ্বাসে তো পথটি খোলা হবে না। আমার কাছে ও-জীবনের পথ বন্ধ, চিরদিনের জন্যেই বন্ধ। সেই গাঁয়ের ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলের বেঞ্চিগুলোর কথা মনে পড়ে একবার। জানলার খোলা পথে সামনের ইস্কুলের দোতলা চোখে পড়ে। আমি আজ আর ওদের কেউ নই। কত ইঁদুর পালিয়েছি, কত বই ছিঁড়ে নতুন বই-এর বায়না ধরেছি! নিজের হাতটাকেই যেন কামড়াতে ইচ্ছে করে আজ।—

আমি কি ওদের নই?

"ফেরিওলা, এই বাঁশী"—কার ডাকে চমক ভাঙে। বাসের দিকে যাই ছুটে। "কত? দু'পয়সা?—" "হবে না মা হবে না, চার চার পয়সা বাঁশী, বাঁশী কিনুন বাঁশী, খোকার মুখে হাসি, হাসে খোকার মাসী!—…"

সকালবেলাটা ভালো কাটে না। দুপুরে পাড়ায় বেরিয়ে পড়ি। জোর চীৎকারে মেয়েদের ঘুম ভাঙাই। "চুড়ি নেবে মা, চুড়ি? খুকুমণির বাঁশী, জলে দেবার কর্পূর, কাপড়ে দেবার নীল, আর শাড়িপরা পুতুলদিদি নাচে ঝমঝমা।" কিছু কিছু বিক্রী হয়। মেয়েদের ঠকানো কিন্তু একেবারে যায় না। বাড়িয়ে দাম চাই, চার আনা হলে দু'পয়সা থেকে শুরু করে যে। তবে মিথ্যে ব'লব না, অচল সিকি দোয়ানী, ফুটো ঝুমঝুমি আর গন্ধ-উবে-যাওয়া কর্পূর, রঙ-জ্বলে-যাওয়া নীল—কিছু কিছু বিক্রী হয় বৈকি! পুতুল আর বাঁশী বিকেলে বটে বিক্রী এখানে হবেই। খোকাবাবু আর খুকুমণিদের কাঁদিয়ে দিতে পারলেই হোল! মায়ের কাছে আব্দার! গাঁয়ে থাকতে একমুঠো ভাত বেশি খেলে একটা পয়সা মিলেছে অনেক দিন, এখন মা আমার সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে না, জানি

সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা

জেগে থাকে, কান খাড়া করে থাকে কখন বেরিয়ে পড়ি, নিঃশব্দে চোখের জলে ভিজে যায় মুখ। কিন্তু শূন্য থালা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ানো যায় না! বিকেল বেলাটা আমার বিক্রী জমে ভালো। অফিস-ফিরতি বাবু একজোড়া চুড়ি কিনে নেয়, কল-ফিরতি মজুর একটা ছুরি, ইস্কুল-ফিরতি ছেলে একটা পেন্সিল কেনে কখনও। ক'লকাতা সহর আলোয় করে ঝলমল, সিনেমাহলে ছবিগুলোর নাচ হয় শুরু। সারা দিনের আয় হিসেব করে লাভের অংকে পাই মোট এক টাকা দু' আনা।

এমনি করে কাটে আমার দিন। সকাল-সন্ধ্যেয় আমার সারা সময় কাজে কাজে ঠাসবুনট। সকলের মুখে হাসি আনবে আমার চার পয়সার বাঁশী। বাঁশী নয়,—হাসি

আমি হাসি ফেরি করি

আমি ফেরি করি। কিন্তু আমার নিজের ঘর যে কান্নায়-ব্যাথায় অন্ধকার। আমি বোধ হয় ওই বাতিওয়ালারই মত যে রাস্তার মোড়ে জ্বালিয়ে যায় বাতি, কিন্তু ঘরে তার এক ফোটা তেল নেই.. ঘর যেন নীরন্ধ্র অন্ধকার।

ভোরের প্রথম-ট্রামে ও রাতের শেষ-বাসে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

ব্যাপারটা আকস্মিক সন্দেহ নেই...

ভোরের প্রথম ট্রাম যখন ঘুমে-জড়ানো এক চোখে আলো জ্বালিয়ে টুংটাং করে ছোটে, তখনও আমার মাঝরাতের স্বপ্ন ভাঙে না। 'ভোরে উঠি' এই অপবাদ অতি বড় বন্ধুও আমায় দিতে পারবে না। আবার রাতের শেষ বাসে বাড়ি ফেরার অভিজ্ঞতাও আমার জীবনে পূর্বে একটিবারও আসেনি

ঘুম ভাঙে

অত রাত অবধি চোখের পাতা খোলা রাখতে পারলে পরীক্ষাগুলো 'পাশ' করবার জন্য আর ভাবতে হ'ত না। তাই একই দিনে রাতে 'প্রথম ট্রাম' ও 'শেষ বাস' মিলেমিশে এমন একটা গোলমেলে ছবি গ'ড়ে তুলল আমার চেতনাকে ছেনে ছেনে যে, ভুলেও তাকে ভোলা যায় নি। সত্যিই ব্যাপারটি আকস্মিক।

ক'লকাতার বাইরে বেশ কয়েক মাইল দূরে যেতে হবে একটু সাংসারিক প্রয়োজনে। ট্রেন ধরবার গরজে ভোরেই উঠতে হল, ঠেলে উঠিয়ে দেওয়া হল বলাই বরং সংগত বদ-মেজাজে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই,—দু'-একটি লোকের

তখনও হয় নি ভোর

অস্পষ্ট আনাগোনা চ'লছে, শেষ রাউণ্ডের পুলিশ ফিরছে থানায়—বুটের পেরেকে আর শানে-বাঁধা ফুটপাথে শব্দ উঠছে কট্ কট্ কট্ কট্....

দূর থেকে একচোখ-বোজা ট্রামটা ঢুলতে ঢুলতে এল। ওরও ঘুম ভাঙে নি এখনও। ওকেও ঠিক আমারই মত কে ঠেলে তুলে পাঠিয়েছে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে। আহা বেচারা! বালিগঞ্জের ঘাসের রাস্তা দিয়ে চ'লছে ট্রাম। বাইরের

আলোগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন দূর আকাশের শেষ তারাটিকে। টুং-টাং করে বাজে ঘণ্টা, টিকিট চায় কণ্ডাক্টর। ঘুমন্ত ক'লকাতার ভোরের তন্দ্রার আরাম যেন লেপ্টে আছে ঐ সবুজ ঘাসে, লোহার জালে-ঘেরা চাবাগাছগুলোয়, সদ্য যে-পাখিটা ডেকে উঠেই থেমে গেল তার অস্ফুট কাকলীতে।

ভোরের ক'লকাতার ছবি

ধীরে ধীরে ভাঙে ঘুম। একটি-দু'টি করে অনেকগুলো সীট'ই ভরে যায় ট্রামের। রাজধানী ক'লকাতার ঘুম ভাঙে—ভাঙে—ভাঙে না। সুপ্তি ও জাগরণের সীমান্তে শুয়ে পায়ের কাছ থেকে মোটা চাদরটা শেষবারের মত টেনে নেবার চেষ্টা করে সে। আকাশের শুকতারা হাসে ফিকে হাসি। একটি-দু'টি রস্নার শব্দ। ঠেলা গাড়ীটা টেনে বের করে' 'রামা-হো' বলে চেঁচিয়ে গান ধরে এক বেহারী মজুর। এক পাল ছাগল পেরিয়ে যায় চওড়া চক্‌চকে পথটা। সাইকেলে দুধের ক্যান ঝুলিয়ে যায় গয়লা, কেউ-বা রাস্তায় হোস পাইপে ছড়ায় জল, ফেরিওয়ালা হাঁকে খবরের কাগজ। ক'লকাতার ঘুম ভাঙে—ভাঙে ঘুম.....

ভোরের পাখি যখন নারকেল গাছের উঁচু কোটর থেকে ডানার ঝাপটায় ফিকে অন্ধকার সরিয়ে সরিয়ে কোন্ অসীমে যায় উড়ে, আর সন্ধ্যেয় যখন সে নীড়ে ফেরে শান্তির হিমে পালকগুলো ভারী ক'রে—সে তো একই পাখি, কিন্তু কতই-না তফাৎ! ভোরে যার যাত্রা সুরু কোন্ সে আদর্শলোকের সন্ধানে আর সন্ধ্যেয় তার যাত্রাশেষ আশাভংগের দীর্ঘশ্বাস বহন করে'!—একের সামনে ভবিষ্যতের পাতাগুলো কেবলই আপনাকে মেলে ধরতে চাইছে, আর অন্যের পেছনে পাশ-করা ছাত্রের মুখস্থ নোটের মতই তা পরিত্যক্ত। গভীর রাতে শেষ বাসে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম এই কথাই।

জীবনবাণী

কণ্ডাক্টর হাঁকে,—'লাস্ট বাস, কালীঘাট, ভবানীপুর। লাস্ট বাস্—একদম খালি, চড়ে বাবু, লাস্ট বাস!' বারে বারে থেমে যাত্রীসংগ্রহের চেষ্টা করে সে। গড়ের মাঠের পাশে আলোর সার নাচে হেসে হেসে। ফুটপাথে নেই কোন লোক। 'কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেট'গুলো বন্ধ হয়েছে দোকানপসারের। শেষ-'শো'-ভাঙা কিছু দর্শক মেট্রোর সামনে অপেক্ষা করছে দক্ষিণগামী এই শেষ বাসের আশায়।

বাস চলে

পুলিশের গাড়ীর তীব্র হর্ণ আর উজ্জ্বল আলো বল্লমের ধারালো ফলার মত বেঁধে আলো-ছায়া-ঘেরা চৌরংগীকে। গ্রাণ্ড হোটেলের নীচে ফুটপাথে শুয়ে ঘুমোয় 'জুতো পালিশ' ছোকরা আর এক-পা ভিখিরিটা। মোড়ে মোড়ে পানের দোকানের সামনে জটলা চলে তখনও। কেমন নিঃসংগ ভূতের মত মনে হয় আমাদের বাস্‌টাকে—

যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটে চ'লছে সে কোন্ এক অন্ধকারের দিক। গাছের সারি যায় সরে সরে, দোতালার জানলা বন্ধ হয় একে একে, কোথায় কোন্ বেহালায় বাজে একটা করুণ সুর, আকাশের চাঁদটা তেরছা আলো ফেলে বাসের জানলায়। লোকগুলো ঝিমোয়, কিন্তু জাগ্‌বার আগের আরামে আর আমেজে নয়, ঘুমোবার আগের ক্লান্তিকে আর হতাশায়। কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে কারা 'হরিবোল' ব'লে নিয়ে যায় শব;

গভীর রাতের ক'লকাতার ছবি

কণ্ডাক্টার হাঁকে—'লাস্ট্ বাস, বালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ।'

দৈনিক রেলযাত্রীর রোজ্‌নাম্‌চা

—একটু সরে সরে দাদা, আরও একজনের জায়গা হবে।

আরও সংকুচিত হই। বেঞ্চি যায় ভরে। দেওয়ালের এক কোণে লেখা, "মাত্র ৪৮ জন বসিবেক" চোখে জ্বালা ধরায়, মুছে দিতে ইচ্ছে করে ওই মিথ্যেটা। চাপে যে বস্তু কতটা সংকুচিত হতে পারে সে খবর বৈজ্ঞানিকের চাইতে অনেক ভাল জানেন একজন দৈনিক রেলযাত্রী। দুটো বেঞ্চির মাঝখানকার এক চিল্‌তে ফাঁকাটুকুও ভরে ওঠে কয়েক মিনিটেই। তারপরে কড়াইয়ের গরম জলের মত দু'পাশের দরজা দিয়ে মানুষ উপ্‌চে উপ্‌চে পড়ে, হ্যাণ্ডেল ধরে' বাদুড়-ঝোলা হয়ে ষোলো মাইল পথ যাবার জন্যে হয় তৈরী।

ট্রেনে ভিড় বাড়ে

আপত্তি করি না আর, এমন কি কোনও ব্যাংগাত্মক মন্তব্যও নয়,—ছাত্রসুলভ চপলতাকে অন্তত এই একটা ব্যাপারে কি করে যে পরিহার করলাম, ভাবতে সত্যি অবাক লাগে! ডেলি প্যাসেঞ্জারী বয়সের পার্থক্য দেয় ঘুচিয়ে,—ছাত্র কেরাণী আর দোকানদার, গন্ধ আর তরকারীর ঝুড়ে হয়ে যায় একাকার।

শ্রেণীহীন সমাজ

আপনারা যারা ক'লকাতার বদ্ধ ঘরে থেকে এক টুকরো নীল আকাশের স্বপ্ন দেখেন, আমার দৈনন্দিন ষোলো মাইল ভ্রমণকে তাঁরা ঈর্ষা করতে পারেন। কিন্তু গোপনে একটা কথা বলে রাখি, তিলে তিলে আয়ু ক্ষ'য়ে এই ভিড়ে যখন চলাফেরা করি,—একদিন দু'দিন নয়—প্রত্যহ সকালে-সন্ধ্যেয় আর যখন সকাল ন'টায় আধ-খাওয়া থালাটা সরিয়ে ছুটি ষ্টেশনে আর সন্ধ্যে পাঁচটায় যখন হ্যাণ্ডেল (হ্যাঁ, মরণের শীর্ণবাহুই বটে ধরে' ষোলো মাইল পথ ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে বাড়ি ফিরি, তখন একটা বর্বর প্রেরণায় ওই লোহার লাইনটাকে দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে।

শ্রমসাধ্য দৈনন্দিন জীবন

তবু বসবার জায়গা পেয়েছি। অমনি কোন বর্বর প্রেরণার তাণ্ডব জাগোনি মনে। জানলা ঘেঁষে বাইরের পানে আছি তাকিয়ে। পাঁচ মিনিট অন্তর থামছে গাড়ী, লোকের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে চোখ। গাড়ী চলে টেনে টেনে দীর্ঘ শীষ দিয়ে, মাঝে মাঝে বিকট শব্দও করে ওঠে চাকা আর লাইনের রেষারেষি।

গাড়ী ছাড়ে

ফেরিওয়ালা চেঁচায়, হাঁসের চাল যা'রা লুকিয়ে নিয়ে যেতে পাদের উপর হামলা করে পুলিশ একটা ছেঁড়া বেহালার সুর আসে ভেসে---কিন্তু কিছু মিল নেই....নেই কোন তাল....কোন ছন্দ....

সন্ধ্যা হয়ে এল। পাখিরা ফিরে এল নীড়ে। আকাশে লালরঙে আবার মনে পড়ল কোন-এক-জানা কথা। গাড়ী-ঠাসা লোক, তাদের ঘর-ফিরতি ক্লান্ত চেহারা, উত্তেজনাহীন কণ্ঠে তেলের দাম আর চালের কাকড় নিয়ে আলোচনা করে, আপনার সামান্য সওদার দর যাচাই করতে গিয়ে কখনও-বা তীব্র হয়ে ওঠে তাদের কণ্ঠস্বর। দূরে দূরে

জানলার বাইরে সাঁঝের মায়া

যার ঘরে রঙিন জ্বলে ওঠে পিদিম, কোথাও-বা কেরোসিন-লম্প দু'একটা। ধান-কাটা মাঠে একটা হাঁ-হাঁ-করা হাওয়া ঘুরে ঘুরে জমিদারের গোলাঘরের দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে। একটা ছেলে হাঁকে—'গরম ভাজা চানাচুর, দু'পয়সা, চার পয়সা।' জানলা দিয়ে চেয়ে থাকি বাইরে। গাছের ঝাপসা মাথায় জোনাকী মিটিমিটি করে। আধখানা চাঁদের আলো লণ্ঠন থেকে একটু মিছে আগে প'ড়ে ডোবার জলটুকু গলানো রূপোর পাতার মতো চিকিমিকি করে।

কামরার এককোণে জন চারেক কমবয়সী লোক তাসখেলা নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া জুড়ে। বেসুরো গলায় কীর্তন গায় একটা লোক। এক একটা স্টেশনের ধোঁয়াটে আলো কেরোসিনের বাতিগুলো নেচে নেচে আসে এগিয়ে। হঠাৎ একটা আওয়াজ বিচ্ছিন্ন ঘটনার টুকরো ছাপিয়ে যেন আমার কানের কাছাকাছি এসে পড়ে, বুঝিবা প্রাণের কাছাকাছিই। সস্তায় দাঁতের মাজন

কামরার মধ্যে

বিক্রী ক'রতে ক'রতে আমারই বয়সী একটি ছেলে বলে,—"মাত্র এক বছর আগেও আমি ছাত্র ছিলাম।" হয়তো আরও হাজারো সংসারের মত তারও সংসার ভেঙে যাবার কথাই সে বলেছে, বলেছে বিজ্ঞানী বা শিল্পী হবার বাসনা ছেড়ে দিয়ে ফেরিওয়ালার ব্রত গ্রহণ করার কথা। সে সব কথা গেছে হারিয়ে কিন্তু হারায়নি ঐ শব্দ ক'টি—'আমি ছাত্র ছিলাম।' সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে ঐ মাঠে মাঠে, দূর গ্রামে গ্রামান্তরে; আকাশের তারায় তারায়। বেদনার, ধিক্কারের, অভিশাপের সেই শব্দ!

ঘুমের ঘোরে সেই রাত্রে আমার ভবিষ্যতের ছবি দেখে আঁৎকে কেঁদে উঠি কেন ...

শিয়ালদা ষ্টেশনের আত্মকথা

চন্দ্রগ্রহণ দেখেছো? রাহুর জন্যে বেদনা বোধ করনি কোনদিন? কি জানি কেন, আমার চূড়ায় যে বড ঘড়িটা বহুদূর থেকেও দেখা যায়, তার উপর থেকে যখনই গ্রহণ দেখেছি, রাহুর মতই এক শব্দগর্ভ হাহাকারে কেঁদে উঠেছে বুকের ভিতরটা। কেবলই মনে হয়েছে, সৌন্দর্য ও আনন্দের অমৃতখনিকে বারংবার জীবনে ও পেতে চেয়েছে, কিন্তু কাছে পেয়েও তাকে পাওয়া যায়নি আলিংগনে ধরলেও সে বেরিয়ে গেছে শথ হাতের ফাঁক দিয়ে:

জীবনবাণী

"কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।'—রবীন্দ্রনাথ।

আমি যেন চন্দ্রগ্রহণে আমার নিজের জীবনের রূপকই দেখতে পাই।

* * * *

গোড়াতেই যদি বলে বসি, আমার এই চত্বর আর তার আশেপাশে চারিদিকে ছিল শুধু বড বড সুগভীর পুকুর, তাহলে ভাবতে কেমন লাগে, বল তো? কিন্তু সত্যিই তাই। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন—এমনি পরিশ্রম করে জল সরাতে হয়েছে—আর সেই নির্জলা পুকুরগুলো ইট, মাটি, খোয়ায় উঠেছে ভরে'। বিশালকায় আমার এই ভবনটি গ'ড়ে তুলতে যে পরিমাণ ইট লেগেছে, তার চেয়ে বেশী ইট মাটির নীচে রয়েছে পোতা। না, ভরাট জমি পথের 'লেভেলে' তুলে এনে আমাকে এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার কি দুঃসাধ্য প্রয়াসই-না সেদিন দেখা দিয়েছিল। ইতালীর প্রাচ্য ভাস্কর্যেই আমার ভবনটি নির্মিত। দেশীয় মজুরনীদের কণ্ঠে যে ছাত-পিটানো গান সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল আজও আমি অন্তঃকর্ণে শুনতে পাই সে স্বর-মূর্ছনা।

গোড়ার কথা

শানে-বাঁধানো উত্তর, দক্ষিণ ও '.মন' প্লাটফর্মে আর চারপাশের বিরাট চত্বরে আমার ব্যাপ্তি। সার্কুলার রোডটা আমায় সেলাম ক'রে ক'রে যায় সোজা বৌবাজার ষ্ট্রীট আর হ্যারিসন রোড তো আমার জঠরে জনস্রোত ঢালবার জন্যেই তৈয়ের হয়েছিল। আমার শক্তিতে, আমার মহিমায় . হয়েই তো থাকি, আফিমখোরের ন্যায় রোদে ঝিমুই, বসে ভিজে আধখোলা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আমার পশ্চিমমুখো দরজার পা:

শিয়ালদার চেহারা

পাশে ছ্যাকরাগাড়ীর ঘোড়াগুলো পা ঠুকে ঠুকে হাঁপায় হাপরের মতো। মাঝে মাঝে ভেঙে যায় সুপ্তি, ভেঙে যায় অর্ধচেতনার আমেজ—ইতিহাসের একটি চঞ্চল মুহূর্ত আমাকে অস্থির করে' তোলে, জীবনের একটি মধুর লগ্ন আমার চেতনাকে করে আলোড়িত। সেই মুহূর্তগুলোর ইতিহাস আমি বহন করে নিয়ে চলি যুগে যুগান্তরে—বছরে বছরে।

মনে পড়ে, প্রথম যেদিন আমার ঐ অক্টোপাশ লৌহবাহুগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—সুন্দরবনের কোলে আর ধানক্ষেতের আশেপাশে। সেদিন রেলের লাইনে লাইনে খবর এসেছিল ধ্বংসের, শোষণের আর সর্বনাশের। আমার এই বাহুতে বাহুতে এগিয়ে গিয়েছিল ইংরেজ শাসকের শোষণ—ভেঙে দিয়েছিল এদেশে হাজারো বছরের পুরোণো গ্রাম্যজীবন, হাহাকার উঠেছিল চাষীর ঘরে ঘরে। নির্জীব আমি বাধা দিতে পারি নি সেই রক্তের ঘামের আর চোখের জলের ধারা। তবু পুরোণোর জায়গায় নোতুনকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে আমারই এ লৌহবাহু। ভাঙার উপরে ভিত্ তুলেছে নোতুন গড়নের, নোতুন যন্ত্রসভ্যতার পত্তন করেছে সে এই দেশে। হায়, একথা যদি চেঁচিয়ে ব'লতে পারতুম—"শিয়ালদা কেবল একটি প্লাটফর্ম নয়, শানে-বাঁধানো চত্বরও নয়, শিয়ালদা নোতুনের আহ্বান, যন্ত্রগংগার ভগীরথ।"

রেল লাইন ভাঙনের দূত আবার নোতুনেরও ভিত্

*   *   *   *

কত মৃত্যুই তো মনে পড়ে, কিন্তু দু'টি মৃত্যুর বিদীর্ণ বেদনা ভুলব না আমি—গাঁথা হয়ে গেছে তা আমার প্রস্তরময় অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দেশবন্ধুর মৃতদেহ একদিন নামানো হয়েছিল আমারই চত্বরে ট্রেন থেকে। সারা ক'লকাতার আত্মার কান্না সেদিন শুনেছিলুম—শুনেছিলুম সারা বাংলার আত্মার কান্না। মৃত্যুর দেবতা সেদিন নত হয়েছিল মৃতের পায়ের নীচে। এ ঐশ্বর্য আর কোনদিন স্পর্শ করে নি আমার চেতনাকে। আর একদিন দেখেছিলুম এই মৃত্যুরই করুণ রূপ ভ্রাতৃঘাতী দাংগায়। নিরপরাধ খবর-কাগজওয়ালা ছেলেটার কাটা ধড়টা যেদিন নিঃশব্দে এই চত্বরে রক্তের জোয়ারে ছট্‌ফট্ করে নিথর হয়ে গেল, সেদিনের স্মৃতিও ভুলব না আমি। আমার অস্তিত্বের সংগে এ কলংক অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে রইল বোধ হয় চিরদিনেরই জন্যে। জানি না, আমার এ কলংকের ক্ষালন হবে কবে? ..কবে হবে?...

মৃত্যুর বেদনা

আমি সাক্ষী মহাকালের। দেখ্‌ছি আমার বুকে কত উৎসবের মাতামাতি কত বেদনার বিদীর্ণ হাহাকার। সেদিন নববধূটিকে দেখলুম, সিঁথেয় সিঁদুর-রাগে

কল্যাণের চূড়া, গলায় রজনীগন্ধার মালায় সৌন্দর্যের বিজয়কেতন। হায়, আমার এই পাথর-চাপা বুকে যদি ফুল ফুটত গো! ধরতে চাই, কিন্তু রাখতে পারিনে। সৌন্দর্যের আর আনন্দের যে-ঢেউ এসে লাগে আমার তটপ্রান্তে, তা উপ্‌চে বেরিয়ে যায় ঐ লোহা-বাঁধানো বাষ্প-চলা গাড়ীতে! ঐ আকাশের রাহুর মতোই যাকে চাই তাকে পাই না, যাকে পাই তাকে রাখতে পারি না চিরন্তন আলিংগনে।

উৎসবের আনন্দ

এই তো সেদিন তে-রঙা ঝাণ্ডা উড়িয়ে মালায়-তোড়ায়-গন্ধে আলোয় আমায় তোমরা সাজালে। উৎসবে মাতলে আমারই বুকের উপরে—স্বাধীন হয়েছে দেশ। তারপরে কিন্তু এ কী নিদারুণ অভিজ্ঞতা হ'ল আমার! মানুষে মানুষে ভেদে গেল আমার চত্বর। মানবিকতার সুসম্পূর্ণ অপমৃত্যু দেখেছে এই ছিন্নমূল যাত্রীপরিবেশ। সমাজ হারানো সংসার হারানো এই মানুষের দল প্রাণ বাঁচাতে, মান বাঁচাতে দিশেহারা হয়ে ছুটে এল আমার আশ্রয়ে! আমার এই মহাভবন অবধি এসেই যেন ওদের যাত্রা হ'ল শেষ! দু'হাত তিন হাত মাত্র জায়গা দখল ক'রল এক একটি পরিবার—পাশেই রইল নিজের নিজের বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি, পোঁটলা-পুঁটলি। ঐটুকু জায়গার মধ্যে চ'লল ওদের আহার-নিদ্রা, ঘরকন্না সব-কিছুই। ঐ স্বল্পতম জায়গা নিয়েই আবার অহর্নিশ অর্ধনগ্ন পুরুষদের মধ্যে লেগে রইল অবিরাম ঝগড়া-বিবাদ হাতাহাতি আর তারই সংগে মিশে গেল অপর্যাপ্তবসনা নারীদের কলকণ্ঠ। ওরই মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি ক'রত প্রকৃত স্বেচ্ছাসেবকের দল আর স্বেচ্ছাসেবকদের মুখোস-পরা নরপশুরাও। কিন্তু সব চেয়ে বেশী আমার মনে জাগে উদ্বাস্তুদের সেই হিমশীতল চাউনি। মানুষের অমন নিষ্পলক, নিরাসক্ত, নিস্পৃহ চাউনি আমি জীবনে দেখিনি কখনো! মনে হলেই একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি যেন শির শির করে আমার গা বেয়ে নামতে থাকে। সত্যিই আমি বাঁচাতে পারি নি তাদের! আমার শেড্‌গুলো দু'পাশে টেনে নিয়ে বর্ষায় পারি নি তাদের রক্ষে করতে, শীতে পারিনি তাদের উত্তাপ দিতে! হায় ঘরছাড়া এই মানুষের দল! কোথায় আজ ভিক্ষেয়-চুরিতে দেহটাকে বাঁচাতে চাইছো?...কোথায় সেই ট্যারা যুবক, সেই তোত্‌লা বুড়ো, সেই আকাশের তারার মত বাচ্চাটা?....ঘাড় উঁচু করে জানতে চাই—কোথায় তারা?.. কোথায় তারা?....কোথায়?....

বাস্তুহারার মর্মব্যথা

পারি না। আমি যে লোহা টিন কাঠ আর পাথর—আমি যে বাঁধা! ভগবান! মুক্তি দাও আমাকে এ বন্ধন থেকে....মুক্তি দাও....মুক্তি দাও।

বর্ষার ক'লকাতা

সকাল থেকেই মেঘ করে আছে। ছেঁড়া ছেঁড়া নয়, কালো পালিশ-করা থমথমে আকাশ ভেঙে-পড়ার আগের মুহূর্তের স্তব্ধতা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ধ্যান ক'রছে কোন্ নটরাজের। গুম্ গুম্ গুড়্ গুড় আওয়াজ থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে। যেন তারই প্রত্যাশিত পদধ্বনি,—সে যে আসে আসে আসে!

বৃষ্টি আসে

বেলা দশটা নাগাদ সে সত্যি এসে গেল। টিপ্ টিপ্ ফোঁটা ফোঁটা নয়, জলের তোড়ে পাগলা নদীর চাঞ্চল্য এল পথে-ঘাটে-আকাশে।—ভেসে গেল শালপাতার ছেঁড়া টুকরো, একটা কোণা-ভাঙা দইয়ের খুরি হেলে-দুলে চলতে লাগল। রাস্তার নালা ছাপিয়ে ফুটপাথের কিনারা স্পর্শ ক'রল ঘোলা জলের ধারা।

রিক্সার টুং-টাং শোনা যায় না আর। একটা কাক কিন্তু ভিজে ভিজে কেবলই ডেকে চলে। বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম ঝম্‌ঝম্। রাস্তায় বাড়ে জল। হাইড্রেনের খোলা মুখ দিয়ে বড় বড় করে রাস্তার জল নীচে নর্দমায় গলে পড়ে।

ক'লকাতার কান্না

কিন্তু আকাশের কান্নার সংগে কে দেবে পাল্লা? সহর জুড়ে উঁচু উঁচু বাড়ির ছাদগুলোকে ঢেকে দিয়ে চোখের জলে ক'লকাতাকে ডুবিয়ে দেবে আজ নিখিল বিশ্বের কোন্ সে বিরহিণী।

ইট-কাঠের মোটা মলাটে বাঁধা শহর আমাদের এই ক'লকাতা। মোটা, কিন্তু পরীক্ষার্থী ছাত্রের মত 'ইম্পর্ট্যান্ট' বেছে পড়া যায় সহজেই। হাজারো নোংরা গলিঘুঁজি আর বস্তীর সার ঘেঁটে কে আর হাত নোংরা করে।

ইটকাঠের ক'লকাতা

মনুমেন্ট থেকে চিড়িয়াখানা, হাওড়ার ব্রীজ থেকে খিদিরপুরের ডক, বালিগঞ্জের লেক আর চৌরঙ্গীর মিউজিয়াম! ব্যস্, এক নজরে এই তো ক'লকাতা প্রাসাদনগরী ক'লকাতা, রাজধানী ক'লকাতা। এর মোটা মলাট ভেদ করে ঋতুর উৎসবানন্দ প্রবেশ করে না এখানে। সভ্যতার কড়া পাহারা অনিদ্র—বসে আছে দোর-গোড়ায়।

কেবল গ্রীষ্মে এর রাস্তাগুলোয় জলের হাহাকার জাগে। ব্যস্, ঐ পর্যন্ত! শরৎ এলে আকাশের সাদা মেঘের হালকা টুকরোয় তার পরিচয় লেখা পড়ে, কিন্তু ক'লকাতার প্রাসাদপুরীতে সে খবর পৌঁছায় না। পূজোর আনন্দে মাইকগুলো যতই প্রাণ-ফাটা চীৎকারে আপনাকে প্রচার করে, শরতের মৃদু হাসির ছুটির আমেজ ততই যায় হারিয়ে।

ক'লকাতার ঋতুর প্রাণস্পন্দন নেই

শীতের দিনে অবশ্য রঙ-বেরঙের চাদরে রাস্তা আর মুলো-কপিতে বাজার যায় ভরে, কিন্তু "পোষালী বাতাসে হিমে বাসে ভেসে আসা" পাকা ধানের সোঁদা গন্ধ কই। খেজুররসের হাঁকাহাঁকিতে ক'লকাতার শীত আপনাকে

জানায় না একটি বারও। এমন কি, বসন্তের যৌবনের অহংকারে পলাশের বনে বনে যে-আগুন পড়ে ছড়িয়ে, মনে মনে যে-গান জাগে নোতুন প্রাণের রাগে, ক'লকাতা তার পায় না খবর। হায়-রে, প্রাসাদ-পুরী ক'লকাতা।

ক'লকাতার সারা দেহে আর মনে যদি কোন ঋতু থাকে তো সে আজকের এই বর্ষা। সব সরিয়ে, সব ভরিয়ে, সব ভাসিয়ে নেবার ঋতু এই বর্ষা! বর্ষা তার আসার খবর পাঠায় না, দুষ্টু মেয়ের মত দূর থেকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় না পালিয়ে, একটা ভীষণ বুড়ো সন্ন্যাসীর মতো বৈশাখের তাতানো মাটিতে ফুঁয়ে ফুঁয়ে ছড়ায় না আগুন। বর্ষা প্রচণ্ড নাড়া দেয় সারা সহরের অস্তিত্ব ধরে, মন্থর মনের ভিতও বুঝি যায় টলে --

বর্ষায় ক'লকাতার ছবি

"ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরখন্তিয়া।" —বিদ্যাপতি।

আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের সিটি কলেজ একটা দ্বীপের মতো ভাসতে থাকে। ঠনঠনের সামনে কোমর-জলে সাঁতার কেটে কেটে বেরিয়ে যায় দোতালা বাসগুলো। কালিঘাটে রসা রোডের মোড়ে ছোট্ট বেবী গাড়ীগুলো ছলছল চোখে জল থামার অপেক্ষা করে, একটা ফিডে ভিজতে ভিজতে ইলেকট্রিক তারের উপর দোল খেয়ে উড়ে পালায়। কালীধন ইস্কুলের ছেলের দল 'রেনি ডে'তে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফেরে। এক-হাঁটু, কোথাও-বা কোমর-জলে তাদের হুল্লোড় নিয়ে বাংলার গ্রাম থেকে খানিকটা সজল শ্যামলিমা ক'লকাতার ইট-কাঠের উপর নিয়ে আসে যেন!

এমনি ঘন বর্ষায়, এমনি মেঘের গর্জনে, এমনি বিদ্যুতের চকিত চমকে, ঘনরামের ধর্মমংগলের মতো এমনি একঘেয়ে একটানা ছন্দস্পন্দই তো ঐ মোটা মলাটের কারাগার থেকে সহর ক'লকাতাকে মুক্তি দেয় প্রাণের রাজ্যে। সব ইট-কাঠ-পাথরের শান-বাঁধাই রাজপথের, প্রকৃতির সংস্পর্শহীন রিক্ত মরু জীবনের মধ্যে থেকে এই বর্ষার আকুল সজল বেণী দুলিয়ে জড়িয়ে অনেক কামনার দীর্ঘশ্বাস অনেক বেদনার ব্যাকুলতা, অনেক ট্রাজেডির ব্যর্থতা আপনার বাণীকে ছন্দে-সুরে পাঠায় সৌন্দর্যের মোক্ষধাম অলকাপুরীতে—যেখানে প্রেমে নেই বিরহ, কামনায় নেই বিফলতা, আশার লতা যেখানে নিষ্ঠুর হিমে ছিঁড়ে যায় না বারংবার, যেখানে সমগ্র জীবনব্যাপী সৌন্দর্যসাধনার সিদ্ধিরূপা প্রিয়তমা আছে দাঁড়িয়ে—

বর্ষার দিনে ক'লকাতার প্রাণ-কামনা

'হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমান্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্। --মেঘদূত

সাংবাদিকতা ও আধুনিক জীবন

ইংরাজি 'জার্নালিজম্' কথাটিকে আমরা বাংলায় বলি 'সাংবাদিকতা'। সাংবাদিকতার বিশেষ প্রবাহের মধ্যে অনেক শাখা-উপশাখার যে পল্লবিত বিস্তার আছে, সেকথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। সংবাদপত্রের প্রকারভেদে সাংবাদিকতার রূপান্তর অত্যন্ত সহজে ধরা যায়। বাজারে আজকাল অজস্র পত্র-

ভূমিকা

পত্রিকার ভিড়ে—এদের সমারোহের মধ্যে—বৈচিত্র্যের জয়জয়কার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিষয়বস্তু ও উপজীব্য বিভিন্ন জাতের। দৈনিক সংবাদপত্রের রূপ ও স্বরূপ সম্পাদক ও সাংবাদিকদের হাতে কি ভাবে রূপান্তরিত হয়, সেকথা মুখ্য হ'লেও প্রাসংগিক ভাবে অন্যান্য প্রকার সাংবাদিকতার আসল চেহারাও আমাদের এই আলোচনায় ধরা পড়ে।

বর্তমান কালের সভ্যতা তথা আধুনিক জীবনের অন্যতম প্রধান বাহন সংবাদপত্র। এমন এক শ্রেণীর লোক দেশে সৃষ্টি হয়েছে, যাদের প্রতিদিন সকালে চায়ের সংগে দৈনিক পত্রিকা একখানা অবশ্যই চাই। দেশবিদেশের খবর জানবার জন্য সাধারণ অসাধারণ সকল মানুষেরই আগ্রহ দিনের পর দিন ক্রত

সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতা তথা জীবনের বাহন

বেড়েই চলেছে। এ কেবল শহরের বেলাতেই নয়, গ্রামবাসীদের পক্ষেও সত্য। এখন আর দ্বৈপায়ন স্বাতন্ত্র্যে সাম্প্রতিক কূপমণ্ডূকতায় টিকে থাকবার দিন নেই। অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে সারা পৃথিবীর যেমন কর্মকাণ্ডের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে, তেমনি মানুষের চিন্তার জগতেও এসেছে বিরাট যুগান্তর। সভ্যতা ও সমাজের বিবর্তনফলে আধুনিক জীবনের আসল রূপটি মানুষের চোখে যতই ধরা প'ড়ছে, সে ততই বেশী অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠছে আরও জানবার ও বুঝবার জন্যে।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গঠন করা হয়। প্রত্যেক দেশে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের বহু পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন মতবাদ সংবাদপত্রেরই সাহায্যে প্রকাশ করে। অন্যান্য আরও অনেক উপায় থাকলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ক্ষমতার অধিকারী

জনমত-গঠনে সংবাদপত্র

হ'তে হ'লে সংবাদপত্রের সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় কালির আঁচড়ে যে সব সংবাদ বেরোয়, তাদের পরিবেশ-কৌশলই 'সাংবাদিকতা' নামে আখ্যাত। প্রতিটি পত্রিকার সংবাদ পরিবেশিত হয় সেই পত্রিকার আদর্শ ও স্বার্থানুযায়ী। সাংবাদিকতার বৈচিত্র্য তাই নগণ্য নয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সংবাদপত্র মূলধনীদের পাশুপত অস্ত্র। মানুষের জাগ্রত চৈতন্যকে তারা এই সম্মোহন অস্ত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন ক'রতে চায় নিজেদের নিরংকুশ অক্ষুণ্ণ আধিপত্য রাখবার জন্যে। এদের টাকার অভাব নেই; সুতরাং পত্রিকা-প্রকাশের আর্থিক প্রাচুর্য এদের কাছে তো খোলামকুচি। বড়োলোকদের স্বার্থের পরিপোষক হিসাবে যে সব পত্রিকার সৃষ্টি—সেখানে জনগণকে ধাপ্পা দেওয়াই সাংবাদিকতার মূল মন্ত্র। সাংবাদিকরা ভালো মানুষ, কি খারাপ মানুষ, সে বিচার সেখানে নেই।

ধনতান্ত্রিক প্রভাবে সাংবাদিকতা

মাইনে-করা চাকর হিসেবে মালিকের স্বার্থের খবরদারী করাই তাদের প্রধান কাজ। ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের বিশেষ অবকাশ সেখানে নেই। বেশীর ভাগ সাংবাদিকের স্বাধীন কণ্ঠ সেখানে অবরুদ্ধ। কিন্তু সাংবাদিকতার মর্মকথাই তো হ'চ্ছে জনকল্যাণকে লক্ষ্য ক'রে সংবাদপত্রকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করা। সত্যি কথা ব'লতে কি, দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মালিকের সিন্দুকে থাকে গচ্ছিত। অতএব, সাংবাদিকতার আসল উদ্দেশ্য এখানে কারাবন্দিনী।

ঐ সমস্ত ধনীপোষ্য কাগজে সাংবাদিকতার ধর্ম হচ্ছে ধনিক স্বার্থের রঙীন চশমা চোখে দিয়ে বাস্তব ঘটনার বিকৃত ও মিথ্যা প্রচার। আর সৎ এবং স্বাধীনচেতা সাংবাদিকের হয় সেখানে অগ্নিপরীক্ষা। হয় তাকে মালিকশ্রেণীর পায়ে আত্মবিসর্জন দিতে হয়—জনতার মঙ্গলামঙ্গলকে অগ্রাহ্য ক'রে মালিকের মনস্তুষ্টি করতে হয়, নয় বিদ্রোহ ক'রে এই নারকীয় ষড়যন্ত্রের বাইরে চলে' আসতে হয়। আর্থিক দুরবস্থার চাপে যাদের অন্য কোন উপায় থাকে না, তারা বাধ্য হয়ে' নিরুপায় ভাবে মালিকের পদসেবা করে, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে, এবং সাধারণ লোকের দুঃখবেদনার কথা অগ্রাহ্য করে' মুষ্টিমেয় বড়োলোকের প্রভাব-প্রতিপত্তির করে খবরদারী। দৃষ্টান্তরূপে 'রয়টার' বা [illegible] কোন বড়ো সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচনা ক'রলেই এ সত্যটি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাংবাদিকতায় মিথ্যাচার

তবে দেশের লোকের মধ্যে সত্যকার রাজনৈতিক চেতনা ও দেশপ্রেমের উদ্বোধন ক'রবার জন্যে সত্য সংবাদ সরবরাহ করবার মতো পত্রিকারও অভাব হয় না কোন দিনই। ভারতের ও পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাসে সাংবাদিকতার এই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান। সাংবাদিকতা এখানে কেবলমাত্র জীবিকার্জনের পন্থা নয়। নিরলস দেশসেবিগণ মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবেই একে ব্যবহার করেন এবং এখানে সাংবাদিকতা হয় সত্য ও ন্যায়ের বাহন। তবে এ ধরণের পত্রিকা ব্যবসায় ক'রবার

সাংবাদিকতার সত্যনিষ্ঠা

উদ্দেশ্যকে সাহায্য করতে পারে না। কারণ.—মালিক এবং শাসকশ্রেণী একে সহজে নারাজ। টাকাওয়ালা মানুষের সমর্থন এর পিছনে না থাকায় জাঁক বেশী না থাকলেও মানুষের মনের উপর এদের প্রভাব অপরিসীম। এ হ'ল জনসাধারণের নিজস্ব বার্তাবহ —এর প্রাণভোমরা মানুষের মনের মণিকোঠায় থাকে সযত্নে লুকানো।

এ ছাড়া খেলাধুলা সিনেমা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাদের আসল কথাও হ'ল এই. যারা ব্যবসায়ী বুদ্ধির তাড়নায় পত্রিকা প্রকাশ করে, তাদের সাংবাদিকতা মিথ্যাচারের নামান্তর। মানুষকে প্রবঞ্চিত করাই তাদের ধর্ম এবং সাংবাদিকতা তাদের কাছে টাকা পিটবার সস্তা উপায়মাত্র। এর অজস্র উদাহরণ আমরা পথে-ঘাটে ছড়ানো দেখতে পাই। মানুষের কতকগুলি দুষ্ট প্রবৃত্তিকে নাড়া দিয়ে সেই উত্তেজনার সুযোগ নেয় বেশীর ভাগ যৌন-বিষয়ক পত্রিকা। এরা সাধু সাংবাদিকতার ছদ্মবেশে মানুষের ভালো ক'রবার অছিলায় চরম অকল্যাণই সাধন করে।

সাংবাদিকতায় কাপট্য

তবু সংবাদের পরিবেশনে কারচুপি থাক, তবুও সাংবাদিকতা এ যুগের অন্যতম প্রধান আশ্রয়. মালিকানার আদেশে এর রূপবদল ঘ'টলেও সাংবাদিকতার দুর্বার শক্তি অবশ্য স্বীকার্য সত্যকার সাংবাদিকতা ঘটনাচক্রে যদিও অনেক সময় বিকৃতির পথ ধরে, তবু সেজন্য সাধারণ সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের শক্তিকে তুচ্ছ করা অযৌক্তিক। মানুষের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সাংবাদিকতা ও আধুনিক জীবন ক্রমাগতই বিবর্তিত হয়ে চলেছে; গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তিম দশা যতই আসবে ঘনিয়ে, বন্দিনী সাংবাদিকতা ততই পাবে মুক্তির স্বাদ এবং জনকল্যাণে সাংবাদিকেরা নিজেদের সমগ্র শক্তি ততই ক'রবেন নিয়োজিত। শোষণবৃত্তিকে যে-সমাজ রেখেছে টিকিয়ে, সে-সমাজ সাংবাদিকতার মর্যাদা নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলবেই, এতে আর বিস্ময়ের কথা কি? কিন্তু এ অবস্থাও তো চিরস্থায়ী নয়—সাংবাদিকতার বর্তমান চেহারার বদলও তাই ক্রমান্বয়ে ব্যক্তির দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী

সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ

ছুটি

ছুটি, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Holiday', মূলত তা ছিল 'Holy day' অর্থাৎ পবিত্র দিন। কোন পবিত্র ঘটনা অথবা ব্যক্তির স্মরণে ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ত এই দিনটিতে। প্রাত্যহিক কর্মাদিতে দেখা দিত বিরতি। অবশ্য এক্ষণে ছুটির দিন ব'লতে বুঝায় বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদ অথবা উৎসাহের দিনকেও; প্রত্যেক দেশেরই আছে নিজস্ব ছুটির দিন—হয় তা উৎসবের, নয় তা কর্মবিরতির বা আমোদ-

প্রমোদের ও অবসর-বিনোদনের। নিখিল বিশ্বের সভ্য দেশগুলিতে প্রচলিত ছুটির প্রতি লক্ষ্য ক'রলে দুটি জিনিষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে—একটি হচ্ছে, ছুটির দিন উৎসবের দিন, অপরটি হচ্ছে, ছুটির দিন আবার বিশ্রাম-দিবসও। ছুটির ব্যাপারে ধর্মের হাত সব চেয়ে বেশী। তাই সর্বত্রই ধর্মীয় উৎসব-দিবসগুলি ছুটির দিন হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

ছুটির প্রকৃতি

'ছুটি' শব্দটির অর্থ যে ক্ষেত্রবিশেষে পৃথক, একথা অনেকেই বুঝেন না। আপিসের চাকুরিয়াদের ও কলকারখানার শ্রমিকদের কাছে ছুটির অর্থ হচ্ছে তাদের স্ব স্ব পেশার সংগে সম্পর্কিত কর্ম থেকে সাময়িক বিরতি। পক্ষান্তরে, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীর বেলায় ছুটি অন্যবিধ অর্থ বহন করে। ভবিষ্যতের পাঠ প্রস্তুতির জন্যে না হোক, অন্তত লব্ধ জ্ঞানকে সংহত ও ধ্রুব করে তোলবার জন্যে ছুটি বা অবকাশের বেশ খানিকটা অংশকে ছাত্র-ছাত্রীকে কাজে লাগাতে হয়। আবার সুশিক্ষকও ছুটিকে নিশ্চিন্ত আলস্যে কালযাপনের সুযোগ বলে মনে করেন না। যিনি সুশিক্ষক, তিনি আপনাকে আরও দক্ষ করে তোলবার জন্যে, ভবিষ্যতের অধ্যাপনা-প্রস্তুতির জন্যে, ছুটিকে অনেকখানি কাজে লাগিয়ে থাকেন। ইস্কুল-কলেজে ঐ কয়টি ঘণ্টার পঠন-পাঠনে এমন কিছু ফল ফলে না, যদি না ছুটিতে বা অবকাশে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা পড়ে ও শেখে। অবশ্য ইস্কুল-কলেজের বাধাধরা 'রুটিনে'র বাইরে ছুটিতে বা অবকাশে গৃহে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে এইভাবে অধ্যয়ন করতে প্রবুদ্ধ করা, সুশিক্ষকের দক্ষতার পরিচায়ক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছুটির তাৎপর্য

সরকারী বেসরকারী, সওদাগরী আপিসে ছুটির মাত্রা অনেক কম। ফৌজদারী আদালতের চেয়ে দেওয়ানী আদালতেই ছুটি বেশী, আবার হাইকোর্টের ছুটি আরও বেশী। হাইকোর্টে পূজার ছুটি দীর্ঘ—মাস দুয়েকেরও বেশী। এরূপ দীর্ঘ পূজার ছুটি আর কোন প্রতিষ্ঠানেই নেই। ডাকঘর ও ব্যাংকের ছুটি বোধ হয় সব চেয়ে কম। সাধারণত প্রধান প্রধান হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান পর্ব দিবসেই ছুটি হয়। এছাড়া স্বাধীনতা দিবস, ব্যাংকের ষাণ্মাসিক হিসাবদিবস প্রভৃতি উপলক্ষ্যেও ছুটি হয়ে থাকে। তবে ছুটির মাত্রাধিক্য দেখা যায় ইস্কুল-কলেজে—এ ছুটির মধ্যে আবার কলেজেরই ছুটি অধিকতর।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছুটির মাত্রা

ছুটি দু' জাতের—দীর্ঘ অবকাশ ও দু-এক দিনব্যাপী ছোটখাট ছুটি। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করে জানা যায়, বৈদিক যুগের বিদ্যালয়ে এবং গুরুকুলে প্রতি মাসে সপ্তাহ-ব্যবধানে চারটি নিয়মিত ছুটি মিলত—পূর্ণিমায়, অমাবস্যায় এবং অষ্টমী তিথি দু'টিতে। বহিরাগত কারণাদির জন্যেও বিদ্যানিকেতনের কাজ বন্ধ থাকত।

রাজা অথবা প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতের মৃত্যু, দস্যু অথবা গোধনহরণকারীদের দ্বারা উৎপীড়ন, স্বনামধন্য কোন অতিথির সম্বর্ধনা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় বন্ধ হ'ত। অবশ্য অস্বাভাবিক আবহাওয়া-জনিত অপ্রত্যাশিত মেঘ, বজ্র, প্রবল ধারাবর্ষণ, শিলাবাহী ঝটিকা ইত্যাদির আবির্ভাবেও বিদ্যানিকেতনের কাজ স্থগিত থাকত।

বৈদিক ভারতের ছুটি

পরবর্তীকালে স্মৃতির নির্দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালে উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তির পরিবর্তে নীরব আবৃত্তি প্রচলিত হ'ল। মনুর মতে, সরকারী ছুটির দিনেও অবৈতনিক পঠন-পাঠনের বাধা নেই। সে যাই হোক, কোন্ ছুটি গ্রহণীয় আর কোন্‌টিই-বা বর্জনীয়, তা নির্ধারণ ক'রবার ভার কালক্রমে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানাদির উপরেই বর্তাল।

ইসলামী সমাজের গতিপ্রকৃতি মূলত গণতন্ত্রমূলক। ফলে সাধারণ চাষী অথবা শ্রমিকের ছুটির মাত্রা বেশী নয় এইজন্যে যে, দেশের খাদ্যসামগ্রী, শিল্প-দ্রব্যাদির যোগানে টান পড়ে যেতে পারে। মুসলমান উৎসব প্রকৃতিতে ধর্মমূলক। চাঁদকে কেন্দ্র করেই সারা বৎসরে মুসলমানদের ছুটি হ'য়ে থাকে। সরকারী ছুটির তালিকার সংগে তুলনা করা যায় এমন কোন ছুটির তালিকা কোরাণে নেই। মুসলমানের কাছে

মুসলমান-সমাজের ছুটি

রমজান মাসটি অতীব পবিত্র। তাই এই মাসটির আগে এবং পরে একটি করে হপ্তা যোগ দিয়ে মোট দেড় মাস ছুটি দেবার রীতি ইসলামী মাদ্রাসাসমূহে সাধারণত দেখা যায়। অবশ্য মক্তবে বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঐ রমজান মাসে ছুটি দেওয়া হয় না। কারণ,—মক্তবের অল্পবয়সী ছাত্রদের পক্ষে ঐ পবিত্র উপবাসটি বাধ্যতামূলক নয়। প্রাকৃতিক কারণে নয়, নিছক ধর্মনৈতিক কারণেই মুসলমানদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ছুটি ও অবকাশ দেওয়া হয়ে থাকে। মুসলমান বিদ্যালয়সমূহ জুম্মাবারে বন্ধ রাখ্‌বার একটা রেওয়াজ আছে। কিন্তু পবিত্র কোরাণে জুম্মাবারে বিদ্যালয় অথবা অন্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখ্‌বার কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই। 'সুরা-ই-জুমা'তে (শুক্রবারের উপরে লিখিত পরিচ্ছেদে) যেটুকু নির্দেশ আছে, সম্ভবত তাকেই সূত্র ধ'রে পরবর্তীকালে জুম্মাবারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখ্‌বার রীতি উদ্ভূত হয়েছে। রমজান বকর-ঈদ্, মহরম্, শব্-ই-বরাত্ প্রভৃতি মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য পর্বদিবস।

য়ুরোপীয় এবং ইংগ-ভারতীয় নাম-করা ইস্কুলগুলো নৈনিতাল, সিমলা, দার্জিলিঙ

য়ুরোপীয় ও ইংগ-ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি

প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত থাকায় ঐ গুলিতে মাস তিনেকের একটি দীর্ঘ শীতাবকাশ হয়ে থাকে। তবে ভারতের সমতলভূমিতে অবস্থিত ইস্কুলগুলোতে আট নয় হপ্তার গ্রীষ্মাবকাশ হয়ে থাকে। এ ছাড়া 'খ্রীস্ট মাসে' চার হপ্তার ছুটি। অবশ্য

'ইষ্টারে'র দরুণ আরও চার পাঁচদিন ছুটি আছে। প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইস্কুলগুলোতে সাধারণত শনিবার এবং রোমান্ ক্যাথলিক বিদ্যালয়সমূহে সাধারণত বৃহস্পতিবার ছুটি হয়ে থাকে, আর রবিবার তো সাধারণ ছুটির দিনই।

ইস্কুল শিক্ষার বাহন। আধুনিক যুগের ছাত্রকে অনেক-কিছু জানতে হয়, শিখতে হয়। তাই ছুটির পরিমাণ কমানোর দিকে জনমত গড়ে উঠ্ছে। যারা বর্তমানে প্রচলিত ছুটি এবং অবকাশের বিষয়টি পুংখানুপুংখরূপে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছেন, তাঁরা এর সংস্কারের পক্ষপাতী। ছুটি-সংস্কারকেরা বলেন ব্যাংক এবং সরকারি কোষাগারের সংগে সমতা রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ধর্মমূলক ছুটিগুলি কমানোর প্রয়োজন। সহরে প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানাদিতে গ্রীষ্মঋতুর মাঝামাঝি মাস দেড়েকের একটি দীর্ঘ অবকাশ এবং শীত-ঋতুর মাঝামাঝি মাসখানেকের একটি দীর্ঘ শীতাবকাশের তারা সমর্থক। এই সংস্কার-প্রয়াসীরা পল্লীগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষালয়াদিতে সাপ্তাহিক ছুটি এবং গ্রীষ্মাবকাশ না দিয়ে খৃষ্টের দিনে, স্থানীয় উৎসব-দিবসে এবং বীজবপন ও ফসল কাটার সময়ে ছুটি দেবার পক্ষপাতী। সারা বৎসর ধ'রে মাঝে মাঝেই ইস্কুল কলেজে যে দু'চার দিন ক'রে ছুটি হয় তার মূলোৎপাটন ক'রে তিন তিন মাসের ব্যবধানে ছুটির ব্যবস্থা ক'রলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দিক দিয়ে যথেষ্ট উপকার হবে, এটাও কোন কোন ছুটি-সংস্কারক মনে করেন। আমাদের এই দেশ আয়তনে এতই বিরাট, প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় এতই বিচিত্র এবং সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে এতই স্বতন্ত্র যে, ছুটি বা অবকাশের একটা সার্বভৌমিক পদ্ধতি চালু করা আদৌ সম্ভব নয়। হিন্দু এবং মুসলমান 'পরবে'র নামে যখন-তখন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানাদিতে ছুটি হওয়া আদৌ সমীচীন নয়। তবে স্বনামধন্য কোন আদর্শ মহাপুরুষ, জাতির পক্ষে একান্তভাবে স্মরণীয় কোন ঐতিহাসিক দিবস, জাতিগত বেদনামূলক কোন ঘটনা—এই সমস্ত কারণে যদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানাদিতে ছুটি হয়, তা'হলে অবশ্য প্রতিবাদ করা চলে না।

প্রচলিত ছুটির সংস্কার

ছুটি এবং অবকাশগুলো উপভোগ এবং সদ্ব্যবহার কি ভাবে করা যায় সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। ছুটির দিনে ছাত্রেরা তাদের অভিভাবকদের সংগে করে একটা সাধারণ জনসমাবেশে উপস্থিত হয়ে দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা ক'রতে পারে। এই আলাপ আলোচনা যাতে একঘেয়ে না হয় সেজন্য মাঝে মাঝে সংগীত-পরিবেশনেরও ব্যবস্থা হতে পারে। যাতায়াত ব্যাপারে বিশেষ খরচ-পত্রের দিকে না গিয়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরই কাছাকাছি কোন স্থানে ছুটির দিনে বেড়াতে গেলে, মনটা বেশ প্রফুল্ল হ'তে পারে। উন্মুক্ত প্রান্তর, নদীতীর, ফুলের বাগান আম্রকুঞ্জ—এ সমস্ত স্থান বেড়ানোর পক্ষে খুবই অনুকূল। পল্লীর সামাজিক জীবন বড়ই

.বচিত্র্যহীন—তাই যখন কোন মেলা বসে তখন পল্লীগ্রামে সাময়িক ভাবে নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা এবং উত্তেজনা সংক্রামিত হয়। মেলায় পণ্যদ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয়ই শুধু নয়, ভাব-বিনিময় হবারও যথেষ্ট সুযোগ থাকে। এই সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দিন তিনেকের ছুটি হলে ছাত্রেরা অভিভাবকদের সংগে গিয়ে ছুটির আনন্দ এবং শিক্ষা পাবার সুযোগ পেতে পারে। কারণ,—আধুনিক মেলায় চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনা, কৃষিশিল্প এবং চারুশিল্পের প্রদর্শনী, নানা ধরণের পুস্তকাদির দোকানের সমাবেশ অনায়াসেই হতে পারে। প্রচুর বারিপাতের দিনে যে ছুটি হয়, তাও কম উপভোগ্য নয়। কেন না, ঐ বিশেষ দিনটিতে প্রকৃতির এক অনুপম সৌন্দর্য মাধুর্য ছাত্রমনের মধ্যে এক কল্পলোক বহন করিয়া আনে। বিদ্যালয়ের অন্ত পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিক স্নাতক ইত্যাদি পরীক্ষা দিবার পরে ছাত্রছাত্রীগণ বেশ লম্বা ছুটি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহা ব্যর্থই হয়। তবে ছাত্রছাত্রীরা যদি এই সময়ে সমাজ উন্নয়নমূলক ব্যাপৃত হয় তো দেশেরই কল্যাণ। এ দিক দিয়ে ছাত্র-আন্দোলনের কর্মধারা পরিকল্পিত হওয়া সমীচীন।

ছুটি উপভোগ ও সদ্ব্যবহার

দেহ এবং মনকে সঞ্জীবিত করবার জন্য ছুটি এবং দীর্ঘ অবকাশের দরকার। সুতরাং আমাদের দৈহিক শক্তি অথবা মানসিক বল কমে যায় এমন ভাবে ছুটি এবং দীর্ঘ অবকাশকে নষ্ট করা উচিত নয়। দীর্ঘ অবকাশের সময় অজানা পরিবেশে অপরিচিত জনগণের মধ্যে যদি উপনীত হওয়া যায়, তাহলে অভূতপূর্ব অনাস্বাদিতপূর্ব এক আনন্দের সন্ধান মেলে। ছুটির দিনে পায়ে হেঁটে অল্প কিছু সম্বল নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর, মাঠের পর মাঠ অতিক্রম ক'রে যে দুঃসাহসিক অভিযানে পরম আনন্দটি লাভ করা যায়, তাহার তুলনা এই পৃথিবীতে আর কোথায় মেলে। তাই তো ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় ব'লতে ইচ্ছা করে—

ভ্রমণ করা

'Hence in a season of calm weather
Though inland far we be
Our souls have sight of that immortal sea
Which brought us hither,
Can in a moment travel thither,
And see the children sport upon the shore,
And hear the mighty waters rolling evermore.'

বিজ্ঞানের গতি কোন্ পথে!

পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের কাজ। পার্থিব রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবার জন্যে বিজ্ঞানের প্রয়াসের অন্ত নেই—নানাবিধ আবিক্রিয়ায় বিজ্ঞান মানুষের জীবনে এনেছে বিরাট্ বৈচিত্র্য। শিল্প ও সংস্কৃতির সংগে সভ্যতার জয়যাত্রায় বিজ্ঞানের অবদান নিতান্ত সামান্য নয়। মানুষেরই জ্ঞান তার জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করবার জন্যে বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। অথচ বর্তমান কালে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ সমস্ত মানুষের জীবনে সমানভাবে বর্ষিত হতে পারছে না নানা কারণেই।

ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ বাস ক'রত অজ্ঞানতার তামস-তমিস্রায়। সেদিন তার জীবনে সভ্যতার চিহ্ন ছিল না বিন্দুমাত্রও। কিন্তু অবস্থার ফেরে একদিন সে আবিষ্কার ক'রল আগুন, শিখ্ল সে হাতিয়ার তোয়ের ক'রতে, ধীরে ধীরে একটির পর একটি আবিষ্কারে তার জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্তন হতে লাগল ক্রমাগতই। শম্বুকগতি গরুর গাড়ির যুগের সংগে দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোত বা ব্যোমযানের দূরত্বের ব্যবধান দুস্তর। অর্থাৎ বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কার সভ্যতার স্রোতকে নূতন নূতন খাতে প্রবাহিত ক'রে তার মধ্যে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী বৈচিত্র্য ও মনোহারিত্ব দান করেছে। মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সৃষ্টি করেছে অতি গভীর একনিষ্ঠ সাধনায়—বিজ্ঞানীর জীবন-সাধনার একান্ত কামনাই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাহায্যে মনুষ্যসভ্যতার উন্নয়ন-সাধন। দিনের পর দিন অতন্দ্র সাধনায় মানব-জীবনের দুঃখযাতনাকে বিদূরিত করে জীবনকে সুখী ও সুন্দর করে তোলা—এর চেয়ে বড় কথা বিজ্ঞান-সাধনায় আর কিছুই নেই।

বিজ্ঞান ও সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক

জেম্স্ ওয়াট্ যেদিন বাষ্পশক্তি আবিষ্কার করেছিলেন, সেদিন তাঁর কল্পনায় কি ছিল, জানা শক্ত হলেও বাষ্পশক্তি আজ মানুষের জীবনে অনেকখানি জায়গা দখল করেছে। বিজ্ঞানী যেদিন বিদ্যুতের শক্তি করলেন আবিষ্কার, সেদিনটি সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বিদ্যুৎশক্তির সহায়তায় মানুষের সমাজ ও সভ্যতার চেহারা পর্যন্ত গেছে বদলে। বৈদ্যুতিক শক্তির লীলায় সমগ্র পৃথিবীর আয়তন অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে যেন আমাদের নিকট প্রতিবেশীতে হয়েছে পরিণত। পৃথিবীর দিক্-দিগন্তে যেখানে যে ঘটনাই ঘটুক, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত দেশের লোক বিজ্ঞানের সাহায্যে তা অনায়াসেই জান্তে পারে। মানুষের চলাফেরা, কাজকর্মের অজস্র সুবিধা ক'রে দিয়েছে এই বিজ্ঞানই। ফরাসী লেখক জুলে ভার্নি *'Around the World in Eighty Days'* নামে একখানা উপন্যাস রচনা করে সারা পৃথিবীকে একদিন দিয়েছিলেন চমকে। মানুষের

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদান

ধারণা এবং বিশ্বাস ছিল, নিখিল পৃথিবী পরিভ্রমণ করে আসতে অনেকদিন সময় লাগে। কিন্তু ভার্নি ভৌগোলিক বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, পৃথিবী-পরিভ্রমণে আশী দিনের বেশী সময় লাগে না। আজকাল পাঁচ দিন বা তিন দিনেরও মধ্যে পৃথিবী-ভ্রমণের কাহিনী শোনা যাচ্ছে। মানুষের পরিভ্রমণগতি অতি দ্রুত বেড়েছে,—এও বিজ্ঞানেরই দান।

বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এমন সব ওষুধ, যা অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিকে সহজেই নিরাময় করে দিতে পারে। জার্মান বিজ্ঞানী 'রন্টজেন' রঞ্জনরশ্মি (X-Ray) আবিষ্কার করে মানুষের অশেষ মংগল সাধন করেছেন। এই বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে মানুষের দেহের অভ্যন্তরের যে পূর্ণাংগ চিত্র পাওয়া যায়, পূর্বে তা ছিল অকল্পিত। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর আবিষ্কার করলেন জলাতংকের ওষুধ। এর সাহায্যে কত দুরারোগ্য ব্যাধিরই-না চলেছে চিকিৎসা।

বিজ্ঞানের সাহায্যে চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর

দিনের পর দিন বিজ্ঞান এমনি করে ক্রমাগত চলেছে এগিয়ে। কিন্তু এই অগ্রগতির সমস্ত সুফল মানুষের পক্ষে সহজলভ্য হয়েছে বলে মনে করা ভুল। বীক্ষণাগারে যে সত্যের হয় অভ্যুদয়, সকলের অধিকার তাতে সমান হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সকল মানুষে বিজ্ঞানের সেবা সমানভাবে পায়নি। সমাজ-জীবনের ও রাষ্ট্রিক জীবনের চাবিকাঠি যাঁদের হাতে, তাঁরা বিজ্ঞানকে ক্রীতদাসীর মত আপনাদের বাসনাতৃপ্তির সুলভ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। বিজ্ঞান তাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্যতম প্রধান অবলম্বন। বিজ্ঞানের অপব্যবহার ক্রমাগত বেড়ে বেড়ে এমন অবস্থায় পৌঁছিয়েছে যে, আজ মানুষের মনে এমন সন্দেহও জেগেছে যে, সভ্যতার পাদপীঠে বিজ্ঞান আশীর্বাদ, না অভিশাপ! মারণাস্ত্রের তাণ্ডবলীলায় মানুষের বহু যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইমারৎ যেভাবে হয় ধূলিসাৎ, তাতে মানুষের মনে এ প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের সব-কিছু দান মানুষের জীবনে কার্যকরী হ'তে পারে না। তার কারণ বিজ্ঞানকে সামান্য কয়েকজন মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা চলেছে। স্বার্থান্ধ মূলধনীরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির একচেটিয়া ব্যবসায় ক'রে কোটি কোটি মুনাফা পায়। অর্থাৎ বিজ্ঞানের দানকে ব্যবসায়ের মূল্যে রাখা হয়েছে মানুষেরই নাগালের বাইরে। যেমন—'ক্লোরোমোইসেটিন' চিকিৎসার কথা বিচার করা যাক্। 'টাইফয়েড্' জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে এর প্রয়োগ অনিবার্য। কিন্তু জিনিষটি এমনি মহার্ঘ যে, সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে এ পড়েই না।

সভ্যতার পাদপীঠে বিজ্ঞান আশীর্বাদ, না অভিশাপ?

বিজ্ঞানের এই অপপ্রয়োগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আণবিক বোমাও। অণুর অসীম শক্তিকে

বিজ্ঞানীরা যখন করেছিলেন আবিষ্কার, তখন এর ধ্বংসকারী শক্তির কথা তাঁরা ভাবেন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন, আণবিক শক্তির সাহায্যে মনুষ্য-জীবনের সুখশান্তিকে অনেক বেশী বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। অথচ সেই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হ'ল দু'টি জাপানী শহর ধ্বংস করার জন্যে। আর বর্তমানে একটির পর একটি আণবিক বোমা তোয়ের ক'রে সমগ্র পৃথিবী দখল করবার চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের রূপটি সুস্পষ্টভাবে উঠেছে ফুটে। আবার এর উপরেও আছে নাকি হাইড্রোজেন বোমা!

বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ—আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা

কিছুদিন আগে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের এক অধিবেশনে অধ্যাপক জোলিও কুরি এবং মাদাম ইরিন কুরি একটি কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার সময় অধ্যাপক কুরি ইউ. পি. আই.-এর প্রতিনিধির নিকট বলেছেন—"The member-nations of the United Nations must unequivocally demand that the deadly bomb should be eliminated in future warfares." অধ্যাপক কুরি একথাও পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন,—"Disarmament was necessary for the present disturbed world to settle down." বিজ্ঞানের নোবেল-পুরস্কারধারী ফ্রান্সের এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর কথায় বিজ্ঞানের অপব্যবহারের রূপটি কী বেশ চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয় নাই?

সভ্যতার পরিপন্থী বিজ্ঞান-সাধনা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য

সংগ্রামই জীবন

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে'—কবিগুরুর এই উক্তি নিছক ভাববিলাস বা একটা চটকদারী ঢঙ্ নয়। এই সত্যেরই প্রেরণা রয়েছে প্রতিটি জীবের জীবনের মর্মমূলে। অবিরত অগ্রাভিযানই তো জীবনের সাধনা। 'চঞ্চলা' নদীর মতোই প্রাণপ্রবাহ শুধু উদ্দামবেগে ধাবমান। স্থিরতা, স্থাণুত্ব জড়েরই ধর্ম। জীবের এই অগ্রাভিযানের পথে আসে বাধা, আসে সংঘাত। সংস্কারের অচলায়তন রোধ ক'রে দাঁড়ায় তার পথে। শুরু হয় সংগ্রাম। মানুষের জীবন এই সংগ্রাম ও শান্তি, গতি ও স্থিতির আবর্তমান ইতিহাস। সভ্যতার ইতিহাস এই সংগ্রামময় অগ্রগতিরই নিদর্শন।

ভূমিকা

বিজ্ঞানের মতে, প্রাণতত্ত্বটি একটি আকস্মিক আবির্ভাব। ব্রহ্মাণ্ডের সতত চক্রমান নীহারিকাপুঞ্জের বিভিন্ন বিবর্তনের ভিতরে প্রাণের উৎপত্তির কোন সুদূর ভাবনাও ছিল না। ব্রহ্মাণ্ডের শৈত্য এবং উত্তাপের প্রতিকূল পরিমণ্ডলে প্রাণ একটি বিস্ময়ের মতোই হয়েছে উদ্ভূত। চতুর্দিকে এই প্রাণকে ধ্বংস করার

জন্যে শক্তিপুঞ্জের খেলা চলছে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা যায়, যে কোন সময়েই প্রাণের 'Heat death' বা 'Cold death' হতে পারে। কাজেই এই প্রাণতত্ত্বটিকে রক্ষা করবার জন্যে প্রতি পাদক্ষেপে সংগ্রাম শুরু হয়েছে। যেখানে জীবনের বিকাশ, সেইখানেই তো সংগ্রামের প্রচণ্ডতা। মাটির নীচে যে বীজ থাকে সংগোপনে সকলের দৃষ্টির আড়ালে, তাকে প্রতি মুহূর্তে ক'রতে হয় দুর্বার সংগ্রাম; মৃত্তিকা ভেদ ক'রে তাকে লাভ ক'রতে হয় আলোর ঘুমভাঙানো পরশ। কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, কত রৌদ্র-বৃষ্টিই যে তাকে আঘাত হানে! কিন্তু সকল আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে ফলসম্পদে ভরে উঠে বীজটি তার নিজের জীবনের সার্থকতাই প্রতিপন্ন করে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জীবন

সৃষ্টির আদিমতম এককোষী জীব থেকে শুরু ক'রে মানুষ অবধি এই সংগ্রামের শেষ নেই। এককোষী জীবের সংগ্রাম শুরু হয় পরিবেশের সংগে সার্থক অভিযোজনার প্রচেষ্টায় ও খাদ্যান্বেষণে। প্রাণ রাখার প্রচেষ্টায় এই প্রাণপণ সংগ্রামেরই ফলে জাগে বংশরক্ষার প্রচেষ্টা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে দ্বন্দ্বময় পরিবেশের নিদর্শন। প্রাণ-প্রবাহ এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই করে অগ্রগমন। এই সংগ্রামই জীব-বিবর্তনের ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন নিয়ামক। যারা সংগ্রামে হয়েছে পরাংমুখ বা ক্লান্ত, তাদের জরদ্গব অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে। বহু অতিকায় জীব জীবনের সার্থক সঞ্চয়ে স্থিতিমান হয়েছে বলেই, সংগ্রাম ত্যাগ করে শান্তিকে অভ্যর্থনা করেছে বলেই তো আজ শুধু ইতিহাসের পাতায়ই তা রয়েছে বেঁচে। কত মানবজাতি, কত পশুজাতি সংগ্রামবিমুখ হয়ে এমনি করে জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তারও তো ইয়ত্তা নেই। মানুষের তো কথাই নেই। মানুষের সংগ্রাম শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে সার্থক অভিযোজনার সংগ্রাম নয়—মানুষের সংগ্রাম প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করার সংগ্রাম, প্রকৃতিকে আজ্ঞাবহ কামধেনু করার সাধনা। শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামেই মানুষ ব্যাপৃত নয়, মানুষের সংগ্রাম নিজের পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে। অর্থনৈতিক জীবন তো সর্বাত্মক সংগ্রামের একটা বিরাট্ পরিমণ্ডল! মানুষের জীবনদর্শনে 'পেন্সন' কথাটির স্থান নেই। তাই সংগ্রামে যেদিন আসে ক্লান্তি, সেদিন জীবনও লাভ করে নিষ্প্রাণ শবের অবিচল স্থিতি। শুধু বহির্জগতেই নয়, অন্তর্জগতেও মানুষের সংগ্রামের অন্ত নেই। মনের শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তির সংগ্রাম, নীতিবোধ ও পাশব জিঘাংসার সংগ্রাম, মানুষকে প্রতিনিয়ত 'আদিম নিষাদে' করে পরিণত। মানস ভাবনিচয় ও প্রবণতাসমূহের ভিতরে দিবারাত্র যে সংগ্রাম চলছে, তাতে

বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সংগ্রাম

জয়ী হ'তে না পারলে মানুষ উন্মাদ হয়ে জড়ত্ব লাভ করত, অথবা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

জীবনের অস্তিত্ব যেমন সংগ্রাম-নির্ভর, জীবনের সকল রূপায়ণও তেমনি সংগ্রামের উপরেই করে নির্ভর। জীবন যদি শান্তি ও সমৃদ্ধির পংগুতা বরণ করে নেয় তো সে জীবনেরও হয় ভাবমৃত্যু। যে-সকল অতিকায় জীব ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের বহিঃপ্রকৃতির সংগে সংগ্রাম করতে হয়নি বা সে সংগ্রামে তারা জয়ীও হয়নি—একথা যথার্থ নয়। স্থূল সংগ্রাম তারা করেছে এবং জয়ীও হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের পরিবেশের অন্তহীন প্রাচুর্য তাদের জীবনে এনেছে নিশ্চিন্ত অলস রোমন্থন; তাই তাদের জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল নব নব অভিবিকাশের প্রেরণা কালধর্মে সবাইকেই ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হতে হয়, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব বেঁচে থাকে বংশধরদের কর্মপ্রচেষ্টার ভিতরে। অবশ্য শান্তির নিঃস্বতায় কত জাতিই তো এমনি করে চলে গেল জীবনের যবনিকার অন্তরালে।

ক্রম-অভ্যুদয়ের অধ্যায়-সংগ্রামেই জীবনের সার্থকতা

মানুষ যদি নিজের সৃষ্টিকে না করে অতিক্রম, যা কিছু সঞ্চয় তাই দু'হাতে ফেলে ফেলে সে যদি এগিয়ে না যায়, পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় ক্ষয় করার সাহসই যদি তার না থাকে—তবে তার জীবন পশুজীবনেরই সমান। মানুষের জীবনে প্রতিক্ষেত্রে রয়েছে কর্তব্যের আহ্বান। কর্তব্যপালনের সমরে পরাংমুখ হয়ে নিশ্চিন্ত ঐশ্বর্যের মাদকতায় জীবনকে সুরভি-মন্থর করে তুললে উপভোগ হয় বটে, কিন্তু জীবনের ভাবাদর্শ তাতে হয় বিপর্যস্ত, জীবনের অগ্রাভিযানও হয় ব্যাহত। প্রকৃতির দানে কোল উঠল ভরে, আর সেই ঐশ্বর্যের পসরা নিয়ে নিজের ভোগলালসা করলাম চরিতার্থ—জীবনের অর্থ এত ক্ষুদ্র নয়। জীবনের দায়িত্ব অনেক—সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি, এমন কি সমগ্র জাতির প্রতি, প্রত্যেক মানুষের রয়েছে সুনির্দিষ্ট কর্তব্য। সেই সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হলে মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব সংশয়াকুল হয়ে উঠবে একথা নিঃসন্দেহ।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগের ব্রহ্মাস্ত্র আণবিক বোমাকে যদি মানুষ অহিংস সংগ্রামে পর্যুদস্ত না করতে পারে, তবে সমগ্র মনুষ্যজাতিই একদিন নিশ্চিহ্ন হবে। নিজের

উপসংহার

পরিপূর্ণ সম্ভাবনাকে সমগ্রভাবে বিকশিত করাই তো মানুষের সার্থকতম সংগ্রাম। সর্বপ্রাণিসাধারণ জৈব সংগ্রামে হয় প্রাণের প্রতিষ্ঠা, মানুষের এই আত্মবিকাশমুখী অধ্যাত্মসংগ্রামে হয় জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা। এই অধ্যাত্মসংগ্রাম থেকে মানুষ—শুধু মানুষ কেন, যে কোনও প্রাণী—যেদিন বিরত হবে, সেদিন তার অস্তিত্ব ধীরে ধীরে যাবে মুছে।

এই অধ্যাত্মসংগ্রামেই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, এতেই অমরাবতীর পথে মানুষের অগ্রগতি। অতএব,—

'মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা,
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর-মহিমা ?'

শ্রেষ্ঠ মানব

প্রকৃতির অন্তহীন অনবচ্ছিন্ন বিবর্তনের ফলে যেদিন মানুষ প্রথম-সূর্যের বিপুল আলোকের অভিনন্দন পেল, সেদিন ধরিত্রী প্রাণের পুলকিত উল্লাসে গেয়ে উঠেছিল, 'ন মানুষাৎ পরতরং হি কিঞ্চিৎ'—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। সত্যই মানুষ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এক বিস্ময়কর অভিব্যক্তি। জীবনপ্রবাহের (Elan vital) যে-ধারা এককোষী জীব থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত তরংগায়িত, সমগ্র প্রাণিজগৎ সেই উদ্দাম স্রোতের অন্ধবেগে আবর্তনশীল। কিন্তু মানুষ ? সেই উচ্ছ্বসিত প্রাণপ্রবাহের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে মানুষ অকস্মাৎ চমকে থেমে গেছে—প্রচেষ্টা করেছে তার গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করতে—জহ্নুমুনির মতোই তার উচ্ছৃংখল উচ্ছ্বাসকে গ্রাস করে তাকে নিজের কাজে, বিশ্বের কল্যাণে, শতধা উৎসারিত করেছে জাহ্নবীধারার মতো। মানুষের এখানেই বৈশিষ্ট্য। আত্মসচেতনতা ও জ্ঞানকর্ষণাই মানুষের মনুষ্যত্ব। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের যেখানে পরিপূর্ণতম বিকাশ, তার লক্ষণ কি ?—তার বৈশিষ্ট্যই-বা কোথায় ? যুগ যুগ ধরে কত মহামানব, কত অবতার, কত পয়গম্বর ধরিত্রীর ধূসর ধূলিকে দিয়েছেন অমৃত-পরশ ; কত মহাবীর জগৎকে স্তম্ভিত করেছেন শৌর্যমহিমায় ; কত ত্যাগী ও জ্ঞানী ত্যাগের ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের দীপ্তির উজ্জ্বল নিদর্শন গেলেন রেখে ; কত বুদ্ধ ও চৈতন্য অহিংসা ও প্রেমের পীযূষধারায় হিংসায় উষররক্ষ ধরিত্রীকে করলেন প্রীতিশ্যামল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে,—মানুষ কোন্ আদর্শটিকে বরণ করবে ? আর মানুষের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠত্ব হবে কোন্ কোন্ গুণের সমন্বয়ে ?

ভূমিকা

এ প্রসংগে সর্বাগ্রে মনে পড়ে এক পাশ্চাত্ত্য মনীষীর বাণী, যাঁর মতে ভবিষ্য মহামানব হবে শক্তি ও প্রেমের সংহত সমন্বয়। কথাটি ভেবে দেখবার মত। দেহ ও মন নিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ। তাই একটিকে অবহেলা করে অপরটির পরিপূর্ণ বিকাশ হলেও তা মানুষের আদর্শ বলে স্বীকৃত না হওয়াই সম্ভব। প্রকৃতির বিবর্তনের ইতিহাসের ভিতরে কিন্তু পাই আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ইংগিত। বিবর্তনধারার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলে দেখা যাবে, এখানে শুধু অগ্রগতি—পরাবৃত্তির বা পশ্চাদ্‌গতির কোন নিদর্শনই নেই। বিবর্তনের এক স্তরে যে প্রাণবৃত্তির

বিকাশ হয়েছে, পরবর্তী স্তরে সেই বৃত্তিই উত্তরোত্তর পরিপুষ্টির দিকে এগিয়ে চলে এবং সেই বৃত্তি যখন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়, তখন বিবর্তনের গতি অন্যদিকে হয় আবৃত্ত—তখন প্রাণীর অন্য-বৃত্তির উৎকর্ষের দিকেই বিবর্তনের ধারা হয় চালিত, পূর্বেকার বৃত্তিটি উপযোগিতার অভাবে ধীরে ধীরে হয়ে পড়ে সংকুচিত। বিবর্তনের স্তরে স্তরে জেগে উঠে বৈচিত্র্য-ময় বৈশিষ্ট্য। বিবর্তনের ফলে যখন একটি নূতন তত্ত্বের হয় উদ্ভব, তখন পূর্বের তত্ত্বটির বিবর্তন থেমে গিয়ে নবলব্ধ তত্ত্বের প থেই বিবর্তন চলে এগিয়ে। তা না হলে মানুষের ভিতরে আমরা হস্তী বা প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণীর দৈহিক বিশালতার উৎকর্ষই দেখ্‌তে পেতাম। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেরই সংকেত পাই যে, আত্মচেতনা ও জ্ঞানশক্তি যে-মানুষটির ভিতরে হবে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত, সেই মানুষটিই বরণীয় শ্রেষ্ঠ মানব।

বিবর্তনবাদীর মত

মনোবিজ্ঞানীর দল বিবর্তনবাদীর সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেন,—মনের তিনটি স্বাভাবিক বৃত্তি রয়েছে: তা হচ্ছে—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অর্থাৎ হ্লাদিনী, সন্ধানী ও সংবিৎ। এই তিনটির সুসমঞ্জস পরিপূর্ণ বিকাশেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। বুদ্ধিবৃত্তি যেদিন হবে পূর্ণ বিকশিত, আনন্দ আহরণের শক্তি যেদিন হবে পরিপূর্ণ এবং মানসশক্তি যেদিন হবে সম্পূর্ণ অপ্রতিহত—সেদিনই মানুষ বিবর্তনের সর্বসমুচ্চ শিখরে হবে সমাসীন। বাংলার ঋষি শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু বিবর্তনবাদীর পথেই অগ্রসর হয়ে ব'লেছেন যে, প্রাণতত্ত্বের বিবর্তন হতে হতে যেমন হয়েছে মনের উদ্ভব, তেমনি মনের বিবর্তনের শেষ সীমায় মানুষের দেহে উদ্বুদ্ধ হবে অতিমানস সত্তা। সেই অতিমানস সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশেই মানুষ লাভ করবে পূর্ণতার স্বাদ। উহাই তো তাহার দিব্য জীবন।

মনোবিজ্ঞানী ও শ্রীঅরবিন্দের মত

ভারতীয় শাস্ত্র আলোচনা কর্‌লে দেখা যায়, মানুষ তার আদর্শের শেষপ্রান্তে পাদপীঠ রচনা করেছে ঈশ্বরের। সেই আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় রামায়ণে ও পুরাণাদিতে, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের গুণনিচয়ের বর্ণনায়। সেখানে আমরা দেখ্‌তে পাই, দেহ মন ও আত্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশই ভারতীয় জনগণের নিকট মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে পূজিত। উপনিষদে পাওয়া যায়, মানুষ পঞ্চকোষসমন্বিত। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চকোষের পরিপূর্ণ সুসমঞ্জস বিকাশেই মানুষ পূর্ণতা লাভ করে। এখানে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, অন্নময় ও প্রাণময় কোষের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা আসুরিক শক্তি আহরণের নির্দেশ নেই। সমস্ত কোষেরই চাই পরিপুষ্টি এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতা। কোন কোষই অবজ্ঞেয় নয়।

ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত

জ্ঞান করে আগমন, প্রজ্ঞা লভে স্থিতি

মহাশূন্যে বিশাল নীহারিকাপুঞ্জের ভিতরে যেদিন জাগ্‌ল সৃষ্টির আলোড়ন, সেদিন বিচ্ছিন্ন অন্ধ শক্তিপুঞ্জ সংহত হতে লাগ্‌ল। সেই সংহত শক্তিপুঞ্জ ভেঙে ভেঙে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল,—তরল হল কঠিন, কঠিন পরিণত হল তরলে। ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে শুরু হল ভাঙাগড়ার খেলা।

ভূমিকা

এমনি করে প্রকৃতির অন্তহীন আবর্তনে অজৈব সৃষ্টির ধারা বয়ে চল্‌ল যুগ হতে যুগান্তরে। প্রকৃতির অংগে অংগে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের লহরী হল উল্লসিত। প্রকৃতির খেয়াল হল নিজেকে দেখ্‌বার, নিজেরই সৌন্দর্য উপভোগ কর্‌বার। জাগ্‌ল প্রাণ; জৈব সৃষ্টির পালা হল শুরু। জ্ঞানের হল উদ্ভব; প্রকৃতি নিজের মাধুরী আস্বাদ করে হল পুলকিত। কিন্তু চঞ্চলা প্রকৃতি তো শান্তির স্থিরতা বরণ কর্‌তে পারে না। দেহের লাবণ্যের উৎসমূলে রয়েছে যে অন্তরের মাধুরী, অংগের সৌন্দর্যের সেই মর্মবাণীটুকু কান পেতে শুন্‌তে হয়। তাই শুরু হল আলোড়ন, বিবর্তনের তরংগও উঠ্‌ল। জাগ্‌ল মানুষ। এক শত হল প্রজ্ঞা। প্রকৃতির আকাংক্ষা হল চরিতার্থ।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা—চেতনার আদি ও অন্ত। জ্ঞান আনে বিষয়ের অববোধ, প্রজ্ঞা দেয় বিষয়েরই আন্তর রহস্য-চেতনা। বিষয় আহরণেই জ্ঞানের সমাপ্তি, আর সেই আহৃত বিষয় নিয়েই প্রজ্ঞার অভিযান। জ্ঞানের যাহা সাধ্য, প্রজ্ঞার তাহাই সাধনার উপকরণ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে মনের কাছে বাইরের যে বিষয় উপস্থিত হয়, সেই বিষয়টিকে ঠিক তারই উপস্থাপিত স্বরূপে জানার নামই জ্ঞান। জ্ঞান তাই ইন্দ্রিয়সংযোগজনিত বিষয়ের উপস্থিতি। এ জ্ঞান শুধু মানুষের নয়, সর্বপ্রাণিসাধারণ।

সংজ্ঞানির্দেশ ও পার্থক্য বর্ণনা

এই যে জ্ঞান, এতে বিষয়ের উপস্থাপিত বাহ্যিক রূপকে অতিক্রম করে তার আন্তর স্বরূপকে ধর্‌বার কোন প্রচেষ্টাই নেই। এখানে পূর্বানুভূত বিষয়ের সংগে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের বোধ আছে বটে, কিন্তু সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের হেতুপ্রত্যয় বা অন্তর্নিহিত কার্যকারণ আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা এতে নেই। জ্ঞান তাই সম্পূর্ণরূপে বিষয়াবগাহী, বিষয়পর্যাপ্ত। বৃক্ষের জ্ঞান বাইরের ঐ বৃক্ষটির কাণ্ড-শাখা-প্রশাখার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এবং পত্র-পুষ্প-ফলের কথাটুকুই শুধু জানাতে পারে। এর বাইরে যেতে সে যে নারাজ। বৃক্ষের চারপাশের বিষয়সজ্জার সংগে এর কোন সম্বন্ধ-পরম্পরার বন্ধন আছে কিনা, এর নিজের সত্তারই-বা অন্তর্নিহিত কারণ কি—এসব গবেষণা করতে জ্ঞান অক্ষম। জ্ঞানের এই অক্ষমতার ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞার সার্থক

অভিযান। প্রজ্ঞা বৃক্ষটিকে শুধু বিচ্ছিন্ন একটি বৃক্ষরূপেই দেখে না, তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সংগে যে সম্বন্ধশৃংখলা রচনা করে' সে অবস্থান করছে, তারই বাহিক আকৃতির পিছনে গুপ্ত রয়েছে যে কার্যকারণের ইতিহাস—প্রজ্ঞা করে তাকেই আবিষ্কার। প্রজ্ঞা জ্ঞানাহৃত বিষয়ের করে বিশ্লেষণ, করে শ্রেণীবিভাগ এবং সেই বিষয়ের অস্তিত্বের মূলসূত্রটিকে খুঁজে বের করাই যে তার উদ্দেশ্য।

প্রজ্ঞা মানুষের দৈবী সম্পদ। প্রজ্ঞার আলোকেই মানুষ নব নব অভ্যুদয়ের পথে, নব নব কল্যাণের পথে, নিজেকে পরিচালনা করে। প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য থেকে যদি মানুষ বঞ্চিত হত, তাহলে মানুষ পশুস্তরকে কোন দিনই অতিক্রম করতে পারত না। শুধু জ্ঞানের পাথেয় নিয়ে এই রহস্যময়ী স্বৈরিণী প্রকৃতির ক্রীড়নক মানুষ কখনই অভিব্যক্তির এই আত্মপ্রতিষ্ঠ অবস্থা লাভ করতে পারত না। জ্ঞান চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী। তাই প্রতি মুহূর্তেই আমাদের হয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান। বিষয়টি যদি ইন্দ্রিয়ের সম্মুখ থেকে হয় অপসারিত, অথবা ইন্দ্রিয় যদি বিষয় থেকে হয় প্রত্যাহৃত, তাহলে জ্ঞান জন্মাতে পাবে না। তাই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে, এক জ্ঞান হয় উদিত, আরেক জ্ঞান হয় বিদূরিত। এমনি করে ঠিক তরংগেরই মতো একটির পর আরেকটি জ্ঞান চিত্তকে অধিকার করে। অনেক দার্শনিক জ্ঞানের এই ক্ষণিকতা ও বিষয়নিষ্ঠা পর্যালোচনা করে' শেষ অবধি মনের অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে বহির্জগৎই সত্য, মন বলে কোন পদার্থই নেই। সে যাই হোক্, এই চঞ্চলতার জন্যেই জ্ঞান কখনও সংস্কারে পরিণত হতে পারে না; আর সংস্কারে পরিণত হলেও সে সংস্কার জগতের উপরে কোন আলোকপাত করতে পারে না। সংসারে এমন বহু লোক দেখা যায়, যারা জীবনে বহু ঘটনা, বহু ঘাতপ্রতিঘাতের সংগে সংগ্রাম করেও কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না—জাগতিক ঘটনাপরম্পরার কার্যকারণশৃংখলা সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান শিশুদের স্তরেই থাকে সীমাবদ্ধ।

জ্ঞানের চঞ্চল গতাগতি

কিন্তু জীবনের পথে চলতে চলতে যদি কোন অভিজ্ঞতাই অর্জিত না হয়, শুধু স্মৃতিপথে বিরাট্ ঘটনার পাহাড়ই ভিড় করে দাঁড়ায়, তাহলে জীবনের অগ্রগতি হয় ব্যাহত। জীবনের প্রতি, জগতের প্রতি, প্রজ্ঞার দার্শনিক দৃষ্টি না থাকলে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা ব্যর্থতায় হয় পর্যবসিত, সভ্যতার অভিযানও হয় দুঃস্বপ্নে পরিণত। প্রজ্ঞা মানুষের মনে দৃঢ় সংস্কাররূপে অধিষ্ঠিত হয়। বিষয় অপসারিত হলেও প্রজ্ঞার অস্তিত্ব লোপ পায় না। ধ্রুবতারকার মত স্থির অচঞ্চল দ্যুতি বিকিরণ করে' প্রজ্ঞা জগৎকে উদ্ভাসিত করে, ঘটনাপরম্পরায় অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে

প্রজ্ঞার স্থিরতা—মানবসভ্যতায় প্রজ্ঞার অবদান

উদ্‌ঘাটিত করে, মানুষকে দেয় অগ্রগতির সার্থক পথনির্দেশ। শুধু জ্ঞানের পরে জ্ঞান আহরণ করে' মনে বিষয়ের বিরাট্ পাহাড় রচনা করা যেতে পারে; তাতে করে মনকে পরিণত করা হয় একটি বিরাট্ বিষয়পঞ্জিকারূপে। বিশ্বকল্যাণ তো দূরের কথা, এই জ্ঞানের দ্বারা আত্মকল্যাণের পথও বেছে নেওয়া যায় না।

প্রজ্ঞাই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রধান অবলম্বন। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে যদি প্রজ্ঞার স্থির জ্যোতি বিকীর্ণ না হত, তাহলে জগৎ হত মনুষ্যবাসের অযোগ্য। সমাজও উঠ্‌ত না গড়ে, রচিত হত না পারিবারিক সম্পর্কের মাধুর্যময় আবেষ্টনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শনে মহিমময় এই বিচিত্র সভ্যতা তাহলে কি গড়ে উঠ্‌তে পারত? মানুষ যদি কোন দিন প্রজ্ঞাকে পরিত্যাগ করে' জ্ঞানকে বরণ করার মূর্খতা প্রকাশ করে, তবে সেদিন বিজ্ঞানে ও দর্শনে মহিমামণ্ডিত এই যুগযুগান্তরজয়ী মানবসভ্যতা তাসের প্রাসাদের মত ভেঙে পড়্‌বে, স্বৈরিণী প্রকৃতির অন্ধ শক্তিপুঞ্জের নিরংকুশ ধ্বংসলীলায় সেদিন মানুষের অস্তিত্ব জগৎ থেকে হবে বিলুপ্ত।

উপসংহার

বেতার ও বর্তমান জগৎ

কত অন্তহীন যুগ ধরে প্রকৃতির নিরংকুশ লালনে-তাড়নে মানুষ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। সে যুগে প্রকৃতি ছিল স্বৈরিণী—মোনালিসার হাসির মতোই ছিল সে দুর্বোধ্য। মানুষ ছিল তার যথেচ্ছ রোষ ও দাক্ষিণ্যের ক্রীড়নকমাত্র। প্রকৃতির অনন্ত রহস্যের রত্নসম্পুট, তার প্রাণস্পন্দনের মর্মবাণী ছিল অনাবিষ্কৃত—মানুষ তাই প্রকৃতির এই স্বৈরাচারের পাষাণস্তূপে সেদিন প্রমিথিয়ুসের মতোই মাথা খুঁড়ে মরেছিল। কিন্তু সে যুগ কবে গেছে কেটে! প্রকৃতির সংগে নিবিড় বন্ধন ছিন্ন করে' মানুষ আজ জ্ঞানের দীপ্তিতে দেদীপ্যমান। বিজ্ঞানীর মর্মভেদী দৃষ্টির কাছে প্রকৃতি দিয়েছে ধরা। বন্দিনী নারীর মতোই তার অফুরন্ত রহস্য ধীরে ধীরে হচ্ছে আবিষ্কৃত। স্বৈরিণী প্রকৃতি আজ বৈজ্ঞানিকের নর্মসখী।

ভূমিকা

বিদ্যুৎ আবিষ্কার বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে একটি প্রদীপ্ত কীর্তিস্তম্ভ। বন্দিনী বিদ্যুৎ তার ভ্রূবিলাসের চাতুর্য নিয়ে ধরা দিল বিজ্ঞানীর কাছে। ধরা পড়ল ঈথর ও ইলেকট্রনের চারুচরণের ছন্দ। বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স্‌ওয়েলের কাছে প্রকাশ পেল বৈদ্যুতিক তরংগের স্বরূপ। আবিষ্কৃত হ'ল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন। বিশ্ববাসী

তাই বিস্ময়ে হতবাক্। কিন্তু 'এহো নয়, আগে কহ আর'। দূরত্বের দুর্লংঘ্য বাধা যখন ঘুচ্‌ল, তখন তারের মধ্যস্থতার ব্যসন বিজ্ঞানী সইবেন কেন? শুরু হল অতন্দ্র গবেষণা। 'শব্দ' জিনিষটি ঈথরের কম্পনসমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিপুলা পৃথ্বীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এই ঈথরে সহজেই জলের তরংগের মতো বৈদ্যুত চৌম্বক তরংগ তোলা যায়। এই ঈথর-তরংগকে বিদ্যুৎ-তরংগে এবং বিদ্যুৎ-তরংগকে আবার শব্দ-তরংগে পরিণত করার প্রচেষ্টাই একদিন রূপায়িত হল বেতার-আবিষ্কারের অকল্পনীয় সাফল্যে। বেতারকেন্দ্রের প্রেরকযন্ত্র ঈথরে তরংগের সৃষ্টি করে; সেই তরংগ এসে আঘাত করে গ্রাহকযন্ত্রে সংশ্লিষ্ট 'আকাশ-তারে'। লক্ষ যোজন দূরের সংগীত-মূর্ছনা, আবেগোচ্ছল কণ্ঠস্বরের অকুণ্ঠ অর্ঘ্য এসে এমনি করেই করে আনন্দে অভিষিক্ত। ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনি এই বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কর্তা বলে পরিচিত হলেও ফ্যারাডে, ম্যাক্‌স্‌ওয়েল, হার্ডজ, ব্র্যানি, অলিভার লজ্‌, জগদীশচন্দ্র প্রমুখ জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিকগণও পথিকৃৎ পূর্বসূরী হিসাবে স্মরণীয়।

আবিষ্কারের ইতিহাস

বেতার বিজ্ঞানীর এক অভাবনীয় আবিষ্কার। অশোকবনে বন্দিনী সীতার কুশল জান্‌বার জন্য আজ্‌কের রামচন্দ্র আর অঞ্জনানন্দনকে সমুদ্রলংঘনে অনুরোধ কর্‌বে না। দূরকে করায় নিকট, পরকে করায় আপন, আনন্দের পরিবেশনে বেতারের এই তো বিস্ময়কর অবদান। বিংশ শতাব্দীর মানুষের এই জটিল সমস্যাপীড়িত, নিয়মের অক্টোপাসে নিগড়িত, কর্মক্লান্ত জীবনে বেতারের সংগীত, নাটক, নক্‌সা দেয় অমোঘ সঞ্জীবনী-পরশ। আপিস ও গৃহের অন্ধকূপে ক্ষয়িষ্ণু জীবনে বেতারের অবারিত বাতায়ন-পথে নির্ঝরিত হয় অসীমের সুরমূর্ছনা, দূরদূরান্তের সৌন্দর্যমণ্ডিত আনন্দের আলাপন আমাদের হৃদয়ের সকল দুঃখজ্বালা করে বিদূরিত, গতানুগতিক জীবনের অন্ধ আবর্তন ত্যাগ ক'রে আত্মবিস্মৃত মানুষ আত্মচেতনার পায় সন্ধান।

বেতারের প্রয়োজনীয়তা—
(১) আনন্দ-পরিবেশন

কিন্তু বেতার শুধু আনন্দেরই পরিবেশক নয়। বেতারের কল্যাণ-পরশে মানবজীবনে মংগলের পথ হয়েছে প্রশস্ত। স্বাধীন দেশে বেতার আজ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিতরণের দায়িত্ব নিয়েছে। নিরক্ষরতা দূর করতে হলে শিক্ষায় চাই বেতারের উপযোগিতা। পুঁথির শুক্‌নো পাতার অক্ষরে যে জ্ঞান মনকে পরশ করতে পারেনি, বেতারের প্রযোজনা তাকে একেবারে অন্তরে দিয়েছে গেঁথে। গণশিক্ষার এই বাহনের কল্যাণে আজ দূরদূরান্তরের মনীষীর গবেষণার ফল আমরা ঘরে বসেই জান্‌তে পারি। তাতে করে আমাদের শিক্ষা কুসংস্কার এবং একদেশদর্শিতা ত্যাগ করে লাভ করতে পারে সার্থকসুন্দর সম্পূর্ণতা।

(২) শিক্ষা ও জ্ঞানবিতরণ

দেশের কৃষক-শ্রমিক ক্ষেতে-কারখানায় কর্মরত অবস্থাতেই সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বেতারের মাধ্যমে প্রচুর জ্ঞানলাভ করতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ কৌতূহল নিরসনের জন্যে বক্তৃতা, আলোচনা, সাক্ষাৎকার-প্রসংগ বেতারে হয় সম্প্রচারিত। শিশুমহল, ছাত্রমহল, মহিলামহলের জন্যও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এমনি করে বেতারের মারফতে আকাশেই একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়ে তোলা যায়। বস্তুত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-পরিষদে বেতার-চালিত একটি আন্তর্জাতিক (আকাশ) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবও রয়েছে। তাছাড়া, বেতার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে শুধু যে জ্ঞানের রাজ্যে শক্তির বৃথা অপচয় বন্ধ হবে তাই নয়, নব নব আবিষ্কারের পথে মনীষীদের জয়যাত্রাও হবে ত্বরান্বিত।

অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেও বেতার প্রতিদিন দেশে দেশে মানবের মংগলের দ্বার উদ্ঘাটন করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তো বটেই, সাধারণ ব্যবসায়ীর স্বল্পপরিসর কর্মক্ষেত্রেও বেতার আজ মানুষের সময় ও পরিশ্রম বাঁচিয়ে দূর-বিদেশের বাজার-দরের যথার্থ সংবাদ বহন করে এনে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথ করেছে সুগম। রাষ্ট্রপরিচালনায় বেতার আজ কতখানি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে, তা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করলেই বুঝা যায়। প্রতিটি রাষ্ট্রই আজ স্বকীয় বেতারকেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছে। এই রাষ্ট্রায়ত্ত বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ভাবাদর্শ জনগণের মনে সঞ্চারিত করা হয়। জনমত সৃষ্টি করার গুরু দায়িত্ব এই সমস্ত বেতারকেন্দ্রের উপরে ন্যস্ত। অবাঞ্ছিত বিদ্রোহ অংকুরেই বিনাশ করতে এর ক্ষমতাও অবিসংবাদিত। রাষ্ট্রের জনগণকে একাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করতে, রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন অকুণ্ঠচিত্তে পালন করাতে বেতার সদাজাগ্রত। সমাজসংস্কারকার্যেও বেতার আজ অগ্রণী। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অংগে অংগে যে দুরপনেয় কলংকের স্বাক্ষর রয়েছে, তা মুছে ফেলার ব্রতও বেতার গ্রহণ করেছে। বেতার জাতিগত বর্ণগত বৈষম্য এবং দেশগত দূরত্ব বিদূরিত করে মানুষের সাথে মিলনের পথ দিয়েছে এগিয়ে। বেতারের এই সর্বতোমুখী কল্যাণ-সাধনায় বৈজ্ঞানিকের সাধনাও আজ তাই গৌরবমণ্ডিত।

(৩) অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বেতার

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ আমরা বেতারের সংগে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। বেতার নানাক্ষেত্রে বহু উপকার সাধন করে থাকলেও, বর্তমান জীবনের মর্মমূলে এর প্রতি মানুষকে আত্মনির্ভরশীলতা থেকে বঞ্চিত করেছে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি—আমাদের পরমুখাপেক্ষী চিন্তাশক্তি আলস্যময় জড়তা লাভ করেছে।

রণক্ষেত্রে বেতার হিংসার বিষবাষ্প উদ্গারণের কাজেই নিযুক্ত। যে-বেতার সমুদ্রে বিপন্ন জাহাজের যাত্রীকে জানায় আশ্বাসের সংকেত, সেই বেতারই যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষযজ্ঞের পরিবেশ রচনা করে মানুষের স্বার্থান্ধ কলহের অগ্নিতে জোগায় ইন্ধন।

বেতার-পরিচালনায় অব্যবস্থার ফল

কোন কোন দেশে আবার বেতার জনগণের স্বাধীন চিন্তার স্রোতও করেছে অবরুদ্ধ, হয়েছে জনগণের নিষ্পেষণের এবং মিথ্যা প্রচারের সুলভ বাহন। এই বেতার-পরিচালনেরই অব্যবস্থার ফলে হাল্‌কা সংগীত, কুরুচিপূর্ণ অভিনয় ও নক্‌সা জনগণের রসপিপাসা চরিতার্থ করবার প্রয়াস পায়।

আমাদের দেশ এখন স্বাধীন। বেতারের মংগলময় সম্ভাবনা যাতে বাস্তবে রূপায়িত হয়, তার জন্য দেশে বেতারকেন্দ্রের প্রসার আরো ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে সারা ভারত জুড়ে মাত্র সাতাশটি বেতার সম্প্রচার-কেন্দ্র রয়েছে। রেডিও ব্যবহারের দিক দিয়ে নিখিল বিশ্বে ভারতের স্থান তৃতীয়। ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাস অবধি সমগ্র দেশে মোট ১০৮৩২৬১টি রেডিও-লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র অনুষ্ঠানে কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতই বিপুল স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাই—বেতারের কর্মসূচী যাতে সুপরিকল্পিত হয়, বেতারের সংগে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তানায়কগণের নিবিড় সংযোগ যাতে থাকে, সেদিকে রাষ্ট্রপরিচালকগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত। বেতার যেদিন মানুষের দুর্বৃত্তির রাহুগ্রাসমুক্ত হয়ে কেবলমাত্র কর্ণেরই উপভোগের উপকরণ না হয়ে মানবের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধনে রত হবে, সবপ্রকার দূরত্ব ও ব্যবধানের অচলায়তন অপসারিত করে বিশ্বকে মহামানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত করবে, সেদিন বৈজ্ঞানিকের তপঃক্লিষ্ট সাধনা জগতে শান্তি ও মৈত্রীর মেদুর পরিমণ্ডল রচনা করে এনে দেবে অটুট প্রশান্তি, অক্ষুণ্ণ সার্থকতা।

'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও' —উপসংহার

চিত্রবাণীর ধারা ও ভবিষ্যৎ

একদা গ্যয়টে বলিয়াছিলেন, "Theatre is a crucible of civilisation" চিত্রবাণী তথা সবাক্ চিত্র সম্পর্কেও এই মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। এক হিসাবে ইহাও বলা যায় যে, চিত্রবাণী সভ্য হইয়া থাকিবার মানদণ্ড বিশেষ। তাই চিত্রবাণী প্রযোজক-পরিচালকদের হাতে রহিয়াছে বিরাট্ দায়িত্ব। চিত্রবাণীর সমস্যা ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত নয়—জাতিগত প্রশ্ন। শিক্ষার দিক, সামাজিক দিক, অর্থনৈতিক দিক, রাষ্ট্রিক দিক, ইত্যাদি সর্ব দিক

ভূমিকা

হইতেই চিত্রবাণীর রহিয়াছে বিরাট্ সম্ভাবনা। আজ দেশীয় চিত্রনির্মাতাদিগকে এই বিরাট্ জাতীয় দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

আধুনিক বিদ্যালয়ে চিত্রবাণীর স্থান এবং সম্ভাব্য দান সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। য়ুরোপ এবং আমেরিকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। জার্মানীর বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্রের ব্যবহার যত বেশী হয়, পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ। সোভিয়েট্ রাশিয়াও এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রণী। ইংলণ্ডের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান "British Film Institute" শিক্ষামূলক চিত্রের প্রচারবৃদ্ধিকল্পে সদাই সচেষ্ট। লণ্ডনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ব্যাপারে শিক্ষাদানকল্পে "London Film School" নামে একটি শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক বিদ্যালয়ে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীববিদ্যা প্রভৃতির শিক্ষা অত্যন্ত সরস ও সহজভাবে প্রদত্ত হইতে পারে। এই প্রসংগে ইংলণ্ডের "G. B. Instructional Limited"-এর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জীববিদ্যা সম্পর্কিত চলচ্চিত্রগুলির কথা স্মরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকার্যে, বিশেষত বিজ্ঞানচর্চায়, চলচ্চিত্রের স্থান অপরিমেয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও চলচ্চিত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিলাতী চলচ্চিত্রনির্মাতাগণ বৃত্তিমূলক তথা ব্যবসায়সংক্রান্ত চিত্রবাণী তুলিয়াছেন ও তুলিতেছেন। ঐ সমস্ত ছবি দেখিয়া দেশের ছাত্রেরা তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের পথ নির্ধারণ করিয়া থাকে। অথচ পাকিস্তান কেন, ভারতবর্ষেও যেখানে ১৯৫৫ সালের হিসাবে তিন সহস্রাধিক চলচ্চিত্র-প্রেক্ষাগৃহ এবং ১৯৫৬ সালের হিসাবে ২৫৫টি চলচ্চিত্রনির্মাতা কোম্পানী রহিয়াছে, সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের স্থান ও দান নাই। আমাদের সংস্কৃতি আছে—নাই শিক্ষা। আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প শুধু বিলাসের সামগ্রী, জাতিগঠনের কার্যে তাই ইহা বিমুখ। নিরক্ষতার অন্ধকারে নিমগ্ন পাক্-ভারতের বিদ্যালয়ের শিক্ষা-উপযোগী চিত্রবাণী যাহাতে নির্মিত হয় সে বিষয়ে উভয় দেশের সরকার এবং শিল্প ধুরন্ধরদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষায় চিত্রবাণীর স্থান ও দান

বাণীচিত্রের মাধ্যমে অগ্রগামী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে ব্যাপক জনশিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা হইয়াছে। সভ্যজগতে চলচ্চিত্রশিল্প জাতিগঠনের ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইতেছে। তাই দেখি,—মহাপুরুষদিগের জীবনের চিত্ররূপায়ণে বাণীচিত্রের দায়িত্ব আজ স্বীকৃত। বর্তমানে বাংলা ছায়াচিত্রে মহাপুরুষদিগের জীবন-রূপায়ণে যে প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে, তাহাকে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি যুগের সবাক্ ছবির ধারানুসরণ মনে করিলে ভুল করা হইবে। এদিক দিয়া বাংলা ছায়াচিত্রে বর্তমানে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারা চলিয়াছে। এই ধারার প্রথম রূপবাণী "স্বামিজী"। বৈচিত্র্যসন্ধানী

বাঙালী এই মহাজীবনের চিত্রটিকে 'সাদর অভ্যর্থনা' জানাইয়াছিল বলিয়াই ক্রমে ক্রমে "যুগদেবতা", "বিদ্যাসাগর," "মাইকেল মধুসূদন," "রাণী রাসমণি," "মহাকবি গিরিশচন্দ্র" প্রভৃতি বাণীচিত্র পর্দায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। একদা বাংলা ছায়াচিত্র ছিল ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের 'হলিউড'। এক্ষণে বাংলা ছবির সেই স্বর্ণযুগ অপসৃত। কিন্তু নানা সমস্যাবিধ্বস্ত আধুনিক বাংলা ছবি হিন্দী, উর্দু ও বিদেশী ছবিগুলির সহিত ঘোর প্রতিযোগিতায় যেন আর আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। হিন্দী ছবির নাচ-গান-হৈ-হল্লোড়, কুৎসিত ইংগিত, সস্তা তথাকথিত প্রেম, যৌন আবেদনের চাঞ্চল্য ইত্যাদি বাংলা ছায়াছবিতেও ধীরে ধীরে সংক্রামিত হইযাছে। এই ঘোর অধঃপতন হইতে বাংলা ছায়াছবিকে উদ্ধার করিবার জন্য বাঙালী প্রযোজকেরা 'মাদামকুরি,' 'জোয়ান্ অব আর্ক' 'এমিল জোলা,' 'রামযোশী', ইত্যাদি জীবনীচিত্রের অনুসরণে মহাজীবনের চিত্র রূপায়ণ করিয়া এক দিকে যেমন অর্থনৈতিক সংকট এড়াইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, অপর দিকে তেমনি জাতীয় গঠনমূলক কার্যে হাত দিয়াছেন। মহাপুরুষদিগের জীবন চিত্র হইতে অন্তত কিছুটা শিক্ষা আজ বাঙালী দর্শকেরা গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

মহাজীবন রূপায়ণে ভারতীয় চিত্রবাণী

বাংলার চলচ্চিত্রক্ষেত্রে কার্টুনচিত্র একরূপ নাই বলিলেই চলে। যে সমস্ত ঘটনা মানুষকে নিত্য পীড়া দেয়, তাহার মূল কারণটি সাধারণ চলচ্চিত্রের সাহায্যে দর্শকদিগকে বুঝানো কষ্টসাধ্য। কিন্তু কার্টুনছবিতে রূপকের সাহায্যে, রূপকথার ন্যায় ঘটনাজালের মধ্য দিয়া আভাসে-ইংগিতে-ব্যঞ্জনায় তাহা সহজেই বুঝাইয়া দেওয়া চলে। শ্রীভক্তরাম মিত্র "মিচ্কে পটাশ" নামে যে কার্টুনচিত্রটি তুলিয়াছেন, তাহা ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সবাক্ চলচ্চিত্র-প্রণয়নের দিকে এখনও আমাদের চিত্রনির্মাতাদিগের দৃষ্টি একরূপ পড়ে নাই বলিলেই চলে। পাক্-ভারতীয় ডকুমেণ্টারী ফিল্মের অভাব বড়ই বেশী। বাংলা দেশে এ যাবৎ সার্থক কোন ডকুমেণ্টারী ফিল্মই রচিত হয় নাই। ডকুমেণ্টারী ছবিগুলির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক—শিল্প ও সংস্কৃতি হইতে সামরিক বাহিনী ও কৃষি, হাতের কাজ হইতে বৃহৎ শিল্প, স্বাস্থ্য ও ইতিহাস, খেলাধূলা ও বিজ্ঞান, নাগরিকত্ব ও সমাজগঠনের কায সবগুলিই ইহার এলাকায় পড়ে। সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে, "বাস্তব ঘটনামূলক দেশের চিত্র"ই ডকুমেণ্টারী ফিল্ম। বোম্বাইয়ের চিত্রপরিচালক শান্তারামের "ডাক্তার কোট্‌নীস" চিত্রটি ডকুমেণ্টারী ফিল্মের পর্যায়ে পড়ে না—মূলগত ভাবেও নয়, গুণগত ভাবেও নয়।

কার্টুনচিত্র ও ডকুমেণ্টারী চিত্রের অবস্থা

দেশের উন্নতি সুখ ও সম্পদ সকলেরই কাম্য। দেশীয় জনগণ প্রমোদ আকাংক্ষা করেন সত্য, কিন্তু দেখিতে হইবে তাহা যেন সুস্থ প্রমোদ হয়। কস্তু ইহ : অতীব

দুঃখের বিষয় যে, চিত্রনির্মাতারা একটি বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য সবাক্ চিত্র প্রস্তুত করিতে গিয়া বিপথগামী হইয়া পড়িতেছেন। আদি জন্মগত পাপের কথা সকলেই অবগত—প্রকৃতিদত্ত খানিকটা যৌনাবেগ মানুষ জন্মগ্রহণ-সূত্রেই বহন করিয়া লইয়া আসে। তদুপরি আমাদের চলচ্চিত্র আবার মানুষের ঐ সহজাত প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। তাই শ্রীরাজাগোপালাচারিয়ার ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র-শিল্পে যৌন আবেদন হ্রাস করিয়া অন্যবিধ আবেদন উপস্থাপিত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভারত ও বিদেশের লক্ষ লক্ষ লোক উপভোগ করিতে পারে এমন অনেক কিছু আমোদই চিত্রবাণীর মাধ্যমে পরিবেশিত হইতে পারে।

আমাদের চিত্রাবলীর সর্বপ্রধান ত্রুটি

আজ নানাদিক দিয়া বাংলা চিত্রশিল্পের সংকট। বংগবিভাগের ফলে বাংলা ছবির বাজার আজ সংকুচিত। পশ্চিম পাকিস্তানের বাজার না পাইলেও উর্দু, হিন্দুস্থানী বা পাঞ্জাবী ছবির প্রযোজকগণ গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না সত্য, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাজার তো বাংলা ছবির প্রধান অবলম্বন। দেশবিভাগের পূর্বে বাংলা ছবিতে মোট আদায়ের শতকরা ষাট ভাগ পাওয়া যাইত কেবলমাত্র পূর্ববংগেই। কিন্তু পাকিস্তানে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাজার সংকুচিত হওয়ায় বাংলার চিত্রব্যবসায়ীরা আজ প্রকৃতই অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ পাকিস্তানে প্রদর্শিত মোট ছায়া-ছবির মধ্যে সম্ভবত শতকরা পঁচাত্তরখানিরও বেশী ভারতীয় ছবি দেখিবার চাহিদা আছে। পাকিস্তান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ফিল্ম সম্পর্কে যদি একটা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বাংলার এই চলচ্চিত্র-সংকট অতিক্রান্ত হইতে পারে। বিশেষত, বাংলার ছায়া-ছবিশিল্প যে ইহাতে রক্ষা পাইবে, একথা বলাই বাহুল্য।

দেশবিভাগের ফলে বংগীয় চিত্রবাণী-শিল্পের সংকট ও তাহার প্রতিকার

পাকিস্তান, মালয়, ইন্দো-চীন, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্ম, পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, পশ্চিম এসীয় দেশসমূহে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাজার আছে। কিন্তু নানা কারণে ইহা মোটেই আশানুরূপ নয়। তাই বোম্বাইয়ের চিত্রবাণী-প্রযোজক শ্রীআহ্লুওয়ালিয়ারের মতে, ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য তিনটি উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। প্রথমত, ভাল ছবি তুলিতে হইলে বেশী টাকার দরকার; অতএব এই শিল্পে টাকা ধার দিবার জন্য "Film Finance Corporation" চালু থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, বিদেশে ভারতীয় চিত্রবাণীর বাজার করিয়া দিবার জন্য

ভারতীয় চিত্রবাণী-শিল্পের উন্নতির উপায়

সরকারী প্রচেষ্টা কাম্য। তৃতীয়ত, ভারতে যে সমস্ত বিদেশী ছবির প্রেক্ষাগৃহ আছে, সেগুলিকে একটা নির্দিষ্টসংখ্যক ভারতীয় সবাক্ চিত্র-প্রদর্শনে বাধ্য করিবার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। এ বিষয়ে দেশীয় সরকার একটি আইন প্রণয়ন করিলে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা খানিকটা সমুন্নত হইবে। অবশ্য বাংলা চিত্রবাণীর বিপত্তি নানা দিক দিয়া পরিলক্ষিত হয়। আজ মাদ্রাজে প্রায় আটশত ভ্রাম্যমাণ ছায়াছবি প্রদর্শিত হইতেছে, অথচ বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য পশ্চিম-বংগ সরকার ভ্রাম্যমাণ চিত্রকে বিশেষ উৎসাহিত করিতেছেন না।

বর্তমানে ভারতীয় চিত্রবাণীর শিল্পগত ও কারিগরিমূলক মান বৃদ্ধিকল্পে দেশীয় সরকার যে বাৎসরিক পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসাহ। সর্বোৎকৃষ্ট ভারতীয় ফিচার ফিল্ম ও ডকুমেণ্টারী ফিল্মের জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক, সর্বশ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্রের জন্য প্রধান মন্ত্রীর স্বর্ণপদক, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট ফিচার ফিল্মের জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদকাদি প্রদত্ত হইতেছে। ইহা ছাড়া, দুইটি করিয়া ভারতীয় ফিচার ফিল্ম এবং আঞ্চলিক ভাষাসমূহের ডকুমেণ্টারী ফিল্ম, শিশু-চলচ্চিত্র ও ফিচার ফিল্মকেও ভারত সরকার অভিজ্ঞানপত্র দিতে সুরু করিয়াছেন। ১৯৫৬ সালের চলচ্চিত্র পারিতোষিক-প্রাপ্তদের তালিকায় পশ্চিম-বংগ সরকার প্রযোজিত ও শ্রীসত্যজিৎ রায় পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' সর্বোৎকৃষ্ট ভারতীয় ও আঞ্চলিক ফিচার ফিল্ম রূপে স্বীকৃত হওয়ায় রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক ও স্বর্ণপদক দুইই পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, বাংলা চলচ্চিত্র 'রাণী রাসমণি' এবং 'রাইকমল'ও সরকারী অভিজ্ঞানপত্র পাইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারব্যবস্থা ও বংগীয় চলচ্চিত্র

১৯১৩ সালে শ্রীডি. জি. ফাল্কে প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র 'হরিশ্চন্দ্র' প্রযোজনা করেন। অতঃপর ১৯৩১ সালে সবাক্ চিত্রের আবির্ভাবে চলচ্চিত্র-শিল্পের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সবাক্ চিত্রশিল্পের রৌপ্য-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহার অনুষ্ঠানসূচীতে গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রযোজিত কয়েকটি বিখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৬ সালে ভারত কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে যোগদান করে। চেকোস্লোভাক্ চলচ্চিত্র-উৎসবে 'ভারত-দর্শন' নামে রঙীন চলচ্চিত্রটি যুগ্ম দ্বিতীয় পুরস্কার পায়। ঐ বৎসরেই অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সোভিয়েট্ রাষ্ট্রে যে ভারতীয় চলচ্চিত্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে 'মির্জা গালিব', 'বিরাজ-বৌ', 'শ্রী ৪২০',

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব ও ভারতীয় চিত্রবাণী

'বারিশ', 'জাগৃতি' এবং 'মুন্না' প্রদর্শিত হয়। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লী, কলিকাতা এবং বোম্বাই নগরীত্রয়ে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট্ চলচ্চিত্র উৎসবে 'Othello, 'Twelfth Night', 'Rumvautsev's Case', 'Two Captains', 'Road to Life' এবং 'Sultauat' সবাক্ চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয়। দিল্লীতে ইউনেস্কো মরসুমে ও বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবে যে নির্বাচিত ফিচার ফিল্মসমূহ ও ডকুমেণ্টারী চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয় তাহাতে 'গৌতম বুদ্ধ' চলচ্চিত্রটিও প্রদর্শিত হয়। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবাদিতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের উৎপাদকগণ নিখিল বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। চলচ্চিত্র উৎপাদনে ও প্রদর্শনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যদি ঐ সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।

ভারত-সরকার তথা বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের অবশ্য কর্তব্য সম্পর্কে চিত্র-উৎপাদকগণ অনেক সময় গালভরা উপদেশ নির্দেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারাও যে চিত্রের উৎকর্ষের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না দিয়া নিছক পরিমাণের ও ব্যবসায়ের লাভের দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি দিতেছেন—একথাও ত অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় চিত্রবাণীশিল্প সংখ্যায় এবং পরিমাণে সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও উৎকর্ষ ও উপযোগিতার বিষয়ে আজিও রহিয়াছে অতীব পশ্চাতে। তাই ভারতীয় চলচ্চিত্রের বর্তমান ত্রুটি ও গলদ দূর করিবার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব যদি কার্যকরী হয়, তবে খুবই আশার কথা। অবশ্য এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-মেলায় বিদেশী ছবির সহিত ভারতীয় ছবির মেলামেশার ফলে ভারতবাসীদের বিদেশী ছবির প্রতি আগ্রহ যেমন দেখা দিয়াছে, তেমনি বিদেশেও ভারতীয় ছবির জন্য ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হইয়াছে। ফলে ভারতীয় ছায়াছবির বাজার যে কিছুটা সম্প্রসারিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

উপসংহার

প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

আজ যান্ত্রিক সভ্যতার বিজ্ঞানসূর্যের দীপ্তিতে সারা বিশ্ব আলোকিত। প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ প্রভৃতির তামসিকতা বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে ও অগ্রগতিতে দূরীভূত হইয়াছে এবং বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে বিজ্ঞান দান করিয়াছে তাহার সর্বব্যাপী শক্তি। তাই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে দেখা দিয়াছে স্বাচ্ছন্দ্য। কৌতূহলী মন ও সন্ধানী দৃষ্টি দিয়া মানুষ সৃষ্টির রহস্যসন্ধানে ব্যস্ত—কার্যকারণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় জানিতে রত। বিজ্ঞান দিয়াছে

সূচনা

মানুষকে বিশ্লেষণী বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ করিবার প্রবৃত্তি। দূর আজ তাহার বড়ই নিকট—প্রাকৃতিক দুর্দৈব তাহার আজ্ঞাবাহী। মানুষ বিজ্ঞানবলে আজ প্রকৃতির প্রভু। যাহার খেয়ালী শক্তিবিকাশে মানুষ নির্বাক্ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকিত, আজ সে-ই উহার নিয়ামক।

বিজ্ঞানবলে মানুষ আজ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী। জীবনযাত্রার সর্বদিকের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে বিজ্ঞান নিয়োজিত। নগরের কোন মানুষের প্রাত্যহিক কর্মতালিকা আলোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রভাতী চা-পানের সময় হইতে আফিসে গমন ও আফিস হইতে প্রত্যাবর্তন এবং রাত্রিতে নিদ্রার পূর্ব পর্যন্ত সকল বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্য দান করে এই বিজ্ঞানই। স্টোভের শব্দে নিদ্রাভংগ আর রাত্রিতে রেডিওর বিদায়ী সংগীতে নিদ্রাকর্ষণ বিজ্ঞানেরই দান। যানবাহনের স্বাচ্ছন্দ্য, চিত্তবিনোদনের উপকরণ, বিবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য, রন্ধনের সুসহায়ক উপকরণ প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের পক্ষে যাহা-কিছু প্রয়োজনীয়, তাহারই উপরে বিজ্ঞানের বিপুল হস্ত প্রসারিত। প্রখর উত্তাপ নিবারণ, বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা, শীতের প্রাবল্য দূরীকরণ, অন্ধকার হইতে মুক্তি—এসবই বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সম্পন্ন করা যায়। বিজলী পাখা, বিজলী বাতি, ট্রাম-কার, হাওয়াগাড়ি, রেলগাড়ি, অফিসের লিফ্‌ট্, গৃহের স্টোভ্, হিটার-চুল্লী প্রভৃতি সমস্তই সহজলভ্য হইয়াছে বিজ্ঞানের উন্নতিতে। বিমান উড়িয়া যায় শূন্যমার্গে যাত্রী ও সংবাদ লইয়া, সমুদ্র পাড়ি দেয় জলযান—শত শত মাইল হইতে প্রিয়জনের সংবাদ আনে টেলিগ্রাম—বেতার—টেলিভিসান। কত মনীষীর শিক্ষা উপদেশ ও বাণী রোটারি মেশিনে মুদ্রিত প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে হয় পরিবেশিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করাই শুধু নয়, দূরের খাদ্যসম্ভারও আসে ত্বরিত গতিতে দুর্ভিক্ষক্লিষ্টের মুখে হাসি ফুটাইতে। দুরারোগ্য ব্যাধিও আজ বিজ্ঞানের আশার্বাদে নিরাময় করা যায়। স্ট্রেপ্টোমাইসিন—পেনিসিলিন—আল্‌ট্রা ভাওলেট রে—এক্সরে—রেডিয়াম-থেরাপি প্রভৃতি আজ চিকিৎসাজগতে যুগান্তর আনিয়াছে। বিজ্ঞান মৃত্যুপথযাত্রীকে দান করিয়াছে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, চিত্তে তাহার জাগাইয়াছে আশা। লিখিবার লেখনী ও কাগজ, জ্ঞান আহরণের সংবাদপত্র ও পুস্তকরাজি দিয়াছে এই বিজ্ঞানই। নির্ভয়ে পথ-চলার জন্য টর্চ লাইট ইত্যাদি—সভ্য জগতে আরামময় জীবন-যাত্রার পক্ষে যাহা-কিছু প্রয়োজনীয়, সে সমস্ত কিছুই বিজ্ঞানের উন্নতির ফল। নগরে নগরে জল সরবরাহ হয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে, আলোকমালায় উহারা হয় উদ্ভাসিত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই দ্বারা কি নগরজীবন, কি পল্লীজীবন, কোনটিই আজ বিজ্ঞান-বহির্ভূত নয়।

প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী দান

বিজ্ঞান শুধু দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যই আনে নাই, মানসিক উৎকর্ষও আনিয়াছে। বুদ্ধিকেন্দ্রিক বিজ্ঞান-শিক্ষা মানুষকে করিয়াছে কর্মপটু, শৃংখলাপরায়ণ ও নিয়মানুবর্তী। প্রকৃতির রহস্য মোচন করিয়া বিজ্ঞান মানুষকে প্রকৃতির মতো নিয়মানুবর্তী করিয়াছে। সময়জ্ঞান আসিয়াছে বিজ্ঞানেরই সাধনায়। সেইজন্য ঘড়ি না হইলে আর চলে না। ফলে মানুষের অলসমন্থর দিনের হইয়াছে অবসান। প্রাচীন দৈবনির্ভর অন্ধবিশ্বাসের পাষাণভার হইতে আজ মানুষ পাইযাছে মুক্তি, প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত-কিছুকে যুক্তি দ্বারা সে আজ গ্রহণ করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষ আপনার প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্দর ও মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে আবার বিজ্ঞান বিশ্বমানবেরও মধ্যে নৈকট্য সাধন করিয়াছে।

প্রাত্যহিক কর্মজীবন ও ভাবজীবন সংগঠনে বিজ্ঞানের প্রভাব

কিন্তু বিজ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে ও জগতে বিশেষ উন্নতি সাধন করিলেও তাহা নারন্ধ্র নহে। বৈজ্ঞানিক সমুন্নতি যেমন স্বাচ্ছন্দ্য আনিয়াছে, তেমনি পৃথিবীতে দুর্গতিও কম আনে নাই। বিজ্ঞান জীবনযাত্রাকে জটিল করিয়াছে আর মানুষের চিন্তাকে করিয়াছে কুটিল। সরল বিশ্বাস আজ নির্বাসিত। আধুনিক মানুষ তাই অতৃপ্ত সন্দেহ-পরায়ণ। আন্তর বিশ্বাসের সহিত কর্মের মিলন-ব্যাপারে অসংগতি আজ প্রকট। যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্প্রাণতা মানুষের প্রাণশক্তিকে পদদলিত করিয়াছে, মানুষকে করিযাছে নিষ্ঠুর। উহা স্বার্থলোলুপ বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষকে করিয়াছে বঞ্চিত ক্রীতদাস। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা যান্ত্রিক সভ্যতারই ফল। তাহার নিষ্ঠুর কবলে কবলিত লক্ষ লক্ষ মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে রোগে শোকে অশিক্ষায় জর্জরিত, যান্ত্রিক সভ্যতা গ্রামীণ শান্তিপূর্ণ পবিত্র সভ্যতাকে করিয়াছে বিনাশ। তাহার স্থলে ধনীর বুদ্ধিবাদী প্রাণহীন সমাজের হইয়াছে প্রতিষ্ঠা। সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আজ পদদলিত। কিন্তু বিজ্ঞান কি এই দুর্দৈবের জন্য সত্যই দায়ী? গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, মানুষের অন্তরস্থিত বুভুক্ষিত হৃদয়হীন দানবই এই নিদারুণ অভিশাপের মূলীভূত কারণ।

বিজ্ঞানের অভিশাপ—উপসংহার

সাহিত্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষা

মনীষী কার্লাইল বলিয়াছেন,—'Literature is the thought of thinking souls.'—সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে চিন্তাশীল আত্মার ভাবসম্পদ। 'সাহিত্য' শব্দের

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পর্যালোচনা করিলে দেখি, অনেক মনীষীই যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল কথা হইতেছে এই যে, ভাবের জগতে মানবের সহিত মানবের মিলন ঘটানোই সাহিত্যের কাজ। আবার পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক হাক্সলে বিজ্ঞানের পরিচয় দিবার প্রসংগে বলিয়াছেন,—'Science is nothing but trained and organised sense' অতএব, 'Art and Science have their meeting point in method'—ইহা নিঃসন্দেহ।

ভূমিকা

বস্তুবিশ্বের ভাবসত্য সাহিত্যের সামগ্রী আর বস্তুসত্যের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে বিজ্ঞান। উভয়ের উৎসভূমি মূলত একই। তবে একটির কারবার আন্তর সত্যকে লইয়া এবং অপরটির বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে বাহ্য রূপকে অবলম্বন করিয়া। বস্তু-জগতের অনুরণন কবিচিত্তে আশ্রয় পায় এবং সেখানে অভিশয়িত হইয়া চেতনার রঙে রঞ্জিত হইয়া নবরূপে বিকাশ লাভ করে। সেইজন্য সাহিত্যের জগৎ সম্পূর্ণ নূতন জগৎ, নূতন সৃষ্টি। সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি প্রজাপতি 'অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ'। আর বিজ্ঞান বস্তুসত্যের বিশ্লেষণে, প্রকৃতির ঘটনাবলীর রহস্যাবরণ উন্মোচনে, কার্যকারণের তত্ত্বসন্ধানে ব্যাপৃত। অতএব, একটির সীমা ভাবজগৎ, কিন্তু অপরটির ক্ষেত্র ব্যবহারিক জগৎ। অর্থাৎ বিজ্ঞান যেখানে ক্লান্ত হইয়া সীমাকে বরণ করে, সেখান হইতেই সাহিত্য চিরপ্রশান্তির রাজ্যে যাত্রা করে।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ভিত্তিভূমি

অবশ্য ব্যবহারিক জগৎ ও ভাবজগৎ নামে দুইটি জগতের পরিপোষক রূপে বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে দেখিবার দরুণ বিশ্বরংগমঞ্চে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সংগে সাহিত্যের সায় না মেলাই স্বাভাবিক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপের এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাসে সাহিত্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার মধ্যে বিরোধও ঘটিয়াছিল। দুরন্ত প্রকৃতির অবাধ্যতাকে মানুষ যখন বশে আনিল, জলে স্থলে ও আকাশে যখন তাহার অবাধ গতিবিধির জয়ধ্বজা সে প্রোথিত করিল, অগম্য মরু উত্তুংগ পর্বতশৃংগ, অসীম অগাধ সমুদ্র যখন মানুষের পক্ষে সহজগম্য হইয়া উঠিল, ভূগর্ভের সম্পদ, অতল সমুদ্রের রত্ন ও নভোলোকের চপলা যখন মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করিবার কাজে নিযুক্ত হইল এবং দূর যখন হইল নিকট, তখন মানুষের দৃষ্টিকে, মানুষের চিন্তাকে বিজ্ঞান বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। যাহার খেয়ালের ক্রীড়নক ছিল মানুষ, তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে পাইয়া মানুষ বিজ্ঞানকে ও বিজ্ঞান-শিক্ষাকে মুক্তির দূতরূপে প্রণতি জানাইল। কিন্তু প্রাচীনকাল হইতেই সারা বিশ্ব বিজ্ঞান-শিক্ষাকে গৌণ স্থান দিয়া সাহিত্য দর্শন জ্যোতিষ প্রভৃতি শিক্ষাকেই মুখ্য স্থান দিয়া আসিয়াছে।

বিজ্ঞান-শিক্ষা ও সাহিত্য-শিক্ষার বিরোধ

নাটক, অলংকারশাস্ত্র, ব্যাকরণ, রাজনীতি, ধর্মনীতি এতদিন মানবের প্রধান সহচররূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে, মানুষের চিন্তার খোরাক জোগাইয়াছে ভাবরাশি প্রকাশের বাহন হইয়া আসিয়াছে, এবং সভ্যতাকেও উন্নতির পথে চালিত করিয়াছে। কাজেই সাহিত্য-শিক্ষা ও সাহিত্যের সমর্থকের সহিত বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকের কলহ উপস্থিত হওয়াই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু মানবকল্যাণব্রতের মহান্ সূক্ষ্মদৃষ্টি লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করিলে এবং সীমিত দৃষ্টিকে সুদূরপ্রসারী করিলে এই আপাতবিরোধের অন্তঃসারশূন্যত সহজেই উপলব্ধি করা যায়। উভয়েরই ফলশ্রুতি বা চরম লক্ষ্য মানবকল্যাণ ও নৈসর্গিক বিপর্যয়ের কবল হইতে অসহায় মানুষকে মুক্তিদান। পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে শান্ত না করিলে মানবমনের স্থৈর্য আসিবে কিরূপে? কাজেই প্রকৃতির খেয়ালকে বশে আনিয়া মানবকল্যাণে নিয়োজিত না করিলে মানবের কল্যাণ কোথায়? আবার স্থৈর্যহীন অশান্তি, ভীতচকিত অস্থিরতা মন হইতে নির্বাসিত না করিলে সাহিত্যসৃষ্টি হওয়াও তো অসম্ভব। মানুষের দেহ পাঞ্চভৌতিক আর পঞ্চসত্তার মিলনসঞ্জাত

বিজ্ঞান-শিক্ষা ও সাহিত্য-শিক্ষার ঐক্য

রৌদ্র তাপ বৃষ্টি ঝঞ্ঝা বিপর্যয় নিবারণ যেমন আবশ্যক, পঞ্চসত্তার সন্তোষ-সাধনও তেমনি অবশ্য করণীয়। বিজ্ঞান দেহকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করে আর সাহিত্য করে আত্মার বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তার পরিপুষ্টি। অতএব, মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়েরই দান অপরিসীম। উভয়ের মিলনেই পূর্ণতা, পক্ষান্তরে একের অভাবে অপরটির অপূর্ণতা। সাহিত্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার মধ্যে যে আপাতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিছক খণ্ডদৃষ্টির পরিচায়ক।

বর্তমান যুগ যান্ত্রিক যুগ, খণ্ডতন্ত্রের যুগ। অতএব, এই যুগে সারাবিশ্বের সাহিত্য চারুকলা দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষার সংগে বিজ্ঞান-শিক্ষাও সর্বজনস্বীকৃত, সর্বদেশ-গ্রাহ্য। এমন কি, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রাধান্যও পরিদৃষ্ট হয়। ইহার কারণ অতীব সুস্পষ্ট। বর্তমান যুগে ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সমধিক। প্রাত্যহিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য,

বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সমাজজীবনের বিলাসসম্ভার, রাষ্ট্রজীবনের অগ্রগতি—এ সমস্তই বিজ্ঞানের হাতে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার দূরকে করিয়াছে নিকট, অপরিচিতকে করিয়াছে পরিচিত, পরকে করিয়াছে আপন। একদিন যাহা ছিল কল্পনার সামগ্রী, আজ বিজ্ঞান তাহাকেই করিয়াছে বাস্তবায়িত। বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত বৃত্তিশিক্ষা আজ অসম্ভব, জগতের অগ্রগতির ছন্দে ছন্দ মেলানোও দুঃসাধ্য। ইহা ছাড়া, বিজ্ঞান-শিক্ষা বিকাশ করিয়াছে মানসিক বৃত্তি, বৃদ্ধি করিয়াছে পর্যবেক্ষণশক্তি, দান করিয়াছে

প্রণালীবদ্ধ সুসংবদ্ধ চিন্তাশক্তি, জাগ্রৎ করিয়াছে বিশ্লেষণী প্রবৃত্তি এবং মুক্তি দিয়াছে প্রাচীন দৈবনির্ভর সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে। ইহা বিশ্বপ্রকৃতির সমূহ কার্যের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া উহার রহস্যাবরণ উন্মোচন করিয়া মানুষকে সাহায্য করিয়াছে। এইভাবে নানা দিক দিয়া বিজ্ঞান-শিক্ষার অপরিহার্যতা অবশ্য স্বীকার্য।

কিন্তু সাহিত্য-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার্য নয়। সেইজন্য বিজ্ঞানে-অগ্রসর দেশগুলিও সাহিত্য-শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে নাই। শিশুচিত্তের উপর সাহিত্য-শিক্ষার প্রভাব অপরিসীম; সাহিত্য শিশুচিত্তের উন্মেষসাধনের সহায়ক। সেইজন্য সাহিত্য-শিক্ষা তথা প্রাথমিক শিক্ষার অপরিহার্য অংগ সাহিত্য চিত্তকে সরস করে, কল্পনাকে মুক্তিদান করে। চিন্তার উদারতা বৃদ্ধিসাধনে, সুকোমল বৃত্তির পরিপুষ্টি বর্ধনে, সাহিত্য-শিক্ষার দান সত্যই অপরিসীম। বিজ্ঞান-শিক্ষা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করে আর সাহিত্য-শিক্ষা আনে ভাবের প্রসারতা। বিজ্ঞান দূরকে দান করে নৈকট্য আর সাহিত্য করে ভাবজগতের মিলনসাধন—মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে প্রীতির রাখী দেয় বাঁধিয়া। মহামানবের মিলনযজ্ঞে বিজ্ঞান আহ্বায়ক আর সাহিত্য উহার পুরোহিত। ইহা ছাড়া, বিজ্ঞানীর আবিষ্কার সর্বজনবেদ্য করিতে সাহিত্যের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন, তাঁহার লেখার বা বলার ভংগীটি সাহিত্যই সুসংবদ্ধ সরস প্রাঞ্জল করিয়া দেয়। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জগতে ক্লান্তি আছে—আছে অতৃপ্তি; কিন্তু সাহিত্যপাঠে উহা অপনোদিত হয়। সাহিত্যের নির্মল আনন্দে মনের ক্লেদ যায় মুছিয়া, নূতন প্রেরণা হয় সঞ্চারিত। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সত্য কবিশিল্পীর বিভাবনায় বিভাবিত ও অতিশয়িত হইয়া সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠে। মানুষ অসীমের অংশ—মানবাত্মা সীমা ছাড়াইয়া অনন্তে চায় বিস্তৃতি। সেইজন্য বিজ্ঞানের সীমিত ব্যবহারিক জগতে তাহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই—বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে পূর্ণতা নাই। সত্যই সাহিত্যে কেবল মিলে ভাবের প্রসারতা—কল্পনাসমুদ্রে মানবাত্মা পায় অবাধ সন্তরণের অখণ্ড সুযোগ। বিজ্ঞানের জ্ঞান তাহার অন্তরাত্মার তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না আর সাহিত্যের সাহচর্য তাহার মনের দ্বার দেয় খুলিয়া।

সাহিত্য-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বিজ্ঞান স্থানকালের সীমায় সীমিত, কিন্তু সাহিত্য জীবনের সকল অবস্থাতেই প্রিয় সহচর। যৌবনের প্রেরণা, বার্ধক্যের সান্ত্বনা সাহিত্যেই পাওয়া যায়। সাহিত্য-পাঠ আমাদের আন্তর আকাশ উজ্জ্বল করে—শোকে আনে সান্ত্বনা—ব্যথায় দেয় শান্তির প্রলেপ। এই জন্য সাহিত্য দিবসের সহচর, যাত্রাপথের প্রিয় সংগী। জগতের মহামানবেরা বিজ্ঞানের অবাধ অগ্রগতিতে—যান্ত্রিক সভ্যতার দাম্ভিক পদক্ষেপে আজ

সাহিত্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার তুলনামূলক বিচার

শংকিত। বিজ্ঞান আজ মানবের আশীর্বাদ না অভিশাপ—এই প্রশ্নই জাগিয়াছে সারা বিশ্বমানবের মনে। বিজ্ঞান-শিক্ষার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আজও জগৎ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। কিন্তু হোমার দান্তে সেক্সপিয়ার বাল্মীকি কালিদাস রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ফলশ্রুতি লইয়া কোন প্রশ্ন নাই—কোন বিরোধও নাই। সাহিত্যের ফলশ্রুতি আনন্দে—আত্মার সীমাহীন মুক্তিতে, এই সিদ্ধান্ত করিতে কোন ভাবনাই ভাবিতে হয় নাই। বিজ্ঞানের ঐকদেশিক উৎকর্ষ যেমন ভয়াবহ, অপর দিকে কেবল ভাবের নেশায় মত্ততাও মানবকল্যাণ-বিরোধী। ভাববিলাসের উৎকটতা মানুষের বাস্তব-জ্ঞানের পরিপন্থী, অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। বিজ্ঞানের কৃত্রিমতা ও সংকীর্ণতা যেমন উন্মুক্ত প্রসারতার কণ্ঠরোধ করে, তেমনি সাহিত্যের নিছক ভাববিলাস মানুষকে যুক্তিহীন কর্মভীরু করিয়া তুলে। ব্যবহারিক দিকটির জৌলুস-মূঢ়তা আজ সাহিত্যকে পণ্যদ্রব্য করিয়া তুলিয়াছে। মনীষী Colton সাহেব সেইজন্য দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—'Literature has now become a game, in which the booksellers are the kings, the critics the knaves, the public the pack and the poor author the mere table or thing played upon.'

বিজ্ঞান ও সাহিত্য একটি অখণ্ড জ্ঞানের দুইটি অংশ

বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞানের শাখা-প্রশাখাগুলি এক অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ সেই জ্যোতির্ময়ের অংশ। একের অবাধ পরিপুষ্টিতে অপরের শীর্ণতাও তাই অপরিহার্য। বিজ্ঞানের অবাধ উৎকর্ষ জাতির অনগ্রসরতা সূচিত করে। মহামতি গ্যয়টের (Goethe) বাণী এই প্রসংগে স্মরণ করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন,—'The decline of Literature indicates the decline of the Nation. The two keep pace in their downward tendency.' কাজেই সাহিত্য উৎসারিত হয় জাতির নৈতিক ভাবতান্ত্রিক গভীরতা হইতে, অনুভূতির অতলস্পর্শী

শেষ কথা

মোটের উপর, সাহিত্য ও বিজ্ঞান—উভয়ই মানবের পূর্ণ কল্যাণের জন্য প্রয়োজন যে কোন একটির অভাবেই মানবজীবন অপূর্ণ। সাহিত্য ভাবকেন্দ্রিক আর বিজ্ঞান বুদ্ধিকেন্দ্রিক। উভয়েই মানবমনের ভিন্ন ভিন্ন দিকের পরিপূরক। মানুষকে সাহিত্য করিয়া তুলে ভাবুক চিন্তাশীল আর বিজ্ঞান করিয়া তুলে কর্মপটু বুদ্ধিবাদী। উভয়েরই মিলনসংগমে মানবের মনোজগতের পরিপুষ্টি, মানবসভ্যতার অগ্রগতি।

বন্যা

কোন্ সুদূর অতীতে অনন্ত অসীম জলের বিস্তার হইতে খেয়ালী বিধাতার এক কটাক্ষ-ইংগিতে এই সামান্য একখণ্ড ভূমির জন্ম হইয়াছিল। তাহার পর হইতে এই সামান্য ভূমিখণ্ডের উপর সমগ্র প্রকৃতি-নিয়মের আক্রমণের যেন আর শেষ নাই। 'জল, শুধু জল'—এর বিপুল সর্বব্যাপকতায়ও তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া-লওয়া এই মাটিটুকুকে আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার কতই-না চেষ্টা! ভূকম্পনে কাঁপাইয়া, অগ্ন্যুৎপাতে পুড়াইয়া, নদী-ধারায় ও বৃষ্টিজলে ধোয়াইয়া এবং বন্যায় ডুবাইয়া আমাদের এই সামান্য আশ্রয়টুকুকে লইয়া প্রকৃতিমাতার কী নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র। বিশেষত বন্যার তাণ্ডবে যখন মাঠ-ঘাট-উঠান ডুবাইয়া, বাড়িঘর ভাসাইয়া, একাকার একটি নবতর সমুদ্র কৌতুকহাস্যে মুখর হইয়া উঠে, তখন চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, এত জলেও কি তোমার তৃষ্ণা মেটে না? যে সামান্য মাটিটুকু আমাদের দিয়াছ, তোমার বিশ্বতৃষ্ণা কি তাহাকে গ্রাস করিলেই মিটিয়া যাইবে?

সূচনা

বন্যাপ্লাবিত এই বাংলাদেশের করুণ দৃশ্য কে না দেখিয়াছে। আর বন্যা-ত্রাসিত মানবের শত দুঃখলাঞ্ছনার কে না শরিক হইয়াছে? কারণ,—বন্যার সংগে এ দুর্ভাগা দেশের এক দুর্নিবার আত্মীয়তা আছে—দুর্ভাগ্যের আত্মীয়তাই বলা যাইতে পারে—বলা যাইতে পারে বান্ধব প্রেম। আমরা তাহাকে তাড়াইতে চাই, তাহার এ মৃত্যু-আলিংগন হইতে বাঁচিতে চাই, কিন্তু সে বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে, জলে একাকার শ্মশানপ্রান্তের তালগাছটিকে বহস্তভরে নাড়া দিয়া সবুজ হাওয়াবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে। পাশ দিয়া ভাঙিয়া-পড়া ইস্কুলঘরের চালা যায় ভাসিয়া—একটি অজগরশিশু ছাগল-ছানাটির পাশে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। উভয়ের চোখের ভাষায় একই আতংক শিহরিয়া ওঠে। দুই চারিটি গলিত শব স্রোতের মুখে ভাসিয়া যায়, দূরে দূরে দুই একটি বাড়ির ছাদ মানুষে-মানুষে কালো হইয়া ওঠে। শিবের মন্দিরে ত্রিশূলটায় আটকাইয়া ঝুলিতে থাকে একটি শিশুর মৃতদেহ। অশ্রান্ত বৃষ্টিতে পাশের জলাভাবগ্রস্ত ওলাউঠা-জর্জর গ্রামটি ডুবিয়া ডুবিয়া ডুকরাইয়া কাঁদে! কাছারি-বাড়ির দোতলায় আর ঘোষেদের বাড়ির অলিন্দে আশ্রিত মানুষের ক্রন্দনমিশ্রিত প্রার্থনাকল্প অভিশাপ কি দেবতাকেও স্পর্শ করে? ধানগাছের শিষগুলি যায় পচিয়া। বাড়িঘর ভাঙিয়া ডুবিয়া ভাসিয়া যায়! যাহা-কিছু সঞ্চয় খাদ্যবস্ত্র অর্থ কোথায় চলিয়া যায়! অকালমৃত্যু গ্রাস করে মানুষকে! তারপরে ধীরে ধীরে জল কমে, লক্ষ করিয়া আসে 'রিলিফ্', কলিকাতার যুবকেরা গান বাঁধে ও অর্থ সংগ্রহ করে—

বন্যার বর্ণনা ও মানুষের দুর্দশা

'বিপুল বন্যা গিয়াছে ভাসিয়া...'

ইত্যাদি! ভিজে কাদামাটিতে মানুষ আবার ঘর বাঁধে, আবার সংগ্রাম করে, আবার কোনক্রমে বাঁচিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু বারংবার মৃত্যুর সংগে পাঞ্জা কষিয়া, পরাজিত হইয়াও মানুষ দমে না, আবার সংগ্রাম করে। মৃত্যুকে জয় করিবার সাধনাই তো জীবনের সাধনা। মরিতে মরিতেও মানুষ তাই মৃত্যুকেই মারে। মানুষ প্রকৃতিকে জানিতে চেষ্টা করে, তাহার চরিত্র বুঝিয়া স্বভাবের পথেই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সাধনা করে। বিজ্ঞানাশ্রয়ী মানুষ প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়াই প্রকৃতির সংগে সংগ্রাম করে এবং জয়ী হয়।

বন্যার কারণ

কেন এই ভূকম্পন, কেন এই অগ্ন্যুৎপাত, এই বন্যা,—মানুষ ইহাদের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে। এই আবিষ্ক্রিয়ার পথেই ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, অন্য কোন পন্থা নাই। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই কারণ আবিষ্কারে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথমত, অতিবর্ষণ। অতিবর্ষণের ফলে খালপুকুর বিল ডুবিয়া যায়, নদীর গভীরতা অল্প হইলে তীর ছাপাইয়া কিংবা বাঁধ ভাঙিয়া জল লোকালয়ে প্রবেশ করে এবং গ্রাম সহর ভাসাইয়া দেয়। ১৯৫৫ সালের আসামের বন্যার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া পুণা আবহাওয়া অফিসের বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন যে, প্রবল বৃষ্টিপাতই উহার কারণ। ১৯৫৬ সালের দক্ষিণ-বংগের মেদিনীপুর অঞ্চলের প্লাবনের কারণও অতিবর্ষণ বলিয়াই মনে হয়।

—(১) অতিবর্ষণ

বন্যার দ্বিতীয় কারণটি একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। নদীর কাজ দুইটি: প্রথমত, অববাহিকায় যে বৃষ্টিপাত হয় তাহার জলরাশিকে বহন করিয়া সমুদ্রে বা হ্রদে লইয়া যাওয়া, দ্বিতীয়ত, সংগে সংগে ক্ষয়ীভূত পাথর বা মাটিও বহন করা। এই দ্বিতীয় কাজটি নির্ভর করে নদীর ঢাল ও প্রবাহিত জলের পরিমাণের উপরে। যদি কোন কারণে ঢাল বা জলের পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ পলি বা বালি নদী-গর্ভে জমিতে থাকিবে। পরবর্তী বন্যায় যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হইবে তাহার পক্ষে নদীগর্ভের ধারণ-ক্ষমতা যে অনেকখানি কম হইবে ইহাই স্বাভাবিক। কারণ ইতিমধ্যে পলি জমিয়া নদীগর্ভ উঁচু হইয়া গিয়াছে। ফলে এই অতিরিক্ত পরিমাণ জলের চাপে নদীর পাড় ভাঙিয়া যাইবে, নদী প্রশস্ততর হইবে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নদী যতই প্রশস্ত হইবে, তাহার স্রোত ততই কমিবে। স্রোত যত কমিবে, ততই পলি বেশি করিয়া জমা হইবে, নদী আরও প্রশস্ত হইবে। আবার ইহার ফলে নদী সরল-সহজ পথে না গিয়া, বাঁকা পথে প্রবাহিত হয়। এই কারণে নদীগর্ভ ক্রমশঃ উঁচু হইতে থাকে এবং বন্যার জল বাঁকা পথে যাইবার সময়ে বাধা পাওয়ায় পাড় ভাঙিয়া নদী উপত্যকায় বন্যা লইয়া আসে। এই কারণেই নদী দিক পরিবর্তন করে অনেক

—(২) নদীগর্ভের উন্নতি

সময়ে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে কুশী, তিস্তা প্রভৃতি উত্তর ভারতের নদীগুলিতে বন্যার ইহাই প্রধান কারণ। ব্রহ্মপুত্রের বন্যার কারণ কিন্তু পৃথক। ১৯৫০ সালে আসামে যে ভূমিকম্প হয়, তাহার পর হইতেই ব্রহ্মপুত্রে বন্যার প্রকোপ বাড়িয়াছে।

(৩) ভূগর্ভস্থ জলের উন্নতি

ভূপ্রকৃতিতে এই ভূ-কম্পনের ফলে এমন কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, যাহার দরুণ এই বন্যার প্রকোপ বাড়িয়াছে। অনেক ভূতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, এই কম্পনের ফলে ভূগর্ভস্থ জলের উচ্চতা বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে এই জল ভূপৃষ্ঠের মাত্র দুই ফুট নীচে থাকে। ফলে বর্ষার জল মাটিতে শুষে না, সমস্তই নদীপথে প্রবাহিত হয় ও বন্যা ঘটায়।

মানুষ বন্যার নানা কারণ আবিষ্কার করিয়াছে এবং ইহা নিবারণের নানা চেষ্টা করিতেছে। মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। চীনদেশের যে হুয়াই নদী বৎসরের পর বৎসর তাহার অববাহিকার জনসাধারণকে চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলিত, সে

নিবারণের উপায়

দেশের জনসাধারণ ও সরকারের চেষ্টা তাহার প্রকোপ অনেকটা শান্ত করিয়া আনিয়াছে। গত ১৯৫৪-৫৫ সালে এই নদীর জলবৃদ্ধির সংগে সংগে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা এর পাড়ের মাটির বাঁধ আরও উঁচু করিয়াছে। তাই কোন অঞ্চলেই বন্যার তোড় তেমন কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই। সাময়িকভাবে বাঁধ বাঁধিয়া বন্যার প্রকোপ নিবারণ করা সম্ভব এবং সম্প্রতি বিপদের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এই পন্থা অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু স্থায়ীভাবে এই সমস্যার সমাধানের দিকে আমাদের অবশ্যই অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথমত, যে সমস্ত নদীর ঢাল কম, এবং

—(১) জলাধার-নির্মাণ

নদীগুলি বেশি চওড়া, সেই সব নদীতে বাঁধের সাহায্যে বড় জলাধার প্রস্তুত করিতে হইবে। বর্ষাকালের অতিরিক্ত জল এই জলাধারগুলিকে পূর্ণ করিবে। ফলে কুশী বা তিস্তার মত নদী কতকগুলি জলাধারে পর্যবসিত হইবে এবং নদীগর্ভের ক্ষয় প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। জলাধারের জল গ্রীষ্ম-কালে বহু খালপথে ধীরে ধীরে ছাড়া হইবে আর বন্যার জল একটিমাত্র অঞ্চলে ২৪ ফুট উঁচু না হইয়া এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া ১½ ফুট উঁচু হইবে। এই জল সহজেই সেচকার্যে ব্যবহৃত হইবে। অতঃপর বন্যা তো রুদ্ধ হইবেই, কৃষিরও ঘটিবে উন্নতি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বর্ষার সব জল জলাধারে সঞ্চয় করা যাইবে না। কিছু পরিমাণ জল নদী-

—(২) গাইড্ ব্যাংক

গুলির বর্তমান খাতে প্রবাহিত হইবে। এই কারণে নদীর চওড়া খাতটি সংকীর্ণ করিতে হইবে নদীর দুই তীরে মাঝে মাঝে পরিকল্পিত উপায়ে গাইড্ ব্যাংক নির্মাণ করিয়া। ইহার ফলে নদীর পাড় ভাঙিয়া নদীর খাত চওড়া হইতে পারিবে না। তাই নদাখাতে স্রোত বেশি থাকিবে, পলিমাটিও

ধুইয়া ভাসিয়া যাইবে। ব্রহ্মপুত্রের জন্য কিন্তু অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এত বড় নদীতে বাঁধ বাঁধিবার উপযুক্ত নদী আসামে নাই। তাই ইহার ছোট ছোট উপনদীতে এমনভাবে বাঁধ দিতে হইবে যাহাতে তাহাদের জল ব্রহ্মপুত্রের গর্ভ ভর্তি করিতে না পারে। ব্রহ্মপুত্রের জল নামিয়া গেলে উপনদীগুলিতে সঞ্চিত জল ধীরে ধীরে ছাড়িতে হইবে।

—(৩) উপনদীতে ছোট ছোট বাঁধ

আমাদের জাতীয় সরকার যদি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে নদী-সংস্কারের এই ব্যবস্থাগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে অনেক দুঃখধন্দার শেষে আমাদের মুখে আবার হাসি ফুটিবে। বিপুল জলরাশির মৃত্যুর আলিংগন সেচকার্যের স্বর্ণপ্রসূতায় রূপান্তরিত হইবে। মানুষের জয় ঘটিবেই।

উপসংহার

সহশিক্ষা

ভারতীয় গণজীবনে যেদিন নবজাগৃতির জোয়ার এল এগিয়ে, ভারতের নারীও সেদিন শুনেছিল প্রগতির সামধ্বনি—অসূর্যম্পশ্যা নারী সেদিন গৃহের অন্ধকূপ ত্যাগ করে সমগ্র দেহে ও মনে চেয়েছিল আলোকের রঙীন আশীষ। কণ্ঠে বন্ধনমুক্তির উদ্দাম সংগীত হৃদয়ে পুরুষের সমানাধিকার-লাভের আকাংক্ষা—নারী সেদিন শিক্ষার দাক্ষিণ্যে নিজেকে পুরুষের সমকক্ষ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল বিশ্বের দরবারে। আর্থিক অপর্যাপ্তি ও অন্যান্য অসুবিধার ফলে নারীর দাবি চরিতার্থ হল সহশিক্ষার প্রবর্তনায়। দেশে দেশে জাগল দুরন্ত জিজ্ঞাসা। প্রাচীনে ও নবীনে বাধল সংঘাত। দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিকে চলল সমর। অন্তহীন বাক্যের ঝড় ও তর্কের ধূলির অকালবৈশাখী আকাশকে করল সমাচ্ছন্ন। কিন্তু শিক্ষার বিপুল ভোজে পুরুষের সংগে নারীর পংক্তিভোজনের অধিকার আছে কিনা—এ প্রশ্নটির মীমাংসা হল কৈ?

ভূমিকা

সহশিক্ষার প্রশ্নে দুটি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী মতবাদ গড়ে উঠেছে। সহশিক্ষার যারা বিরুদ্ধবাদী, তাঁদের মতে সহশিক্ষা অন্যত্র কিছুটা কল্যাণপ্রসূ হলেও ভারতীয় ও পাকিস্তানী সমাজসংস্থার ভিতরে এর প্রবর্তনায় অবিমিশ্র অমংগলই প্রশ্রয় পাবে। প্রথমত. ভারতীয় ও পাকিস্তানী ঐতিহ্যে সহশিক্ষার কোন নিদর্শন নেই, ভারত ও পাকিস্তানের সমাজ-ব্যবস্থা, আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ ও নারীচর্যা সহশিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই, পাশ্চাত্ত্য

বিরুদ্ধবাদীর বক্তব্য

সংস্কৃতিলালিত সহশিক্ষাকে গ্রহণ করলে ভারতীয় ও পাকিস্তানী কৃষ্টি হবে বিপর্যস্ত ও ধূলি-পংকিল—সমাজব্যবস্থায় আসবে ভাঙন। দ্বিতীয়ত, সহশিক্ষা নারীর দেহ ও মনের লাবণ্য ও মাধুরী অপহরণ করবে। লজ্জা, শীলতা, শ্রী পরিত্যাগ করে' নারী পুরুষকে সর্বক্ষেত্রে করবে অন্ধ অনুকরণ। তার ফলে নারীর নারীত্ব যাবে হারিয়ে। ধীরে ধীরে সমাজে হবে পুরুষায়িত নারীর অভ্যুদয়। সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের মাধুর্যও নিঃশেষে হবে অবলুপ্ত। তৃতীয়ত, নারী ও পুরুষের সহশিক্ষা ঘৃত ও অগ্নির সান্নিধ্যের মতোই বিপজ্জনক। নারী ও পুরুষের অকালে এই অবাধ সান্নিধ্য নৈতিক চরিত্রকে করবে কলুষিত, সমগ্র জাতির নৈতিক অধঃপতনের পথ এতে করে' প্রশস্তই হবে। চতুর্থত, জীবনে ও সমাজে নারী ও পুরুষের কর্তব্যের ক্ষেত্র বিভিন্ন। মাতৃচর্যাই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। তাছাড়া নারীর জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সংগীত, রন্ধন ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কাজেই কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন বলেই সহশিক্ষার দ্বারা নারীর শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে পারে না। তা ছাড়া, সহশিক্ষা পাশ্চাত্ত্য দেশেও যে খুব সমাদৃত হচ্ছে তা নয়। ব্রিটেনে শুধু অল্পবয়স্ক শিশুদেরই সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েট্ রাশ্যা প্রায় কুড়ি বছর ধরে সহশিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে সিদ্ধান্ত করেছে যে, পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন বলে সহশিক্ষার প্রথা বিলোপ করাই বাঞ্ছনীয়।

সহশিক্ষার সমর্থকদের মতে, বিরুদ্ধবাদিগণের যুক্তি কূপমণ্ডূকতা ও কুসংস্কারের দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন তো নয়ই, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক। যেখানে বিভিন্নতা রয়েছে, সেখানেও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। কাজেই কর্মক্ষেত্রের নিগূঢ় ঐক্যের দিক থেকে বিচার করলে সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। সহশিক্ষা পাকিস্তানের দিক থেকে না হলেও ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়। কারণ,—প্রাচীন ভারতে সহশিক্ষার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়—ভবভূতির উত্তররামচরিতে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। মধ্যযুগীয় পর্দাপ্রথাই নারীকে সহশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে। সহশিক্ষা যথার্থভাবে প্রবর্তিত হলে দেশের বা জাতির কোন অমংগলেরই আশংকা নেই; বরং তার ফলে কল্যাণের পথই হবে প্রশস্ত। যৌনচেতনায় রহস্যের আকর্ষণই সব চেয়ে বেশী প্রবল। সহশিক্ষার গুণে অর্থাৎ পরস্পরের সান্নিধ্য-ফলে রহস্যের কুজ্ঝটিকা হবে বিদূরিত; যৌনসম্পর্ক হবে সুস্থ ও কলুষবর্জিত, যৌনবিকৃতির সম্ভাবনাও যাবে কেটে। কাজেই, সহশিক্ষা নৈতিক উন্নতিরই পোষক। তা ছাড়া সহশিক্ষার পরিবেশে মানুষ হয়ে উঠলে

সমর্থনকারীর বক্তব্য

সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সর্ববিধ ক্ষেত্রে নারী ও নর উভয়ে পরস্পরের মধ্যে স্বচ্ছন্দ সহজ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তাতে করে সমাজ ও রাষ্ট্রের মংগল ছাড়া অমংগলের কোন আশংকা নেই।

অবশ্য একটি দল মধ্যপন্থা অবলম্বন করে' উভয় মতবাদের সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু একেবারে আদি থেকে নিরবচ্ছিন্ন অন্ত অবধি নয়, মাঝে ছেদ প্রয়োজন।

সমন্বয়বাদীর বক্তব্য

বুনিয়াদী ক্ষেত্রে ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষা-ব্যাপারে সহশিক্ষা পরিত্যাজ্য। বুনিয়াদী ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও নরের শিক্ষাতালিকায় কোন পার্থক্যের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষা-ব্যাপারে উভয়েরই স্বকীয় প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষা আবশ্যক বলেই সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় নয়। ব্রিটেনে সাধারণত এই নীতিই অনুসৃত হয়ে থাকে। মনোবৈজ্ঞানিকগণের মতেও এই ব্যবস্থাই নিরাপদ ও কল্যাণপ্রসূ।

স্ত্রী ও পুরুষ সমাজেরই দুইটি অংগ এবং একে অন্যের পরিপূরক। কিন্তু প্রকৃতির অনুশাসনকে উপেক্ষা করে' নারী যদি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যদি জীবিকা-সংস্থানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে পুরুষেরই সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়, এবং সমাজ ও রাষ্ট্র এই প্রচেষ্টাকেই জানায় অকুণ্ঠ 'স্বাগতম্,' তাহলে শিক্ষার প্রতি ক্ষেত্রেই সহশিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কর্মক্ষেত্রে নারীকে যদি পুরুষের অবাধ সান্নিধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে হয়, তাহলে পৃথক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু রাখার কোন যুক্তিই থাকে না।

উপসংহার

কারণ,—সমগ্র শিক্ষায় আত্মপ্রতিষ্ঠ মানব হতে হলে যেমন নারীর, তেমনি নরেরও, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা উপেক্ষা করলে চলে না। বুনিয়াদী ও স্নাতকোত্তর ক্ষেত্রে সহশিক্ষা এবং অন্যত্র পৃথক্ শিক্ষা-ব্যবস্থা নৈতিক অবনতিরই কারণ। যৌনচেতনা যে বয়সে জাগ্রত হয়, সেই বয়সে হঠাৎ পরস্পরকে পৃথক করে দিলে অবদমনের ফলে নানাপ্রকার যৌনবিকৃতিও দেখা দিতে পারে। বরং গোড়া থেকেই অনবচ্ছিন্ন ভাবে যদি পরস্পর পরস্পরের অবাধ সান্নিধ্যে বড় হয়ে ওঠে, তাহলে রহস্যবোধ বিদূরিত হয়, যৌনসম্পর্ক হয় সহজ ও স্বচ্ছন্দ। কাজেই আমরা বিবেচনা করি, সর্বক্ষেত্রেই নারীর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার দাবি যদি একান্ত ভাবেই মেনে নিতে হয়, তাহলে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত শিক্ষার প্রতিটি স্তরে সহশিক্ষাই তো বাঞ্ছনীয়।

আবশ্যিক সামরিক শিক্ষা

শুধু দৈহিক উৎকর্ষ যেমন মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়, তেমনি দেহকে কৃশ নিষ্পিষ্ট করে শুধু মানসশক্তির চর্চাতেও নেই কোন কৃতিত্ব। দেহ আর মন নিয়েই গোটা মানুষটি। তাই মানুষের সর্বাংগীণ উন্নতি দৈহিক উৎকর্ষকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। এই জন্যেই সংস্কৃতশাস্ত্রে বলা হয়েছে—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'। কাজেই প্রতিটি মানুষের শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেহচর্চার প্রযোজন তো আছেই। কিন্তু বর্তমান যুগ হিংসার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন। কথায় কথায় ক্ষণে ক্ষণে যুদ্ধের দামামা উঠ্‌ছে বেজে—অতর্কিতে বোমারু বিমান এসে হানা দেয় পল্লীর নিভৃত শান্তির নীড়ে। তাই আজ সামরিক শিক্ষাকে আবশ্যিক ভাবে প্রতিটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করার উঠেছে দাবি।

ভূমিকা

কোন দেশেরই জনসাধারণ যুদ্ধ চায় না, যুদ্ধ কখনও কোন দেশের গৌরব বাড়ায় না। তবু সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিকের ষড়যন্ত্রে পররাজ্যলোভী হিট্‌লারদের প্ররোচনায় যুদ্ধের বিষাণবাদ্য আকাশ-বাতাস তোলে কাঁপিয়ে। হিংসা ও পশুশক্তির আবাহনের চেয়ে অহিংসার পূজারী হওযা—আদর্শের দিক থেকে অনেক মহান্ সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশরক্ষার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য পশুশক্তির আস্ফালন যখন অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তখন সেই জীবনের বাস্তব ভয়াল রূপকে অস্বীকার করে' উটপাখির মতো অন্ধভাবে আদর্শের ধ্বজা ধারণ করে' থাকলে ক্ষতি ছাড়া লাভ তো কিছুই হয় না। তাই যুদ্ধ আবশ্যক বা অনাবশ্যক দুস্কৃতি। সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা জাতীয় জীবনে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু আজ্‌কের যুদ্ধের রীতি-নীতি গেছে সম্পূর্ণ বদ্‌লে'। বর্তমানকার সর্বাত্মক সর্বগ্রাসী যুদ্ধে সামরিক ও অসামরিক জনগণের ভেদরেখাটি যায় উবে। এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধে আত্মরক্ষা ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে সমগ্র শক্তিকে সমরানলে দিতে হয় আহুতি। অথচ রীতিমত শিক্ষিত সৈনিকবৃত্তিধারী লোক কোন দেশেই বেশী থাকতে পারে না। কারণ,—তাতে করে সরকারের প্রচুর অর্থ প্রতিরক্ষা-খাতেই বরাবর ব্যয় কর্‌তে হয়—যে কোন সমৃদ্ধিশালী দেশেরই অর্থনৈতিক অবস্থার পক্ষে এটা অসম্ভব। বিশেষত, ভারতবিভাগের ফলে দরিদ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের বিপুল সীমান্তরক্ষার ব্যাপারে বিরাট্ সৈন্যবাহিনীর দরকার। এর জন্য অজস্র অর্থব্যয় করে' নিয়মিত সৈন্যবাহিনী প্রতিপালন করা সত্যি সম্ভব নয়। তাই কথা উঠেছে আবশ্যিক সামরিক শিক্ষার। ইস্কুলে বা কলেজে শিক্ষালাভ করার সময়ে যদি যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে করে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আক্রমণ থেকে

আবশ্যিক সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে এই সমস্ত যুবক কোন প্রস্তুতি ছাড়াই সৈনিকদের কার্য গ্রহণ করতে পারে। এই বিবেচনায় পাশ্চাত্ত্যের বহু দেশে সামরিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে এবং কোন কোন দেশে এটা বাধ্যতামূলক ভাবেই প্রবর্তিত হয়েছে। Camp life তথা শিবির জীবন পাশ্চাত্ত্য ছাত্রজীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অখণ্ড ভারতে ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনী আইন পাশ হয়। অতঃপর ভারতের কয়েকটি প্রদেশে ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনী চারটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে গঠিত হয়। ঐ চারটি বিভাগের প্রথমটি প্রাদেশিক বাহিনী, দ্বিতীয়টি নাগরিক বাহিনী, তৃতীয়টি চিকিৎসাবাহিনী এবং চতুর্থটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবাহিনী। শেষোক্ত বিভাগই University Training Corps নামে সুবিদিত—বিভিন্ন ইস্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গড়া। বর্তমানে প্রথম তিনটি বাহিনীই আঞ্চলিক বাহিনীর মধ্যে পুনর্গঠিত হয়ে চতুর্থ বিভাগটি পৃথক্ ভাবে জাতীয় শিক্ষার্থী দলরূপে গঠিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালের শেষাশেষি এই দলের সিনিয়র বিভাগে ৯৭৭ জন অফিসার ও ৪৫৬৮৮ জন শিক্ষার্থী, জুনিয়র বিভাগে ১৫০৫ জন অফিসার ও ৫৩৭৪৭ জন শিক্ষার্থী এবং বালিকা বিভাগে ২৫৩ জন অফিসার ও ৭৬৩৭ জন শিক্ষার্থিনী—একুনে ১০৯৮০৭ জন ছিল। জাতীয় শিক্ষার্থী দলের আকাশবাহিনীতে এক্ষণে বারোটি স্কোয়াড্রন আছে। এই সামরিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীগণ নিয়মানুবর্তিতা শিখে নেতৃত্বের গুণাবলী অনুশীলন করতে সক্ষম হয়—ফলে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার সুযোগ পায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রথম সামরিক শিক্ষা এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবাহিনী থেকেই পান।

শুধু পুরুষেরই নয়, নারীরও সামরিক শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে নারী ছিলেন পুরুষের সমকক্ষ—পুরুষেরই মতো যুদ্ধবিদ্যা রাজনীতি ও সমাজনীতিতে শিক্ষিতা। ভারতে মুসলমান রাজত্বের আমলেও নারী ছিলেন যুদ্ধবিদ্যানিপুণা। দুর্গাবাঈ, চাঁদ বিবি, রিজিয়া, ঝাঁন্সার রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এই সেদিনও তো নেতাজী 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজে'র মধ্যে নারীবাহিনী গড়ে তুলেছেন। দেশের মানসম্ভ্রম স্বাধীনতা-প্রতিপত্তি বজায় রাখ্‌তে গেলে পুরুষের সামরিক শিক্ষার মূল্যের চেয়ে নারীর সামরিক শিক্ষার মূল্য আদৌ কম নয়। প্রাচীন কালে নারীর সামরিক শক্তি কতবার দেশের মানমর্যাদা রক্ষা করেছে। আর এই বর্তমান কালে সারা দুনিয়ায় যেভাবে সাম্রাজ্যবাদীর মুখব্যাদান বিরাট্ থেকে বিরাটতরের দিকে এগিয়ে চলেছে, তাতে করে স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব বজায় রাখ্‌তে হলে পুরুষের ন্যায় নারীকেও সামরিক শিক্ষা দেওয়া সমীচীন। অবশ্য সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে নারীকে সংসার ভুলতে হবে, এমন কোন কথা নাই।

নারীর সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

অনেকে বলেন, সামরিক শিক্ষাকে আবশ্যিক ভাবে প্রবর্তন করা মানে যন্ত্রসভ্যতার জয়গান করা। এক একজন মানুষের প্রতিভা এক একটি বিচ্ছিন্ন খাতে হয় প্রবাহিত। কাজেই স্বাভাবিক প্রবণতা বা রুচির উপরে চাপ না দিয়ে রাষ্ট্র যদি সকলকেই সৈনিক করে তুল্‌তে চান, তাহলে প্রতিভার হবে অপমৃত্যু। হিংসার বিষবাষ্পে জগৎ হবে পরিব্যাপ্ত। অন্তত ভারতের প্রাচীন আদর্শ এই আবশ্যিক সামরিক শিক্ষাকে আদৌ 'স্বাগতম্‌' জানাতে পারে না। কিন্তু এঁদের মত সমর্থনযোগ্য নয়। সামরিক শিক্ষা বল্‌তে এখানে পূর্ণাংগ সমরনৈপুণ্যলাভের শিক্ষা বুঝায় না। বন্দুক ধরতে ও গুলি ছুঁড়্‌তে শেখা, মিলিটারী কুচকাওয়াজ ও নিয়মশৃংখলা, মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে শেখা—মোটামুটি ভাবে এইগুলিই সামরিক শিক্ষার উদ্দিষ্ট। এই শিক্ষালাভ করতে বড় জোর ছ' মাস সময়ের প্রয়োজন। এতে করে প্রতিভার অপমৃত্যু তো হবেই না, বরং সুদীর্ঘ ছাত্রজীবনের প্রান্তে এসে পাওয়া যাবে একটু নূতনত্বের আস্বাদ। যত-কিছু মানসিক গ্লানি এই দৈহিক কর্ষণা ও নিয়মনিষ্ঠার ভিতর দিয়ে একেবারেই যাবে মুছে।

বিরুদ্ধ মত ও উহার খণ্ডন

বর্তমান জগতের রণমুখর পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে একথা নিঃসংশয়েই বলা যেতে পারে যে, সামরিক শিক্ষা আবশ্যিক ভাবে আমাদের দেশে শীঘ্রই প্রবর্তিত হওয়া উচিত। এখানে ন্যায় বা অহিংসা বা ঐতিহ্যের প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। আপদ্‌ধর্ম কোন নিয়ম স্বীকার করে না। সে নিজের প্রয়োজন-অনুসারে চলার-পথ তৈয়ের করে নেয়। কাজেই বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে এই আপদ্‌ধর্ম হেয় নয়, বরং বরণীয়ই। শুধু দেহচর্চা করে' সর্বাংগীণ মনুষ্যত্ব-বিকাশের আশ্বাস এখানে অর্থহীন—নিছক জীবনমরণের প্রশ্নই এখানে মুখ্য প্রশ্ন।

ংহার

স্বাধীন পাক্‌-ভারতে ইংরাজি ভাষার স্থান

ইংরাজপ্রভু ভারত ও পাকিস্তান থেকে হয়েছে অপসারিত। পরবশতার নাগপাশ ছিন্ন করে' পাক্‌-ভারত আজ তাই আত্মপ্রতিষ্ঠ। 'অখণ্ড জ্যোতি'র অনলস সাধনায় ভারত ও পাকিস্তান আজ সকল গ্লানি ও জড়তা জীবন থেকে নির্বাসিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে ইংরাজি ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে। যাদের ভাষা, তারাই যখন দূর সাগর-পারে হল অপসারিত, তখন সেই ভাষার উদ্দেশে অর্ঘ্যরচনা করা কি অযৌক্তিক নয়? ইংরাজি ভাষাকে যদি আজ তার গৌরবসিংহাসন থেকে চ্যুত না করা হয়, তবে কি এই কথাটিই প্রতিপন্ন হবে না যে, আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রজীবনে

ভূমিকা

স্বাধীনতা পেয়েছি বটে, কিন্তু মানস-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের পরবশতার অমানিশা এখনও পোহায় নি!

একদিন ইংরাজি ভাষা ছিল আমাদেব জাতীয় জীবনের পরশমণি। ইংরাজি ভাষার কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হলে জীবনের ক্ষেত্রেও দেখা দিত বঞ্চনা ও ব্যর্থতা। সেদিন ইংরাজি ছিল ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম। কি চাকুরীর ক্ষেত্রে, কি ব্যবসায়ে, কি শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজি ভাষা সেদিন বিশ্বরূপ নিয়ে সমগ্র শিক্ষিত সমাজের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় নিজের অক্ষয় অধিকার করেছিল প্রতিষ্ঠা। সেদিন কেন, আজও ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত না হলে সমাজে হতে হয় অপাংক্তেয়। আমাদের এই ইংবাজি ভাষা-প্রীতি একটা আকস্মিক বা অহেতুক ব্যাপার নয়। এর মূলে রয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে ঐ বিদেশী ভাষার বিরাট্ অবদান। ইংবাজি ভাষার সম্পর্ক থেকে ভাবত ও পাকিস্তান যদি বঞ্চিতই হত, তাহলে এই উভয় রাজ্যের গ্রামীণ কৃষিসভ্যতার গো-শকট যুগযুগান্তর ধবে' সেই পুরোণো প্রাণহীন পণ্যেরই হাট বসত জমিয়ে। জাতীয জীবনের এই প্রাণচাঞ্চল্য, এই নবজাগৃতি হত যে অসম্ভব! পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাব যোগ্যতম বাহন ইংরাজি ভাষার সংস্পর্শ লাভ করেছি বলেই-না আমাদের জীবনেব অন্ধতমিস্রার ঘোর গেছে কেটে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিচিত্র উপচাবে আমাদের আঙিনা উঠেছে ভরে। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার ধারা ইংবাজি ভাষাব পথেই আমাদেব মরুধূসব জীবনকে করেছে সবস ও সার্থক, সকল কুসংস্কাব ও অজ্ঞতাব স্তূপীকৃত বোঝা অপসারিত কবে' জীবনকে করেছে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও গণ-স্বাধীনতাব মন্ত্র ইংবাজি ভাষাব ছন্দেই আমাদেব কর্ণে করেছে প্রবেশ। তাইতো ভারত ও পাকিস্তান আজ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও ভাবধারায় সমৃদ্ধ হবে বহুদিন পবে আবাব নিজেব স্বাধীনতা আহরণ করতে সমর্থ হয়েছে। স্বাধীন পাক্-ভাবতে ইংবাজি ভাষাব স্থান নির্ধাবণ-প্রসংগে এব বিরাট্ অবদানের কথা সত্যই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মবণ কবতে হয়।

ইংরাজি ভাষার বিরাট্ অবদান

ইংরাজি ভাষাব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক দল যেমন কৃতজ্ঞতাব ভাবে একেবারেই নতজানু, আবাব অন্য দলও তেমনি ইংরাজের বিরুদ্ধে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র ইংরাজি ভাষার উপরেও ব্যবহাব করতে দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু কৃতজ্ঞতা বা ঊষ্মা কোনটাই তো প্রকৃত পথের নির্দেশ দেয় না। যুগে যুগে প্রতিটি বস্তুর অর্থ যায় বদলে'। বর্তমান যুগের প্রয়োজনের মানদণ্ডেই বিচাব করতে হবে ইংবাজি ভাষার ভবিষ্যৎ। নতুবা কৃতজ্ঞতামণ্ডিত শবকে আরাধনা করে' বা পূর্ববৈরবশে স্বচ্ছন্দ প্রাণপ্রবাহকে অবরুদ্ধ কবে' মংগল হবে না নিশ্চয়ই।

একদেশদর্শী মতবাদ

স্বাধীন পাক্-ভারতে ইংরাজি ভাষার আর পূর্বের ন্যায় মর্যাদা থাকবে না, এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। আমাদের নিজস্ব ভাষাগুলোকেই ইংরাজি, ফরাসী, জার্মান ও রুশ ভাষার ন্যায় সর্বাত্মক জ্ঞানবিজ্ঞানে ঐশ্বর্যশালিনী করে তুলতে হবে আবার প্রত্যেকটি প্রদেশের শিক্ষাও ঐ প্রদেশেরই ভাষায় দিতে হবে। কিন্তু পাক্-ভারতের প্রতিটি ভাষাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্বয়ংপূর্ণ করে তোলা তো আর সহজ কর্ম নয়। উভয় রাজ্যেরই বড় বড় মনীষী এ সম্বন্ধে নিজেদের মতামতও ব্যক্ত করেছেন। ভারত-ব্যাপারে গান্ধীজীর মতে, ইংরাজি ভাষার প্রসার অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়, জনাব আবুল কালাম আজাদ আশা পোষণ করেন যে, আগামী দশ বছরের ভিতরেই ইংরাজি ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় দিতে পারা যাবে, ভারতের খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রথম পাঁচ বছরের জন্য ইংরাজি ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল; বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে কোন যুক্তিই নেই। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলো যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়নি বলে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে আগামী কয়েক বছর ইংরাজিরই মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। কিন্তু প্রাদেশিক ভাষাগুলোর উন্নতি হলেই ইংরাজির প্রয়োজন যাবে চলে। সত্যি কথা বলতে কি, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে যতদিন না হিন্দুস্থানী ভাষা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রচালনার ক্ষেত্রে যতদিন না উর্দু-বাংলা ভাষা প্রকৃত রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করছে, ততদিন ইংরাজিকে রাষ্ট্রজীবন থেকে নির্বাসন দেওয়া অসম্ভব। শ্রী কে. এম্. মুন্সী 'ভারতীয় হিন্দী পরিষদে'র একাদশ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে বলেছেন, অত্যন্ত জেদের বশবর্তী হয়ে ইংরাজি ভাষা বর্জনের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলে হিন্দী ভাষার লাভ তো হবেই না, পরন্তু ক্ষতি সুনিশ্চিত। ইংরাজি ভাষা বর্জনের ফলে জাতীয়তাবোধ অন্তর্নিহিত হবে, আঞ্চলিক মনোভাব জাগবে আর ভাষার ভিত্তিতে ভারত বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তাই তাঁর মতে, দ্রুত ইংরাজি ভাষাবর্জনের কথা অতীব ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। স্বাজাত্যকরণের মত্ততায় বিভ্রান্ত হয়ে আমরা যদি এখুনি ইংরাজি ভাষাকে হটিয়ে দিতে যাই, তাহলে আমাদের শিক্ষার অগ্রগতি হবে প্রতিহত। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের বিদ্বৎ-সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিটি প্রদেশের নিজস্ব ভাষায় যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বই রচিত ও প্রকাশিত না হওয়া অবধি পুরোনো ব্যবস্থার নড়চড় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার ফল আহরণ করে ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে হলে সার্বভৌম ভাষা ইংরাজির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না। আবার আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের একটি অন্যতম বাহন হিসেবে ইংরাজি ভাষার সাহায্য গ্রহণ সত্যই লাভ-

প্রকৃত অবস্থা

জনক। বাংলা, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি কোন ভাষা দিয়েই একাজ হবে না। এমন কি, হিন্দী এবং উর্দুও বিন্দুমাত্র সহায়ক হবে না। তাই বৃহত্তর জগৎ ও সর্বজাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের নিমিত্ত দেশেবিদেশে আনাগোনা ও আদানপ্রদানের নিমিত্ত ইংরাজি এখনও আমাদের বহু দিবস শিখ্‌তে হবে। কাজেই প্রত্যেক প্রদেশে মাতৃভাষা ব্যতিরেকে অপর ভাষা ইংরাজি শিক্ষাই সবচেয়ে লাভজনক। এতে করে সর্ব-পাক-ভারতীয় ও সর্বজাতিক প্রয়োজন অনায়াসেই নির্বাহিত হবে। কিন্তু ঐ অজুহাতে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সমর্থন করা যায় কি ?

সত্যি কথা বলতে কি, সব দিক থেকে বিচার করে মনে হয়, ইংরাজি ভাষাকে ভারত ও পাকিস্তানের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে তো বটেই, রাষ্ট্রক্ষেত্র এবং ব্যবসায়ক্ষেত্র থেকেও দ্রুত অপসারিত করা বাঞ্ছনীয়। তাহলে স্বাধীন রাজ্যদ্বয়ের বালক-বালিকা সহজেই মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে পারবে এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষায় যে অনাবশ্যক শক্তির অপচয় হয়, তাও হবে বন্ধ। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের জন্যই ইংরাজি ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইংরাজ একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হওয়ায় ইংরাজি ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কাজেই, বিশেষজ্ঞদেরও হয়তো-বা আন্তর্জাতিক জ্ঞান আহরণের জন্য ইংরাজি ভাষাকে ত্যাগ করে অন্য ভাষার শরণ নিতেও হতে পারে। সে যাই হোক, যতদিন না ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, ততদিন ইংরাজির আসন যে এই স্বাধীন রাষ্ট্রদ্বয়ে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে থাকবে, এ কথা নিঃসন্দেহ।

উপসংহার

রাত্রি

ভাবিতে অবাক লাগে যে, যে-মানুষ পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়াছিল, তাহার জীবনের প্রায় পঁচিশ বৎসরই তাহার নিজের অধিকারে ছিল না। অর্থাৎ ঐ সময় সে ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে। রাত্রি তাহার রহস্যময় কৃষ্ণ যবনিকা দিয়া ঐ সময়কে তাহার দিনের কর্মময় ও ব্যক্তিত্বোজ্জ্বল অংশ হইতে পৃথক করিয়া লইয়াছে। জীবনের অর্ধাংশ রাত্রিকে বাদ দিয়া তাই মানুষের পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। দিবসের শত সহস্র কর্মে যে স্বৈরাচারী ডিক্টেটর জাতির জীবনে বিভীষিকার মত প্রতীয়মান, রাত্রে তাহাকে যখন নিদ্রিত অবস্থায় দেখা যায় "With his eyes shut, his mouth open, his left hand under his right ear, his other twisted and hanging helplessly before him like an idiot's"...(—Leigh Hunt), তখন সমগ্র ব্যক্তিটির পরিপূর্ণ ছবি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

মানবজীবনে রাত্রির গুরুত্ব

দিন ও রাত্রি যে একটি সত্যেরই দুইটি দিক মাত্র, তাহা ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতেও নিহিত রহিয়াছে। গ্রহমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহগুলির ন্যায় পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর পাক খাইতে খাইতে সূর্যকে বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসিতেছে। বিধির এমনই বিধান যে, জন্মলগ্ন হইতে আজকাল এবং আগামী শত কোটি বৎসর ধরিয়া এই পাক-খাওয়ার আর বিরাম নাই, বিরামের সম্ভাবনাও নাই। ইহারই ফলে পৃথিবী ঋতুর নব নব সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে এবং অপর দিকে দিনের অবসানে রাত্রি এবং রাত্রির অবসানে দিনের আবির্ভাব ঘটিতেছে।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে রাত্রি

কবিরা একথা বুদ্ধিতে মানিলেও অনুভূতিতে মানিবেন না। ঋতু-পরিবর্তন যে কেবল বৈজ্ঞানিক তথ্যমাত্র, দিবারাত্রের পশ্চাতে পৃথিবীর পাক-খাওয়াই যে একমাত্র সত্য, ইহা তাঁহারা তর্কে না ছাড়িলে স্বীকার করিবেন না, এবং একবার স্বীকার করিলেও পরমুহূর্তে ছন্দে-ভাষায় এমন ঝংকার তুলিবেন, এমন ছবি আঁকিবেন, এমন অচিন্ত্যপূর্ব তাৎপর্য আবিষ্কার করিবেন, যাহা বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতদের যুক্তিতর্ককে নিরস্ত করিয়া দিবে। রাত্রির অন্ধকার কবি-চিত্তে এক রহস্যময় অজানার দ্যোতনা আনে। যাহাকে পরিষ্কার জানি না, যে রাজ্যে বুদ্ধির প্রত্যক্ষতা নাই সেইখানেই তো কল্পনার খেলা,—সেই তো রোমান্সের রাজ্য। শরৎচন্দ্র তাই অন্ধকারেরও রূপ দেখিতে পান। তাঁহার মনে হয়, "....অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে।" রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রাত্রি দেখা দিয়াছে এক রূপবতীর সৌন্দর্য লইয়া। মানুষের ইন্দ্রিয় যাহার নাগাল পায় না সে-ই তো রূপাতীত। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে বার বার আঁধার রাতেই দুঃখরাতের রাজা দেন দেখা। শক্তিসাধকের নিকটে রাত্রির রহস্যময়ী বিভীষিকামূর্তি ধরিত্রীর রুদ্রমূর্তির রূপক-রূপেই দেখা দেয়। শক্তিরূপা রাত্রির নিকট হইতে তাঁহারা শক্তি যাচ্ঞা করেন তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন প্রণালীতে।

কবির দৃষ্টিতে রাত্রি —শক্তিরূপা রাত্রি

কিন্তু কবিকল্পনা, দর্শন বা বিজ্ঞানের দৃষ্টি ব্যতীতই রাত্রির স্বাভাবিক রূপ কতই-না চিত্ত-চমৎকারা! পাখিরা ফেরে নীড়ে। নারিকেল পাতাগুলি মৃদু হাওয়ায় দোলে। নৌকায় জ্বলে আলো, নদীর জলে তাহার ছায়া খান্ খান্ হইয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায় ছড়াইয়া। বাঁশের পাতার ফাঁক হইতে আধখানা চাঁদ মারে উঁকি। রাত্রিও বাড়ে। কর্মক্লান্ত মানুষ শয্যায় আরামের আশায় উৎফুল্ল হয়। দিবসের সকল গ্লানি হরণ করিয়া লইয়া যায় নিদ্রা। চিন্তার হাত হইতে কিছুক্ষণের

রাত্রির আবির্ভাব নিদ্রিতের আরাম

জন্য মুক্তি পায় মানুষ। ঝিঁ ঝিঁ পোকা একটানা সুরে ডাকিয়া চলে। রাত্রির নীরব কণ্ঠে যেন রব উঠে—"শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!'

কিন্তু চোখে নিদ্রা নাই অনেকের। পরীক্ষার ছাত্র পাশের পড়া করে। সদ্য সন্তানহারা জননী একটা অসহ্য বেদনায় ভূমি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ভিখারী বালকটি কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না। আর ফাঁসীর আসামী দেওয়ালের দিকে পলকহীন নেত্রে তাকাইয়া টিকটিকির মাছি-ধরা দেখিতে থাকে, কিছুই ভাবে না আর—কোন কিছু চিন্তা করিবার ক্ষমতাও বুঝিবা লোপ পাইয়া গিয়াছে তাহার। ...কোথা হইতে নবজাত একটি শিশুর প্রথম কান্না শোনা যায়। রাত্রির নীরব কণ্ঠে কেবলই রব ওঠে,—'শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!'

বিনিদ্রের অশান্তি

বাংলা ও বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব

বেশী দিন আগেকার কথা নয়, বাংলার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রঘুনাথ 'পক্ষধরের পক্ষশাতন' ক'রে তাঁর পাণ্ডিত্যস্পর্ধা খর্ব ক'রে বিপুল আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেন,—

"কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
শাস্ত্রেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে।"

—রঘুনাথের এই দম্ভোক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য একদিন ছিল যখন বাঙালী চরিত্রের এই চতুরস্রতা, তাহার বহুমুখী প্রতিভার অচঞ্চল দীপ্তি, ভারতের ইতিহাসকে করে তুলেছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। সেদিন বাঙালী শৌর্যে-বীর্যে, জ্ঞানে-সাধনায়, সাহিত্যে-সংগীতে, শিল্পসৃষ্টিতে সমগ্র ভারতেরই ছিল আদর্শস্থানীয়। আজকের আত্মবিস্মৃত বাঙালীর প্রতিভার অমোঘ যাদুদণ্ড-স্পর্শে সেদিন ভারতের সকল রিক্ততা ও দৈন্য হয়েছিল বিদূরিত। বাঙালী সেদিন ছিল ভারতের ভাগ্যবিধাতা। বাংলার সে গৌরব-রবি আজ অস্তায়মান।

ভূমিকা

বাঙালীর ঐ গৌরবময় বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে বাঙালীর জাতিগত নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য আর বাংলার বহিঃপ্রকৃতির সবুজ প্রাণের অফুরন্ত সমারোহ। জাতিতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালী সর্বভারতীয় জাতিগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাঙালীর ধমনীতে শুধু আর্যের নয়, আর্যেতর দ্রাবিড় কোল ভীল মুণ্ডা প্রভৃতি বহুজাতির শোণিত প্রবাহিত। এই শোণিত-সাংকর্য বাঙালী চরিত্রের পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবপ্রবণতার কারণ। এই আর্যেতর সংস্কারের প্রেরণাতেই বাঙালী জীবন সর্বভারতীয় জীবন-

বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের কারণ —(১) নৃতাত্ত্বিক বিশিষ্টতা

ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনার স্বতন্ত্র পথ রচনা করেছে। ভারতীয় সমাজের অনুশাসনকে বাঙালী তাই করেছে অবজ্ঞা। ব্রাহ্মণ্যধর্ম কোনদিন বাঙালীর বিদ্রোহী চিত্তকে সমগ্রভাবে অধিকার করতে পারেনি। এই নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যই বাঙালীকে ভাবপ্রবণ করেছে, করেছে স্বপ্নবিলাসী ও বাস্তবতাবিমুখ। বাঙালীর তাইতো মজ্জায়-মজ্জায় সঞ্চারিত হয়েছে বিদ্রোহ ও অতীন্দ্রিয় রহস্যপ্রিয়তা।

বাংলার বহিঃপ্রকৃতিও তার স্বকীয় বিশিষ্টতা নিয়ে বাঙালী চরিত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, অরণ্যকুন্তলা বংগভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভারতের অন্য প্রদেশের সৌন্দর্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'গংগাহৃদি বংগভূমি'র শতধারে প্রবাহিত পুণ্যস্নেহধারা বাঙালীর জীবনকে করেছে শ্যামশ্রীমণ্ডিত। পলিমাটির দেশ বংগভূমি কোমল এবং উর্বর। প্রাণের বলিষ্ঠ প্রকাশ এখানে তারুণ্যের সার্থক সাধনার জানাচ্ছে ইংগিত। পুরাতনের পাষাণভার বাংলার মাটি বহন করতে অক্ষম। বাংলার উর্বরভূমির অযাচিত অকৃপণ দাক্ষিণ্য বাঙালীকে কিছুটা শারীরিক শ্রমবিমুখ করে তাকে ভাবরাজ্যে জ্ঞানের জগতে সঞ্চরণের জন্য জুগিয়েছে অনন্যসুলভ সামর্থ্য। বাংলার প্রকৃতির নয়নাভিরাম লাবণ্য—সুনীল আকাশতলে সবুজ শস্যের তরংগভংগ, নদীর কুলুকুলুধ্বনি, জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী, বেল-বকুল-মল্লিকা-মালতী-যূথীর সুরভিত সমারোহ, কোয়েল-দোয়েল-পাপিয়া-শ্যামা-ডাহুকের কলকূজন, ঋতুর নব-নবায়মান বৈচিত্র্য—বাঙালীকে করেছে কবি ও ভাবুক, তাকে করে তুলেছে নবীন ও সুন্দরের পূজারী। নদীমাতৃক বংগভূমির নদনদী ভাঙাগড়ার স্বচ্ছন্দ আবর্তনের ভিতরে বাঙালীকে গতানুগতিকতার বাহুপ্রেম থেকে মুক্ত হবার জন্য জানিয়েছে উদাত্ত আহ্বান। বাঙালী জীবনে এই আর্যেতর সংস্কৃতি ও বাংলার বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে—এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই—সঞ্চারিত হয়ে বাঙালীকে দিয়েছে এক মহীয়ান্ স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা। 'বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুকমালা'—সেই জননী বংগভূমির অতীত ইতিহাস জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙালীর অপরাজেয় প্রতিভার নিদর্শন বহন করছে।

—(২) বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব

প্রথমে ধর্ম ও জ্ঞানের কথাই ধরা যাক্। আদিবিদ্বান্ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবক্তা কপিল এই বাংলারই গংগাসাগরসংগমে জন্মগ্রহণ করে সমগ্র ভারতে জ্ঞানের অম্লান আলোকচ্ছটা দিয়েছিলেন ছড়িয়ে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এই বংগদেশেই সমৃদ্ধির সমুচ্চ শিখরে উঠেছিল। বাংলার স্নিগ্ধ সরস প্রকৃতির পরশলালিত বাঙালী ঔদার্য ও মানবতার প্রেরণায় অনার্য বৌদ্ধ ও জৈনধর্মকে জানিয়েছিল অভ্যর্থনা। তাইতো কত জৈন তীর্থংকর এই বাংলাতেই তাঁদের সাধনায় লাভ করলেন

সিদ্ধি। অনার্য ও আর্য সভ্যতার মিলনক্ষেত্র বাংলা যথার্থই হয়ে দাঁড়িয়েছিল মহামানবের মিলনক্ষেত্র। বাংলার অতীশ দীপংকর প্রায় এক হাজার বছর আগে তিব্বতে তাঁর জ্ঞানের জ্যোতি বিকিরণ করে সমগ্র তিব্বতকে করেছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বাঙালী শীলভদ্র ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ এবং সে-যুগে তিনিই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তখনকার দিনে বাঙালী সমগ্র ভারতে যে শুধু আপন শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠা করেছিল তা নয়, বাঙালী তার স্বকীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্যও প্রমাণ করেছিল। তাই বৌদ্ধ হীনযান ধর্ম বাংলার উদার জলবায়ুর পরিবেশে বিনষ্ট হল। প্রচারিত হল মানবতাবাদী উদার মহাযান ধর্ম। মানবতা তো বাঙালীরই বৈশিষ্ট্য। নাথধর্মের জন্মভূমিও এই বাংলাই। পরবর্তী যুগে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম সমগ্র ভারতে তুলেছিল যে-আলোড়ন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংস্কারের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে দিয়েছিল যে-নাড়া, তা অবিস্মরণীয়। শাক্ত ও শৈবসাধনার লীলাস্থানও এই বাংলাই। তন্ত্রসাধনার তো কথাই নেই। বাংলার প্রতিভা তন্ত্রকে যে কত শাখা-প্রশাখায় বিভাগ করেছিল, তার ইয়ত্তাই নেই। তন্ত্র রয়েছে যে বাংলার মর্মমূলে। তাই বাংলার ধর্মচর্যা তন্ত্রের অনুশাসনকেই অনুসরণ করে। এই সর্ব-সংস্কারমুক্ত বাংলাই আহরণ করেছিল অথর্ববেদের প্রাণরস। নবদ্বীপের নব্য ন্যায়চর্চা একদিন সমগ্র ভারতকে করেছিল বাংলারই পদানত। রঘুনাথ, জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি নৈয়ায়িক ছিলেন সমগ্র ভারতের শিক্ষাগুরু। বাংলার মধুসূদন সরস্বতী তো একাই একশ'। এক কথায়, জ্ঞানের প্রতিটি বিভাগেই বাঙালী সেদিন ছিল সমগ্র ভারতের অগ্রদূত।

ধর্ম ও জ্ঞানচর্চায় বাঙালী

কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বংগপ্রতিভা ছিল অকুণ্ঠ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কি সংস্কৃত সাহিত্যক্ষেত্রে, কি বাংলা সাহিত্যসাধনায়, সবেতেই বাঙালী দিয়েছে তার প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর। সাহিত্যে ও চারুশিল্পে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তার প্রাণধর্মের অভিব্যঞ্জনায়। উপকরণবাহুল্যকে বাঙালী কোনদিনই সহ্য করেনি। চর্যাপদ ও জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীথেকে সুরু করে চণ্ডীদাসের সুললিত পদাবলী, কাশীরাম কৃত্তিবাসের মহাকাব্য প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যকে অনন্ত মাধুর্যে ও ঐশ্বর্যে করেছে বিমণ্ডিত। পূর্ববংগগীতিকা, বাউল গান, পাঁচালী গান, কবির গান প্রভৃতি তো বাঙালীরই বিশিষ্ট অবদান। বাঙালী সত্যই 'গানের রাজা' বলে সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য।

কাব্য-সাহিত্যে বাঙালী

চারুশিল্পে ও কারুকলায় বাংলার অবদান অপরিমেয়। বাংলার স্থপতির মন্দির

ও গৃহনির্মাণ-প্রণালী আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মাটি ও খড়ের ঘর বাঙালী অতীব সুন্দরভাবে নির্মাণ করত, আর তা সমগ্র ভারতে ছিল প্রশংসনীয়। নৌকা-নির্মাণে বাঙালী যে প্রাণময় কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। বাংলার ভাস্কর হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি-রচনায় যে প্রাণস্পন্দন রূপায়িত করেছেন, যে সূক্ষ্ম ভাবাভিব্যঞ্জনার পরিচয় দিয়েছেন, তা অন্যত্র সুদুর্লভ। বাংলার ধীমান্ ও বীতপালের শিল্পরীতি একদিন ভারতের বাইরেও পেয়েছিল সমাদর। বাংলার ভাস্কর 'ছত্রমুখ' মূর্তির ভিতরে স্বকীয় সাধনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছে আর কীর্তিমুখ মূর্তির ভিতরে সে শুধু সারা ভারতের শিল্প-সাধনাতেই সহযোগিতা করেছে। বাংলার চিত্রে এবং সংগীতেও বাঙালী প্রাণের সহজ আবেদন ও সুকুমার সূক্ষ্মতাবোধ প্রকাশ পেয়েছে। অজন্তার গিরিগুহাগাত্র এখনও বাঙালীর চিত্রশিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করছে। সংগীতে বাংলা নূতন নূতন পথও প্রবর্তন করেছে। কীর্তন, ভাটিয়ালী প্রভৃতি শাস্ত্রানুশাসনবর্জিত প্রাণাবেগময় সংগীতই বাংলার নিজস্ব সম্পদ্। বাংলার রেশমশিল্প জগতে এক সময় ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রাচীন বাংলার পৌণ্ড্র ও সুবর্ণকুড্য রেশমের সূক্ষ্ম বস্ত্র-নির্মাণের জন্য ছিল প্রসিদ্ধ। এই বস্ত্রের নাম 'পত্রোর্ণ'। বাকলের কাপড়ও ছিল বাংলার গৌরবের অন্যতম নিদর্শন। বাকল হতে যে কাপড় হত, তার নাম 'ক্ষৌম', উৎকৃষ্ট ক্ষৌমের নাম ছিল 'দুকূল'। শত শত বছরের সাধনায় বাঙালী যে স্বকীয় প্রতিভায় সমুজ্জ্বল শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল, তার সার্থক নিদর্শন আজও ভারতে এবং ভারতের বাইরে যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সিংহল, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের অন্তর্ভুক্ত স্থানে বিদ্যমান।

স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, সংগীতে ও অন্যান্য শিল্প-কলায় বাঙালী

শৌর্যে-বীর্যে, এমন কি বাণিজ্যেও বাঙালীর ঐতিহ্য গৌরবে সমুজ্জ্বল। কাহারও কাহারও মতে, অতি প্রাচীন কালেই বাঙালী বিজয়সিংহ সিংহলদ্বীপ জয় করে' সেখানেও বাঙালীর কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। শশাংক, গণেশ, ধর্মপাল প্রভৃতির শৌর্যমণ্ডিত কীর্তিকাহিনী আজও ভারত বিস্মৃত হয়নি। মোগলযুগে বাংলার প্রসিদ্ধ বারভুঁঞা যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে দিল্লীর সিংহাসনও উঠেছিল কেঁপে। নৌযুদ্ধে বাঙালীর কৃতিত্ব একদিন দিগ্বিজয়ী রঘুকেও বিপন্ন করে তুলেছিল। বাণিজ্যে বাংলা তো বহু প্রাচীন যুগ থেকেই ছিল ভারতের অগ্রণী। বাংলার তাম্রলিপ্ত ছিল তখন ভারতের বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। বাংলার বহির্বাণিজ্যের আয়তন ছিল খুবই বেশী। বাঙালীর শংখশিল্প, তাঁতশিল্প, হাতীর দাঁতের শিল্প ও সূচিশিল্প সমগ্র পৃথিবীর ছিল বিস্ময়ের সামগ্রী।

শৌর্যে বীর্যে ও বাণিজ্যে বাঙালী

বর্তমান যুগেও বাঙালী সমগ্র ভারতে সংস্কৃতির সাধনায় অগ্রণী। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নবজাগৃতির আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, তার পুরোভাগে ছিল বাঙালীই। চিরবিপ্লবী বাঙালীই নব্য ভারতের স্রষ্টা। ধর্মজগতে রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-সাধনা শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে করেছে বিরাট্ আলোড়নের সৃষ্টি। বাঙালীর চিরতরুণ প্রাণই সর্বপ্রথমে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার ব্রত নিয়েছিল। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র এই 'বাংলারই ঋষিকণ্ঠে একদা হয়েছিল উদ্গীত। এই তো সেদিন নেতাজীর বিপ্লবী স্বরাজসাধনা সমগ্র জগৎকে করে দিয়েছিল বিস্ময়ে স্তম্ভিত। 'বাঙালী যাহা চিন্তা করে আজ, সমগ্র ভারতবাসী তাহা চিন্তা করে কাল।' সত্যই বাঙালী ভারতের সর্বক্ষেত্রেই নায়ক। বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য শুধু ভারতকে নয়, সমগ্র বিশ্বেরই মনোরঞ্জন করেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা না হয় বাদই দিলাম। বাঙালী বঙ্কিম, শরৎ, মাইকেল, গিরিশ, ক্ষীরোদ, দ্বিজেন্দ্র, নজরুল বিশ্বের যে কোন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পাশে পেতে পারে স্থান। অভিনয়শিল্পে বাঙালী শিশির-অহীন্দ্রের প্রতিভাদ্যুতি নিখিল ভারতে দেদীপ্যমান। শীততাপনিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা সৃজনে বাঙালী সলিলকুমার ভারতীয় মঞ্চের ইতিহাসে যে অভূতপূর্ব সৃষ্টি-কৌশলের পরিচয় রেখে দিয়েছেন, তা সত্যই বাংলা ও বাঙালীর গর্বের সামগ্রী। প্রাচ্য নৃত্যশিল্পে বাঙালী উদয়শংকর যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা ভারতের অন্যত্র দুর্লভ। চিত্রশিল্পেও বাংলার অবনীন্দ্রনাথ ও যামিনী রায় যে নবরীতির উদ্ভাবন করেছেন, তা বিশ্বে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা করেছে অর্জন। যুগ যুগ ধরে জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে বাঙালী তার প্রতিভার যে ভাস্বর স্বাক্ষর দিয়েছে, তার জ্যোতি চিরদিন অম্লান, অক্ষয় হয়েই থাকবে।

নব্য ভারতের স্রষ্টা বাঙালী

কিন্তু সাম্প্রতিক বাঙালীর সে গৌরব আজ কোথায়? রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বাঙালী আজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরাজয়ের কলংক করছে বহন, বাঙালী প্রতিভা আজ সৃষ্টির নব নব উদয়াচলের পথে এগোয় না। উদার বাঙালী আজ সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে আলস্যে জীবন অতিবাহিত করছে। বাঙালীর এই দুর্গতি সত্যই শোচনীয়। বাঙালী যদি আবার ভারতের নেতৃত্ব পেতে চায়, আবার যদি সে তার প্রতিভার বহুধাবিচিত্র অবদানে জগৎকে বিস্মিত করতে চায়, তাহলে তাকে ত্যাগ করতে হবে বিলাস-ব্যসন ও আলস্যের জড়তা, তাকে বিস্মৃত হতে হবে স্বার্থান্ধ আত্মকলহ। গৌরবময় অতীতের নিশ্চিন্ত রোমন্থন ত্যাগ করে সংহত বাঙালী যদি আবার আত্মসংবিৎ ফিরে

উপসংহার

পায়, তবেই-না বাঙালীর অতীত গৌরবের অবিচ্ছিন্ন ধারা হবে অব্যাহত, তবেই-না বাঙালী উদাত্তকণ্ঠে কবির সুরে সুর মিলিয়ে আবার বলতে পারবে,—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি!"

সেদিনটি কি সত্যই দূরে বহুদূরে? ....

বাঙালীর শিল্পে ও জীবনে বাংলার প্রকৃতির প্রভাব

সত্যই বাংলা একদিন ভারতের সভ্যতার ইতিহাসে, শিল্পে-সাহিত্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শৌর্যে-সাধনায় গৌরবপ্রভামণ্ডিত বাণীর আসন অধিকার করেছিল। বাংলার এই সবজয়ী সাধনায় বাংলার প্রকৃতির প্রভাব অবিসংবাদিত। বাংলার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই বাঙালীর চরিত্রে অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা সঞ্চার করেছে। বাংলার স্নেহমেদুর প্রকৃতিই বাঙালীর প্রাণরসের স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিনী গোমুখী।

ভূমিকা

নদীমাতৃক দেশ এই বাংলা। বাংলার নদ-নদী যেমন করে যুগ যুগ ধরে বাংলাকে সঞ্জীবনী-ধারায় অভিষিক্ত করে এসেছে, তার তুলনা ভারতের অন্যত্র বিরল। বাংলার ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কর্ণফুলি নদী বাংলার প্রতিটি দেশকে করেছে সরস ও শস্যশ্যামল। হিমালয় থেকে প্রবাহিত এই সব নদনদীর আগমনে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ উঠেছে জেগে। বাংলা তাই হৈমবতী উমা অন্নপূর্ণা। একদিকে নদনদীর প্রাচুর্য, অন্য দিকে বংগোপসাগর ও হিমালয়ের দাক্ষিণ্যে দেবতার অজস্র ধারাবর্ষণ—এই দু'টি মিলে বাংলার মাটিকে করেছে উর্বর। বাংলার ঋতুর যে বর্ণবহুল বৈচিত্র্য, তাও বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য। বাংলার, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—প্রতিটি ঋতুর এমনই আছে একটি স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্র আবেদন, যা ভারতের অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলার প্রকৃতির এই দাক্ষিণ্যমূর্তিই এর সবটুকু নয়। এখানে সব কিছুরই ভিতরে আছে একটা বৈচিত্র্য, একটা পরস্পর-বিরুদ্ধ দ্বান্দ্বিক পরিবেশ। দাক্ষিণ্যমূর্তির পাশেই রয়েছে আবার প্রকৃতির নির্মম শ্মশানকালী মূর্তি। নদনদীর প্রকোপে বাংলার কত জনপদ, কত সভ্যতা যে সলিল-সমাধি বরণ করেছে, তার ইয়ত্তাই নেই। নদী শুধু কূলই ভেঙে চলেছে; আবার কোথাও-বা বন্যার জলপ্লাবনে দেশের পর দেশকে একেবারে গ্রাসও করে বসেছে, কোথাও-বা আবার নদী বয়ে গিয়ে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা সংক্রামক রোগের জীবাণুকে করেছে লালন, করেছে পালন। তা সত্ত্বেও বাংলার জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, কোয়েল-দোয়েল-পাপিয়া-শ্যামা, অজস্র সুরভি ও বর্ণাঢ্য পুষ্পের সমারোহ,

বংগ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য

সুনীল আকাশ ও মৃদুমন্দ সমীরণ—বাংলার প্রাকৃতিকে সুরে, ছন্দে, গন্ধে, গানে করে তুলেছে মাধুর্যমণ্ডিত।

বাংলার এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনে গড়ে উঠেছে বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভূমি উর্বর বলে বাঙালীকে কখনও পরিশ্রম করে শস্য জন্মাতে হয়নি। তাই বাঙালী হয়েছে শ্রমকুণ্ঠ, অলস, লক্ষ্যহীন, কল্পনাপ্রবণ। প্রকৃতির সরসতা ও প্রাণের সবুজ সমারোহ বাঙালীকে করেছে ভাবুক ও কবি, করেছে সংস্কারমুক্ত ও উদার। নদীর ধ্বংসলীলা বাঙালীকে আবার চিরবৈরাগীও করে তুলেছে। তাই তার জীবনে এসেছে নব নব অভিলাষ আর তাদেরই অভিব্যক্তি। পুরাতনের জীর্ণ নির্মোক তাকে নূতনের অভিসার থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য বাঙালীকে বৈচিত্র্যের অনুরাগী করে তুলেছে। সাধারণভাবে বলা যায়, বাংলার প্রকৃতি বাঙালীকে শান্ত, নিরীহ, অলস, আনন্দময় জীবনযাপনের উৎসাহ যুগিয়েছে। কিন্তু এরই পাশে আবার দুর্জয় সাহস, উদার সংস্কারমুক্তি, ভাবপ্রবণতা, দার্শনিকতা, ভক্তি ও গীতিমুখরতা প্রভৃতি সকল গুণই বাঙালী পেয়েছে প্রকৃতিরই কাছ থেকে। উপযুক্ত অনুকূল পারিপার্শ্বিকে বাঙালীর চরিত্রে এই দ্বৈবীভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার প্রকৃতি যেমন ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ, তেমনি বাঙালী চরিত্রও ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন ধারার বিচিত্র প্রভাবে প্রভাবান্বিত—একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে।

প্রকৃতির প্রভাবে বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বাংলার শিল্পে ও জীবনে বাংলার প্রকৃতির এই প্রভাব সর্বত্র পরিস্ফুট। ভূমি উর্বর বলে বাঙালী মুখ্যত হয়েছে কৃষিজীবী। নদীর দাক্ষিণ্য পেয়েছে বলেই বাঙালী নাবিক এককালে বহির্বাণিজ্যে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। বাংলার সামাজিক জীবনে দেখা যায়, উৎসবের অন্ত নেই। এখানে 'বারোমাসে তেরো পার্বণ' লেগেই আছে। কৃষির জন্য পরিশ্রম করতে হয় না বলে বাঙালী হয়েছে আড্ডা-রসিক—বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে ললিতকলার অনুশীলনে। বাঙালীর সাহিত্যে, সংগীতে, ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় সর্বত্রই এমন একটা শাস্ত্রশাসনবর্জিত গীতিমুখরতা রয়েছে, যা ভারতের অন্য কোথাও নেই। এই গীতিপ্রবণতাই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। তাই বাংলার কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রবীন্দ্রনাথ। তাই বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক হলেও তাঁদের উপন্যাস মোটামুটিভাবে গীতিকাব্যাত্মক। তাই বাঙালী মধুসূদন কেবলমাত্র 'মেঘনাদবধকাব্য' রচনা করেই তৃপ্তি পেলেন না, 'ব্রজাংগনা-কাব্য'ও তাঁকে পরম পরিতৃপ্তির পুলকে অভিষিক্ত করল। তাই এই বাংলাতেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম হল বিস্তৃত। বাংলা কখনও অনুশাসনের বেড়ী ও পুরাতন সংস্কার সহ্য করতে

শিল্পে ও জীবনে প্রকৃতির প্রভাব

পারে না। তাই তো বাংলায় বৌদ্ধ-মহাযানধর্ম ও তন্ত্রধর্মেরই প্রতিষ্ঠা। বাংলার ভাস্কর্যের তাই বৈশিষ্ট্য হল 'ছত্রমুখ' মূর্তি। বাংলার শিল্পকলায় সংস্কারহীনতা, সূক্ষ্মরচনানৈপুণ্য ও অলংকারহীনতা সর্বত্রই পরিস্ফুট। বাংলার লোকচরিত্রের বিরুদ্ধ-গুণগত সমন্বয় আবার প্রকাশ পেয়েছে তারই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও স্মৃতিনিবন্ধে। বাঙালী জীবনের এই চতুরস্রতা তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—সাহিত্যে, চিত্রে, সংগীতে, ভাস্কর্যে, দর্শনে ও বিজ্ঞানে—পেয়েছে সার্থক প্রকাশ।

আজ বাঙালী অখণ্ড জীবনের প্রতিটি খণ্ডিত ক্ষেত্রে রয়েছে পশ্চাতে পড়ে। তার সমগ্র জীবন আজ আলস্যে ও পরচর্চায় ক্ষীয়মাণ। রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, বাঙালী আজ বহুধাবিচিত্র প্রকৃতির প্রভাবকে জীবনে সমন্বিত করতে পারেনি। প্রাকৃতিক প্রভাবকে বাঙালী যদি কোনদিন নিজের জীবনে সুসমঞ্জস আকৃতি দিতে পারে, তবেই সেদিন সে আবার ফিরে পাবে নিজের পূর্বগৌরবের সিংহাসন।

উপসংহার

বাংলার উৎসব

বাংলার নিসর্গে যেমন, তেমনি বাঙালীর স্বভাবেও আছে বেহিসেবী প্রাণচাঞ্চল্য। মধুর, কোমল, কান্ত সুর ও ছন্দের পুষ্পিত প্রলাপে বাংলার নিসর্গ মুখর। সৌন্দর্য এখানে প্রয়োজনের সীমাকে ছাড়িয়ে অপ্রয়োজনের করছে অর্ঘ্যরচনা, আবার প্রাণের নিরংকুশ প্রাচুর্যে নিসর্গ এখানে সর্বনাশা উচ্ছ্বাসে ভাঙনের লীলায় চঞ্চল। নিসর্গপ্রীতি বাঙালীর স্বভাবেও এই প্রাণপ্রাচুর্য ও বাঁধ-ভাঙার নেশায় দিয়েছে ছাপ। তাইতো বাঙালা-জীবনের রথের চাকা লোহায়-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে বেশীক্ষণ চলতে নারাজ। গতানুগতিক জীবনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির রঙীন ইসারা তার মনে দেয় দোলা; কর্মনিগড়িত জীবনের অন্ধকূপ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির আনন্দমেলায় যোগ দিতে তার মন হয় চঞ্চল। সৃষ্টি হয় উৎসবের। বাঙালীর দুঃখ-দৈন্য-হত জীবনের একঘেয়ে আবর্তনের ভিতরে উৎসবের কলধ্বনি আনে নবীনের বারতা; উৎসবের বাতায়নপথে বাঙালীর চিত্ত আকাশের উদার নীলিমায় করে পুলক-সঞ্চরণ।

ভূমিকা

বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণ। বাঙালীর উৎসব পুঁথির প্রাণহীন নিয়মঘেরা যান্ত্রিক অনুষ্ঠান নয়। এ যে শুভ উৎসব—এ যে প্রাণের রসপিপাসার স্বচ্ছন্দ রূপায়ণ। তাইতো বাংলার উৎসবের কোন অন্ত নেই। প্রতি মাসে প্রতি দিনে তার লেগেই আছে উৎসব। বাঙালীর সকল কাজের অবসরে জাগে শুধু অকাজের আনন্দ আহরণের ব্যাকুলতা। ঋতুর আবর্তনের সাথে সাথে বাঙালীর উৎসব ধীরে ধীরে হতে থাকে আবর্তিত। অবশ্য বাংলার উৎসব

বাংলার উৎসব তিন জাতের

মূলত তিন রকমের—(১) ঋতু-উৎসব; (২) ধর্মোৎসব ও (৩) সামাজিক উৎসব। প্রথমে ঋতু-উৎসবের কথাই ধরা যাক্। এক একটি ঋতু বাংলায় তার আগমনী জানায় এক একটি বিচিত্র সুরে। প্রকৃতির এই বহুবিচিত্র আত্মপ্রকাশে যে সৌন্দর্য ও সুরের লহরী খেলে, মানুষের মনে তা জাগায় নিজেকে প্রকাশ করার, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার প্রেরণা। এই প্রেরণাই রূপায়িত হয়েছে ঋতু-উৎসবে। নববর্ষের প্রথম দিন থেকে শুরু করে চৈত্র-সংক্রান্তি পর্যন্ত বিভিন্ন ঋতুর বন্দনাগানে বাংলার পল্লীভবন হয় মুখর। প্রাচীন শারদোৎসব ও বসন্তোৎসব এই ঋতু-উৎসবের একটি নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে আজও রয়েছে বেঁচে। বসন্তোৎসব থেকেই গড়ে উঠেছে দোল-খেলার উৎসবটি। বাংলার মেয়েলি ব্রতের অধিকাংশই ঋতূৎসবের পর্যায়ভুক্ত। ভাদুলি, পূর্ণিপুকুর, মাঘমণ্ডল, অশ্বত্থপাতা প্রভৃতি ব্রত ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর আগমনী করে ঘোষণা।

ঋতু-উৎসব

অথচ বাংলার ধর্মোৎসবে ধর্ম মুখ্য হলেও উৎসব গৌণ নয়। বরং গোঁসাই ঠাকুর যখন পূজার আনুষ্ঠানিক শুচিতা রক্ষায় থাকেন ব্যাপৃত, তখন 'অকাজের গোঁসাই'দের মনের আনন্দোচ্ছ্বাস নানা ভাবে প্রকাশ পায় সুরে ও ছন্দে, গীতে ও নৃত্যে। বৈদিক-পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে কত দেব-দেবীই-না বাঙালীর ঘরে পূজা পান। লৌকিক মনসা বা ষষ্ঠী দেবীও এখানে বাদ পড়েন না। বছরের প্রতি মাসেই কোন-না-কোন দেবতার পূজাকে উপলক্ষ্য করে' উৎসবের আয়োজন হয় এই বাংলায়। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ধর্মোৎসবের ভিতরে দুর্গাপূজাই সর্বশ্রেষ্ঠ। দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসব। সারা বছর ধরে' বাঙালী দুর্গা-মায়ের আগমনীর করে প্রতীক্ষা। শরতের গীতিপুলকিত পুষ্পসুরভিত প্রভাতে যখন মায়ের অর্চনা হয় শুরু, তখন দীনের কুটীর আর ধনীর পর্ণশালা হয়ে যায় একাকার। দূর প্রবাস থেকে বাঙালী ফিরে আসে ঘরে মায়ের আশীস্ নেবার জন্যে। দুর্গাপূজায় বাংলার ঘরে ঘরে যে আনন্দের বান যায় বয়ে, তার তুলনা অন্য কোথাও দুর্লভ। দুর্গাপূজার পরে আসে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। তার পরে একে একে আসে কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা ও সরস্বতীপূজা। মুসলমানদের ঈদ ও মহরম ধর্মোৎসবের অন্তর্গত দু'টি প্রধান জাতীয় উৎসব। এছাড়া সবে-বরাত, সবে-মেরাজ প্রভৃতি উৎসবও উল্লেখযোগ্য।

ধর্মোৎসব

সামাজিক উৎসবের ভিতরে বিবাহই শ্রেষ্ঠ। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আনন্দের অবকাশ অপ্রচুর হলেও বিবাহের রাত্রে আমাদের নিকট থেকে অপসারিত হয় যান্ত্রিক ব্যস্ততার একঘেয়ে আবর্তন। সেদিনের মধুর সুরে ও সংগীতে, সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে বর ও কন্যার সজ্জার বৈচিত্র্যে, লোকের প্রাণখোলা আনন্দ-আলাপনে, চিত্তকন্দর

থেকে যে প্রীতিরস হয় নির্ঝরিত, তা আজ্‌কের সমাজেও দেয় শান্তির স্নিগ্ধতা।

সামাজিক উৎসব

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাইষষ্ঠী, পৌষপার্বণ প্রভৃতিও সামাজিক উৎসবের অন্তর্ভুক্ত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত পৌষপার্বণের রসাল মাধুর্যের লীলায়িত স্বাক্ষর দিয়েছেন নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্রে—

'আলু তিল গুড়-ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিঠে পুলি অশেষ প্রকার॥
বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার! ধন্য তোর খেলা॥'

মুসলমান সমাজেও আছে সামাজিক উৎসব। 'মিলাদ শরীফ' মুসলমানদের একটি অতীব জনপ্রিয় সামাজিক উৎসব। এই উৎসবটি মাসে দু'একটি করে হয়ই।

আজ পল্লী জনমানবহীন, হৃতশ্রী শ্মশানে পরিণত। একদা উৎসবের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই পল্লীই। আজ্‌কের শহরে যান্ত্রিক জীবনে উৎসবের বাহুল্যবর্জনের জন্যে চলেছে অক্লান্ত প্রচেষ্টা। এখানে-সেখানে বারোয়ারী উৎসব হয় বটে,—কিন্তু তা উন্নাসিক

উপসংহার

ঐশ্বর্যের প্রকাশ মাত্র। মানুষের মিলনের যোগসূত্রটি উৎসব থেকে প্রকৃতই অপসারিত। মজা এই যে, উৎসব বর্জন করে সমাজতন্ত্রেরই আবাহন করছি আমরা। আশংকা হয় যন্ত্রসভ্যতার দাক্ষিণ্যপুষ্ট এই সমাজতন্ত্রও একদিন মানবতাহীন যান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে হবে পরিণত। এই দারুণ সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে বাংলার জীবনে আবার অতীতের সেই শুভ উৎসবের স্বচ্ছন্দ প্রাণের পরিবেশ রচনা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে সমুদ্রে হ'ল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন,
শক-হূণ-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।' —রবীন্দ্রনাথ।

ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তি অগণিত জীবন ও সংস্কৃতিস্রোতের পুণ্য-মিলন-ভূমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেমন সত্য, বাংলা ও বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির সম্বন্ধেও তেমনি অভ্রান্ত। বাংলার জনতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখিতে পাই পাই: বিচিত্র জাতিবর্ণের রক্তপ্রবাহ এমন করিয়া বাঙালীর ধমনীতে সঞ্চারিত হইয়াছে যে, তাহার একটিমাত্র বিশিষ্ট পরিচয় আর নাই। "বাংলার বিভিন্ন জেলার বিচিত্র বর্ণসমূহের ভিতর আপেক্ষিক স্থূল ও সূক্ষ্ম পার্থক্য, একই বর্ণের মধ্যে দেহপরিমিতির

ভেদবৈচিত্র্য ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিচার করিলে বলিতেই হয়, এ সমস্তই বিচিত্র নর-সাংকর্যের দ্যোতক। জন-সাংকর্যের, নরতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের জৈব মিশ্রণের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে! বস্তুত স্মরণাতীত কাল হইতে এই ধরণের জনসাংকর্যের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষেব অন্যত্র খুব সুলভ নয়। এই মিশ্রণ এত গভীর ব্যাপক যে নরতত্ত্বেব দিক হইতে কোন বিশিষ্ট বর্ণ যত উচ্চ বা নিম্নই হউক না কেন, কোন বিশিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের একান্তভাবে স্বতন্ত্র কবিয়া দেখিবার উপায় নাই।" এই অবিচ্ছিন্ন, অবিশিষ্ট বাঙালীত্বেব ধাবাই বর্তমান বাঙালীর জীবনসংস্থাব ধারক। বাংলাব সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, ধ্যান-ধাবণাও এই সাংকর্যের ফল। মনোধর্মী আর্যজাতি বাঙালীব চিন্তা বাঙালীব দার্শনিক ধ্যানাদর্শেব প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আবাব দেহধর্মী অনার্যজাতি বাঙালীকে দিযাছে ধর্ম ও দর্শনে অতি-সাধারণ জৈব প্রেরণাব লৌকিকতা। এই মনোধর্ম ও জৈব প্রেবণাব লৌকিকতা উত্তুংগ ভাবাদর্শ ও লৌকিক জীবনেব সুখদুঃখের একত্র মিলন ঘটাইয়া বাঙালীর সাহিত্যকে ভাবাদর্শ ও অশ্রুর প্লাবনে ডুবাইয়া দিয়াছে। আর্য, অনার্য, দ্রাবিড ও বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে পরিপুষ্ট বর্তমান বাঙালীর বাহ্য ও অন্তর্জীবন তাই বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ এক নবীনা তিলোত্তমা।

বাঙালীর ইতিহাসের গোড়ার কথা

বর্তমান বাঙালীর ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি নির্দেশ কবা সত্যই দুরূহ। কারণ,—বাঙালীর জীবন-তিলোত্তমা যে তিল তিল উপাদান গ্রহণ কবিয়া তাহার বর্তমান রূপ পাইয়াছে, তাহা এমন ভাবে ছড়াইয়া আছে—কোথাও লোকচক্ষুর অন্তরালে, কোথাও সংস্কৃতি-সভ্যতাব আস্তবণের তলায়—যে তাহাকে বর্তমান জীবনেব আলোকে বিচার কবা দুরূহ। প্রথমত বাঙালীর ধর্মকর্মেব মধ্যে তাহার জীবনেব প্রাচীনতম রূপটি ফুটিয়া উঠে। "বস্তুত, বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকাব ইতিহাস হইতেছে রাঢ, পুণ্ড্র, বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাংলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস। এ-তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেব-দেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়া-ছুঁয়ি অনেক-কিছুই আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি।" এই সব ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান আমা[illegible] লৌকিক সাহিত্যে রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই আদি ধ্যানধারণা মনো[illegible]র্যদর্শন ও ভাববাদী মনোভাবের সহিত

বর্তমান বাঙালীর ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি

মিশ্রিত হইয়া বাঙালীর নূতন ধ্যানাদর্শকে রূপ দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, বাঙালীর দেহমন, চিন্তা-ধ্যান-ধারণা সকল ক্ষেত্রেই সমন্বয়ের চিহ্ন বর্তমান। এই সমন্বিত ধ্যানাদর্শেরই উত্তরাধিকারী উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত নূতন বাঙালী।

এইবার ইতিহাস-পাঠকের দৃষ্টি লইয়া বাঙালীর অতীত রাজনৈতিক সংস্থার দিকে লক্ষ্য করা যাক। খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাক্‌-ইংরাজযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। সামন্ত, মহাসামন্ত, তাহার উপর রাজা এবং রাজারও উপরে রাজাধিরাজ বা সম্রাট্‌ থাকিতেন। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক সকল শক্তিই ইঁহাদের দ্বারা বিধৃত হইত। কিন্তু রাজতন্ত্র থাকিলেও জনজীবনের শক্তিও যে কার্যকরী ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় পালরাজাদের আগমনের পূর্বে। বাংলাদেশের অরাজক মাৎস্য-ন্যায় দেশের জনসাধারণের মনে যে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়াছিল, তাহাতেই নূতন পালরাজাদের আগমন সূচিত হইয়াছিল। মুসলমানযুগে রাজতন্ত্র আরও দৃঢ় হইল। ইংরাজ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার ঠিক পূর্ববর্তী মুহূর্তে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার একটি অরাজকতার যুগ দেখা গেল। দিল্লীর দুর্বল সম্রাটের শক্তি তখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন, প্রাদেশিক শাসকেরা ও উচ্চতর রাজকর্মচারীরা তাঁহাদের শাসনশক্তিকে নিজেদের স্বার্থের জন্য তখন ব্যবহারে অভ্যস্ত। সেই ভয়ংকর অরাজকতার মুহূর্তই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের পূর্ব মুহূর্ত—বাংলার অন্ধকার সেই রাত্রির তপস্যার মধ্য দিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর নবজীবনের আলো বিচ্ছুরণ।

বাঙালীর অতীত রাজনৈতিক সংস্থা

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশ, যে বাংলা দেশ আধুনিক ভারতবর্ষের জননী, যে বাংলাদেশের নবজাগ্রত চেতনা সমগ্র ভারতবর্ষের ধ্যানধারণাকে প্রভাবিত করিয়াছিল, সেই বাংলার দিকে চাহিয়াই মহামতি গোখেল একদা বলিয়াছিলেন,—"What Bengal thinks to-day, India will think to-morrow." ইংরাজি শিক্ষাদীক্ষা, পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ আর অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার নৈরাশ্য বাঙালীর জীবনে আনিয়া দিয়াছিল এক বিপ্লবচেতনা। এই নবচেতনাই সকল পুরাতন জীর্ণতাকে চূর্ণ করিয়া নূতন জীবনের আলোক বহিয়া আনিতে চাহিল। মানবিকতাবোধ (Humanism) জীবনকে ভালবাসিতে শিখাইল। ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখেরও যে স্বয়ংস্বতন্ত্র মূল্য আছে, এই বোধটিই আধুনিক বাংলার জীবনচেতনার কেন্দ্রবস্তু। বাংলার সংস্কৃতি সাহিত্য রাজনীতি—সকল ক্ষেত্রেই দেখা গেল এই শিকল-ভাঙার নূতন গান। জীবনের যেন এক নূতন মূল্যবিচারের পালা পড়িয়া গেল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী

বাংলার আকাশ-বাতাসও যেন নূতন চেতনায় নাচিয়া উঠিল। সত্যই সে এক স্মরণীয় দিন।

এই নবজাগ্রত বাংলার জীবনচেতনা হইতেই আধুনিক রাজনীতিবোধের উদ্ভব ঘটিল, জাতীয় কংগ্রেসেরও প্রতিষ্ঠা হইল। সমগ্র ভারতীয় চেতনার তলায় যেন বাঙালীর জীবনচেতনা লুপ্ত হইতে চলিল। বাঙালীও সর্বভারতীয় আদর্শের তলায় তাহার খাঁটি বাঙালীত্ব বিসর্জন দিয়া বসিল। এই সময় বাঙালী যেভাবে তাহার নিজের সমাজ ও জাতিধর্ম ত্যাগ করিয়া বসিয়াছিল—এমন আর ভারতের অন্য কোন জাতিই করে নাই। "সে বংগমাতার পরিবর্তে ভারতপিতার সন্তান হইয়াছে, জাতির পরিবর্তে মহাজাতির এবং মানুষের পরিবর্তে মহামানুষ হইয়াছে।" বাঙালী তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া সর্বভারতীয় হইতে গিয়া নূতন ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ইংরাজের এক গোপন বৈঠকে বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়িয়াছে। রাজনীতি হতভাগ্য বাঙালীর ললাটে চরম অভিশাপলিপি আঁকিয়া দিয়াছে। বিপন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা আজ খণ্ডিত বাংলায় হাহাকার তুলিয়াছে।

আধুনিক বাঙালীর স্বরূপ

রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার জাতীয়তা ও সংস্কৃতির প্রাণধারার যে গতি আমরা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহা আজ স্তব্ধ অথবা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত। বাংলা সাহিত্য ও ভাষা আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। একদিকে হিন্দী আর এক দিকে উর্দুর প্রভাবে বংগবাণীর শ্বাস রুদ্ধপ্রায়। বাংলা সাহিত্যের একান্ত প্রাণধর্মও ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে। চারিদিকে একটি নিশ্ছিদ্র ঘন কুয়াসা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে যেন রুদ্ধ করিয়া দিতে চায়। যে জীবনের চিত্র সাহিত্যের অবলম্বন, যে জীবনের রসবোধই কবির সৃষ্টির উৎস, তাহাই আজ হৃতবল, তাহাই আজ পংগু।

আধুনিক বাঙালীর জাতীয়তা ও সংস্কৃতির পরিচয়

বাঙালীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবন আজ এক বন্ধ্যা বালুচরে ঠেকিয়া গিয়াছে। খাদ্যসমস্যা ও বেকারসমস্যা রাজনৈতিক দলীয় মনোভাবের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থনীতি-রাজনীতির আকাশে-বাতাসে এক রুক্ষ ভয়াবহ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিম-বংগে আগত পূর্ববংগের লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী উদ্বাস্তু হইয়া পথে পথে জীবন হারাইতেছে; তাহাদের আর্ত হাহাকার পশ্চিম-বংগের পথে-প্রান্তরে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। এহেন আর্ত জীবনের এই

আধুনিক বাঙালীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিচয়

ভয়াবহ নৈরাশ্যের নিশ্ছিদ্র কুয়াসা বাঙালীর জীবনকে ধ্বংসের অভিমুখীন করিয়া দিয়াছে।

এই ভয়ংকর বেদনাকে সংগে লইয়া বাঙালীকে পথ চলিতে হইবে। কারণ,—সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চক্রান্তে বাঙালীর ভাগ্যলিপি যে ঐ ভাবেই আজ লিখিত।

বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন

বাঙালী উনবিংশ শতাব্দীতে ধনে-মানে, চিন্তায়-ধ্যানে একটি পূর্ণাংগীণ জাতি হইয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সর্বাংগীণ রূপটিও তাহার চক্ষুকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আজ সে-সংস্কৃতির, সে-ধ্যানধারণার বিলুপ্তি বাঙালী কেমন করিয়া সহ্য করিবে। বাঙালীর আজ জীবনমরণ প্রশ্ন। তাহার ভবিষ্যৎ কোথায়? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার চিত্র মুদ্রিত থাকিবে, না বিলুপ্ত হইয়া যাইবে?

প্রচুর তিতিক্ষা আর ধৈর্যের সহিত আজ বাঙালীকে তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। তাহার সংস্কৃতি ও সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যধারা হইতে বহুদূরে থাকিলেও উহারই মধ্য দিয়া নূতন পথের সন্ধান করিতে হইবে। ছিন্নমূল বাঙালী জীবনের মধ্যেও যে চিরন্তন রসসত্য আজ বিষাদকরুণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে,

বাঙালীর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

তাহাকে বাংলা সাহিত্যে রূপ দিতে হইবে। তাহার এমন রূপ হইবে, যাহা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভবিষ্যৎ পথকে উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে। রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দুইশত বৎসর ধরিয়া বাঙালী যে রসস্বপ্ন দেখিয়াছে, যে জীবনবেগ সাহিত্যশিল্পীর কর্মকে সুদূরপ্রসারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাকে আজ আরও বস্তুধর্মী, আরও করুণ, আরও মর্মন্তুদ করিয়া তুলিতে হইবে। বাঙালী জীবনের সেই বেদনাময় আলেখ্য যেন বুকভাঙা সুরে সুদূরের ইংগিত দিতে পারে, যেন তাহাতে দুঃখশেষের পথের নির্দেশ ফুটিয়া উঠে। বাঙালীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক চেতনাতেও সংহতি এবং সমস্যা-সমাধানের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা ফুটিয়া উঠুক। মৈত্রী ও ত্যাগ আজিকার রাজনৈতিক দলীয় মনোভাবের হীনচক্রকে প্রতিরোধ করুক। বাঙালীর অভিশপ্ত জীবনের এই স্বপ্ন তাহাকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে উন্মুখ করিয়া তুলুক।—ইহাই তো বাঙালী জাতির অন্তর্গূঢ় কামনা।

বাংলার একখানি গ্রাম

ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় হরিদাসপুর গ্রাম। কবে কোন্ অতীত কালে বৈষ্ণব সাধক হরিদাসের ছিল আখড়া। তাঁরই পূত স্মৃতি বহন করে' কালের স্রোতে অবগাহন করে' বর্তমানের তীরে পৌঁছেচে শুধু নামটিই, আর কোন চিহ্ন নাই।....

গ্রামের জীর্ণ দেবালয়—কাজলদীঘির শান-বাঁধানো জীর্ণ ঘাট—জমিদারবাবুর বাগান-বাড়ির পড়ে-যাওয়া প্রাচীর—আরও ইতস্তত-ছড়ানো কত কিছু প্রাচীন জৌলুসের কত কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।···এমন একদিন ছিল যখন হয়ত গ্রামটি ছিল হাসিতে ভরা, সম্পদে ভরপুর। কিন্তু আজ? আজ সে দিন নেই—সে জৌলুসও নেই। চতুর্দিকে বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের ভগ্ন অবশেষ। কালের ঘণ্টানিনাদে তারা চকিত।

নাম ও প্রাচীন কথা

গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান,—তাদের পরই সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বর্ণ-হিন্দু। এ ছাড়া তাঁতি-জোলা-ছুতার-কামার-কুমার-হাড়ি-ডোম-মুচি প্রভৃতি নানা হরিজনও আছে। অধিকাংশই চাষী। অন্যান্য পেশাও আছে নিজ নিজ পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যধারাকে বজায় রাখার জন্যে। দারিদ্র্যের চিহ্ন অনেকের অংগে নামাবলী পরিয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের সারল্যসুন্দর মুখে সরল আন্তর বিশ্বাসটি সুপরিস্ফুট।

অধিবাসী

কাঁচামাটির 'রাজপথ' গ্রামের মাঝখান দিয়ে সরকারী পথের সংগে মিলেছে। এই রাজপথের সংগে এসে মিলেছে ভিন্ন পাড়ার কত ছোট ছোট রাস্তা। মাটির কাঁচা পথ—গ্রীষ্মে জমে হাঁটুভর ধূলা—বর্ষায় হয় কর্দমে পিচ্ছিল—শরতে দুধারের ঘাস ও লুটিয়ে-পড়া ধানের শিশির পথচারীর চরণকে দেয় ভিজিয়ে। গোরুর গাড়ী ছাড়া অন্য কোন যান যায় না সে পথ দিয়ে। তবু ঐ পথই গ্রামবাসীর 'রাজপথ'। সেখান দিয়ে গ্রামের সবাই যায় ঘর ছেড়ে দূরে—দূর থেকে আসে ঘরে।

পরিবহন

গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কাঁসাই নদী। বর্ষার উদ্দামতায় চলছল কলকল নদীটি গ্রামের হৃদয়ে জাগায় শিহরণ। আবার শরতের পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ শান্তি যখন আনে অপরিসীম আনন্দ, তখন গ্রীষ্মের শীর্ণ ধারা দামাল ছেলেদের জানায় আমন্ত্রণ। নদীপথে চলে নৌকা গ্রামের যাত্রী নিয়ে, বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে। যুবকদের চলে নৌকাবাইচ। জেলেরা ধরে মাছ, জেলেনীরা ছুটে আনন্দে মাছের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে বাজারের পথে। নদী বয়ে আনে উর্বর কোমল পলিমাটি, হেমন্তের শেষে চাষীরা তীরে লাগায় পটোল, তরমুজ, বেগুন, আরও কত ফসল। বসন্তের পাগল মন অর্থাভাব থেকে পায় মুক্তি। চাষীগিন্নীর রূপার পৈঁচা—নাকের নোলক—পিছে-পেড়ে কাপড় মিলে অনায়াসে। স্নেহময়ী কাঁসাই সারা বছর গ্রামকে করে' তোলে পুষ্ট তার নিঃসীম স্নেহরসে। নদীর পাড়েই গ্রামের বিস্তৃত মাঠ। সে-মাঠকে করে তুলে শ্যামল এর জলধারা।

নদী

গ্রামের মাঝে কাজলদীঘি, কাজল-কালো জলে ফুটে থাকে কুমুদ-কমল।

কানায় কানায় ভরা বর্ষার দিনে রবি-শশীকে নিয়ে কুমুদ-কমলের চলে আড়াআড়ি। শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় কাজলদীঘিতে বসে সৌন্দর্যের হাট। প্রাতঃসূর্যের তরুণ আলো কমলিনীর লজ্জানত মুখটি তুলে ধরে শারদ-প্রাতের মধুর ক্ষণে। মধুলোভীর দল ছুটে আসে বিনা নিমন্ত্রণে। গ্রামের মধ্যে আছে আরও অনেক পুকুর। তারা বর্ষার উচ্ছল আনন্দে ভরপুর, শরতে প্রশান্ত গম্ভীর, শীতে সৌন্দর্যহীন, বসন্তে বার্ধক্যজরাগ্রস্ত, গ্রীষ্মে রুগ্নশীর্ণ মৃতপ্রায়। কাজলদীঘির জল গ্রীষ্মে গ্রামবাসীর অবলম্বন হয়ে উঠে, পুকুরগুলো তখন জ্বালায় লালবাতি। আশ্রিত মৎস্যকুল হয় নির্বংশ।

দীঘি ও পুকুর

প্রকৃতি দেবী হরিদাসপুরকে বছরের ছ'টি ঋতুতেই সাজান বিশেষ বিশেষ সাজে। গ্রীষ্মের শুষ্ক রুক্ষতা গ্রামে আনে শ্রান্তি—আনে ঔদাসীন্য। ধরিত্রীর তপ্তনিঃশ্বাস আনে চোখে-মুখে জ্বালা, জিহ্বায় অরুচি আর তৃষ্ণা। নদী হয় শীর্ণ। পুকুর হয় মৃতপ্রায়, মাঠ করে ধূ ধূ। কালবোশেখীর ধূলা অন্ধকার করে তুলে বৈকালী আকাশ। মাঝে মাঝে পড়ে বাজ—হয় শিলাবৃষ্টি। পাকা আম জাম কাঁঠালের গন্ধে গ্রামখানি হয় ভরপুর। বেলফুলের গন্ধে হয় সান্ধ্য বায়ু সুরভিত, আরও কত ফুল ফুটে উঠে গ্রীষ্ম সন্ধ্যার ক্লান্ত অবসরে। বর্ষা আসে দিগন্ত ঘন করে'। সে আনে শ্যামলতা—আনে স্নিগ্ধতা। ধরিত্রী ছাড়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস—পেকে উঠে নানা ফল—ঘোমটা খোলে কত লজ্জানত কুসুম। চাষীর মুখে ফুটে উঠে হাসি—দীঘি পুকুর মাঠ ঘাট নদী নালায় জাগে প্রমত্ত যৌবন। আনারসের গন্ধে বিভোল বাতাস চতুর্দিক্ করে আমোদিত। শরৎ আসে মাতৃত্বের পূর্ণ গৌরবে। সে আনে চারিদিকে স্নিগ্ধ প্রশান্তি—আনে তৃপ্ত পূর্ণতা। নদীতীরের কাশবনে জ্যোৎস্নারাতে কাজলদীঘির কুমুদিনী ও প্রভাতের কমলিনীর শুভ্রতা এক দিকে আর অন্য দিকে ভরা মাঠের কচিধানের সবুজনৃত্য গ্রামখানিকে করে সৌন্দর্যমণ্ডিত। হেমন্তের সোনার ধান, শীতের নীরস শুষ্কতা আর বসন্তের মত্ত আনন্দ গ্রামখানিকে ভুলেনি। বসন্তের কোকিল-কূজন ভুলে-যাওয়া কত ব্যথাকে জাগায়—আমের বোলের রসপানে ছোটে মধুকর—কচিপাতায় ভরে উঠে বুড়ো নিমগাছটাও। সারা গ্রামখানিকে লতায়-পাতায়-ফুলে-গন্ধে তখন নববধূর বাসরসজ্জা মনে হয়।

ঋতুচক্রের আবর্তনলীলা

গ্রামের মাঝখানটিতে একটি পাঠশালা। এক দিকে মৌলবী ছাহেবের আসন, আর এক পাশে পণ্ডিতমহাশয়ের বসবার স্থান। ছাত্রসংখ্যা অবশ্য মন্দ নয়। বেশীর ভাগই মুসলমান। কিন্তু এখন আর কেবল আরবী উর্দু শিখলে চলে না। সেজন্য বাংলা ও ইংরাজি এ. বি. সি. শিখ্‌তে হয়। ছাত্রদের ভালবাসা খুবই প্রগাঢ়; কিন্তু মারামারিও হয় খেলার মাঠে—শীর্ণ

বিদ্যামন্দির ও শিক্ষাব্যবস্থা

নদীতে সাঁতারের সময়। সকাল বেলাতেই পাঠশালা বসে। বেঞ্চে বসে বড়ো পড়ুয়ার দল আর চাটাইয়ে বসে ছোটোরা। সুর করে পড়া হয় নামতা—দু'একটি কবিতাও। বিংশ শতাব্দীর ইস্কুলীয় রীতি এখনও যেন আসতে সাহস করছে না এই প্রাচীন বিদ্যামঠটিতে। কাজেই এখানকার শাসনব্যবস্থা যেমন কিছুটা বর্বর, তেমনি অতিরিক্তও। ছেলেরা সেই ভয়েই আসে; নইলে অন্য কোন প্রলোভন কোথায়? পাঠশালার পড়া শেষ করে' বেশীর ভাগই লাগে চাষে, ফলায় কত রত্নশস্য, অন্তরের সরল বিশ্বাসকে কর্মে দেয় রূপ। আর খাদ্যের অবস্থা যাদের সচ্ছল, তারা যায় সহরে কেতাবী বিদ্যার প্রাণহীনতায় হৃদয় বলি দিতে। তারা হয় উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, অফিসের বড় বাবু, থানার দারোগা। তাদের বেশীর ভাগই আর মায়ের শ্যামল অংকে আসে না ফিরে।

জমিদারের কাছারি ও পরিত্যক্ত প্রাসাদপুরী

গ্রামের উত্তর প্রান্তে জমিদারবাবুর বিরাট্ অট্টালিকা আর তার সংলগ্ন বিরাট্ পূজামণ্ডপ এবং কাছারি-বাড়ি। বিপুল অট্টালিকার সে জৌলুস নাই, সে আভিজাত্য-গর্বী অবস্থাও নেই: নির্বাসিতের বেদনা, পরিত্যক্তের গ্লানি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে কালের ঘণ্টা শুনছে যেন স্তব্ধ হয়ে! বছরে মাত্র দু'টিবার যখন জমিদারবাবু সহর থেকে সপরিবারে আসেন গ্রামের এই বাড়িটিতে, তখন প্রোষিতভর্তৃকার পতিমিলনের স্বল্পস্থায়ী আনন্দের মাঝে দীর্ঘ বিচ্ছেদের করুণ বিষণ্ণ পাণ্ডুরতা ফুটে উঠে এই প্রাসাদপুরীতে।

গ্রামের মাঝে মন্দির ও মসজিদ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে যেন বিজয়ার কিংবা ঈদের আলিংগনাবদ্ধ দুই বন্ধুর মত। সন্ধ্যায় বেজে উঠে শংখঘণ্টার বোল আর প্রত্যুষে শোনা যায় আজানের মধুর কণ্ঠস্বর। সারা বছরে পূজাপার্বণের অন্ত নেই। দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা ঘটা করেই হয় হিন্দু-পাড়ায়, দোলের ফাগোৎসব সবাইকে দেয় রাঙিয়ে। শ্রীরামনবমীর মেলা বসে বসন্তকালে। কত দূর দূর গ্রাম থেকে আসে কত লোক—আবালবৃদ্ধবনিতা। চৈত্রমাসে শিবের গাজন হয়—ঢাকের শব্দে চতুর্দিক হয় চমকিত। আর মুসলমানের মহরম হয় বড় ঘটা করে'। জোয়ান মুসলমান ভাইদের লাঠিখেলা দেখার মত জিনিষ হয়ে উঠে। রণবাদ্যের শব্দ দূরান্তের গ্রাম থেকে যায় শোনা। ঈদের দিনটিতে কি সাজসজ্জারই-না পারিপাট্য। সকলের নূতন পোষাক পরার ধুম পড়ে যায়। বিজয়ার আলিংগন আর ঈদের আলিংগন সরল বিশ্বাসী প্রেমিক গ্রামবাসীর আন্তর ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে দেয়। কি অপূর্ব প্রীতি, কি অকুণ্ঠ ভালবাসা সবার মাঝে! সারা বছরেই সারা দিনের কর্মশ্রান্তির পর হিন্দু যায় চণ্ডীমণ্ডপে গীতাপাঠ রামায়ণ-গান কিংবা দাশুরায়ের পাঁচালী শুনতে আর মুসলমান যায় মসজিদে বিশ্বপিতার কাছে

ধর্মচর্চা, পূজাপার্বণ, প্রীতি বিনিময়

প্রার্থনা জানাতে। গ্রামটিতে সহরের মতো বাতিকগ্রস্ত সার্বজনীন পূজার উন্মত্ততা নেই—আছে হাড়ি মুচি মেথর ব্রাহ্মণ মুসলমান সকলের সার্বজনীন প্রীতি। সেজন্ত সকল পূজাপার্বণে উৎসবে-আমোদে পরস্পর পরস্পরকে জানায় আমন্ত্রণ, গ্রহণ করে আপন জনের মতো পরম ঔদার্য নিয়ে। সবাই যেন একই পরিবারের লোক। কেউ গর্বভরে জাত্যভিমানের পরিচয় দেয় না অথবা কেউ গণতান্ত্রিক প্রগলভতা দেখিয়ে অন্যায় অধিকারের অসম্ভব দাবিও জানায় না।

গ্রামে আমোদপ্রমোদের অভাব নেই। উৎসব আনন্দ ছাড়াও শরতে নদীতে চলে নৌকাবাইচ, কাজলদীঘিতে সন্তরণ, দীঘির বিস্তৃত পাড়ে হা-ডু-ডু, কিৎকিৎ। অবসরক্ষণে ডোমের বাঁশি উঠে বেজে—রহমৎ মিয়ার একতারায় বাউল গানের সুর হয় ঝংকৃত। রামদাসের বাড়িতে সন্ধ্যায় কীর্তনের সমবেত কণ্ঠে 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বঁধু, ঐখানে থাক' সংগীত মনের রোম্যান্টিকভাব খোরাক জোগায় এবং 'মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে' সরল চাষীদের দাম্পত্য-জীবনকে মধুরতর করে। নদীর কূলে দামাল ছেলেদের ঝাঁপিয়ে পড়া—আম-কুড়ানোর ধুম—খেজুরগাছের রস পাড়ার ব্যস্ততা যে কোন লোকেরই মনে দেয় আনন্দ।

আমোদপ্রমোদ, খেলাধুলা সংগীতচর্চা

গ্রামে আছে গ্রাম্যপঞ্চায়েৎ। তা গঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক পন্থায়—নবীন ও প্রবীণকে নিয়ে। তারা বিচার করে—দণ্ড দেয়। তারা গ্রামের বিচারক—গ্রামের সংগঠক ও রক্ষক। চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাদের সাপ্তাহিক অধিবেশন—সেখানে সকলের আবেদন নিবেদন দরদ দিয়ে শোনা হয়—সকলকে মিলিয়ে দেওয়া হয় প্রীতির পরিবেশে। সেখানে সবাই সমান বিচার পায়—ধনী-নির্ধন পণ্ডিত-মূর্খ হিন্দু-মুসলমান আর হরিজন। গ্রামে আছেন বদান্য হাজি সাহেব। তিনি শরণঠাঁই, দীনের মাতাপিতা। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা পায় অর্থ—দরিদ্র ব্রাহ্মণ পায় পুত্রের পৈতে দেওয়ার খরচ। আর আছেন মথুরা বাবু। তিনি সংগতিপন্ন দরদী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোজ সকালে ভিড় জমে। কত বিষণ্ণ জননীর মুখে হাসি ফুটে শিশুর আরোগ্যলাভে। কত পতিপুত্রহীনা বিধবা পায় আশ্রয়—পায় কত সাহায্য! কোথাও সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি নেই—কোথাও দ্বিজাতিতত্ত্বের কিংবা জাত্যভিমানের বিষবাষ্পের লেশমাত্র নেই।

গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ও বিচার-ব্যবস্থা; জনসেবায় অসাম্প্রদায়িকতা

গ্রামটি স্বয়ংপূর্ণ। তাঁতের কাপড়, লোহার কাস্তে-কোদাল, কাঠের খেলনা, রুপার পৈঁচা, নাকের নোলক, মাটির হাঁড়ি পাতিল যেমন পাওয়া যায় কারুশিল্পীদের কাছে, তেমনি চাষী জন্মায় পাট, ধান, ডা'ল, তামাক, সরষে, আলু, পটোল প্রভৃতি

শস্য ও খাদ্যবস্তু। দুধের প্রাচুর্যের জন্যে গ্রামটি অন্যান্য গ্রামের ঈর্ষাস্থল। ডিম মাংস মাছও মিলে প্রচুর। গ্রামে চাষীরা পয়সার লোভে অধিকাংশ বেচে ফেলে গোমস্তা সরকার মাষ্টার দোকানী ব্যবসায়ীর কাছে। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন খুব সচ্ছল নয় বটে, তবু উদ্বৃত্ত পাট ধান প্রভৃতি ফসল বিক্রী করে' চাষারা মাসে মাসে গয়না গড়ায়—বলদ কেনে—কখনও-বা ২।১ কাঠা জমিও কেনে। গ্রামের প্রান্তে নদীর পাড়ে বসে হাট হপ্তায় দু'বার—প্রতি সোমবারে ও শুক্রবারে। পাশের কত গ্রাম থেকে আসে কত পণ্যসম্ভার, কত ক্রেতা। নদীপথে আসে বর্ষায় শরতে হেমন্তে কত দূরের কত নৌকা। গ্রামের উদ্বৃত্ত সব চলে যায় দূর গ্রামে। এই মেলামেশায় বাড়ে কত অভিজ্ঞতা, কত জ্ঞানের হয় প্রসার।

অর্থনৈতিক জীবন

গ্রামের আর এক দিকে—হাট থেকে দক্ষিণে একটু দূরে আছে এক শ্মশান, তারই পাশে আবার মুসলমানের কবরস্থান। এক দিকে শ্মশানের শূন্য নির্জন ভয়াবহ স্তব্ধতা এবং অপর দিকে কবরস্থানের পুষ্পরাশি ও সারিবদ্ধ বৃক্ষরাজির শোভা। কিন্তু এত সম্পদেও গ্রামটি ক্ষয়িষ্ণু। অভাবের জ্বালাময় জিহ্বা বিস্তার করেছে গ্রামের সচ্ছলতায়। শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার অভাব—আরও নানা অভাব—নানা রোগ—নানা ভাবনা গ্রামের সুখের নীড়ে এনেছে অশান্তি। এ দূর করতে আজকের যুবকসমাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেই সংগে সরকারও নিয়েছেন পরিকল্পনা। জানিনা, কত দিনে আবার ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় হরিদাসপুরের পুরাণো দিন আসবে ফিরে।··

উপসংহার

সাহিত্য ও আদর্শ

পৃথিবীতে তার অভ্যুদয়ের পর থেকে মানুষ সভ্যতার পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তার জীবনের পরিধিকে সে সীমায়িত করেনি জৈবিক প্রয়োজনে—চরিতার্থতার সংকীর্ণ চৌহদ্দিতে। কেবলমাত্র বেঁচে-থাকা আর বংশবৃদ্ধি করার একমাত্র তাগিদে তার শ্রেয়োবোধ তৃপ্ত হয়নি বলেই জীবনকে সে করতে চেয়েছে সুন্দর, বিচিত্র ও মহিমামণ্ডিত। আর এই শ্রেয়োবোধের কল্যাণময় অনুপ্রেরণায় সে সৃষ্টি করেছে শিল্প সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে। সাহিত্য মানুষের সেই সুন্দরের সাধনার সুযোগ্য বাহন। ডক্টর ব্রেজার বলেছেন—"To live and to cause to live, to eat food and to beget children, these were the primary wants of men in the past,

সাহিত্য-সৃষ্টি

and they will be the primary wants of men in future....other things may be added to enrich and beautify human life, but unless these wants are first satisfied, humanity must cease to exist." মানুষ তাই ভদ্রভাবে মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য যেমন সংগ্রাম করছে, তেমনি সংগ্রাম করছে সেই অস্তিত্বকে সুন্দর ও সুখী করার জন্যে। মানুষেব এই শ্রেয়োলাভের সাধনা আর অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস অবিচ্ছিন্ন। কাবণ,—'Man cannot live by bread alone.' জীবনকে সুন্দর ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করবার প্রয়াসে সাহিত্যের সাযুজ্য অত্যন্ত মূল্যবান।.................. যুগান্তকারী সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে, সাহিত্য সত্য সুন্দর ও শিব এই তিনেরই উপাসক। মংগলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত যে সাহিত্য, তাকে তিনি অন্যায় ও পাপ মনে করতেন। সাহিত্যে আদর্শবাদ থাকবে কিনা, থাকলে পরিমাণে কতটা থাকবে, তাহার ইংগিত এই উক্তিরই মধ্যে ব্যঞ্জিত।

প্রথমে বিচার করা যাক,—সাহিত্যের মূল লক্ষ্য কি? অনেকে মনে কবেন, রস-সাহিত্যের একমাত্র পরিণতি ফলশ্রুতিজাত আনন্দসৃষ্টিতে। সৌন্দর্যবোধের চরিতার্থ-তাই সাহিত্যের চরমতম সার্থকতা। আদিকবির কণ্ঠে ক্রৌঞ্চবিরহের যে শোকগাথা স্বত-উৎসারিত প্রবাহে একদিন প্রকাশিত হয়েছিল শ্লোকরূপে, সেদিন আমরা জেনেছিলাম মহৎ বেদনাই সুমহান্ সাহিত্যের স্রষ্টা। রামগিরি-পর্বতে বিরহী যক্ষের মনোবেদনাকে কাব্যে রূপ দিলেন মহাকবি কালিদাস—মেঘদূতেরও মধ্যে নেই কোনো নীতি বা আদর্শ-বাদের নামগন্ধ। এটি মানবের শাশ্বত হৃদয়বৃত্তির এক বিস্ময়কর রূপায়ণ, রক্তপিপাসু মানুষকে এ বিতরণ করে চলেছে অনাস্বাদিত আনন্দ ও অপূর্ব পরিতৃপ্তি। বিখ্যাত সাহিত্যকার গ্যয়েটের 'ফাউষ্টে' আমরা যে অজানা জগতের সন্ধান পাই, সেটি আমাদের ধূলিমাটির চিত্র নয়, অথচ 'ফাউষ্ট' পরিতৃপ্ত করে মানুষেব রসপিপাসু মনকে। অনেকে মনে করেন, এই সৌন্দর্যসাধনাই সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য।

সাহিত্যের লক্ষ্য

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, সৌন্দর্যের সাহিত্য আর শিল্পের জন্য শিল্প অর্থাৎ Art for art's sake—এ মতটি অত্যন্ত বাজে, যুক্তিবিচারের ধোপে এ টেকে না। নৈয়ায়িক বিচারে এর অর্থ যাই থাক, মানুষের সৌন্দর্যবোধ কখনো অন্যান্য বোধনিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে এই বোধশক্তি দুর্লভ। অতএব, মানুষের সৌন্দর্যবোধ যে অন্যান্য বোধের উপর একান্ত নির্ভরশীল এবং অংগাংগীভাবে জড়িত, সে সত্যটিকে অস্বীকার করা বাতুলতা। তাই তাদের একের চলার পথে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য।

বিরুদ্ধ মত

মনোরাজ্যের বিবিধ বিপরীতমুখী বোধগুলি পরস্পরের মধ্যে সংগতি বজায়

রেখে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করে। অথথা কোন বোধ চঞ্চল হলে বা বিপথে গেলে মনোরাজ্যে বিদ্রোহের সুর জাগে—জীবনশান্তিতে ঘটে ছন্দপতন। আর্টের রাজ্যেও বিভিন্ন মতবাদের এমনি সমন্বয় ও সংগতি থাকা দরকার। মানুষের মনে যদি এই নীতিবাদের ক্ষেত্র পূর্ব থেকে প্রস্তুত থাকে, তবে পতিতা নারীকে মহীয়সী রূপে বিচিত্র করলেও সে আপত্তি জানায় না। কিন্তু এই সমন্বয়বাদকে লংঘন করে' কেবলমাত্র কোন বিশেষ নীতিবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সাহিত্যেব সীমা অতিক্রম করা হয়—সাহিত্যেব মর্যাদাহানিও ঘটে।

বিপরীতমুখী মতবাদের মধ্যে সমন্বয়

সাহিত্যে কোন-না-কোন মতবাদ অবশ্যই থাকবে। কারণ,—সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য যে মানবজীবন, তার দেহশ্রীতে তো অসংখ্য অসংগতি বিচ্যুতি আর অপূর্ণতার ছাপ। সমাজের যে বদ্ধ অচলায়তনে মানুষের জীবনবোধ প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত, সাহিত্যকাব তো সেই সমাজেরই মানুষ —সেই সব মানুষেরই তিনি অগ্রণী সহযাত্রী। ভ্রান্ত মানুষকে নূতন পথেব সন্ধান দেবার জন্যে, তার অপূর্ণতাকে পূবণ করে' সম্পূর্ণ করবার জন্যেই তো তাঁর লেখনী-ধারণ। বিশেষ কিছু বলবাব জন্যেই তো তাঁর বাণীব্রত। তা ছাড়া সামাজিক জীব হিসেবে তাঁব আবও একটা বিবাট্ কর্তব্য আছে—সমাজের অগ্রগতির কাজে তাঁকে সাহায্য করতে হয় যথাসাধ্য। সুতবাং তাঁর বচনায় নিজেব জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে একটা বিশিষ্ট মতবাদ প্রচাব করতে যে তিনি চেষ্টিত হবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর নিজেব জীবনেব আদর্শবাদেব সঞ্জীবনী-বসেই যে তৎসৃষ্ট সাহিত্য জারিত হয়, একথা অবিসংবাদিত ভাবে সত্য। তাঁব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একটা নিজস্ব দৃষ্টি-কোণ থেকে সুন্দবের যে রূপ সন্দর্শন কবে, তাকেই তিনি প্রতিফলিত করতে চান সাহিত্যের মাধ্যমে। হৃদয়বৃত্তির রাজ্যে অবগাহন করে' বাস্তব-নিবপেক্ষ সাহিত্য-রচনার দিন যে অতিক্রান্ত, একথা অস্বীকার করা যুগধর্মকে না মানারই সামিল।

সাহিত্যের মতবাদ

সাহিত্যে আদর্শবাদ প্রচাবেব স্থান থাকলেও তার একটা মাত্রা আছে, নিজস্ব একটা সীমা আছে। বচয়িতাকে সতর্ক থাকতে হয়, যাতে তাঁর নীতিজ্ঞান অযথা আত্মপ্রকাশ কবে' সৌন্দর্যসৃষ্টিকে পণ্ড না করে, যাতে সাহিত্য-সৃষ্টির মূলরসকে কোন মতে ক্ষুণ্ণ না করে। সুন্দবের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে', রস-সৃষ্টিকে অব্যাহত বেখে, যে-সাহিত্যকার অন্তরালে থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নীতিজ্ঞান প্রচাব কবতে পারেন, তিনিই যথার্থ শিল্পস্রষ্টা। শিল্পীর যে গভীর অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণার স্পর্শে সাহিত্যের উজ্জীবন, তা আকাশ ফুঁড়ে বেরোয় না। তবে সেই মত বা আদর্শকে প্রচার করতে হয় অত্যন্ত সতর্কভাবে, পাঠকের

আদর্শবাদের মাত্রা

সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে, শিল্পসৃষ্টির একান্ত নেপথ্যে। কারণ,—এই আদর্শবাদের প্রকৃত মূল্য সাহিত্যের ফলশ্রুতিতে। নতুবা দেবদাসের জন্য শরৎচন্দ্র যতই আমাদের দু'-ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করতে অনুরোধ করুন না কেন, আমাদের মনের সায় না থাকলে আমরা তা মানব কেন? সৌন্দর্য ও রসমাধুর্যের পথে পাঠকচিত্তকে পরিচালিত করে' যদি সেই কাম্য মনোভাবকে জাগ্রত করা যায়, কাংক্ষিত ভাবনার অংশীদার করা যায় পাঠককে, তবেই-না সাহিত্যে আদর্শবাদ প্রচারের সার্থকতা।

এই নীতির ব্যত্যয়ের নজীর বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা করলে আমরা স্পষ্টই অনুধাবন করতে পারি। নিজেকে নেপথ্যে অদৃশ্য রেখে নীতিবাদ প্রচারের যে আদর্শ, সেই 'কান্তাসম্মিত' ভাবকে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা রক্ষা করেন নাই। তিনি স্থানে স্থানে 'প্রভুসম্মিত' কথাও বলেছেন। আর্টের বিচারে সেখানেই উপন্যাসকার বঙ্কিম যবনিকার অন্তরাল থেকে উপন্যাসের পাদপীঠে নীতিপ্রচারকের ভূমিকা নিয়ে দর্শন দিয়েছেন। এই অনধিকার প্রবেশের পর তিনি স্বমুখে যে সকল উপদেশ দিয়েছেন, আর্টের বিচারে তাকে অধিকারের সীমা লংঘন করা ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা চলে না। 'বিষবৃক্ষে'র উপসংহারে তিনি নিজমুখে বলেছেন—"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।" এভাবে কথকের পুরাণ-মাহাত্ম্য প্রচারের ন্যায় নীতি-উপদেশ দানের কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। কারণ,—বিষবৃক্ষের ফলশ্রুতি তো রয়েছে তার আখ্যানভাগেই। তাই বিশেষভাবে এই উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

বিপরীত নজীর

অতএব, পরিশেষে সংক্ষেপে বলা যায়, সাহিত্যে আদর্শবাদ থাকবে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে। সাহিত্যকার থাকবেন আখ্যানভাগের অন্তরালে এবং তাঁর আদর্শ-বাদের সার্থকতা বিচার হবে ফলশ্রুতির মানদণ্ডে। তাঁর আসল উদ্দেশ্য হবে সুন্দরের উপাসনা আর সেই উদ্দেশ্যের বাহন হবে তাঁরই সৃষ্ট সাহিত্য। এই অধিকারের সীমা অতিক্রম করলেই উঠবে আপত্তি—সাহিত্যের মূলরসও হবে ক্ষুণ্ণ।

শেষ কথা

সাহিত্য ও বাস্তব

সাহিত্যের নাড়ীর যোগ সমাজের সংগে, সামাজিক মানুষের সংগে। মানব-হৃদয়ের গভীর অনুভূতির স্পর্শযুক্ত কোন সাহিত্যসৃষ্টি এ যুগে অসম্ভব। বাস্তব জীবনের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিক সত্তা সাহিত্যের মাধ্যমে রূপান্তরিত রূপে এক অখণ্ড পরিপূর্ণতায় প্রতিভাত হয়। জীবনে যে অপূর্ণতার বেদনা, যে বিচ্যুতির বিষাদ,

সাহিত্যের ভাব-রসায়নে সেই বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশগুলিই এক অপূর্ব সম্পূর্ণতায় সমন্বিত হয়, যখন ব্যক্তিক কাহিনী সামগ্রিক সত্যরূপে নিখিল মানবহৃদয়ের কোমল স্পর্শ কামনা করে। সাহিত্যের মধ্যে তাই আমরা পাই জীবনের অখণ্ডতার আভাস, অন্তঃসলিলা মনোবেদনার রসঘন সমগ্র চিত্র। তাই বেদনা-বিধুরতায় ও সাহিত্যে আনন্দের নির্যাস—দৈনন্দিনতার ক্ষুদ্র আবেষ্টনপিষ্ট জীবনে তাই বৃহত্তর মানবতার সুদূর আহ্বান—জীবনের সীমায়িত সসীম পরিধিতে তাই অনন্ত 'অসীমের সুবিপুল অবকাশ। মানুষের প্রয়োজনবোধের তাগিদে সাহিত্যের রূপকল্পনা ঘটলে এই সীমাবদ্ধতার সংকীর্ণতার বাইরেই হয় তার অবাধ বিহার।

সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্যের এই যে সত্যস্বরূপ, ইহার মূল উপজীব্য, প্রধান অবলম্বন তা হলে কি? নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুনিবিড় মানবহৃদয় আর মানুষের আবাসভূমি তার সুখদুঃখের নিকেতন এই সমাজ-সংসার। সাহিত্যিক সত্তা মানুষের মনের গভীর তলদেশে অবতরণ করে' হৃদয়বৃত্তির যে অমূল্য মণিমুক্তা আহরণ করে, তা পরিবেশন করার সুদক্ষ কারিগরিতেই প্রকৃত রসসৃষ্টির সার্থকতা। লক্ষ যুগের হাসি-অশ্রু আর দুঃখসুখের সংগীতে-গাঁথা এই ধরাতলে মানবজীবনের কত বৈচিত্র্য, কত বিভাগ, কত শ্রেণীবিন্যাস। সমগ্র মানুষের রূপ এখানে অভিন্ন নয়—সমাজব্যবস্থার অসম বিন্যাসের দরুণ মানুষের পদমর্যাদা আর তার অবমাননার কতই-না স্তর। সমাজের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ইতর-ভদ্র, ছোট-বড়, সাধারণ-অসাধারণ কত মানুষই-তো বাস করে! সাহিত্যকার যদি প্রকৃত মানবদরদী হন, অপরাজেয় মানবতার যদি তিনি হন সহযাত্রী, প্রকৃতভাবেই যদি তিনি পূজারী হন সত্য শিব ও সুন্দরের—তবে কাহাদের জীবন অবলম্বনে গড়ে উঠবে তাঁর সাহিত্যপ্রয়াস? এ প্রশ্নের সদুত্তরের উপর নির্ভর করে সাহিত্যে বাস্তবতার যাচাই।

সাহিত্যের সামগ্রী

উত্তরাধিকারসূত্রে যে-সাহিত্যের অধিকারী আমরা, তা বিচার করলে দেখা যায়, সেখানে দেশের সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার অত্যন্ত কড়াভাবে নিয়ন্ত্রিত। দু' একজন আগন্তুক সেখানে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু তাদের তেমন সমাদর হয় নাই—সে যেন ঘোর অন্ধকার কামরায় কোন গোপন ছিদ্রপথে প্রবেশ-করা এক ঝলক আলোরই মত। তখন সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা ইত্যাদি ছিলেন উচ্চশ্রেণীর মানুষ—রাজা-মহারাজ-জমিদার শ্রেণীর লোক। চাকর-বাকর বা দাস-দাসী অথবা নেহাৎ ভাঁড় হবার সুযোগ পেলেও নায়কত্বের সম্মান তারা কোনদিনই পায়নি। বড়লোকের ছেলের বিয়েতে

অতীতের ইতিহাস

শোভাযাত্রার গৌরব বর্ধন করতে গ্যাসের বাতি বইবার জন্য যেমন কতকগুলি অন্ধকারের যাত্রী ভারবাহী মানুষের দরকার হয়, সেদিনের সাহিত্যেও তেমনি সাধারণ মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে—ভীত ত্রস্ত সংকুচিত পদে। কারণ,—সে যুগটাই ছিল Hero-worship বা বীরপূজার যুগ। সমাজ ও রাষ্ট্রের চাবিকাঠি ছিল ঐ সব মানুষের হাতে! আর দেশের বোবা মানুষ বিস্মৃতির ঘোরে, চৈতন্যের অভাবে, খুঁজিয়া পায় নাই মুক্তিপথের সন্ধান।

কালপ্রবাহের বিরাট্ পরিবর্তনের ফলে সাহিত্যের পথ-চলারও ঘট্‌ল দিক-বদল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগ্রত সংবিৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নাম্‌ল উচ্চঃশ্রেণীর সংগে। রাজনৈতিক চেতনার দ্রুত অগ্রগতি প্রভাব বিস্তার করল আমাদেব সাহিত্যের 'পরে। সবার উপরে যোগ দিল বিদেশী সাহিত্য, বিশেষত ইংরাজি সাহিত্যেব যুগান্তকাবী প্রভাব তো পড়লই। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্পর্শে আমাদেব দেশেব সাহিত্যিকেরাও নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে পদচারণ সুরু কবলেন। ফলে দেখা গেল, মধ্যবিত্ত-শ্রেণী সাহিত্যের আসর জঁাকিয়ে বসেছে আর 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'র মতো দেশেব ইতরজনও মধ্যে মধ্যে পাত্ পাডছেন। এবাবে সাহিত্যেব মধ্যে যেমন নূতন মানুষেব সন্ধান পাওয়া গেল, তেমনি দেখা গেল এদেশেব জরাজীর্ণ মৃতকল্প সমাজের ছবি। সমাজ আর মানুষকে পৃথক্ না রেখে দেখানোব চেষ্টা হল বর্তমান সমাজের পবিপ্রেক্ষিতে মানুষের স্থান কোথায়। সাহিত্যকে এতদিন যেভাবে ধূলিমালিন্যের ঊর্ধ্বে শুভ্রতার আবরণে আবৃত করে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল, তা আর টিক্‌ল না। মানুষের জীবন যে তার সকল ভালো-মন্দে মেশানো—সাহিত্য-রচয়িতারা সেই সত্যটিকে স্বীকার কবে নিলেন। তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন মানুষের নীচতা-দীনতা-ঘৃণ্যতার জন্য সমাজও সমভাবে দায়ী। তাই সাহিত্যের জয়যাত্রাব পথে নূতন ভাবজগতের তোরণদ্বার হল উন্মুক্ত।

ভাবধারার বিবর্তন

সনাতন ধ্যানধারণায় পুষ্ট পুবাতনপন্থীরা রব তুল্‌লেন—সাহিত্য নিয়ে এ সব ছেলেখেলা চলবে না, সাহিত্যকে বাজারের জিনিষ করে' তার বিশুদ্ধ শুভ্রতা কলংক-মলিন করা চলবে না, সাহিত্যের কণ্ঠরোধ করে' এভাবে তার অপমৃত্যু ঘটানো চলবে না। প্রতিবাদীরা বললেন—সাহিত্য মানুষের নিভৃত আনন্দের সৃষ্টি, তার স্থান বাস্তব পৃথিবীর ধূলিমাটির মধ্যে নয়। ক্যামেরায় ছবি তোলার মত বাস্তবের ফোটোগ্রাফী করলেই সাহিত্যে রসসৃষ্টি হয় না, সার্থক মহৎ সাহিত্যের উদ্ভব হয় না। অর্থাৎ তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল বাস্তবধর্মী সাহিত্যিকেরা কেবল বাস্তবের কুশ্রী ঘটনার বিন্যাস-সাধনই করতে পারেন—প্রকৃত রসসৃষ্টি করতে পারেন না।

পুরাতনপন্থীদের সহিত বিরোধ

প্রশ্নটি একদেশদর্শী। আমরা পূর্বেই বলেছি, সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য মানুষ ও সমাজ। মানুষ বলতে কোন বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষকে বুঝায় না। দেশের আপামরদুঃখী জনসাধারণই এ সমাজের মেরুদণ্ড—তাদেরই তিল তিল রক্তমোক্ষণে শিল্প-সংস্কৃতির স্বর্ণমিনার গগন ভেদ করে' উঠেছে। সাহিত্যে তাদের জীবনকে রূপায়িত করা এমন কিছু গুরুতর অপরাধ নয়, সাহিত্যের প্রাণধর্মের বিরোধীও নয়। বর্তমান যুগের মানুষের শ্রেয়োবোধমূলক কল্পনার জগতে বিরাট্ যুগান্তর ঘটেছে। সুতরাং সাহিত্য-রচনার পুরোণো রীতিনীতি-পদ্ধতি এ যুগের নবতর বিশ্বাসের নবজাতককে স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। লেনিন সত্যই বলেছেন,—'Art belongs to the people. It ought to extend with deep roots into the very thick of the broad toiling masses.' সাহিত্যে জনতার বা বাস্তব সমাজের উপস্থিতি তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

অভিযোগের উত্তর

কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে আসল আপত্তি অন্য দিক দিয়ে। সাহিত্যের রসসৃষ্টিই প্রধান কথা—সেই সৃষ্টিপ্রবাহকে যদি বাস্তববাদ ক্ষুণ্ণ না করে, তবে সেখানে আপত্তি উঠতে পাবে না। কিন্তু বাস্তববাদের নামে সাহিত্যিক যদি মানবমনের গভীরতম রহস্যের সন্ধান দিতে না পারেন, সুন্দরের উপাসনাকে বিঘ্নিত করে' তোলেন, তবে তার বস্তুতান্ত্রিকতা সাহিত্যের অধিকারমাত্রা অতিক্রম করে যায়। সাহিত্যের সামগ্রী তার যাই হোক, তাকে রসঘন ভাবে পরিবেশন করতে পারারই মধ্যে রচনাকারের বাহাদুরী, নতুবা নিছক বাস্তববাদের নামে নোংরা জীবনের অশোভন চিত্রণ সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি নয়। সাহিত্যে আদর্শবাদের যেমন একটা সীমা আছে, তেমনি আছে বাস্তববাদেরও গণ্ডি। অবশ্য রূপান্তরের পথে সাহিত্যের জয়যাত্রার অনেক পুরোণো নীতির পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু জীবনকে সুন্দর ও সুখী করবার যে মূল আদর্শ তা ঠিকই আছে। এই উদ্দেশ্যের যা সহায়ক, তাকে অস্বীকার করা বাতুলতারই নামান্তর।

আপত্তি কোথায়—শেষ কথা

সাহিত্য ও প্রচার

আজকাল সমালোচনা-সাহিত্যে একটা কথার বড় বেশী চল। আধুনিক সাহিত্যের সচেতন গণকেন্দ্রিক জয়যাত্রাকে যাঁরা বিষদৃষ্টিতে দেখেন, তাঁরা এই উদ্যমকে নস্যাৎ করে দিতে চান 'প্রোপাগ্যাণ্ডা' বা নিছক প্রচার বলে'। তাঁরা বলেন, সাহিত্যের মধ্যে কোন মতবাদ বা উদ্দেশ্যকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে জনবরেণ্য করে তোলবার চেষ্টা বাতুলতা—সারদার বাণী-কুঞ্জে রাজনৈতিক বিশ্বাসের মতো হস্তীর সদর্প পদচারণা কোনমতেই অভিনন্দনযোগ্য

সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি

নয়। সাহিত্যের জগৎ পার্থিব ধূলিমালিন্যের অনেক উর্ধ্বে—তাকে দৈনন্দিনতার রুক্ষ ধূসরতার মধ্যে নামিয়ে আন্‌বার দুর্বিনীত চেষ্টা সাহিত্যিক ব্যভিচার মাত্র।

অভিযোগের ভাষায় যে তীব্রতার প্রকাশ, বিরুদ্ধবাদীদের আক্রোশের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশী। সাহিত্যকে একেবারে অপ্রয়োজনের আনন্দ বলে' আখ্যাত করতে পূর্বের মতো মনের বা সমর্থনের জোর এঁরা পান না সব সময়। কারণ,—উদ্দেশ্য-হীন সাহিত্য যে আকাশকুসুম কল্পনা, সেকথা এঁরা মর্মে মর্মে বোঝেন—আর বোঝেন বলেই বলেন, সাহিত্যের শেষ লক্ষ্য হল আনন্দসৃষ্টি ও সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। আধুনিক প্রগতিবাদী সাহিত্যের প্রবক্তারা বিনা বাক্যে স্বীকার করেন, সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য আনন্দসৃষ্টি। কিন্তু আনন্দসৃষ্টিকেই তাঁরা এক এবং অদ্বিতীয় লক্ষ্য বলে' মানতে নারাজ। তাঁদের জিজ্ঞাস্য হল—আনন্দসৃষ্টি কিসের জন্যে? অলস অবসরের কর্মহীন বিরতিকে ভরবার জন্যে, না—মানুষের আশাহত চিত্তকে আনন্দমন্ত্রে প্রবুদ্ধ করে' মহত্তম সৃষ্টির পথে প্রবর্তনা দেবার জন্যে? সংগ্রামের পথে সাহিত্য কি নিরপেক্ষ দর্শকের মতো মানুষকে প্রবঞ্চিত করবে, না—অনুপ্রেরণা যুগিয়ে সফল করে' তুলবে।

অভিযোগের স্বরূপ বিচার

সাহিত্যের যে উদ্দেশ্য আছে, সেকথা গোঁড়া সাহিত্যধ্বজীরাও জানেন ও মানেন। তাঁরা বলেন—সে উদ্দেশ্য হল আনন্দদান ও জীবনে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা-স্থাপন। অর্থাৎ সাহিত্যিক ও শিল্পীর ব্রত হচ্ছে মানুষকে আনন্দ দেওয়া এবং জীবনে সুন্দর ও সত্যের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা। একথা যদি সত্য হয়, তবে সাহিত্যের প্রচারবাদী মূল্যকে প্রমাণ করা অত্যন্ত সহজ। সাহিত্যিক বা শিল্পী নিজের জন্যে সাহিত্য বা শিল্প রচনা করেন না—করেন অন্যের রসোপলব্ধিকে চরিতার্থ করার জন্যে। অর্থাৎ স্বীয় প্রতিভার যাদু-স্পর্শে তিনি সৃষ্টি করেন আর তার যথার্থ মূল্যবিচার হয় অন্যের অনুভবে। কথাটা একটু জোরালো ভাষায় বললে দাঁড়ায়, স্রষ্টার সীমায়িত গণ্ডিতে সাহিত্যের মূল্য কানাকড়ি—পাঠকসমাজের সমাদরই তার আসল মূলধন। যত বেশী লোক সাহিত্যের রসাস্বাদন করে, ততই তার সার্থকতা।

আসল আপত্তি—রাজনীতি

প্রকারান্তরে, এই কথাই প্রমাণিত হল যে, প্রচারেরই মধ্যে সাহিত্যের প্রাণ। কবি যেমন নিজে পড়বার জন্যে কবিতা লেখেন না—শিল্পীর চিত্রায়ণও তেমনি নিজের চোখের তৃপ্তির জন্যে নয়। আসলে পাঠকহীন লেখক ও সমঝদারশূন্য শিল্পীর অস্তিত্ব অস্বাভাবিক। নীরব কবিত্ব যেমন অবাস্তব—এর ব্যতিক্রমও তেমনি অসম্ভব। যে-প্রশ্নকে কেন্দ্র করে' সমালোচনার ঘূর্ণিঝড় উঠেছে তার মোদ্দা কথা হল—সাহিত্যের মধ্যে

প্রচারের মধ্যেই সাহিত্যের প্রাণ

রাজনীতিক চেতনার বাষ্পমাত্রেরও 'প্রবেশ নিষেধ'। কারণ,—এতে সাহিত্যের শুচিতা হয় নষ্ট, ঐতিহ্যও থাকে না, উদ্দেশ্য হয়ে যায় ব্যর্থ এবং সাহিত্যও শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় বাজারের সস্তা পণ্য।

এ অভিযোগ কি সত্য?

এ-কালের সাহিত্যিক কখনও সমাজের নির্দেশকে, ইতিহাসের সাক্ষ্যকে অবহেলা করতে পারেন না। কারণ,—তাঁর প্রতি রক্তকণিকায় আছে বিদ্রোহের বীজ। যে-সমাজ তাঁর শিল্পীমানসকে পরিবর্ধিত করার উপযুক্ত রসদ দেয় নি, মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার তাঁকে দেয় নি—সাহিত্যসাধনায় মানুষের পুলকোচ্ছল সুখী জীবনযাত্রার সুন্দর চিত্র আঁকবার পথ রোধ করে রেখেছে—নির্বিকার ঔদাসীন্যে তাকে স্বীকার করা কাপুরুষতা, আত্যন্তিক আগ্রহে তার জয়কীর্তন করা অমার্জনীয় অপরাধ। সাহিত্যিকের দরদ অবজ্ঞাত অবহেলিত নিপীড়িত মানবতার পথে—অন্যায় অসত্য অবিচারের রক্তচক্ষুর সামনে তার পলায়নপরতার নীতি আত্মহত্যারই নামান্তর।

যুগাগত সত্যকে মানতে গিয়েই তাদের সাহিত্যে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে যুগের স্বাক্ষর। সর্বহারা মানুষের বেদনার কাহিনীকে রূপায়িত করতে গিয়ে সুন্দর ও সুখী জীবনের জন্য সংগ্রামরত তার জীবনের উজ্জল দিকে অন্ধ দৃষ্টি মেলে নির্বিকল্প

সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রচার, কিন্তু প্রচারমাত্রই সাহিত্য নয়

এক সাজা যায় না। তবে সেই সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে কেবল বাস্তবের কুশ্রী দিকের জঘন্য ফোটোগ্রাফী করা বা গরম গরম 'স্লোগান'-এর জোড়-বিজোড় মিলনে কাব্যরচনার উন্মাদনা প্রকাশ করা সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি নয়। 'স্লোগানের' সাময়িক মূল্য থাকতে পারে। তাই বলে তাকে সাহিত্য হিসেবে চালু করতে যাওয়া জবরদস্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রচার হতে পারে, কিন্তু প্রচারমাত্রই সাহিত্য নয়। ...কারণ,—সাহিত্যের কতকগুলো নিজস্ব ধর্ম, কতকগুলো বিশিষ্ট গুণ আছে। ব্যক্তির ভাবনা যদি সামগ্রিকতা লাভ না করে—ব্যষ্টির বেদনা যদি সমষ্টির বেদনায় প্রতিভাত না হয়, তবে ব্যর্থ হয় সাহিত্যিকের সাধনা। সাহিত্যের প্রথম কথা রসঘনতা—তারপর অন্যান্য বিচার। রসসৃষ্টি সার্থক হলে অন্য আপত্তি তিলমাত্র টিকতে পারে না।

শ্রীযুত ফ্যারেলের মতে, প্রচার বা 'প্রোপাগ্যাণ্ডা' জিনিষটি হচ্ছে 'a method of **conventionalising and epitomising thought and policy**'। সাহিত্য ও

প্রচার ও সাহিত্যের স্বরূপ বিচার

প্রচার—উভয়েরই মধ্যে ভাব বিদ্যমান। সাহিত্য প্রকাশিত হয় ভাষায়-রূপে-রঙে ভরে'; পক্ষান্তরে 'প্রোপাগ্যাণ্ডা'র ভাবটি প্রকাশিত হয় ভাষার দীনতার মধ্য দিয়ে রূপ-রঙ-বিবর্জিত হয়ে। "ভাব তাই সাহিত্যের মধ্যে তরংগায়িত হয়ে অন্তরকে স্পর্শ করে,

সেই স্পর্শে পুনবায় তরংগের সৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রোপাগ্যাণ্ডার মধ্যে ভাব দানা বেঁধে দলা পাকিয়ে যায়, তাই তীববেগে বাণের মত যখন সে অন্তরে বিঁধে যায় তখন হয় প্রবল উত্তেজনাব সৃষ্টি, একরাশ বুদ্‌বুদের মত ফুলে ফেঁপে সে অন্তর্ধান করে। মুগুর উঁচিয়ে কাজ করানোর মত প্রোপাগ্যাণ্ডা মানুষকে কর্মে উৎসাহিত করে, কিন্তু তাতে চোখ-রাঙানিব আব ধমকানির মাত্রাই থাকে বেশী.....সাহিত্যের উদ্দেশ্যও...... মানুষের মর্মজীবনেব প্রেবণা জোগানো, মানুষকে জীবন্ত কবা, জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করা—কিন্তু ধমক দিয়ে বা 'লগুডেন' নয়, গায়ে হাত বুলিয়ে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে, বুঝিয়ে, যুক্তি দিয়ে, প্রলুব্ধ কবে', মুগ্ধ কবে'। সাহিত্য সেইজন্য দীর্ঘায়ু এবং প্রোপাগ্যাণ্ডা স্বল্পায়ু।.......অন্তঃসারশূন্যতাই প্রোপাগ্যাণ্ডাব বৈশিষ্ট্য ; সাহিত্যেব বৈশিষ্ট্য গভীবতা। প্রোপাগ্যাণ্ডাব মধ্যে 'উদ্দেশ্য' তাই মুখ্য, প্রকাশভংগী গৌণ, সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশভংগী, অর্থাৎ ভাষা, ঘটনা-গ্রন্থন ও চরিত্র-চিত্রণই মুখ্য, 'উদ্দেশ্য' গৌণ। সাহিত্য ও প্রোপাগ্যাণ্ডা দুই-ই উদ্দেশ্যমূলক হলেও, দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান আকাশ-মাটি।"

যে সত্য-সুন্দবেব কথা বলা হয় 'ডংকানিনাদ করে', তাব পরিবর্তন হয় যুগে যুগে। 'Old order changeth, yielding place to new'—একথা কাব্যিক উচ্ছ্বাস নয়—ইতিহাসের পরীক্ষিত সত্য। সুন্দবেব আদর্শও তাই চিবকাল অপরিবর্তিত থাকতে পাবে না। মানুষ আজ সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তাব যুক্তিবাদ্যে—আলেয়ার মায়ায় ভুলে অনিশ্চিতেব পিছনে উধাও হবার দিন তাব নেই। সে জানে, মানুষের জীবন সুন্দব ও সুখী হতে পাবে, যদি বর্তমান সমাজেব কাঠামো ভেঙে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা কবা যায়। এই লক্ষ্যে পৌছানোর সংগ্রামে শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাজই হচ্ছে পথনির্দেশ করা। তাঁবা যে পথ দেখাবেন, সেই পথেই চলবে সর্বহারাদের জয়যাত্রা। এই মহাসত্যকে কি অস্বীকাব করা চলে? এ কি যুগেব সত্য নয়? তবে সাহিত্যের বিচাব হবে আজ কোন্ মানদণ্ডে?

শেষের কথা

সাহিত্য ও রাজনীতি

সাহিত্য জীবনের রসশিল্প। জগৎ ও জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মনের যে নিবিড় নিভৃত অনুভূতি রসঘন হইয়া বাণীতে ভরিয়া উঠে, তাহাই সাহিত্য। তাই জীবন সাহিত্যের আলম্বন আর জগৎ তাহার উদ্দীপন। বস্তুবিশ্বের গতিপ্রকৃতিব যে নিজস্ব ধারাটি রহিয়াছে, তাহার সহিত জীবন কখনও বাধাহত হইয়া বেদনায় কাঁদিয়া উঠে, আবার জগৎ ও জীবনের প্রকৃতিতে যখন সমন্বয়ের সুর ফুটিয়া উঠে, তখন জাগে আনন্দের

মানবজীবনের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক

শি, জাগে বিহ্বলতার আবেশ। সাহিত্য এই সুখদুঃখের নিবিড় গোপন অনুভূতির সপ্রকাশ।

জীবনের নিজস্ব গতি-প্রকৃতির সহিত রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থার একটা সংগতিবিধানের প্রয়াস হইতে রাজনীতির জন্ম। মানুষের জীবনপ্রকৃতিকে কেমন করিয়া রাষ্ট্র-প্রণালীর সহিত খাপ্ খাওয়াইয়া লওয়া যায়, এই চিন্তা হইতেই আদিম মানবের মনে রাজনীতিবোধের জন্ম হইয়াছিল। জীবনের সহিত রাজনীতির এই সম্বন্ধ হইতেই জীবনশিল্প সাহিত্যের সহিতও ইহার একটি সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজনীতিকে যদি জীবনের সহিত একান্তভাবে সংযুক্ত বলিয়া মনে করি, তবে তাহার প্রবেশ সাহিত্যেও অপরিহার্য হইয়া উঠে। কারণ,—সাহিত্য মানবজীবনের বাস্তব পরিবেশের মধ্য হইতেই উন্নীত হইয়া এক রসলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে স্বপ্নানন্দী উচ্ছ্বাস কবি-কল্পনার ফলশ্রুতিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা জীবনের বাস্তব পরিবেশ হইতেই তাহার বস্তুরূপ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হয়। এই বস্তুর সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। তাই সারদার বাণীকুঞ্জে রাজনীতিকে একান্ত মত্ত হস্তী বলিয়া মনে করা ভুল।

মানবজীবনের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক

তবু একটি কথা মনে করিবার আছে। সাহিত্য জীবনের রসশিল্প—শুধুমাত্র বস্তুবিশ্লেষণ নয়। জীবনের বস্তুগুলিকে অবলম্বন করিয়াও তাহাদের অন্তস্তল হইতে নিভৃত মানবহৃদয়ের অতলান্ত রহস্যকে রসরূপ দিতে হইবে সাহিত্যে। জীবনের বস্তুসত্তার নিবিড় গহনে আছে যে গভীরতম জীবনরস, সেই রসকে কবিশিল্পী তাহারই অনুরূপ নিপুণ কলাকৌশলের মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন। সাহিত্যের আত্মা সেই গভীর জীবনরহস্য আর তাহার রূপ (Form) নিপুণ শিল্পকলা। এই ভাব ও রূপের সুসংগতির মধ্য দিয়া সহৃদয়-হৃদয়সংবেদনার ফলেই জীবন রসশিল্পে রূপান্তরিত হয়। সাহিত্যের এই মূল কথাটিকে মনে রাখিতে পারিলে আমাদের বিচার-বিভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সত্যের আলোকে পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সাহিত্য জীবনের বস্তুরূপ হইতে উদ্ভূত হইলেও ঐ বস্তুই রসোত্তীর্ণ হইবার পথে প্রধান সম্বল নয়। কোন একটি শিল্পসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে কিনা, তাহার বিচার করিতে বসিয়া তাহার কথাবস্তু বা সমস্যাপ্রচারটিকে একান্ত প্রধান করিয়া দেখিলে আমরা ভুল করিয়া বসিব। বাস্তবসমস্যা বা কথাবস্তুটি প্রয়োজনীয় হইলেও সেই কথাবস্তু ও বাস্তব সমস্যাটির মধ্য দিয়া যে জীবন চিত্রিত হয়, তাহার গভীর মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে কিনা, বস্তুর মধ্য দিয়া সেই জীবন একান্তভাবে গভীরতর অনুভূতি ও নিবিড় রসসংবেদনায় অভিস্নাত হইয়াছে

সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড

কিনা, ইহাই আমাদের বিচার্য। সংগে সংগে সাহিত্যের শিল্পকৃতিত্বকেও আমাদের বিচারের সময় মনোযোগের সহিত চিন্তা করিতে হইবে। আসল কথা, কবির সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য হইবে জীবনের রসমূর্তি অংকন ও বস্তু-পরিবেশের মধ্য দিয়া জীবনকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে এক অলৌকিক রসসংবেদনায় উন্নীত করা।

ইহাই যদি হয় সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও তাহার বিচারের মানদণ্ড, তবে রাজনীতিকে অন্যান্য সমস্যারই মত জীবনের একটি সমস্যা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রেম, সমাজদ্বন্দ্ব প্রভৃতির মতই রাজনীতিও অন্য সকলের সহিত জড়িত জীবনের অন্যতম সমস্যা মাত্র। এই কথা মনে করিলে রাজনীতিকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিতে আমাদের কুণ্ঠার প্রয়োজন নাই। আবার আর সকল সমস্যাকে বর্জন করিয়া রাজনীতি প্রচারের অতি-উৎসাহেরও প্রয়োজন নাই। রাজনৈতিক সমস্যাকে অবলম্বন করিয়াও যদি জীবনরস সৃষ্টি করা যায়, তবে তাহা রসোত্তীর্ণ উচ্চাংগ সাহিত্যই। রাজনৈতিক সমস্যাপীড়িত জীবন চিরন্তন মানবজীবনের রসসংবেদনা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে কিনা, শিল্পবিচারে আমাদের তাহাই মনে রাখিতে হইবে। শুধু সমস্যাটির গুরুত্ব-লঘুত্বের মাপকাঠিতে শিল্পের সার্থকতা বিচার করিতে গেলে বিভ্রান্তি হইবে।

রাজনীতি একটি জীবন-সমস্যাবিশেষ বলিয়া ইহাও সাহিত্যের সামগ্রী

পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, যে সকল রাজনৈতিক সমস্যামূলক শিল্পসৃষ্টি অমরত্বে উন্নীত হইয়াছে, তাহাদের সার্থকতার কারণ শুধুমাত্র ঐ সমস্যাগুলিই নয়। উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তাহারা চিরন্তন মানবজীবনের রসরহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে এবং সেইজন্যই তাহারা চিরকাল মানুষের জীবনশিল্প হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। রুশ্ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম্ গর্কির 'মা' তৎকালীন রাজনৈতিক বিদ্রোহের কথাচিত্র হইয়াও চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যধারায় সঞ্জীবিত হইয়াছে। শ্রীমতী পার্ল বাকের 'গুড্ আর্থ' কৃষকজীবনের একান্ত বস্তুচিত্র হইয়াও চিরকালের মানবজীবনরসসিঞ্চিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সার্থক প্রগতিবাদী শিল্পীদের লেখনীতে রাজনীতি ও সমাজনীতির একান্ত বস্তুরূপ থাকিলে তাহা মানবজীবনের রসমূর্তি হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক রুশ্ সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে এই বাস্তব জীবনরস—যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই এই সংগ্রামী বাস্তব জীবনের বাণীরস।

রাজনৈতিক সমস্যামূলক সাহিত্যের চিরন্তনত্ব

তাই রাজনীতি জীবনরসসৃষ্টির অবলম্বনমাত্র আর সাহিত্য রাজনীতি-প্রচারের জন্য নয়, এই কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। যে-লেখক শিল্পসৃষ্টি করিতে

বসিয়া একান্ত সচেতনভাবে তাঁহার যুগের রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে বক্তৃতার ভংগীতে প্রচার করিতে বসেন, তিনি রাজনীতি-প্রচারক হইলেও জীবনরস-রসিক শিল্পী নহেন। কারণ,—তাঁহার রসসৃষ্টির প্রয়াস সমস্যা-প্রচারের উৎসাহে একান্তভাবে ব্যাপৃত। তাঁহার রচনা তাই সেই যুগকে অতিক্রম করিতেই স্বকীয় জীবন হারাইয়া বসিবে। কিন্তু যে-শিল্পী রাজনৈতিক সমস্যাপীড়িত জীবনকে অবলম্বন করিয়াও উহার গভীরে অবগাহন করিয়া উহাকে রসস্নিগ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন, তিনিই সফল সাহিত্যিক। রাজনৈতিক সমস্যামূলক বিষয়বস্তু লইয়া শিল্পসৃষ্টি করিতে বসিয়া শিল্পীকে তাঁহার রসসৃষ্টির প্রধান কর্তব্যকে ভুলিলে চলিবে না। রাজনীতি সাহিত্যের অবলম্বন হইয়া থাকিতে পারে, রাজনৈতিক সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতকে জীবনের রসসৃষ্টিতে সহায়ক হিসাবে গ্রহণও করা যাইতে পারে, কিন্তু সার্থক শিল্পীকে সেই রাজনীতির আবর্ত হইতে জীবনের গভীরতম রসসত্যে অবশ্যই উন্নীত হইতে হইবে।

রাজনৈতিক সাহিত্য-শিল্পীর গুরু দায়িত্ব—শেষ কথা

সাহিত্য, সমাজ ও জীবন

মানুষ পৃথিবীতে একাকী বাস করিতে পারে না—তাহারা বাস করে দলবদ্ধ ভাবে। সকল মানুষের মিলনেই সমাজব্যবস্থার উদ্ভব। সমাজই মানুষের সৃষ্টি—মানুষ সমাজের ক্রীতদাস নয়। আর সামাজিক জীব বলিয়াই মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এই সমাজেরই মধ্যে। সমাজকে বাদ দিয়া মানুষের যে পরিচয়, তাহা অসম্পূর্ণ। সংসারত্যাগী মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনায় জগতের ক্ষতিবৃদ্ধি সামান্যই। (সাহিত্যের কারবার মানুষের হৃদয়বৃত্তি লইয়া আর এই জটিল মানসিকতার বিবর্তনের মুখ্য কারণ তো এই সামাজিক পরিবেশই। মানুষ মিলিয়া মিশিয়া বাস করিয়া যেদিন সামগ্রিক কল্যাণর মধ্যে নিজের কল্যাণের মন্ত্র খুঁজিয়া পাইল, সেইদিন হইতেই তাহাদের সভ্যতার সূত্রপাত ও অগ্রগতি। সমাজবোধই তাহাদের সকল উন্নতির প্রাণশক্তি, সকল উৎকর্ষের মূল উৎস।)

জীবনের সংগে সাহিত্যের সম্পর্ক

(দেশে দেশে সামাজিক মানুষের মধ্যে বর্ণ-ধর্ম-স্বার্থ ইত্যাদির বিচারে অসংখ্য ব্যবধান।) কোন দেশের মানুষ সভ্যতার উত্তুংগ শৃংগে আরোহণ করিয়াছে—রাষ্ট্রীয় মদমত্ততায় কেহ-বা অন্যকে নির্মমভাবে শোষণ করিয়া অবনতির হীনতম অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছে। এই অসম ব্যবস্থায় কত স্তর, কত প্রভেদ! (কিন্তু সাহিত্যের উপজীব্য যে মানুষের মন, সেখানে মানুষে মানুষে এই বিসদৃশ পার্থক্য নাই—মানবিক বৃত্তিনিচয়ের পর্যালোচনায় সেখানে তাহাদের গোত্র এক ও অভিন্ন। মহৎ

মানবসমাজ ও সাহিত্য-জগৎ

সাহিত্য দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের রসপিপাসু চিত্তে আপনার চিরস্থায়ী আসন লাভ করে। হৃদয়ের ক্ষেত্রে এই যে মিলন, ইহা সাহিত্যের মস্ত বড় সম্পদ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যের আনন্দরসের উত্তরাধিকারী সকলেই—প্রেম-ভালবাসা-স্নেহ-প্রীতি ইত্যাদি সদ্‌গুণ সকল দেশের মানুষের মনে একই ভাবে বিরাজমান। কালিদাসের 'মেঘদূতে'র রসাস্বাদনে য়ুরোপীয় মনীষী যেমন অপূর্ব আনন্দ অনুভব করেন, তেমনি জার্মান গ্যয়টের 'ফাউষ্ট' বা হোমারের 'ইলিয়াড' 'অডিসি' পাঠ করিয়া ভারতীয় রসিকচিত্তও পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতাব সঞ্চয় হয় পৃথক্ পৃথক্ পরিবেশে। নিজস্ব সমাজের প্রভাবেই তাঁহার ধ্যানধারণার গঠন। দূরপ্রসারী সামাজিক প্রভাবে তাঁহার সাহিত্যের প্রাণশক্তি প্রতিস্পন্দিত। আলাদা আলাদা পরিবেশে সৃষ্ট সাহিত্যের সার্বজনীন আবেদন তাহা হইলে কি প্রকারে সম্ভব? এক দেশের লোকেব জীবনে যাহা সত্য, অন্য দেশেব লোকের পক্ষে তাহা কি প্রকারে অভিন্ন হইতে পাবে? প্রশ্নটির সদুত্তর লাভ করিতে হইলে আমাদেব জানা দরকার—সাহিত্যের সত্য আব জীবনের সত্য, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

সাহিত্যের সার্বজনীনতা

সংসারী মানুষের জীবনে অপূর্ণতার সীমা নাই। মানুষ জীবনে যাহা পায়, তাহা তাহার আন্তর কামনাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। কারণ, সে যাহা চায়, তাহা সে পায় না। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যটিকে অত্যন্ত চমৎকাব ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—

'আমি যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।'

—চাওয়া-পাওয়ার এই যে অসমতা, এই যে অসংগতি, এইখানেই জীবনের ট্রাজেডি! আর এই অপূর্ণতার বেদনাবোধই মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে জীবনকে সুন্দরতর ও মহত্তর ভাবে বিকশিত করিতে। কিন্তু সাহিত্য-সত্য জীবন-সত্যের মত প্রতি পদে বিঘ্নিত নয়। শিল্পীর ভাবজগতে সে এমনভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায় যে, তাহার প্রকাশিত রূপে একটা সম্ভাব্য সম্পূর্ণতার সুর অনুরণিত হইয়া উঠে। এই যে ভাবনাঘন সত্য, ইহার মধ্যে ইংগিত থাকে জীবনে যাহা ঘটে নাই অথচ যাহা ঘটিলে জীবনটা শতদলের মত বিকশিত হইতে পারিত তাহারই। রচয়িতার গভীর অনুভূতিরসে জারিত হইয়া সমাজের খণ্ডিত ব্যক্তিজীবনের সত্য ভাবগভীর রূপে একটা সামগ্রিক সত্তা লাভ করে এবং এই সম্পূর্ণতা বিধানে দক্ষ শিল্পীর নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। যিনি যথার্থ শিল্পী, তাঁহার রচনায় এই সামগ্রিক আবেদন অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যঞ্জিত হইয়া উঠে।

সাহিত্যের সত্য ও জীবনের সত্য

মানুষ চায় অপূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আভাস, সসীমের মধ্যে অসীমের সুর।

জীবনে যে ধন পাওয়া গেল না, তাহাকেই সে খুঁজিয়া ফিরে। জীবনের সমস্ত বোধ, হৃদয়ের প্রত্যেকটি বৃত্তি সমভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় না। এই অপূর্ণতা সাহিত্যের সোনার কাঠির যাদুস্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠে। আর সেই রসসৃষ্টিকে অনুভব করিয়া মানুষের মন ভরিয়া উঠে আনন্দে। সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য যে সুন্দরের সাধনা, এইরূপে তাহা সফলতার পথে অগ্রসর হয়—সাহিত্যের সংগে জীবনের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ নিবিড় ও গভীর হইয়া উঠে। বাস্তব জীবনের চিত্রায়ণে দেশে দেশে বিভেদ থাকিতে পারে; মানবীয় ধর্মে সে পার্থক্য কোথায়? তাহা হইলে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' বিশ্বজনীন সমাদর লাভ করিতে পারিত না; গর্কির 'মাদারে'র মা-এর জীবনের বিচিত্র কাহিনী ব্যথা-করুণা-রসে মাতৃস্নেহ-পাগল মানুষের মনকে উজ্জীবিত উন্মুখর করিয়া তুলিতে পারিত না।

সাহিত্য ও জীবনের মধুর সম্বন্ধ

মানুষ গঠন করিয়াছে সমাজ—আর সেই সমাজ আবার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে মানুষের মনে। সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকের রচনায় যে সকল নরনারীর হৃদয়দ্বন্দ্বের পরিচয় আমরা পাই, সমাজের অমোঘ শক্তি কখনও প্রকাশ্যে, আবার কখনও নেপথ্যে, তাহার প্রেরণা জোগায়। সমাজকে বড় করিতে গিয়া অর্থাৎ অতিমাত্রায় বস্তুতান্ত্রিকতার মোহে জীবনধর্মকে অবহেলা করিয়া যখন বাস্তব ঘটনা-বলীর পুংখানুপুংখ বিন্যাসই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন আর তাহাকে সার্থক সাহিত্য বলা যায় না, তাহাকে আখ্যা দেওয়া যায় বাস্তবকেন্দ্রিক অযথা ভাববিলাস। সমাজই যে সব সময় সাহিত্যিককে প্রভাবান্বিত করিবে, এমন কোন কথা নাই। দূরদর্শী সাহিত্যরথী অনেক সময় সমাজকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাকে নূতন পথে চালিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সারা বাংলায় তথা ভারতে একদিন যে বিপুল দেশপ্রেমের উদ্বোধন করিয়াছিল, তাহার দূরপ্রসারী ফল আমরা আজও ভোগ করিতেছি।

সমাজ-বিবর্তনে সাহিত্যের প্রভাব

যে দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনতা লেখাপড়া জানে না, সাহিত্যের সংগে তাহাদের আবার সম্পর্ক কি? বড় বড় গ্রন্থ রচিত হইল, কি হইল না—'গীতাঞ্জলি'র জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইলেন, কি পাইলেন না, তাহাতে তাহাদের কি আসিয়া যায়? যুক্তিটা সারবান সন্দেহ নাই। সাহিত্য চিরজীবী এবং এই সম্পদ তাহারাও একদিন ভোগ করিবে, একথা না বলিয়া বলিব 'রামায়ণ' 'মহাভারত' কয়জন লোকে পড়ে? অথচ ভারতের জনজীবনে এই দুই মহাকাব্যের অতুলনীয় প্রভাবের সীমা-পরিসীমাও তো নাই।

জনতা ও সাহিত্য

জনশিক্ষার যে সব বাহন এক সময় আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনে তাহার প্রভাব ছিল অপরিসীম। যাত্রাগান, কবিগান, কথকতা ইত্যাদির সাহায্যে সাহিত্যের প্রভাব দেশের নিম্নতর শ্রেণীর লোকগুলির মধ্যে পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্তমানেও দেশে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করিবার নানা পদ্ধতি প্রচলিত আছে: যথা,—জারিগান, সারিগান, যাত্রাগান, কথকতা, ঝুমুর, কবিগান ইত্যাদি। অবশ্য সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি প্রবর্তনের ফলে ইহাদের প্রসার পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে খানিকটা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তবু মালদহের গম্ভীরা-গানের সংগে স্থানীয় মানুষের নাড়ীর যোগের কথা ভুলিলে চলিবে না।

জনশিক্ষার বাহন—সেকালে ও একালে

মানুষের জীবনে অবিনশ্বরতা জীয়াইয়া রাখে সাহিত্যই। সকল উচ্চ ভাবনা-কল্পনা গবেষণা সাহিত্যেরই মধ্যে থাকে বিধৃত ভাবীকালের বংশধরদের উপভোগের জন্য। পাঞ্চভৌতিক দেহের বিনাশ ঘটে অত্যন্ত স্বল্পকালেই—কিন্তু সাহিত্যের মানসলোকে তাহারই হয় অবিনশ্বর প্রাণযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—মানুষ সাহিত্যসৃষ্টি করে আপনাকে চিরঞ্জীবী করিবার জন্য—যুগ ও কালের শত রূপান্তরের বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার ভাবনা যাহাতে ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রধানতম আন্তর কামনা। সাহিত্য সেই কামনা প্রভূত পরিমাণে রূপায়িত করে এবং নরলোকে ক্ষণজন্মা পুরুষদের ললাটে অমরত্বের জয়তিলক অংকিত করিয়া দেয়।

শেষ কথা

সাহিত্যে ট্র্যাজেডির বিবর্তন

সংসারে মানুষের জীবন অবিমিশ্র সুখে ভরপুর নয়—তাহাতে দুঃখ আছে, বেদনা আছে, আছে নিপীড়িত আত্মার মর্মান্তিক হাহাকার। পরিমাণগত বিচারে মানবজীবনের আনন্দের তুলনায় বেদনাই বেশী। মনুষ্যত্বের অপমানে, জীবনের অপমানে, ব্যক্তিপুরুষের অপমানে যে সুগভীর বেদনার উদ্ভব হয়, তাহাই ট্রাজেডির মূল রস। ট্রাজেডির মূল রহিয়াছে জীবনে, যেখানে অনেক কিছু থাকিলেও আছে একটা বিরাট্ অর্থহীনতা, নিয়তির ক্ষমতাহীন অভিশাপে মনুষ্যত্বের তীব্র লাঞ্ছনা, আর জীবন্ত পুরুষকারের অহেতুক অপমান। প্রাচীনকালে গ্রীক মনীষী আরিস্ততল ট্রাজেডির যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাকে এখনও অনেক সুধী সমালোচক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন—"Tragedy is the representation of an action which is

ট্রাজেডির সংজ্ঞা

serious, complete in itself, and a creation of limited length; it is expressed in a speech made beautiful in different ways in different parts of the play; it is acted, not merely recited; and by exciting pity and fear it gives a healthy outlet to such emotions". এখানে ট্রাজেডির অনিবার্য উপকরণগুলির নাম পরিষ্কারভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ট্রাজেডির উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ইংগিতে-আভাসে বলা হইয়াছে।

মানুষের জীবনের ট্রাজেডি যে কোন্ পথে কোথা দিয়া দেখা দিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। পরিবার যাহা চায়, দেশ যাহা চায়, সমাজ যাহা চায়, প্রেম যাহা চায়, সেই পরম প্রার্থনীয়ের আগমনপথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় মানুষের মর্যাদাবোধ, তাহার দৃপ্ত আত্মসম্মান। মহামতি আরিস্ততল সেইজন্য বলিয়াছেন,—ট্রাজেডি জিনিষটি হোমিওপ্যাথী ওষুধের মত—সামান্য পরিমাণে দেহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অভ্যন্তরবর্তী গ্লানি অনেকখানি অপনোদিত করে। ট্রাজেডির ঘটনাবলীর সুনিপুণ বিন্যাসে নায়কের পতনে মানবমনে যে করুণা ও ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহাই জীবনের করুণা ও ভয়ের বেদনাকে অনেকখানি উপশম করে—ইহাই ট্রাজেডির আনন্দ। ট্রাজেডির উদ্দেশ্য কি, এ সম্পর্কে আরিস্ততল সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,—"Tragedy's function is to purge away our excess emotions". ভাবমোক্ষণ বা Catharsis-এর সাহায্যে ভিতরের অতিরিক্ত emotion-গুলির প্রাবল্যকে প্রশমিত করিয়া সংযমের মধ্যে সীমায়িত করিয়া জীবনের দুঃখবেদনার মধ্যে একটা আনন্দের আবেশ সৃষ্টি করাই তো ট্রাজেডির লক্ষ্য।

ট্রাজেডির উদ্দেশ্য

বস্তুত ট্রাজেডির আনন্দ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর। প্রকৃতপক্ষে, ইহা সাহিত্যিক রমণীয়তার মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধির আনন্দ—realisation of the self। স্রষ্টা যেমন নিজের আনন্দস্বরূপ অনুভব করিবার জন্য প্রকৃতি ও মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে নিজের আনন্দ ও সৌন্দর্যস্বরূপের

ট্রাজেডি আনন্দদায়ক কেন?

তেমনি ট্রাজেডির নায়কের পতনে, তাহার দুঃখ-বেদনায় কারুণ্য-রসে নিজের সত্যস্বরূপের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সুগভীর আনন্দলাভ করে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই একটা মস্ত বড় ট্রাজেডি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে মানুষের জীবন হইতেছে—

'আমি যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।'

—চাওয়া-পাওয়ার এই নিরন্তর মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব-দোলায় মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিদিনের কাহিনী এক শরশয্যার গাথাকাব্য। ট্রাজেডি কেবলমাত্র সাহিত্যিক রসঘনতার প্রসাদগুণে মানুষের মনকে অভিভূত করে না, ট্রাজিক নায়কের জীবন মানুষের জীবনের সহিত একাত্মতা পাইয়া ট্রাজেডির করুণরসকে ঘনীভূত করিয়া তোলে। সাহিত্য ও জীবনে এই সাধারণীকরণের সফলতাতেই ট্রাজেডির পরম সার্থকতা।

সংসারে বাস করিতে গেলে মানুষের ইচ্ছার সহিত সমাজের ঘটে পদে পদে বিরোধ। সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বার বার খর্ব হয়—ব্যক্তিমানস অপমানের দীপ্ত দাহনে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। গ্রীক ট্রাজেডিতে বহিরংগের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সেক্সপীয়ারের নাটকগুলিতে নানা প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ট্রাজিক রস ঘনীভূত ও নিবিড় হইয়াছে—ট্রাজিক নায়কের পতনের মূল কারণ যে 'some great error of frailty', তাহাকে তিনি বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। ম্যাকবেথ, ব্রুটাস্ ইত্যাদির জীবনের ট্রাজেডি যেন অন্ধ নিয়তির নিষ্ঠুর খেয়াল—তাহারা যেন সেই অদৃশ্য শক্তির মায়াজালে বন্দী হইয়া অসহায়ভাবে অনিবার্য পতনের পথে অগ্রসর হইতেছে—ব্যক্তিজীবনের এই নিদারুণ অসহায়তা দেখিয়া সহানুভূতিতে আমাদের মন ভরিয়া উঠে—তাহাদের কার্যাবলীকে বিচার করিবার প্রবৃত্তি জাগে না। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যাহাদের নিজেদের এত বড় নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা তাহাদের কাছে মৃত্যু ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন কালের ট্রাজেডি

ইব্‌সেন নাট্যসাহিত্যের এই চিরাচরিত ধারায় বিরাট্ পরিবর্তন আনিলেন। তাঁহার নাটকগুলিতে ট্রাজেডির যে রূপ প্রতিভাত হইল, সনাতন প্রণালীতে তাহার বিচার চলে না। এখানে দেখা গেল, নায়কের জীবনের পতনের কারণ তাহার 'great error of frailty' নয়—সমাজ ও সংসারের বিরূপতাই সেই ট্রাজেডির আসল কারণ। '*An Enemy of the People*' নাটকের নায়ক ডাঃ স্টক্‌ম্যানের মহান্ চরিত্রের একমাত্র ত্রুটি ছিল দেশবাসীদের প্রতি তাঁহার অফুরন্ত ভালবাসা, তাহাদের সর্বাংগীণ মংগল কামনা। ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য কোন উচ্চাশার বশবর্তী হইয়া তিনি মানুষের ভালো করিতে চাহেন নাই। অথচ ক্ষমতাভোগীদের হীনতম চক্রান্তে তাঁহার সকল সদিচ্ছা, সকল সুপ্রচেষ্টা দেশদ্রোহিতা বলিয়া আখ্যা পাইলে তিনি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ভাবে 'বয়কট্' হইলেন। আর তাঁহার বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের নায়ক হইলেন তাঁহারই বড় ভাই—শহরের মেয়র। জনকল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ 'লোকবন্ধু' ডাঃ স্টক্‌ম্যান 'লোকশত্রু' উপাধি পাইয়া মর্মান্তিক বেদনায়

পরবর্তী কালে রূপান্তর

স্ত্রী ও কন্যাকে বলিয়াছেন—'It is this, let me tell you, that the strongest man is he who stands most alone.' সংসার ও সমাজের প্রতি কি বিরাট্ অভিযোগই-না আছে এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে! "*Doll's House*"-এর নায়িকা নোরাও দীর্ঘদিন সুখের দাম্পত্যজীবন যাপন করিবার পর একদিন আবিষ্কার করিয়াছে যে, স্বামী তাহাকে ভালবাসে না। যে-স্বামীর জন্য সে সব-কিছু করিতে বা ত্যাগ করিতে পারিত, তাহারই বিশ্বাসঘাতকতায় বিদ্রোহিনী নোরা সুখ-নীড়ের মোহ ত্যাগ করিয়া অনির্দেশ্যের পথে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার মানসিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া ইব্‌সেন দেখাইয়াছেন, নোরার জীবনেরই মধ্যে ট্রাজেডির কারণ যতখানি বিদ্যমান, তাহার অনেকগুণ বেশী বিদ্যমান বাইরেকার ঘটনাবলীর মধ্যে। প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার চাপে মানুষের জীবনের এই নিগূঢ় ট্রাজেডির ধারাকে পরবর্তী কালের নাট্যকারেরা আরও বেশী আগাইয়া দিয়াছেন।

মানুষের জীবনধর্ম ও সমাজব্যবস্থার সংঘাতে মানুষেরই জীবনে যে কত বড় ট্রাজেডি ঘনাইয়া আসে, শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রমা ও রমেশের জীবনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? মনে মনে যে প্রেমকে তাহারা শতদলের মত বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সুমধুর সৌরভ কি জন্য পৃথিবীকে আমোদিত করিতে পারে নাই? তাহাদের ব্যক্তিচরিত্রের কোন দুর্বলতা কি এইজন্য দায়ী? তাহাদের প্রেমে তো কোন অপরাধের স্পর্শ—কোন কৃত্রিমতাই ছিল না। অথচ তাহাদের প্রাণের আকুতি মিলনকে ত্বরান্বিত বা সার্থক করিতে পারে নাই কেন?—সমাজের বাধায়। ট্রাজেডির এই রূপান্তরটিই বাংলা সাহিত্যে দিনে দিনে আরও বাড়িয়া চলিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের নজীর

বাংলা প্রবাদ

মনীষী বেকন একদা বলিয়াছিলেন—'The genius, wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs.' সত্যই বাংলা প্রবাদও বাঙালীর জাতীয় জীবন, তাহার রসজীবন, তাহার লৌকিক জীবনের অভিব্যক্তি। কবে কোন্ হতভাগ্য পরিবারে ভাগের মা গংগা না পাওয়ায় কাহার মনে বেদনা জাগিয়াছিল, কবে কোন্ কপটাচারী ফেন দিয়া ভাত খাইয়া গল্পে দই মারিয়াছিল বলিয়া কাহার অন্তরে কৌতুকরস সঞ্চারিত হইয়াছিল, কবে কোন্ নীচাশয় ব্যক্তি ছুঁচো মারিয়া হাত গন্ধ করায় কাহার হৃদয় বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল—প্রাত্যহিক জীবনের ঐ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ঐ সাক্ষাৎ অনুভূতিই সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিকে আন্দোলিত

বাংলা প্রবাদের উদ্ভব

করিয়া ক্ষিপ্র টিপ্পনীর আকারে স্বত উৎসারিত হইয়াছিল। কিন্তু একের ঐ বুদ্ধির টুক্‌রাই কালক্রমে অনেকের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়াছে—অভ্যস্ত বাক্যে, লোকশ্রুতিতে অথবা প্রবাদে তাহা পরিণত হইয়া গিয়াছে। একদা যাহা প্রত্যক্ষদর্শীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে ব্যক্তি বস্তু বা ঘটনাবিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রবাদের অন্যতর বিশিষ্ট লক্ষণ পরিস্ফুট করিয়াছে। প্রবাদ-রচয়িতার নাম অবলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার চটকদার বাণী সাধারণের সাক্ষাৎ অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিষ্কর্ষরূপে জনপ্রিয়তার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়া লোকপরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। তাই কালবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কথিত হইলেও প্রবাদবাক্য সমগ্র জাতির নির্বিশেষ সম্পত্তি। বুঝিবা সমগ্র জাতির আত্মা আজ ব্যক্তিবিশেষের দান অস্বীকারে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'ত।

গ্রন্থরচনার বহুপূর্বেই প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ সাধারণ লোকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। তাই প্রবাদকে বলা যায় লোকোক্তি। মহাত্মা ডিজ্‌রেলীর ভাষায়, 'Proverbs were anterior to books, and formed the wisdom of the vulgar, and in the earliest ages were the unwritten laws of morality.' কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক, যাঁহারা জ্ঞানের ধারক ও চিন্তার পরিপোষক, তাঁহাদিগের সুচিন্তিত, সুবিবেচিত, সুব্যক্ত বাণীও লোকজীবনের বিধি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। 'গতস্য শোচনা নাস্তি,' 'শুভস্য শীঘ্রম্' 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী' প্রভৃতি প্রাজ্ঞোক্তিও সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবনে ও ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। পক্ষান্তরে, লোকোক্তিও প্রাজ্ঞের চিন্তায় এবং কর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ফলে লোকোক্তি এবং প্রাজ্ঞোক্তির উদ্ভবের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইলেও ব্যবহারিক জগতে উভয়েই সমভাবে কার্যকরী হইয়া প্রবাদের এলাকা বিস্তৃত করিয়াছে।

বাংলা প্রবাদের দুই ধারা—(১) লোকোক্তি, (২) প্রাজ্ঞোক্তি

বাংলা প্রবাদ চিরন্তন সামগ্রী বলিয়া ইহার মূল্য অপরিমেয়। তবে এই চিরন্তনত্বের মূল্যে কোন শাশ্বত নীতি বা তত্ত্বকথার প্রতিপত্তি নাই। 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'—এই প্রবাদটিতে নৈতিক জগতের সত্যের ইংগিত থাকিলেও বাস্তব জগতের অবিসংবাদিত তথ্য নাই। আবার 'পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা'—এই প্রবাদটিতে বাস্তব জগতের তথ্যের আভাস মোটামুটি থাকিলেও নৈতিক জগতের নিরংকুশ সত্য নাই। অতএব, প্রবাদের সত্য মোটামুটি আপেক্ষিক সত্য—ইহা বড় জোর তথ্যের সত্য, তত্ত্বের সত্য তো কোন

বাংলা প্রবাদের অন্তরংগ ও বহিরংগ পরিচয়

ক্রমেই নয়। মোট কথা, বাস্তবকেন্দ্রিক এই প্রবাদে আছে পথ-চলার বিজ্ঞতা, আছে প্রত্যহের অভিজ্ঞতা। এই দিক দিয়াই প্রবাদের মূল্য চিরন্তন। তবে কাহারও কাহারও মতে, প্রবাদের ঐ সত্য বা তথ্য নিতান্তই সাধারণ ও সামান্য বলিয়া ঝাঁঝালো রসিকতা, ছড়ার ছন্দ, মিলবিন্যাস ও শব্দালংকারের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়াছে আর দেখা দিয়াছে মস্করা, ভাঁড়ামি ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হইতে যাহার উদ্ভব, সেই প্রবাদ কি কখনও লোকসমাজের শক্তিশালী কথ্য ভাষাকে অস্বীকার করিতে পারে? সত্য কথা বলিতে কি, বিষয়বস্তুর উপরে নয়, সহজ সাবলীল বাণীবিন্যাসের উপরে, সাধারণ বুদ্ধির চমৎকারিত্বের উপরে, সংক্ষিপ্ত ও উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগেরই উপরে প্রবাদের যত-কিছু সাফল্য নির্ভর করে।

বাংলা প্রবাদের রূপবৈশিষ্ট্যই শুধু নয়, ইহার রসবৈচিত্র্যও বাঙালী চিত্তকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। প্রথমতঃ, বংগনারীর চিরন্তন মনস্তত্ত্বের আভাস বাংলা প্রবাদে পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে লব্ধ মেয়েলী অভিজ্ঞতা বাংলা প্রবাদের প্রাণরস যোগাইয়াছে। রূঢ় বাস্তবতার আঘাতে প্রাত্যহিক জীবন নিষ্পেষিত হওয়ায় যে সাংসারিক জ্ঞান বংগমহিলাদের মনে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাই সুতীব্র রসিকতায় ফাটিয়া পড়িয়াছে। ফলে বাংলা প্রবাদের বিরাট্ প্রাংগণে বেশ খানিকটা Cynical মনোভংগী পরিব্যাপ্ত। তবে মনুষ্যের প্রতি বিদ্বেষ নয়, বিদ্রূপই হইতেছে অধিকাংশ বাংলা প্রবাদের বৈশিষ্ট্য। তাই শোনা যায়,—'মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ী'; 'অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আল্‌তা পরি'; 'ভাই রাজা ত বোনের কি?'; 'বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট, পান্তাভাতে ঘি নষ্ট'; 'হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে, পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে' প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালীর ঘর-গৃহস্থালীর সব-কিছু সামগ্রীই, তাহার সামাজিক জীবনের সব-কয়টি দিকই বাংলা প্রবাদের উপকরণ যোগাইয়াছে।

বাংলা প্রবাদের উপকরণাদি

ভাঙা কুলো, ছুঁচ চালুনি, আম-কাঁঠাল, ঢেঁকি-চরকা, বাটনা-বাটা, তামা-তুলসী, ছুঁচো-ইঁদুর, সাপ-ব্যাঙ প্রভৃতির কোনটিই বাংলা প্রবাদের সীমানার বহির্ভূত নয়। আবার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন শ্রেণীসংস্থান ও সম্পদের খুঁটিনাটি অথচ খণ্ড চিত্রও পাওয়া যায় বাংলা প্রবাদে। তাই শুনিতে পাই—'ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে বেড়ার ঘর'; 'বৈদ্যের বড়ি ছুঁলেই কড়ি'; 'কায়েতের ঘরের বেরালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে'; 'পাঁঠা মারে বোষ্টম' ইত্যাদি। সমাজের নানাবিধ কৌতুকাবহ বিষয় লইয়াও বহু বাংলা প্রবাদ প্রচলিত আছে: যেমন—'ঘোমটার ভেতর খেমটার নাচ'; 'বিষ নেই কুলোপানা চকর', 'পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সরষে';

'আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা' ইত্যাদি। সর্ব সময়ে যাহা উত্তম তাহারই তালিকা মিলে বাংলা প্রবাদে: যেমন,—'কচি পাঁঠা, পাকা মেষ, দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ'; 'উচ্ছের কচি, পটলের বীচি, শাকের ছা, মাছের মা' ইত্যাদি। তৃতীয়ত, পরিচিত পৌরাণিক ঘটনা, বস্তু বা ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়াও বহু বাংলা প্রবাদের প্রচলন আছে: যেমন,—'রাজ্য পেল রামচন্দর, কলা খেল যত বান্দর'; 'তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে' ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, পুরাণমূলক প্রবাদ-বাক্যাংশের তো ইয়ত্তাই নাই: যেমন—'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'; 'অগস্ত্যযাত্রা'; 'গজকচ্ছপের যুদ্ধ' ইত্যাদি। চতুর্থত, বহু বাংলা প্রবাদে জাতীয় ইতিহাস ও সামাজিক ইতিহাসের টুকরা, স্থানীয় ঘটনা প্রথা বা ব্যক্তিবিশেষের কথাও স্থান পাইয়াছে: যেমন,—'ধান ভানতে মহীপালের গীত'; 'আমড়া, কুমড়া, ধান, এই তিন নিয়ে বর্ধমান'; 'হরি ঘোষের গোয়াল' ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার চর্যাপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি যেন প্রবাদ-ব্যবহারকে ততটা সুযোগ দেয় নাই। কারণ,—প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মূলত গম্ভীর প্রকৃতির রচনায় সমৃদ্ধ, দেবদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনায় নিয়োজিত, ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাধান্য ঘোষণায় ব্যাপৃত, বাৎসল্য ভক্তি ও প্রেমের বন্যায় পরিপ্লাবিত। তবু দেখিতে পাই,—চর্যাপদে আছে—'আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী', শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে—'মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী', কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—'আপ্ত ছিদ্র না জানিস্, পরকে দিস্ খোঁটা', কাশীদাসী মহাভারতে আছে—'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী', কবিকংকণ-চণ্ডীতে আছে—'ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা', ভারতচন্দ্রে আছে—'এ সংসার ধোকার টাট'। তবে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ ও রামেশ্বরের রসরচনায় প্রবাদ-প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় আর উহারই প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ পাদ অবধি সমধিক প্রাচুর্যে ভরিয়া উঠে। ভবানীচরণ, হুতোম, টেকচাঁদ হইতে শুরু করিয়া দাশুরায়, দীনবন্ধু ও অমৃতলাল অবধি বাংলা সাহিত্যে খাঁটি বাংলা বুলি সমাদৃত হওয়ায় বাংলা প্রবাদের বহুল প্রয়োগ ঘটে এমন কি, 'আলালের ঘরের দুলাল', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'যেমন রোগ তেমনি রোঝা' প্রভৃতি গ্রন্থের নামকরণ হইতেই তৎকালীন গ্রন্থকারদিগের প্রবাদ-প্রীতি অনুভূত হয়। উহাই বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের যুগ। প্রবাদ-প্রয়োগের ঐ সাফল্যের কারণ দুইটি—একটি, প্রবাদের লোকপ্রিয়তা এবং অপরটি, ইহার গতানুগতিকতা। গত শতাব্দীর প্রাত্যহিক জীবনে এবং সাহিত্যে প্রমাণ রূপক ও দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রবাদের গুরুত্ব অনতিক্রম্য।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ

কিন্তু 'Wise men make proverbs and fools repeat them'—ইহাও তো একটি ইংরাজি প্রবাদ-বাক্য। তাই গত শতাব্দীতে নূতন যুগের নূতন শিক্ষার আবির্ভাবে সাহিত্যিক আদর্শ ও শিক্ষিত জীবনের রীতি ও রুচি পরিবর্তিত হইল। ব্যক্তিগত ভাবুকতা ও কল্পনাসমৃদ্ধির ফলে প্রতিভাশালী লেখকগণ পুরাতন জীর্ণ বাক্যাদির ব্যবহার বর্জন করিয়া নিজস্ব বাক্যরীতির উদ্ভাবনে তৎপর হইলেন। সাহিত্য-সৃষ্টিতেও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রশ্রয় থাকায় প্রবাদ-বাক্যগুলি অচল হইল, তবে প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলি ভাষাদেহের ভূষণরূপে কিছুটা থাকিয়া গেল। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের লেখকগণ বুঝিবা লর্ড চেষ্টারফিল্ডের শিষ্ট আদর্শের উপদেশ শুনিযাছিলেন—'A man of fashion never has recourse to proverb and vulgar sayings.' তাই আমাদের এই ভাববিলাসী সাহিত্যে, এমন কি রস-রচনাতেও, প্রবাদের প্রয়োগ এত বিরল। শুধু জাতির চিন্তায় ও সাহিত্যে মৌলিকতা-বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলেই যে এইরূপ ঘটিযাছে তাহা নয়, শিক্ষায় ভাবে ও চিন্তায় আমরা আজ বাঙালী হইযাও অবাঙালী। বিলাতী সভ্যতা-ভব্যতা, মার্জিত রুচি-রীতি আমাদিগকে গণজীবনের এলাকা হইতে দূরে সরাইয়া লইয়াছে দেশকালনিরপেক্ষ 'কালচার'-বিলাসী এক সূক্ষ্ম অথচ কৃত্রিম জীবনলোকে। প্রবাদসমৃদ্ধ সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের সাবলীল গ্রাম্যতার আবিষ্কারে আমরা এক্ষণে ভীত হই, লজ্জিত হই। তাহার কারণ, অতীতের বাঙালীর দেহমনের অটুট স্বাস্থ্য, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী আমাদের নাই। তাই বাংলার নিজস্ব সম্পদ এই প্রবাদগুলি আজ লুপ্তপ্রায়। অবশ্য প্রবাদ-বিস্মরণের আরও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। যে সজীব বাংলা ভাষায় প্রবাদগুলি বিরচিত, তাহাও আজ আমরা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি, ঐ ভাষায় রস ও রহস্য আস্বাদ করিবার শক্তিও বুঝিবা আমাদের নাই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ

আধুনিক আভিজাত্য আমাদের জীবন ও সাহিত্যকে এমনি ভাবেই গ্রাস করিয়া বসিয়াছে যে, আজিকার প্রচলিত ভাষা বাঙালীর বাংলা নয়। বাংলা ভাষার ভাব-প্রকৃতি, যাহা বাঙালী জাতির রসচেতনা হইতে স্বত উৎসারিত, তাহা আজিকার বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু বাংলা প্রবাদের ভাষা বাঙালী জাতির জীবনস্পন্দনে স্পন্দিত, বাঙালীর মৌলিক জীবনের সম্পদ। অথচ, আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে আধুনিক ভদ্রসমাজে ও ভদ্রসাহিত্যে বাংলা প্রবাদগুলি প্রত্যক্ষভাবে নিন্দিত নয় সত্য, কিন্তু পরোক্ষভাবে অবহেলিত। তবু একটু সৌভাগ্যের বিষয় যে, প্রবাদগুলির বর্জন ঘটিলেও প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলি বাংলা ভাষার চিরন্তন 'ইডিয়ম' তথা সরস বাক্যরীতি হিসাবে

বাংলা প্রবাদের ভবিষ্যৎ

গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য তাহা না ঘটিলে সরাসরি ভাবেই বংগভাষাপ্রতিমার ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন হইত। তাই মনে হয়, এহেন গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়া যে প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলি টিকিয়া রহিয়াছে, ব্যঞ্জনে মশলাপ্রয়োগের ন্যায়, তাহা বাক্যালংকার হিসাবে অতীতে যেমন স্থান পাইত, ভবিষ্যতেও তেমনি পাইবে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে অবশ্য পল্লীভূমি ও পল্লীজীবনের সহিত অন্তরংগ পরিচয় স্থাপন করাইবার প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। ফলে বাংলা প্রবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার হয়তো-বা যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ মিলিতে পারে। তবে আধুনিক গ্রাম্যজীবনেও তো কৃত্রিম নাগরিক মনোবৃত্তি সংক্রামিত। তাই ভরসাও বিশেষ নাই।

বাংলা লোকসাহিত্য

একদা বাঙালী ছেলেমেয়েদের সহজাত কল্পনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, বাঙালী ঘরণীদের মনপ্রাণকে অতীব কোমল ভাবে গৃহধর্মে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য, উচ্চনীচ-নির্বিশেষে বাঙালী জনসাধারণের মনকে আমোদে-আনন্দে বিহ্বল করিয়া শিক্ষায় ও সৌন্দর্যে ভাসাইয়া দিবার জন্য, বাঙালীচিত্তের অন্দরমহলে বাহিরাগত জ্ঞান ও নীতিসমূহকে তরলোচ্ছল হাসির ভিতর দিয়া সঞ্চারিত করিবার জন্য, বাঙালীর চিরাগত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যাহার মধ্যে রক্ষিত ছিল, তাহা এই লোকসাহিত্যই। লোকের মুখে মুখে ইহা কখনও-বা সংগীতরূপে, কখনও-বা আবৃত্তিরূপে, কখনও-বা গল্পরূপে, বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার তথা বাঙালী লোকসাধারণের চিত্তলোকের উপর রচনা করিয়াছিল সাহিত্যের এক বিরাট্ মন্দির। এই বিরাট্ মন্দিরটিই লোকসাহিত্যের মন্দির। ইহার ভাষা 'নিরক্ষরা', কিন্তু লেখ্য ভাষার মতই ইহার বনিয়াদ সুদৃঢ়। এমনই সুদৃঢ় যে যুগ হইতে যুগান্তরে, মন হইতে মনান্তরে, জীবন হইতে জীবনান্তরে চলিয়াছে ইহার অভিযান। শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য—মানবজীবনের এই ত্রিলোক তথা তিনটি দশা ব্যাপিয়াই থাকে লোক-সাহিত্যের প্রভাব। লোকসাহিত্য ইহলোকভোগ্য আমোদ-আহ্লাদ, আনন্দ-কৌতুক, আশা-আকাংক্ষার ক্ষণদীপ্তি যেমন ফুটাইয়া তোলে, তেমনি পরলোকের জ্ঞান আহরণ করিবার উপযোগী শাশ্বত দীপ্তিও বিকিরিত করে। লোকসাহিত্যের উদ্ভব ও উপভোগের ব্যাপারে আছে একটা 'ডিমোক্র্যাটিক' তথা গণতান্ত্রিক সুর। ইহার স্রষ্টা লোকসাধারণ, ইহার রসভোক্তাও লোকসাধারণ—তাই ইহার নামও লোক-সাহিত্য। লোকসাধারণের বিপুল সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য শুধু যে লোকসংগীত, লোকশিক্ষা, লোকনৃত্য, লোকাচার, লোকভাষা প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নয়, লোকসাহিত্যেরও মাধ্যমে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা

লোকসাহিত্যকে মোটামুটিভাবে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: প্রথমত, শিশুসাহিত্য; দ্বিতীয়ত, মেয়েলী সাহিত্য, তৃতীয়ত, ধর্মসাহিত্য; চতুর্থত, পল্লী-সাহিত্য; পঞ্চমত, সভাসাহিত্য; ষষ্ঠত, ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য, সপ্তমত, প্রবচন-সাহিত্য। 'শিশুসাহিত্য' বলিতে মোটামুটিভাবে 'রূপকথা' 'উপকথা'ই বুঝায়। রূপকথা সাধারণত গ্রাম্য চলিত ভাষায় রচিত মৌখিক গল্প। ইহার মাঝে মাঝে থাকে ছড়া ও গান। কোন কোন ক্ষেত্রে গল্প একেবারেই নাই অথবা অবলুপ্ত সূত্রাকারে ক্ষুদ্র ছড়াই শুধু বিদ্যমান। লোকসাহিত্যের এই রূপকথাকে আধুনিক সাহিত্যের 'উপন্যাসের বাস্তুপুরুষ' বলা যায়। "এই যে আমাদের দেশের রূপকথা—বহুযুগের বাঙালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব কত রাজ্যপরি-বর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুন্ন চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে, যে স্নেহ দেশের বাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে; সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে। নিখিল বংগদেশের সেই চির-পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।" 'মধুমালা', 'মালঞ্চমালা,' 'কাঞ্চনমালা', 'শংখমালা' প্রভৃতির গান, 'ব্যাংগমা-ব্যাংগমীর গল্প', 'সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির গল্প'—এমনি আরও কত কত গানগল্প যে রূপকথার অন্তর্ভুক্ত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 'মেয়েলী সাহিত্য' বলিতে মোটামুটিভাবে ব্রতকথাই বুঝায়। এই 'ব্রতকথা'র উৎপত্তি যে কতদিনের, তাহা কেই-বা বলিতে পারে? হয়তো-বা 'মুকুন্দরামের চণ্ডী' প্রভৃতি লৌকিক ধর্মোপাখ্যানের মূল এই ব্রতকথাই। কোন সমালোচক বলিয়াছেন—'কবির নিকট ব্রতকথা বাঙালার আদিম কাব্য; ঐতিহাসিকের নিকট ইহা বংগের গৃহ ও সমাজের, ধর্ম ও কর্মের, পুরাতন ইতিহাস; আর মাতৃভক্ত বাঙালীর নিকট ব্রতকথা বংগজননীর স্তননিঃসৃত প্রথম ক্ষীরধারা।' মেয়েলী ব্রতকথায় আত্মীয়স্বজনের সুখকামনালিপ্সু, ধর্মপরায়ণা, চিরসহিষ্ণুতার সাক্ষাৎ প্রতীক হিন্দুরমণীর ঐহিক এবং পারত্রিক আশা-আকাংক্ষা ভরসা-বিশ্বাসের কত কথাই না ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'দশপুত্তল ব্রত,' 'সাবিত্রী ব্রত', 'সেঁজুতি ব্রত', গোকল ব্রত', 'তোষালা ব্রত', 'পুণ্যিপুকুর ব্রত,' 'যমপুকুর ব্রত'—এমনি আরও কত রকমের নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের নিয়মপালনের ক্ষুদ্র গাথা আমাদের দেশের পুণ্যবতী ব্রতচারিণী ধর্মপ্রাণা বিধবা দেবীগণকে, অথবা শাঁখা-সিন্দুর পরিহিতা কল্যাণী সধবাদিগকে, কিংবা সরলা পবিত্রমনা কুমারীসমূহকে মিলিত করিয়া বাংলার এক অনির্বচনীয় পরিবেশ অতীতে রচনা করিত এবং আজিও করিয়া থাকে।

লোকসাহিত্যের সাতটি শ্রেণী—
(১) শিশুসাহিত্য,
(২) মেয়েলী সাহিত্য,

'ধর্মসাহিত্য' বলিতে 'ধর্মমংগল', 'মনসামংগল', 'শীতলামংগল,' 'শিবায়ন', 'সত্য-নারায়ণ কথা', 'গংগামংগল', 'চণ্ডীমংগল', 'হরিলীলা', 'নীলার বারমাস' প্রভৃতিকেই বুঝাইয়া থাকে। সংক্ষিপ্ত পাঁচালী, ব্রতকথাই ধর্মসাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া এক বিপুল স্রোতোধারা প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে বহাইয়া দেয়। 'শ্যামা-সংগীত', 'উমা-সংগীত', 'হরি-সংকীর্তন', 'বাউলের গান', কর্তাভজা সম্প্রদায়ের 'ভাবের গীত', 'গুরুসত্য দলের গীত, 'দেহতত্ত্বের গান' প্রভৃতিকে লোকসাহিত্যের ধর্মশাখাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। 'পল্লীসাহিত্য' বলিতে 'মাণিকচাঁদের গান,' 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত,' 'ময়নামতীর গান', 'মাণিকপীরের গান', 'সত্যপীরের গান', 'জারীর গান', 'মুর্শীদ্যাগান,' 'রাখালিয়া', 'গাজীর গীত', 'হাবু গীত', 'নলে গীত,' 'ঘেঁটু গান', 'সারি গান', 'তরজা গান', 'পূর্ববংগ-গীতিকা' প্রভৃতিই বুঝায়। বাঙালী বহুদিন হইতেই হিন্দুমুসলমানরচিত এই সমস্ত খাঁটি দেশীয় গীতগানে আনন্দলাভ করিতে অভ্যস্ত। আগেকার দিনে শুভকার্যে, দোল-দুর্গোৎসবে বাড়িতে আসর বসাইয়া 'কবির লড়াই', 'হাফ্-আখড়াই', 'পাঁচালী গান' প্রভৃতির গাহনা বসাইবার নিমিত্ত বর্ধিষ্ণু লোকে মাতিয়া উঠিতেন, গানের আসর বা সভা লোকে লোকারণ্য হইত। তাই এই জাতীয় লোকসাহিত্যকে 'সভাসাহিত্য' বলা যায়। আসর বা সভা জাঁকাইয়া লোকসাহিত্যের অন্তর্গত সভাসাহিত্যের এই যে রূপদান, ইহা 'নিধুবাবুর টপ্পাগানে', 'রূপচাঁদ পক্ষীর গানে', 'শ্রীধর কবিরত্ন প্রভৃতির কথকতায়', 'মধু কানের ঢপসংগীতে', 'দাশুর পাঁচালীতে', 'রামায়ণ-গানে', 'চণ্ডীর গানে', 'মনসার ভাসানে', 'গোষ্ঠযাত্রা দোলযাত্রা রথযাত্রা শ্রীকৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি নানা নামে প্রচলিত কালীয়দমন যাত্রা'তেও ঘটিত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত ইতিহাসগ্রন্থ নাই। কিন্তু পদ্যে রচিত বহু 'কুলপঞ্জী বা কারিকা', 'ঢাকুর', 'ভাটগাথা' ইত্যাদির সন্ধান মিলে। লোকসাহিত্যের এই বিশেষ দিকটি 'ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য' শ্রেণীর অন্তর্গত। 'প্রবচনসাহিত্য' নামের আর এক জাতের লোকসাহিত্য আছে, যাহার ভিতরে মিলে অনন্ত জ্ঞান ও বহুদর্শিতার নিদর্শন। প্রবাদবাক্যে 'ডাকের বোল', কৃষিতত্ত্বে ও জ্যোতিষ-কথায় 'খনার-বচন', গণিতবিদ্যায় 'শুভংকরের আর্যা' লোকের মুখে মুখে চলিতে থাকায় উহারা প্রবচনের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। লোকসাহিত্যের এই দিকটিকেই বলা হয় 'প্রবচনসাহিত্য'

(৩) ধর্মসাহিত্য ; (৪) পল্লী-সাহিত্য ; (৫) সভাসাহিত্য (৬) ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য ; (৭) প্রবচনসাহিত্য

লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অপরিমেয়। ইহা এমনই বিপুল আয়তনের যে মানব-জীবনের পক্ষে যাহা-কিছু উপভোগ্য ও পালনীয়, যাহা কিছু হাল্কা ও গভীর, যাহা-কিছু ভাল ও মন্দ—সবেরই সম্পর্কে রহিয়াছে কিছু-না-কিছু নির্দেশ। লোকসাহিত্যের রস

কোথাও-বা গানের আকারে, আবার কোথাও-বা ছড়া কিংবা অগেয় কবিতারূপে পরিবেশিত হইত। প্রথমে গেয় লোকসাহিত্যের কথাই আলোচনা করা যাক্। সুক্ষ্ম কারুকার্যহীন ভাষায়, অলংকারহীন রচনাশৈলীতে, একঘেয়ে সুরে, রামপ্রসাদী গানগুলি ভক্তির নির্ঝরধারা ছুটাইয়াছে। একদিকে দেখি,—তাপিত সন্তান রামপ্রসাদের প্রাণের উচ্ছ্বাস—

গেয় লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

'ভবে আমার আশা কেবল আশা, আসা মাত্র সার হইল।
চিত্রের পদ্মেতে পড়ি ভ্রমর ভুলি রইল॥
নিম খাওয়ালি না চিনি বলে কেবল কথায় করি ছল।
মিঠার আশে তেতো মুখে সারা দিনটা গেল॥'

আবার অন্যদিকে রাম বসুর গানে কুলবধূর মর্মকাতরতা, ব্রীড়া-সংকুচিত মাধুরী দেখি—

'মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি বলা হল না।
মরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।'

কিন্তু ভাষার ঝংকারে, সুরের মাধুর্যে, ভাবের গভীরতায় কবিওয়ালা হরুঠাকুরের গানই সবচেয়ে কলাশ্রীসম্পন্ন: যেমন—

'ঘন গরজে ঘন শুনি—
ঐ ময়ূর ময়ূরী হরষিত, হের চাতক-চাতকিনী,
ঐ কদম্ব কেতকী চম্পক জাতি সে চৌদিকে শেফালিকে
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে,
বিদ্যুত খদ্যোত দিবা জ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি,
প্রিয়-মুখে মুখ দিয়ে শারী শুক থাকে দিবস-রজনী।'

দাশুর পাঁচালীর কোন কোন গানে শব্দসংঘাতের সৌন্দর্যও ফুটিতে দেখি: যেমন—

'লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দন্তিতা ধনী মুখ করাল
স্তম্ভিত পদে মহাকাল কম্পিত ভয়ে মেদিনী।'

আবার টপ্পা-খেউড়-স্ফূর্তি-পরিপ্লাবিত লোকসাহিত্যের মাঝে 'কাঙাল ফিকিরচাঁদে'র বাউল-গীত প্রাণের কথা শুনাইয়া যেন একটু আরাম, যেন একটু স্বস্তিও দিয়াছিল—

'কাঙাল যদি ছেলের মত তোমার ছেলে হত তবে পারতে জানতে
কাঙাল জোর কার কোল কেড়ে নিত, নাহি সরতো কোলে সরতে॥'

বিবাহিতা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের দুঃসহ অন্তর্বেদনা আছে। 'আমাদের এই ঘরের স্নেহ ঘরের দুঃখ, বাঙালীর গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালীর হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে-ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালার অম্বিকাপূজা এবং বাঙালীর কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান।

অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের ছড়ার মধ্যেও বংগজননীর মর্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।' তাই দেখি,—

'গিরি গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য রূপিণী
অচৈতন্য করে কোথায় লুকালো।'

—মা মেনকার এই উক্তির মধ্য দিয়া মর্মপীড়িতা বংগজননীরই ছবি ফুটিয়াছে।

অগের লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত অগের কবিতাবলীতে কবিত্বগুণ থাকুক আর নাই থাকুক, জ্যোতিষ ও কৃষিবিদ্যার সংগে সংগে সেই দূরবর্তী বংগীয় সমাজ ও সংস্কারের আচার-ব্যবহারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বকথাই জানা যায়। ধর্মোপদেশের নমুনা পাই ডাকের বচনে—'যে দেয় ভাতশালা পানিশালা। সে না যায় যমের বাড়ি।' কৃষিতত্ত্ব ও অর্থনীতির সূত্রকথা পাই খনার বচনে—

'তিন শ' ষাট ঝাড় কলা রুইয়া। থাক্ গিয়া তুই বাড়িতে বইয়া॥
দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ। কমে না বাড়ে না বার মাস।'

শুভংকরের 'আর্যা'য় কবিত্ব না থাকিলেও বেশ কাব্যিক ভংগীতেই গণিতবিদ্যাকে নামতার ন্যায় মুখস্থ করিবার সুযোগ আছে—

'কুড়্বা কুড়্বা লিজ্যে! কাঠায় কুড়্বা কাঠায় লিজ্যে॥
কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ। দশ বিশ গণ্ডা কাঠায় জান॥'

কথকদিগের কথার গৎ অবশ্য সমাসবহুল, যমক-অনুপ্রাসময়, সংস্কৃত বাক্যাডম্বর-সমৃদ্ধ সত্য, কিন্তু সুর করিয়া আবৃত্তি করায় ইহা শ্রুতিমাধুর্যে ভরিয়া উঠিয়া সাক্ষর-নিরক্ষর-নির্বিশেষে সকলেরই মনে একটা চিত্রসৌষম্য সঞ্চারিত করিত, মেঘময় দিনের সুবলয়সমৃদ্ধ বর্ণনায় কথকঠাকুর যে সাহিত্যকৃতির পরিচয় দিতেন, তাহা বাণভট্টের রচনাশিল্পের কথাই দেয় স্মরণ করাইয়া—

'পূর্ব দিগম্বর দেদীপ্যমান, শক্রধনুশোভিত নভোমণ্ডল, কাদম্বিনী সৌদামিনী-চঞ্চল, তদ্দর্শনো-দ্বেজিতান্তঃকরণ মত্তকরীবরারোহণ কৃত দেবেন্দ্র নিক্ষিপ্ত-বজ্র নিক্ষেপ-শঙ্কিত ঐরাবত-স্খলিত পতিত-কণ সমুদ্র-গর্জিত বজ্রপতন-ভয়ানক-ধ্বনি-প্রতিধ্বনি-শ্রবণ-সভয়-চকিত নয়নোদ্বেজিত পান্থজন, পক্ষিগণ গণিত-প্রমাদ সংকট-ত্রাসিত এককালীন কুহু কুহু রব করিতেছে।'

—গুরু গুরু শব্দধ্বনিতে বেশ একটি ঘোরালো ছবি ফুটিয়া উঠে নাই কি? রূপকথা উপকথার ছড়াগুলি স্পষ্টত অর্থহীন ভাবহীন পরস্পরসংগতিহীন, কিন্তু উহারা যে স্মৃতি, যে ছবি চিত্তপটে ফুটাইয়া তুলে, তাহা কবিত্বময়ই বটে। 'কিন্তু এ কবিত্ব ভিন্ন জাতীয়; অভিধানে এ কবিত্বের অর্থ মিলে না, পণ্ডিতে এ কবিত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। শাস্ত্র-ইতিহাসে এ কবিত্বের মূল পাওয়া যায় না। ভাষার দৈন্য,

ভাবের অপ্রগাঢ়তা সত্ত্বেও এই সকল সামান্য ছড়ার সহিত আমাদের সুখদুঃখের কত প্রাণের কাহিনী গ্রথিত।' এইজন্যই রূপকথা উপকথার মাঝে ফুটিয়া উঠে চিরন্তনের দাবি, ঝংকৃত হয় আশা-আকাংক্ষার গাথা। তাই দেখি,—

'বঁধুর পান খেয়োনাক ভাব্ লেগেছে,
ভাব্ ভাব্ ভাব্ কদমের ফুল ফুটে রয়েছে।'

—চরণ দুইটির মাঝে স্পষ্ট অর্থহীনতা থাকিলেও একটা ভাবনিষিক্ত পরিবেশ যে শাশ্বতমুখী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহা তো আর অস্বীকার করা চলে না। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান'—এই ছড়াটি শুধু শৈশবদশাতেই মোহমন্ত্রের ন্যায় কাজ করিয়া থাকে তাহা নয়, পরিণত বয়সেও ইহার মোহ কাটে না। ছড়ার মধ্যে সত্যই একটা 'চিরত্ব' প্রবাহিত। যুগে যুগে মানুষের নব নব পরিবর্তন হইয়া থাকে, অথচ শিশু হাজার বছর আগেও যেমন ছিল, তেমনি আছে এখনও। 'সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন, কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য ;—তাহারা মানবমনে আপনি জন্মাইয়াছে।'

বাংলা সাহিত্যে লোকসাহিত্যের আবির্ভাব যে কতখানি বিষয়বৈচিত্র্য সংক্রামিত করিয়াছে, তাহা সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে ইহাও অনুমান করা যায়, লোক-সাহিত্যে দেব-দেবী লইয়া প্রচুর গান রচিত হইবার পর দেশের চিত্তবৃত্তি যে-মানবসংগীত খুঁজিয়াছিল, তাহাই ধীরে ধীরে প্রেমসংগীতে, নয় দেশাত্মবোধক গানে হয় রূপায়িত। এই কথাটি তো সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয় সেই গানটির কথা স্মরণে, যেখানে টপ্পাকার নিধুবাবুই লিখিয়াছেন—

শেষ কথা

'নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?'

বাংলা মহাকাব্য

বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয় মৌলিক মহাকাব্য রচনা। অবশ্য ইহারও বেশ কিছু দিন আগে একবার আমাদের সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ। কত কত কবিই-না সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। মৌলিক রচনা নাই-বা হইল, কিন্তু

অনুবাদ-রচনা হইলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারতই যে বাঙালীর জাতীয় জীবনের ধারক ও পরিপোষক, ইহা তো আর অস্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-মহাকাব্যের যে পরিমাণ সাড়া পড়িয়াছিল, ঠিক ততখানি সাড়া আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে মৌলিক মহাকাব্য রচনায় দেখা দেয় নাই। কোন কোন সমালোচক ইহাকে নিতান্তই দুর্ভাগ্য ও অক্ষমতার বিষয় বলিয়া ভাবিয়াছেন। কথাও উঠিয়াছে, গীতিকাব্যে খণ্ডকাব্যে কবিত্বময় বাঙালী বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আপনার বৈশিষ্ট্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে তো কাব্যকে অতিক্রম করিয়া মহাকাব্যের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইতে পারে নাই। পশ্চিমের হাওয়া আমাদের গীতিকাব্যে, আমাদের নাট্যসাহিত্যের গায়ে লাগিয়া বেশ খানিকটা সমুজ্জ্বল স্বাস্থ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে সত্য, কিন্তু এমনও তো মনে হয় যে, ঐগুলি লঘু সাহিত্য, কতকটা চাপল্য হইতেই উহারা সমুদ্ভূত—মহাকাব্যের মহাভাব সেখানে কোথায়। বিগত শতাব্দীর বাঙালী কবিগণের ইহাই ধারণা ছিল যে, মহাকাব্যই শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার বাহন। আখ্যানমূলক রচনার উপযোগী গদ্যরীতি তখনও বাংলা সাহিত্যে পরিপুষ্ট রূপ লইয়া দেখা দেয় নাই বলিয়াই হয়তো-বা মহাকাব্যের আয়তনের মাধ্যমে বড় কাহিনীকে মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য সেদিনের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবিমাত্রেরই অন্তরে ঝোঁক দেখা দিয়াছিল। কিন্তু সে ঝোঁকটি ক্ষণিকের ঝোঁক—দানা বাঁধিতে পারে নাই। যাহারা মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই শুধু মহাকাব্য রচনা করেন নাই, গীতিকাব্য খণ্ডকাব্য রচনার মধ্য দিয়াই ঘটিয়াছিল তাঁহাদের কবিপ্রাণের পরিপ্রকাশ। কাব্য ছাড়াইয়া মহাকাব্যে নয়, মহাকাব্য ছাড়াইয়া কাব্যেতেই ঘটিয়াছে বাঙালী কবির জয়যাত্রা।

ভূমিকা

সংস্কৃত আলংকারিকেরা সাহিত্যে যে বিশেষ প্রকাশটিকে 'মহাকাব্য' নামে আখ্যাত করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য অলংকারশাস্ত্রে তাহারই নাম 'এপিক্'। রূপশিল্পের দিক দিয়া, গঠন-কারুকার্যের দিক দিয়া, মহাকাব্য এবং এপিকের মধ্যে কমবেশী ভাবে যে পার্থক্যই দেখা যাক না কেন, প্রকৃতির ক্ষেত্রে, অন্তর্জীবনের ক্ষেত্রে, মহাকাব্য এবং এপিকের মধ্যে কোন গুরুতর ব্যবধান নাই। আমাদের প্রাচীন আলংকারিকের মহাকাব্যের গঠনশৈলী সম্পর্কে যে ধরাবাঁধা নিয়মটির কথা জানাইয়াছেন, তাহা মোটামুটি এই রকম : খুব বড়ও নয় আবার খুব ছোটও নয় এমনি ভাবের আটটি সর্গ থাকে মহাকাব্যে, মহাকাব্যের নায়ক দেবতাস্বভাব, সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় ও ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত, শৃংগার বীর ও শান্ত এই তিনটি রসের মধ্যে যে কোন একটি হয় অংগী বা প্রধান রস এবং অন্যান্য রস তাহারই অংগ ; ইহাতে থাকে নাটকের পঞ্চসন্ধি। ইতিহাস অথবা

প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রমতে মহাকাব্য

সজ্জনাশ্রিত কোন ব্যাপার বা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই ঘটে মহাকাব্যের রচনা; মহাকাব্যের গোড়াতেই থাকে হয় নমস্কার, নয় আশীর্বচন বা মংগলাচরণ; সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, মুনি, স্বর্গ, নগর, অধ্বর, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রের জন্ম—এই সকলের বিস্তারিত বর্ণনা থাকা চাই মহাকাব্যে, এমনি রকমের আরও কত নির্দেশ যে-সাহিত্যশিল্প মানিয়া চলে, তাহারই নাম প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রমতে 'মহাকাব্য'।

পাশ্চাত্ত্য 'এপিক্' কথাটিরও সৃষ্টিমূলে আছে প্রাচ্যেরই ন্যায় 'বৃত্ত' বা 'ব্যাপার' জিনিষটি। 'ইপস্' শব্দটির অর্থ 'গল্প'; অতএব, 'এপিক' বলিতে গল্প-সম্পর্কিত কোন-কিছুকেই যে নির্দেশিত করা হয়—একথা বলাই বাহুল্য। যে উপাখ্যানটিকে গাম্ভীর্যময় পরিবেশে সুবিন্যস্ত করিয়া গল্প করা হয়, তাহারই নাম 'এপিক্'। বীররস ছাড়া নীতি এবং ধর্মের আদর্শও ইহাতে মিলে প্রচুর। অনন্ত আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত শস্য আর অপরিমেয় ব্যোম—ইহাই এপিক-কল্পনার রংগক্ষেত্র। প্রথম নজরেই পাশ্চাত্ত্য এপিকের মধ্যে তিনটি উপাদান লক্ষ্য করা যায়। ইহার যেমনি ভাবধারা, তেমনি শব্দসম্পদ, তেমনি শব্দের বাঁধুনী। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই এপিকের পক্ষে অপরিহার্য। বৈচিত্র্যই এপিকের প্রাণ আর ঘটনাকেন্দ্রিক নাটকত্বই বৈচিত্র্যবিধায়ক। তাই আরিস্ততলের মতে, নাটকত্ব ওতপ্রোতভাবে না থাকিলে এপিকের উৎকর্ষ দেখা দেয় না। এপিকে কথার বাঁধুনি একটা মস্তবড় জিনিষ—এমন করিয়াই শব্দনির্বাচন করিতে হয় যে, উহা ধ্বনিত হইবামাত্র পাঠকমনে একটা গম্ভীর উদাত্ত ভাব সঞ্চারিত হয়। কীটসের ন্যায় এপিক কবিও শব্দবন্ধনকে প্রেমিকের দৃষ্টি লইয়া দেখিয়াছেন। আসল কথা, কাব্য নিছক ভাবেরই সমষ্টিমাত্র নয়। ভাব সে তো কাব্যের প্রাণ; তাই প্রাণের সুষমা, শক্তি ও মাধুর্য—এসবই যাহাতে ফুটিয়া উঠিতে পারে, এমন দেহই তো চাই। ভাবধারা, শব্দসম্পদ ও শব্দবিন্যাস—এই তিনটিরই দিকে নজর রাখিয়া পাশ্চাত্ত্য এপিক যেমন রচিত হয়, তেমনি প্রাচ্য মহাকাব্যেরও সৃষ্টি হয়। এই তিনটির দিকে যদি নজর থাকে, তাহা হইলে চরিত্রচিত্রণ, প্রকৃতিবর্ণন, যুদ্ধবর্ণন প্রভৃতি তো আপনা হইতেই সুরে-বাঁধা হইয়া সমুন্নত রূপে প্রকাশ পায়। আদি মধ্য অন্ত লইয়া একটি সমগ্র কাহিনীর যে ছন্দরূপ এপিকে থাকে, তাহার সম্পর্কে আরিস্ততল বলিয়াছেন,—'Concerning the poetry, however, which is narrative and imitative in meter, it is evident that it ought to have dramatic fables, in the same manner as tragedy, and should be conversant with one whole and perfect action, which has a

পাশ্চাত্ত্য অলংকারশাস্ত্র-মতে মহাকাব্য

beginning, middle and end.........Again, it is requisite that the epic should have the same species as tragedy. [For it is necessary that it should be either simple, or complex, or ethical, or pathetic.] The parts are also the same, except the music and the scenery. For it requires revolutions, discoveries, and disasters, and besides these, the sentiments and the diction should be well-formed ; all of which were first used by Homer, and were used by him fitly.'

অবশ্য যুগ-পরিবর্তনের সংগে সংগে এই 'এপিক' বা 'মহাকাব্যে'র আকৃতি-প্রকৃতিরও রূপান্তর হইয়াছে। এক শ্রেণীর মহাকাব্যে কবিবিশেষের কোন প্রাণস্পন্দনই শোনা যায় না, যেন মনে হয় ইহা স্রষ্টা-নিরপেক্ষ একটি সৃষ্টি, যেন মনে হয় কত অজ্ঞাতনামা প্রতিভাধর কবির একটি মিলিত প্রয়াস হইয়াছে রূপায়িত, যেন মনে হয় কত শাখা-প্রশাখায় বিক্ষিপ্ত ও বিচিত্র কাহিনীকে অলোকসামান্য এক কবিপ্রতিভা করিয়াছে গ্রথিত। এই ধরণের মহাকাব্যকেই ইংরাজিতে বলা হয় Epic of Growth, Authentic Epic বা Primitive Epic আর বাংলায় বলি 'জাত মহাকাব্য'। ইহাতে চিন্তা ও ভাবানুভূতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, আশা ও আকাংক্ষা লইয়া সমগ্র জাতির একটা অখণ্ড প্রাণসত্তা বস্তুধর্মিতা ও সমুন্নতির পরিবেশে উঠে ফুটিয়া। বাল্মীকির 'রামায়ণ', ব্যাসের 'মহাভারত', হোমারের 'অডিসি' 'ইলিয়াড'—তাই 'জাত মহাকাব্য'। আবার আর এক শ্রেণীর মহাকাব্যও আছে, যাহার আয়তন পূর্ববর্তী মহাকাব্যের ন্যায় বিরাট্ না হইলেও সুসংবদ্ধ ঘটনাপারম্পর্যে ও মাধুর্যে মহীয়ান। অ-লোকসম্ভব 'জাত মহাকাব্য' হইতেই বিষয়বস্তু আহরণ করিয়া এই ধরণের মহাকাব্যে একটা লৌকিক স্বাতন্ত্র্য, সমসাময়িক যুগপ্রভাবিত একটা কবিমানসের ভাব ও ভাবনা, রুচি ও আদর্শ, আশা ও আকাংক্ষা রূপায়িত হয়। ভাষা ও উপমার কারুকার্যে, মননশীলতা ও কল্পনার প্রাখর্যে রেখায়িত এই যে মহাকাব্য, ইহাকে ইংরাজিতে বলা হয় Epic of Art, Literary Epic অথবা Imitative Epic আর বাংলাতে বলি 'অনুকৃত মহাকাব্য'। ইহাই 'A work of deliberate art'। কালিদাসের 'রঘুবংশম্', মিলটনের *Paradise Lost*, ভার্জিলের *Æneid*, ট্যাসোর *Jerusalem Delivered*, হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ', নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' নামধেয় কৃষ্ণমহ' কাব্য—তাই 'অনুকৃত মহাকাব্য'। পূর্বোক্ত জাতের মহাকাব্য আবৃত্তির জন্য রচিত, কিন্তু শেষোক্ত জাতের মহাকাব্য নিছক পড়িবারই জন্য লিখিত। এই

মহাকাব্য বা এপিক্ দুই শ্রেণীর—
(১) জাত মহাকাব্য ;
(২) অনুকৃত মহাকাব্য

উভয় শ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যে যে পার্থক্যটি রহিয়াছে, তাহা এই—'It is the difference between the contracted, precise, but vigorous tradition of a heroic age, and the diffused, eclectic, complicated culture of a civilization.'

বাংলা সাহিত্যে যে কয়েকজন কবি 'অনুকৃত মহাকাব্য' তথা নব্য আদর্শের অনুসরণ-সঞ্জাত মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের নামই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য রংগলাল মহাকাব্য না লিখিলেও, তাঁহার 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' পাশ্চাত্ত্য আদর্শানুযায়ী হইয়া মহাকাব্যেরই পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইতিহাসপ্রোক্ত ঘটনা ও সজ্জনের জীবনকথাকে কেন্দ্র করিয়া যথাযোগ্য শব্দবিন্যাসের সাহায্যে তিনি যে-কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রকৃতি এবং পাশ্চাত্ত্য এপিকের প্রকৃতি কিছুটা একই ধরণের। রংগলালের রচনাই যদি একটু বিস্তৃত আয়তন লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত, তাহা হইলে তাঁহার কাব্যকেও 'মহাকাব্যে'র শ্রেণীতে ফেলিতে আপত্তি হইত না। সংক্ষিপ্ত হওয়াতেই রংগলাল-কাব্যকে ইংরাজি সাহিত্যের 'Metrical Romance,' 'Verse Tale'-এর পর্যায়ভুক্ত করিয়া থাকি।

রংগলাল-কাব্যে মহাকাব্যের ধর্ম

মধুরচিত 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য'ই বাংলা অমিত্রাক্ষরছন্দে লিখিত প্রথম 'খণ্ড এপিক'। ইহারই পরে আসে 'মেঘনাদবধকাব্য'—রাম রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ, এই চরিত্রত্রয়ই 'মেঘনাদবধকাব্যে'র মুখ্য উপজীব্য। মধুসূদন নিজেই তাঁহার এই শেষোক্ত গ্রন্থখানিকে বলিয়াছেন Epicling বা খণ্ড এপিক। আমাদের পুরাণ-কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া পাশ্চাত্ত্য এপিকের আদর্শে মধুকবি ইহাতে চরিত্রচিত্রণ করিয়াছেন। মুখ্যত মিল্টনই ছিলেন তাঁহার আদর্শ, তবে স্থানে স্থানে তিনি হোমার, ট্যাসো, ভার্জিল প্রভৃতি মহাকবিকেও অনুসরণ করিয়াছেন। যে দেশে 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্ ন তু রাবণাদিবৎ' বলিয়া সাহিত্য-রচনার নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই দেশে জন্মিয়াই মাইকেল লিখিয়াছেন,—'I despise Ram and his rabble, but the idea of Ravana inspires me with enthusiasm; he is a grand fellow'. ঐশ্বর্যের কবি মধুসূদন বনবাসী রামের প্রতি সহজাত বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করিয়া এবং লংকেশ্বর রাবণের প্রতি তাঁহার তীব্র আনুগত্য দেখাইয়া বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য মানবধর্মেরই বিজয়পতাকা উড়াইয়াছেন।

মহাকাব্যরচনায় মধুসূদন

হেমচন্দ্র মধুকবিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়া 'বৃত্রসংহারকাব্যে'র যে রূপসজ্জা দিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্ত্য-ঘেঁষা সন্দেহ নাই। গ্রীক্ 'ফেটে'র অনুসরণে 'নিয়তি দেবী'

ট্যাসোর কাব্যের 'সফ্রোনিয়া-হরণে'র অনুকরণে 'শচীহরণ', মিলটনীয় 'অসুরসভা'র অনুবর্তনে 'অসুরমন্ত্রণা-সভা'কে হেমচন্দ্র তাঁহার মহাকাব্যে প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন। দধীচির তনুত্যাগ ও বজ্রগঠনের মধ্য দিয়া বিষয়বস্তুর গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু মহাকাব্যসুলভ কাব্যকৃতির সন্ধান ইহাতে মিলে না। চরিত্রাঙ্কণের মধ্য দিয়া বীররসকে প্রধান রূপে প্রকট না করিয়া অবিরাম যুদ্ধবর্ণনার মাধ্যমে বৃত্রসংহারকাব্যকে বীররসপ্রধান করিতে গিয়া হেমচন্দ্র মহাকাব্যের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব ব্যাহত করিয়াছেন।

মহাকাব্যরচনায় হেমচন্দ্র

নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' মহাকাব্যের আকারে বিরচিত হইলেও Byron-এর *Child Harold*, কালিদাসের 'মেঘদূতম্'-এর ন্যায় কতকগুলি খণ্ডকাব্যের সমষ্টিমাত্র। Milton-এর *Paradise Lost* ও Dante-এর *Divina Comedia*-র ন্যায় ইহাতে কোন অমানুষী কল্পনা ও অলৌকিক সৃষ্টি নাই। কয়েকটি চিন্তা এবং ঘটনা এলোমেলো ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে এইমাত্র। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস'—এই তিন ভাগে রচিত কৃষ্ণমহাকাব্যে নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের আদ্য মধ্য ও অন্ত্য লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। কবি এই কাব্যত্রিতয়ে আর্য-অনার্য সংঘর্ষের এক গৌরবময় ইতিহাসের মধ্য দিয়া, ব্রাহ্মণ-দ্রাবিড় সভ্যতার বিরোধের মধ্য দিয়া, য়ুরোপীয় মহাকাব্যের বিশালতা সঞ্চারিত করিয়াছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক আনন্দ-সংকট-দুঃখকে কবি মনশ্চক্ষে দেখিয়াছেন এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পটভূমিকায় সেই সন্ধিযুগের এক দার্শনিক চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। তত্ত্বকথা, ধর্মনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি এত থাকিতেও সংযত রচনাশৈলী ও সমুন্নত শিল্পকৃতির অভাবে নবীনচন্দ্র সার্থক মহাকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই।

মহাকাব্যরচনায় নবীনচন্দ্র

'মেঘনাদবধকাব্যে'র আদর্শে আরও কয়েকখানি মহাকাব্য রচিত হয়। ইহার পরিশিষ্টরূপে যে দুইখানি মহাকাব্যের রচনা হয়, তাহার মধ্যে একখানির নাম 'দশাননবধ-মহাকাব্য'। সংস্কৃত মহাকাব্যের লক্ষণানুসারে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি 'নিবাতকবচবধ' নামে সপ্তদশ সর্গে সমাপ্ত এক মহাকাব্য রচনা করেন। ইহা ছাড়া, আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'হেলেনাকাব্য', কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান-কাব্য' প্রভৃতি গ্রন্থের কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। এমন কি, এই বিংশ শতাব্দীতেও যোগীন্দ্রনাথ বসু 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী' নামে দুইখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। বিষয়নির্বাচনে, ঐতিহাসিকতায়, জাতীয়তাবোধে, ভাষায়, ভাবে, ঝংকারে—সর্ব দিক দিয়াই মহাকাব্যের মহাভাব এই দুইখানি গ্রন্থে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের আরও কয়েকখানি অপরিচিত মহাকাব্য

কিন্তু তবু যোগীন্দ্রনাথের মহাকাব্য দুইখানি বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত হইয়াই রহিয়াছে। এই অপরিচয়ের কারণ হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দরের কথাই আমাদের মনে পড়ে। ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছিলেন—'মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন একেবারে চলিয়া গিয়াছে।' মন্তব্যটি অবশ্য করা হইয়াছিল

শেষ কথা

'অডিসি', 'রামায়ণ' প্রভৃতি 'জাত মহাকাব্যকে' লক্ষ্য করিয়াই, কিন্তু 'অনুকৃত মহাকাব্য' সম্পর্কেও রামেন্দ্রসুন্দরের ঐ মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। মানবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে বিবিধ ও বিচিত্র রূপে রূপায়িত করা এবং সমগ্র সমাজের প্রতিভূ হইয়া সেই সমাজেরই আদর্শকে বলিষ্ঠ এবং সার্বজনীন করিয়া তোলা—চূড়ান্তরূপে বিপরীতমুখী এই দ্বিধারা আছে বলিয়াই আজিকার দিনে মহাকাব্যকে প্রাণ ভরিয়া সমাদর করি না সত্য, কিন্তু হয়তো-বা খানিকটা প্রশংসাই করি। মহাকাব্য সম্পর্কে মানবমনের মাঝে এই যে সদাজাগ্রত অন্তর্বিরোধ, ইহারই দরুণ মহাকাব্যের সৃষ্টি আর হয় না। বাংলার কাব্যমালিকাকে যিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথও এই অন্তর্বিরোধবশতই যে মহাকাব্য রচনা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই, তাহা জানিতে পাই 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থে, যেখানে তিনি বলিয়াছেন—

> ঠেকল কখন তোমার কাঁকন কিংকিণীতে,
> কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে,
> মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
> পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।
> আমি নাব্‌ব মহাকাব্য সংরচনে
> ছিল মনে।

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য

কাল হইতে কালান্তর ব্যাপিয়া, স্থান হইতে স্থানান্তর জুড়িয়া, আপন ও পরের মধ্যে—নিকট ও দূরের মধ্যে—ভাব-বিনিময়ের পরিবহন-কর্ম সাধন করিয়া থাকে এই অনুবাদই। কৃষ্টিগত মিলনের সোপানই যে শুধু ইহা রচনা করে তাহা নয়, আত্মবিস্তারের উপায় এবং উপকরণও মিলাইয়া দেয়। ধরা যাক, ইংরাজি সাহিত্যের কথা। ইহার অর্ধেক মর্যাদাই আজ অনুবাদ-সাহিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজ সাহিত্যিকেরা—এমন কি অনেক সক্ষম শিল্পীও মৌলিক শিল্পসাধনায়

আত্মনিয়োগ না করিয়া—অনুবাদকে সাহিত্যকর্ম হিসাবে মানিয়া লইয়া বহু সাধনা, বহু আত্মত্যাগ, বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই তো আজ ফরাসী, জার্মান, রুশীয়, ইতালীয়ান, জাপানী, নরওয়েজীয়ান, স্কাণ্ডিনেভীয়ান, ডাচ, চীনা, ভারতীয়, আরব্য, পারস্য প্রভৃতি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিত ইংরাজের আয়ত্তে আসিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, বিশ্বসাহিত্যের যথার্থ নিরিখ করিতে হইলে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্যের অধ্যয়ন ছাড়া গত্যন্তর নাই। অনুবাদ অন্যান্য দেশেও হয়, বাংলাতেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের দ্রুত সমুন্নতি ও বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ইহার গৌরবময় আসনলাভ সত্যই বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন হইলেও, গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস কিন্তু এখনও দেড়শত বৎসরের পুরাতন নয়। যথার্থ অনুবাদ না হইলেও, অন্তত অনুসরণের মধ্য দিয়া বাংলা কাব্যসাহিত্যের পত্তন হইয়াছে। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি বাংলা কাব্যসাহিত্যের এই শ্রেণীর অনুসরণ-কাব্য। পক্ষান্তরে, প্রায় অনুবাদেরই মধ্য দিয়া যাহার জন্ম, সেই গদ্যসাহিত্যে এই অনুবাদ-কর্মটি আজিও শিল্পসাধনার রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই বলিলেই চলে। কাব্যের অনুবাদ অথবা অনুসরণের ক্ষেত্রে মধ্যযুগে যাহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন, সম্ভবত তাঁহারা প্রত্যেকেই উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন বলিয়াই বাংলা কাব্যসাহিত্যে এই দিক দিয়া সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কিন্তু গত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পদ্যে অথবা গদ্যে যাহারা অনুবাদ অথবা অনুসরণ-কর্ম করিয়াছিলেন অথবা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই, বোধ করি, উচ্চশ্রেণীর শিল্পী নহেন। হয়তো-বা সেইজন্য অনুবাদ বা অনুসরণ সাহিত্যগৌরব লাভ করিতে অক্ষম। অবশ্য একথা ঠিক যে, অনুসরণ করিয়া কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কাশীদাসের 'মহাভারত', ফিট্‌জেরাল্‌ডের 'ওমরখৈয়ামে'র মত অল্প কয়েকখানি ভাষান্তরিত কাব্য বিশ্বসাহিত্যে মর্যাদা লাভ করিলেও, সাধারণত কাব্যানুসরণ বা কাব্যানুবাদ বিপুল অক্ষমতারই ইতিহাস।

সাহিত্যক্ষেত্রে অনুবাদ বা অনুসরণের স্থান

অনুবাদেরই মধ্য দিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পাদরী মনোএল-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম বিরচিত এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের লিসবন সহরে রোমান হরফে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধ-পরবর্তী কালে বিজয়ী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর আইনকানুন বংগদেশে প্রচারার্থে অনুবাদ শুরু হইয়াছিল। জোনাথন ডান্‌ক্যান্‌ অনূদিত তিনখানি আইনের বই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল—ঐগুলিই ভারতে মুদ্রিত সর্বপ্রথম বাংলা পুস্তক। তৎকালে শ্রীরামপুরে স্থাপিত ব্যাপটিষ্ট মিশন বংগদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় বাইবেল অনুবাদ প্রকাশে তৎপর হইয়াছিল। *New Testament* এবং *Old Testament* লইয়া সমগ্র 'ধর্মপুস্তক' বাইবেলের অনুবাদ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামরাম বসুর সাহায্য লইয়া জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী এই অনুবাদ করিয়াছিলেন। প্রসংগত, একটি কথা বলা চলে যে, ইংরাজি ভাষায় অনূদিত বাইবেল পৃথিবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, বংগভাষায় অনূদিত বাইবেল সাহিত্য নয়—নিছক অনুবাদই। অতঃপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকগণ কর্তৃক পাঠ্যগ্রন্থ রচনার অবসরে বেশ-কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে ঐ অনুবাদগ্রন্থগুলির মূলের অর্ধেকই ইংরাজি; বাকিটা সংস্কৃত, নয় ফার্সী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকগণের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ছিলেন প্রধান অনুবাদক। মৃত্যুঞ্জয়ের অনূদিত 'হিতোপদেশ' গ্রন্থখানি একরূপ আক্ষরিক অনুবাদ—তাই ভাষাও সংস্কৃতানুগ—ফলে স্থানবিশেষ উৎকট। মৃত্যুঞ্জয়কৃত অন্যান্য অনুবাদও দোষ-ত্রুটি-বিবর্জিত নয়। পক্ষান্তরে, গোলোকনাথ শর্মা অনূদিত 'হিতোপদেশ' পুস্তকখানিতে স্বাধীন অনুবাদ-রীতি থাকায় রচনা শ্রুতিকটু হয় নাই। অবশ্য মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত তুলনায় গোলোকনাথের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল নিতান্তই অগভীর। ফারসী উর্দু ও ইংরাজিতে তারিণীচরণ মিত্রের ব্যুৎপত্তি থাকিলেও, তিনি বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। ফলে তাঁহার রচনা অনুবাদ হইলেও বাংলা হয় নাই। চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' হিন্দী 'তোতা-কহানী'র অনুবাদ। এই হিন্দী বইয়ের মূল হইল ফারসী 'তুতিনামা' এবং উহারও মূল হইল সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি'। চণ্ডীচরণের অনুবাদ-ভাষা নিন্দনীয় নয়। হরপ্রসাদ রায় অনূদিত 'পুরুষ-পরীক্ষা' মূল সংস্কৃতের অনুগত হইলেও প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণসমন্বিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগের বাহিরেও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' অনূদিত পাঠ্যগ্রন্থাদি উল্লেখযোগ্য। তবে সাধারণ বিদ্যালয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বইয়েরই প্রচলন ছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' বা বংগভাষানুবাদক সমাজ সংস্থাপিত হইল। শ্রীযুক্ত মেকলে রচিত *Life of Lord Clive* গ্রন্থখানির

বাংলা ভাষায় অনুবাদের শৈশব-পর্ব

অনুবাদ করিলেন হরচন্দ্র দত্ত এবং উহাই সমিতি-প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অনূদিত বাইবেল এবং ঐ সমস্ত পাঠ্যপুস্তকের বাহিরেও বাংলা গদ্যরীতির একজন প্রধান নিয়ন্তা হিসাবে রামমোহন রায়ের নাম স্মরণীয়। রামমোহন বিরচিত 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্ত-সার' গ্রন্থদ্বয় অনুবাদাত্মক। তিনি উপনিষদাদির যে গদ্যানুবাদ করেন, তাহার ভাষা বেশ সহজ ও সরল। অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থের খণ্ডদ্বয় জর্জ কুম্ব রচিত *Constitution of Man* নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইলেও যথার্থ অনুবাদ নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' হিন্দীপুস্তক 'বৈতাল পচ্চিসী'র যথাযথ অনুবাদ নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় মূল সংস্কৃত মহাভারতের যথাযথ অনুবাদ কিছুটা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ কার্যে ব্রতী হওয়ায় তিনি আর সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন নাই। তারাশংকর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' বাণভট্ট রচিত মূল কাব্যগ্রন্থের যথার্থ অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ মাত্র। বংগসাহিত্যে অনুবাদের এই শৈশব-পর্বে ইহাই সবিশেষ লক্ষণীয় যে, পাদ্রীসমাজ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বংগভাষানুবাদক সমাজ মোটামুটিভাবে যথার্থ অনুবাদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কেহ কেহ আবার যথাযথ অনুবাদ করেন নাই।

অতঃপর বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের কৈশোর পর্বে নাটক এবং কাব্যেরই অনুবাদ সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত না হইলেও সংস্কৃত নাটকের নাট্যানুবাদ লইয়াই বাংলা নাট্যরচনার সূত্রপাত। বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকই সম্ভবত এই শ্রেণীর প্রথম রচনা। হরচন্দ্র ঘোষ শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের প্রথম বংগানুবাদ করেন। তবে অনুবাদ যথার্থ অনুবাদ নয়—মর্মানুবাদ। ফলে *Merchant of Venice*-এর মর্মানুবাদ 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক' নাটক হয় নাই—হইয়াছে পাঠ্যপুস্তক। আবার *Romeo and Juliet*-এর বংগানুবাদ 'চারু-মুখচিত্তহরা নাটক' প্রধানত অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেও, রচনায় লালিত্য বা রসের একান্তই অভাব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শেক্‌স্‌পীয়রের জনপ্রিয় নাটকগুলির একাধিক অনুবাদ বংগভাষায় হইয়াছিল। তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটকখানি সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইংরাজ সাহিত্যের শেক্‌স্‌পীয়রের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাসও বাংলা নাট্যানুবাদের উপকরণ সরবরাহ করিয়াছেন। কালিদাসের নাটক অবলম্বনে নন্দকুমার রায় 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' নামে অভিনয়যোগ্য প্রথম বাংলা নাটক

বাংলা ভাষায় অনুবাদের কৈশোর-পর্ব

লিখিয়াছিলেন। অতঃপর কালীপ্রসন্ন সিংহের তত্ত্বাবধানে (?) 'বিক্রমোবর্শী' নাটকের আক্ষরিক অনুবাদ হইয়াছিল। কেবলমাত্র কালিদাসেরই নয়, ভবভূতি শ্রীহর্ষ বিশাখদত্ত শূদ্রক ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃত নাট্যকারদের বিভিন্ন নাটকগুলির বংগানুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অতুলনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্য-কবিতার সার্থক অনুবাদ করা বড়ই কঠিন। কিন্তু এই অনুবাদকর্মে বংগকবিদের দান সমধিক উল্লেখযোগ্য। রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পার্নেল ও গোল্ড্স্মিথের 'হার্মিট্' কাব্য দুইটি এবং কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' অনুবাদ করিয়াছিলেন। পার্নেলের 'হার্মিট্' বহুদিনব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়পাঠ্য ছিল বলিয়া রংগলালের পর অনেকেই বাংলা পদ্যে উহার ভাষান্তর করিয়াছিলেন। কবি রংগলাল কয়েকটি ইংরাজি কবিতারও অনুবাদক। বংগদর্শনের বিশিষ্ট লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কালিদাসের 'মেঘদূতে'র অনুবাদ করিয়াছিলেন। একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, 'বিদেশী ভাষার কবিতা বাংলায় রূপান্তরীকরণে সত্যেন্দ্রনাথ যে পরিমাণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা যে-কোন সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতাগুলি ফুলের মত বৃন্তরূপ মূলকে আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।' ইহা ছাড়া, বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের কৈশোর-পর্বে ইংরাজি দর্শন, ইতিহাস, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতির কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহাদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই সাহিত্যপদবাচ্য। অল্পসংখ্যক অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত 'ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষ' পুস্তকখানি সমধিক উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের সমৃদ্ধি দেখা যায় এই বিংশ শতাব্দীতে—বিশেষ করিয়া এই সাম্প্রতিক কালে। আমাদের সাহিত্যে অনুবাদের ইহাই যৌবন-পর্ব। বর্তমানে অনুবাদের নানা ধারা; যেমন—ভাবানুবাদ, ছায়ানুবাদ, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ও যথার্থ বা বিশুদ্ধ অনুবাদ। প্রথম তিন শ্রেণীর অনুবাদে অনুবাদকের নিষ্ঠার একান্তই অভাব—কেবলমাত্র ব্যবসায়সুলভ রীতি ও মনোভাবই উহাতে বিদ্যমান। ঐ বাজার-চলতি অনুবাদ-রীতি দেখিয়া মনে হয় যে, অনুবাদক বিদেশী ভাষায় অনভিজ্ঞ জনকে যেন কৃপার দান দিবার জন্য সমুৎসুক। অনুবাদ যে একটি শিল্পকর্ম—তাই ইহা সাহিত্যের সৃষ্টিকর্মেরই গোত্রভুক্ত—ইহা যেন ঐ তথাকথিত অনুবাদকেরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। বাণীভংগী, আংগিক, ভাব ও ভাষার যথাযথ পরিবেশনই নিষ্ঠাবান অনুবাদকের কর্তব্য। বিদেশী সাহিত্যকে সার্থক বাংলা রীতিতে প্রকাশ, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভাবানুভূতির সংযোগ সাধন, মূল ভাষার উপরে বিশেষ অধিকার প্রদর্শন, বাক্যার্থ ও বাচ্যার্থ-বোধের সৌষ্ঠবরক্ষা—এ

বাংলা ভাষায় অনুবাদের যৌবন-পর্ব

সবেরই প্রতি নিষ্ঠবান অনুবাদকের লক্ষ্য থাকা সমীচীন। সাম্প্রতিক কালে উপন্যাস ছোট গল্প নাটক কবিতার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, ইতিহাস রাজনীতি অর্থনীতি প্রবন্ধ প্রভৃতির বেলাতেও অনুবাদক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। অবশ্য একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বর্তমান বংগসাহিত্যে অনুবাদ-পরিবেশকদের সকলেই এবং সর্বত্র যথার্থ অনুবাদ-প্রয়াসী নহেন। আধুনিক অনুবাদকারীদের মধ্যে যাঁহারা সমধিক উল্লেখযোগ্য, তাঁহাদের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচিত হইল।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গর্কির 'মা' উপন্যাসখানি যথার্থ অনুবাদ করেন নাই—তবে গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ-বর্গীয়। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ অনূদিত গ্রন্থগুলি মোটামুটি এই জাতেরই। তবে মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দের লেখা গ্রন্থের অনুবাদ 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' বেশ নিষ্ঠাযুক্ত ও প্রশংসাযোগ্য। বিমল সেন অনূদিত ঐ 'মা' উপন্যাস যথার্থ অনুবাদধর্মী নয়—সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ মাত্র। সুধীন সরকারের 'ধীরে বহে ডন' শ্রেণীর বইগুলিও প্রকৃত অনুবাদধর্মী নয়—সংক্ষিপ্ত ও সরল রূপায়ণ। পবিত্র গংগোপাধ্যায় অনূদিত 'রামধনু' সংক্ষিপ্ত বা সম্পাদিত আকারের সুখপাঠ্য গ্রন্থ। প্রবোধেন্দু ঠাকুর বর্তমান যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের বংগানুবাদ-পরিবেশকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। অনুবাদ-সাহিত্যে ইনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। কালাতীত সমৃদ্ধ সাহিত্যকে খাঁটি বাংলায় পরিবেশনের আশ্চর্য প্রতিভা ইঁহার অনুবাদগ্রন্থ দাবি করিতে পারে। এই প্রসংগে প্রবোধেন্দু অনূদিত 'কাদম্বরী' স্মরণীয়। এক কথায় বলা যায়, ইনি আমাদের অনুবাদ-সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উত্তরসাধক। মোহিতলাল মজুমদার অনূদিত 'বিদেশী ছোট গল্প-সঞ্চয়ন' ও 'বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন' গ্রন্থ দুইখানি সার্থক অনুবাদ-প্রচেষ্টার ভূমিকা হিসাবে স্মরণীয়। অশোক গুহের অনুবাদগ্রন্থগুলির মধ্যে ভাষার সারল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি মূলের ভাষাভংগীর অনুসারক নহেন—পক্ষান্তরে বর্জননীতিরই পরিপোষক। তবে তাঁহার 'ফাঁসীর মঞ্চ থেকে' পুস্তকখানি অনুবাদের বৈশিষ্ট্য বহন করে। প্রধানত, মূল ভাষাজ্ঞানের পটভূমিকার দিক হইতে আধুনিক বাংলা অনুবাদক্ষেত্রে মূল রুশ ভাষা হইতে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত 'রুশ-কবিতা' নামক গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনিলেন্দু চক্রবর্তী অনূদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধিকাংশই ছোট-গল্পের সংকলন। অনুবাদকের নিষ্ঠা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন—তাই মূলের পরিবর্জন ও পরিবর্ধন-পদ্ধতির প্রতি তাঁহার পক্ষপাত নাই। তাঁহার প্রথম দিকের লেখা 'গভর্ণমেন্ট ইন্‌স্‌পেক্টর' নামক বিখ্যাত রুশ নাটকটির অনুবাদ চমৎকার। তাঁহার

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের যৌবন-পর্বের উল্লেখযোগ্য অনুবাদকগণের অনুবাদ-বৈশিষ্ট্য

'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প' পর্যায়ের ১ম হইতে ৪র্থ খণ্ডের গল্প-ভাণ্ডার, 'দেশের গল্প' বিশ্বস্ততারক্ষার উজ্জ্বল উদাহরণ। মূল লেখকের বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক যথাসম্ভব তাঁহার অনুবাদে ধরা পড়িয়াছে। তুলনামূলক বিচারে এ কথা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। অনিলেন্দুর সর্বশেষ অনূদিত গ্রন্থ 'প্রেম ও কামনা' (বিদেশী লেখকদের প্রেমমূলক শ্রেষ্ঠ গল্প-সংকলন) বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে শিল্পকর্ম ও বিশ্বস্ততার অনন্য দৃষ্টান্ত। একটি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, মহৎ শিল্পীদের রচনার যথাযথ অনুবাদ বাজারের সাধারণ চাহিদামত মত নাও হইতে পারে। কারণ,—মূল লেখকের রচনা-ভংগী ও ভাষা-ঐশ্বর্য যো-খুশী পাঠের ন্যায় হওয়া বড়ই দুরূহ। অনিল সিংহ অনূদিত 'সোভিয়েট্ রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা' বইখানিও অনুবাদ-প্রচেষ্টা ও রূপায়ণের দিক দিয়া প্রশংসাযোগ্য। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রয়োজনের দিক দিয়া অবশ্য জ্ঞাতব্য। ভবানী মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'মাদার রাশিয়া' একখানি বৃহৎ ও বিশিষ্ট অনুবাদগ্রন্থ। বিষয়বস্তু ও অনুবাদ—উভয় দিক হইতেই বর্তমান অনুবাদ-সাহিত্যে এই গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের আর একটি অনুবাদ-গ্রন্থ 'অখণ্ড জগৎ' সম্পর্কেও পূর্বোক্ত অভিমত সমভাবে প্রযোজ্য। ইনি বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্যই বিশেষ স্থান পাইবার অধিকারী। রজনী পাম দত্ত লিখিত এবং পরিমল চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য অনূদিত 'আজিকার ভারত' (১ম ও ২য় ভাগ) বংগানুবাদে নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে এই জাতীয় প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। এ. কাহন্ ও এন্. সোয়ার্সে লিখিত *Conspiracy against Russia* নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বিনয় ঘোষ ও সুনীল গংগোপাধ্যায় বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অনুবাদকর্ম একটু বিস্তৃত সত্য, তবে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিক হইতে ইহা প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা সন্দেহ নাই। অতঃপর একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড' নামক পুস্তক-ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান রাজনীতিক দলবিশেষের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে মননশীলতা ও প্রবন্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যাপারে যে দুঃসাহসিকতা দেখাইতেছেন তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। পূর্ব-পাকিস্তানেও বাংলা অনুবাদকর্ম ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। *Virgin Soil*-এর অনুবাদ 'পোড়োজমি' রচনা করিয়া 'আজাদ'-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁহার সার্থক অনুবাদ-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। মহাকবি ইকবালের কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে সৈয়দ আবদুল মান্নান, ফররুখ আহ্মদ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদকর্ম, বিশেষত ইহার সাহিত্যশিল্পসম্মত রূপায়ণ, খুবই আয়াসসাধ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য 'অনুবাদ-চর্চা' নাে একখানি গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা খুবই প্রশংসনীয় সত্য, ত: ইংরাজি সাহিত্য হইতে অনুবাদ-ব্যাপারে আরও অনেক কিছু করিবার অবকাশ আছে। সজনীকান্তের ভাষা বলা যায়, 'মৌলিক রচনায় এখন বাংলা দেশে ভাঁটার টান ধরেছে, এই সুযোগে বাঙালী সাহিত্যিকেরা যদি অনুবাদের কাজ এগিয়ে রাখ্‌তে পারেন, তা'হলে বাংল সাহিত্যের কল্যাণই হবে।'

শেষ কথা

বাংলা সাময়িক সাহিত্য

বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস খুব দীর্ঘ দিনের নয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য দীর্ঘ আট শত বৎসরের ইতিহাসে কবিতার একাধিপত্য। উনিশ শতকের প্রারে বাংলা সাহিত্যিক-গদ্য শৈশবে পদার্পণ মাত্র করিয়াছে। গদ্যসাহিত্যের ভাব বহনোপযোগী কিছুটা ক্ষমতা না জন্মিলে সাময়িকপত্রের উদ্ভব যে সম্ভব নয়, ইহ সহজেই অনুমান করা চলে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করিবার দিকে পণ্ডিত ও শিক্ষিত মহলে একটা চেষ্টার সূত্রপা হইল। এবং অল্প কিছুকালের মধ্যে বেশ কয়েকখানি পুস্তক রচিত হইয়া বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্যের নানা সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিল বাংলা গদ্যের প্রথম সৃষ্টিসমূহ স্বভাবতই ইস্কুল-কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল সাময়িক পত্রই সর্বপ্রথম শিক্ষায়তনের একান্ত প্রয়োজনের গণ্ডি হইতে জ্ঞান ও বিদ্যাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার কার্যে ব্রতী হইল।

গদ্য-সাহিত্য ও সাময়িক পত্র

অবশ্য প্রথম প্রথম সাময়িকপত্রগুলিও ছাত্রছাত্রীদের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করিত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইস্কুল-কলেজের প্রয়োজনের বাহিরে একটি সাধার পাঠক-গোষ্ঠী (Reading public) গড়িয়া উঠিতে বেশ কিছুটা সময় লাগিয়াছিল। এই প্রসংগে 'দিগ্‌দর্শন' এবং 'পশ্বাবলী' পত্রিকার নামোল্লেখ করা চলে। উভয় পত্রিকাই যে 'স্কুল বুক সোসাইটি' দ্বারা পোষিত হইত এ তথ্য পাওয়া যায়। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন'ই প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা। ইহা প্রতিমাসে প্রকাশিত হইত। 'যুবলোকের কার

ইস্কুল-পাঠ্যরচনা ও সাময়িক পত্র

সংগৃহীত নানা উপদেশ' এই পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত। ক্লার্ক মার্শম্যান ইহার সম্পাদক ছিলেন।

বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসকে আমরা মোটামুটিভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করিবার পক্ষপাতী। এই পর্ববিভাগ বাঙালীর জীবন-ইতিহাসের বিবর্তন এবং বাংলা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক অগ্রগতির সংগে সম্বন্ধচ্যুত নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত—প্রথম যুগ। ইহার নামকরণ করা যাইতে পারে প্রস্তুতি-প্রতিষ্ঠার যুগ। দ্বিতীয় যুগ—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের প্রায় দুই দশককে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা চলে—ইহা ঐশ্বর্য যুগ। অতঃপর ইহার পরবর্তী তৃতীয় যুগ বা আধুনিক যুগ—এই যুগ সাম্প্রতিক কাল অবধি প্রসারিত।

সাময়িক সাহিত্যের তিন যুগ

'দিগ্‌দর্শন' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর পূর্ব পর্যন্ত প্রস্তুতি-প্রতিষ্ঠা পর্বের বিস্তৃতি বলা যাইতে পারে। এই পর্বে বাংলা সাময়িকপত্র জন্মলাভ করিয়াছে। এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ক্রমেই সমুন্নতি লাভ করিয়াছে। ইতিহাসের ভাষায় এই পর্বকে বলা যাইতে পারে বাংলার নবজাগৃতির প্রস্তুতি এবং বৌদ্ধিক পশ্চাৎভূমি (Intellectual background)। আর রসসৃষ্টির দিক দিয়া এই পর্ব তো কেবল প্রস্তুতিরই। বৈদেশিক সংস্কৃতির সংগে সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে সংশয় ও দ্বন্দ্ব জাগিয়াছে মানুষের মনে। আত্মস্থ ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া সৃষ্টিকর্মে তাঁহারা এখনও ব্রতী হইতে পারেন নাই। এই পর্বের সাময়িকপত্রগুলিতে এই সব মনোবৃত্তির ও অবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। সমসাময়িক কালে নানা বিষয় লইয়া যে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন গড়িয়া উঠে, এই পর্বের পত্র-পত্রিকা তাহার বাহন হিসাবে কাজ করিয়াছে। সহমরণপ্রথা, বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ-নিরোধ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে নানা বিতর্ক এবং কলহ এই সময়কার পত্রগুলিতে প্রকাশিত হইত। দ্বিতীয়ত, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনী-সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনা প্রকাশিত করিয়া জ্ঞানানুশীলনের একটি ভিত্তি এই কালে রচিত হইতেছিল। তৃতীয়ত, প্রাচীন হিন্দুধর্ম, নবপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম এবং খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের কার্যাবলী সম্বন্ধে নানা বিতর্ক ও আলোচনা অনেক পত্রিকার প্রাণস্বরূপ ছিল। নানা দিক হইতে যে যুক্তিবাদের ঢেউ উঠিতেছিল, ধর্মীয় আলোচনাতেও তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল। এই সব তর্ক-বিতর্কের ফলে সহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত লোকের মন কিছুটা পরিমাণে পত্রিকাকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর্থত, এই পর্বের সাময়িকপত্রে রস-সাহিত্যের আয়োজন একান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তাহার কারণ আমরা আগেই আলোচনা করিয়াছি। ঈশ্বর গুপ্তের

প্রথম যুগ—প্রস্তুতি-প্রতিষ্ঠা পর্ব

খণ্ড কবিতাকে কোনক্রমে বিশুদ্ধ রস-সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। ইহ ছাড়া এই পর্বের সাময়িক পত্রগুলি কিছু পরিমাণে সংবাদ সরবরাহকারীও বটে

এক্ষণে এই প্রস্তুতি-প্রতিষ্ঠা পর্বের কয়েকটি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের পরিচ লওয়া যাক্। ১৮১৮ সালে 'সমাচার-দর্পণ' 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামক সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। শেষোক্তটি বাঙালী পরিচালিত সর্বপ্রথম বাঙালা পত্র। গংগাকিশো ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহাতে রামমোহনের সহমরণ-বিষয়ক প্রব প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে একাধিক সাময়িকপত্র খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়ো করে। ১৮২১ সালে 'সম্বাদ কৌমুদী'র সাহায্যে হিন্দুরা "দেশবাসীর অভাব অনুযোগের কথাও" ভদ্রভাবে আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। রামমোহন রা ইহার প্রধান লেখক ছিলেন। সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রবন্ধাদি ইহাতে নিয়মিত প্রকাশিত হইত। রক্ষণশীল হিন্দুরা তখন 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র মাধ্যমে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। এই পর্বের পত্রিকাগুলির মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকরে'র স্থান সবিশেষ উচ্চে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহা সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক ও মাসিক এবং এক সময়ে দৈনিক হিসাবেও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম দৈনিক। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, প্রাচীন কবিদের জীবনী ও কাব্যসংকলন ইহার প্রধান আকর্ষ ছিল। ইহা ছাড়াও দেশবিদেশের সংবাদ, ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা ইহাতে স্থান পাইত। কিন্তু অক্ষয়কুমার সম্পাদিত মাসিক 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) যে এই পর্বের প্রধানতম সাময়িকপত্র তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য হইলেও অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় ইহা নানাবিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন-ইতিহাস সম্বন্ধীয় একটি উচ্চাংগের পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'তত্ত্ববোধিনী' বাংলাভাষাকে উচ্চভাবের উপযুক্ত বাহন হিসাবে প্রস্তুত হইতে যে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, অক্ষয়কুমারের রচনাবলীই তাহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সমাচার-দর্পণ, বাঙ্গাল গেজেটি সম্বাদ-কৌমুদী, সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ঐশ্বর্যপর্বের পত্রিকাগুলিতেই সর্বপ্রথম বাংলা সাময়িক পত্রের এমন একটি আদর্শের স্থাপনা হয়, যাহা দ্বারা অধুনাতন পত্রিকাগুলিও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত। প্রথমত, কাব্য-উপন্যাসাদির প্রকাশ এবং প্রচার এই পর্বের প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকার অন্যতম মুখ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, এই পর্বেই বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য তত্ত্বহিসাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে এবং সদ্য-প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার মূল্যবিচার শুরু হয়। তৃতীয়ত, বাঙালী জাতির প্রাণে স্বাধীনতার যে কামনা নানাবিধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং

দ্বিতীয় যুগ—ঐশ্বর্যপর্ব

অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হইতেছিল, পত্রিকাগুলির মধ্যেও তাহা আত্মপ্রকাশ করে। নানা-ভাবে অতীতে-বর্তমানে-ভবিষ্যতে জাতির জীবনের নানা দিককে অনুধাবন করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ইহার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্যের আলোচনায় নূতন দৃষ্টিভংগী এবং প্রাণাবেগ সঞ্চারিত হয়। এই ধারা অবশ্য 'তত্ত্ববোধিনী' হইতেই কিছুটা আরম্ভ হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, এই পর্বের পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যে বিভিন্ন সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে, তাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যের দিক্‌পাল ব্যক্তি। সাময়িককে তাঁহারা চিরন্তনের রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেন।

বিবিধার্থ-সংগ্রহ, এডুকেশন গেজেট, বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা, সোমপ্রকাশ

প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫১ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্যদ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায়" এই পত্রের কলেবর পূর্ণ হইত। মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভবের' অনেকাংশ এই পত্রে প্রকাশিত হয় এবং মধুসূদনেরই কাব্য-নাটকাদি অবলম্বন করিয়া প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনারও ইহাতেই সূত্রপাত হয়। রাজেন্দ্রলাল, মধুসূদন, কালীপ্রসন্ন, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মনীষী এই পত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহার সমসাময়িক 'এডুকেশন গেজেট', 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। প্যারীচাঁদের 'মাসিক পত্রিকা' ভাষার সারল্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগরের পরামর্শে ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়। ভাষার দিক হইতে ইহার সংস্কৃতানুকারিতা প্রবল ছিল, কিন্তু ইহার প্রগতিশীল ভাবনাও প্রশংসনীয়।

বংগদর্শন

১৮৭২ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বংগদর্শন' সর্বকালের বিচারে একটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা। ঐতিহাসিক-প্রবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে "...'বংগদর্শনে'র আবির্ভাব একটা সামান্য সাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী সমস্ত ইতিহাসই এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।...বস্তুত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সবশুভকরী', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ' প্রভৃতিতে যে সম্ভাবনার আংশিক আভাসমাত্র পাওয়া গিয়াছিল, 'বংগদর্শন' প্রকাশের সংগে সংগে তাহার পূর্ণ বিকশিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রবন্ধ সমালোচনা যে কতকগুলি সংবাদ (news) ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রস-সংযোগে সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের

শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সংগে সংগে আনন্দেরও খোরাক যোগাইতে পারে, 'বংগদর্শনে'ই সেই সত্য সর্বপ্রথম প্রচারিত হইল।" 'বংগদর্শনে' বঙ্কিমের অমর উপন্যাসগুলিও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া কি বিপুল উৎসাহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি করিত, আমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। 'বংগদর্শন'কে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমের আদর্শে, উদ্দীপনায় ও উপদেশে জগদীশনাথ রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা নানা বিষয়ে গবেষণাদির সাহায্যে বংগভাষা ও সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন।

উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকের পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল : 'জ্ঞানাংকুর', 'ভারতী', 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'বংগদর্শন' (নব পর্যায়) 'প্রবাসী', 'বসুমতী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি। ইহার অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার সংগে রবীন্দ্রনাথ নিজে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার গদ্যপদ্য নানা রচনায় এই পত্রিকাগুলি সমৃদ্ধ তো ছিলই, উপরন্তু কবির আদর্শে ও উৎসাহে তরুণদের মধ্যে একটি বিরাট্ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল। এই পত্রিকাগুলিতে ভাষার সৌন্দর্য ও নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়তই চলিত। রচনা-সৌকর্যের উন্নতির চেষ্টা এবং বিদেশী নানা কাব্যকল্পনাও চিন্তাসূত্রের সংগে আপনাদের যুক্ত করিবার প্রয়াসও লক্ষণীয়। 'ভারতী'কে কেন্দ্র করিয়া শেষ দিকে রবীন্দ্রানুসারী কবি ও সাহিত্যিকদের একটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হইল। উপেন্দ্রনাথ গংগোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা প্রকাশিত হয়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-রীতিকে অনুসরণ করিয়া বহু সুধী ব্যক্তির প্রবন্ধাদিও এই পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। 'কল্লোল'-কেন্দ্রিক রবীন্দ্রোত্তর অতি-আধুনিক কবিদলের সংগে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক হাইফেন হিসাবে ইহাদের গ্রহণ করা চলে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করিয়া একটি নূতন চলিত গদ্য রীতি এবং রম্যদীপ্ত বক্র ও মননশীল মেজাজ বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে। অপর পক্ষে 'যমুনা' 'ভারতবর্ষ'কে অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ইহাদের মূল্যও তাই সামান্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও সাময়িক পত্র : ভারতী, বিচিত্রা, সবুজপত্র ইত্যাদি

ইতিমধ্যে আমরা বাংলা সাময়িক সাহিত্যের তৃতীয় যুগে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি। প্রথম মহাযুদ্ধের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির নানা দ্বন্দ্ব ও সংকট এই যুগের বাঙালীর মনে বাসা বাঁধিয়াছে এবং তাঁহাদের সৃষ্টিকর্মকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এই পর্বের সাময়িক-পত্রেও তাহারই প্রতিফলন। একদিকে 'রূপবাদী'গণ বুদ্ধদেব বসু, ৺জীবনানন্দ, সুধীন দত্ত প্রভৃতির নেতৃত্বে 'কবিতা' 'চতুরংগ' প্রভৃতি পত্রিকার মধ্য দিয়া একটি আন্দোলনের

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অপর দিকে সমাজবাদিগণ 'পরিচয়', 'ক্রান্তি', 'নতুন সাহিত্য', 'অগ্রণী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন সমাজবাদী চিন্তা ও প্রগতি-সাহিত্য প্রকাশ করিতেছেন। উপরন্তু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আদর্শহীন ভাবে পাঁচমিশালী নানা রচনার সমন্বয়ে 'শনিবারের চিঠি', 'বসুমতী', 'দেশ' পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। ইহাদের অনেকের কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য আছে, আবার কেহ কেহ একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনের প্রচারে ব্যস্ত। এখনও ইহাদের সম্যক বিচারের সময় আসে নাই। এক কথায় বলা চলে, প্রধান প্রধান সাময়িকপত্র প্রায়ই সাময়িকতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া চিরন্তনের আসন পাইয়াছে।

তৃতীয় যুগ—আধুনিকতা, উপসংহার

আধুনিকপূর্ব বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতি

আধুনিকপর্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘ আট শত বৎসরের। হাজার বছর আগে চর্যাপদের গানগুলি রচিত হইবার সময় হইতে উনিশ শতকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিস্তৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে নানা বিকাশ তাহাই আধুনিকপূর্ব যুগ হিসাবে স্বীকৃত হইবে। উনিশ শতক হইতে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা। আধুনিকপূর্ব বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আয়োজন—তাহা কবিতার, গদ্যসাহিত্যের নয়। তাই আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে গতিপ্রকৃতি, তাহার আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। এই আট শত বৎসরের বাংলা কবিতাকে প্রধানত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে: প্রাচীন যুগের সাহিত্য—ইহার আয়ুষ্কাল মুসলিম-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত, এবং মধ্য যুগের সাহিত্য—এই যুগ মুসলিম শাসন-কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তবু মূলত ইহারা একই যুগের সাহিত্য। কারণ,—মুসলিম-বিজয়ের ফলে রাষ্ট্রনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিলেও দেশের মূল অর্থনীতিতে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নাই। এই আট শত বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশের অর্থ-নৈতিক-সামাজিক ভিত্তি একই প্রকার ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক গবেষকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থাকে গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিভিত্তিক সামন্ততন্ত্র নামে অভিহিত করা চলে। এই আট শত বৎসর ধরিয়া বাঙালীর জীবন আত্মকেন্দ্রিক কতকগুলি গ্রামকে অবলম্বন করিয়া আপন আপন খাতেই আবর্তিত হইয়াছে, কোন রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনের তরংগ তাহার জীবনধারাকে আঘাত করিতে পারে নাই। তাই এই গোটা যুগের কবিতার এমন কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে, যাহা পটভূমিকার এই আত্মকেন্দ্রিক আত্মসন্তুষ্ট গ্রামীণ জীবনবোধের উৎস হইতেই উদ্বর্তিত।

আধুনিকপূর্ব বাংলা কবিতা—প্রাচীন ও মধ্য যুগ

আধুনিকপূর্ব বাংলা কবিতার সর্বপ্রধান যে লক্ষণটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইল ধর্মের একাধিপত্য। সেকালে বাংলা কবিতায় এমন কিছুই রচিত হয় নাই, যাহার সংগে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় সাধনা যুক্ত নয়। সে-যুগের বাংলা কবিতার যে প্রধানতম তিনটি ধারা—মংগলকাব্য, অনুবাদ ও পদাবলীর ধারা—তাহারা সকলেই ধর্মকেন্দ্রিক। মংগলকাব্যের কবিরা লৌকিক ভয়-ভীতি ও কামনা-বাসনাকে কতকগুলি দেবদেবীর মূর্তিতে কল্পনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন পুরাণের সংগে যুক্ত করিয়া মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, শীতলা প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই দেবতাদের ক্ষমতার শেষ নাই, ইহারা ভক্তের ধনজনের সকল অভাব অনায়াসে মোচন ত করেনই, সাপ-বাঘের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন, এমন কি মুসলমান রাজশক্তির ক্রোধের অগ্নিকেও হেলায় নিবারিত করেন। পদাবলীতে আমাদের কবিরা প্রেমের গান গাহিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁহারা স্পষ্টকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।' স্বয়ং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির মূর্ত বিগ্রহ রাধার রসসম্ভোগই তাঁহাদেব অভিপ্রেত। অনুবাদ-কাব্যগুলিতেও এই ধর্মভাব জাগ্রত। সংস্কৃত রামায়ণ কিংবা মহাভারতের নায়ক-নায়িকারা বিরাট্ চরিত্রের মানুষ রূপেই অংকিত, বাঙালী অনুবাদকদের হাতে রাম কিংবা শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণই দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। এমন কি, চর্যাপদ হইতে রামপ্রসাদের শাক্তসংগীত পর্যন্ত যে সাধন-গীতির ধারা বাংলার প্রাচীন কবিতার রাজ্যে প্রসারিত, তাহাও প্রত্যক্ষভাবেই বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্মীয় সাধনভংগী প্রকাশেই সার্থক। এমনি আঠারো শতকে ভারতচন্দ্রের দেহাধিষ্ঠিত প্রেমকাব্যের চারিপার্শ্বেও কালীনামের একটি নামাবলী জড়িত।

ধর্মের একাধিপত্য

কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন ও মধ্য যুগ ধরিয়া বাংলায় যে কাব্যসাধনা চলিয়াছে, তাহা মানবজীবন হইতে বহু দূরে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ধর্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যেও মানবজীবনের নানা দৈনন্দিনতা সে যুগের কাব্য কবিতায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক যুগের মানবতার সংগে সে-যুগের এই মানব-স্বীকৃতির পার্থক্য অবশ্যই লক্ষণীয়। এই মানবতা দেব-নির্ভর। সে যাহাই হউক মানবজীবনের নানা বাস্তব সত্য এই যুগের কাব্যসাহিত্যে সর্বদাই পরিলক্ষিত। চর্যাপদের জীবনকে অস্বীকার করিবার যে দর্শন তাহা প্রকাশ করিবার জন্যও তাঁহাদের এই জীবন হইতেই চিত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। তাঁতী, জোলা, শিকারী, জেলে, মাঝি—তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষের জীবনের নানা বাস্তব কর্মময় ছবি চর্যাপদে ছড়াইয়া রহিয়াছে। মংগলকাব্যগুলিতে

সে-যুগের মানবতা

দেবতার প্রতাপ যতই প্রবল হউক না কেন, বাঙালীর গ্রাম-জীবনের পরিবারকেন্দ্রিক চিত্রের বাস্তবতায় ইহা ধন্য। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া সুখীসুন্দর জীবনের কামনাই মংগলকাব্যগুলির পত্রে পত্রে ধ্বনিত। এইজন্যই তাহাদের দেবার্চনা, তাহাদের স্বর্গকামনাও। মংগলকাব্যের কল্পিত স্বর্গও জীবনবিরোধী কোন কল্পরাজ্য নয়, জীবনে যে বাস্তব সুখসমৃদ্ধি সম্ভব নয়, দেবার্চনার মধ্য দিয়া সেই সুখৈশ্বর্যের রাজ্যপ্রাপ্তির কামনাই তাহাদের স্বর্গকামনা। আর বৈষ্ণব কবিতার তত্ত্ব আমাদের 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ'-এর দিকে আকর্ষণের যতই চেষ্টা করুক না কেন, রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতির বাস্তব চিত্র মানুষের জীবন হইতেই প্রত্যক্ষত গৃহীত। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—

> 'সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
> কোথা তুমি দেখেছিলে এই প্রেমচ্ছবি
> কোথা তুমি শুনেছিলে এই প্রেমগান ?'

রামপ্রসাদাদির আগমনী-বিজয়ার গানে বাঙালী জননীর করুণ আর্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহার ধর্মীয় ব্যাখ্যা যে একান্তই বহিরংগগত, এ কবিতা-পাঠে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এমন কি, এই সর্বব্যাপক মানবদৃষ্টিতে আমাদের সাহিত্যে দেবচরিত্রেও ঘটিয়াছে আমূল পরিবর্তন। শ্রীকৃষ্ণ একটি গ্রাম্য রাখাল বালক হইয়া বাংলার পথে-ঘাটে রাধার প্রেমকামনা করিয়া ধামাল গান জুড়িয়া দিয়াছেন, দেবাদিদেব মহাদেব চাষা সাজিয়া মাঠে-ঘাটে জমি তৈয়ার করিতেছেন ও ফসল ফলাইতেছেন, মনসা হিংস্র ও ক্রূরমূর্তিতে গ্রাম্য জমিদার ও নবাবের পাইক-পেয়াদাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন, আর কালী তো আসিয়া বিদ্যাসুন্দরের দেহসর্বস্ব ভালবাসার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।

তৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ব্যক্তিমানুষের কোনরূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠা সে যুগের সমাজ অথবা সাহিত্যেও সহ্য করে নাই। সে-যুগে লাউসেন হইয়া ধর্মঠাকুরের পাদুকা মস্তকে বহন করিলে সাফল্যের সম্ভাবনা সুপ্রচুর, কালকেতু হইলেও সে যুগের কোন আপত্তি নাই, কারণ তাহার ব্যবহারে দেব-দেবীকে অস্বীকার করিবার চেষ্টামাত্র নাই। কিন্তু সে-যুগে চাঁদ-সদাগর হইলে আর রক্ষা নাই, তাঁহার সপ্ত-ডিঙা-মধুকর গংগায় ডুবিবে, সপ্তপুত্র বিষক্রিয়ায় অকালে প্রাণ হারাইবে, সমস্ত জীবন-ব্যাপী অশেষ লাঞ্ছনা তাহাকে ভোগ করিতে হইবে এবং এত ঘটনার পরেও যদি তাঁহার মস্তক দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উচ্চ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কবির অংগুলিসংকেতে তাহার চির-উন্নত শির জোর করিয়াই মনসাদেবীর পায়ের তলায় লুটাইয়া দেওয়া হইবে।

ব্যক্তি-স্বীকৃতির অভাব

সে-যুগের কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে পৌনঃপুনিকতা ও অনুকরণ-ধর্ম। পূর্বোক্ত তিন চারিটি ধারার মধ্যেই তাই তাহাদের আবর্তন-বিবর্তন ঘটিয়াছে।

শতাধিক কবি মনসামংগলকাব্য রচনা করিয়াছেন, চণ্ডীমংগল ও ধর্মমংগল রচয়িতার সংখ্যাও খুব বেশি কম নয়। অথচ একই কাহিনী, একই রূপ চরিত্র-চিত্রণ, একই পয়ার ও ত্রিপদীর ছন্দস্পন্দে শিথিল গতিতে বিবৃতি। রামায়ণ এবং মহাভারতেরও অনুবাদ ঘটিয়াছে প্রচুর। মহাভারতের খণ্ডে খণ্ডে অনুবাদ যে কত হইয়াছে তাহা সংখ্যাতীত। আর পদাবলী তো হাজারে হাজারে রচিত হইয়াছে। রাধার কোন একটি বিশেষ মনোভংগীকে একই রূপে একই উপমায় একই চিত্রকল্পে বর্ণনা করা হইয়াছে শত শত কবিতায়। কবির ব্যক্তি-অংশের প্রভাব ইহার মধ্যে এত কম যে বিস্মিত হইতে হয়।

পৌনঃপুনিকতা ও অনুকরণ-ধর্ম

আধুনিকপূর্ব বাংলা কবিতার চিত্রধর্মও একটি বিশিষ্ট রূপ হিসাবে আলোচনার যোগ্য। এখানেও উপমা-উৎপ্রেক্ষায় অনুকরণধর্ম প্রবল। কেবল তাহাই নয়, সে-যুগের কাব্যে অধিকাংশ স্থলেই বর্ণনা দীর্ঘ তালিকায় পর্যবসিত, কোন বিশিষ্ট চিত্র-সৌন্দর্যে বিধৃত নয়। বিশেষত নারীরূপের বর্ণনায় এক অদ্ভুত বস্তুবোধহীন অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। হস্তীর ন্যায় গতি, সিংহের ন্যায় কটিদেশ প্রভৃতি উপমায় বস্তু-অংশকে সম্পূর্ণত বাদ দিয়া তাহার 'রস'-অংশ ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথও এক আলোচনায় আপত্তি জানাইয়াছেন। এই বিশিষ্টতার জন্ম যে সে-যুগের ভাববাদী জীবনদর্শনের মধ্যে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভাববাদ ও চিত্রকল্প

সে-যুগের বাংলা কবিতা নানাভাবে ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য প্রভাবের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অভিজাতের রাজসভায়, বৌদ্ধ মঠে কিংবা হিন্দু দেবতার মন্দিরে, অথবা কর্মশীল মানুষের পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে মাঠে-ঘাটে এবং মেয়েমহলে নানাবিধ ব্রতকথা প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের জন্ম। আধুনিক সাহিত্যের ন্যায় মুষ্টিমেয় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পঠনপাঠনের মধ্যেই তাহারা সীমাবদ্ধ নয়। সে-যুগে অক্ষরজ্ঞানশূন্য সাধারণ মানুষের কাছে সাহিত্যকে পৌছাইয়া দিবার নানারূপ প্রথা ছিল, সুযোগ ছিল এবং তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটিত। কীর্তনের আসরে, শারদীয়া পূজার দিনে বাড়িবাড়ি ঘুরিয়া যে আগমনী-বিজয়ার গান গাওয়া হইত তাহার সুরে সুরে, রামায়ণ-মহাভারতের কথকতায়, মনসার ভাসানে, গাজনের উৎসবে, ব্রতের অনুষ্ঠানে, যাত্রার পালায় পুরাণো সাহিত্য ছিল গ্রাম-বাংলার সর্বসাধারণের প্রাণের সম্পত্তি। এইখানে তাহার সব চাইতে বড় সার্থকতা।

সে-যুগের কবিতা ও জনসাধারণ

আধুনিক বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতি

ভূমিকা

'আধুনিক' শব্দটি অত্যন্ত বিতর্কবহুল। কারণ, আধুনিকতার কালগত বৈচিত্র্যের পরিবর্তন হয় সময়ধারার বিবর্তনের সংগে সংগে। সুতরাং আমাদের আলোচনায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' বলিতে আমরা পর-রবীন্দ্র 'কল্লোলযুগ' হইতে সুরু করিয়া সাম্প্রতিক কাল অবধি কবিদের রচনাকে আলোচনার বিষয়ীভূত করিব। 'রবীন্দ্র-যুগে'র কাব্য-সাহিত্যের সহিত ইহার মৌলিক ব্যবধানের সুরটি কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও-বা পরোক্ষ ভাবে ব্যঞ্জিত। অন্তত এ সময়ের কবিমানস রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিয়া যে নূতন পথে পরিভ্রমণ করিয়াছে তাহার বিবর্তনের ইতিহাস কম কৌতূহলজনক নয়। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, অতীত দিনের ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া কোন নূতন কাব্যরীতি রাতারাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না—নূতনের উদ্‌ভবের বীজ নিহিত থাকে পুরাতনেরই জঠরে। অতএব, যে নবতর প্রেরণায় আধুনিক কবিতার স্বাতন্ত্র্য, তাহাকে একেবারে আকস্মিক মনে করিবার কোন কারণ নাই। ঐতিহাসিক প্রয়োজনবোধের তাগিদে বাংলা কাব্যের পরিবর্তন বাস্তবতার যাত্রাপথে যে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে, তাহা একেবারে নগণ্য নয়।

পরিবর্তনের কারণ

বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা ও নিয়ামক প্রায়শঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কবি ও সাহিত্যিকরা। বৈদেশিক রাজশক্তির শাসনে ও শোষণে এই উপমহাদেশের শিরায় শিরায় যে ব্যথা-বেদনার স্রোত গলিত লাভার মত সমস্ত দেশের দেহকে আত্যন্তিক বেদনায় অস্থির করিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে মধ্যবিত্ত-মানসে। জীবনের গভীর নৈরাশ্য ও অবক্ষয় তাহাদিগকে স্বপ্নালুতার ভাবলোক হইতে ক্রমশঃ সরাইয়া আনিতে কঠোর বাস্তবের ধূলিধূসরতার মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়াছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাই নূতন বৈপ্লবিক চেতনা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে—কবিরাও বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়াইয়া চলিয়াছেন নূতন পথে।

আধুনিক বাংলা কবিতায় বিদ্রোহের বহুবিচিত্র সুর

এই বিদ্রোহী আধুনিকতার উদ্বোধন হইল মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইত্যাদি রবীন্দ্রোত্তর কবিদের রচনায়। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত-জীবনের ভাঙন ও নবতর সৃষ্টির গান ইহাদের কণ্ঠে মন্দ্রিত হইল। নানা কবির নানা কাব্য-কবিতায় নানা রূপে বিদ্রোহী মনোভংগী ছড়াইয়া পড়িল। প্রথমত, জীবন-রসিক মোহিতলাল ভোগবাসনার এক বিচিত্র তথ্য প্রকাশ করিলেন। মার্কিন-কবি হুইট্‌ম্যানের বাণী হইল ইহাদের বেদমন্ত্র—

"A little while we die—
Shall not life thrive as it may,
For no man under the sky
Lives twice out-living his day."

অতএব, এই জন্মের সীমাবদ্ধতাকে পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইবে—নারীর দেহ হইতে নিঙড়াইয়া লইতে হইবে সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত লাবণ্য। কারণ,—

'রমণী-অধর-সীধু যে রসনা করিয়াছে পান
অমৃত-পায়স তার মনে হবে ক্ষারকটু প্রলেহ-সমান।'—মোহিতলাল।

নারীকে মোহিতলাল মনে করিলেন ভোগেরই উপকরণরূপে—তাহার আত্মা ও হৃদয় আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিলেন না। দ্বিতীয়ত, নজরুলের কণ্ঠে আমরা শুনিলাম অন্য সুর। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন গণমানবের জয়—কাবার লৌহকপাট ভাঙিয়া লোপাট করিয়া নূতন সমাজ গড়িবার আহ্বান জানাইলেন 'অগ্নিবীণার' বিদ্রোহী-কবি নজরুল। 'বিদ্রোহী' কবিতায় তিনি ঘোষণা করিলেন—

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
যবে অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।'

পরবর্তী কালে এই দুইটি পৃথক্‌ধর্মী সুর যে পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা খুবই উল্লেখযোগ্য। মোহিতলালের জৈবিক বাস্তবতা ও কল্লোলযুগের যৌন-আত্মরতির উৎস খুঁজিয়া পাওয়া যায় গোবিন্দ দাস ও বিদেশী কবিদের রচনায়। নারী-সম্পর্কে গোবিন্দ দাস স্পষ্টই বলিয়াছেন—'আমি তারে ভালবাসি অস্থিমজ্জাসহ।' বিদেশী লরেন্সীয় জীবন-দর্শন—"If we can exchange our ideas, why can't we exchange our feelings ?"—ইহাদিগকে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। গ্লানিময় যৌন-অক্ষমতারও স্বীকারোক্তি মিলে—

'রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃংগার-কামনা
রমণী-রমণ রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি।' —বুদ্ধদেব বসু।

'বন্দীর বন্দনা'র কবি রতিক্রিয়ার অবাস্তব রোম্যান্টিক ভাববিলাসিতায় বলিয়াছেন—

'যে মুহূর্তে বাসনা-বিহ্বল নীবি খসে পড়ে
দেখা দেয় কালের প্রলয়-জলে
সর্বগ্র তিমির-তলে অলজ্জ ব-দ্বীপ,

অমনি কাল ; অদৃষ্টের করাল-কুহেলী দীর্ণ করি
আদিম পুরুষ
লভে সপ্তদশ-দ্বীপা সসাগরা পৃথিবীরে।'

অবশ্য অচিন্ত্য সেনগুপ্তের নারী-ঘটিত কবিতায় খানিকটা সাহসিকতার পরিচয় থাকিলেও, অজিত দত্তের রোম্যান্টিকতা সত্যই চমৎকার—

"মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মত চঞ্চল উদ্দাম ;
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।
আমি সেই বায়ুস্রোতে খসে-পড়া পালকের মত
আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত,
সে আকাশ তোমার অন্তর,
মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর।'

অবশ্য জীবনানন্দ দাশের রোম্যান্টিকতা আরও অনেক বেশী সুন্দর! তাঁহার রচনার আংগিকে আছে সুদূরতা ও ব্যাপকতার ইংগিত ; যেমন,—'বনলতা সেনে' পাই—

'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা,
সবুজ ঘাসের দেশ যখন চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে—
'এতদিন কোথায় ছিলেন !'
পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"

অথচ এমনিতর রচনায় গোবিন্দ দাস বহু পূর্বেকার হইয়াও কি চমৎকার দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন! মনে হয় যেন একেবারে সাম্প্রতিক কালে লেখা :

'কমাল পয়মালকারী বিলক্ষণ চিনি নারী
চিনি সে অটোটিডরোজ, হর্ডিকলন ;
একটু শুকাতে হায়, হাওয়ায় উড়িয়া যায়,
পকেটে রাখিলে তবু করে পলায়ন।'

তৃতীয়ত, রোম্যান্টিকতার অন্যদিকের সমাজ-সচেতন কবিতার এক্ষণে বিচার করা যাক্। নিঃসন্দেহে এই সময়কার শ্রেষ্ঠতম কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁহার যে কবিমানস হইতে 'প্রথমা'র উৎপত্তি, তাহার এক দিকে করুণ বর্ষার ঝরঝরানির মত বিলাপের সুর, অন্যদিকে জনতার সম্মিলিত দূর পদধ্বনি। লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের ব্যর্থতায় যে-মন বলে—

'জীবন-শিয়রে বসি স্বপ্ন দেয় দোল
সে মিথ্যায় মত্ত হয়ে সত্য তোর ভোল।'

নিষ্ঠুর বাস্তবের নির্মম আঘাতে সেই মধ্যবিত্ত মনকেই দেখি কল্পনার আশ্রয়নীড়

খুঁজিতে। বিদ্রোহী জীবন হইতে উৎসারিত বাণীতে তাই ফুটে পীড়িত অবহেলিত নিঃস্বদের জন্ম দরদ—

'অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
চেন কি তাদের ভাই ?
দুই তুরংগ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরই বল্গা নাই।'

এই একই সুরে তিনি গণমানবের সংগে নিজের একাত্মতা ঘোষণা করিয়াছেন—

'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটেমজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের !
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে হায় নাই।'

কিন্তু 'প্রথমা'র পরবর্তী কালে দেশের জাতীয় জীবনে যে বিরাট্‌ ভাঙাগড়া হইয়া গিয়াছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাহার সহিত সমতালে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 'সম্রাট্‌' কাব্যে যদিও তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—

'শুধু সদস্য আমরা নই, আমরা যে সম্রাট্‌ !
শুধু লভ্যাংশে মন ভরে না, চাই সাম্রাজ্য।
বিধাতার সাথে সেই তো আমাদের চুক্তি !'

অথচ 'ফেরারী ফৌজে' তিনি জীবন-পলাতক এবং তাহার কারণ সকলের নিকট বিদিত—তিনি এখন সাম্রাজ্য-স্থাপনে ব্রতী, জনতার কথা তাঁহার মনে নাই।

পরিচয়-গোষ্ঠীর সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন ইত্যাদির সম্পর্কে একটু না বলিলে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইঁহাদের একটি পাকাপোক্ত গোষ্ঠী আছে—একে অন্যের জয়ঢাক বাজাইয়া আসর মাত্‌ করিতে ইঁহারা ওস্তাদ। বাস্তব জীবনের সহিত কোন প্রত্যক্ষ যোগ ইঁহাদের নাই—উটপাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজিয়া ইহারা ঝড়ের দাপট হইতে আত্মরক্ষা করেন এবং পাণ্ডিত্যাভিমানের গজদন্তমিনার হইতে জনতার জন্য কাব্যবাণী প্রেরণ—আসলে এসব পাণ্ডিত্যেরই ঘোড়দৌড়ঃ যেমন,—

আধুনিক বাংলা কবিতায় অবোধ্য ধূসরতার সাধনা

'মরীয়া লিবিডো আজো কাউন্‌সিলের প্রবল গলায়,
ওড়েনি ওড়েনি আজো কঠিন সংগীন
সর্বকামপরিত্যাগী কর্পোরেশনের ব্যূহদ্বারে।' —বিষ্ণু দে।

আবার শুনুন সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় দুর্বোধ্য শব্দের সমারোহে কাব্যিক জগাখিচুড়ি—

'রক্তহীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে
অতিক্রান্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
অসূর্যর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
যোগায়ে জীয়ান-রস অপুষ্পক-বীজে।'

অবশ্য পলায়নবাদী সমর সেন মহুয়ার সুবাসে আর ছায়ায় হৃদয়ের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিলে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না; কিন্তু তাঁহার ধূসর বিশীর্ণ মনের বমন সত্যই অস্বস্তিকর—

'কালিঘাট ব্রিজের উপর কখনো কি শুনিতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে সহর, হে ধূসর সহর!

জীবনসংগ্রামী কবিদলের কাব্যসাধনা

বিদ্রোহের ঐ নৈরাশ্যবাদ কাটাইয়া যাহারা বাংলা কাব্যে নূতন বলিষ্ঠতার সঞ্চার করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই মার্কস্‌বাদী। কাব্যকে ইঁহারা জীবনসংগ্রামের সহিত অংগাংগী করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া ইঁহাদের রচনা সব সময় রুচিমাফিক না হইলেও যে বলিষ্ঠ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিদ্রূপাত্মক কবিতার বক্তব্য কত তীক্ষ্ণ, আঘাত কত প্রত্যক্ষ:

'প্রভু যদি বলো, অমুক রাজার সাথে লড়াই,
কোন দ্বিরুক্তি করব না। নেবো তীর ধনুক।
এমনি বেকার। মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই—
দেহ না চ'ললে, চ'লবে তোমার কড়া চাবুক।'

আরও গভীর কবি অরুণ মিত্রের অনুভূতি—প্রকাশভ তাঁহার অনেক বেশী সংহত সংযত। সমগ্র মানবগোষ্ঠীর পরিপূর্ণ জীবন ন্দের সাহত যেন তাঁহার কবিতার আত্মীয়তা। 'লাল ইস্তাহারে' রাজনৈতিক ত্তেজনা থাকিলেও সে তো উহারই স্বীকৃতি—

'প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার?
লাল অক্ষর আগুনের হল্‌কায়
ঝল্‌সাবে কাল জানো!'

সরোজকুমার দত্তেরও কাছে শোনা যায় এই কবিগোষ্ঠীর জবানবন্দী—

'কবরে প্রোতনী হ'য়ে কাঁদিবে না আমার বেদনা,
দুঃসাহসী বিন্দু আমি, বুকে বহি সিন্ধুর চেতনা।'

বাংলার কিশোর-কবি নয়, কবি-কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনানুভূতি ও

প্রত্যাশা গভীরতর। সুকান্ত-প্রতিভার অবিনশ্বর সাক্ষ্য 'ছাড়পত্র' ও 'ঘুম নেই' প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতা হইতে উৎসারিত। মাত্র বিশ বৎসর বয়সে দারিদ্র্যকীটে দংশন করিয়া ঐ স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভাকে শেষ অবধি কালকবলিত করায় বাংলা কাব্যের অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে। কবি সুকান্ত আর্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন—

'এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম তোমারে সেলাম।'

শোষণে-নিষ্পেষণে জর্জরিত বিশ্বমানবের অকম্প্র মর্মবেদনা 'বিদ্রূপ ও বহ্নি'র কবি রঘুনাথ ঘোষের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছে। নিপীড়িত বিশ্বজনের অন্তরাত্মার মধ্যে আপনাকে সমাসীন করিয়া কবি রঘুনাথ অনুভব করিয়াছেন,—'ধরণীর শব আমি, আমি বিকৃত কংকাল'। এই সামগ্রিক অনুভূতি সুগভীর আন্তরিকতার স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ায় কবি রঘুনাথের প্রায় প্রতিটি কবিতাই 'বিদ্রূপ' ও 'বহ্নি'র যুগপৎ সমাবেশে সত্যই অপূর্বসুন্দর। 'আমি গাই গান' কবিতায় তাই তো তাঁহার বাণী সার্থক—

'সকলের আর্তরোল ব্যর্থ বুভুক্ষার
চকিতে জ্বলিয়া উঠে
আমারি এ প্রজ্বলিত লেখনী-শিখায়
অনন্ত দীপক-রাগে।'

বিদ্রোহী আধুনিকতা, অবোধ্য ধূসরতা ও জীবনসংগ্রামের তীব্রতায় আধুনিক বাংলা কবিতা অধ্যুষিত। তবে এমন জন কয়েক কবিও আছেন, যাঁহাদের কবিতাদিতে ঐরূপ দৃষ্টিভংগীর সন্ধান মিলে না। পক্ষান্তরে, স্ব স্ব ভাবানুভূতির বৈশিষ্ট্যে তাঁহারা আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। 'স্বপ্ন ও সংগ্রামে'র কবি অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় মনে করেন, "অলক্ষ্যে বৃহতের জন্য স্বপ্নপ্রয়াণ এবং প্রত্যক্ষে ক্ষুদ্রত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামচেতনা—এই হচ্ছে পূর্ণ জীবন, শিল্পজীবন তথা সত্যজীবন। এই জীবন থেকে কাব্য এবং সেই কাব্য থেকে প্রত্যাসন্ন নব-জীবনের-আস্বাদ—এই তথ্যে যারা বিশ্বাসী, তাঁরা এক দিকে যেমন 'রিয়ালিষ্টিক' অপর দিকে তেমন 'রোম্যান্টিক'।" তাই নিছক জীবনানুগ কাব্যকবিতার বিরোধী কবি অমিয়রতন বলিয়াছেন—

আধুনিক বাংলা কবিতায় উল্লেখযোগ্য সুরবৈচিত্র্য

'সেই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর আমি সাধনা করি,—
যেখানে অস্ত্রের সংগে পুষ্পের হয় না প্রতিদ্বন্দ্বিতা,
—একে হনন করে না অপরকে।

যেখানে মানুষ ভোলে না মধুপের আনন্দ,
মধুপ হরণ করে না মানুষের কর্মশক্তি।'

পক্ষান্তরে, এক চিরন্তন বাউল 'যাযাবরে'র কবি সুধীর গুপ্তের নিভৃত মনোমন্দিরে থাকিয়া তাহার মাঝে 'রমান্তিক' বৈরাগী-বৃত্তির অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়াছে। আধুনিক জড় যান্ত্রিক ও বস্তুতন্ত্রী যুগের মানস-সমুদ্রে দাঁড়াইয়া সংখ্যাতীত সমস্যার বাত্যাবিক্ষুব্ধ যুগকল্লোলের অভিশব্দায়মানতা অতিক্রম করিয়া এক শান্ত সমাহিত সাধনার পরিবেশে গুপ্তকবি তাঁহার মনকে নিবিষ্ট রাখিয়াছেন। তিনি মনে করেন, সৌন্দর্যানুভূতির অমৃতময়তাতেই সাহিত্যের শিবতা। প্রচারের চঞ্চল লীলায় তাঁহার কবিতা লীলায়িত নয়। মন ও মাটির সুবলিত যোগাযোগে আবেগানুভূতির স্বর্গ-মন্দাকিনীতে মর্ত্যভাগীরথীতে প্রবাহিত করিবার সাধনাই এই কবির সাহিত্যধর্ম। তাই 'মাটির মাধুরী'তে 'বিরহীর অভিজ্ঞতা' বর্ণনাকালে কবি গাহিয়াছেন—

'হারানোর চেয়ে অনেক ভালো যে
কোনো দিন ভালো না বাসা ;
পুরাণো স্মৃতির পুঞ্জিত চাপে মরিয়া
বুঝিয়াছি, ভালো ছিল চিরকাল
বুকে পুষে রাখা তিয়াসা ;—
মরুতে না হয় মেঘভার যেতো মরিয়া।'

'কুটিরের গানে'র কবি ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাবলীতে শান্ত স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর অনাবিল পল্লীসৌন্দর্য উৎসারিত হইয়াছে। সুগভীর আন্তরিকতাই তাঁহার কবিতাদির প্রাণ। কোমল ছন্দ-মাধুর্যে, মনোহর শব্দ-ঝংকারে, ভাবানুভূতির স্বচ্ছতায়, স্বপ্নালুতার মোহমদিরতায় তাঁহার কবিকর্ম সমুজ্জ্বল। আবার 'নিশান নাও-'য়ের কবি ধীরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় সেই স্বদেশী যুগে দেশবাসীর অন্তরে যে বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেন, তাহার জন্য তিনি 'চারণ-কবি'ও বটে। 'জাগরণী'তে তিনি হিয়াছেন—

'চক্ষে হানিয়া দামিনী-দীপ্তি, বক্ষে বাঁধিয়া বজ্রানল
চরণে বাঁধিয়া ঝঞ্ঝার বেগ কম্পিত কর ধরণীতল।
রক্তসায়রে ফুটিছে ফুল!
যুগের নিদ্রা ভাঙিয়া জাগুক্ হিমালয় হ'তে জলধিকূল।'

'সন্ধ্যামালতী'র কবি আশুতোষ সান্ন্যাল তাঁহার রোম্যান্টিক কবিমর্ম ক্লাসিক্যাল কবিভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন! অন্তর্গূঢ় অনুভূতি ও সুগভীর আন্তরিকতা সূক্ষ্ম আত্মোপলব্ধির ত্রুটিহীন ছন্দে, অনবদ্য পদবিন্যাসে, বিপুল অর্থগৌরবে ও অপরূপ ব্যঞ্জনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। টেনিসনের 'In Memorium' ও বড়াল কবির 'এষা'র

ন্যায় 'সন্ধ্যামালতী'ও শোককাব্য। ইহা কবির ব্যক্তিগত জীবনালেখ্য—তাই তাঁহার নিজস্ব ভাবজীবনের প্রতিচ্ছবি, নিজস্ব ধ্যানজীবনের প্রতিরূপ এবং নিজস্ব জীবনদর্শনের সংকেত পরিস্ফুট। কবি অনুভব করিয়াছেন—

'ওরে প্রেম, মৃত্যু তোরে ক'রেছে মহান্,
লোভনীয়, কান্তোজ্জ্বল, স্নিগ্ধ মধুময় ,
মরণের রুদ্ররূপ করিয়া হরণ,
স্মৃতি তোরে আজীবন দেয় বরাভয়।'

'কোণার্কে'র কবি জীবনকৃষ্ণ শেঠ অতীতকালের সেই কোণার্কের সূর্যমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার বিচিত্র ভাবানুভূতিকে বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। 'জন্মান্তর', 'ধর্মপদ', 'কোণার্ক সূর্য-মন্দির' প্রভৃতি কবিতাগুলি বেশ দীর্ঘকায় সত্য, কিন্তু গাঢ় ছন্দোবন্ধে, অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনায়, মনোহারী ভাষা-ঐশ্বর্যে সত্যই অতুলনীয়। অপরিসীম গভীর দরদ লইয়া তিনি কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। আর তাহারই ফলে কবিবাণী যেন জীবন্ত চিত্ররূপে আমাদের নয়নপুটে ফুটিয়া উঠে। লিয়াখিয়া নদীর কি মনোমদ সজীব ছবিই-না তিনি আঁকিয়াছেন—

'খেয়ালি জোয়ার আসে, সোনালি জোয়ার,
লিয়াখিয়া বয়ে চলে খরতর বেগে।
লক্ষ আলোর কুচি ঢেউএ ঢেউএ ভেঙে চুরে যায়।
অপরূপ—অপরূপ লিয়াখিয়া, কাহারে সে খোঁজে ?'

'মঞ্জরীর' কবি ধীরানন্দ ঠাকুর প্রকৃতি ও জীবনের কবি। রজনীগন্ধা, নির্ঝর, পাহাড়, নদী, ভোরের হাওয়া, তরু, কোকিল, ঘন বরষা প্রভৃতি লইয়া এই যে রহস্যময়ী প্রকৃতি—ইহার প্রতি ধীরানন্দের 'অনুরাগের দীপ জ্বলে যেন অনির্বাণ'। তাই কবি ধীরানন্দ গাহিয়াছেন—

'বড়ো ভালো লাগে জীবনকে,
সর্বগ্রাসী ঈপ্সা জাগে মনে—
প্রকৃতিকে একান্ত আপনার করে নেবার।
আমার সুন্দর-হযে-ওঠার আনন্দে—
খুশী থাকে অনন্তযৌবনা প্রকৃতি-উর্বশী।'

প্রকৃতির সূত্রে জীবনকে এই যে ভালো-লাগা, ইহার মূলে আছে 'জীবের জিজীবিষা'। তাই জীবনের ওপারে রহিয়াছে যে-মরণ, তাহার সম্পর্কে ধীরানন্দ অতীব সহজ কণ্ঠে স্পষ্ট তাৎপর্যময় ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন—

'মরণ মানে শূন্যতা, জীবনশূন্যতা—
সব অনুভূতির লয় ও লোপ।'

'স্বপ্নজাগরে'র কবি অনিলেন্দু চক্রবর্তীর কাব্যকৃতি সম্পর্কে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে,

" 'স্বপ্নসাগরে'র মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা তাঁর কতকগুলি কবিতার গতি তীব্র, সম্মুখে দূর আলোর দূরদৃষ্টি; আর কতকগুলি স্বপ্নমন্থর, দুপাশে কলগীতি, শুভ্র পাল তুলে চলেছে ছবির মতো। একাধারে কড়ি ও কোমল ভাবের এই কবিতাগুলির মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি, স্পষ্ট অবলোকন ও চিত্রাংকনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে—সমস্ত কিছুর মধ্যেই কবির সমবেদনার সুরটি উপভোগ্য। কারণ—এই কবিতাগুলির মধ্যেও এমন সব উদ্দীপক বিষয়বস্তু আছে, চিত্র আছে—যাকে আশ্রয় করে কবি কাব্যপাঠকের মানসপটে অন্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারতেন। Antipathy না দেখিয়েও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ কাব্যকারের অন্যতম গুণ।" এই অনন্যসাধারণ পরিচয় কবি অনিলেন্দুর লেখায় প্রচুর পরিমাণেই ছড়াইয়া রহিয়াছে। যেমন,—

'চেয়ে দেখো আর এক দুনিয়া:
শ্বেত আর পীত আর কালো মানুষেরা যায় মিলে
মৃত্যু ঠেলি' অবিশ্রান্ত প্রাণের মিছিলে,
অলির গলির দ্বন্দ্ব মিটে যায় মুক্ত-ময়দানে;
স্বেদ ঝরে, পলি পড়ে—
অহল্যার হাসি ফোটে ফসলের গানে।
শত্রুর শবের 'পরে লক্ষ হাতে গড়ে ওঠে বলিষ্ঠ পৃথিবী—
ঊর্ধ্বে যার তারা-ভরা প্রকাণ্ড আকাশ।
তুমি কোন্ দিকে?'

আধুনিক বাংলা কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে আরও যাঁহারা লেখনী চালনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, দিনেশ দাস, মংগলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শাহাদাৎ হোসেন, জসীম উদ্‌দীন, ফররুখ্ আহমেদ, আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, আবদুর রসিদ খাঁ, সুফিয়া কামাল, নুরুন্নাহার, মতিউল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, বন্দে আলী মিঞা, আবদুল কাদির, সৈয়দ আলী আহ্‌সান, বেনজির মহম্মদ, আহ্‌সান হাবিব, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতির নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ ধরণের চিন্তাধারার শরীক এবং ইঁহাদের কাব্যধর্ম নবজীবনের আগমনী-বাণীতে মুখর।

শেষ কথা

বাংলা উপন্যাস

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস-নামক গদ্যকাব্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বস্তুত রবীন্দ্রোত্তর যুগে আমাদের সাহিত্যে গল্প-উপন্যাসের প্রাচুর্যও যেমন, রূপ-বৈচিত্র্যও তেমনই অতিশয় বিলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের প্রকৃতিতে

আত্মপরিচয়-লাভের যে দুর্দমনীয় আকাংক্ষা আছে, তাহারই বশে প্রত্যহের হাসি-কান্নায়, ব্যথায়-আনন্দে সে আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতে চাহিতেছে। কিন্তু দর্পণে প্রতিবিম্বিত না হইলে আপনার মূর্তি যেমন কাহারও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে না, তেমনই বিধাতার এই সৃষ্টির মতই মানুষ ভাষা ও সাহিত্যের রূপ-দর্পণে আপনার আন্তর মূর্তির নিত্য দর্শন লাভ করিতেছে। এই উপন্যাস নামক গদ্যকাব্যে মানুষ আপনাকে যেরূপ অভ্রান্ত রূপে প্রত্যক্ষ করে, এমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এই উপন্যাসই মানুষের জীবনালেখ্য,—মানুষের জীবনই উপন্যাসের প্রাণবস্তু। এই কাহিনী দেবমানব বা রূপকথার অবাস্তব কাহিনী নয়। তথাপি ব্যাপ্তিও যেমন সীমাহীন, গভীরতাও তেমনই অতলস্পর্শী। এই জীবনের যত কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কলহ-সংশয়, অমৃত-গরল—এ সবকে কোন তত্ত্বরূপে আস্বাদন করা নয়, বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের দ্বারা আয়ত্ত করাও নয়, নিত্যপরিচিত নর-নারীর জীবন্ত কাহিনী রচনার দ্বারাই একেবারে সাক্ষাৎ হৃদয়গোচর ও অনুভূতির বস্তু করিয়া তুলিতে হইবে। কালের গতি-স্রোতে, ঘটনা-ধারার বিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে জীবনকে দেখিতে হইবে। ঔপন্যাসিক-কবি জীবনকে এইরূপেই দেখিয়া থাকেন। তারপর কার্য-কারণের অমোঘ নিয়ম, অদৃশ্য শক্তির লীলা ও নর-নারীর চরিত্র-নিহিত নানাশক্তির দ্বন্দ্ব—সকলই সেই ধারার গতি ও আদি-অন্তের নিয়ামক হইয়া জীবনরহস্যের এক সুগভীর রসরূপ আমাদের হৃদয়গোচর করে—এই দুর্লভ মানবজীবনের অন্তহীন বিচিত্র রূপদর্শনে আমাদের আত্মা তৃপ্ত ও আশ্বস্ত হয়। মহাভারতকার পরম তত্ত্বকে এই তথ্যপূর্ণ জীবনের জবানীতে পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহাতে একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নয়, সমগ্র জাতিরই অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইয়াছিল. ঐতিহাসিক এক মহাসংকটে ভারতীয় হিন্দুজাতি তৎকালে রক্ষা পাইয়াছিল। আধুনিক যুগে বস্তু-জিজ্ঞাসার উৎকট কোলাহলের নেপথ্য-গৃহে বুঝিবা মানবাত্মা সেই আদিম পিপাসায় এখনও তেমনই পিপাসার্ত এবং সেই পিপাসা-নিবারণের বারিধারার বাহক কোন ধর্ম বা পুরাণশাস্ত্র নয়—একালের উপন্যাস-কাব্যই।

উপন্যাসের সাধারণ পরিচয়

আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের জন্মকাল আদৌ প্রাচীন নয়, মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতেই হইয়াছে উহার আবির্ভাব। গল্প বলা ও শোনার আকর্ষণটা মানুষের যতই সহজ ও স্বাভাবিক হোক্ না কেন, জীবনের যে-বাস্তব রসিকতা আধুনিক উপন্যাসের জন্মের কারণ, তাহা ইংরাজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সহিত সাক্ষাৎ ও নিবিড় সংস্পর্শের ফলেই সম্ভব হইয়াছে—এই ঐতিহাসিক সত্যকে কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। ঐ বিজাতীয় সংস্কৃতি আমাদের প্রাণমূলে যে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতেই আমরা নবজন্ম লাভ করিয়াছি। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে

আমাদের বহুকালাগত সুদৃঢ় ধারণা বিচলিত হইয়াছিল, অর্থাৎ যে জীবনের অধিকাংশই আমরা পরকাল ও ভগবানে বাঁটিয়া দিয়া এবং সকল দ্বিধা-সংশয়পূর্ণ বাস্তব জীবনকে একরূপ পাশ কাটাইয়া অধ্যাত্মজীবনের নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় আশ্বস্ত হইয়াছিলাম, অতঃপর ঐ জীবনই অতিশয় কঠিন বাস্তব-জিজ্ঞাসার অধীন হইল। শুধু গল্প-উপন্যাসেই নয়, মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-সাহিত্যকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছি, উহার সেই রোমান্টিক প্রবৃত্তি বা আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদ ইংরাজি কাব্যের সাক্ষাৎ রসপ্রেরণারই যে ফল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বৌদ্ধগান হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা কাব্যের ধারা এতকাল এক সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ তটবন্ধনকে স্বীকার করিয়াই প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সাহিত্যে মানবহৃদয়ের গভীরতর উৎকণ্ঠা ও প্রশ্নকাতরতা শাস্ত্রশাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সেই সাহিত্য মানুষের হৃদয়-রহস্যে সংবেদনশীল হইয়া উঠে নাই, দেবতা ও দৈবের অনুগ্রহ-নিগ্রহের কাহিনীতেই পর্যবসিত হইয়াছে। অতএব, উপন্যাস-গল্পের জন্মপত্রিকা রচনাকালে সংস্কৃত কাদম্বরী অথবা পঞ্চতন্ত্র-কথাসরিৎসাগর কিংবা বৌদ্ধজাতকের শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন নাই। ঐরূপ গল্পের পরিচয় সকল জাতিরই প্রাচীন সাহিত্যে অল্পাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের উপন্যাস-গল্প গঠনভংগীতে ও অন্তর্নিহিত রসপ্রেরণায় এমনই অনন্যসদৃশ যে ঐরূপ কাহিনী-গল্পের সংগে তাহাদের দূরতম সগোত্রতাও নাই—থাকিতেও পারে না। অন্য সাহিত্যে উপন্যাসের ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রাচীন উপকথা-গাথা প্রভৃতির স্থাননির্দেশের অবকাশ থাকিলেও আমাদের সাহিত্যে যে ঐরূপ গবেষণা কেন আদৌ ভ্রান্তিমূলক, তাহা আমরা বলিয়াছি। জীবনের প্রতি যে গভীর মমতাবোধ এবং সহানুভূতি হইতে উপন্যাসের জন্ম, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে সেই দৃষ্টিভংগীর পরিচয় কোথাও মেলে না।

বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, উপন্যাসের ধারা অনুসরণ করিবার কালে বাস্তব-অবাস্তবের মাপকাঠি দ্বারা দিক্‌ নির্ণয় করা সংগত হইবে না। কেন না,— উপন্যাস-বিশেষের রসপরিণাম যদি যথার্থ ও অনবদ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাস্তবানুগামী নয় বলিয়াই উহাকে বরখাস্ত করিলে বিদগ্ধ জন তাহা গ্রাহ্য করিবেন কেন? মনে রাখিতে হইবে, কল্পনার প্রকৃতি-অনুযায়ী ও দৃষ্টিভংগীর বিভিন্নতার কারণে উপন্যাসের বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। আসল কথা, সেই দৃষ্টিশক্তি চাই, যাহাকে আমরা বলি কবিত্ব। উপন্যাসের রূপ-বিবর্তনের মূলে কালধারার প্রভাব থাকিলেও প্রত্যেকটি সৃষ্টিই স্বতন্ত্র।

বাংলা উপন্যাসের ধারা নির্দেশের প্রণালী

এইবার আমাদের উপন্যাস সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সুডৌল সর্বাংগ-

সুন্দর উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই সর্বপ্রথম কীর্তি। তৎপূর্বে টেকচাঁদ ঠাকুর বিরচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। এই

বাংলা উপন্যাসের গোড়ার কথা

উপন্যাসের উৎপত্তিব কারণ নির্ণয়-প্রসংগে গ্রন্থকাব বলিয়াছেন—"তখন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যাহা সর্বাপেক্ষা আমাদেব দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করিবে তাহা ইংরেজি সভ্যতার সহিত সংস্পর্শজনিত আমাদেব সমাজ ও পবিবাবেব মধ্যে একটা তুমুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন। এই বিক্ষোভ ও আন্দোলনই আমাদের নব উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম এবং প্রধান উপাদান হইয়া দাঁড়াইল।" তথাপি এই 'আলালেব ঘরেব দুলালে'ব সাহিত্যিক মূল্য অপেক্ষা ঐতিহাসিক মূল্যই অধিকতর—উহাতে সত্যকার সৃষ্টিশক্তিব স্বাক্ষর নাই। বঙ্কিমেব পুর্বে ইংরাজি গল্প-উপন্যাসপাঠে পাঠকচিত্তে যে ধরণেব ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা 'আলাল' মিটাইতে পাবে নাই। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'কাদম্বরী,' 'টেলিমেকাস,' 'রাসেলাস', 'দুরাকাংক্ষের বৃথা ভ্রমণ' প্রভৃতি অনুবাদ-গ্রন্থবাজিই বাঙালীর সেই রোমান্স্-পিপাসা মিটাইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কঠিন নিকষে ভারতের যুগযুগবাহী সত্যটিকে উত্তমরূপে যাচাই কবিয়া নব যুগেব উপযোগী নব মানবসংহিতা প্রণয়ন করিলেন। স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমেব মন্ত্র যেমন তাহাব কাব্যপ্রেবণাব সাক্ষাৎ সহায় হইয়াছিল, তেমনই সেই আধ্যাত্মিক সংকটে, ঐ একই মন্ত্র জাতির বুকে ও বাহুতে নব বলাধান কবিযা বিজাতীয় সভ্যতার আক্রমণজনিত নিশ্চিত মৃত্যু হইতে জাতিকে বক্ষা করিয়াছিল। তাই বঙ্কিমের উপন্যাসে গণজীবনের বাস্তবতাব স্বাক্ষব না থাকিলেও বৃহত্তব জগৎ ও জীবনের গভীরতর বাস্তবের আছে স্বীকৃতি, মানবাত্মার চিবন্তন উৎকণ্ঠার আছে পবিচয়। এই জন্য তাঁহাব উপন্যাসকে কোন শ্রেণীভুক্ত কবা সংগত হইবে না। ঐ উপন্যাস মহাকাব্য, নাটক, গীতিকাব্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীবই এক রাসায়নিক সৃষ্টি। তাহা বাস্তব-অবাস্তবেব ভেদ মানে না, অর্থাৎ তাহা উৎকৃষ্ট কাব্য ও উৎকৃষ্ট সৃষ্টি—মানবজীবনের কাহিনীর উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য। বঙ্কিমেব পবে রবীন্দ্রনাথেব গল্প-উপন্যাসে আদর্শবাদেবই প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। 'পঞ্চভূতে'র 'মনুষ্য'-প্রবন্ধে dignity of man as a man-এর মাহাত্ম্য ঘোষণা করিলেও তিনি একজন অতি উচ্চ আদর্শবাদী। রবীন্দ্রনাথ 'ব্যক্তিমানুষে'র পবিবর্তে মনুষ্যত্বেরই জয়গান করিয়াছেন। 'তাঁহার কল্পনাশক্তিব মূলে আছে—অন্তর ও বাহির, ভাব ও বস্তু, চিন্তা ও অনুভূতির সংগতিমূলক এক অপূর্ব গীতি-প্রবণতা।' এই গীতিপ্রবণতা জীবনের অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ প্রকাশগুলিকে, অতিসাধারণ মানবচরিত্রকেও অসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। 'মানুষ যত ক্ষুদ্র হউক, সে যতই দরিদ্র বা অশিক্ষিত হউক তাহার মধ্যেও মানবাত্মা

আছে, তিনি তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়াছেন।' তাই গল্পে-উপন্যাসে কোথাও তিনি মানুষের গ্লানি বা চরিত্রহীনতাকে বড় করিয়া দেখেন নাই, বরং অতিশয় তুচ্ছকেও সত্য ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। অতএব, রবীন্দ্রনাথও আদর্শবাদী। যুগের অধর্ম ও অন্যায়, অশক্তি ও অপ্রেমের বাস্তব দৌরাত্ম্য, সকল অনাচার-অবিচারের ঊর্ধ্বে তিনি সত্য ও সুন্দরের আদর্শকে সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। "আমাদের দেশের নারী-পুরুষে, বালক-বালিকা ও শিশুর মুখে যে এত সৌন্দর্য আছে, আমাদেরই নিভৃত পল্লীকুটিরে গৃহপরিবারের তুচ্ছ জীবনযাত্রার যে এত গভীর হৃদয়োৎকণ্ঠা 'মনের মোহের এমন মাধুরী' লুক্কায়িত আছে তাহা আমরা ইতিপূর্বে জানিতাম না।" রবীন্দ্রনাথই বাঙালী জীবনের অখ্যাত ও অপরিচিত কোণগুলিকে অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। বঙ্কিমের কবিকল্পনা বাস্তবে পাশ কাটাইয়া রসের সন্ধান করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ ঐ বাস্তবকেই অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। অতঃপর শরৎচন্দ্রে এই বাস্তবের সমস্যাই অতিশয় জটিল হইয়া উঠিয়াছে—গভীর হৃদয়ানুভূতির প্রবল আবেগে কোন-কিছুকে তিনি যেন ঠিক তাহার মত করিয়া দেখিতে পারেন নাই, অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছেন। মানুষের দুঃখকে যতটুকু দেখিয়াছেন, তাহার চেয়ে তিনি বেশী উপলব্ধি করিয়াছেন। অতএব, অতিসাধারণ জীবনযাত্রা, দুঃখের অতিশয় বাস্তব চিত্র, এমন কি, নীতি-বহির্ভূত জীবনকেও তাঁহার উপন্যাস-গল্পে স্থান দিয়াছেন বলিয়াও তিনি 'রিয়ালিষ্ট' নহেন। উপন্যাসের এই পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে Idealism-এরই ত্রিমূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। রবীন্দ্রনাথের সময়ে প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাসে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্নিগ্ধ বাস্তবতার সন্ধান আমরা পাই। তিনি জীবনকে কোন নূতন দিক হইতে দেখেন নাই—একটি সহজ সরল আনন্দে ও সহৃদয় কৌতুকহাস্যে উহাকে বিমণ্ডিত করিয়াছেন।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায়

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ভিন্ন খাতে বহিতে শুরু করিয়াছে। সাদা চোখে বাস্তবের সংগে বোঝাপড়া আরম্ভ হইয়াছে। ইহা বাংলা উপন্যাসের দ্বিতীয় যুগ। এই যুগে লিখিয়াছেন অনেকেই। ইঁহাদের মধ্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি প্রাতিভ দৃষ্টি—এই দৃষ্টির বলে যে-সমাজের জীবন তাঁহার গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য হইয়াছে, তাহার তলদেশের নিগূঢ় রসধারাকে তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। সেই জীবনে মেধ্য-অমেধ্য, শুচি-অশুচি, সুন্দর-অসুন্দর, উচ্চ-নীচে ভেদ নাই, জীবন একটা নূতন রূপে রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার যে বাস্তব, তাহা বাস্তবভেদী গভীরতর বাস্তব। বিভূতিভূষণ

বাংলা উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায়

বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের গভীরে প্রবেশ না করিয়া, মনুষ্যহৃদয়ের অতলস্পর্শ রহস্য সন্ধান না করিয়া, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যে অদৃষ্টপূর্ব পটদৃশ্যের ছবিতে তাঁহার কাব্যধর্মী মনকে খেলাইয়াছেন। জটিল মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ, ভাব-বিপ্লবের জয়গান তাঁহার উপন্যাসে নাই। মোটের উপর, পরিবেশ-পটভূমির শান্ত স্নিগ্ধ মধুর রূপই তাঁহার উপন্যাসের আকর্ষণীয় সামগ্রী। উদারনৈতিক সমাজতন্ত্রবাদী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে বামমার্গীয় চিন্তাধারার স্বচ্ছ সাবলীল রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতের দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই, নিছক বর্তমানই তাঁহার লক্ষ্য। বহির্মুখী তথ্যমূলক মন লইয়া মানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্না দেখিয়া বেড়ানোই তাঁহার কাজ। কেবলমাত্র বুদ্ধিনিষ্ঠ কৌশলে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদকে ফুটাইয়া তোলার ব্যাপারটিও তাঁহার লেখায় অত্যন্ত স্পষ্টীভূত। আবেগের অবদমন ও স্বতঃস্ফূর্তির সাহায্যে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা—ইহাই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য। মনোজ বসুর লেখাতেও আধুনিক সমানাধিকারবাদ-সমস্যা, সামাজিক সমস্যার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যলেশহীন রাজনৈতিক উপন্যাস রচনা করিয়া সন্ত্রাসবাদী যুগের এক আলোকোজ্জ্বল চিত্র রচনার ব্যাপারে মনোজ বসু উপন্যাস-সাহিত্যের একটা নূতন দিক খুলিয়াছেন বটে। উপন্যাস ইতিহাস নয়—এই দৃষ্টিভংগী লইয়া দেখিলে অবশ্য তাঁহার লেখা রাজনৈতিক উপন্যাসের সার্থকতা স্বীকার্য। নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রগতিশীল ঐতিহ্যমুখী মনের ছাপ পাওয়া যায়। অসহায় মানবতা, শোষিত নিষ্পেষিত জীবনের ছবি, নানা বিচিত্র মনোবৃত্তির চরিত্রবিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি—এসব ব্যাপারে নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের প্রতিভার পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। মণীন্দ্রলাল বসু, রমেশচন্দ্র সেন, 'বনফুল' নামে পরিচিত ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, জগদীশ গুপ্ত, সুবোধ ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, অন্নদাশংকর রায় প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ-বা প্রচুর ও সুবৃহৎ উপন্যাসই রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের প্রতিভা মূলত ছোট-গল্প লিখিবারই প্রতিভা। প্রত্যেকেই দু'-একখানা ভাল উপন্যাস লিখিলেও, অধিকাংশ উপন্যাসই ফাঁপানো ছোট-গল্প মাত্র।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কতিপয় বিশিষ্ট উপন্যাস

বাংলা উপন্যাসের এই দ্বিতীয় যুগে হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানির ন্যায় কোন কোন ঔপন্যাসিকের এক-আধখানি উপন্যাস পাঠকের নজরে বেশী করিয়া পড়িয়াছে। যাযাবর রচিত 'দৃষ্টিপাত' বইখানি রিপোর্টের ভংগীতে দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটের পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রা লইয়া লিখিত। সাহিত্যের শাশ্বত মূল্যবোধের কোন উপকরণই

ইহাতে নাই। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসখানিতে রাজনৈতিক পরিবেশে ধৃত পারিবারিক কয়েকটি চরিত্রের জীবনাদর্শ বিশ্লেষিত হইয়াছে। আংগিকের অভিনবত্ব ও বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ সবিশেষ লক্ষণীয়। অতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি কেলাসের' আদর্শগত আবেদন আমাদের মনকে টানিয়া লইয়া যায় গভীর সহজিয়া মানবধর্মের দিকে। অমরেন্দ্র ঘোষ রচিত 'চর কাশেম' বইখানির পটভূমি সংরচন, চরিত্রবিশ্লেষণ ও বিষয়বস্তুর বাস্তবতা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাস হইতেও অধিকতর মনোজ্ঞ। এই উপন্যাস দুইখানিতে পূর্ববংগের নিসর্গপ্রকৃতি ও মানবজীবনের এক খণ্ডাংশের ভাষাচিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলামে'র মধ্যে সেকালের ও একালের কলিকাতা-জীবনের যে মনোমদ, কৌতূহলোদ্দীপক জীবন্ত আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে, তাহা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। দীপক চৌধুরীর 'পাতালে এক ঋতু'ও রাজনৈতিক শতরঞ্চের খেলায় যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতি রচনা করিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। আভা দেবীর 'মুখোশে'র মধ্যে বস্তুসূত্রের যে বৈশিষ্ট্য, যুক্তির যে তীব্রতা, ভাবের যে বিদ্রোহ আছে, তাহা ইতিমধ্যেই অতি-প্রগতিশীল মনকে আকর্ষণ করিয়াছে।

পূর্ব-পাকিস্তানে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এখনও অবধি কোনও লেখক পরিপূর্ণ সার্থকতা দাবি করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে কোন কোন রচয়িতা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। 'আনওয়ারা'-রচয়িতা নজিবর রহমান ও 'আব্‌দুল্লাহ্‌'-রচয়িতা কাজি ইমদাদুল হকের মধ্যে উপন্যাস-প্রতিভা পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া, 'মোমেনের জবানবন্দী'-লেখক মাহবুবউল আলম, 'সত্যাসত্য'-লেখক আবুল মনসুর 'বনী আদম'-রচয়িতা শওকত ওসমান, 'লাল শালু'-রচয়িতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা উপন্যাস

অতঃপর অতি-আধুনিক বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে অর্থাৎ বাংলা উপন্যাসের তৃতীয় যুগে জীবন ও জগতের অতি রূঢ় ও নির্মম বাস্তবকে রসসৃষ্টির অনান করিবার জন্য একটা কঠিন পরীক্ষা চলিতেছে। এই পরীক্ষায় ভাব অপেক্ষা অভাব, সুন্দর অপেক্ষা কুৎসিত, আত্মা অপেক্ষা অনাত্মারই জয়ঘোষণা দেখা যায়। তথাপি আত্মভাবমুক্ত হইয়া, স্বকীয় অভিপ্রায় বা ভাবের উচ্ছ্বাসকে সবলে দমন করিয়া যদি প্রত্যক্ষ বাস্তবকে তদ্‌ভাবে দেখা ও দেখানো যায় এবং তাহাতে সার্থক রসসৃষ্টি সম্ভব হয়, তাহা হইলে বাংলা কথা-সাহিত্য যে এক অভিনব সম্পদের গৌরব অর্জন করিবে এবং রসিকচিত্তও নিশ্চয় নূতনতর রসের আস্বাদনে তৃপ্ত ও আশ্বস্ত হইবে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য।

বাংলা উপন্যাসের তৃতীয় পর্যায়—শেষ কথা

বাংলা ছোট-গল্প

গল্প বলা ও গল্প শুনা—ইহা তো প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে চলিয়া-আসা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। মানুষের মাঝে রহিয়াছে গল্পশ্রবণপিপাসু এক চিরকিশোর মন। ভাষাও যখন পুরোপুরি সৃষ্টি হয়নি, তখনই মানুষের মুখে প্রথম ধ্বনিত হয় গীতিকবিতা, তারপরেই শুরু হয় গল্প বলা। শোনা যায়, চতুর্দশ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মিশর দেশে গল্প প্রচলিত ছিল। চৈনিক সভ্যতাও খুব প্রাচীন—সেখানেও কোন্ সেই অতীত কাল হইতে গল্প করিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। *Old Testament*, *The Apocrypha*, *The New Testament* ও *The Talmud*-এতে বাইবেলী যুগের গল্পকথার সন্ধান পাওয়া যায়। হোমারীয় যুগে গ্রীকেরা ও সিজারীয় যুগে রোমকেরা অত্যন্ত গল্পপ্রিয় ছিল। আবার আমাদের মহাভারত ও পুরাণের উপাখ্যান

গোড়ার কথা

সমূহ, বৃহৎকথার উপকথাবলী, জাতকের ও পঞ্চতন্ত্রের কথাসমূহ—এসবই লোককথার সাহিত্যিক রূপ মাত্র। পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ সারা য়ুরোপে একদা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু পুনরভ্যুত্থান যুগে ইতালীতে বকাচিওর নেতৃত্বে নব উপকথা-সাহিত্য রচিত হয়। আদর্শ ধর্ম ও প্রীতির বালাই না থাকিলেও, রক্তমাংসের মানুষের কথা লিখিয়াও যে আর্ট সৃষ্টি করা যায়—এই সত্যের প্রথম আবিষ্কর্তা বকাচিওই। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-নিরানন্দের উৎস যে মানুষেরই মধ্যে নিহিত এবং তাহা দৈবশক্তির অনুরাগ বিরাগ-নিরপেক্ষ—ইহাই বকাচিওর ফিলজফি। বকাচিওর এই প্রভাব য়ুরোপীয় সাহিত্যে বেশ কিছু দিন চলিবার পরে উপন্যাসের প্রভাবে পড়িয়া হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর আধুনিক ছোট-গল্পের আদর্শ রূপের জন্মদাতা হইলেন ফরাসী সাহিত্যিক প্রস্পের মেরিমে ও রুশ্-কবি পুশ্‌কিন। মেরিমের পরই নাম করা যায় আলফঁস্ দোদে ও গী দ্য মোপাসাঁর। মোপাসাঁর ছোট-গল্পে বিষয়বস্তুর যে অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য এবং ভাষার যে শক্তিমত্তা ও সৌন্দর্য দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রভাব শুধু যে য়ুরোপীয় সাহিত্যেই দেখা দিয়াছিল তাহা নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা ছোট-গল্পের রূপরেখাতেও বও ফলাইয়াছিল। আপন অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির সাহায্যেও যে ছোট গল্প নামে এই নবকথা রচনা করিতে পারা যায় এবং ইহাও যে এক উচ্চ শ্রেণীর আর্ট-কৃতিত্ব—এই ইংগিতটিই মোপাসাঁর সৃষ্টিতে মেলে।

ছোট-গল্পের বিষয় বা Content-এর মূল্য যতটা, তাহার চেয়ে Form বা রসরূপের মূল্য অনেক বেশী। ছোট-গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য ও যেমন আছে, তেমনি আছে আর্টেরও রকমফের। ইহা চিত্রও হইতে পারে, আবার সংগীতও হইতে পারে। কাহারও কাহারও ধারণা, নাম যখন 'ছোট-গল্প' তখন একাধারে গল্প এবং আকারে

ছোট হওয়া তো চাইই। বলা বাহুল্য, কতখানি ছোট হওয়া উচিত—তাহা লইয়াও সাহিত্যিক-মহলে গবেষণার অন্ত নাই। এই চুলচেরা হাস্যকর তর্কের মধ্যে যাইবার প্রয়োজন নাই। আসল কথা, ছোট-গল্পের পরিসর ঠিক করিয়া দিলেই কি আর লেখার Form বা রসরূপ শেখানো যায়! শ্রীযুত সমরসেট্ মম্ বলিয়াছেন—'I wanted to write stories that proceeded, tightly knit, in an unbroken line from the exposition to the conclusion. I saw the short story as a narrative of a single event, material or spiritual, to which by the elimination of everything that was not essential to its elucidation a dramatic unity could be given. In short, I preferred to end my short stories with a full stop rather than with a straggle of dots. From the familiarity with Maupassant that I gained at an early age, from my training as a dramatist and perhaps from personal idiosyncrasy, I have, it may be, acquired a *sense of form* that is pleasing to the French.'

ছোট-গল্পের মর্ম-পরিচিতি

এই 'Form' বা রসরূপ সৃষ্টিমূলক রচনামাত্রেই, সে এখন বড়ই হোক, কি ছোটই হোক, প্রতিটি ক্ষেত্রেই থাকে। ছোট-গল্পের বেলাতেও এই রসরূপ রচয়িতার দৃষ্টিভংগীতে ধরা দেয় আর ইহারই প্রয়োজনে, ইহারই ফলে, একটা গাঁথুনির অনিবার্যতা দেখা দেয়ই। এই রসরূপই ছোট-গল্পের আত্মা আর 'টেক্‌নিক্' জিনিষটি তো বাইরেকার কলাকৌশল। আগে রসরূপ আর তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজনেই তো পরে 'টেক্‌নিক্' বা কলাকৌশলের প্রয়োজন। ছোট-গল্পও এক জাতের কথাশিল্প, তবে ইহাতে উপন্যাস নাটক বা মহাকাব্যের ন্যায় পটভূমি এবং কালের বিস্তার নাই, চরিত্র এবং ঘটনারও বাহুল্য নাই। পক্ষান্তরে, উহারই একটা খণ্ড রূপকে এমন একটি বিশেষ সংস্থানের, বিশেষ ঘটনার, বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে ব্যঞ্জনামধুর রসঘন করিয়া তোলা হয় যে, আমাদের এই জীবনের বিরাট্ চত্বরে যে সমস্ত অবহেলিত, অনাদৃত, অনাবিষ্কৃত, স্বল্পদীপ্ত দিক রহিয়াছে, তাহারা তীব্র চকিত আলোকে আলোকিত হয়। ছোট-গল্পের ইহাই রসরূপ। আর ইহারই ফলে কখনও কৌতুক, কখনও বিস্ময়, কখনও-বা একটা ক্ষণিকের ভাববিহ্বলতা আমাদের হৃদয়বীণার সুপ্ত তন্ত্রীতে ঝংকৃত হইয়া উঠে। এমনি ভাবেই ছোট-গল্পের রসপরিণাম সঞ্চারিত হয় আমাদের মনে। ছোট-গল্পের এই মুখ্য দিক অর্থাৎ রসরূপের প্রয়োজনেই গৌণ দিক অর্থাৎ Mechanism তথা বহিরংগ কলাকৌশল বা গাঁথুনির যত-কিছু বৈশিষ্ট্য।

অতএব, মোট কথাটি দাঁড়ায় এই যে, একটি ছোট পটভূমি, একটি চবিত্র (অবশ্য অপবাপব চবিত্রও থাকিবে, তবে তাহা ঐ ক্ষুদ্র পরিসরেরই অন্তর্ভূত), একটি নাটকীয পবিণামে গল্পের পরিসমাপ্তি—ইহারই জন্য যত-কিছু আয়োজন, যত-কিছু উপাদান-বিন্যাস। এমন কোন কথা, এমন কোন বর্ণনা থাকে না, যাহা চূড়ান্ত ফলশ্রুতির পক্ষে অনাবশ্যক।—ইহাই ছোট-গল্পেব আদর্শ। যে ছোট-গল্প এই আদর্শেব যতটা নিকটবর্তী, তাহা ঠিক ততটাই সার্থক। টুর্গেনিভেব উক্তিকে অনুসবণ করিয়া বলা যায়, বনপথ দিয়া যাইবাব কালে কোন লোককে বাঘে তাড়া কবিলে তাহাব যেমন বনেব ফুল আব লতাপাতাব সৌন্দয মাধুর্য উপভোগ কবিবাব সময় থাকে না, কেমন করিয়া আশ্রয়স্থলে গিয়া পৌঁছাইবে ইহাই থাকে যেমন তাহাব প্রাণপণ প্রয়াস, ছোট-গল্পেব বচয়িতাও ঠিক তেমনি একটিমাত্র ঘটনাব পরিণতিব দিকে লক্ষ্য বাখিয়া লেখনী চালনা কবেন।

বাংলা ছোট-গল্পেব ক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথই আদি বচয়িতা। 'লিরিকে'র মত ছোট-গল্পের বসরূপেব সংগে ববীন্দ্র-প্রতিভাব একটা স্বাভাবিক সংগতি বিদ্যমান।

ছোট-গল্পে রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু তাই বলিয়া কবিকল্পনার প্রবলতা লইয়া তিনি ছোট-গল্প বচনা কবেন নাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র কবিয়া নিজস্ব বচনাকৌশলে তিনি ছোট-গল্প লিখিয়াছেন। ইহার প্রেরণামূলে আছে—

'ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ-কথা
নিতান্তই সহজ ও সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তাহারই দু'চারিটি অশ্রুজল,
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্ত র'বে সাংগ করি' মনে হবে
শেষ হযে হইল না শেষ।'

তবে ববীন্দ্রনাথেব অধিকাংশ ছোট-গল্পই অতিপ্রবল ভাবদৃষ্টিহেতু গল্পায়িত লিবিকই। তাঁহার লেখা 'কাবুলিওয়ালা', 'পোষ্টমাষ্টাব' গল্পে ব্যক্তিমানুষেব চবিত্র মুখ্য নয়—মানবহৃদয়ই মুখ্য, বহির্বিশ্বেব ঘটনা প্রধান নয়—চিত্তাকাশেব বিদ্যুৎ-বিলাসই প্রধান। প্রকৃতি ও মানবমনেব নিবিড় সম্বন্ধ লইয়া যতগুলি গল্প তিনি লিখিয়াছেন, তাহাদেব মধ্যে 'অতিথি'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। 'নষ্টনীড়' গল্পটি তাঁহার লেখা প্রেমের গল্পগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত। 'একরাত্রি', 'শুভা', 'দুবাশা', 'সমাপ্তি,' 'কংকাল' প্রভৃতি গল্পে ঘটনা-চরিত্র-পরিবেশ-সমাপ্তির গাঁথুনি ততটা নিখুঁত না হইলেও, ইহাদের অন্তর্নিহিত বসরূপ থাকায় যে নাটকীয় পবিসমাপ্তি ঘটিয়াছে তাহাতেই উহারা হইয়াছে রসঘন।

রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প লিখিবার সময়ে যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগে প্রথম প্রয়াসী হন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারীর গল্পের নাটকোচিত Climax ও নগেন্দ্রনাথের গল্পের সুখপাঠ্যতা ও চমৎকারিত্ব সবিশেষ লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্র ছোট-গল্প বেশী লিখেন নাই। কেন না,—বড় উপন্যাসই তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত বাহন। শরৎচন্দ্রের এমন কয়েকটি ছোট-গল্প আছে, যাহাদিগকে 'সংক্ষেপিত উপন্যাস' বলা যায়। 'আঁধারের আলো', 'পথ-নির্দেশ', 'কাশীনাথ', 'আলো ও ছায়া', 'অনুপমার প্রেম' প্রভৃতি ছোট-গল্পের আখ্যানভাগ তো উপন্যাসোচিত। অবশ্য 'সতী' গল্পটির মাঝে সার্বজনিক আবেদন থাকায়, উহা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পের সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটির মত খুব কম গল্পই বিশ্বসাহিত্যে আছে, যাহার মাঝে অনুরূপ বিস্তৃতি ও নিবিড়তার সাক্ষাৎ মেলে। 'মহেশ' গল্পটিকে আধুনিক কালের গণসাহিত্যের ভিত্তিস্থানীয় বলিয়াও মনে করা হইয়া থাকে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পেও ছোট-গল্পের রসরূপ ও বহিরঙ্গ কলাকৌশল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অবনীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে অদ্ভুত কল্পনার ছোঁয়াচ্ পাওয়া যায়। বাণীভংগীর দরুণ রূপকথা বলিয়া মনে হইলেও রূপকথা নয়—ঘটনাটি বাস্তবই, এমন গল্প অবনীন্দ্রনাথ অনেকই লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখা 'হীরা-কুনি' গল্পটির কথা এই প্রসংগে মনে করা যাইতে পারে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মরমের কথা' গল্পটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লেখা ছোট-গল্পগুলি আকারে বড় হইলেও বিষয়বস্তু ও চরিত্র-গঠনের বৈচিত্র্যহেতু পাঠকমন আকর্ষণ করিয়া থাকে। অতি নগণ্যতম ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াও যে সার্থক গল্প রচনা করা যায়, তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় মেলে প্রেমাংকুর আতর্থীর গল্পাদিতে। প্রেমাংকুরের রচনায় প্রচ্ছন্ন হাস্যরসাবেগ থাকিলেও, করুণরস আছে। তাহার গল্পগুলিতে ছোট ছোট লোভ, মনস্তাপ প্রভৃতি মানস ভাবতরংগ কেমন সুন্দর ভাবেই-না ফুটিয়াছে! মণীন্দ্রলাল বসুর ছোট-গল্পের প্রাণ-সম্পদ হইতেছে ভাষার মনোহারিত্ব, পরিবেশ-সৃষ্টির অভিনবত্ব ও বর্ণনাভংগীর লঘুগতি।

রবীন্দ্রযুগের ছোট-গল্প
—একটি ধারা

রবীন্দ্রযুগের ছোট-গল্পে আর একটি ধারাও লক্ষ্য করা যায়। একদা Barret H. Clark বলিয়াছিলেন—'Short story is a tale which holdeth children from play and old men from chimney corner'. ছোট-গল্পের এই সংজ্ঞাটি যদি মানিয়া লওয়া যায় তো প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্পই এই দিক দিয়া সার্থক। প্রভাতকুমারের গল্প হাস্যরসের উচ্ছল ধারায় ঝলমল। সাদাসিদে নিরাড়ম্বর ভাষায় তিনি মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনের যে খণ্ডাংশের যে চিত্রটুকু তিনি আঁকিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার পরিচয়

সুনিবিড়—সবটুকুই সুসমঞ্জস রসে টলটল। আবার প্রভাতকুমারের এমন অনেক গল্পও আছে, যাহাদের মধ্যে করুণরসের সন্ধান মেলে। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে যে হাস্যরস আছে, তাহা একান্তভাবেই ঘরোয়া। রাজনীতি দর্শন মননশীলতা অথবা যুক্তির জটিলতায় তিনি গল্পের সাবলীল ভংগীকে বা পরিবেশকে ভারগ্রস্ত করিয়া তোলেন নাই। ঘটনার রস কম হইলে কথায় রস ঢালিয়া অথবা রস না দিতে পারিলে ঘটনার মধ্যে অসংগত 'টাইপ্' সৃষ্টি করিয়া প্রহসনের পরিস্থিতি রচনা করাই তাঁহার লক্ষ্য। পরশুরামের লেখা 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী' বই দুইখানি বংগসাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। ভাষার ঔজ্জ্বল্যে, শব্দের গমকে, দরদী পর্যবেক্ষণশক্তিতে, সহজ ঘটনা-বিন্যাসে তাঁহার প্রতিটি গল্পের হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্ত। বস্তুতন্ত্রবাদী সমাজসচেতন আধুনিক দৃষ্টিভংগী, বিজ্ঞানী মন, উদ্দেশ্যমূলক প্রয়াস পরশুরামের গল্পে পাওয়া যায়; কিন্তু সর্বত্র তিনি তাঁহার বক্তব্যকে প্রচ্ছন্নরূপে রসাত্মক প্রতিক্রিয়ায় ফেলিয়া রসাল স্বভাবোক্তি রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বীরবলের গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'গল্প-সাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য দান করিয়াছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তার অভিজাত মনের অনন্যথা, গাঁথা হয়েছে ভাষার শিল্পে।'' গল্প বলিবার একটি নিজস্ব ভংগিমায়, বলিষ্ঠ ও সূক্ষ্ম রেখাপাতে, হিউমার ও উইটের স্পর্শে বীরবলের গল্পগুলি যেমন প্রাঞ্জল তেমনি রসঘন। অতি তুচ্ছ ঘটনা অথবা মিথ্যা কাহিনীর উপরে স্থাপিত হইয়াও যখন কোন গল্প সত্যের মত খাঁটি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মানবমনকে রসাপ্লুত করে, তখনই তো সত্যকার আর্টিষ্টের পরিচয় এবং বীরবল এই ধরণেরই আর্টিষ্ট। সমাজ এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখক্লেশের মধ্যে ব্যথাবেদনার ভিতরেও যে হাস্যরসের পরিবেশ আছে, এই সামগ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নজর এড়াইয়া যায় নাই। অবশ্য গল্পবিশেষে হাস্যরসের সংগে শ্লেষাত্মক ইংগিতেরও রাখীবন্ধন হইয়াছে। অতি নগণ্য সামান্য ঘটনাও নিরাড়ম্বর অল্প কথায় রসাপ্লুত হইয়াছে তাঁহার গল্প-গ্রন্থাদিতে।

রবীন্দ্রযুগের ছোট-গল্প—অপর ধারা

পর-রবীন্দ্রযুগে যাঁহাদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন অধুনালুপ্ত 'কল্লোল' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। এই বিদ্রোহী সাহিত্যিক দল য়ুরোপীয় আদর্শে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে নূতন ভাবধারা সঞ্চারিত করেন, তাহারই প্রভাবে সুরু হয় পরবর্তী কালের সাহিত্যের জয়যাত্রা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্পাদির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক সংগ্রাম ও সমাজজীবনের প্রতি একটা দরদী দৃষ্টিভংগী দেখা যায়। তবে অন্তর্মুখী একটা বলিষ্ঠ অহংসর্বস্ব ভাবও তাঁহার গল্পাদিতে আছে।

কল্লোল-গোষ্ঠীর ছোট-গল্প

সাম্প্রতিক কালে অচিন্ত্যকুমারের গল্পে সৌন্দর্যবিলাসের চেয়ে বুদ্ধিবিলাসেরই আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। জনপ্রিয় লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল জীবনের খণ্ডাংশ লইয়া অনেক গল্প লিখিলেও, তাহাকে সমগ্র রূপে দেখিবারও একটা প্রয়াস তাঁহার মধ্যে আছে, রুচিজ্ঞানে তিনি উদারপন্থী। শৈলজানন্দ তাঁহার গল্পের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এমন একটি স্তর হইতে, যে স্তরটি সামাজিক আর্থিক মানসিক সর্বদিক হইতেই নিষ্পেষিত। কোল, ভীল, সাঁওতাল, কুলি, মুটে, মজুর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মধ্য হইতেই তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহার গল্পের মালমসলা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, গঠনকারুকলার বৈশিষ্ট্য, উচ্চাংগের শিল্পকর্ম আছে। মুন্সীয়ানা ও অদ্ভুত রঙের খেলা—এই দুইটি সামগ্রীতে প্রেমেন্দ্র প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেই হয়। ব্যক্তিগত জীবনের Frustrationকে Universalised করিয়া প্রকাশ করাতেই প্রেমেন্দ্রের সার্থকতা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে যেমন পাওয়া যায় বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক মনের বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য, জগদীশ গুপ্তের গল্পেও তেমনি পাওয়া যায় মানুষের বিকৃত মনস্তত্ত্বের প্রকাশ। বুদ্ধদেব বসু মূলত প্রগতির সমর্থক। সচেতন মন ও সরল দৃষ্টিভংগী লইয়া তিনি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যানুসারী সমাজধারার সদসৎ দিক, তাহার পরিবেশগত আবহাওয়া জটিলতা এবং আদর্শকে তাঁহার গল্পের মধ্যে সরাসরি ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

সমাজ-সচেতন জাতীয়তাবাদী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট-গল্পগুলির মধ্যে প্রগতিমুখী দৃষ্টিভংগী, যুগধর্মী মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রগতিশীল হইলেও দুর্গতিলেশহীন—তাঁহার গল্পরচনায় একটা বলিষ্ঠ প্রাণের সাড়া, একটা আশ্চর্যসুন্দর দূরদৃষ্টি আমাদের নজরে পড়ে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে দেশকালপাত্রকে গৌণ করিয়া পরিবেশ-রচনা ও চরিত্রাংকন এমনভাবে হইয়াছে যে, পাঠকের মনের অবসাদ ঘুচাইয়া তাহাকে সীমার গণ্ডি হইতে টানিয়া লইয়া যায় সীমাতীতের দিকে। বনফুলের প্রায় প্রতিটি গল্পই আংগিক, আবেদন ও পরিসমাপ্তির দিক হইতে সার্থক। পোষ্ট কার্ডের ভিতরেও ধরানো যায়, এমন বহু সার্থক ছোট গল্প তিনি লিখিয়াছেন। বনফুলের প্রতিভা মূলত ছোট-গল্প রচনার পক্ষে অনুকূল—উপন্যাস-রচনার বেলায় তাঁহার লেখনী সংহতিশূন্যতা, শিথিলতা, পুনরাবৃত্তি, অস্বাভাবিকতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট। সুবোধ ঘোষের 'ফসিলের' গল্পগুলিতে পরিবেশ-রচনার অভিনবত্ব, ভাববস্তু ও বিষয়বস্তুর নূতনত্ব, ভাষায় সবলতার সুসমন্বয় ছোট গল্পের রসরূপ চমৎকার ফুটাইয়াছে। তীব্র দ্রুত প্রবহমানতা সুবোধ ঘোষের গল্পে আছে। সাধারণ আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতিই মনোজ বসুর গল্পের উপজীব্য। তাঁহার গল্পাদির বিষয়বস্তু এবং

সাম্প্রতিক ছোট-গল্প

বাণীভংগীর মধ্যে যেমন আছে বৈচিত্র্য, তেমনি আছে সংযম। অন্নদাশংকর রায়ের গল্প বুদ্ধিদীপ্ত, চিন্তাপূর্ণ—কিন্তু মানসতা ও বিশ্লেষণের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গল্পের কথাবস্তু ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের ছোট-গল্পগুলি পটভূমি-পরিবেশ রচনার বৈচিত্র্যে, বাণীভংগীর নৈপুণ্যে, ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতায়, আধুনিক মনঃসমীক্ষণসম্মত রসপরিবেশনে, যুগচেতনার বৈশিষ্ট্যে অথচ যুগোত্তীর্ণতার আবেদন-মাধুর্যে সমুজ্জ্বল; ছোট-গল্পের রসরূপ বহিরংগ ও কৌশলের দিক দিয়া তাঁহার বহু গল্পই সার্থক। আর একজন উদীয়মান শক্তিশালী ছোট-গল্প-লেখকেরও নাম এই প্রসংগে স্মরণীয়। ইনি নরেন্দ্রকুমার মিত্র। গল্পের কথাবস্তু সংগঠনে, নাটকীয় পরিসমাপ্তিতে, আদ্যন্ত কৌতূহল রক্ষায় ইঁহার মুন্সীয়ানা সত্যই প্রশংসনীয়। ইঁহার ভবিষ্যৎ সত্যই সমুজ্জ্বল।

বাংলা ছোট-গল্প সাহিত্যে পূর্ব-পাকিস্তানের দানও অবিস্মরণীয়। বংগবিভাগের ফলে উভয় বংগের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন আসিয়াছে। নয়া রাষ্ট্রের নয়া চেতনায় উদ্বুদ্ধ জীবনে নয়া জমানার কথা ভাবিবার দিন আসায় পূর্ব-পাকিস্তানের কথাশিল্পীরা পূর্ববংগের সমাজজীবনের চিত্র অংকনে তৎপর হইয়াছেন। প্রবীণ কথাশিল্পী আবুলফজল 'জন্মান্তর' গল্পে মওলানাকে আঘাত হানিয়া মেহনতী মানুষে রূপান্তরিত করিয়াছেন। মাহবুব্ আলম কমল ঘরামি ও নবানকে বাথার সাহেবে অভিস্নাত করিয়াছেন। শওকত ওসমান ফরাজ আলীর জীবনকে বেগবতী গোমতী নদীর স্রোতের সংগে মিশাইয়া দিয়াছেন। বুলবুল চৌধুরী চোরাবাজারীদের বস্ত্রহরণ করিয়াছেন 'আগুন' গল্পে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সামান্য তুলসীগাছকে ও আবুলকালাম সামশুদ্দীন একটি সড়ককে কেন্দ্র করিয়া নীচতলার মানুষের ব্যর্থ জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। মুনীর চৌধুরীও প্রাত্যহিক জীবনের বেদনাবিহ্বল কাহিনী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আবদুল হাইয়ের 'স্মাগ্‌লিং' গল্পটি মাতৃত্ব-মিশ্রিত এক মর্মবেদনার চিত্র। আনোয়ার রহমান পল্লী-পাঠশালার 'পন সারে'র চরিত্রে এক দরদী শিক্ষাব্রতীর রূপটি চমৎকার ফুটাইয়াছেন। শক্তিধর কথাশিল্পী সুচরিত চৌধুরী যে গ্রাম্য কবিয়ালের জীবনটিকে কেন্দ্র করিয়া গল্প রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে নদীমাতৃক পূর্ববংগের রসধারা উৎসারিত হইয়াছে—বীরভূমের রুক্ষ লাল মাটির কবিয়াল এ নয়। এমনি ভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রবীণ ও নবীন কথাসাহিত্যিকগণ পূর্ববংগকেই কলমের আঁচড়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই বাংলার কথাসাহিত্যে এক বিপুল সম্ভবনাময় নূতনের ইংগিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ ইংগিত বুঝিবা গণসাহিত্যেরই।

পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ছোট-গল্প

বংগ-সাহিত্যে ছোট-গল্পের অভাব নাই এবং এমন অনেক গল্প-সাহিত্যিকই আছেন,

যাঁহারা কিছু কিছু সার্থক গল্পও লিখিয়াছেন। এই প্রসংগে প্রমথনাথ বিশী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সুশীল জানা, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য, বিমল মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, বাণী রায়, অমলা দেবী, আশালতা সিংহ, আশাপূর্ণা দেবী প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যায়। বাংলার সাহিত্যরসিক প্রতিভার মূল্য দিতে জানে, কিন্তু এখনও অনেকেরই প্রতিভার সম্যক বিকাশ নজরে না পড়ায় শেষ কথা কিছু বলা চলে না।

শেষ কথা

বাংলা নাট্যসাহিত্য

বাংলা দেশে নাটক এবং নাট্যালয়—দুয়েরই উৎপত্তি হয় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে। সংস্কৃত নাটক বা নাট্যকাব্যের প্রভাবে বাংলা নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে, এমন মনে করিবার কোন সংগত কারণ নাই। অবশ্য অভিনয়ের ব্যবস্থা পূর্বেও এদেশে ছিল। কিন্তু সেই অভিনয়ের আসর বসিত মংগলগান, পাঁচালী, কীর্তন, কথকতা ইত্যাদি লইয়া। বস্তুত বৈষ্ণবকবিতা, কবির গান এবং পূর্বোক্ত যাহা-কিছু আমাদের সাহিত্যিক পুঁজি, তাহাদের সৃষ্টি সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্যে নয়—আসরে গাহিবার জন্য। মানুষের মনোধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতে যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব তরংগিত হইয়া উঠে, তাহাদের অভিব্যক্তি এই সমস্ত রচনায় নাই। 'পূর্ববংগ-গীতিকা'র মধ্যে এই জীবনসংঘাত থাকিলেও তাহা নাটকীয় গুণাশ্রিত নয়। অবশ্য 'বিদ্যাসুন্দর', 'কমলে কামিনী' ইত্যাদি যাত্রার পালা এদেশে পূর্বেও প্রচলিত ছিল, তবে সেগুলি পুস্তকাকারে লিখিত হইত না—অধিকারীদের খাতার পাতায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হইত তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' সম্ভবত বাংলা হরফে প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত নাটক, তবে প্রকৃতিধর্মের দিক দিয়া ইহা যাত্রারই সগোত্র। অতঃপর কলিকাতার বংগমঞ্চে সর্বপ্রথম অভিনীত হয় সমসাময়িক জীবনকে অবলম্বন করিয়া রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক।

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদনই বাংলা নাটক রচনার একটি নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, পরবর্তী নাট্যকারগণ মধু-নির্দেশিত সেই নূতন স্বল্পপরিসর পথটিকে আজ সার্বায়তন রাজপথে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাই আধুনিক বাংলা নাটকের জন্মদাতা হিসাবে নাট্যকার মধুসূদনের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁহার প্রথম বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র কথাবস্তু যযাতি-উপাখ্যান হইতে সংগৃহীত। এই নাটকে অনাবশ্যক বিষয়, চরিত্র, সংলাপ, দৃশ্যাদির অবতারণা না করিয়া তিনি যে শিল্পগত মিতাচার তথা Artistic economy দেখাইয়াছেন, তাহা কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। শর্মিষ্ঠা-চরিত্রটি নাট্যকারপত্নী হেনরিয়েটার আত্মিক প্রভাবেই যেন গড়িয়া উঠিয়াছিল। বলিতে কি,

এই নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে নবযুগ সূচিত করিয়াছিল। সংস্কৃত নাটকে চিরাচরিত শিল্পপ্রমূর্তি বর্জন করিবার ব্যাপারে তিনি বিপ্লবী মনোভাব পোষণ করিলে৺ একেবারেই প্রাচীন পদ্ধতি ও রীতিকে পরিহার করিতে পারেন নাই। কেন না,—প্রস্তাবনা-রচনায় কঞ্চুকী, বিদূষক প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণায় তিনি সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ করিয়াছিলেন। অভিনেতাদের দ্বারা Sublime নাটকের পাশাপাশি Ridiculous নাটকের অভিনয় করিবার জন্য 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ে শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' এই দুইখানি প্রহসন মধুসূদন ফরাস নাট্যকার মলিএয়ারের অনুসরণে রচনা করেন। প্রথমোক্ত বইখানিতে নব্য বংগসম্প্রদায়ের ও শেষোক্ত বইখানিতে তথাকথিত সাধুসজ্জন দেশবাসীর অন্যায় আচরণের প্রতি তিনি তীব্র ব্যংগবিদ্রূপ করিয়াছিলেন। বাস্তবতায়, চরিত্রসৃষ্টিতে, ঘটনাবিন্যাসে, ভাষাভংগিমায় প্রহসন দুইখানির চমৎকারিত্ব অবিসংবাদিত। গ্রীসীয় বিয়োগান্ত উপাখ্যান Apple of discord বা চল্‌তি কথায় 'সোনার আপেলে'র কাহিনীকেই ভারতীয় পরিবেশে ফেলিয়া নাট্যকার মধুসূদন ক্লাসিক আদর্শে 'পদ্মাবতীনাটক' নামে একখানি মিলনান্ত নাটক রচনা করেন।

বাংলা নাটকের গোড়াপত্তনে নাট্যকার মধুসূদন

এই নাটকে তিনি সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করিয়া ভাবিলেন—'Our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees. If I should live to write other dramas, you may rest assured I shall not allow myself to be bound by the diction of Mr. Viswanath of the Sahitya-darpana. I shall look to the great dramatists of Europe for models' গ্রীক ট্রাজেডির অনুসরণে প্রথমে বিয়োগান্ত-ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারীনাটক' তিনি রচনা করেন। ইহাতে ইতিহাসের বস্তু রক্ষিত হওয়ায়, তদানীন্তন কালের চিত্র বেশ ফুটিয়াছে। নাটকখানির সংলাপ চরিত্রানুগ, কিন্তু ঘাত-প্রতিঘাত না থাকায় অনেক চরিত্রই দুর্বল। মদনিকা-চরিত্রের সরসতা উপভোগ্য হইলেও ধনদাস-চরিত্রের মাত্রাতিরিক্ত তরলতা পীড়াদায়ক। নাটকের শেষ দৃশ্যের করুণরস মর্মস্পর্শী। 'কৃষ্ণকুমারীনাটকের' ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিলেও প্রথম বিয়োগান্ত নাটক হিসাবে অভিনয়শিল্পের দিক দিয়া ইহার জনপ্রিয়তা ছিল। অতঃপর তিনি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন। লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, তাঁহার কবিমনের ভিতর দিয়া নাট্যকারমনটি উকিঝুঁকি মারিয়াছিল। 'ব্রজাংগনা কাব্যে' নাটকীয় স্বগতোক্তি অথবা একোক্তি, 'বীরাংগনা-কাব্যে'র বিভিন্ন নায়িকার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য-রক্ষণ ব্যাপারে নাট্যকারসুলভ শিল্পকৃতিকে অব্যাহত থাকিতে দেখা যায়। অতঃপর রোগশয্যাশায়ী মধুসূদন 'মায়াকানন' নামে একখানি সম্পূর্ণ নাটক ও

'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে একখানি নাটকের কিয়দংশ রচনা করিয়া ওপারের যাত্রী হইলেন। 'মায়াকানন' নাটকখানি নাট্যকার মধুসূদনের জীবনবেদ। মধুজীবনের প্রতিধ্বনিই হইতেছে এই নাটকের মূল সুর। স্রষ্টা ও সৃষ্টি—নাট্যকার মধুসূদন ও 'মায়াকানন' নাটক—একটি অপরটিকে যেন অর্থান্বিত করিয়া থাকে। 'আত্মচরিত-কল্প' এই নাটকখানি হইতে মধুর জীবনেতিহাসের বহু অমূল্য তথ্য আহরণ করা যাইতে পারে। মধুর নির্জলা সাহিত্যিক জীবন নাটকরচনাকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং ঝরিয়াও পড়িয়াছিল নিজেরই জীবনবৃত্তান্তকে নাট্যসাধনার মাধ্যমে আভাসিত করিয়া। তাই নিছক কবিরূপে নয়, নাট্যকার-হিসাবেই মধুসূদনের সত্যকার পরিচয়।

দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দেশের নানা স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত তাঁহার ছিল নিবিড় পরিচয়, আর সেই পরিচিতি আশ্চর্য সৃষ্টিকুশলতায় প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার নাটকে। নিরন্ন চাষীর মর্মান্তিক বেদনা এবং নীলকর কুঠিয়ালদের অমানুষিক অত্যাচার নাট্যকারের সহানুভূতিতে মিলিত হইয়া 'নীলদর্পণ' নাটকের সৃষ্টি। মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর ভালবাসা এবং উদার স্বচ্ছ দৃষ্টি নাট্যকার দীনবন্ধুর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সূক্ষ্ম নাট্যরীতির বিচারে 'নীলদর্পণে' অনেক অসংগতি চোখে পড়িবে সত্য, কিন্তু ইহার অপরিসীম সামাজিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য। নিপীড়িত মানবতার আর্ত চীৎকারে দীনবন্ধুর আন্তরিক সাড়াদানে কোন প্রবঞ্চনার অবকাশ ছিল না বলিয়াই তাঁহাকে 'প্রথম গণনাট্যকার' হিসাবে সম্মানিত করা যায়। নাটকে বস্তুতান্ত্রিকতা তাঁহার দান। 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পর হইতে বাংলার রংগমঞ্চে বৈতনিক প্রথা প্রবর্তিত হইল। তাই গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুকে বলিয়াছিলেন—'বাংলার রংগালয়-স্রষ্টা'। প্রহসন রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রুচিগত নগ্নতা দীনতা থাকিলেও 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো,' 'জামাইবারিক' প্রভৃতি নাটকে তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার অসামান্যতাও পরিদৃশ্যমান।

বাংলা নাটকে বাস্তবতা পরিবেশনে দীনবন্ধু

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন বসু কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঘরোয়া ষ্টেজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', 'অলীক বাবু' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দেখিয়া সাধারণে তৃপ্তি পাইয়াছিল। কিন্তু মনোমোহনের 'প্রণয়পরীক্ষা', 'রামাভিষেক', 'সতী', 'হরিশ্চন্দ্র' ইত্যাদি নাটক তেমন উচ্চাংগের হয় নাই। 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র নাট্যকার উপেন্দ্র দাস নাট্যসাহিত্যের আসর সেরূপ জমাইতে পারেন নাই।

দীনবন্ধু-গিরিশ-মধ্যবর্তী নাট্যকার

বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক পর্যায়ে গিরিশচন্দ্রের প্রাধান্য অপ্রতিহত। তিনি নাকি নটহিসাবে বাংলার 'গ্যারিক' ও নাট্যকার হিসাবে বাংলার 'সেক্‌স্‌পীয়র'। গ্যারিক ও গিরিশচন্দ্র—উভয়ের মধ্যে কাহারও অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, তাই এ সম্পর্কে কিছু বলা বাতুলতা। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সেক্‌স্‌পীয়র, মিলার বা গ্যয়টে—ইঁহাদের নাটকে যে প্রাণবন্ত ভাব বা উদ্দীপনা আছে, তাহা গিরিশসাহিত্যে কদাচিৎ পরিদৃশ্যমান। গিরিশচন্দ্র মূলত পৌরাণিক নাট্যকার হইলেও ঐতিহাসিক, সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মমূলক জাতীয় নাটক ও কয়েকটি প্রহসনের রচয়িতা। তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক নাটকের নাম 'আনন্দ রহো' এবং প্রথম পৌরাণিক নাটকের নাম 'রাবণবধ,' প্রথম পারিবারিক নাটকের নাম 'প্রফুল্ল'। তাঁহার রচিত নাট্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় শতাবধি। তিনি এমনই ছিলেন 'Voluminous writer'। সাহিত্যশিল্পের দিক দিয়া খর্বতা থাকিলেও মঞ্চশিল্প তথা দৃশ্যশিল্পের দিক দিয়া গৌরব আছে বলিয়াই আজও অবধি তাঁহার লেখা যে কয়েকখানি নাটক দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তন্মধ্যে 'জনা,' 'প্রফুল্ল,' 'বিল্বমংগল,' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস,' 'পাণ্ডবগৌরব' প্রভৃতি নাটক ও 'আবুহোসেন' গীতিনাট্যখানি উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক বাংলা নাটক ও গিরিশচন্দ্র

ধর্মপ্রবণতা, প্রেমাকুলতা ও ভক্তিরসের বন্যায় গিরিশ-নাট্যসাহিত্য প্লাবিত। ধর্মপ্রাণ ভক্তিবিহ্বল বাঙালী জাতির মনের কথাটিকে তিনি নাটকের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছিলেন বলিয়াই দেশজোড়া এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তির তিনি অধিকারী। 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদেও গিরিশপ্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। তবে মোটের উপর গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের চরিত্রগুলি যেন রক্তমাংসের নয়—কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত। তাঁহার লেখা 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী'—এই তিনখানি নাটক নাটকীয় গুণ অপেক্ষা দেশাত্মবোধ-উদ্দীপক ঘটনায় সংলাপে অধিকতর ভরপুর ছিল বলিয়া তখনকার দিনে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায়। যে পাশ্চাত্ত্য কলাকৌশলের প্রয়োগ ঘটনাপ্রধান নাটক-রচনার নিয়ম, তাহাকেই গিরিশচন্দ্র আমাদের দেশের রসপ্রধান নাটক-রচনায় প্রয়োগ করিয়া যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন নাটকে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার ব্যাপারেও তিনি কিছুটা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সূক্ষ্ম শ্রেণীর হাস্যরসসৃষ্টিতে সম্যক পারদর্শিতা না থাকিলেও ভাঁড়ামি-জাতীয় হাস্যরস পরিবেশনে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব বেশ খানিকটা ছিল। গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের ভাষা বেশ চরিত্রানুগ ও অলংকারবর্জিত সহজ সরল। ভাঙা ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ—যাহা 'গৈরিশী ছন্দ' নামে সুপরিচিত—তাহাকে রংগরংগালয়ে

বহুলপ্রচলিত করিয়া গিরিশচন্দ্র মধুসূদনেরই আকাংক্ষাকে এতদিন বাদে সার্থক করিয়া তুলিলেন। গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের প্রায় প্রতিটি গানই নাটকবিশেষের অংগস্বরূপ —গান বাদ দিতে গেলে নাটকেরই হয় অংগহানি। দৃশ্য ও চরিত্র, স্থান কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়াই তিনি নাটকে গান সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন নাটকে দার্শনিক মতেরও ছায়া বিদ্যমান: যেমন—'শংকরাচার্য' নাটক। কিন্তু গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের প্রচুর গুণ থাকিলেও একথা স্বীকার না করিয়াই উপায় নাই যে, গুরুবাদীদের ডংকানিনাদে তাঁহাকে প্রাপ্যের তুলনায় অনেক বেশী সম্মানই আমরা আজ অবধি দিয়া আসিতেছি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রায় পঞ্চাশখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'প্রতাপাদিত্য,' 'নন্দকুমার,' 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত,' 'চাঁদ-বিবি', 'বঙ্গবীর', 'আলমগীর' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক, 'সাবিত্রী,' 'ভীষ্ম,' 'নব-নারায়ণ' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক, 'আলিবাবা,' 'কুমারী,' 'কিন্নরী' প্রভৃতি গীতিনাট্য, 'মিডিয়া,' 'রঞ্জাবতী,' 'বাদ্‌সাজাদী' প্রভৃতি নানা জাতীয় নাটক সমধিক প্রসিদ্ধ। ক্ষীরোদপ্রসাদই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারা এক নবতর পথে পরিচালিত করেন। 'ধর্মমংগল' প্রভৃতি মংগলকাব্যগুলির মধ্যেও যে প্রচুর নাটকীয় উপাদান আছে, তাহা তিনিই 'রঞ্জাবতী' রচনা করিয়া প্রমাণ করেন। জাতীয় ভাবে প্রবুদ্ধ বাংলা দেশের নাট্যকারেরা যখন মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা, বিশেষ

বাংলা নাট্যসাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ

করিয়া চিতোর হইতে জাতীয় বীর আমদানী করিয়া নাটকে রূপ দিতেছিলেন, তখন তিনিই যশোরের প্রতাপাদিত্যকে, বাংলার প্রতাপাদিত্যকে, লইয়া নাটক লিখিলেন। বিজয়া প্রতাপকে 'ত্রিধাবিভক্ত বিহংগম'কে 'বিজয়পতাকা-চিহ্ন' হিসাবে গ্রহণ করিতে বলিয়া প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিবল, বাহুবল ও ধর্মবল এই ত্রিবিধ শক্তির সাহায্য লইতে বলিয়াছিলেন। ধর্মপ্রাণ পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া প্রতাপাদিত্য ধর্মবল হারাইলেন; আর তাহা হইতেই তাহার অবনতি ঘটিল। শ্রেষ্ঠ নাট্যকারমাত্রই প্রতীক-চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ ত্রিধাবিভক্ত বিহংগমও প্রতীক হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যকুশলতার পরিচায়ক। ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক শক্তিতে এই যে বিশ্বাস, ইহা ক্ষীরোদপ্রসাদের বরাবরই ছিল। স্বার্থপর সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করিয়া গণশক্তিকে যখন দাবাইয়া রাখিয়াছিল, বংগালয়ের সাধারণ দর্শকবৃন্দ যখন সাম্যবাদমূলক বিপ্লবের বিরোধী, তখন হীনবীর্য সমাজের শক্তিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্রাহ্মণসন্তান সমাজসংস্কারক ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখিলেন 'কুমারী' নাটক। অস্পৃশ্যতাবাদ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অস্পৃশ্যতাবর্জন যে জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান, একথা তিনিই প্রথম জানাইলেন। 'হিংসা' ও 'অহিংসার' মধ্যে কোন্ নীতি শ্রেয়স্কর,

তাহা ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক সপ্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রথমে 'রঘুবীরে' ও পরে 'প্রতাপাদিত্যে' এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। জনকল্যাণে নিষ্কাম হিংসাও যে ধর্মানুমোদিত, ইহা তিনি 'প্রতাপাদিত্য,' 'রঘুবীর' ছাড়াও 'রঞ্জাবতী'তে, 'নব-নারায়ণে' ব্যক্ত করিয়াছেন। ধ্বংসের বীজাণু অধর্মেরই মধ্যে নিহিত, ধর্মবিরুদ্ধ কার্য অধর্মাচারীর বিনাশের হেতু—ইহাই তো তাঁহার 'নব-নারায়ণ' নাটকের শিক্ষা। আলমগীরের মানবসত্তা ও সম্রাটসত্তার দ্বন্দ্ব, উদিপুরী বেগমের অন্তরের মাঝে উদয়পুরী ভাবপ্রবাহের সঞ্চরণ, 'আলমগীর' নাটকখানিকে কি মঞ্চশিল্পের দিক দিয়া, কি সাহিত্যশিল্পের দিক দিয়া, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দিয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষা সরস ও সবল সত্য, কিন্তু লিরিকতার প্রাচুর্য থাকায় কৃত্রিমতাদোষদুষ্ট। শ্লেষ বাক্যের প্রয়োগে ও Serio-comic শব্দযোজনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার ভাষায় নীতিকাব্যোচিত রসঘনতা থাকায়, উহা গাম্ভীর্যময় নাটকের চেয়ে Melodrama অর্থাৎ অতিনাটকের বেলায় অধিকতর কার্যকর। তাই তাঁহার Melodrama-গুলি বেশ সুখপাঠ্য ও অভিনয়যোগ্য। তাঁহার ভাষায় যে Force আছে, তাহাতে Statical force বেশ ভালই আছে, কিন্তু Dynamical force বড়ই অল্প। ক্ষীরোদের হাস্যরস মার্জিত ও পরিপাটি, কিন্তু স্বাভাবিক স্বচ্ছতার চেয়ে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যই স্পষ্টতর।

দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা অধ্যাত্মসৌন্দর্য ও তাহারই স্বর্গীয় ছটায় জাতীয় জীবনকে উদ্ভাসিত করিতে চাহিয়াছিল। তাই 'প্রতাপসিংহ' নাটকে যোশীর মুখে শুনিতে পাই—'এমন কবিতা লেখো, যা পড়ে' ভাই ভাইয়ের জন্য কাঁদে। মানুষ মনুষ্যত্বের জন্য কাঁদে।' এই ভাবাদর্শটিই দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। অতি-আধুনিক বংগ-সাহিত্যে যেমন ভাইয়ের অভাব, তেমনি মানুষেরও অভাব—এখানে আছে শুধু 'আমি' আর 'তুমি' অর্থাৎ শুধু 'কবি' ও তাঁহার 'সাথী প্রিয়া'ই আছেন। তাই ভাইয়ের জন্য, মানুষের জন্য, ভাবিবার অবকাশ কোথায়? দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাট্যসাহিত্যে মানুষের মহনীয়তা দেখাইয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া মানবকে করিতে চাহিয়াছেন মানব-সেবক। সমগ্র দ্বিজেন্দ্র নাট্যসাহিত্যে 'আমি' তত্ত্বের ক্ষীণ স্পন্দনটুকুও ধ্বনিত হয় নাই। তাঁহার সাহিত্য ভাবে, আদর্শে, ত্যাগে, সংযমে ও পরার্থপরতায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলি মহত্ত্বে, ত্যাগে ও সত্যনিষ্ঠায় দীপ্তিময়। সৎ ও অসৎ—উভয় জাতের চিত্রই তাঁহার সাহিত্যে আছে। কিন্তু তাঁহার রচনাভংগীর গুণে অসৎ চিত্রগুলি মলিন ও আদর্শগুলি লোভনীয় হইয়া পড়িয়াছে। চিত্তবৃত্তির বিবিধ ও বিচিত্র লীলাভংগিমার ব্যঞ্জনায় যে মাধুর্যবোধের অভিব্যক্তি, তাহাই তো সাহিত্যশ্রী বা

বাংলা নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল

Art। আধুনিক বংগসাহিত্যে কতকগুলি কুৎসিত ভাব ও কুরুচি দুষ্টব্রণের মত মাথা তুলিতেছিল। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা সেই অন্যায়, সেই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে দৃপ্ত অভিযান চালাইয়াছিল। 'সাজাহানে' ঔরংজীবের সিংহাসনলাভের চেয়ে দারার দুর্ভাগ্যই অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। গুলনেয়ারের রূপযৌবন পিশাচীর কদর্যতায় নিমজ্জিত। ইহাই তো সত্য ও শালীনতাময় আর্ট। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে পুষ্পমাধুর্যের চেয়ে অভ্রমহিমারই প্রাধান্য বেশী। ইহাতে জাতির প্রাণশক্তিই হইয়াছে প্রবুদ্ধ। দুর্গাদাসের কর্মসন্ন্যাস, দারার নিস্পৃহতা, দাদামহাশয়ের দুলালী সরযূর স্বামিগৃহে দারিদ্র্যবরণ, মহম্মদের সাম্রাজ্য-উপেক্ষা—এই সমস্ত মহিমা প্রভাত-আলোক-স্পর্শের ন্যায় জীবনের সুপ্ত মহনীয়তাকে জাগাইয়া দেয়। তাই দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য-সাধনা বাংলার নব প্রবোধনা। দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে নারী ভোগোপকরণ নয়, সে 'নির্মেঘ উষার চেয়েও নির্মল, বীণার ঝংকারের চেয়েও পবিত্র'। তাহার ত্যাগপরায়ণ রূপটিই দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে প্রকট। মানুষী ভাবের সংগে দৈবী ভাবের সংমিশ্রণে যে সমুচ্চ মানবতার সৃষ্টি, তাহার পরিচয় মিলে স্নেহপাগল সাজাহান, কর্তব্যনিষ্ঠ দুর্গাদাস, দেশপ্রেমিক প্রতাপ, মহীয়সী সরযূ মানসী মহামায়া সত্যবতী প্রভৃতির চরিত্রে। চরিত্রগুলি যেন দেবতা ও মানুষের এক অনবদ্য সংমিশ্রণ। স্বাজাত্যবোধ নব্যবংগের নবধর্ম। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতা সংকীর্ণ নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল যে সুস্থ স্বাদেশিকতার আদর্শের পূজারী ছিলেন, তাহার পরিচয় মানসীর উক্তিতে মিলে। মানসী বলিয়াছে—'স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয়তা বড়, তেমনই জাতীয়ত্বের অপেক্ষা মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়, মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক্।' বলিতে কি, সমগ্র দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের গভীরতা হইতে মেঘমন্দ্রধ্বনিতে মন্দ্রিত হয়—'আবার তোরা মানুষ হ'। দ্বিজেন্দ্ররচিত নাটকগুলির মধ্যে 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' মঞ্চশিল্পের দিক দিয়া যতই সমুন্নত হোক্ না কেন, জটিল চরিত্রচিত্রণে ও নাট্যকলাসম্মত রস-পরিবেশনে 'নুরজাহান'ই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। পরিমার্জিত সরস সতেজ হাস্যরসে—হিউমারে—তাঁহার নৈপুণ্য খুবই ছিল। বিচিত্র ধরণের বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ প্রয়োগে, উপমা উৎপ্রেক্ষা এবং যমকের ব্যবহারে তাঁহার তুলনা মেলা ভার। দৃষ্টি তাঁহার অন্তর্মুখী—জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তাঁহার নাটক জীবন্ত। তবে তাঁহার আত্মকেন্দ্রিক মনোধর্ম নাট্যরসের মস্তবড় অন্তরায়। নাটকীয় রীতি-অনুসারে তিনি নিজেকে নাটকের ঘটনাবলীর নেপথ্যে না রাখিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীদের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন, ফলে, বিবর্তনের পথে নাটকের স্বাভাবিক পরিণতিকে তিনি কৃত্রিমতা-দুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার কবিধর্মী মন আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার শিক্ষা স্বীয় স্বভাবের জন্যই পায় নাই; যে-রচনাশৈলী তাঁহার

গৌরব, তাহাও নাট্যরসকে কম ক্ষুণ্ণ করে নাই। পাত্র-পাত্রীদের সকলের মুখে প্রায় একই প্রকারের সংলাপ যোজনা করিয়া তিনি নাটকের একটি মহৎ ধর্মকেও লংঘন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র-নাট্যসাহিত্যে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া সংগীত সংযোজিত হয় নাই। শিল্পগত মিতাচারের দিক দিয়া অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ।

গিরিশ-সমসাময়িক নাট্যকারগণের মধ্যে রসরাজ অমৃতলাল বসুর নামই সর্বাগ্রগণ্য। 'তরুবালা', 'বিজয়বসন্ত', 'আদর্শ বন্ধু', 'নবযৌবন', 'যাজ্ঞসেনী'—এই পাঁচখানি নাটক লেখা ছাড়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'চন্দ্রশেখর' 'বিষবৃক্ষ' ও 'রাজসিংহ' নাট্যীকৃত করেন। আবার 'বিবাহ বিভ্রাট', 'খাসদখল' প্রভৃতি ষোলো সতেরোখানি প্রহসনও তিনি রচনা করেন। তবে প্রহসনের চরিত্রগুলি কমবেশী ভাবে বাস্তবের বিকৃত ও অতিরঞ্জিত আলেখ্য। নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় 'হরধনু-ভংগ' নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ সংযোজনা করিয়াছিলেন—তাহাই হয়তো-বা গিরিশের হাতে 'গৈরিশ ছন্দ' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। রাজকৃষ্ণের লেখা 'লয়লা মজনু', অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা 'আনন্দবিদায়,' 'শিরীফরহাদ', 'হিন্দাহাফেজ', 'তুফানী' প্রভৃতি গীতিনাট্য একদা প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন

কতিপয় নাট্যকার

করিয়াছিল। ইঁহাদের পরই নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন', 'চণ্ডীদাস', 'বাংলার মেয়ে', নাট্যীকৃত 'মন্ত্রশক্তি', 'মা', 'পোষ্যপুত্র' প্রভৃতি নাটক, যোগেশচন্দ্রের 'সীতা', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'দিগ্বিজয়ী' প্রভৃতি নাটক আজও দর্শকজনের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। পৌরাণিক কাহিনীসমূহ হইতে উপকরণ আহরণ করিয়াও যে আধুনিক কালোপযোগী নাটক লেখা যায়, তাহার প্রমাণ যোগেশচন্দ্রের 'সীতা', তাহার প্রমাণ মন্মথ রায়ের 'কারাগার'। অতঃপর এই যুগেরই 'বিজয়া'-প্রণেতা মনোমোহন রায়, 'হরিরাজ' 'ভ্রমর'-প্রণেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'রণভেরী'-প্রণেতা দাশরথি মুখোপাধ্যায়, 'মিশরকুমারী'-প্রণেতা বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, 'দেবলাদেবী'-প্রণেতা নিশিকান্ত বসু রায়, 'বাঙালী'-প্রণেতা ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী নাট্যকারগণের সগোত্র নহেন। সাধারণ রংগালয়ে তাঁহার নাটক বিশেষ অভিনীত হয় নাই। কারণ, তাঁহার বেশীর ভাগ নাটকই Closet drama অর্থাৎ বৈঠকী ধরণের। অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার নাটকের রসাস্বাদন সম্ভব নয়। তাই ডক্টর টমসন বলিয়াছেন—'His dramatic work is the vehicle of ideas rather than expression of action', সাধারণত ক্রিয়াই নাটকের প্রাণ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় নাটক ভাবের বাহন ছাড়া আর কিছুই নয়। একবার তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন,—'নাট্য-

কারের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, আমার নাটকের অভিনয় হয় ত হইতে পারে, না হয় অভিনয়ের পোড়া কপাল, আমার কোনই ক্ষতি নাই।' ফলে, 'শেষরক্ষা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার-সভা', 'তপতী', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটক ছাড়া রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়ের দিক দিয়া, মঞ্চসাফল্যের দিক দিয়া, জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই। রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্য ঘটনা বা ঘাত-প্রতিঘাতপ্রধান নয়—দৃশ্যমানতার চেয়ে ভাবগভীরতার দিকেই তাঁহার নজর বেশী। তাঁহার কবিমানস নাটককে লিরিকধর্মী করিয়াছে, ফলে দৃশ্যকাব্য হিসাবে তাঁহার নাটক সর্বগুণসম্পন্ন হয় নাই, তবে সাহিত্যসম্পদ যে অনেকখানিই আছে—একথা বলাই বাহুল্য। তাঁহার কথাই ছিল এই, 'চিত্রপটে আমার দরকার নেই, আমি চাই চিত্তপট—তার উপরে রঙের তুলি বুলিয়ে ছবি আঁকব।' তাঁহার নাটকের পটভূমি কোন বিশেষ স্থান বা কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়—বিশ্বজনীনতার ভিত্তিতেই উহার স্থাপনা। কাব্যনাট্য, রূপকনাট্য, দ্বন্দ্বনাট্য, সাংকেতিক নাট্য, প্রহসন প্রভৃতি রচনা করিয়া তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি শূন্য দিক যে পূরণ করিয়াছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁহার প্রহসনগুলিতে একটি বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের অবতারণা আছে, হাস্যরসের আবরণে জীবনের অনেক নিগূঢ় রহস্যের বেদনামধুর অভিব্যঞ্জনাও ফুটিয়াছে। 'ডাকঘর', 'অচলায়তন,' 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি সাংকেতিক নাটক সমুচ্চ ভাবগভীরতার বাহনরূপে বাংলা নাট্যসাহিত্যে অতুলনীয়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

রংগালয়কে কেন্দ্র করিয়াই হয় নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিস্তৃতি। বর্তমানে সবাক্ চিত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রংগমঞ্চ যেন আর আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। একথা অবশ্য খুবই ঠিক যে, থিয়েটার-ব্যবসায়ের সহিত তুলনায় সিনেমা-ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী। নানারূপ বিস্ময়কর মনোরম ও জ্ঞানপ্রদ দৃশ্য-প্রদর্শনে, অল্প সময়ে পূর্ণ তৃপ্তিদানে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী-সম্মেলনে অভিনয়-প্রদর্শনে সিনেমার জনপ্রিয়তা যতই স্বীকার করা যাক্ না কেন, থিয়েটারের লোপ সিনেমার দ্বারা কখনই হইতে পারে না। কেন না,—সিনেমা নাটক নয়, নাটকের কংকালমাত্র, আর ছবি ছবিই, আসল মানুষ নয়। নাটকের মধ্যে যাহা বিশেষরূপে উপভোগ্য, নাট্যরস যাহার মধ্যে থাকে নিহিত, সেই সংলাপবস্তুটিকে সিনেমায় বেশ কঠোর হস্তে ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং প্রকৃত নাট্যরসিক কখনও সিনেমা দেখিয়া তৃপ্তি পাইতে পারেন না। তবে একথাও ঠিক যে, চেষ্টা করিলে সিনেমার অনেক-কিছু জিনিস রংগমঞ্চেও দেখানো যাইতে পারে। বিংশ শতাব্দীর এই কর্মব্যস্ত

সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যসাহিত্য

জীবনে চাল-চিড়া বাঁধিয়া, সারা রাত ধরিয়া থিয়েটার দেখা সম্ভব নয়। ইহা বুঝিয়াই রংগালয়ে আজকাল আড়াই ঘণ্টার বই অভিনয় করা হয়। সিনেমার সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা তো করা চাইই। তাহা ছাড়া যতটা পারা যায় চিত্রনাট্যের শিল্পরীতিতে এবং সত্যকার নাট্যরসকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া মঞ্চনাট্য রচনার প্রয়োজন। এদিক দিয়া শচীন সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে,' শিশির কুমার ভাদুড়ী ও জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক' প্রভৃতি দু'চারখানি নাটকমাত্র অগ্রসর হইয়াছে। ইব্‌সেন ও শ-কে আদর্শ করিয়া সাম্প্রতিক কালে মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন সেনগুপ্ত প্রভৃতি নাট্যকারগণ বাংলা নাটকে পাশ্চাত্ত্য নাটকের ভাবধারা সংক্রামিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু ইহাই তো আর যথেষ্ট নয়। অতি-আধুনিকতার দাবি লইয়া যে নাটকগুলি মঞ্চে অভিনীত হয়, তাহা আদৌ মৌলিক চিন্তাপ্রসূত নয়, বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ মাত্র। মনে রাখা দরকার— 'A nation is known by its stage'. শরৎচন্দ্র, তারাশংকর প্রভৃতির নাটকে বংগসমাজের কথা, তাহার প্রাণস্পন্দন অবশ্য শুনিতে পাই। আবার মহেন্দ্র গুপ্তের নাটকাদিতে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ও দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের ধারা অনুসৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল' হাস্যরসপ্রধান নাটক হইলেও বেশ শিক্ষাপ্রদ এবং হৃদয়গ্রাহী। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী চক্রবর্তীর 'দুঃখীর ইমান' 'পথিক' গণজীবনের রূপায়ণে, গণশিক্ষাদানে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ রংগালয় ও পেশাদার নটনটীর একান্ত অভাব থাকায় নাট্যসাহিত্য এই অঞ্চলে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিতেছে না। সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় অল্প কয়েকটিই আছে। এই অসুবিধার মধ্যেও যে কয়েকজন নাট্যকার নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'আনোয়ার পাশা' 'কামাল পাশা' ও 'কাফেলা'-রচয়িতা ইব্রাহিম খাঁ, 'সরফরাজ খাঁ' 'মসনদের মোহ' 'আনারকলি'-রচয়িতা শাহাদাৎ হোসেন, 'শহীদ সেরাজ'-রচয়িতা মুহম্মদ নেজামৎউল্লাহ্, 'নাদির শাহ্'-রচয়িতা আকবর উদ্দিন, 'বাগদাদের কবি'-রচয়িতা শওকত ওসমান প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা নাট্য সাহিত্য

সত্যকার ভাল সাম্প্রতিক নাট্যকার হিসাবে মাত্র জনকয়েকই আছেন আর সব নাট্যকার কেবল শিক্ষানবিশীই করিতেছেন। ভল্‌তেয়ারের ভাষায় তাঁহাদিগকে বলিতে চাই—'Compact a lofty and interesting event in the space of two or three hours; bring forward the several characters only when each ought to appear.

শেষ-কথা

Develop a plot probable as it is attractive, say nothing unnecessary, instruct the mind and move the heart, be eloquent always and with the eloquence proper to every character represented.

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য

শত বর্ষ পূর্বে প্রকৃত বাংলা সমালোচনার কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য লোকসাহিত্য ও বৈষ্ণবসাহিত্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ সত্য, কিন্তু উহাদের প্রকৃত সমালোচনা খুব বেশী দিনের নয়। তাহা ছাড়া, বাংলা উপন্যাস, ছোট-গল্প, নাটক প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ না ঘটিলে তো আর সাহিত্য-সমালোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না। তাই মৌলিক সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের সহিত তুলনায় বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য সত্যই অনেকখানি অনগ্রসর এবং অপরিণত। তবু তুলনার পরিপেক্ষিতে ইংরাজি সাহিত্যের অপেক্ষা বাংলা সাহিত্যেরই কৃতিত্ব অধিকতর। ইংরাজি সাহিত্যে চসার স্পেন্সার শেক্সপীয়ারের অতুলনীয় সাহিত্যকৃতির বহুকাল পরে তাহাদের গুণগ্রাহী সমালোচকদিগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে, বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টিধর্মী মৌলিক সাহিত্য ও উহার সুনিপুণ রসগ্রাহিতা—এই উভয়ের মধ্যে কালব্যবধান বড়ই কম। বংগভাষার আকাশে নূতন সাহিত্যারুণের উদয়ের সংগে সংগেই উহার কনকরশ্মির প্রতিবিম্বনটি রসগ্রাহী পাঠকের অন্তরে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ফলে বাঙালী সমালোচক আজ পরিণত ও রসগ্রাহী মনোবৃত্তি লইয়া সাহিত্য-রসাস্বাদনে তৎপর।

ভূমিকা

সমালোচনার সংজ্ঞা লইয়া সমালোচকদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব ও মতভেদ রহিয়াছে। যাঁহারা আরোহমূলক সমালোচনার (Deductive Criticism) পক্ষপাতী, তাঁহারা সাহিত্যে গতিশীলতাকে অস্বীকার করিয়া কতিপয় বাঁধাধরা মূলসূত্রের মাপকাঠিতে সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিরীক্ষণ করেন। অবশ্য অবরোহমূলক সমালোচনার (Inductive Criticism) সমর্থকেরা নির্দিষ্ট আইনকানুনের গণ্ডির মধ্যে সাহিত্যকে বাঁধিয়া রাখিয়া উহার গতিশীলতাকে স্তম্ভিত করিবার ঐ দুষ্ট প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেন না। আবার যাঁহারা ছায়ালোচনার (Impressionistic Criticism) অভিলাষী তাঁহারা ব্যক্তির উপরে সাহিত্যের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া সাহিত্যবিচার করিতে চাহেন। ফলে ধার্মিক, রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, 'বিশুদ্ধ'

সাহিত্য-সমালোচনার বিভিন্ন রীতি

রসিক প্রভৃতি বিভিন্ন মনোভংগীসম্পন্ন জনগণের মধ্যে সাহিত্যের মূল্য যাচা লইয়া বাদবিতণ্ডা দেখা যায়। ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগার মানদণ্ডে কাব্য সমালোচকেরা কাব্যবিচার করিতে বসেন বলিয়াই সমভাবে বিচক্ষণ সমালোচকদের মধ্যেও সুতীব্র মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীঅরবিন্দ দিলীপ কুমার রায়ের কাছে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"All criticism of poetry is bound to have a strong subjective element and that is the source of the violent differences in the appreciation of any given author by equally 'eminent' critics" যাঁহারা রসালোচনার (Appreciative Criticism) প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁহারা অবরোহমূলক সমালোচনা ও ছায়ালোচনাকে মিশাইয়া রসানুভূতির স্তরে আনিয়া ঐ অনুভূতি পাঠকমনে সঞ্চারিত করিবার প্রয়াসী এই শ্রেণীর সমালোচকদিগের মতে, সমালোচনার উদ্দেশ্য—ব্যাখ্যা-বিচার নয় রসগ্রহণ ও রসপরিবেশন। আবার যাঁহারা নন্দনতত্ত্বসম্মত সমালোচনার (Aesthetic Criticism) সমর্থক, তাঁহারা পাঠকমনের উপরে সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া এবং ঐ প্রতিক্রিয়াকে নন্দনতত্ত্বের নিয়মানুসারে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। সমালোচ্য বিষয়ের সৌন্দর্য-নিষ্কর্ষ আহরণ করিয়া উহার সহিত 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইয়া নবতর অথচ অনুরূপ এক সৌন্দর্য সংশ্লেষণবৃত্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করাই এই জাতীয় সমালোচনার লক্ষ্য। সাহিত্য-সমালোচনার উল্লিখিত রীতিগুলির মধ্যে একটিতেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচনার আবশ্যকতা স্বীকৃত হয় নাই। অথচ ইতিহাস যখন গতিশীল এবং সেই ইতিহাস যখন সামাজিক ইতিহাস আর সাহিত্যও যখন যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া উহারই পরিপ্রকাশ, তখন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সাহিত্য-সমালোচনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যুক্তিকে অস্বীকার করা চলে না—ইহাই মার্কসীয় সমালোচনার মূলীভূত নীতি। "এ সমালোচনার মধ্যে 'আত্মা' নেই, 'নটবাজ' নেই, 'বিশুদ্ধ' অমৃতরস নেই—এর মধ্যে আছে মানুষের দেহ ও মন, পৃথিবী ও সমাজ, মানুষের শিল্প ও সাহিত্য। অবশিষ্ট যা তা মানুষের নয়, সমাজের নয় সুতরাং মার্কসীয় সমালোচনারও অন্তর্ভুক্ত নয়।"

সাহিত্য-সমালোচনার ঐ বিভিন্ন রীতি যে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের যথাযথ স্তরপরম্পরায় প্রতিফলিত হইয়াছে, এমন কথা বলা চলে না। বরং ইহাই লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন সমালোচককে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রীতির সমালোচনার যুগপৎ পরিপ্রকাশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন যুগের টীকাকারেরা ছিলেন আরোহমূলক সমালোচনার পক্ষপাতী—প্রাক্-নিরূপিত মানদণ্ডের নিরংকুশ প্রয়োগেই ছিলেন তাঁহারা সিদ্ধহস্ত। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য মূলত পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে উদ্ভূত ও বিকশিত হওয়ায়, এই

জাতীয় সমালোচনা-রীতি বড় একটা অনুসৃত হয় নাই। তবে ইহাই লক্ষণীয় যে, 'সাহিত্যে খুন' শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ণচন্দ্র বসু আরোহমূলক সমালোচনা-রীতির প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। পক্ষান্তরে 'নাটক' প্রবন্ধ-রচয়িতা কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'নভেলের শিল্প বা কবিত্ব' প্রবন্ধ-রচয়িতা দেবেন্দ্রবিজয় বসু প্রভৃতি অবরোহমূলক সমালোচনা-রীতির প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃন্ময়ী' প্রবন্ধরচনায় ছায়ালোচনা-রীতি পরিলক্ষিত হয়। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র, 'সমালোচনা-সাহিত্য' প্রবন্ধ-লেখক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, 'বিষবৃক্ষ' প্রবন্ধলেখক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মনোরমা' প্রবন্ধলেখক গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ' প্রবন্ধলেখক রামেশ্বর পাঁড়ে, 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র'-রচয়িতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি রসালোচনা-রীতির সমর্থক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই নন্দনতত্ত্বসম্মত সমালোচনা-রীতির প্রবর্তক। অতঃপর এই রীতিরই মোটামুটি অনুবর্তন করিয়াছেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী, নলিনীকান্ত গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, বিশ্বপতি চৌধুরী প্রভৃতি। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রাচীনের মোহঘোর কাটাইয়া বাংলা সমালোচনা-রীতিকে এক নবতর রূপে রূপায়িত করিবার প্রয়াসী। ইহাই মার্কসীয় সমালোচনা-রীতি। তবে এই রীতির সার্থক ও পূর্ণ অভিব্যক্তি তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার, ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার প্রভৃতি এই নবতর সমালোচনা-রীতির পরিপোষক।

বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন সমালোচনা-রীতি

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, সাময়িক পত্রিকাদিকে অবলম্বন করিয়া, উহাদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছে। তাই দেখি,—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ মে তারিখে প্রথম প্রকাশিত ও পাদ্রী জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক সম্পাদিত 'সমাচার-দর্পণে' তৎকালীন নূতন পুস্তকের সমালোচনা বিদ্যমান। কিন্তু সে তো সমালোচনা সাহিত্যের নিতান্তই শৈশবাবস্থা—অস্ফুট এক কলকাকলী ব্যতীত আর কিছুই নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর' (১৮৩০ খ্রীঃ অঃ), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতিতে যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হইত, তাহা নিছক 'ভালো লাগা মন্দ-লাগা'র কথাতেই মুখর হইয়া উঠিত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্রিকাতেও বাংলা সমালোচনার সন্ধান মিলে। ১২৮০ বংগাব্দের ২১-এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রকাশিত 'মধ্যস্থ' নামক সাপ্তাহিক

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে প্রাক্-বঙ্কিম যুগ

পত্রিকায় লিখিত নাট্যকার মনোমোহন বসুর উক্তি হইতে জানা যায় যে, কালীপ্রসন্ন সিংহই 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' বাংলা সমালোচনার প্রথম পথপ্রদর্শক। এই মাসিক পত্রিকাখানিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ ঠাকুর, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি স্বনামধন্য সাহিত্যকারদের বহু গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিম-প্রভাবের পূর্ববর্তী সমালোচকগণের মধ্যে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা'-রচয়িতা রাজনারায়ণ বসু ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ'-লেখক ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনারায়ণের লেখায় চিন্তাশীলতা এবং অন্তরের দরদ উভয়ই চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে, 'ভূদেবের শুভ্র পরিচ্ছন্ন চিন্তা, পরিমিত সংযত অথচ প্রাঞ্জল ভাষণের ভিতর দিয়া যে রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার উপরেও এই নৈষ্ঠিক সদাচারী হিন্দুত্বের স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে।' সত্য কথা বলিতে কি, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কবি রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাঙালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' শীর্ষক পুস্তিকায় আধুনিক বাংলা সমালোচনার বীজ উপ্ত রহিয়াছে।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের *Calcutta Review* তে বঙ্কিমচন্দ্র 'Bengali Literature' নামে ইংরাজি ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের যে রূপ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ও তৎসম্পাদিত 'বংগদর্শনে'র মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। রসানুভূতি, সৌন্দর্যবোধ, নীতিজ্ঞান, শাস্ত্রানুরাগ, সাহিত্যপ্রীতি—এ সবই বঙ্কিম-প্রবর্তিত সমালোচনা-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। সামাজিক অবস্থার সহিত সাহিত্যের প্রত্যঙ্গ যোগাযোগ তিনি স্বীকার করেন নাই। বহুমুখী পাণ্ডিত্যে, সূক্ষ্ম চিন্তাশীলতায়, জীবন্ত জাতীয়তাবোধে, সুগভীর সমবেদনাযোগে, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ-শক্তিতে 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র মহিমায় খুব উজ্জ্বল না হইলেও গতানুগতিক নয়।........কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা বঙ্কিমের হাতে কোথাও স্বতন্ত্র সাহিত্য-সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই।' 'বংগদর্শন' কেবলমাত্র বঙ্কিম-প্রতিভারই বাহন নয়, ঐ যুগ-প্রতিভারই বাহন। বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ব্যতীত আরও বহু লেখক ঐ পত্রিকায় লিখিতেন। 'বংগদর্শনে'র প্রসিদ্ধ লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনায় পাণ্ডিত্য ও চিন্তার প্রাখর্য পরিদৃষ্ট হয়। চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনায় ভাব এবং ভাবনার অনেকখানি সমন্বয় ঘটিয়াছে। সেই যুগের যশস্বী সাহিত্য সমালোচক হিসাবে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রামদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে বঙ্কিম-যুগ

'বংগদর্শনে'র লেখক নহেন, এমন অনেক সাহিত্য-সমালোচকও বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথেই পরিক্রমণ করিয়াছেন। 'প্রচার' 'সাহিত্য' ও 'নারায়ণ'—এই তিনটি পত্রিকাও সমালোচনা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা দুই একটি সমালোচনা খানিকটা রচনাধর্মী। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনাগুলির মধ্যে কয়েকটি বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল, আবার গুটিকয়েক সুকুমার সাহিত্যিক রচনাধর্মী। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা যেমন শাস্ত্রজ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে ভরপুর, তেমনি স্বকীয় অনুভূতিতে ও কল্পনায় স্নিগ্ধমধুর। বিপিনচন্দ্র পালের সমালোচনায় চিন্তাশীলতার সংগে ব্যক্তিজীবনের হৃৎস্পন্দনের সংযোগ বিদ্যমান।

অতঃপর রবীন্দ্রযুগ। 'ভারতী', 'সাধনা', 'বংগদর্শন' (নব পর্যায়) ও 'সবুজ পত্র'—এই চারিটি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন রসশাস্ত্র হইতে রসদ আহরণ করিয়া বাংলা সমালোচনাকে নবীন সজ্জায় সজ্জিত করিলেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার যাদুস্পর্শে পুরাতন যেন নূতন হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ আজন্মস্রষ্টা বলিয়াই 'লোকসাহিত্য' ও 'প্রাচীন সাহিত্যে'র সমালোচনায় তাঁহার সমালোচক-রূপের চেয়ে স্রষ্টা-রূপই স্থানে স্থানে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আসলে তো রোমান্টিক কবি—তাই এইরূপ হইয়াছে। তবে কবি-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা সমালোচনার আদর্শকে সামান্যই প্রভাবিত করিয়াছেন। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিসাক্ষিক কল্পনাসমৃদ্ধির উপরে খুবই নির্ভরশীল ছিলেন সত্য, কিন্তু সমালোচক হিসাবে তিনি নৈর্ব্যক্তিক। তিনি জানাইতেন,—'কিন্তু মহাকাল বসিয়া আছেন। তিনি ত সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাঁহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোট, যাহা জীর্ণ, তাহা চালিয়া ধুলায় পড়িয়া ধুলা হইয়া যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই সকল জিনিসই টেঁকে, যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। এমনি করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায়, তাহা মানুষের সর্বদেশের সর্বকালের ধন। এমনি করিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির, মানুষের প্রকাশের একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। সেই আদর্শই নূতন যুগের সাহিত্যেরও হাল ধরিয়া থাকে। সেই আদর্শ মতই যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি তবে সমগ্র মানবের বিচারবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।...সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছোট করিয়া দেখিলে প্রকৃত দেখাই হয় না।' অবশ্য ইহাও সবিশেষ লক্ষণীয় যে, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে তিনি উপনিষদের উচ্চবেদীতে বসাইয়া, 'কাদম্বরী' হইতে শুরু করিয়া 'সাহিত্যতত্ত্ব' 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া 'আধুনিক সাহিত্য' সমালোচনায় সেই উপনিষদ ও সংস্কৃত

অলংকারশাস্ত্রেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা এমন সুদৃঢ়ভাবে করিয়া গিয়াছেন যে, রবীন্দ্রপরবর্তী সাহিত্য-সমালোচকেরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উহারই অনুসরণ অনুকরণ করিয়াছেন সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনায় নীরব অর্ঘ্য দান করিয়াছেন সৌন্দর্যতত্ত্বের স্তব গাহিয়াছেন। সমালোচক-দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'রবি-দীপিতা'য় নীরস বাণীভংগীতে উপনিষদের তত্ত্বকথা এবং সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের রসকথা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন আলংকারিকদের শূন্যগর্ভ অমৃতরসের আস্বাদে বিভোর হইয়া তাঁহাদেরই আওতায় ধরা দিয়াছেন। সমালোচক প্রমথ চৌধুরী ও মোহিতলাল মজুমদার—উভয়ের মধ্যে কেহই সেই বাস্তববহির্ভূত রস', যাহা 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ,' তাহার কথা বিস্মৃত হন নাই। প্রমথ চৌধুরী লিখিত 'ভারতচন্দ্রে'র সমালোচনায় ব্যক্তিসাক্ষিক রীতি পরিলক্ষিত হয়। চৌধুরী মহাশয় শব্দসচেতন বাক্যকুশল সুরসিক পুরুষ ছিলেন বলিয়া প্রকাশ্যতই আপনাকে ভারতচন্দ্রের উত্তরসাধকরূপে পরিচয় দিতে পছন্দ করিতেন।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগ

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে মোহিতলালের দান অপরিমেয় অতুলনীয়। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় একদা মোহিতলালের সমালোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দান হিসাবে পরিগণিত হইত। 'Style is the man himself'—তাই সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে তিনি কবি-সাহিত্যিকের ব্যক্তিমানসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন। মোহিতলালের মতে, জাতিগত বিশিষ্ট চেতনাই সাহিত্যকৃতির মূলে বিদ্যমান। সাম্প্রতিক সমালোচকের চোখে নলিনীকান্ত গুপ্তের 'সাহিত্য-সমালোচনার দৃষ্টিভংগী পণ্ডিচেরীর আশ্রম-উদ্ভূত, এবং তাহাকে নির্বিঘ্নে বলা যেতে পারে Supra-conscious Super-soul-এর Super-neurotic অভিব্যক্তি —অতএব সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।' প্রাচীন পুঁথি-সাহিত্যের সমালোচনায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতির দান অবিস্মরণীয়। শশাংকমোহন সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, প্রিয়রঞ্জন সেন, ডক্টর সুকুমার সেন, বিভাস রায়চৌধুরী, ডক্টর মনোমোহন ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র দাশ, ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বিনায়ক সান্যাল, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, ডক্টর মদনমোহন গোস্বামী, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, সাধনকুমার ভট্টাচার্য, অজিতকুমার ঘোষ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু ধীরানন্দ ঠাকুর, ক্ষুদিরাম দাস, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন,

সৈয়দ আলী আহ্‌সান, আশ্‌রাফ সিদ্দিকী প্রভৃতি অধ্যাপকবৃন্দের সমালোচনা-সাহিত্য বেশ পণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণে ও ইংরাজি সমালোচনা-পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ। সাহিত্যের রসবিচারে উঁহাদের সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্ত নিয়োজিত। বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন ব্যাপারে এই অধ্যাপক-সমালোচকগণের রচনাগুলি সর্বজনসমাদৃত।

'পরিচয়' পত্রিকা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিকে এক নূতনতর পথে চালনা করিয়াছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সমাজ ও সভ্যতার সহিত শিল্পের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তো স্বীকার করিয়াছেনই, অধিকন্তু সাহিত্যকে দৈবী প্রতিভার গণ্ডি হইতে সরাইয়া লইয়া পার্থিব আসনে বসাইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি আর এই মনোভংগীর পরিপোষক নহেন। 'চতুরংগ' ও 'কবিতা' পত্রিকাদ্বয়ের সমালোচক-গোষ্ঠী দৈবীশক্তিতে আস্থাশীল নহেন বলিয়াই তাঁহাদের সমালোচনাও সমাজ-সভ্যতার মুখাপেক্ষী। বুদ্ধদেব বসুই এই সমালোচক-গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি তথা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের হাতছানিতে ও রুশিয়ার সাম্যবাদী আদর্শের আকর্ষণে ইঁহারা 'কেবল অনর্গল বিকৃত মনের অনুপ্রেরণা' যোগাইয়া চলিয়াছেন। তবে সাম্যবাদী সমালোচনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়া যাঁহারা সাহিত্যানুশীলন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার প্রভৃতির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের এই নূতন পথটি যে কুসুমাস্তৃত নয়—কণ্টকাকীর্ণ, একথা ইঁহারা ভালভাবেই অবগত আছেন।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে সাম্প্রতিক যুগ

ছোটদের বাংলা সাহিত্য

সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার সেই প্রবীণদল ও বাহক সেই যুবসম্প্রদায়, ইহাদের কল্যাণ, ইহাদের স্বার্থ সমাজকে অবশ্যই দেখিতে হইবে। নচেৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে। কিন্তু আজিকার সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিলেও, আগামী কালের সমাজ ও রাষ্ট্রের রংগমঞ্চে যাহারা যুবসম্প্রদায় ও প্রবীণদলের ভূমিকা অভিনয় করিবে, ফুটনোন্মুখ সেই কিশোর, বালক, শিশুদলের ভবিষ্যৎ গড়িবার উপযোগী ছোটদের সাহিত্য রচনা করা দরকার। কলমের লাঙলে মনের মাটি চষিয়া ভাব ও ভাবনার ফসল উৎপাদন করাই যাহাদের কাজ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিশোর মনের নূতন মাটিকে লইয়াও নিড়ানি দিয়া থাকেন আর তাঁহারাই শিশু-সাহিত্যিক।

ভূমিকা

সাহিত্যরচনার লক্ষ্য লইয়া বাদবিতণ্ডার অন্ত নাই, কিন্তু সকল বাদবিতণ্ডাকে অতিক্রম করিয়া একটি কথা অন্তত স্থায়ী স্বীকৃতি পাইয়াছে যে, সমাজ ও ব্যক্তির

বিকাশ করাই সাহিত্যের কাজ। তাই কচি মনের মাটি কাঁচা বলিয়া ইহাকে লইয়া অনায়াসে একটা পেটেণ্ট ছাঁচের ভিতরে ফেলিয়া রূপ দেওয়া চলে না। ছোটদের সাহিত্যরচনায় কোন বিশিষ্ট আদর্শের সন্ধান, কোন ধরাবাঁধা পথ দেখাইয়া দেওয়ার বিরোধী তাই অনেকেই। এক দিকে যেমন একদল শিশু-সাহিত্যিক মনে করেন, ছোটদের সাহিত্য বলিতে অবাধগতি কল্পনার আকাশ-পরিক্রমা ছাড়া আর কিছুই নয়, অপর দিকে তেমনি আজিকার দিনের রূঢ় বাস্তবের আঘাতে জর্জরিত আর একদল সাহিত্যসেবী জানাইয়াছেন, দুঃখ জিনিষটি জীবনের মর্মমূলে এমন করিয়াই আঘাত হানিয়া থাকে যে, দুঃখের স্বরূপ চিনিয়া প্রকৃত কল্যাণের পথ বাছিয়া লইবার ব্যাপারটি ছেলেবেলা হইতেই প্রয়োজন। কিন্তু কথাটি এই যে, পরিণতবয়স্কের চলার-পথে যে ঘাত-প্রতিঘাতের ঢেউ প্রতি মুহূর্তে উপ ছাইয়া পড়ে, তাহার ভিতরে ছোটদের টানিয়া আনা শুধু যে অর্থহীনই তাহা নয়, অনর্থকরও বটে। পক্ষান্তরে, ছোটদের মনই তো কল্পনাশক্তিপ্রসারের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং এই শিশু অবস্থা হইতেই কল্পনাশক্তির স্ফূর্তি ও পুষ্টি না ঘটিলে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরাট চত্বরে তাহাদিগের দ্বারা পরবর্তী জীবনে কোন বড় সৃষ্টিই গড়িয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং কল্পনার বিস্তৃতি ও ঘনতাই যে ছোটদের সাহিত্যরচনার লক্ষ্য, একথা বলাই বাহুল্য।

ছোটদের সাহিত্য রচনার লক্ষ্য

বৈচিত্র্য লইয়াই জীবন। এক দিকে যেমন প্রাণখোলা নির্মল হাসির মূল্য আছে অপর দিকে তেমনি মূল্য আছে মর্মস্পর্শী কান্নারও। কান্নাহাসি, সুখদুঃখ, আনন্দ-বিষাদের দোলায় না চড়িতে পারিলে মনের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কোনটিরই স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা দেয় না। অপরের বেদনাকে নিজের অন্তরের মাঝে উপলব্ধি করিবার সুযোগ দেওয়াই তো সাহিত্যকারের কাজ। এমনই তো জীবন স্বার্থপরতার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ, ইহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া যদি পরার্থপরতার সমুচ্চ শিখরের দিকে মানুষের লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহা হইলে জীবনের মূল্যবোধও তো ঘটে না। তাই ছোটদের সাহিত্যের উপাদান হিসাবে হাসি ও কান্নার প্রবাহকে অস্বীকার করা চলে না। রাজপুরী হইতে বিতাড়িত ন-রাণী ও ছোটরাণী তাহাদের সন্তান বুদ্ধু-ভূতুমকে লইয়া কাঠ কুড়াইয়া দুঃখের দিনগুলি চোখের জলে ভাসাইয়া দিলেও তাহারা জীবনের সার্থকতার সন্ধানে ছুটিতে কসুর করে নাই। একদিন দেখা যায়, ঐ অবহেলিত বুদ্ধু-ভূতুমই বীরত্বের সাধনা করিয়া লাভ করে অতুলনীয় ঐশ্বর্য, ফিরিয়া পায় পিতার স্নেহ, আনে মায়ের সুখ। জগতে এমনি করিয়াই তো ঘটে অন্যায়ের অবসান, অবিচারের অবলুপ্তি। কল্পনার প্রসার এমনি রকমের বিষয়বস্তুর মধ্যেই তো সব চেয়ে বেশী করিয়া খেলে। এই পথেই চলিয়াছে 'গালিভার', চলিয়াছে 'এলিস', চলিয়াছে 'ডন কুইক্সোট'। আবার 'রাজপুত্তুর' 'কোটালপুত্তুর', 'তিন তিন মিতিন' সবাই চলিয়াছে

এই পথ দিয়াই। সমাজের ক্লেদ, মালিন্য, নীচতার পংকসমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃতের সন্ধান পাওয়া—এই কাজটি বড়দের সাহিত্যে থাকিবে সত্য, কিন্তু ভয়ের প্রতিকূলে নির্ভীকতা, হিংসার প্রতিকূলে ক্ষমা, ক্রোধের প্রতিকূলে প্রেম যেখানে প্রাধান্য লাভ করে, সেখানে ছোটদের মনকে পুষ্ট করিবার উপকরণ যে উহাতে আছে, একথা বলাই বাহুল্য। তাই বিশ্বের কল্যাণ-মুখী সাহিত্যমাত্রকেই—হোক্ না কেন তাহা বড়দেরই জন্য লেখা—ছোটদের উপযোগী করিয়া পরিবেশন করা চলে। ইহার প্রমাণ 'ছোটদের মহাভারত', 'ছোটদের লে মিজারেব্‌ল্,' 'ছোটদের বিষাদসিন্ধু', 'ছোটদের আনন্দমঠ' ইত্যাদি। কিন্তু বস্তিজীবনের জঘন্য পরিবেশ, বাস্তবজীবনের কঠিন সংঘাত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের ঐতিহাসিক অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছোটরা শুধু তাচ্ছিল্য, শুধু অবহেলা, শুধু ব্যথাই লাভ করে, তাহাদের জীবনে 'নীলপাখী'র স্বপ্ন দেখা পরিহাসেরই নামান্তর। তাই ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে, কল্যাণের পথে ঐ সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছোটদের উদ্বুদ্ধ করার যে সাহিত্যিক আদর্শ, তাহাকে একান্তভাবে মানিয়া লইবার দিন আজ আসিয়াছে। মুনাফাখোর কালোবাজারী ধ্বজাধারী কোন ধনীর ছেলে প্রতিবেশী গরীব ছেলেমেয়েদের ব্যথায় সমব্যথী হইয়া যদি মজুত চা'লের খবর সর্বজনসমক্ষে প্রকাশই করিয়া দেয়, তাহাতে ক্ষুদ্রতর পরিবেশে পিতৃদ্রোহিতা প্রকাশ পাইলেও বৃহত্তর পরিবেশে অর্থাৎ সমষ্টির কল্যাণে ছোটর এই যে বীরত্ব—ইহার স্বীকৃতি আজিকার ছোটদের সাহিত্যে ফুটিয়া ওঠা দরকার। এমনি করিয়াই বাস্তব জীবনের সংগে ছোটদের সাহিত্যের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। পৌরাণিক যুগেও তো পুত্র প্রহ্লাদকে পিতা হিরণ্যকশিপুর বিরোধী হইতে দেখিয়াছি। আজই-বা সাহিত্যের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে আমাদের ঘরে ঘরে নব নব প্রহ্লাদের আবির্ভাব ঘোষিত হইবে না কেন?

ছোটদের সাহিত্যের উপাদান

মনে হইতে পারে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। 'চয়ন' ও 'সংগ্রহ' ধরণের যে সকল পুস্তক বিদ্যালয়ে পড়ানো হইয়া থাকে, তাহাদের পদ্যাংশে যদিও-বা কিছুটা সাহিত্যোপভোগের আনন্দ মিলে, গদ্যাংশে তো ইহার আশা দুরাশারই নামান্তর। পাঠ্যপুস্তকগুলির ভাব ও বিষয় এতই সীমাবদ্ধ এবং পাঠনপদ্ধতিও এতই প্রাচীন যে সুপরিসর সাহিত্যের বিরাট্ প্রাংগণে ছাত্রছাত্রীরা আদৌ উপনীত হইতে পারে না। আবার এমনও দেখা যায়, শিশুকে পূর্ণবয়স্ক মানুষের অপরিণত সংস্করণ হিসাবে ধরিয়া নিম্নশ্রেণীর গল্প পরিবেশিত হইয়া থাকে। অধম জাতের সস্তা লোমহর্ষক কাহিনীগুলির বাজে ও সুলভ সংস্করণের প্লাবনে ছোটদের সাহিত্য আজ প্লাবিত। এই কি ছোটদের সাহিত্যের সত্যকার পরিচয়? কিন্তু শিশুমনেরও আছে

পূর্ণতা, আছে ভাববৈচিত্র্য। পূর্ণবয়স্ক মানুষের একটি ছোট অপরিণত সংস্করণ হিসাবে শিশুকে দেখিলেই চলিবে না। শিশু—সে তো পূর্ণ-পরিণত শিশুই। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর—জীবনের এই প্রতিটি স্তরেই আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব বৈচিত্র্য, নিজস্ব পরিপূর্ণতা। ছোটদের সাহিত্যক্ষেত্রেও শিশু, বালক ও কিশোরের মানসিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আলাদা আলাদা তিনটি পূর্ণপরিণত স্তর থাকা প্রয়োজন। আমাদের ছোটদের সাহিত্যে এই বিভাগত্রয় নাই বলিলেই চলে। শিশু ও বাল-সাহিত্য কিছুটা থাকিলেও কিশোরসাহিত্যের অভাব খুবই বেশী। নিখিল বিশ্বের সকল স্থানেই ছোটদের সাহিত্য মোটামুটিভাবে বর্তমান যুগের সৃষ্টি। ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের গোড়ার দিকে ইংরাজিতে ছোটদের সাহিত্যকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করিয়া আমাদের ছোটদের সাহিত্যের উদ্ভব। বিদ্যাসাগরের 'কথামালা', অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ', মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা', মনোমোহনের 'পদ্মমালা' প্রভৃতি ছোটদের পাঠ্য ও 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা','কাদম্বরী', 'রামের রাজ্যাভিষেক', 'টেলিমেকস্' প্রভৃতি আরও একটু বড়দের পাঠ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ পুস্তকগুলির অধিকাংশই উপদেশমূলক এবং ভাষাও বেশ নীরস এবং কঠিন। সে যাই হোক্—আমাদের মাতৃভাষায় ছোটদের সাহিত্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছে শতবর্ষের কিছুটা পূর্বে। গদ্য এবং পদ্য—উভয় রীতিতেই খণ্ডিত বাংলায় ছোটদের সাহিত্য রচিত হইতেছে। ছোটদের মানসিক আহার যাঁহারা বর্তমানে সরবরাহ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিমবংগবাসী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী, অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো), ননীগোপাল চক্রবর্তী, বিমল ঘোষ (মৌমাছি), এবং পূর্ববংগবাসী জসীম উদ্‌দীন, বন্দে আলী মিঞা, গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আশ্‌রাফ সিদ্দিকী, তালিম হোসেন, হাবীবুর রহমান, শওকত ওসমান, আহ্‌সান হাবীব, শামছুন নাহার, হোস্‌নে আরা প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমাদের মাতৃভাষায় ছোটদের সাহিত্যের আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি

শিশুমনের সত্যকার ছবিটি ছোটদের আধুনিক কবিতা অপেক্ষা ছড়াগুলিরই মধ্যে অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীন কালের 'ছেলেভুলানো ছড়া'র পরেই আধুনিক কালে রচিত ছড়াজাতীয় ও অভিনয়াত্মক কবিতা-পুস্তকের নাম করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ', উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ', চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাতের জন্মকথা', গুরুসদয় দত্তের 'ভজার বাঁশী,' যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হিজিবিজি' ও 'হাসিখুসি', সুখলতা রাওয়ের 'পড়াশুনা', সুনির্মল বসুর 'ছন্দের টুংটাং', নজরুল ইসলামের 'ঝিঙে ফুল', গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লাল কালো' প্রভৃতি বইগুলির ছবি যেমন মজার মজার, তেমনি সুন্দর চকচকে। 'অতীতে শিশুপাঠ্য গ্রন্থহিসাবে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

শিশুসাহিত্য

'ঠাকুরমা'র ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রভৃতির খুব সমাদর ছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রাচীন ছড়ারই ন্যায় ঐ প্রাচীন গল্পগুলিও প্রায় অবলুপ্ত। গল্পগুলির লিখনরীতি আধুনিক রুচিসম্মত না হইলেও, শিশুমনের নিকটে ইহার বিষয়বস্তুর আবেদন খুবই বেশী। পক্ষান্তরে, বাংলার পল্লীকাহিনীর সংগ্রহ হিসাবে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনীর বই', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল', ইংরাজি পরিকথার অনুসরণে লিখিত অথবা অনুবাদিত পুস্তক হিসাবে সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই' 'আরও গল্প' ও পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের 'হাসু' ও 'এক পয়সার বাঁশী', বন্দে আলী মিঞার 'চোর জামাই' 'গল্পের আসর' ও 'মেঘকুমারী', আশরাফ সিদ্দিকীর 'কাগজের নৌকা', কাদের নওয়াজের 'দাদুর বৈঠক', শেখ হাবিবুর রহমানের 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' প্রভৃতি বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' প্রকৃতপক্ষে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ নয় সত্য, কিন্তু 'শিশু'র বহু কবিতায় এবং 'শিশু ভোলানাথে'র কয়েকটিতে শিশুমনের ছবি অবিকৃত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শিশুর ছেলেখেলার কথাটি এমনই সস্নেহ কৌতুকের সংগে কবিতাগুলিতে বিবৃত হইযাছে যে, ইহারা বালকদের খুবই উপভোগ্য। সুকুমার রায় চৌধুরীর 'আবোল-তাবোল' আজও অবধি বালকপাঠ্য হাসির কবিতার বই হিসাবে স্বনামধন্য। সুনির্মল বসুর কয়েকটি কবিতাতেও এই সুর লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' সম্ভবত বংগসাহিত্যের একমাত্র সচিত্র লিমারিকের বই। শেখ হাবিবুর রহমানের লেখা 'হাসির গল্প' ও 'সুন্দরবন-ভ্রমণ' বই দুইখানি বালকদের অতি প্রিয়। বালকদের জন্য দেশবিদেশের নানা কাহিনী ছাড়াও নানা দেশের পুরাণ ও উপদেশের গল্পও রচিত হইয়াছে। 'জাতকের গল্প', 'গ্রীক্ পুরাণের কাহিনী' 'ঈশপের গল্প', 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'পুরাণের গল্প', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'মহাভারতের গল্প', 'টুক্‌টুকে রামায়ণ' প্রভৃতির নাম এতৎপ্রসংগে স্মরণীয়। আবার সাঁওতাল, হো প্রভৃতি ভারতীয় আদিবাসীদের কাহিনীও আমাদের ছোটদের সাহিত্যের উপকরণ যোগাইয়াছে: যেমন,—'সাঁওতালী উপকথা', 'হোদের গল্প'। হিন্দুস্থানী গল্পের সংকলনগ্রন্থ 'হিন্দুস্থানী উপকথা' এবং 'আরব্যোপন্যাস', 'আলাদিনের প্রদীপ', 'নাবিক সিন্দবাদ' প্রভৃতি আরবী ফার্সী পুস্তকাদির বাংলা সংস্করণ বালকদিগের নিকটে বেশ উপভোগ্য। প্রিয়ংবদা দেবীর 'পঞ্চুলাল', সীতা ও শান্তা দেবীর 'আজব দেশ' ও 'হুক্কাহুয়া' ইংরাজি গল্প-অবলম্বনে রচিত হইলেও শিশুর মনে, এমন কি বালকদেরও মনে, অফুরন্ত আনন্দের উৎস খুলিয়া দেয়।

বালসাহিত্য

শিশুমনের অপূর্ব ভাববৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় এমন ধরণের কল্পনাপ্রধান

সাহিত্য-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থটির তুলনা বিশ্বসাহিত্যেও পাওয়া দুষ্কর। ইহার সূক্ষ্ম রস পুরোপুরি উপভোগ করিবার ক্ষমতা একমাত্র কিশোরদেরই আছে, শিশুদের নাই। সুকুমার রায় চৌধুরীর 'হ-য-ব-র-ল-ব' ও লীলা মজুমদারের 'বদ্যিনাথের বড়ি' এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। বাংলায় কিশোর-সাহিত্যের অভাব খুব বেশী করিয়া অনুভূত হয়। ছোটদের উপযোগী উপন্যাসসাহিত্য বিশেষ নাই। পক্ষান্তরে, ইংরাজিতে এই শ্রেণীর উপন্যাসের খুবই কদর। অতীতের লেখা 'অনাথ', 'উত্তরাধিকারী'র মত ছোটদের উপন্যাস আজকাল আর দেখা যায় না। শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনে লেখা 'ছেলেবেলার গল্প' কিশোরদের উপযোগী। সুকুমার রায় চৌধুরীর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'ঝালাপালা', রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' ও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ধূপের ধোঁয়া', আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর লাস্ট্‌ বয়্‌' প্রভৃতি নাটক ছোটদের অভিনয়োপযোগী ভাল নাটক। ছোটদের মনে ঐতিহাসিক চেতনা জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে 'রাজকাহিনী', 'রণডংকা', 'তাক্সিয়ার বাহাদুরী', 'বিশে ডাকাত', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর 'ইতিহাসের সোনার পাতা' গ্রন্থগুলি খুবই মূল্যবান। বালসাহিত্যে ও কিশোরসাহিত্যে য়্যাডভেঞ্চার-শ্রেণীর উপন্যাসেরই প্রচলন সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহার দুইটি শ্রেণী—প্রথম, বিদেশী রোমাঞ্চকর কাহিনীর অনুবাদ অথবা অনুকরণ এবং দ্বিতীয়, মৌলিক রচনা। অসম্ভব কাল্পনিক ভৌতিক ধরণের এই গল্পগুলি কল্পনাবিলাসী বাঙালী জাতির পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নয়। এই জাতের সস্তা খেলো বই—যাহাকে ইংরাজিতে বলা হয় 'পেনী ড্রেড্‌ফুল'—তাহা সাহিত্যের দিক দিয়া সত্যই 'ড্রেড্‌ফুল'। বাংলা ও অপরাপর ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সংগে ছেলেদের পরিচিত করাইবার জন্য 'ছোটদের দেবীচৌধুরাণী' বিভূতিভূষণের 'আম আটির ভেঁপু', 'টলষ্টয়ের কাহিনী', 'সেক্‌স্‌পীয়ারের গল্প' প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। গল্প উপন্যাস ছাড়াও 'পোকামাকড়', 'গাছপালা', 'জীবজন্তু', 'গ্রহ-নক্ষত্র', 'বিশ্বপরিচয়', 'জ্ঞানবিজ্ঞানের কি ও কেন', 'বলতো?' প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পর্কিত পুস্তক ও 'পৃথিবীর ইতিহাস', 'সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ', 'পৃথিবীর সেরা সাহিত্য' প্রভৃতি ইতিহাস সম্পর্কিত পুস্তকাদিও ছোটদের সাহিত্যে অল্পস্বল্প দেখা দিয়াছে। নিছক ছোটদের উপযোগী ভ্রমকাহিনী অতি অল্পই আমাদের আছে। এখনও দেশবিদেশের ছোটদের খবর আমরা বড একটা পাই নাই।

কিশোরসাহিত্য

ছোটদের জন্য সাময়িক পত্রিকারও প্রয়োজন। বিভাগপূর্ব বাংলায় প্রথম ছোটদের মাসিকপত্র ছিল প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' এবং ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী'—পরে উভয়ের মিলিত নাম হয় 'সখা ও সাথী'। 'মুকুল', 'সন্দেশে'র পরেই 'মৌচাক', 'শিশুসাথী', 'রামধনু', 'রংমশাল', 'শিশু সওগাত' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার নাম

উল্লেখযোগ্য। সুখের বিষয় পূর্ব পাকিস্তানে 'ঝংকার', 'মিনার', 'হুল্লোড়' প্রভৃতি শিশু মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু মাসিক পত্রিকা কয়েকখানি থাকিলেও ছোটদের দৈনিক সংবাদপত্র খণ্ডিত বাংলার কোন অঞ্চলেই একখানিও নাই। অথচ, সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিশ্বজগতের সংগে বালক ও কিশোরদের পরিচয় হওয়া দরকার। বড়দের খবরের কাগজের অংশবিশেষে যেটুকু আলোচনা থাকে, তাহা আদৌ যথেষ্ট নয়। তবে, একেবারে যেখানে ছোটদের জন্য কোন বিশেষ দৈনিক পত্রিকা নাই, সেখানে এই ব্যবস্থাটিও মন্দের ভালো। কোন কোন বিদ্যালয়ে মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা আছে, কিন্তু তাহা পরিচালনার অভাবে ঠিক ছোটদের সাহিত্যের উপকরণে সমৃদ্ধ নয়। আবার এমন বিদ্যালয়ও দেখা যায়, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করিবার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে বাধাই সৃষ্টি করা হইয়া থাকে।

ছোটদের সাময়িক পত্রিকা

আজিকার এই স্বাধীন পাক্-ভারতে ছোটদের মনকে যদি শিশু হইতে বালক, বালক হইতে কিশোর অবধি সুপথে পরিচালিত ও গঠিত না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশের মানবসম্পদই হইবে ক্ষতিগ্রস্ত। এই কথাটি স্মরণ করিয়া যদি আমরা ছোটদের সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হইতে পারি, তবেই হইবে দেশের কল্যাণ। অবশ্য একথাও ঠিক যে, ছোটদের মনের খাদ্য পরিবেশনকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে মানসিক অজীর্ণরোগেরও রহিয়াছে সম্ভাবনা।

শেষ কথা

বংগসাহিত্যে মহিলা-শিল্পীর দান

মানবজীবনে আছে বহুবিচিত্র সমস্যা, আছে জটিল মনস্তত্ত্ব, আছে সীমাহীন প্রশ্ন ও মীমাংসা। এইগুলি লইয়াই তো সাহিত্যের ব্যাপক আয়োজন। এক দিকে বাস্তবানুভূতি এবং অপর দিকে ভাবকল্পনাকে অবলম্বন করিয়াই তো কবি-সাহিত্যিক মানবজীবনের কান্নাহাসি, বিরহমিলন, সুখদুঃখের মালাখানি গাঁথিয়া যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের জীবনসমস্যার উপরে আলোকপাত করেন। কবি যে কাব্য রচনা করেন, ঔপন্যাসিক যে উপন্যাস রচনা করেন, নাট্যকার যে নাটক রচনা করেন—সে সবেরই কেন্দ্রমূলে রহিয়াছে ঐ জীবনই। অন্তহীন কালতরংগের বিচিত্রবিপুল গতিভংগীর সংগেই তো ঐ বিকশিত সাহিত্যশতদল ভাসিয়া চলিয়াছে বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া অনাগত ভবিষ্যতের পানে। কিন্তু ঐ যে সাহিত্য-শতদল—উহার মর্মমূলে রসের যোগান দিয়া আসিতেছে নর ও নারী উভয়েই। সাহিত্যের উপজীব্য এই যে মানবজীবন—ইহাকে নর যে

ভূমিকা

ভাবে দেখে, ঠিক সেই ভাবেই দেখে না নারী। উভয়ের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে—পরিমাণগত না হোক, মাত্রাগত তো বটেই—একটা ব্যবধান বিদ্যমান। সুতরাং নারীসমাজের প্রতি কৃপালাঞ্ছিত মনোভাব বা মহিলাদের শিল্পচেতনার প্রতি বিস্ময়-উপেক্ষা-মিশ্রিত দৃষ্টিভংগী লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাদের দানের সম্যক মূল্যবিচার করিবার অবকাশ নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যের বিরাট্ আয়োজনে পুরুষের সহিত তুলনায় নারীর দান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু নারীহৃদয়ের যে বিশেষ অনুরণনটুকু মহিলা-শিল্পীদের শিল্পচেতনায় ধরা পড়িযাছে, তাহার মূল্যও তো কম নয়। তাই বাংলা সাহিত্যে মহিলা-শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির মূল্য বিচার করিবার যুক্তি অস্বীকার করা চলে না।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কাব্য ও গল্প-উপন্যাসেই মহিলা-শিল্পীর দান সর্বাধিক। অগণিত কাব্য-কবিতায় বাংলার মহিলা-শিল্পী আপনার প্রাণের কথা উজাড করিয়া দিয়াছেন। নারীর কথা, নারীর হৃদয়, নারীর আশা-আকাংক্ষা, নারীর বেদনা কাব্য-কবিতায় যেমন করিয়া স্ফূর্ত হইয়াছে, এমনটি কোন বিভাগেই পরিদৃষ্ট হয় না। প্রসংগত, ইহাও সবিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মহিলা-কবিদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকই দীর্ঘকাল পতিসংগসুখ পাইয়াছেন। অধিকাংশ মহিলা-কবিই পতিহীনা। এমনও দেখা যায় যে, সধবা অবস্থায় অনেক মহিলা-কবির কাব্যপ্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটে নাই। পতিবিরহকাতরা রমণীর মর্মবেদনাই কবিত্বের রূপে-রসে ভরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই বাংলার মহিলা শিল্পীর অন্তরদেশ মথিত করিয়া উঠিয়াছে—গভীর নৈরাশ্যের হলাহল, অন্তহীন বিষাদের অবিরাম তরংগ। আবার ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ-বা পুত্র-কন্যাকে হারাইয়া ব্যক্তিগত শোকবেদনার প্রবল বন্যায় বংগসাহিত্যভূমিকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছেন। গল্পে-উপন্যাসে নারী-শিল্পীর স্বকীয়ত্বের ছাপ তেমন ফুটিয়া ওঠে নাই। প্রবন্ধ ও নাটক রচনার ক্ষেত্রে মহিলা-শিল্পীর দান নিতান্তই নগণ্য—বিশেষ করিয়া শেষোক্তের বেলায় তো বটেই। বংগসাহিত্যের এই দুইটি বিভাগে বংগনারীর কণ্ঠ ও সুরের পরিচয় একরূপ নাই বলিলেই চলে। তাই 'মেয়েরা যদি তাদের বিশেষতর আনন্দ বেদনার অনুভূতিগুলিকে নিজস্ব ঢঙে সাহিত্যে রূপ দিতে পারতো, তা হলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হতো এবং লেখিকাও যথার্থ সিদ্ধিলাভ ক'রত।'

বংগসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে মহিলা-শিল্পীর অবদান

বংগের মহিলা-কবিদের কাব্যপ্রবাহের দুইটি ধারা—একটি, প্রাচীন এবং অপরটি, নবীন। এক দিকে যেমন সেকালের বাংলা কবিতার পয়ার ছন্দ, সেকালের সামাজিক সংস্কার, সেকালের আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব বিদ্যমান, অপর দিকে তেমনি

উনবিংশ শতাব্দীর কৃষ্টি, সমাজ-সংস্কার, দেশপ্রেম প্রভৃতির পরিচয়ও বর্তমান। বংগের মহিলা-কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান দিতে হইবে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূতা রামীকে। তাঁহার পদাবলীতে চণ্ডীদাসের ন্যায় মর্মবিদারী গভীরতা ও অন্তর্গূঢ় তন্ময়তা না থাকিলেও একটা সরল অকৃত্রিম প্রেমের আর্তি তাঁহাকে আন্তরিকতার সুরে ভরিয়া তুলিয়াছে। ইহার পরেই সম্ভবত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে আবির্ভূতা কবি চন্দ্রাবতীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রাবতীর গান পূর্ব-ময়মনসিংহে বহুলপ্রচারিত। মনসা দেবীর কথা এবং অসমাপ্ত রামায়ণ-কাব্য ছাড়াও কবি চন্দ্রাবতী 'মহুয়া', 'কেনারাম' প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মহিলা-কবি আনন্দময়ীর লেখা বিবাহ অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সম্পর্কিত গানগুলি সহজ আন্তরিকতার সুরে ভরপুর। আনন্দময়ীর সমসাময়িকা গংগাদেবীও বিবাহকালে গেয় বহু মংগল-গানের রচয়িত্রী। বংগের মহিলা-কবিদের কাব্যপ্রবাহের ইহাই প্রাচীন ধারা।

বংগের মহিলা-কবিদের কাব্য-প্রবাহের দুইটি ধারা—
(১) প্রাচীন ধারার পরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে সুরু করিয়া বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তক এই প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া বংগসাহিত্যের এক গৌরবময় কাল। য়ুরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে বিশেষভাবে পড়িয়াছে। আবার রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যসভায় বংগসাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বংগের মহিলা-কবিদের কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও বড় কম নয়। গদ্যসাহিত্যের দিক দিয়াই স্বর্ণকুমারী দেবীর সমধিক প্রসিদ্ধি সত্য, কিন্তু তাঁহার সংগীত এবং কবিতাপুস্তকের সংখ্যাও বড় কম নয়। তাঁহার লেখা 'গাথা' তো 'কথা-কবিতা'—ইহার বিষাদ-করুণ গল্পগুলি বংগসাহিত্যের অমূল্য বস্তু। তাঁহার প্রণয়-কবিতাগুলি রসমধুর। মানবজীবন যে কাব্য-কবিতার অবলম্বন, এই কথাটি প্রসন্নময়ী দেবীর প্রত্যেকটি কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে। শতবর্ষ-পূর্ববর্তী সমাজচিত্র, নারীজাতির পক্ষে অকল্যাণকর কৌলীন্য ও দেশাচারের ছবি তাঁহার কবিতায় মিলে। অবিবাহিতা নারীজীবনের ভাব ও ভাষা তাঁহার 'কুমারী-চিন্তা' কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত। 'শিশুর হাসি' যে এ জগতে অতুলনীয় সামগ্রী, ইহা কবি প্রসন্নময়ী তাঁহার কবিতায় ফুটাইয়াছেন। আবার তাঁহার কবিতায় স্বদেশপ্রীতিরও আভাষ পাওয়া যায়। পতিবিরহিণী বেদনাবিহ্বলা কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীর লেখা 'অশ্রুকণা' সম্পর্কে ৺চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—'This is poetry in life and as expression of that poetry Asrukana is the history of the soul of a noble Hindu woman.' তাঁহার লেখা 'চোর' কবিতায় মাতৃহৃদয়ের

অনবদ্য ছাপ পড়িয়াছে। কবি কামিনী রায়ের কবিতাগুলি লিরিকতাময়—স্বদেশপ্রীতি, সমাজসেবা ও প্রণয়বিহ্বল নারীহৃদয়ের রহস্যময় বর্ণালীতে

(২) নবীন ধারার পরিচয়

ইহারা সমৃদ্ধ। সমাজের নিপীড়িতা পতিতা নারীদের বেদনায় তিনি বিমথিতা। ইংরাজ-কবি বার্ণস্‌-এর ন্যায় তাঁহার কবিতায় বেদনাকরুণ উচ্ছ্বাস উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার প্রণয়-কবিতাগুলি অতীব বিষাদময়। আবার কবি কামিনী রায়ের মাতৃহৃদয়ের আলেখ্য 'গুঞ্জন' নামক কবিতাপুস্তকের মধ্য দিয়া সুমধুর ছড়ার সুরে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কবিতার মূল সুর—আশা, বিশ্বাস এবং আশ্বাস। মানকুমারী বসুর কবিতায় অবগুণ্ঠিতা লজ্জাবনতা সংকুচিতা বংগমহিলার হৃদয়ের কথা ফাটিয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমসৃষ্টি ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া কবি মানকুমারীর লিখিত কবিতায় নারীজীবনের অনবদ্য মর্মকথা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, তাঁহার কবিতাবলী সমাজ ও প্রকৃতির চিত্রে, জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার সুরে, শিশুপ্রকৃতির গুঞ্জনে, ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠায় সমৃদ্ধ। তৎকালীন কুলীন কুমারীগণের মর্মবেদনা কবি মানকুমারীর আর্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বাঙালীর মেয়ে' শীর্ষক কবিতার প্রতিবাদে কবি মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় 'বাঙালীর বাবু' শীর্ষক যে ব্যংগ-কবিতাটি তৎকালে রচনা করেন, তাহা সে যুগের বাঙালী বাবুদের জীবন্ত চরিত্রালেখ্য হিসাবে যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছিল। কবি পংকজিনী বসুর অধিকাংশ কবিতাই জীবনমৃত্যু-সমস্যা লইয়া বিরচিত। 'A thing of beauty is a joy for ever'—কথাটি কবি পংকজিনীর 'সৌন্দর্য মহান্‌' কবিতায় সার্থক রূপ পাইয়াছে। এক দিকে লাঞ্ছিতা নারীসমাজকে লক্ষ্য করিয়া বিরচিত 'তাই দলে পায়' এবং অপরদিকে মেরুদণ্ডবিহীন, বিলাসী অকর্মণ্য পুরুষসমাজকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত 'বাঙালীর ছেলে'—এই দুইটি কবিতা কবি পংকজিনীর দরদী দেশাত্মবোধময় হৃদয়ের অপূর্ব পরিচয় বহন করে। শোককাব্য 'প্রবাহ'-রচয়িত্রী কবি সরলাবালা সরকারের 'পাসাণী', 'ভিক্ষা,' 'মনে রেখো' ইত্যাদি কবিতাগুলি পড়িবার কালে Cowper-এর 'On the receipt of my Mother's Picture' কবিতাটির কথা মনে জাগে। বিধবা রমণীর মর্মবেদনা তাঁহার 'চিতায় চিতায়' কবিতাটিতে সুপরিস্ফুট। সুগভীর নৈরাশ্য, নশ্বরতা ও হাহাকারই কবি প্রিয়ংবদা দেবীর কবিতার প্রাণ। তাঁহার কবিতাগুলি লিরিক—বেশীর ভাগই ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথায় সমৃদ্ধ। সত্যই 'The poet is principally occupied with herself'. রাজকুমারী অনংগমোহিনী দেবী 'স্বামীর স্মৃতিতে' রচিত 'শোক-গাথার' প্রতিটি কবিতায় মর্মস্পর্শী বেদনা প্রকাশ করিলেও, 'প্রীতি' কাব্যখানিতে তিনি জাগতিক শোকদুঃখবেদনার ঊর্ধ্বে বিশ্বজনীন প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত

হইয়াছেন। কবি সুরমাসুন্দরী ঘোষের কবিতায় ছন্দ, শব্দ, ভাব ও বাক্যবিন্যাসের দিক দিয়া রবীন্দ্র-প্রভাব সুপরিস্ফুট। তাঁহার লেখা 'বংগজননী' কবিতাটি স্বদেশ-প্রীতির ভাববন্যায় উচ্ছ্বসিত। কবি কুসুমকুমারী দাশ ছোটদের সাহিত্যের একজন যশস্বিনী লেখিকা। বাঙালীর ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি শুনাইয়াছেন উদ্যম ও উৎসাহের বাণী। তাঁহার লেখা 'খোকার বিড়ালছানা', 'দাদার চিঠি' প্রভৃতি কবিতাগুলি শিশুমনের সহ-অনুভূতি স্বতই আকর্ষণ করে। কবিত্বে ও আধ্যাত্মিকতায় মহিলা-কবি অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তার কাব্যগুলি সমৃদ্ধ। তাঁহার লেখা 'বংগকুলনারী' কবিতায় সেকালের বংগনারীদের একটি জীবন্ত চিত্র বিদ্যমান। মহিলা-কবি বেগম রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসায়নের কবিতায় দরদী প্রাণের সুস্পষ্ট পরিচয় মিলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়,—"কবি হেমলতার দৃষ্টিকোণ দূরাবস্তারী নয়, তাঁহার কবিতা অসীমের সন্ধানে উন্মুখ হইলেও একটি কেন্দ্রের মধ্যে রহিয়াছে সীমাবদ্ধ। এক কথায় বলা চলে—তিনি আদর্শবাদী ও আধ্যাত্মিক কবি, তাঁহার বিশ্বাস—'God's in His Heaven, all's right with the world." কবি নিরূপমা দেবীর কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট সত্য, তবু ছন্দের ঝংকারে, শব্দচয়নের নৈপুণ্যে, ভাবের নূতনত্বে ও অন্তরের প্রেরণায় তাঁহার স্বকীয় প্রতিভা প্রকটিত। বেদনার মধ্য দিয়াও যে প্রেম জয়যুক্ত হইতে পারে, ইহা নিরুপমা দেবীর কবিতায় সুপ্রকাশিত। মহিলা-কবি লীলা দেবীর কবিতায় আছে সহজ স্বাভাবিকতা, আছে সংযত সৌষ্ঠব, আছে প্রসাদগুণ। পেলব ভাষা, মধুর ভাব, মৃদু গীতলহরী থাকায় তাঁহার কবিতাগুলি মনের মধ্যে আনন্দের রেশ সঞ্চারিত করে। মহিলা-কবিদের মধ্যে রাধারাণী দেবীই বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠা রূপে পরিগণিত। ইনিই আবার 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্মনাম লইয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রকৃতির এক কবি-প্রতিভা দেখাইয়া আমাদিগকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়াছেন। রাধারাণী দেবীর কবিতায় অন্তর-বেদনার আনন্দরূপ প্রকাশটি বড়ই করুণ, অথচ যেন কোন্ সুদূরের বাঁশীর প্রতিধ্বনি-সদৃশ; পক্ষান্তরে, অপরাজিতা দেবীর কবিতা নবপরিণীতা তরুণীর জীবন-ছন্দে ছন্দিত, বংগনারীর বহুবিচিত্র মূর্তির অনবদ্য রূপায়ণে সমুজ্জ্বল। সর্বোপরি, অপরাজিতা দেবীর 'বিচিত্ররূপিণী' গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রসম্মত নায়িকার আটটি অবস্থা আধুনিক কালের জীবনে যে ভংগীতে আরোপিত হইয়াছে, তাহা সত্যই অভূতপূর্ব। বাংলা সাহিত্যের ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। মুসলমান মহিলা-কবি নূরুন্নাহারের 'অগ্নিফসল' কাব্যগ্রন্থখানি ভাবে ভাষায় ও ছন্দে সত্যই অনবদ্য। অবশ্য সুফিয়া কামাল, শাহেদা খানম্, জাহানারা আরজু হোসনে আরা, তহমিনা বানু প্রভৃতি মুসলমান মহিলা-কবিদের দানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মহিলা-কবি স্বর্গতা

উমা দেবী ছোটখাট সুখদুঃখবিজড়িত এই ছোট্ট জীবনটুকুর প্রাত্যহিক রূপচিত্র সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির বলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ইহা এক নূতনতর দৃষ্টিভংগী সন্দেহ নাই। বর্তমান শতাব্দীতে অনেক মহিলা-কবিই কাব্য-কবিতা রচনা করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা প্রকৃতই কোন্ পথে পরিণতি লাভ করিবে, সে বিষয়ে এখনও কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

বংগসাহিত্যে মহিলা-ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের মূল্য বিচার করিবার কালে দেখিতে হইবে দুইটি দিক—একটি, সাহিত্যিক উৎকর্ষ এবং অপরটি, নারীর সুর-বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সমাজব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তন নয়—ইহারই মধ্যে নারীর ন্যায়সংগত অধিকার-দাবি—ইহাই নারীর বাণী। পুরাতন যৌথ পরিবার-প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় নারী পাইয়াছে এক ব্যাপক মুক্তির আস্বাদন, সংকুচিত ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ—ইহাই নারীর জীবনাভিব্যক্তি। বংগীয় সমাজে নিঃসম্পর্কীয়া নারীর সংগে পুরুষ ঔপন্যাসিকের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ বড়ই কম, পক্ষান্তরে মহিলা ঔপন্যাসিকের সুযোগ বড়ই বেশী। তাই মহিলা-রচিত উপন্যাসে নারীর সুরবৈশিষ্ট্য থাকিবারই কথা। স্বর্ণকুমারী দেবী মহিলা-ঔপন্যাসিকদের প্রথম পথপ্রদর্শিকা কিনা জানি না, তবে উপন্যাস রচনার উৎকর্ষ ও পরিমাণের দিক দিয়া তাঁহাকেই মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে স্বর্ণকুমারীর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না—তবে সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে বাস্তব-রস-সমৃদ্ধি ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য লেখিকার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস 'কাহাকে'র ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, বইখানির প্রথম হইতে শেষ অবধি নারীহস্তের কোমলপেলব লঘুমধুর স্পর্শ বিস্তৃত।

মহিলা-ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের মূল্যবিচারের সূত্র—স্বর্ণকুমারী দেবী

অতঃপর মহিলা-রচিত উপন্যাস দুইটি বিপরীতমুখী প্রবাহের সম্মুখীন হইয়াছে। এক শ্রেণীর মহিলা-ঔপন্যাসিক হিন্দু সমাজের প্রতি আক্রমণ ও সমালোচনা সহিতে না পারিয়া ইহার সনাতন বিধি-নিষেধ ও চিরাগত আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন। অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী এই শ্রেণীরই প্রতিনিধিস্থানীয়া। অপর শ্রেণীর মহিলা ঔপন্যাসিক নারীহৃদয়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘাত এবং ইহার মাঝে পরিবর্তনের তরংগ-চাঞ্চল্য তথা নারীসমাজে আধুনিক মনোবৃত্তির প্রতিবিম্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সীতা দেবী ও শান্তা দেবী এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয়া।

মহিলা-রচিত উপন্যাসের দুইটি বিপরীতমুখী ধারা

নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবীর আদর্শ, মনোভংগী, জীবনরসরসিকতা ও বিশ্লেষণপদ্ধতি প্রায় একই রূপ। তবে সৃষ্টিশক্তিতে অনুরূপা দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও কলাকৌশলে চিত্তবিশ্লেষণে নিরুপমা দেবীরই শ্রেষ্ঠত্ব। নিরুপমা দেবীর "সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, সুকুমার চিন্তাশীলতা ও জীবন-সমালোচনার অন্তর্নিহিত একটি কোমল করুণ ভাব তাঁহার নারীহস্তের লঘু স্পর্শটি চিনাইয়া দেয়!......'দিদি' নিরুপমা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।.........সুরমার মত এমন সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে পরিকল্পিত, প্রতি অংগভংগীতে জীবন্ত, প্রাণের নিগূঢ় স্পন্দনে লীলায়িত চরিত্র বোধ হয় বংগ-উপন্যাসে নারী-জগতে দুর্লভ।" ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় অনুরূপা দেবীর স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায় না—সামাজিক উপন্যাসেই তাঁহার শক্তিপ্রাচুর্য সুপরিস্ফুট। তাঁহার 'মা' উপন্যাস সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তবে 'মহানিশা' ও 'গরীবের মেয়ে'র ভাবগভীরতা না থাকিলেও, কতিপয় অনন্যসাধারণ গুণের জন্য 'মন্ত্রশক্তি'ই অনুরূপা দেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। শেষোক্ত "উপন্যাসে লেখিকা জীবনের উপর বেদমন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বাস্তব জীবনের সহিত রোমান্সের এক অভিনব সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। ইহাই 'মন্ত্রশক্তি'তে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব।" তাঁহার 'পথহারা' উপন্যাসের ভিত্তিমূলে রহিয়াছে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রের অতীব পরিচিত বিপ্লববাদ। রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশালতার পরিবেশেও এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসাবলীতে পুরুষশিল্পীসুলভ মন্তব্যের প্রাচুর্য ও বিশ্লেষণ-পাণ্ডিত্য থাকিলেও, ব্রজরাণী নীলিমা বাণী উৎপলা প্রভৃতি নারীচরিত্রের বিকাশ-ব্যাপারে নারীহস্তের সুকোমল স্পর্শ স্বতই অনুভূত হয়। এই নিরুপমা-অনুরূপা ধারারই অনুবর্তনের মধ্যে পড়েন ৺ইন্দিরা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষজায়া, মাজেদা খাতুন, তহমিনা বানু প্রভৃতি।

একটি ধারার পরিচয়

বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতা, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, সভ্যতা-ভব্যতা ইত্যাদির সংঘাতে আমাদের সমাজে যে জটিলতার অবির্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাকেই প্রেম ভালবাসা প্রভৃতি মানুষের সুকুমার অনুভূতিগুলির ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে রূপায়িত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সীতা দেবী ও শান্তা দেবীই অগ্রণী। সীতা দেবী বেশ কয়েকটি ছোট-গল্প ও অল্প কয়েকটি উপন্যাস লিখিয়াছেন। 'রজনীগন্ধাই' এই লেখিকার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'স্ত্রীজাতির পক্ষ হইতে, তাহাদের অন্তর্দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করিবার জন্য উপন্যাস লিখিলে কিরূপ নূতন আর্টের সৃষ্টি হইতে পারে, 'রজনীগন্ধা' তাহার একটি চমৎকার

অপর ধারার পরিচয়

দৃষ্টান্ত।......নারীর হাতে চিত্রতুলিকা থাকিলে পুরুষের ভাগ্যে এইরূপ বিরল বর্ণবিন্যাস খুব স্বাভাবিক।...নারীর দিক হইতে প্রেমের তীব্র, অপ্রতিরোধনীয় প্রভাবের এরূপ বিবরণ বাংলা উপন্যাসে বিরল এবং ইহাই উপন্যাসটির গৌরবময় বিশেষত্ব।' শান্তা দেবী লিখিত ছোট-গল্পাদির মধ্যে মনোবিশ্লেষণ ও হৃদয়বৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতের দিক দিয়া 'পরাজয়' গল্পটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। শান্তা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চিরন্তনী'র সংগে সীতা দেবীর ঐ 'রজনীগন্ধা'র এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে মহিলা ঔপন্যাসিকের অবদানের বৈশিষ্ট্য 'চিরন্তনী'তে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীতা ও শান্তা দেবীর যুগ্ম রচনা 'উদ্যানলতা' উপন্যাসখানিতে লিখনভংগীর ঐক্য থাকায় যে সুখপাঠ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাবগভীরতার দিক দিয়া আদৌ সমৃদ্ধ নয়। আশালতা সিংহ, আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, অমলা দেবী, বাণী রায়, আভা গুপ্তা প্রভৃতি এই সীতা-শান্তা কর্তৃক সূচিত ধারারই মধ্যে পড়েন।

বাংলা প্রবন্ধ, নাটক, প্রহসন, জীবনবৃত্তান্ত, ভ্রমণবৃত্তান্ত ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহিলা-শিল্পীর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। নারীর কথা, নারীর জীবনবাণী, নারীর আশা-আকাংক্ষা বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগগুলিতে সেরূপ স্বতঃস্ফূর্ত হয় নাই। প্রথম মহিলা নাট্যকার কামিনীসুন্দরী দেবীর লেখা 'উর্বশী' নাটক, শ্রীমতী রাসসুন্দরীর লেখা 'আমার জীবন' আত্মজীবনী, স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা 'কনে-বদল' ও 'পাকচক্র' প্রহসন, 'নিবেদিতা' ও 'দিব্যকমল' নাটক, 'কৌতুকনাট্য ও বিবিধকথা', প্রসন্নময়ী দেবীর লেখা 'উত্তর-ভারত ভ্রমণকাহিনী', 'সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র' ও 'তারা-চরিত' জীবনবৃত্তান্ত, কামিনী রায়ের লেখা 'সিতিমা' গন্থ-নাটিকা ও 'শ্রাদ্ধিকী' জীবনবৃত্তান্ত, মানকুমারী বসুর লেখা 'বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা' প্রবন্ধ, বীরবল-পত্নী ইন্দিরা দেবীর লেখা 'নারীর উক্তি' প্রবন্ধপুস্তক, অনুরূপা দেবীর লেখা 'সাহিত্য ও সমাজ' প্রবন্ধ, শরৎকুমারী চৌধুরাণীর লেখা স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী, সরলা দেবী চৌধুরাণীর লেখা 'কালীপূজায় বলিদান ও বর্তমানে ইহার উপযোগিতা' প্রবন্ধ, নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (সরস্বতী) রচিত 'নারীধর্ম' ও 'গার্হস্থ্যধর্ম সন্দর্ভ, প্রফুল্লময়ী দেবীর লেখা 'ধাত্রী পান্না' নাটক, সরযূবালা সেনের লেখা 'অন্নপূর্ণা' একাংকিকা, মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা 'চিত্তছায়া', 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' ও 'কবি-সার্বভৌম' নামে রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতি রচনা বাংলা সাহিত্যের ঐ বিভাগগুলিতে মহিলা-শিল্পীর দানের স্বরূপনির্ণয়ে খানিকটা সাহায্য করে এইমাত্র। বর্তমানে এই দিকগুলিতে যে কয়েকজন মহিলা শিল্পী তাঁহাদের

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে মহিলাশিল্পীর দান—উপসংহার

রচনাশক্তিকে কিছুটা নিয়োজিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ডক্টর সতী ঘোষ, ডক্টর উমা দেবী, বাণী রায়, কমলা কাশ্লিলাল, সুচরিতা রায় প্রভৃতি। শিক্ষা-দীক্ষায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে আধুনিক বংগমহিলারা যখন পুরুষের সমকক্ষতা দাবি করিতেছেন এবং সে দাবি যখন অতীব স্বাভাবিক বলিয়া আজ সর্বজনস্বীকৃতও বটে, তখন বংগসাহিত্যে মহিলা-শিল্পীদের আবির্ভাব হোক্ সুন্দরতর, তাঁহাদের কৃতিত্ব হোক্ মহীয়ান্, তাঁহাদের জীবনদৃষ্টি হোক্ গভীর ব্যাপক।

ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ

"আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে
জ্যোৎস্না-তারায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সূর্য্য চন্দ্র ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা।"

ভূমিকা

বিশ্বকবির ভাবকম্প্রকণ্ঠে এই তো নারী-প্রশস্তি। কিন্তু এই মহীয়সী নারীর মহিমা কোথায়? কমনীয় তনুর স্নিগ্ধ লাবণ্য, নারীর অন্তরের স্বচ্ছন্দ প্রীতিপীযূষধারা আর পুরুষের কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটা—এই তিনটির ভাবসম্মেলন নারীর অম্লান মহিমার পরিমণ্ডল করেছে রচনা। বিশ্বের সমস্ত দেশে তথা সর্ববিধ সামাজিক পরিবেশের ভিতরে নারী 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'-রূপে পুরুষের চিত্তে অধিষ্ঠিতা। জৈব আকর্ষণ-লালিত কল্পনা-বিলাস নারীকে দেখেছে উদ্দাম লীলাসংগিনীরূপে। পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক—সমস্ত কর্তব্যের নিগড় থেকে মুক্তি পেয়ে নারী আজ 'বিকশিত বিশ্ববাসনার অরবিন্দ মাঝখানে' চরণ করে দিয়েছে প্রসারিত। মিস্ মেয়ো প্রমুখ নারীহিতৈষিণীদের প্ররোচনায় ভারতীয় নারীও তার সনাতন কল্যাণ-আদর্শের অনুপম বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হয়ে দায়িত্বহীন আত্মস্বাতন্ত্র্যের জয়গানে হয়ে উঠেছে মুখর।

ভারতীয় নারী ও ভারতীয় সমাজাদর্শ

ভারতীয় নারীর জীবনাদর্শের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে হলে ভারতীয় সমাজ-জীবনের ভাবাদর্শ বুঝা প্রয়োজন। বর্ণাশ্রম-বিভক্ত ভারতীয় সমাজ প্রতিটি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল তার ব্যষ্টিরূপ দেখেনি। মানুষের সত্তা সেখানে দ্বৈপায়ন হয়ে সমাজের সমষ্টি-বোধকে এবং সংহতিকে ব্যাহত করেনি। হৃদয়ের অনুশাসন যদি সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী হত, তবে সে উচ্ছ্বাস চিত্ত থেকে হত নির্বাসিত। তাই সমাজের মংগল-শৃংখলা ভংগ করে উচ্ছৃংখল আত্মচেতনা, দায়িত্বহীন আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ আর উৎকেন্দ্রিক ভাবাতিরেক ছিল নিন্দনীয়। ভারতীয় সমাজ

ছিল সুসংহত ও সমগ্রতার সামঞ্জস্যে মহীয়ান্ জীবনের পূজারী। তাই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—ভারতীয় সমাজজীবনে মানুষের সকল অভীপ্সার এই পরিপূর্ণ সার্থকতার ছিল অবকাশ। সত্য শিব ও সুন্দরের সংহত সাধনার পরিবেশ রচনা করে ভারতীয় সমাজ নারী ও পুরুষের জীবনাদর্শকে স্বসমাপ্ততার পংকশয্যা থেকে উদ্ধার করে সমাজচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে।

ভারতীয় নারীর মহিমামণ্ডিত আদর্শ সত্যই জগতে দুর্লভ। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর মত নারী শুধু ভারতমাতার গুঞ্জরণেই হয়ে উঠেছে পরিপুষ্ট। ভারতীয় নারীর গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য জগতের নারীসমাজের ঐতিহ্যকে করেছে ম্লান।

সতীত্ব ও পাতিব্রত্য

ভারতীয় নারী শুধু লীলাসংগিনী নয়, ভারতীয় নারী সহধর্মিণী, সে 'পত্নী'। ভারতীয় নারীর আদর্শ শুধু উর্বশী নয়, লক্ষ্মীও। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য জীবনের সামগ্রিক সম্পূর্ণতায়। শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—ভারতীয় নারী একাধারে এই পঞ্চরসেরই আশ্রয়। ভারতীয় নারীর বৈচিত্র্যময় জীবনাদর্শের মর্মবাণীই হচ্ছে তার সতীত্ব ও পাতিব্রত্য। এই আত্মবিলোপী পাতিব্রত্য ও অবিচলিত সতীত্বের আদর্শই ভারতীয় নারীর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় নারী স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-কোমলতায় গড়া এক অপূর্ব সৃষ্টি। কিংশুকের মত পেলব তার হৃদয়কন্দর থেকে প্রীতি ও প্রেম, সেবা ও দাক্ষিণ্যের অজস্র

স্নেহ ও প্রেম

নির্ঝর স্বতঃ-উৎসারিত হয়ে ভারতীয় সমাজকে করেছে সরস। কার্যানুরোধে তার হৃদয় কুলিশ-কঠোর হলেও তার অযাচিত দাক্ষিণ্যের স্নিগ্ধ আশীষধারা সততই তো নির্ঝরিত। 'বুকভরা মধু' ভারতীয় নারী যেন সরলতা কোমলতা ও প্রেমেরই প্রতিমূর্তি।

বিদ্যা এবং জ্ঞানের রাজ্যেও ভারতীয় নারীর আদর্শ চির-অম্লান। 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'—যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ীর এই উদাত্ত বাণীটি আজ সমগ্র জগৎ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে স্মরণ করে। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী রাজর্ষি জনকের সভায়

জ্ঞানচর্চা

যাজ্ঞবল্ক্যের সংগে যে অধ্যাত্ম-বিচার করেছিলেন, তা চিরদিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। খনার জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি বরাহের মত প্রচণ্ড জ্যোতির্বিদেরও প্রতিভা ম্লান করে দিয়েছিল। বিদুষী লীলাবতী বহু শতাব্দী পূর্বে গণিতশাস্ত্রে যে গবেষণা করেছিলেন, পাশ্চাত্য জগতে সে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র সেদিন। ভারতীয় নারী যে শুধু গৃহপিঞ্জরাবদ্ধ ছিল না, জ্ঞানে এবং বিদ্যাতেও ছিল তার গৌরবোজ্জ্বল অবদান—এ কথা ভারতের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে রয়েছে লেখা।

শক্তি এবং সাধনার ক্ষেত্রেও ভারতীয় নারী কোনদিন পশ্চাৎপদ হয়নি। যে-ভারত নারীদেবতার পূজাকে করেছে বহুমানন, যে-ভারত নারীকে দেখেছে শক্তিরূপে, সেই ভারতের নারী শক্তিসাধনাতেও হবে পুরুষের পার্শ্বচারিণী, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী জগন্মাতার অংশ ভারতীয় নারী কখনও নিরুপায় দুর্বলতা ও ঘৃণ্য ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিতে পারেনি। সুভদ্রা, পদ্মিনী, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি বীরাংগনার তেজোদ্দীপ্ত কীর্তিকাহিনী আজও আমাদের চিত্তে দেয় প্রেরণা।

তেজস্বিনী বীরাংগনা

কিন্তু মধ্যযুগ থেকে শুরু করে ভারতীয় নারী আজ পর্যন্ত সমাজের কাছে যে ব্যবহার পেয়েছে, প্রতিদিনের অবহেলা অপমান ও অত্যাচারের মৌন বেদনায় তার চিত্ত যেভাবে জর্জরিত হয়েছে—একেও কী ভারতীয় নারীত্বের মহতী মহিমা বলে গ্রহণ করতে হবে? 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা', 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি', 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী', 'নারী নরকের দ্বার'—এই সব শাস্ত্রানুশাসনবলে নারীকে মানুষের সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে', জীবনের বৃহত্তর পরিধি থেকে তাকে অপসারিত করে', গৃহের দাক্ষিণ্যহীন অন্ধকূপে আবদ্ধ করে' সমাজ নারীর যে মূল্য দিয়েছে, তা কোন কালে কোন দেশেই প্রশংসিত হতে পারে না। তাইতো আজ ভারতীয় নারী নিজেকে প্রজননের অসহায় যন্ত্ররূপে না দেখে, অবহেলিত পরাধীন জীবনের গ্লানিকে অপসারিত করে' স্বাধীন সূর্যকরদীপ্ত স্বচ্ছন্দ জীবনের বিরুদ্ধে করেছে প্রগল্ভ সমরসজ্জা। এই বিদ্রোহের বহ্নিবলয় আজ দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত। অতএব, নব্য ভারতের নবীনা নাগরী যদি প্রাচীন আদর্শকে ত্যাগ করে' নবতর ইতিহাস রচনা করবার জন্যই হয় অগ্রণী, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া চলে কী?

সমাজের দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী—একটি রূঢ় বাস্তব জিজ্ঞাসা

বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। বস্তুত স্থিরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ভারতীয় সমাজ নারীকে কখনও অমর্যাদা করেনি। 'যত্রনার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—এ আমাদেরই শাস্ত্রের বাণী। প্রাচীন ভারতের অমর কবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের কাব্য এর জ্বলন্ত নিদর্শন। ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপম উদ্গাতা কালিদাস নারীর এই মহিমময়ী মূর্তির সাক্ষাৎ পেয়েই বলেছিলেন, 'স্ত্রীপুমানিত্যনাস্থৈষা বৃত্তং হি মহিতং সতাম্'।

পূর্বোক্ত রূঢ় বাস্তব জিজ্ঞাসার পটভূমিকা নিরীক্ষণ

অবশ্য সমাজের মংগলের জন্য বহু ক্ষেত্রে নারীকে অনেক নির্যাতনও বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু সমাজের এই শাসন কী শুধু নারীকেই বঞ্চিত করেছে, নরকে বঞ্চিত করে নি? সমাজের নারীনির্যাতনের কাহিনী যাঁরা উদাত্তস্বরে

প্রচার করেন, তাঁরা সীতার নির্বাসনের নির্মমতাই শুধু দেখেন—বিস্মৃত হন শম্বুকের শিরচ্ছেদের করুণ কাহিনী, গোপন করেন লক্ষ্মণ-বিসর্জনের বৃত্তান্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে নারী বা পুরুষ যে কেহই সমাজের মংগলময় অনুশাসনকে করেছে অবজ্ঞা, তারই মস্তকে পড়েছে ক্ষমাহীন শাসনদণ্ড। কিন্তু মধ্যযুগ থেকেই পরবশতার শৃংখলে শৃংখলিত ভারতীয় সমাজে আদর্শের ঘটেছে অচিন্ত্যনীয় বিকৃতি। প্রাণের স্পন্দন থেমে গিয়েছিল বলেই-না তখন সমাজ নানাযুক্তিহীন অনুশাসনের শৈবালদামে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। প্রাচীন ভাবাদর্শ থেকে বিচ্যুত ঐ যে ভারতীয় সমাজ, উহাই তখন আদর্শ বলে মেনে নিয়েছিল উৎকেন্দ্রিক আত্মপ্রকাশকে। তাই অনাদৃত ভারতীয় :নারীর বর্তমান দুর্গতির কারণ নিষ্প্রাণ আদর্শনিষ্ঠা নয়, সামাজিক ভাবাদর্শের সমূহ বিকৃতিই এর প্রকৃত কারণ।

পূর্বোক্ত রূঢ় বাস্তব জিজ্ঞাসার উত্তর

ভারতে আজ স্বাধীনতার নবীন সূর্য সমুদিত। স্বাধীন ভারত যদি তার প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠাকে পুনরায় লাভ করতে চায়, তাহলে ভারতীয় নারীত্বের সেই প্রাচীন আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে' সমাজজীবনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমাজকে সংহত ও সুসংবদ্ধ করে' বিশ্বজনীন কল্যাণের পটভূমিকা রচনা করতে হলে আত্মস্বাতন্ত্র্যগর্বিতা দুর্বিনীতা লীলাসংগিনীদের ভোগসর্বস্ব জীবনাদর্শ পরিত্যাগ করে' বরণ করতে হবে সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর আদর্শকে, স্মরণ করতে হবে অর্ধনারীশ্বরমূর্তিকে, অভ্যর্থনা জানাতে হবে সেই ক্ষেমংকরী নারীকে যে—

উপসংহার

> 'সুদিনে দুর্দিনে কল্যাণ-কংকণ করে,
> সীমন্ত-সীমায় মংগলসিন্দুরবিন্দু,
> গৃহলক্ষ্মী দুঃখে-সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
> সংসারের সমুদ্রশিখরে।'

ভারতীয় সভ্যতার প্রাণধারা গংগা

প্রাকৃতিক শক্তির ক্রম-বিবর্তনে যেদিন ভূপৃষ্ঠ হল সমতল, সেদিন ভূগর্ভের অসহ উত্তাপ সারা বিশ্বে বিকীর্ণ হওয়ায় ভূমিতল হল শীতল, সেদিন থেকে শুরু হল জৈব বিবর্তনের অনবচ্ছিন্ন ধারা। প্রকৃতির অনন্তযুগব্যাপী দুশ্চর তপস্যায় একদিন জেগে উঠল মানুষ। তার পর থেকে শুরু হল মানুষের অগ্রগতির অভিযান। মানুষের এই অভ্যুদয়ের পথে প্রকৃতির প্রধান প্রতিভূ, শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক হল নদী। দেশে দেশে প্রাচীন কালে মানুষ যে বিরাট্ সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল, তার মাঝে

প্রাণধারা সঞ্চার করেছিল সেই সেই দেশের নদ-নদীই। নদীর স্নিগ্ধ শীতল অমৃত-ধারা থেকে বঞ্চিত হলে মানুষ যা.'বর-জীবনের অন্ধ আবর্ত থেকে মুক্তির সন্ধান পেত না—মানুষের বিরাট্ সাধনার ভগীরথ-শংখনাদ তা হলে আরণ্য শ্বাপদের হিংস্র কোলাহলের ভিতরে যেত মিলিয়ে। জগতের যাবতীয় প্রাচীন সভ্যতাই নদীর মহান্ অবদান। নীল, ইয়াংসিকিয়াং, হোয়াংহো, সাতিল আরব, সিন্ধু প্রভৃতি নদ-নদীর তীরেই প্রাচীন সভ্যতা উঠেছিল গড়ে। নদী কঠিন শুষ্ক মৃত্তিকাকে করে সরস, পলিমাটির প্রলেপে উষর ভূমিকেও করে উর্বর; তৃষার্ত শস্যবীজকে দেয় অমৃতপরশ; তাই কৃষিপ্রধান মানুষ নদীর অববাহিকাতেই করে বসতি স্থাপন; নদীতীরেই হয় কৃষি-সভ্যতার উন্মেষ ও বিস্তার। যন্ত্রদানবের কৃপাবঞ্চিত প্রাচীন যুগে নদীপথই ছিল যাতায়াতের পক্ষে প্রশস্ত; নদী ছিল দূরের সংগে নিকটের যোগসূত্র। তাই ব্যবসায় বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল নদীপথেই। এম্‌নি করে কৃষি ও বাণিজ্যের আনুকূল্য করে' নদী মানবসভ্যতার সৃষ্টি ও বিস্তার-ব্যাপারে করেছিল সহায়তা। মিশরীয় সভ্যতার স্রষ্টা যেমন নীল নদ, চৈনিক সভ্যতার ধারক যেমন ইয়াংসিকিয়াং, গংগাও তেমনি ভারতীয় সভ্যতার প্রাণপ্রবাহ।

ভূমিকা

গংগা! হিন্দুর কাছে গংগা শুধুই নদীমাত্র নয়—গংগা দেবী, বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গংগা বিশ্বপাবনী। ভাগীরথী, মন্দাকিনী, অলকানন্দা, সুরধুনী—কতই-না এর নাম-বৈচিত্র্য। মধ্য-হিমালয়ের গংগোত্রি নামের হিমবাহই গংগার উৎস। এই গংগোত্রিই পুরাণে 'মহাদেবের জটা' বলে পরিচিত। গংগোত্রি থেকে যাত্রা শুরু করে গংগা দু'শো মাইল পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে' প্রথমে দক্ষিণে, পরে দক্ষিণ-পূর্বে, প্রবাহিত হয়ে হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে অবতরণ করেছে। পরে পূর্ববাহিনী হয়ে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গংগা রাজমহল পাহাড়ের নিকট বাংলায় প্রবেশ করে' ভাগীরথী ও পদ্মা নামে দুইটি শাখায় বংগোপসাগরে পড়েছে। উত্তর-ভারতের অধিকাংশ প্রদেশকে সরস করে পনেরো শ' মাইলেরও অধিক দীর্ঘ পথ পেরিয়ে গংগা হয়েছে সাগরসংগত। যমুনা, অলকানন্দা, রামগংগা, গোমতী বর্ঘরা, গণ্ডকী, কুশী, শোন, ব্রহ্মপুত্র—উত্তর-ভারতের প্রায় সকল নদীই তাদের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করে' গংগার সংগে হয়েছে মিলিত। এই সকল সজীবতার হেতু তো ঐ গংগাই। কারণ,—গংগা ছাড়া কোন নদীই প্রত্যক্ষভাবে সাগরে পড়েনি। তাই পারিভাষিক অর্থ উপেক্ষা করে' এই নদীগুলিকে গংগার শাখা-নদী বললেও সত্যের অপলাপ হয় না। তা ছাড়াও গংগার শাখানদী আর উপনদী

নদী-পরিচিতি

ছিল অগণন। ভারতীয় সভ্যতার অভিব্যক্তিতে গংগানদীর অবদান আলোচনা করতে গিয়ে গংগার এই বৈশিষ্ট্যের কথা তো একান্তভাবেই স্মরণীয়।

আর্যগণ যখন ভারতে প্রথম এলেন, তখন তাঁরা সিন্ধুদেশে ও পাঞ্জাবেই সর্বাগ্রে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সে দেশ ছিল কর্কশ ও অনুর্বর। পর্বত ও মরুভূমির নিরাবরণ শুষ্কতা সে দেশকে স্থায়ী বসতি-স্থাপনের অনুপযোগী করে তুলেছিল। মাটির মায়ের স্নিগ্ধ সবুজ পরশ না পেলে কী মানুষের যাযাবর-দশা ঘোচে? তাই আর্যগণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন পূর্বদিকে। গাংগেয় উপত্যকার শ্যামল প্রান্তর তাঁদেরকে দিয়েছিল হাতছানি। সেখানে তাঁরা মাটিতে ফলিয়ে তুললেন সোনা। জীবনে এল স্থিতি। দেহের অভাব যখন মিটল, তখন মনের অভাব হয়ে উঠল উদগ্র।

গংগার অবদান

আর সেই মনের খোরাক মেটাতেই ধীরে ধীরে ভারতীয় সভ্যতার হল গোড়া-পত্তন। গংগানদীর শ্যামল কূল ধরে গড়ে উঠল বড় বড় নগর, বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্র—কাশী, কোশল, পাটলিপুত্র, মগধ, তাম্রলিপ্ত। সেই প্রাচীন যুগে আর্যাবর্তই ছিল আর্যদের নিবাস। দাক্ষিণাত্যে তখনও দ্রাবিড়-সভ্যতার পতাকা উড্ডীয়মান। আর্যাবর্তে যে ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল, তাই পরবর্তী যুগে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে' সারা ভারতকেই করেছিল আর্যায়িত। কাজেই ভারতীয় সভ্যতা বলতে মূলত আর্যাবর্তের সভ্যতাকেই বুঝতে হবে। সভ্যতার তিনটি অংগ:—উৎপাদনযন্ত্র, সমাজব্যবস্থা ও সাহিত্যশিল্পগত কৃষ্টি। কৃষিপ্রধান ভারতীয় সভ্যতা মুখ্যত গ্রামীণ। সে-যুগের সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল গ্রাম। কৃষি এবং কুটিরশিল্প নিয়ে এই সভ্যতার অগ্রগতি শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে গংগার দাক্ষিণ্যে গড়ে উঠল অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য। বড় বড় নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র জেগে উঠল গংগার তীরে তীরে। দেশে বয়ে গেল প্রাচুর্যের বান। ব্যবহারিক জগতের অভাব যখন হল বিদূরিত, তখনই এল আত্মজিজ্ঞাসা—শুরু হল মানসকর্ষণ। সাহিত্য ও শিল্প পেল প্রাণ। দর্শন ও ধর্মের অভ্যুদয়ে ভারত হল পবিত্র। দার্শনিক গবেষণা ও ধর্মালোচনার জন্য গংগাতীর ধরে গড়ে উঠল তপোবন। এই অধ্যাত্মসাধনাই হল ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। বর্ণাশ্রমবিভক্ত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং অধ্যাত্মসাধনা—উভয়ই গংগার সরস প্রাণের পরশে পরিপুষ্ট হয়ে সমগ্র ভারতে পড়েছিল ছড়িয়ে।

গংগাতীরের স্নিগ্ধ সবুজ প্রকৃতি মানুষকে আনন্দের স্বর্গলোকে উপনীত করেছিল। তাই ভারতীয় সভ্যতার মজ্জায় মজ্জায় নিহিত রয়েছে প্রকৃতি-প্রীতি ও আনন্দের সাধনা। পরবর্তী যুগে যখন দেশবিদেশের ভাবধারা ভারতীয় সভ্যতার ধারায়

অবগাহন করল, তার যোগসূত্র হিসেবেও গংগার অবদান অসামান্য। সমগ্র ভারতে গংগার জলধারা শাখানদী উপনদীপথে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে করে সমগ্র ভারতের অভ্যুদয়ের পথনির্দেশ গংগার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। গংগার এই বিরাট অবদানকে তাই ভারতবাসী মহিমামণ্ডিত করে বর্ণনা করেছে। গংগা তাই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে উৎপন্ন বলে কল্পিত হয়েছে। এই গংগাই তাই ষাট হাজার সগরসন্তানের ভস্মস্তূপের মরুভূমিকে অমৃতপরশ দিয়ে সঞ্জীবিত করে তুলেছে। রামায়ণ মহাভারত যেমন ভারতের কীর্তিস্তম্ভ, হিমালয় যেমন ভারতের শাশ্বত দেবতাত্মা, তেমনি গংগাও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন মর্মবাণী।

গংগাই ভারতীয় সভ্যতার ধারক ও পোষক

আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে যাতায়াতের নানাপ্রকার যান্ত্রিক বাহন উদ্ভাবিত হবার ফলে জাতীয় জীবনে গংগার প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবু তো এখনও ধর্মানুরাগী ভারতবাসী, ঐতিহ্যানুরাগী ভারতবাসী গংগার বিস্ময়কর অবদানের কথা সশ্রদ্ধ অন্তরে স্মরণ করে আর গভীর আন্তরিকতা-ভরা হৃদয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলে—

উপসংহার

'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতী গংগে
ত্রিভুবনতারিণি তরল তরংগে ॥
শংকরমৌলিনিবাসিনী বিমলে।
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥'

ভারতীয় চিত্রকলা

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে চিত্রকলার অবদান কম নয়। 'কলানাং প্রবরং চিত্রম্'—ললিতকলাসমূহের ভিতরে চিত্রকলাই শ্রেষ্ঠ, এ মতবাদ ভারতেরই নিজস্ব। প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পের মাধুর্য বহির্জগতে অনেক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এশিয়া ও ইউরোপের বহু স্থানেই ভারতীয় চিত্রশৈলী প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু কালের সর্বংকষ প্রভাবে ভারতের অতীত ঐশ্বর্যের প্রায় সমস্ত নিদর্শনই আজ অবলুপ্ত। অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি দু' একটি স্থানের গুহাচিত্র মাত্র সেই প্রাচীন ঐশ্বর্যের ধ্বংসাবশেষ বুকে নিয়ে আজও রয়েছে নীরবে দাঁড়িয়ে।

ভূমিকা

অজন্তা, ইলোরা, এলিফ্যাণ্টা প্রভৃতি স্থানের গুহাচিত্র নিয়েই ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস শুরু করতে হয়। অজন্তার গুহাচিত্রাবলীর সমস্তই এক যুগের নয়। এর সূচনা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে। বৌদ্ধধর্ম-সম্পর্কিত চিত্রই সেখানে বেশী। অন্যান্য

চিত্রও অবশ্য অনেক রয়েছে। ডক্টর স্টেলা ক্রামরীশের মতে, প্রাচীন ভারতীয় চিত্ররীতিকে দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ক্লাসিক বা কৌলিক রীতি এবং মধ্যযুগীয় রীতি। অজন্তার বহু চিত্রেরই ভিতরে রয়েছে ঐ ক্ল্যাসিক রীতির নিদর্শন। ক্ল্যাসিক রীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্তুল (Plastic) অংকন-পদ্ধতি; কিন্তু মধ্যযুগীয় চিত্রশৈলী এই বর্তুলতাকে বিসর্জন করে' রেখাত্মক অংকনকে দিয়েছে প্রাধান্য। ইলোরায় এই মধ্যযুগীয় রীতির যথেষ্ট নিদর্শন মেলে। অনেকের মতে, কুষাণরাজাদের যুগে গান্ধারশিল্প বা গ্রীকো-রোম্যান্ শিল্প ভারতীয় শিল্পকে প্রভাবান্বিত করেছিল। এই প্রভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় সাঁচীর কতকগুলি প্রাকৃতিক চিত্রে। কিন্তু প্রভাবটি বিশেষ কার্যকর হতে পারেনি। গ্রীক্-শিল্পের লক্ষ্য ছিল বিষয়কে হুবহু অনুকরণ করা। কিন্তু ভারতীয় শিল্পী এই অনুকরণ-স্পৃহার দ্বারা কখনও পরিচালিত হয়নি। ভারতীয় শিল্পীর দৃষ্টি ছিল অন্তর্মুখী। রেখা ও রঙের সাহায্যে ভাবাভিব্যক্তিই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। বাইরের বস্তুকে যথাস্থিত রূপে উপস্থাপিত করাই সে তার প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেনি। এই বস্তুতান্ত্রিকতার অনুষংগ-সত্ত্বেও ভারতীয় চিত্রের ভাবাভিব্যক্তি ও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাই হল এর বৈশিষ্ট্য। তাই ভারতে কোনদিনই 'মডেল্' সম্মুখে রেখে চিত্রাংকনের পদ্ধতি ছিল না। ভারতীয় চিত্রশিল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এর গতিপ্রাণতা। চিত্রের ভিতরে প্রাণের স্বচ্ছন্দ আরোহ-অবরোহ ব্যঞ্জিত করাই ছিল এদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই এই চিত্রগুলোতে গতি ও স্থৈর্যের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রগুলোর অংগ-প্রত্যংগ গতিশীল আকাশে পারস্পরিক সংযোজনার ফলে উৎপন্ন হত বলেই এদের অবয়ব-রূপায়ণের রীতি ছিল য়ুরোপীয় ও চৈনিক রীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভাষায় বলা যায়, "গ্রীকেরা অবয়বাকাশকে গোলককল্প স্থৌল্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। চীনারা ভিত্ত্যাকৃতি আকাশের মধ্য দিয়া স্থৌল্যকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। ভারতীয়েরা ধ্যানধৃত অন্তরাকাশের সঞ্চারি স্থৌল্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন।" গ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে ভারতীয় শিল্পে ব্যঞ্জনা জিনিষটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু গুপ্তযুগে ধীরে ধীরে চিত্রশিল্প আবার কিছুটা বাস্তবানুরাগী হয়ে ওঠে। এই চিত্ররীতিই পাল-সেন-পল্লব-চালুক্যদের আমল পর্যন্ত অনবচ্ছিন্ন ভাবে চলেছিল।

প্রাচীন চিত্ররীতি

মুস্লিম যুগে ভারতীয় চিত্রশৈলী ধীরে ধীরে বদ্লাতে থাকে। ভারতীয় চিত্র তার প্রশান্ত অনাড়ম্বর সূক্ষ্ম আবেদন ও আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। তার পরিবর্তে আসে বাহ্যাড়ম্বর, আসে লালসার লালায়িত লীলাভংগী। মোগলযুগের

চিত্রে হয় এই ধারারই পরিপূর্ণ বিকাশ। মোগলযুগের দরবারের চিত্রে বর্ণাঢ্যতা, অলংকরণের প্রাচুর্য ও পার্থিব ভোগের স্পৃহা অত্যন্ত উদগ্রভাবে রূপায়িত হয়েছে। অপর দিকে রাজপুতযুগের চিত্রশিল্পের ভিতরে আমরা দেখ্‌তে পাই সেই যুগাগত ঐতিহ্যেরই রসঘন রূপায়ণ। রাধাকৃষ্ণের মিলন বা বিরহের চিত্রে অথবা রাগ-রাগিণীর ধ্বনি-সুষমা-মণ্ডিত চিত্রে রাজপুত শিল্পীদের যে সূক্ষ্ম নৈপুণ্য ও রসবিহ্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা সত্যই অতুলনীয়।

মুসলিম ও রাজপুত যুগ

ইংরাজ-রাজত্বের সময় থেকে ধীরে ধীরে বিদেশী অপপ্রচারের ফলে আমাদের শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ভাঁটা পড়ে। তার পরিবর্তে বিদেশী চিত্রকলার বহুমানন হতে থাকে পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন অভিজাত ভারতীয়দের ভিতরে। এমনি করে য়ুরোপীয় চিত্রকলা ধীরে ধীরে ভারতীয় চিত্রকলাকে সর্বক্ষেত্রেই গ্রাস করে ব'স্‌ল। মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে যে মোগ্‌লাই রীতির চিত্র ছিল, তা হল অবলুপ্ত। তার স্থান অধিকার কর্‌ল ইংরাজ শিল্পী-রচিত চিত্র। ভারতে এই সময়েই হল প্রথম তৈলচিত্রের প্রবর্তন। এই যুগের চিত্রশিল্পীদের ভিতরে রবি বর্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। য়ুরোপের চিত্রাদর্শের হুবহু অনুকরণ করে ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে চিত্র অংকন করে' সে-যুগে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু যথাযথ অনুকরণই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাই আজ্‌কের দিনে রবি বর্মার ছবির আদর বড় একটা নেই।

ইংরাজ-আমলের গোড়াকার অবস্থা

ভারতীয় শিল্পে, বিশেষ করে চিত্রশিল্পে, যে নবজাগৃতি দেখা দিয়েছে, এর মূলে রয়েছে শিল্পতত্ত্ববিশারদ ঈ. বি. হ্যাভেলের অকুণ্ঠ প্রেরণা। হ্যাভেল ক'লকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষরূপে এসে ভারতীয় শিল্পকলাকে বহুদিনের পংকশয্যা থেকে উদ্ধার করেন। তিনিই উদ্‌ঘাটিত করেন ভারতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের রত্নভাণ্ডার। তিনি পাটনার লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে আর্ট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করে' সেখানে ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাংকন শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন তাঁর সর্বপ্রধান সহায়ক ছিলেন আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ শিল্প-শিক্ষা করেছিলেন পাশ্চাত্ত্য রীতিতে। তিনি মিঃ গিল্‌ডীর নিকট Pastel Portrait তৈয়ের করা শেখেন এবং মিঃ পামারের নিকট Oil Painting শেখেন। কিন্তু বিলাতী আদর্শে চিত্রাংকনে নিরত না হয়ে তিনি নূতন চিত্ররচনাশৈলী উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর ভিতরে ভারতীয় প্রাচীন আদর্শ, মোগলাই রাজপুত আদর্শ এবং বিদেশী শিক্ষা—এসবই একত্র সমন্বিত হয়ে এক অপূর্ব চিত্র-

নবজাগৃতি—অবনীন্দ্রনাথ ও শিষ্যগণ

শিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। জাপানী এবং কাকুরার প্রভাবও বর্তমান। অবনীন্দ্রনাথের 'মৃত্যুশয্যায় শায়িত শাজাহানের তাজমহল দর্শন', 'অভিসারিকা,' 'চৈনিক পরিব্রাজক', 'ভিক্ষু বুদ্ধ', 'বুদ্ধের বিদায়' চিত্রগুলি বিপুল কল্পনার ঐশ্বর্যে বিমণ্ডিত। ভারতীয় চিত্রকলার নবোন্মেষের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় নিয়ে অংকিত অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলোও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধীরে ধীরে প্রাচীন য়ুরোপীয় সমস্ত ধারায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে' অবনীন্দ্রনাথ শেষে ভারতীয় গণকলার ক্ষেত্রেও বিশেষ সার্থক কতকগুলো চিত্র রচনা করেন। অবনীন্দ্রনাথ যে নব রীতিটির উদ্ভাবন করলেন, তাঁর উত্তরসাধক হলেন তাঁহার ছাত্রগণ। এঁদের মধ্যে নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদার সমধিক প্রসিদ্ধ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও একটি স্বতন্ত্র চিত্রশৈলী প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিচরণ করবার কোন উত্তরাধিকারী এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। খ্যাতনামা শিল্পী যামিনী রায় অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়িয়ে পটের পদ্ধতিতে ছবি আঁকছেন। এই ছবিগুলোর য়ুরোপেও যথেষ্ট সমাদর। আধুনিক চিত্রশিল্পীদের ভিতরে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি সম্পূর্ণরূপে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হয়ে পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলার আদর্শে চিত্রাংকন করেন। প্রতিকৃতিতে ও চিত্রে ভারতে তাঁর সমকক্ষ বোধ হয় কেউই হয়নি। প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনায় নারীর নগ্নরূপকে বাস্তবতামণ্ডিত অথচ ভাবব্যঞ্জনাময় করে' আঁকাতেই তাঁর কবিত্ব।

অবনীন্দ্রনাথের পরে ভারতীয় চিত্রকলায় সত্যিকার প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পীর উদয় আর হয়নি। সেদিক থেকে অবনীন্দ্রের সাধনা কিছুটা ব্যর্থ হয়েছে বললে অসংগত হবে না। তাঁর শিষ্যগণ গুরুর গতানুগতিক অনুকরণ করেই চলেছেন। গুরুর কল্পনাশক্তি ও ভাবদৃষ্টি তাঁদের ভিতরে মোটেই সংক্রামিত হয়নি। তাই এঁরা নব নব রীতিতে নব নব সৌন্দর্যের অবতারণা করে চিত্ররসিকদের চাহিদা গড়ে তুলতে সক্ষম হন নি। এটা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। চিত্রশিল্পকে আবার নব নব সম্ভাবনার পথে এগিয়ে নিতে হলে সরকারকে এদিকে যেমন দৃষ্টি দিতে হবে, তেমনি চিত্রশিল্পীগণকেও অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করে' স্বকীয় প্রতিভার স্বচ্ছন্দ পথে অগ্রসর হবার সাহস সঞ্চয় করতে হবে। আর এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে ভারতীয় চিত্রকলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

উপসংহার

ভারতীয় ভাস্কর্য

বৈদিকযুগে মূর্তিপূজোর প্রচলন ছিল কি না, এ সম্বন্ধে কোন নিঃসংশয় সিদ্ধান্তের সিংহদ্বারে পৌছানো সম্ভব নয়। অনেক পণ্ডিতের অভিমত যে, আর্যগণ মূর্তিপূজোর আদর্শ দ্রাবিড়দের নিকট হতে গ্রহণ করেন। বৈদিক মন্ত্রে কিন্তু দেবতাদের যে স্তুতি

পাওয়া যায়, তাতে দেবতাদের অংগপ্রত্যংগের বর্ণনা রয়েছে প্রচুর। সে যাই হোক্‌, বৈদিক যুগের কোন প্রতিমা বা মূর্তির কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু প্রাগ্‌-বৈদিক যুগের সিন্ধু-সভ্যতার মূর্তি-শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্‌পার মূর্তিগুলো ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এই দু'টি স্থানে পাওয়া গেছে বহু মাটির মূর্তি। ব্রতপার্বণে মেয়েরা যে রকম পুতুল ব্যবহার করে, এই মূর্তিগুলো অনেকটা সেই রকমেরই। পশু, পক্ষী বা চাক্‌-লাগানো বাড়ীর প্রতিকৃতিও পাওয়া গেছে অনেক। পাথরে ও নানা ধাতুতে গড়া যে সমস্ত মূর্তি এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সুষমা অনবদ্য। হরপ্‌পার বেলেপাথরের অতি মসৃণ ও কমনীয় নৃত্যরত স্ত্রীমূর্তি, মহেঞ্জোদারোর চুন-পাথরের শাল-গায়ে শ্মশ্রুল ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মূর্তি ও ব্রোঞ্জের নর্তকী-মূর্তির শিল্পনৈপুণ্য অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। তনুর উচ্ছল লাবণ্যলহরী, 'বর্তনা' বা ভাবব্যঞ্জনা ও গতিশীলতা—ভারতীয় ভাস্কর্যের এই তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের নবোন্মেষ এই মূর্তিগুলোর ভিতরে বিশেষ করে লক্ষণীয়।

ভূমিকা

ভাস্কর্যের ইতিহাসে এর পরেই দেখা দেয় এক সুদীর্ঘ অন্ধকার যুগ। এই অন্ধ-তমিস্রা কেটে যায় সম্রাট্‌ অশোকের রাজত্বকালে। অশোকের প্রেরণায় তখন যে সমস্ত বিরাট্‌ মূর্তি নির্মিত হয়েছিল, তা ভারতীয় ভাস্কর্যের এক অবিনশ্বর অবদান। বিপুলায়তন পাথর কেটে মূর্তি-রচনার প্রেরণা বিশেষ করে দেখা দেয় ঐ যুগেই। ভারতের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত অশোকস্তম্ভ—হস্তিমূর্তি, বৃষমূর্তি, সিংহমূর্তি—পরিকল্পনার ব্যাপকতায় ও সুসমঞ্জস সুষমার সমাবেশে অপূর্ব এক ঐশ্বর্যমদির ভাবলোকের সংকেত জানায়। মূর্তিগুলোর সুবলিত দেহসৌষ্ঠব, আত্মস্থ ও সাড়ম্বর গাম্ভীর্যময় ভাব সম্রাট্‌ অশোকেরই সমুন্নত ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর বুঝিবা বহন করে আছে। প্রায় সমসাময়িক যুগে নির্মিত উত্তর-ভারতের বিচ্ছিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েকটি বৃহৎ প্রস্তরমূর্তি হয়েছে আবিষ্কৃত। এর মধ্যে পাটনার দিদারগঞ্জের নারীমূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিটির অম্লান সুষমা ও অনাহত মসৃণতা অশোকযুগের শিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তী যুগে বরহুত, সাঁচী প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধস্তূপের উপরে অনুরূপ লক্ষণযুক্ত অনেক মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়—এগুলো অবশ্য কিছুটা খর্বাকৃতি। মূর্তিগুলো বিভিন্ন দেব-দেবী, যক্ষ-যক্ষিণীদের মূর্তি বলে পরিচিত। এই সময়কার অনেক পোড়া মাটির মূর্তিতে অনুরূপ শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়। সাধারণভাবে একটা সাদৃশ্য থাকলেও বরহুতের মূর্তিগুলো একটি বিভিন্ন শিল্পধারার সৃষ্টি বলেই মনে হয়। বরহুতের মূর্তি-গুলোর অনমনীয় দেহ ও ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখ দেখে মনে হয় যে, এগুলো রেখায় ও রঙে

অশোকযুগের ভাস্কর্য

অংকিত চিত্রশিল্পের অনুকরণে নির্মিত। এই জাতীয় চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় অজন্তার গুহায়। সাঁচীর মূর্তিগুলো বিদিশার প্রখ্যাতনামা গজদন্তশিল্পীদের কীর্তি। এই মূর্তিগুলোর দেহসৌষ্ঠব ও ভাবাভিব্যক্তি কৃতিত্বের পরিচায়ক। এর কিছুকাল পরেই ভাজা ও কারলের গুহামন্দিরের মূর্তিগুলো তোয়ের হয়েছিল। ভাজার মূর্তিতে দেহসৌষ্ঠব ও গতিশীলতা এবং কারলের মূর্তিতে মাংসল নমনীয়তা ও আত্মস্থ গাম্ভীর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধদের অনুপ্রেরণায় জৈনগণ উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে যে গুহামন্দির নির্মাণ করেছিল, সেখানকার মূর্তিতেও এই একই লক্ষণ প্রকাশিত।

পরবর্তী যুগে ভারতীয় শিল্পে পড়ে বৈদেশিক প্রভাব। ঐ প্রভাব মুখ্যত গ্রীক প্রভাবই। কুষাণযুগে হয় ঐ প্রভাবের সূচনা। গান্ধারদেশ এই বৈদেশিকদের প্রধান আশ্রয় ছিল বলে' এই শিল্পের নাম গান্ধারশিল্প। এই যুগের শিল্পে নবাগত জাতির চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য—দুর্দম ভোগলালসা ও যৌবনাবেগ—ধীরে ধীরে সংক্রামিত হতে থাকে। এরই নিদর্শন পাওয়া যায় মথুরার ভাস্কর-শিল্পে। এই যুগেই ভগবান্ বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হয়। কিন্তু এই মূর্তির ভিতরে পূর্বযুগের যক্ষমূর্তিগুলোর অবিসংবাদিত অনুকৃতিই দেখা যায়। কুষাণ-সম্রাট্ কনিষ্কের অনুপ্রেরণায় পুরুষপুরেও (পেশোয়ারে) বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হতে থাকে। কিন্তু এগুলোর প্রেরণা ছিল গ্রীক্ ভাস্কর্য। এইগুলোতে এবং কনিষ্কের মুদ্রায় শিব উমা বুদ্ধ প্রভৃতির যে মূর্তি দেখা যায়, সেগুলোতেও দেহগঠনের ব্যাপারে গ্রীক্ আদর্শই কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু প্রতিমাতত্ত্বের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ এই মূর্তিগুলোতে সংযোজিত হয়নি বলে এদের ভিতরে ভারতীয় সংবেদন সামান্যই ছিল। তাই গান্ধারশিল্প ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। মথুরা ও গান্ধারের শিল্পীরা যখন বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন দক্ষিণ-ভারতের অমরাবতী অঞ্চলেও বুদ্ধমূর্তি নিয়ে অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল। মথুরার শিল্পীরা শুধু বুদ্ধমূর্তিই নির্মাণ করেননি; সেখানে বহু জৈন ভাস্কর্যেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানকার একটি জৈন প্রতিষ্ঠানের প্রাচীরবেষ্টনীর প্রস্তরস্তম্ভের উপরে এক বিচিত্র ধরণের ভাস্কর্যের সাক্ষাৎ মেলে। কোন কোন দিক্ থেকে প্রাচীন যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তির সংগে এদের সাদৃশ্য থাকলেও এদের দেহের কমনীয়তা, অনাবৃত ঊর্ধ্বাংগ, সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ লীলাচঞ্চল ও আত্মতৃপ্ত ভাব এদের বিশেষত্ব। মনে হয়, সমাজ এই সময়ে একটি যুগসন্ধির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল এগিয়ে। পরবর্তী যুগে কিন্তু এই সংশয় ও চাঞ্চল্য অপসারিত হয়।

কুষাণযুগের ভাস্কর্য

গুপ্তযুগ ভারত-ইতিহাসে সর্বাধিক গৌরবমণ্ডিত যুগ। ঐ যুগ ভারতের সর্বময়

সমৃদ্ধির যুগ। সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার সংগে তাল রেখে ভাস্কর্যও এই যুগে চরম উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল। এই যুগের ভাস্কর্যের আদিম নিদর্শন পাওয়া যায় সারনাথের প্রসিদ্ধ বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধমূর্তিতে এবং মথুরার বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব এবং গিরীগোবর্ধনধারী বিষ্ণুমূর্তিতে। গঠনতান্ত্রিক দিক থেকে এই মূর্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, আয়ত অর্ধনিমীলিত চক্ষু, বৃষস্কন্ধ, পেশল বক্ষোদেশ, অংগের পেলব গঠন, স্বল্প অলংকার এবং সূক্ষ্ম পরিধেয়। কিন্তু এই মূর্তিগুলোর প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে এদের আত্মস্থ ভাবস্তিমিত প্রকাশের মাঝে। জীবনের বহুধাবিচিত্র চাঞ্চল্যের ভিতরে অবিচল আত্মচৈতন্যের ধ্রুবজ্যোতি যেন এই মূর্তিগুলোর ভিতরে রূপায়িত হয়েছে। তাই ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণীই যেন মূর্তিগুলোর মধ্যবর্তিতায় পেয়েছে প্রকাশ। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যশৈলী প্রায় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বহু মূর্তি তৈয়ের হয়েছিল। এগুলোর ভিতরে মথুরা, সারনাথ ও সাঁচীর কয়েকটি মূর্তি, দেওগড়ের অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি, মধ্যভারতের এরাণে বরাহরূপী ভগবানের মূর্তি ও বিহারের সুলতানগঞ্জের ব্রোঞ্জ-নির্মিত বুদ্ধমূর্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূর্তিটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অক্ষোভ্য গাম্ভীর্যের পরিবর্তে এক ভাবোচ্ছল চঞ্চলতা; কিন্তু এখানেও ভারতীয় অধ্যাত্মদৃষ্টির দাক্ষিণ্য থেকে শিল্পীমানস বঞ্চিত হয়নি।

গুপ্তযুগের ভাস্কর্য

পরবর্তী যুগে গুপ্ত ভাস্কর্যের অমূল্য 'রিক্থ' বিশেষ করে বাংলায় ও দক্ষিণ-ভারতে সমাদৃত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে পল্লব-রাজাদের সময়ে ভাস্কর্য বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। মাদ্রাজের অল্প দক্ষিণে মহাবলীপুরে, কাঞ্চী ও অন্যান্য অঞ্চলে বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগের সুকুমার দেহগঠনের সংগে কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়ত দেহের সমাবেশ এবং ধ্যানগাম্ভীর্যের পরিবর্তে গতিচাঞ্চল্যই এই মূর্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য। এই গতিচাঞ্চল্যের পরিস্ফুট নিদর্শন রয়েছে মহাবলীপুরের দেবীযুদ্ধ এবং গংগাবতরণ ইত্যাদি বহুমূর্তিযুক্ত ফলকে।

পল্লবযুগের ভাস্কর্য

গুপ্ত আদর্শ বাংলার ভাস্কর্যকে গতিচাঞ্চল্যে প্রভাবিত না করে অখণ্ড মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের বিকাশে প্রভাবিত করে তুলল। প্রতিমাশিল্পের সুস্পষ্ট রসব্যঞ্জক পরিণতি বাংলাতেই সম্ভব হয়েছিল। পাল ও সেনরাজাদের আমলের কালো কষ্টিপাথরে-তৈরী মূর্তিগুলো বংগীয় সংস্কৃতির এক বিরাট্ অবদান। এই মূর্তিগুলোর দেহ কৃশ, দীর্ঘ ও নানা অলংকারে সুশোভিত—চক্ষু বাদামী। পাল ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য 'কীর্তিমুখ' মূর্তি; এর ভিতরে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর, অলংকারের সজ্জা বড়ই বেশী। কিন্তু সেনযুগের ভাস্কর্যে

পাল ও সেনযুগে বাংলার ভাস্কর্য

যে সুকুমার লালিত্য, যে গীতিময় উন্মাদনা ও সূক্ষ্ম নৈপুণ্য দেখা যায়, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ঐ 'ছত্রমুখ' মূর্তিগুলো। এই জাতীয় ভাস্কর্য বাংলায় একেবারে নিজস্ব সম্পদ্‌। এই যুগের প্রসিদ্ধ শিল্পী ধীমান্‌ ও বীতপালের খ্যাতি সমগ্র ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরেও, ছড়িয়ে পড়েছিল।

পল্লবদের উত্তরাধিকারী দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের যুগের ভাস্কর্যে পল্লবযুগের এবং পশ্চিম-ভারতের গুহামন্দিরের মূর্তিকলার সম্মিলিত প্রভাব সুপরিস্ফুট।

চালুক্যযুগের ভাস্কর্য

ইলোরায় রয়েছে এই শিল্পের নিদর্শন। এলিফ্যান্টা দ্বীপের অন্তর্গত সুবিখ্যাত শিব, উমাবিবাহ প্রভৃতি মূর্তি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। গতিশীলতার চূড়ান্ত নিদর্শন রয়েছে দক্ষিণ-ভারতের নটরাজ-মূর্তিতে।

ভারতে মুস্‌লিম আধিপত্য বিস্তারের পরে উত্তর-ভারতে ধীরে ধীরে ভাস্কর্যকলার অনুশীলন রহিত হয়। দাক্ষিণাত্যে অবশ্য বিজয়নগরের রাজবংশের আমলেও এই শিল্পের

ভাস্কর্যের অবনতি

ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু তার পরে এধারাও যায় শুকিয়ে। অবশ্য বাংলায় নিতান্ত ক্ষীণ ভাবেই এই শিল্পধারা ছিল বেঁচে। কৃষ্ণনগরের ভাস্কর্যই তার প্রধান নিদর্শন। স্বাধীন ভারত আজ বিদেশী ভাস্করের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বদেশের অবহেলিত ভাস্করদের যদি আনুকূল্য করে, তবেই-না ভারতের ভাস্কর্য আবার জগতে পারবে নব নব আদর্শ রচনা করতে।

ভারতীয় নৃত্যকলা

সংগীতের স্বরলিপির ন্যায় আমাদের প্রাচীন নৃত্যের কোন প্রতিলিপি তথা গতিলিপি নেই। তাই প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের প্রকৃতিটি যে সত্যই কিরূপ ছিল আর কবেই-বা এর জন্মলাভ ঘটেছে, তা বলা প্রকৃতই খুব কঠিন। যতদূর মনে হয়

ভূমিকা

প্রাচীন নাট্যসম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: একটি, ভরত-সম্প্রদায় এবং অপরটি, নন্দীকেশ্বর-সম্প্রদায়। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্‌টি যে প্রাচীনতর, সে সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও ভরত-সম্প্রদায়ই প্রাচীন ভারতীয় সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। নাট্যশাস্ত্রে প্রাচীন নাচের রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে যে সমস্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে, তা পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্য সেকালে সত্যই চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যরীতি, নাচের রূপবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা থাকায় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, নাট্যশাস্ত্র রচনার অনেক আগে থেকেই শাস্ত্রোক্ত ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্য তথা মার্গনৃত্যের অনুশীলন চলে আসছিল। অতএব, ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্যের প্রাচীনতা সম্পর্কে কোনরূপ মতদ্বৈধের কারণ নেই।

আর্য নাট্যশাস্ত্রের মতে, প্রকাশরীতির চারটি বিভাগ: প্রথমত, কথায় যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম বাচিক অভিনয়; দ্বিতীয়ত, ভাবপ্রকাশই যাহার হয় উদ্দেশ্য তাহার নাম সাত্ত্বিক অভিনয়; তৃতীয়ত, অংগভংগীর দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় তাহাকে বলে আংগিক অভিনয় ও চতুর্থত, মঞ্চসজ্জা দৃশ্যপট ইত্যাদির সাহায্যে যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম আহার্য অভিনয়। নাচে সাত্ত্বিক, আংগিক এবং আহার্য—এই তিন রকমের অভিনয়ই প্রয়োজনীয়। আবার 'নাট্য' 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য' এই তিন রকমের নৃত্যাভিনয় থেকে ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্যের অন্তঃপ্রবাহিত গভীরতা খানিকটা অনুমান করা যায়। 'নাট্য' জিনিষটি আসলে পুরোপুরি নৃত্যাভিনয়ই। অর্থাৎ বাচিক, সাত্ত্বিক, আংগিক এবং আহার্য—এই চার রকমের অভিনয়-রীতিই এতে রয়েছে। পক্ষান্তরে 'নৃত্তে' কেবলমাত্র আংগিক অভিনয়ই থাকে এবং অংগসঞ্চালন-প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন বিশেষ কথাবস্তু, কাহিনী বা গীতিকবিতার সামগ্রিক রূপটি ফুটে ওঠে না। 'নৃত্ত' জিনিষটির যত কিছু আবেদন আমাদের বিশুদ্ধ অবচ্ছিন্ন রসানুভূতির কাছে এসে পৌছয়। 'নৃত্ত' প্রাচীন শাস্ত্রকর্তাগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও নিয়মিত এক Abstract art ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিশেষে 'নৃত্য' জিনিষটি দেয় বিশিষ্ট ভাব ও রসের দ্যোতনা। অধুনা-প্রচলিত নাচের সংগে নাট্য ও নৃত্তের সম্পর্ক নেই বললেই চলে, হয়তো-বা কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে নৃত্যের সংগে।

'নাট্য' 'নৃত্ত' ও 'নৃত্যে'র সংজ্ঞা-নির্ণয়

দক্ষিণ-ভারতে যে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলার রূপটি দেখতে পাওয়া যায় তা দু'জাতের: একটি, 'ভরত নাট্যম্' এবং অপরটি, 'কথাকলি'। আবার উত্তর-ভারতে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা যে দুটি বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত, তার একটি নাম মণিপুরী নৃত্য' এবং অপরটির নাম 'কথক নৃত্য'। ভরত-নাট্যমে বর্ণিত নাচের প্রচলন দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত তাঞ্জোর অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী। এই নাচ দাক্ষিণাত্যের দেবদাসীরা করে' থাকে বলে' চলতি কথায় একে বলা হয় 'দেবদাসী নৃত্য'। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্পর্শহেতু এই নাচের রূপ ও রসের বৈশিষ্ট্য সবিশেষ লক্ষণীয়। তাই ভরত-নাট্যমের নৃত্যকে 'ব্রাহ্মণ্য নৃত্য'ও বলা চলে। আবার 'কথাকলি নাচ'টি দাক্ষিণাত্যের মালাবার অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। 'কথাকলি নৃত্যে' দেবদেবীগণই উদ্দিষ্ট এবং রামায়ণ মহাভারত থেকে এই নাচের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে। ভরত-নাট্যমের মঞ্চসজ্জার রীতি কথাকলি নাচের মধ্যে আর দেখা যায় না। এই নাচ গ্রামের মেয়ে-পুরুষেরা নাচে। অভিনয়প্রধান—তাই মুদ্রাবহুল কথাকলি নৃত্যকে 'প্রাকৃত নৃত্য' তথা 'লোকনৃত্য'ও বলা চলে। আবার উত্তর-ভারতে প্রচলিত 'মণিপুরী নৃত্যে' মণিপুর অঞ্চলের প্রভাবই

উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যকলার বিভিন্ন বিভাগ

যে শুধু পড়েছে তা নয়, বাইরের প্রভাবও কিছু কিছু পড়েছে। 'মণিপুরী নৃত্য' রাধা-কৃষ্ণলীলা নিয়ে রচিত। তাই মণিপুরী নৃত্যকে অনায়াসেই 'বৈষ্ণবীয় নৃত্য' বলা চলে। এ ছাড়া উত্তর-ভারতীয় 'কথক নৃত্যে' বিদেশী নৃত্যভংগিমার ছাপ অত্যন্ত বেশী পড়েছে। রাধাকৃষ্ণের লীলাই যদিও বিষয়বস্তু, তবু নৃত্যরীতির দিক দিয়ে 'মণিপুরী' ও 'কথক' নৃত্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অতঃপর যুগধর্মের পরিবর্তনের সংগে সংগে নৃত্যশিল্পীর মনে ও রুচিতে পরিবর্তন সংক্রামিত হওয়ায় নাচের রূপরীতি ও রূপবন্ধের মধ্যেও এসেছে বৈচিত্র্য। ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রীতির নাচ আত্মপ্রকাশ করেছে। গুজরাটী গরবা নৃত্য, ভীল নাচ, পল্লীনৃত্য, রায়বেশে নৃত্য, সাঁওতালী নৃত্য, ব্রত নৃত্য, বরণ নৃত্য—এমনি আরও কত রকমের আঞ্চলিক নাচ যে গজিয়ে উঠেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই সব আঞ্চলিক নাচের মধ্যে কিছু কিছু বিদেশী প্রভাব পড়লেও, মোটের উপর ভারতীয় নৃত্যের ভাবধারাই এদের মধ্যে প্রবাহিত। আবার দাক্ষিণাত্যের ভরত-নাট্যমের ছাপ ব্রহ্মদেশের 'পোয়ে' নৃত্যে, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত নাচেও দেখা যায়।

দক্ষিণ-ভারতীয় ভরত-নাট্যমে এবং কথাকলিতে দক্ষিণী ভাস্কর্যের একটা সুবলিত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। দক্ষিণ-ভারতের ভরত-নাট্যমে এবং কথাকলিতে নাচিয়ের দেহ-খানি যেন জ্যামিতিক বন্ধনে উপস্থাপিত, বুঝিবা কেটে-কেটে খাঁজে-খাঁজে থাকে-থাকে রেখে দেওয়া হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, এই দক্ষিণী নাচ দুটি প্রধানত 'ক্লাসিক্যাল' তথা স্থাপত্যধর্মী। অপর পক্ষে, উত্তর-ভারতীয় মণিপুরী এবং কথক নাচ দু'টিতে রোম্যান্টিক আবেশ এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে, এদের মাঝে প্রকৃত ক্লাসিক্যাল তথা স্থাপত্যধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভারতের এই উত্তুরে নাচ দুটিতে বিশুদ্ধ ভাব ও রসের প্রকাশ-সৌষ্ঠব বেশ ভালই আছে—তাই অত্যন্ত জনপ্রিয়ও বটে। এই নাচ দু'টিতে উচ্চাংগের গীতিকবিতার রসানুভূতি ঘটে।

ভারতীয় নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য

আবার এই ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্যচতুষ্টয়ের ভংগিমার দিকে যদি একটু সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তাহলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কোন নাচে রয়েছে পুরুষালি ভাব অর্থাৎ সেটা হচ্ছে উদ্ধত 'তাণ্ডব নৃত্য', কোন নাচে রয়েছে একটা মেয়েলী ভাব অর্থাৎ সেটা হচ্ছে সুকুমার 'লাস্য নৃত্য'। বলা বাহুল্য, পুরুষ-নাচিয়েই নাচে তাণ্ডব নৃত্য আর স্ত্রী-নাচিয়ে নাচে লাস্য নৃত্য। অবশ্য শাস্ত্র পাঠ করে জানা যায় যে, শিবের অনুচর নন্দী অর্থাৎ তণ্ডু যে নৃত্য-পদ্ধতির স্রষ্টা এবং তাণ্ডব ঋষি যার প্রথম প্রবর্তক, তারই নাম 'তাণ্ডব নৃত্য'; পক্ষান্তরে লাস্যনৃত্যের জনয়িত্রী শিবসোহাগিনী দেবী পার্বতী। তাই আলগা ভাবে তাণ্ডব নৃত্যকে বলা হয় 'শিবনৃত্য' এবং লাস্যনৃত্যকে বলা হয় 'পার্বতীনৃত্য'।

'তাণ্ডব নৃত্য' ও 'লাস্য নৃত্য'

বাংলার 'ওরিয়েণ্টাল নৃত্য'

বাংলা দেশ নাকি একটি বিশেষ নাচের পদ্ধতির জন্মস্থান। এই নাচটি 'ওরিয়েণ্টাল' নামে অভিহিত। বাংলার বাইরে কোন নাচের আসরে যদি কোন বাঙালী নাচিয়ে ভারতীয় ধ্রুবপদী নাচও নাচেন তো অবাঙালী দর্শকসম্প্রদায় একে 'ওরিয়েণ্টাল নৃত্য' তথা 'ভাবনৃত্য' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু 'ওরিয়েণ্টাল' শব্দটির মানে 'প্রাচ্য'। অতএব 'ওরিয়েণ্টাল নৃত্য' বলতে 'প্রাচ্য নৃত্য'ই তথা 'ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্য'ই বুঝায়। সম্ভবত, বাঙালী নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর অজন্তার ইলোরার ভাস্কর্যরীতিকে অবলম্বন করে' যে সব নৃত্যপদ্ধতি প্রবর্তন করেন, তাকেই অবাঙালী সম্প্রদায় 'ওরিয়েণ্টাল নৃত্য' নামে অভিহিত করে থাকে আর যেহেতু উদয়শংকর বংগসন্তান—তাই বাঙালী নাচিয়ে মাত্রই ওরিয়েণ্টাল নৃত্যবিদ্! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

বংগীয় নৃত্যকলায় অরাজকতা

আবার এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কোন একটি গানকে বিভিন্ন 'গুরুজী' বিভিন্ন ভংগীতে, বিভিন্ন মুদ্রাসাহায্যে, বিভিন্ন সজ্জায় নৃত্যরূপ দেন। গানের মূলভাব তো একটিই, কিন্তু তাকে নাচের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করবার সময় গুরুজীরা এরূপ বৈচিত্র্যবাদী হয়ে উঠ্‌লেন কেন? এটা সত্যিই ভাব্‌বার বিষয়। আসল কথা, নৃত্যকলার রূপদান ব্যাপারে কোন আদর্শ, কোন রূপকল্প গুরুজীরা, হয় না-জানার দরুণ, নয় জেনেশুনেই, অনুসরণ করেন না। ফলে আধুনিক নৃত্যচর্চার ক্ষেত্রে একটি উচ্ছৃংখলতার স্রোত, একটি ব্যভিচারের প্রবাহ বইতে শুরু করেছে। আর কিছুদিন এভাবে নৃত্যকলার অনুশীলন চ'ল্‌লে নাচের ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী।

উপসংহার

মানবমনে বহুবিচিত্র সুর হয় অনুরণিত। তাই মনুষ্যশিল্পী মধুর বেদনাকে রূপ দেবার জন্যে যেমন ভাষার মাধ্যমে সৃষ্টি করে সাহিত্য, যন্ত্র বা কণ্ঠের মাধ্যমে শোনায় সংগীত, তুলী ও রঙের মাধ্যমে অংকিত করে চিত্রকলা, তেমনি আপন দেহকে লীলায়িত করে' পরিবেশন করে নৃত্য। কিন্তু আপন দেহ নৃত্যকলা-প্রকাশের বাহন হওয়ায় একটা মস্ত বড় বিপদেরও রয়েছে সম্ভাবনা। অপরাপর শিল্পকলার সহিত তুলনায় নৃত্যকলার ক্ষেত্রে নৃত্যশিল্পী উপভোগ-কর্তার মনের মধ্যে যতটা তাড়াতাড়ি সরাসরি ভাবে দাগ কাটতে পারে, এমন আর কিছুতেই নয়। কারণ,—ভাষা, যন্ত্র, কণ্ঠ, তুলী, রঙ্—শিল্পসৃষ্টির এই বাহনগুলোর মধ্যে কোনটিই দেহের ন্যায় জৈবিক আকর্ষণে তৎপর নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পাশ্চাত্ত্য নৃত্যকলা গ্রীক্ নৃত্যকলার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার পর ক্রমেই যেন জৈবিক আকর্ষণের দিকে যাচ্ছে এগিয়ে। আমাদের দেশে উদয়শংকরী নৃত্যপদ্ধতি যদিও এখনও অবধি জৈবিক আকর্ষণের দিকে ঝুঁকে পড়েনি, তবু কালক্রমে অনু-

করণের ধারা বেয়ে বেয়ে অদূরভবিষ্যতে ইন্দ্রিয়াভিমুখী হয়ে পড়তে পারে। আবার ক'লকাতা এবং তার আশেপাশে নৃত্যশিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে যে নৃত্যপদ্ধতি চালু হচ্ছে, তাও ব্যক্তিগত বাহাদুরী দেখানোর প্রবণতাবশত ঐ জৈবিক আকর্ষণের দিকেই পড়েছে ঝুঁকে। পক্ষান্তরে শান্তিনিকেতনী নৃত্যশিক্ষাপদ্ধতিতে জৈবিক আকর্ষণ গৌণ হলেও ঐ স্বত-উৎসারিত নৃত্যচ্ছন্দ পরিণামে পথভ্রষ্ট হয়ে নিছক সুকুমার মূকাভিনয়ে রূপায়িত হতে পারে। এই জন্যই ভারতীয় ধ্রুবপদী নৃত্য তথা মার্গনৃত্যের বহুল প্রচার ও অনুশীলন প্রয়োজন। নৃত্যকলার বাহন যদিও এই অংগই, তবু এর শিক্ষাপদ্ধতিতে অনংগ হওয়ার সাধনাই সব চেয়ে বড় কথা। *

গ্রন্থাগার

সূচনা

গ্রন্থাগার জ্ঞানপিপাসু চিত্তের তৃপ্তি-সরোবর—শতকোটি মানুষের শব্দহীন আলাপনের পবিত্র তীর্থ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃংখলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ?'

মানবসভ্যতা ও গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র এবং অক্ষর আবিষ্কারের পূর্বে যে শুভ প্রভাতে মানুষের অনুভূতিরাজ্যের আগল মুক্ত হইয়াছিল, সেইদিনই মানব আপনার চিন্তাকে, আপনার কল্পনাকে রেখার মাধ্যমে কাঁচা মৃৎপাত্রের গায়ে প্রকাশ করিয়া, তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়া গেল বংশধরের জন্য। তারপর চামড়া, বৃক্ষপত্র, প্রস্তরগাত্র, তাম্রফলক প্রভৃতিতেও চলিল সেই প্রচেষ্টা। প্রকৃতির নির্মম ধ্বংসশীলতা হইতে মানুষ বরাবরই চাহিয়াছে বাঁচিতে। সেই বাঁচার প্রচেষ্টাই চিন্তাকে শাশ্বত করিয়া রাখিবার প্রয়াসে ব্যক্ত হইয়াছে। ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছে অক্ষর, মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ। মানুষের সেই চেষ্টা আজও চলিয়াছে সমভাবে। শত সহস্র মনস্বীর চিন্তা ও মননশীলতা গ্রন্থের মধ্যে থাকিয়া গ্রন্থাগারে স্থান

* [শ্রীগোপী ভট্টাচার্য ও শ্রীদেবপ্রসাদ বসু রচিত 'নাচের ইতিকথা' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত পূর্বভাষ হইতে উদ্ধৃত।]

পাইয়াছে এবং আজও পাইতেছে। গ্রন্থাগার সত্যসত্যই যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার, মানবসভ্যতার পবিত্র ও বিশুদ্ধ রূপের সঞ্চয়ন।

গ্রন্থাগারের উদ্ভব ও প্রাচীনতা

প্রাচীন কালে গ্রন্থাগার ছিল দেবমন্দিরে। দেবমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন পাঠক। 'গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ'—ইহা প্রাচীন কালেরই প্রবচন। তখন সাধারণ লোকের মধ্যে বিদ্যার চর্চা বড একটা ছিল না। তবে ধনী ব্যক্তিগণের গৃহে তালপত্রে ও ভূর্জপত্রে লিখিত পুস্তকগুলি রক্ষিত থাকিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পণ্ডিত আপনার জ্ঞানভাণ্ডারকে পূর্ণ করিয়া জনশিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করিতেন। ভারতবর্ষে, তিব্বতে, চীনে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থাগারের নিদর্শন ও নজীব পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রেব অভাবে বহুসংখ্যক পুস্তক প্রকাশ অসম্ভব ছিল বলিযাই গুরুমুখী বিদ্যা ও শিষ্যপরম্পরায় জ্ঞান প্রসার লাভ করিত। গুরুগৃহ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। বৌদ্ধমঠ, মিশনারীর গীর্জা, হিন্দু-দেবমন্দিব ইত্যাদিই ছিল জ্ঞানের পীঠস্থান। পববর্তী যুগে পৃথিবীতে গ্রন্থাগারেব নজীর পাওয়া যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েব মূল্যবান গ্রন্থশালাব কথা সুবিদিত। শ্রীহর্ষের বিপুলায়তন গ্রন্থাগাব ছিল। সোমনাথ মন্দিরেব গ্রন্থাগারের ধ্বংসসাধন সুলতান মামুদের অপকীর্তি এবং আলেকজান্দ্রিয়াব বিখ্যাত হস্তলিখিত পুঁথির গ্রন্থাগার মুসলমান কর্তৃক পোড়ানোর কলংক-কালিমা আজও ইতিহাস হইতে অপসৃত হয় নাই। খলিফা অল্‌মামুনের সময়ে বাগদাদেব গ্রন্থশালা ও সেকেন্দ্রিযাব বিখ্যাত গ্রন্থশালা পৃথিবীবিখ্যাত ছিল। এই সকল গ্রন্থশালায় মূল্যবান পুস্তকরাজি স্থান পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা জনসাধাবণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।

শ্রেণীবিভাগ

পাঠাগাবের কয়েকটি সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ পরিদৃষ্ট হয়: (১) ব্যক্তিগত; (২) শাসন-দপ্তরের প্রয়োজনগত; (৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যগত; (৪) সাধারণ। ব্যক্তিব রুচি ও পেশা অনুসাবে ব্যক্তিগত গ্রন্থশালাব সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীর প্রয়োজন ও রুচি ও পেশা অনুসারে ব্যক্তিগত গ্রন্থশালাব সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীর প্রয়োজন ও রুচি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থে, আইনজীবীর প্রয়োজন আইনসংক্রান্ত পুস্তকে, সাহিত্যরস-পিপাসুরা ভালবাসেন কাব্যগ্রন্থ, সমালোচনা-গ্রন্থ ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থশালাব উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হয় দপ্তরেরই প্রয়োজনে—ভূতত্ত্ব-সমীক্ষার প্রয়োজনে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা গ্রন্থাগারের উৎপত্তি, কৃষিদপ্তরের দ্বারা সংগৃহীত হয় কৃষি-সংক্রান্ত পুস্তকরাজি। এইরূপে বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে জাতীয় গ্রন্থশালা। তৃতীয় পর্যায়ের গ্রন্থশালার পরিপুষ্টি হয় অধ্যাপক, শিক্ষক ও ছাত্রগণের প্রয়োজনে। প্রতিটি শিক্ষায়তনেই আছে গ্রন্থাগাব। ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষায়তনে শিক্ষানৈতিক কল্যাণমূলক গ্রন্থাগাব আছে। সর্বশেষ

পর্যায়ের গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের জন্য। ইহার পুষ্টি জনগণের প্রয়োজনে ও রুচিতে। প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারের মালিক ও উপভোক্তা নির্দিষ্ট ব্যক্তি; দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাগারের মালিক সরকার কিন্তু উপভোক্তা জনগণ; তৃতীয় শ্রেণীর মালিক ও উপভোক্তা শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী-সমাজ আর সর্বশেষ শ্রেণীর মালিক অংশত সরকার ও অংশত জনসাধারণ, কিন্তু উপভোক্তা জনসাধারণই।

বর্তমানে বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগে গ্রন্থাগার ব্যবহারে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সংগে সংগে এবং মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতিতে অসংখ্য পুস্তক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইজন্য জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র বড় বড় গ্রন্থশালার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিও পাঠাগারের নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছে। এখন পাঠাগারে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ—সকলেরই রুচি ও প্রয়োজনের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের অগণিত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। এখন গ্রন্থাগারগুলি কেবল বৃহৎ নয়—তাহাদের পরিচালনাও সুশৃংখলিত এবং বিদ্যাবিস্তারের উপযোগী। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রন্থব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় পুস্তকের তালিকা নির্মাণ এবং শ্রেণীবিভাগেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক গ্রন্থশালার সম্প্রসারণ

পূর্বে অধ্যয়ন-বিষয়ে পুস্তক নির্বাচনের সমস্যা ছিল গুরুতর। বর্তমানে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের পরামর্শে ও নির্দেশে পরিচালিত গ্রন্থশালা তাহা দূর করিতে পারে। সরকার-পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জনসেবায় যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। অনেক দেশে কেন্দ্রীয় একটি পাঠাগারের নির্দেশে অনেক পাঠাগার পরিচালিত হয়। আধুনিক কালে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার বিজ্ঞানেরই দান। মোটরগাড়ী প্রভৃতি যোগে পুস্তক পাঠাইয়া গ্রামবাসী জ্ঞানপিপাসুরও তৃপ্তি সাধন করা হয়।

সাধারণ পাঠাগার কেবলমাত্র গ্রন্থাগার নয়—একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, একটি সামাজিক মিলনক্ষেত্রও বটে। সকলের সংগে মিলন এইখানে সহজ ও স্বাভাবিক। তাই দেশের সংস্কৃতির আদানপ্রদান গ্রন্থাগারে সংঘটিত মিলনেই সম্ভব। ইহা জ্ঞান-পিপাসুকে করে তৃপ্ত, দরিদ্র ব্যক্তির জ্ঞানভাণ্ডার করে পূর্ণ। সাংসারিক ব্যক্তির কঠোর পরিশ্রমের পর লঘু সাহিত্য সত্যই চিত্তবিনোদন করে। দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি দেশবিদেশের সংবাদ সরবরাহ করে। সাধারণ পাঠাগারে বিশেষ বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয়। যেমন আবৃত্তি, সংগীত, জ্ঞানী ব্যক্তির বক্তৃতা, নানাপ্রকার অভিনয়, নানা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি শিক্ষাবিস্তারে, সংস্কৃতিবিস্তারে

গ্রন্থাগারের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দিক

প্রভূত সাহায্য করে। বস্তুত, সুপরিচালিত গ্রন্থাগার জাতির পরম সম্পদ্। পল্লীবাসী অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের কূপমণ্ডূকতা দূরীকরণে ও চিত্তসংযম দৃঢ়ীকরণে গ্রন্থাগারের দান সত্যই অপরিসীম।

আধুনিক বিশ্বে ও ভারতে গ্রন্থাগারের স্থান

বর্তমান পৃথিবীতে বহু বিখ্যাত গ্রন্থাগার আছে। ফ্রান্সের প্যারী নগরীর 'বিব্লিওথিক্ ন্যাশান্যাল' নামক গ্রন্থাগারটি পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার। লণ্ডনের 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম', আমেরিকার বোষ্টন ও ওয়াশিংটন নগরের গ্রন্থশালা, রোমের লাইব্রেরী প্রভৃতি সুবিখ্যাত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রন্থন ও গ্রন্থাগার স্থাপনে এবং অধিকসংখ্যক লোকের চাহিদা মিটাইতে রাশিয়ার সমকক্ষ আর কেহ নাই। ভারতবর্ষেও কয়েকটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার আছে। কলিকাতার 'জাতীয় গ্রন্থাগার', পাটনার খুদাবক্স লাইব্রেরী এবং দিল্লীর পার্লামেণ্ট-কক্ষের পাঠাগার সুবিখ্যাত। বরোদায় গ্রন্থাগার আন্দোলন সার্থক হইয়াছে। সেখানে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সূচনা কেবল বরোদাতেই হইয়াছে। দ্বিখণ্ডিত বাংলা দেশেও কয়েকটি বেশ বড় বড় গ্রন্থাগার আছে—রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, বংগীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, রাজসাহী শহরের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পাঠাগার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত উভয় বংগের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিভিন্ন কলেজ, বিশ্বভারতী, ভূতত্ত্ব সমীক্ষা (Geological Survery of India) প্রভৃতিরও নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে। আবার বিভিন্ন সওদাগর অফিসেও ভাল ভাল গ্রন্থশালা আছে। ভারতের চাহিদা ও লোকসংখ্যার তুলনায় এই সকল ব্যবস্থা নিতান্তই নগণ্য। গ্রন্থাগারের সহিত বর্তমান মানুষের যোগ অচ্ছেদ্য। এই গণতান্ত্রিক যুগে তাই জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্য ভাল গ্রন্থাগার একান্তই অপরিহার্য। বর্তমানে বিশ্বের প্রতীচ্য দেশসমূহে সরকারই জনগণের জ্ঞানপ্রসারে সহায়তা করিতেছেন, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, জেলাবোর্ড প্রভৃতি জনগণের এই প্রয়োজন দূরীকরণে ব্রতী; পল্লী-অঞ্চলের মানুষ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সুবিধা ভোগ করিতেছে। কিন্তু প্রতীচ্য হইতে ভারত অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। ভারতের সুদীর্ঘ পরাধীনতা জনগণের মাঝে নিরক্ষরতার অভিশাপ আনিয়াছে। আজিকার এই স্বাধীন ভারতে তাই গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য।

নিরক্ষরতাই শুধু নয়, দারিদ্র্যও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক। সরকারের আনুকূল্য ও আর্থিক সাহায্য ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত গ্রন্থাগারের সত্যই উন্নতি অসম্ভব। ভারতের বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি অধিকাংশই আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

দেশপ্রেমিক ধনবানের সাহায্যও বিশেষ কাজে লাগিতে পারে, তবে ভোগসর্বস্ব পৃথিবীতে তাহার আশা বড়ই কম। স্বাধীন ভারতে গ্রন্থাগার উন্নয়ন করিতে হইলে সর্বাগ্রে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা উচিত। উহার ফলে আর্থিক অনটন কিছুটা ঘুচিতে পারে। 'গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠার কথাও অবশ্য অনেকে বলেন। গ্রন্থাগার পরিচালনা বিষয়ে গ্রন্থপ্রণয়ন এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রচলনেও উন্নতি হইতে পারে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার স্থাপন ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত শাখা-গ্রন্থাগারেব যোগসাধন করিলেও যথেষ্ট উপকাব হইতে পারে।

উপসংহার

সমাজকল্যাণ ও জনসেবা

মানুষ সামাজিক জীব। পারস্পবিক আদানপ্রদানের ভিত্তিতে মানবসমাজের অগ্রগতি ও কল্যাণ, সমাজস্থিত দুর্বলকে রক্ষা, অসহায়কে সাহায্য, সর্বহারা আশাহতকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলাই জনসেবা। একদা কোন্ সেই অতীত কালে অরণ্যচারী মানব থাকিত গুহায় ও জংগলে, সংগে থাকিত আপন পুত্র কন্যা ও কিন্তু যেদিন মানুষ দলবদ্ধ হইয়া সমাজ সৃষ্টি করিল, মানবসভ্যতার ইতিহাসে উহাই তো কল্যাণময় শুভ প্রভাত। বর্তমানের এত উন্নতিব মূলে মানবেরই সমাজবদ্ধতা। পাবস্পবিক সাহায্যেব জন্য চুক্তিবদ্ধ ঐ মিলন, মানবের সুকুমার বৃত্তিস্ফুরণের ঐ প্রথম প্রেরণা—উন্নতির শিখরাবোহণেব প্রথম সোপান। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাব পীঠস্থানগুলিতে ঐরূপ সমাজব্যবস্থা যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। সমাজজীবনের প্রাথমিক স্তরের সমাজচেতনা জনগণের অন্তরে যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত করিয়াছিল, তাহা মূলত সামাজিকগণের মধ্যে পারস্পরিক সেবা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যুগবিবর্তনে ও সভ্যতার অগ্রগতিতে সমাজচেতনা ও সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বিশ্বপ্রেম বিশ্বপ্রীতি বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রভৃতিতে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে।

সূচনা

রূপে-রসে-ভরা বিপুল বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ামক জগদীশ্বর। স্থাবর জংগম—সকলই তাঁহার সৃষ্টি। মানুষ, পশুপক্ষী—সকলেরই মাঝে তিনি বিরাজমান। তিনি নিরাকার হইলেও বিশ্বেব রূপের মাঝে তাঁহার মহিমময় প্রকাশ। উপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্,' গীতার 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র, সর্বঞ্চময়ী পশ্যতি', কবির 'হীন পতিতের ভগবান' আর ধর্মবেত্তার 'জীব-সেবাই শিবসেবা' প্রভৃতি সকল উক্তির মূলাদর্শ জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা। আর্ত ব্যথিত দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের কল্যাণ ও সেবাই মানুষের

সমাজকল্যাণ ও জনসেবার পারত্রিক দিক

শ্রেষ্ঠধর্ম। সমাজের কল্যাণ ও মানবসেবা প্রত্যক্ষ সাধনা হইলেও, তাহা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের সাধনা—লক্ষ্য সেই পরব্রহ্ম সত্য। স্বামী বিবেকানন্দ প্রেমধর্মের আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য দরিদ্রসেবাকে শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সেবাধর্মের মন্ত্র ছিল—"দরিদ্র দেবো ভব"। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়াছেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?' 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' কবি চণ্ডীদাস প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' যুগে যুগে সমাজকল্যাণব্রতী ঋষি, সত্যদ্রষ্টা কবি ধর্মসাধক জনসেবা ও জীবসেবাকেই ঈশ্বরসেবা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বযুগের সর্বদেশের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে ধর্মকে ভিত্তি করিয়া। আর জনসেবা ও জীবসেবা মানবের ধর্মের অংগরূপে হইয়াছে প্রশংসিত।

ব্যক্তি সমাজের অংগ। ব্যক্তির স্বার্থ ও উন্নতির প্রচেষ্টায় ও উদ্যমে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আসিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে অহেতুক প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। বিবর্তনবাদের নীতিতে দুর্বল ও অসহায়ের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য সমাজজীবনের প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হইতেছে সমাজস্থ পরস্পরের সহিত একটা বাধ্যতামূলক স্বার্থের যোগাযোগ। মানুষ একা অসম্পূর্ণ। অপরের সাহায্য তাহার চাইই। জীবনধারণের বেলায় যেমন স্থূল সামগ্রীর প্রয়োজন, তেমনি মানস ক্ষেত্রেও অর্থাৎ হতাশায় প্রেরণা, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে উৎসাহ, বিজয়ে প্রশংসা মানুষ মানুষেরই নিকট আশা করে। কাজেই বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অপরকে চাইই। আর অপরকে পাওয়া যায় প্রীতির বিনিময়ে, হৃদয়মাধুর্যের আকর্ষণে। সেবার মাধ্যমেই হয় শ্রেষ্ঠ প্রেমসাধনা। সামাজিক জীবের সেবাবৃত্তির উন্মেষে তাহার পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব ও প্রয়োজন কম নয়। এই সমাজ জাতিভেদহীন মানবসমাজ। সমাজকে অনেকে পূর্ণবিকশিত শতদলপদ্ম রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রতিটি মানুষ ইহার দল—সমগ্রের মিলনেই তো পূর্ণতা।

সমাজকল্যাণ ও জনসেবার ঐহিক দিক

সভ্যতার আদিম প্রভাতে সমাজভিত্তিতে রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ঐ আদর্শ স্বার্থময় বুদ্ধিবাদী রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। তবে সুশাসক প্রজাহিতৈষী রাজন্যবর্গ প্রজার জন্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও অপর্যাপ্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সর্বাংগীণ কল্যাণ পদদলিত হইয়াছে এমন সাক্ষ্যও ইতিহাসে বিরল নয়। প্রবঞ্চিত পদদলিত দারিদ্র্যপীড়িত মানব যেদিন স্বাধিকার ফিরিয়া পাইতে চাহিল, সেদিন হইল সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বর্তমান যুগে সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। সমাজকল্যাণ ও জনসেবার

ধার্মিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হইলেও, রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ ও সেবা রাষ্ট্রের প্রধানতম কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণ, দীনতম নিকৃষ্টতম ব্যক্তিরও উন্নতিসাধন ও সেবা রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। প্রাচীনকালে রাজানুগ্রহ কিংবা মহাপুরুষ মহাজনের দয়া-দাক্ষিণ্য আজ রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য সমাজকল্যা ও সেবাধর্মের নীতি আজ কর্তব্যে পর্যবসিত। মানবসমাজ পূর্ণাবয়ব শক্তিশালী সংহতিতে পরিণত হইয়াছে। অদূরভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বব্যাপী অখণ্ড সমাজ গড়িয়া উঠিবে, অনেকে এমন আশাও পোষণ করেন। আজ পৃথিবীতে সমষ্টিগত জীবনের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আইনকানুন প্রভৃতি সৃষ্টি হইতেছে।

রাষ্ট্রে সমাজকল্যাণ ও জনসেবার আদর্শ

সমাজে বাস করিয়া সমাজস্থ অপর ব্যক্তিবর্গের কল্যাণ সাধন করা এবং অপরের নিকট হইতে আত্মকল্যাণমূলক কিছু পাওয়া—এই পারস্পরিক আদান-প্রদানই জনসেবার মূল আদর্শ। আপন সংসার, আপন পুত্রকন্যা প্রভৃতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কিংবা আপন স্বার্থসিদ্ধির মূলে সমাজকল্যাণ ও জনসেবার মনোভংগী নাই। অতএব, সমাজস্থ অপর সকলের জন্য আত্মস্বার্থ ত্যাগ করিয়া আয়াস বিসর্জন দিয়া নিজে দুঃখ বরণ করা এবং অপরের কল্যাণে স্বার্থবিসর্জনই প্রকৃত সমাজ-কল্যাণ ও জনসেবা। পীড়িতের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান, ভগ্নোদ্যমের বুকে আশা-সঞ্চার—সমাজকল্যাণ ও জনসেবার অংগ। আর্থিক সাহায্যই কেবলমাত্র জনসেবার মানদণ্ড নয়, অপরের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে সাহায্য করাও সমাজকল্যাণ ও জনসেবা। রোগকবলিত, দুর্ভিক্ষপীড়িত, বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের আর্ত মানবের কল্যাণ ও সেবাই সমাজকল্যাণ ও জনসেবা।

সমাজকল্যাণ ও জনসেবার আদর্শ ও ক্ষেত্র

প্রাচীন ভারতে সেবাধর্ম পরম ধর্মরূপে বিবেচিত হইত। বর্ণাশ্রমধর্মের মধ্যেও জনসেবার ব্যবস্থা ছিল। গৃহস্থের নিত্যকরণীয় পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে অতিথিসেবা ও জীবজন্তুদিগের সেবা ছিল অন্যতম। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত অতিথিবৃন্দের পরিচর্যার ভার লইয়াছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ জনসেবার মধ্য দিয়া স্বধর্ম আচরণ করিয়া জীবন সার্থক করেন, ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানমাত্রই প্রতিটি মানুষকে ঈশ্বরের জীব মনে করেন। বলিতে কি, মহাত্মা যীশু জনসেবার জন্যই মৃত্যু বরণ করেন। মহাত্মা বুদ্ধ জনসেবাকে পরম আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। সম্রাট অশোকের জনসেবা ও জীবপ্রেম ইতিহাসবিশ্রুত। বৌদ্ধদের সংঘগুলি জনসেবার কেন্দ্র ছিল। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের মানবপ্রেম, যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বীরসাধক

সমাজকল্যাণ ও জনসেবার পরিচয়

বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির জনসেবার তুলনা নাই। প্রাচীন ভারতের পল্লীসমাজের স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ প্রভৃতিও সমাজকল্যাণ ও জনসেবার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অন্নহীনে অন্নদান, অতিথির পূজা, আর্তের সেবা, শোকে সান্ত্বনা-প্রদান প্রভৃতি কার্য্য ছিল প্রাচীন সমাজসেবার অংগ। রাজা, জমিদার, দেশের ধনীরা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে জনসেবা করিতেন। বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, পুকুরপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐ সমাজকল্যাণ ও জনসেবা। বর্তমানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—যেমন রামকৃষ্ণ-মিশন এই কাযেই ব্রতী। কল্যাণকামী ভারতরাষ্ট্র বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত। তন্মধ্যে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্যতম।

সমাজকল্যাণে ও জনসেবায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের বৈপরীত্য—উপসংহার

আধুনিক যুগের পূর্বে জনসেবা ছিল ধর্মের অংগ, জনসেবাকেই ঈশ্বরের আরাধনা বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রভৃতির আবির্ভাবে পাশ্চাত্ত্য সভ্য মানুষের মনোবৃত্তিতে বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীরা সেবাকে নীতিরূপে গণ্য করে। জনসেবা ও সমাজ-কল্যাণ সামাজিক নীতি ও আইন হিসাবে সেই সমস্ত দেশে গৃহীত। কিন্তু প্রাচ্য ভূখণ্ডে মনোবৃত্তির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইলেও আজও ইহা পুণ্য কর্মরূপে স্বীকৃত। জনসেবা এখনও ধর্মাচরণের অংগবিশেষ। এখানে সেব্য সেবা গ্রহণ করিয়া সেবককে ধন্য করে এবং সেব্যমানের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। পাশ্চাত্ত্যে দান সেবা ও দয়া অপরের শ্রমবিমুখতা ও আলস্যের পরিপোষক রূপে বিবেচিত, আর প্রাচ্যে সেবা দয়া প্রভৃতি ধর্মপালনের অবশ্য করণীয় অংগরূপে মর্যাদা-প্রাপ্ত। মোট কথা, জনসেবার আদর্শ লইয়া যতই বাগ্‌বিতণ্ডা হোক না কেন, মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মানবের সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের উন্মেষক বলিয়া সমাজকল্যাণ ও জনসেবা চিরকালই শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইবে।

স্বাধীনতা

ভূমিকা

একদা বার্নার্ড শ 'স্বাধীনতা'র স্বরূপ-পরিচয় দিবার কালে বলিয়াছিলেন, ইংরাজি ভাষায় অনধিকারী অনভিজ্ঞ বলিয়াই ইংরাজ তাহার নিজের অবস্থাকে 'লিবার্টি' অর্থাৎ 'স্বাধীনতা' বলিয়া মনে করে। স্বাধীনতার মর্মসূত্রটি ইংরাজের জীবনের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় নাই বলিয়াই বার্নার্ড শ ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। কথাটি সত্যই যাচাই করিয়া দেখিবার মত।

সমাজের আদি অবস্থায় দাসত্বের বিপরীত দশাকে বলা হইত স্বাধীনতা; অর্থাৎ যে দাস নয়, সে-ই স্বাধীন। অবশ্য দাস-সমাজের বিলোপ ঘটিবার সংগে সংগেই স্বাধীনতার এই সামাজিক সংকীর্ণ অর্থটি গেল বদলাইয়া। সার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব যেই ঘটিল,

অমনি রাজনৈতিক দর্শনে স্বাধীনতাকে এক নূতন পরিবেশে রাখিয়া বিচার করা হইল। স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ—এই উভয়ের গণ্ডিরেখা টানিতে গিয়া কোন কোন দার্শনিক মহা বিপাকেই পড়িলেন। গোল বাধিল এই লইয়া যে, ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার ক্ষমতারই নাম যদি হয় স্বাধীনতা, তাহা হইলে বহিরাগত যে কোন জাতীয় কর্তৃত্বের সংগে ইহার একটা মৌলিক বিরোধ আছেই। অর্থাৎ রাষ্ট্র যে পরিমাণে ব্যক্তির উপরে কর্তৃত্ব করে, ঠিক সেই পরিমাণেই হয় স্বাধীনতার সংকোচন। রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধই যখন স্বাধীনতার বিরোধী, তখন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে সমর্থন করিবার সুযোগ কোথায়? অতএব, কথাটি দাঁড়ায় এই যে, স্বাধীনতা মানুষের অপ্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লাঘব ঘটাইয়া স্বাধীনতার ক্ষেত্রটিকে করে সংরক্ষিত। হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকের মতে, রাষ্ট্রের নির্দেশানুযায়ী কার্যই স্বাধীনতার নামান্তর। এইরূপ অবধারণার মূলে তাঁহাদের ইহাই যুক্তি যে, মানুষের নিজের একটা মহৎ সত্তা আছে, এ বিষয়ে সে অনেক সময়েই সজ্ঞান নয়। অতএব, সমাজের সর্বসাধারণের পক্ষে যাহা কল্যাণ, তাহা রাষ্ট্রেরই দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। সমন্বয়বাদী দার্শনিকদের মূল কথাটিই এই যে, স্বাধীনতা কোন একটা নেতিবাচক পরিবেশ নয়, যুক্তি এবং আদর্শ-অনুসারী কর্মেই স্বাধীনতা। আর রাষ্ট্রই সেই সামাজিক কার্যাদর্শ ও পুঞ্জীভূত জ্ঞানের ধারক।

সমন্বয়বাদীর দৃষ্টিতে স্বাধীনতার প্রকৃতি

স্বাধীনতার এই ব্যাখ্যার মাঝে রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সমর্থন থাকিলেও, সমাজগঠনের উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ,—ব্যষ্টিগত রুচি ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতাকে বনিয়াদ করিয়া আছে যে স্বতন্ত্র জগৎটি, তাহাকে বজায় রাখিবার জন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা। তবে একটা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব মানিতে হয়, নতুবা সমষ্টির স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। আবার একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, সমাজের বিশেষ বিশেষ স্তরে বিশেষ বিশেষ নিয়ন্ত্রণ থাকিবেই। আধুনিক ভাবতে যদি নবতর সমাজ গড়িতে হয়, তাহা হইলে জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধী হইয়াই গড়িতে হইবে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, যোগ্য শিক্ষাব্যতিরেকে মানুষ তাহার স্বাধীনতার সুযোগ-সুবিধাও আহরণ করিতে পারে না। তাই প্রয়োজনমতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে গিয়া যে পরিমাণে হয় নিয়ন্ত্রণ, ঠিক সেই পরিমাণেই ঘটে স্বাধীনতার সংকোচন। কিন্তু ইহা তো আপাতদৃষ্টি-মূলক কথা। আসলে তো পরিণামে ঘটে স্বাধীনতারই সম্প্রসারণ। তবু একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব তো গভর্নমেণ্টেরই কর্তৃত্ব। অতএব রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব কি ব্যক্তিবিশেষদের কর্তৃত্ব নয়?

সমন্বয়বাদীর যুক্তিধারার বিশ্লেষণ

অতঃপর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পরিবেশে পড়িয়া স্বাধীনতা আর এক নূতন তাৎপর্য

লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। মধ্যযুগকে এড়াইয়া আসিবার পর স্বাধীনতার একটা নেতিবাচক সংজ্ঞা দেখা দিল। মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণের অভাবেরই নাম স্বাধীনতা। যে সকল বিধি ও বাধা সামাজিক মানুষের পক্ষে সুখের পরিপন্থী, তাহাদের অপসারণের নামই স্বাধীনতা। তাই নানা জাতের বিদ্বেষমূলক বাধানিষেধ অপসারণ করায় এই যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। একদা এই ভাবতেই তো সর্ব সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষায় অধিকার ছিল না। এখন অবশ্য উচ্চ শিক্ষার আইনগত বাধা অপসৃত হওয়ায় আইনগত স্বাধীনতা মিলিয়াছে সত্য, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দরিদ্র ভারতের দীনহীন চাষী-মজুরের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব কি? সুতরাং এই যে স্বাধীনতা, ইহা দরিদ্রের কাছে মর্মান্তিক পরিহাসরূপেই আত্মপ্রকাশ করে। এই স্বাধীনতার সত্যকার কোন মূল্যই নাই। তাই স্বাধীনতা সুযোগসৃষ্টিরই নামান্তর এবং সমাজের বাস্তব পরিবেশ বিশ্লেষণের পরেই ফুটিয়া উঠে স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য। প্রসংগত, ইহাই তো দিনের আলোর মত স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, সমাজ যখন স্থির অচঞ্চল নয়, সামাজিক বিবর্তন যখন আছেই, তখন একটা নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় সমাজ-ব্যবস্থার পটভূমিতে কখনও স্বাধীনতাকে ধরিয়া রাখা যায় না। আমাদের দেশে জাতিভেদপ্রথা হয়তো-বা একদা সমাজের সকলেরই পক্ষে স্বাধীনতার সহায়ক ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা শুধু মূল্যহীনই নয়, ক্ষতিকরও বটে। তাই এই গতিশীল সমাজের পটভূমিতে স্বাধীনতাকে একটা প্রাণময় সজীব আদর্শ হিসাবেই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তাই ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিলেও, স্বাধীনতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি ঘটিবে না। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই হইতে পারে স্বাধীনতার ন্যায়সংগত বণ্টন।

ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে স্বাধীনতার স্বরূপ-পরিচয়

ক্ষেত্রভেদে স্বাধীনতার স্বরূপটি এখন একবার লক্ষ্য করা যাইতে পারে। এক দিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার স্বাধীনতা এবং অপর দিকে সোভিয়েট্ রাশিয়ার স্বাধীনতার বাস্তব বিশ্লেষণ করা যাক্। ইংরাজ তাহার সরকারের কার্যকলাপ এবং নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে পারে আইনমতেই—'The people can damn their government.' সরকারবিরোধী রাজনীতিক দলের অস্তিত্বই ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রমাণ। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপযোগী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইংলণ্ডের জনগণের নাই। বেকারজীবনের দুর্ভাবনা হইতে ইংরাজ মুক্ত নয়, জীবিকানির্বাহের নিমিত্ত মালিকেরই উপরে তাহাকে একান্তভাবে নির্ভর করিতে হয়। পক্ষান্তরে সোভিয়েট্ রাষ্ট্রের শ্রমিককে মালিকপ্রভুর খেয়ালখুশীর উপর নির্ভর করিতে

ইংলণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট্ রাশিয়ার স্বাধীনতার স্বরূপ-সন্ধান

হয় না। জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা রাষ্ট্রেরই হাতে। তবু একটি প্রশ্ন উঠে যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে গিয়া সোভিয়েট্ রাষ্ট্র কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েছে? কমিউনিষ্ট পার্টির অথবা সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করিবার স্বাধীনতা নাই বলিয়াই এরূপ সংশয় দেখা যায়। কিন্তু নানাস্বার্থদুষ্ট ধনতান্ত্রিক সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ—এই উভয়ের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য তো আছেই। ব্যষ্টিগত স্বার্থকে বনিয়াদ করিয়া মত প্রকাশ এবং তদনুযায়ী দলগঠনের স্বাধীনতা—ইহাই তো ধনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অর্থ। কিন্তু সমাজতন্ত্রে বিরুদ্ধবাদী ব্যষ্টিস্বার্থের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার কোন প্রশ্নই যে নাই—সমষ্টিগত স্বাধীনতা-সংরক্ষণই সমাজ-তান্ত্রিক স্বাধীনতার মূল কথা।

আসলে স্বাধীনতা তো একটা অখণ্ড সামগ্রী। তবে বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য স্বাধীনতার বিবিধ দিগ্‌দর্শন করা যাইতে পারে: যেমন—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় স্বাধীনতা। আর্থিক জগতের যে অবস্থাটি সমষ্টির স্বাধীনতার সহায়ক, তাহাকেই বলা যায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। দারিদ্র্য ও বেকারজীবনের আশংকা হইতে মুক্তি এবং রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের অধিকার—ইহারই উপর গড়িয়া উঠে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি। ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি বিরাট্ অংশ দারিদ্র্যকবলিত বলিয়া আপন আপন ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী জীবননির্বাহের পথ নির্বাচন করিয়া লওয়া সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজেও জাতীয় আয়ই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সীমা নিরূপণ করে। ধরা যাক,—ভারতেরই কথা। ভারতের লোকসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি না পাওয়া অবধি এদেশের কোটি কোটি লোকের স্বাধীনতা সংকুচিতই হইয়া থাকিবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্রগৃহ, রংগক্রীড়া—এ সকলই স্বাধীন জীবনের অপরিহার্য অংশ। সুতরাং বর্তমান ভারতে রাজনৈতিক দিক দিয়া জনসাধারণের হাতে শাসনক্ষমতা থাকিলেও, পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপযোগী জাতীয় সম্পদ ও আয় গঠন করিতে আরও কিছুটা সময় কাটিয়া যাইবে। (বেকার জীবন, বার্ধক্য, অকালমৃত্যু অথবা অসুস্থতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে সমাজে সঞ্চয়ই একমাত্র বিশল্যকরণী, সেখানে স্বাধীনতা সমষ্টির জন্য নয়, পক্ষান্তরে কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য, যাহারা অক্লেশে অর্থসঞ্চয় করিয়া 'freedom from want and fear' ভোগ করিবার সুযোগ পায়। সমষ্টির স্বাধীনতার জন্য চাই ব্যষ্টির স্বাধীনতা।)

স্বাধীনতার দিগ্‌দর্শন—
(১) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

শাসনক্ষমতা যেখানে জনসাধারণের অধিকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়, সেখানে যতটা সুযোগ থাকে, ঠিক ততটা পরিমাণই থাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু এই যে সুযোগসৃষ্টি, ইহা খুব সহজসাধ্য নয়। রুশোর মতে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা কেবলমাত্র

তখনই সার্থক রূপ লইয়া দেখা দেয়, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া জনসাধারণ কর্তৃক সরাসরি শাসন প্রবর্তিত হয়। অবশ্য ইহা কার্যকর প্রস্তাব নয়। তবে একথা ঠিক যে, জনমতের মাধ্যমে জনসাধারণ শাসননীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কায়েমী স্বার্থকে এড়াইয়া নিরপেক্ষ জনমত বলিষ্ঠ হইয়া দেখা দেয় না। কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব থাকিলে তাহা সোভিয়েট্ রাষ্ট্রের জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া গণমত লইবার বিধিটি ঐদেশের শাসননীতিরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে মোটের উপর ইহাই বলা যায় যে, গ্রাম্য চাষীর পক্ষে কেন্দ্রীয় শাসনে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ নাই-বা থাকিল, কিন্তু গ্রাম্য পঞ্চায়েতে মোড়লি করিবার সুযোগ পাইলেও তো সে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আস্বাদ পাইতে পারে। অতএব, জনসাধারণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগ একান্তভাবে নির্ভর করে শাসনক্ষমতার যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীয়করণেরই উপরে।

(২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা

স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মতামত, স্বাধীন শিল্পদৃষ্টি, স্বাধীন অনুভূতি, যে কোন ধর্মমতে বিশ্বাসের অধিকার—এইগুলিই তো স্বাধীনতার ব্যক্তিগত দিক ফুটাইয়া তোলে। জার্মানীর নাৎসী দলের মতে, রাষ্ট্রের সত্তা হো Totalitarion বা সামগ্রিক; রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যের বাহিরে কোন স্বাধীনতা ছিল না, ছিল না কোন ব্যক্তিগত রুচির বালাই। নাৎসী জার্মানীতে আর্ট ও সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু কমিউনিষ্ট রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট সাহিত্য ও আর্ট বলিয়া কোন মতবাদ রূপ জনসাধারণকে প্রভাবিত করে না। কমিউনিষ্ট রাশিয়ায় সেক্স্পিয়র টলষ্টয়ের সমাদর আছে খুবই। একটা কথা উঠিয়াছে, সোভিয়েট্ রাষ্ট্র ধর্মবিরোধী। কার্ল্ মার্ক্স্ অবশ্য বলিয়াছিলেন,—'Religion is the opium of the people'. কিন্তু ইহা তো তাঁহার কমিউনিষ্ট মতবাদ নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীতে ধর্মকে যাচাই করিয়া লওয়া মাত্র। সাম্যবাদী সোভিয়েট্ রাশিয়া ধর্মের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু জনগণের ধর্মবিশ্বাসে সে হস্তক্ষেপ করে নাই। সোভিয়েট্ রাষ্ট্র ধর্মকে যেমন প্রশ্রয় দেয় না, তেমনি নিপীড়িতও করে না—ধর্ম সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্ম ও ব্যক্তিগত মতামতের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতাই স্বাধীনতার ব্যক্তিগত দিকটিকে সুরক্ষিত করে। অবশ্য ব্যক্তিও স্বাধীনতারক্ষার জন্য দায়ী। পেরিক্লিসের মতে, সাহসই স্বাধীনতা আদায় ও সংরক্ষণের হেতু। থরোর মতে, অন্যায় ভাবে বন্দীকৃত জনগণের কারাগারই স্বাধীন ব্যক্তিমাত্রের আবাসস্থল। লাস্কির মতে, বিনা প্রতিবাদে অন্যায় অবিচার মানিয়া লইলে স্বাধীনতাই হয় সংকুচিত।

(৩) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

এমনি করিয়া সমাজব্যবস্থার গোড়া হইতে স্বাধীনতার বিভিন্নমুখী অভিযানটি আজ বিশ্বজনের কাছে বিবিধ ও বিচিত্র সুযোগ আনিয়া দিয়াছে সত্য, কিন্তু তবু বলিব, স্বাধীনতায় এখনও সকলের অধিকার সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ভারতের অসংখ্য চাষীমজুর, আমেরিকার নিগ্রো আজও তো অখণ্ড স্বাধীনতার স্বাদ পায় নাই। আজও তো কোন কোন দেশের জনসাধারণ কবিমানস, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও রাজনীতিকের কর্মনৈপুণ্য লইয়া মনুষ্যজীবনকে পূর্ণ-পরিণত করিতে পারে নাই। চিনির বলদের ন্যায় অপরের স্বার্থভারই তাহাদিগকে হয় বহিতে। সারা বিশ্ব জুড়িয়া সেইদিন হইবে স্বাধীন মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা, যেদিন শ্রেণীবিশেষের বিশেষ স্বার্থ ও সুবিধা অপরের উন্নয়নপথে করিবে না প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি, যেদিন মনুষ্যত্ববিকাশের সুযোগসুবিধাগুলি যোগাইবে গণচেতনার উপকরণ।

শেষ কথা

ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চেহারা যুগসচেতন মানুষের দৃষ্টিতে আজ আর অপ্রকাশ নাই। মালিক মহাজনের কুৎসিত আকৃতি পৃথিবীর জনসাধারণের নিকট আজ জঘন্য-ভাবে উদ্‌ঘাটিত। ব্যক্তিগত মুনাফাশিকারের খড়্গ, কোটি কোটি জনসাধারণের ন্যায্য অধিকারকে পদদলিত করিবার শয়তানী চক্রান্ত ক্রমশঃ এত বেশী প্রকট হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাতে অন্য অভিসন্ধির মায়াজালে আবৃত রাখিয়া মানুষকে ভাঁওতা দিবার কোন সোজা পথই খোলা নাই। একদল পরাশ্রয়ী স্ফীতোদর মানুষ সকল মানুষের সৌভাগ্যকে কৌশলে হস্তগত করিয়া তাহাদিগকে সারাজীবনব্যাপী শোষণ ও শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট করিবে—এই ব্যবস্থা চিরকালের জন্য কখনও চলিতে পারে না। কারণ,—স্বার্থপর মানুষের দুর্নিবার লোভই সমাজকে এইভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করিয়া ধনিকের মুনাফা-মৃগয়ার লীলানিকেতনে পরিণত করিয়াছে। অথচ মনুষ্যসভ্যতার প্রথম যুগে মানুষে মানুষে এই ধনবিভেদ শ্রেণীবিভেদ ছিল না। যদিও গায়ের জোরেই তখন অধিকার সাব্যস্ত হইত, তথাপি সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—অধিকাংশ মানুষকে শোষণ করিবার চাবিকাঠি মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে তখনও আসে নাই।

ধনবাদী সমাজের স্বরূপ

সামন্ততান্ত্রিক মানুষকে কৃষিদাসরূপে যে শোচনীয় জীবনযাপন করিতে হইত, ইতিহাসের পাতায় তাহা কলংকের কালিতে লিখিত রহিয়াছে। মানুষকে সকল মানবীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া বন্য পশুর জীবন যাপন করিতে বাধ্য করার মত বর্বরতাই ধনবাদের শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। কোটি কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া মুষ্টিমেয় মানুষের 'ব্যাংক ব্যালান্স' বাড়ানোর মত নৃশংসতা মূলধনী প্রথার দান।

এই ব্যবস্থার ফলে অসংখ্য মানুষ অত্যাচারে—অনাচারে—অবিচারে তিলে তিলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে আর একদল মানুষ সেই প্রবঞ্চনার টাকায় বিলাসের রঙীন ফানুস উড়ায়। এই যে নির্লজ্জ অমানুষিকতা, ইহার মাঝে না আছে কোন মানবতাবোধ, না আছে কোন ভদ্রতাজ্ঞান এবং না আছে কোন শালীনতার আব্রু।

ধনবাদের শোষণ

সমাজবাদের জন্ম এই ধনতান্ত্রিক অব্যবস্থারই গর্ভে। মানুষ চিরকাল এই শোষণ-ব্যবস্থাকে নতশিরে বরদাস্ত করিতে চায় না। এই নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য সে করে পথের সন্ধান। সমাজবিজ্ঞানীরা তাহাদের পথনির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, মানুষের সর্ববিধ দুঃখদুর্দশার মূল কারণ মানুষেরই স্বার্থপর শোষণ-প্রবৃত্তি। শোষণ-ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে মানুষের জীবনে কোনদিনই শান্তি বা সমৃদ্ধির সূচনা হইতে পারে না। এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুখী করিয়া গড়িয়া তুলিবার যাবতীয় উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে—এক শ্রেণীর মানুষ তাহা খাসদখলে রাখিয়া মৌরসী-পাট্টার পাশা জমায় বলিয়াই এই শোচনীয় অবস্থা। জনসাধারণের সম্পত্তি যদি তাহাদের হাতে ফিরিয়া আসে এবং যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে তাহাদের অভাব কিসের? মানুষ একথা ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে শিখিয়াছে বলিয়াই তাহারা শোষণহীন সমাজব্যবস্থার বনিয়াদ পত্তনের কাজে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দুনিয়ার সর্বহারা মানুষ যেদিন হইতে শিখিয়াছে "পায়ের শৃংখল ছাড়া তাহাদের হারাইবার কিছু নাই, সারা পৃথিবী তাহারা জয় করিয়া লইতে পারে", সেইদিন হইতে তাহারা মুক্তি-পতাকার তলে সমবেত হইয়াছে এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার শ্মশানশয্যার উপরে নবতম সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করিবার সংগ্রামে ব্রতী হইয়াছে। তাহাদের সংগ্রামের সফলতায় যে-সমাজের প্রতিষ্ঠা, সেখানে শোষণ নাই, অত্যাচার-অবিচার নাই, একজনকে বঞ্চিত করিয়া অন্যের সুখী হইবার বিধানও নাই। প্রয়োজন-অনুসারে সকলের অভাব সমভাবে দূরীভূত করা এবং সকলের জীবনকে স্বাস্থ্যে-শিক্ষায়-শিল্পে-সভ্যতায়-সাহিত্যে এবং মানবীয় বৃত্তিনিচয়ের মহত্তম বিকাশে পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই তো সেই সমাজের আদর্শ। এই আদর্শের নিশান উড়াইয়া কোটি কোটি মানুষের মুক্তিমিছিল যতই গিরিবিজয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে, ততই ক্ষমতাভোগী পরগাছার দল নিটোল ভালোমানুষীর সুযোগ খুঁজিয়া মুক্তিকামী জনতাকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করে।

সমাজবাদের জন্ম

শ্রমিক এবং কৃষক আজ সচেতন হইয়া আপনার হারানো অধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য দুর্মর পণে কঠোর সংগ্রামে রত হইয়াছে। শেষ বিজয়ের পূর্বে

বিশ্রান্তি নাই—ইহাই তাহাদের শপথ। ধনবাদের সদ্যোজাত কনিষ্ঠ সন্তান ফ্যাসীবাদ তাই তাহার সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জনতার অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অমানুষিক নিষ্ঠুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখানে দয়া মায়া মমতা প্রভৃতি কোন কোমল বৃত্তিরই স্থান নাই—আছে কেবল ক্ষমাহীন সংগ্রামে মুনাফার খবরদারী।

ধনবাদের জঘন্যতম রূপ 'ফ্যাসিজম্'

কিন্তু সকল শক্তি সংহত করিয়া জনতার অগ্রগতিকে ঠেকানো যায় নাই। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে সমাজবাদী শ্রমিক কৃষকদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোভিয়েট্ রাশিয়ার অনুপম আদর্শ ঝাঞ্জাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে আলোকস্তম্ভের মত দুনিয়ার সকল মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামী চেতনায় প্রেরণা সঞ্চার করিতেছে। ইতিহাসের অভ্রান্ত গতিপথে সমাজবাদেই মনুষ্যসভ্যতার পরিণতি। আজ আর ইহা অলস কল্পনাবিলাস নয়—শোষণ-হীন সমাজ আজ বাস্তব সত্য। এই সত্যকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে বিপুল আন্দোলনের প্লাবন ডাকিয়াছে। আজ সেই মহাপ্লাবনকে বালির বাঁধ দিয়া বন্ধ করিবার জন্য সারা বিশ্বের ধনিকগোষ্ঠী উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে—একটির পর একটি মহাযুদ্ধ বাধাইয়া এই অনিবার্য ভবিষ্যতের হাত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইতিহাসের পথের চাকাকে যেমন থামানো যায় না, তেমনি ধনবাদের পরিণতি সমাজবাদেরও গতি অপ্রতিরোধ্য।

শেষের কথা

শিক্ষাবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা যিনি পান নি, বিদ্যালয়কে যিনি বাল্যকালে ভীতিবিহ্বল নয়নে দেখেছেন, শুধু কবিতাতেই নয়—সুচিন্তিত প্রবন্ধেও যিনি ইস্কুল-পালানোকে আভাসে-ইংগিতে সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁকেই—সেই রবীন্দ্রনাথকেই—শিক্ষাবিজ্ঞানী রূপে মেনে নিতে মনটা স্বভাবতই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই বিদ্রোহ জানাবার আর অবকাশ থাকে না। শিক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের একটা সহজাত বিদ্বেষ আছে বলেই আমরা ইস্কুলে যেতে ভয় পাই অথবা গেলেও ইস্কুল থেকে পালিয়ে সিনেমা দেখ্‌বার সুযোগ খুঁজি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই আলাদা। দেবী বীণাপাণির তিনি ছিলেন অকৃত্রিম পূজারী—তাই বিদ্যাশিক্ষার প্রবল আগ্রহের জন্যেই তিনি ইস্কুল ছেড়েছিলেন। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি যে জ্ঞানার্জনের পক্ষে আদৌ সহায়ক নয়, এটা তিনি ছেলেবেলাতেই অন্তরের অন্তরতম কোণে অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি উত্তরকালে সাহিত্য-সাধনাকে কিছুটা

ভূমিকা

ক্ষতিগ্রস্ত করেও পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করেছিলেন, নিজের যথাসর্বস্ব পণ করেও শান্তিনিকেতনে 'শিক্ষাসত্র' গড়বার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কাব্যানুভূতিকে চেপে রেখেও নিজের চিন্তাধারাকে শিক্ষাবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল মহাকবিই নন, মহাশিক্ষকও।

অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষাবিদেরা 'শিক্ষা' বলতে অর্থকরী বিদ্যাই বোঝেন। অর্থকরী বিদ্যার্জন যে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি সত্য, কিন্তু ঐ অর্থকরী বিদ্যার্জন-প্রচেষ্টাকে শিক্ষার সূচনা হিসেবে নয়—উপসংহার হিসেবেই তিনি কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে, বাকবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 'সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধনে'র পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য 'মানুষ হওয়া' আর গৌণ উদ্দেশ্য বিদ্বান হওয়া, ব্যবসায়ী হওয়া, চাকুরে হওয়া। 'চলন্ত পুঁথি হওয়া, অধ্যাপকের সজীব নোটবুক' হওয়া নয়—'শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ' হওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার মধ্যে জ্ঞানের আলো ফুটিয়ে তোলাই সবচেয়ে বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'শিক্ষা সম্বন্ধে একটিমাত্র কথা আমার বলবার আছে। যা আর কেউ শেখায়, তা শেখা যায় না। যা নিজে শিখি তাই আসল শিক্ষা।' নিজের চেষ্টায় মানুষ হওয়া, এই যে আত্মনির্ভরতার অনুশীলন, ইহাই তো শিক্ষা। চেষ্টার প্রবৃত্তি জাগানো, শিক্ষার্থীর চিত্তকে জাগানো, শেখা জিনিষকে প্রকাশ করে জ্ঞানকে পাকা করবার সুযোগ দেওয়া, শিক্ষার্থীকে নিজে চিন্তা করতে ও কাজ করতে উৎসাহিত করা—এই সবই তো শিক্ষার উদ্দেশ্য। কারণ, 'বাস্তবিকতা-বর্জিত হইলে মনই বল, হৃদয়ই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়।' রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলতে মৌলিক শিক্ষাকেই বুঝতেন। তাঁর মতে, চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির সহিত মানসিক শক্তিসমূহ তথা আত্মা এবং দেহের কাঠামোটির সর্বাংগীণ বিকাশ যাকে অবলম্বন করে ঘটে, তারই নাম শিক্ষা। যে শিক্ষা বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের ভিতরে একটা আন্তরিক যোগসূত্র রচনা করে, প্রতিদিন নব নব প্রসংগের অবতারণার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে চিন্তা কল্পনা অনুভূতি ও বিচারশক্তি সঞ্চার করে, তাই প্রকৃত শিক্ষা। সমগ্র মননশীলতার চালক তো এই শিক্ষাই।

রবীন্দ্রনাথের মতে
শিক্ষার সংজ্ঞা

রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষা কর্মপ্রতিষ্ঠ না হলে সর্বাংগীণ পরিণতি কখনও ফুটে ওঠে না। 'মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকলপ্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড' যোগ আছে এবং 'পরস্পরের সহযোগিতায় তারা বল লাভ করে'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'দেহের শিক্ষা যদি সংগে সংগে না চলে তাহলে মনের শিক্ষারও প্রবাহ বেগ পায় না।... দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা

আমরা যে সব কাজ করতে পারি, সেই সব কাজের চর্চা—সেই চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়।....আমার মত এই যে আমাদের আশ্রমের প্রত্যেক ছাত্রকে বিশেষ ভাবে কোন না কোন হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব-চর্চায় মনও সজীব, সতেজ হয়ে উঠে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়।.... উভয়ের মধ্যে ভাল রকম মিল করতে না পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায়।' গান্ধীজীও বলেছেন,—'The principal means of stimulatimg the intellect should be the manual training.' রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে সংগীতের স্থান খুবই উচ্চে। Walter Pater প্রকৃতই বলেছেন,—'Art struggles after the law of music.' জীবনে পূর্ণপ্রজ্ঞ শিক্ষা পেতে হলে সংগীত একান্ত প্রয়োজনীয়, এটা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের এটাই পরম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি সংযম সামগ্রীটিকে যেমন স্বাধীনতার মধ্যে, তেমনি আনন্দের মধ্যে, তেমনি জীবনের প্রতিটি কর্মভাবনারই মধ্যে দেখেছেন। কোন বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান হারালেই হয় জীবনের ছন্দপতন। সৌষম্য বা সুষমাকেই রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য তথা অখণ্ড জীবনবেদ বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই স্বাধীনতা এবং সংযমই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাবিধির ভিতরে ছিল বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার আদর্শ

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা পেশ হয়; কিন্তু উহার অনেক পূর্বে ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের এক প্রান্তে গ্রামের দরিদ্র জনগণের শিক্ষাদানার্থে একটি 'শিক্ষাসত্র' স্থাপন করেন। ধরতে গেলে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম হাতে-নাতে পরীক্ষার সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথেরই দ্বারা। প্রসংগত, এটাও স্মরণীয় যে,১৯২৫ সালের মে মাসে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসত্র' দেখেছিলেন ও সেখানকার কর্মকেন্দ্রিক ভাবধারা লক্ষ্য করেছিলেন। অবশ্য একথা না বললে ভুল হবে যে, ১৯২২ সালে এলমহার্স্ট বিশ্বভারতীতে যোগদান করাতেই গুরুদেবের বহুকাল-ঈপ্সিত জনসাধারণের উপযোগী শিক্ষাদর্শকে প্রকাশ করার সুযোগ মিলেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন যে, এলমহার্স্ট "believes, as I do, in an education which takes count of the organic wholeness of human individuality that needs for its health a general stimulation to all faculties, bodily and mental." রবীন্দ্রনাথের মত idealist ও practical লোকের অনুপ্রেরণায় এবং এলমহার্স্টের

রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসত্র' ও গান্ধীজীর 'বুনিয়াদি শিক্ষা'

মত practical idealist ব্যক্তির সাহচর্যে শান্তিনিকেতনের 'শিক্ষাসত্রে'র খসড়া তোয়ের হয়েছিল। 'Siksa-Satra, a Home for orphans" নামক প্রবন্ধে এলমহার্স্ট লিখেছেন,—'The aim of the Siksa-Satra is ·… ·to provide the utmost liberty within surroundings that are filled with creative possibilities, with opportunities for the joy of play that is work,—the work of exploration, and of work that is play,—the reaching of a succession of novel experiences ; to give the child that freedom of growth which young tree demands for its tender shoot, that tilled for self-expression in which all young life finds both training and happiness." এলমহার্স্টের এই উক্তি তো শিক্ষাবিজ্ঞানী জন্ ডিউইয়েরই বাণী, মহাশিক্ষক রবীন্দ্রনাথেরই বাণী। কবির আদর্শই ছিল এই যে, 'শিক্ষাসত্রে' সর্বাংগীণ শিক্ষা পেয়ে ছাত্রেরা যে শুধু স্ব স্ব জীবিকা উপার্জন করবে তাই নয়, তারা পল্লীতে ফিরে গিয়ে পল্লীর করবে উন্নতি, তারা হবে Village Leaders। ১৯২৭ সালে জুলাই মাসে 'শিক্ষাসত্র'টি শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে সরিয়ে নেওয়া হ'ল। নব পরিবেশে 'শিক্ষাসত্রে'র যে নবজীবন দেখা দিয়েছিল, তাকে লক্ষ্য করেই ১৯২৭ সালের বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদনে লিখিত রয়েছে,—"While great stress is laid upon manual labour by which they learn to earn an honest livelihood ; in fact, the children take as much interest in reading, writing etc. as in other activities. Great care is taken to present everything before them in the form of concrete projects." রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসত্রের' শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"It is not only through the fullest development of all his capacities that man is likely to achieve his real freedom." রবীন্দ্রনাথ মানুষ সম্পর্কে চেয়েছিলেন, "He must be so equipped as no longer to be anxious about his own self-preservation." ওদিকে গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শে পাওয়া যায়, "Insurance against unemployment." গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা তথা ওয়ার্ধা শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে কোন সমালোচক বলেছেন—"এই প্রণালীটির দুটি দিক আছে। একটি শিক্ষাতত্ত্বের, অন্যটি অর্থনীতির দিক। শিক্ষাতত্ত্বের সহিত যে দিকটির সম্বন্ধ, তাহা মূলত ও সারত ষোলো বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত (এক্ষণে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত) 'শিক্ষাসত্র' নামক বিদ্যালয়ের অনুসৃত প্রণালীর মত।…যাঁহারা ওয়ার্ধা প্রণালীর আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের শিক্ষাসত্রের প্রণালীটিও দেখা উচিত।

মানুষের জীবিকা নয়, তার জীবনকেই রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অবশ্য জীবিকার সমস্যাকে শিক্ষাদর্শ থেকে একেবারে বাদ দিয়ে তিনি কোন তুরীয় আদর্শবাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন নাই। জীবনের আনন্দ, সৃষ্টিবিলাস, ক্রীড়া-কৌতুক, অপব্যয় প্রভৃতির কোনটিকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সীমানা থেকে বহিষ্কৃত করেননি। জীবনে আদর্শপ্রাপ্তির যদি কিছু সম্ভাবনা থেকেই থাকে তো নীতি ছাড়া একপাও এগোবার উপায় নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নীতির চেয়েও বড়ো ঐ ধর্ম অর্থাৎ 'মানুষের ধর্ম'কে মেনে নিয়ে জানিয়েছেন যে, বহুবিচিত্র মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নানা ভাবে রূপ দিবার সুযোগ দেওয়াও তো শিক্ষার লক্ষ্য; কোন বিশেষ মতকে কেন্দ্র করে সফলতা লাভের আদর্শটি শিক্ষক বা শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যে কারও পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। গান্ধীজীও জীবনকে পবিত্র বলে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এই দরিদ্র জটিল পরিস্থিতিতে জীবনের চেয়ে জীবিকারই উপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন বেশী করে'। এদেশের কোটি কোটি নিরক্ষর শিশুর শিক্ষা-সমস্যা অচিরকাল মধ্যেই পূর্ণ বয়স্কের জীবিকা-সমস্যারূপে দেখা দেবে এবং এরই আশু সমাধান কিভাবে করা যায়, তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল মহাত্মাজীর শিক্ষা-জিজ্ঞাসায়। গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শনে জীবনের চেয়ে জীবিকা এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শনে জীবিকার চেয়ে জীবন প্রাধান্য লাভ করেছিল। উভয় শিক্ষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভংগীর মধ্যে যতটুকু পার্থক্যই থাকুক না কেন, মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পার্থক্য বড় বেশী নেই। মনে হয়, আগামী কালের শিক্ষাবিধি শিক্ষাদর্শনের এই উভয় ধারার মেলবন্ধনেই নবরূপে দেখা দেবে।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা

'শিক্ষার হেরফের' এবং আরও অনেক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছেন। ইংরাজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার বিপক্ষে এবং শিক্ষার সুরু থেকে ইংরাজি ভাষাকে অবশ্য পাঠ্য হিসাবে প্রবর্তন করার প্রতিকূলে তিনি সুস্পষ্ট অভিমত জানিয়েছেন। কারণ, "এক তো, ইংরাজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস ও পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোন প্রকার মিল নাই। তাহার পর আচার, ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসংগও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাকে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।" 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আধুনিক শিক্ষা ইংরেজি ভাষা-বাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশপথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালী ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এ্যাণ্ড. ও. কোম্পানীর

মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন

ডিনার-কামরায় যখন খেতে বসে, তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটা-ছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটাতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা,—আছে সবই অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়।" আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছেন তার কারণ দু'টি: একটি হচ্ছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান সহজে মনের আয়ত্ত হয়, অপরটি হচ্ছে—শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত সম্পদ হয় না, পক্ষান্তরে দেশজোড়া অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করতে সাহায্য করে—এমনি ভাবেই জ্ঞান সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

একদা রবীন্দ্রনাথ ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করেছিলেন,—"একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশজুড়ে পাতা হোক্। এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষা-পাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে এইটি দেখবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সেরকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়ে আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোন কারণ দেখিনে।" কিন্তু আজও অবধি বিশ্ববিদ্যালয় গুরুদেবের ঐ অনুরোধ রক্ষা করেন নি; তাই তিনি বিশ্বভারতীর মাধ্যমে ঐরূপ পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন তো করেছিলেন-ই, অধিকন্তু ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে সংগৃহীত জ্ঞান যাতে জনসাধারণ লাভ করতে পারে, তারই জন্য তিনি "বিশ্ববিদ্যালয়-সংগ্রহ-গ্রন্থমালা" প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন ও নিজে বিজ্ঞানের বই লিখে ঐ বিপুল জ্ঞান-দান-যজ্ঞের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বভারতী এক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত হওয়ায় 'লোক-শিক্ষা-পরিষদ' দ্বারা গৃহীত পরীক্ষা কি আর বিশ্বভারতী কর্তৃক স্বীকৃত হবে?

দেশজোড়া পরীক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন

রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার সংগে জীবনের নিবিড় সংযোগ থাকা চাই। "শিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে বিদ্যালয়ের গড়া কৃত্রিম সামগ্রী করে তুললে তার অনেকখানিই আমাদের পক্ষে ব্যর্থ হয়।" তিনি বেদনাহত চিত্তে লিখেছেন,"আমাদের ভাব, ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গিয়াছে,—

মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে।" তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বোঝাতে চেয়েছেন,— "আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnology বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশের যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত, পোদ-বাগ্দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড় একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে।" তাই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন,—'জ্ঞান-শিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে-বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকেই অবলম্বন করিয়া হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই।" রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানের এই সূত্রটিকেই রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আশ্রমের গাছপালা, পশুপক্ষী প্রভৃতি বিশ্বপ্রকৃতির এই উপাদানগুলির সংগেই যে শুধু আশ্রম-ছাত্রছাত্রীগণের সম্পর্ক আছে তাই নয়, ভুবনডাঙা গ্রাম ও সাঁওতাল পাড়াগুলির সম্যক পরিচয়ও তাদের পেতে হয়। জীবনকে পেতে হলে জীবনকেই ছুঁয়ে যেতে হয়। জীবনহীন শিক্ষার ভিতর দিয়ে জীবনকে ধ্বংসই করা হয়—তাকে পাওয়ার আশা দুরাশার নামান্তর। শিক্ষা ও জীবনের পূর্ণ সমন্বয় সাধনই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসত্রের মূল কথা।

শিক্ষার সংগে জীবনের সংযোগ

জীবনের সংগে শিক্ষার সহজ ও সুনিবিড় সম্পর্ক না থাকায় ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় আমাদের শিক্ষা কোনরূপ সক্রিয় শক্তি সঞ্চারিত তো করেইনি, উপরন্তু প্রত্যহের অনাড়ম্বর সরলতাকে চালিত করেছে আড়ম্বরময় জটিলতার দিকে। ফলে ঘটেছে জীবনের পরাজয়। সারা জগৎকে পুঁথির দর্পণে চিনতে গিয়ে, দেখতে গিয়ে ও বুঝতে গিয়েই আমরা ভুলের বালুচর তৈরী করছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"বই পড়াটাই যে শেখা ছেলেদের মনে এই অন্ধ সংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়।" কারণ,— পুঁথি-আবরণ বিদ্যায় মন এমনই মোহ-বিমূঢ় হয় যে সকল সচেতন সজীবতা যায় হারিয়ে, পুঁথির বাঁধনে মন হয় পংগু নির্জীব ও জড়। আসল কথা, পুঁথির বুলিকে আমরা শৈশবকাল থেকে আপন বুদ্ধির আগুনে ঝলসিয়ে নিতে শিখিনি, ব্যবহারিক বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে শিখিনি, শৈশব থেকে কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে স্বাধীনভাবে বিকশিত করে তুলতে শিখিনি। "জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই" বলেই আমাদের এই ভীষণ দুর্গতি। পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষাই বয়সে সাবালক মানুষকেও করে রাখছে বুদ্ধিতে চির-নাবালক। জীবনে শিক্ষার এ কী নিদারুণ মর্মান্তিক পরাজয়!

পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষার গলদ

রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে আনন্দহীন শিক্ষার বেদনায় জরজর হয়েছিলেন। তাই চিত্তবিকর্ষণমূলক পাঠশালাগত শিক্ষায় তিনি এগুতে পারেন নি। শিক্ষার সংগে আনন্দের যোগ থাকা চাই—বলতে কি, শিক্ষায় আনন্দের স্থান সকলের উপরে। কারণ, "আনন্দের সংগে পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিত ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, গ্রহণ-শক্তি, ধারণা-শক্তি, চিন্তা-শক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক ভাবে বল লাভ করে; আনন্দের ভিতর দিয়া মুক্তির হাওয়ার মধ্যে শিশুচিত্ত যেমন বিকশিত হয়, তেমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়।" তাই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে আনন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, আনন্দ হচ্ছে একজাতীয় জারক-রস, যা অধীত বিদ্যাকে হজম করতে মনকে সাহায্য করে। "যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না।" ইস্কুলে ব্যাকরণের সূত্রাদি, শব্দার্থ, অংক-কষা প্রভৃতি ছাড়াও যা ছাত্রদের প্রাপ্য, তা তো ঐ বেত ও 'মাষ্টারের কটু গালি'। ফলে শিক্ষার্থীর কাছে ইস্কুল হয় কারাগার। তাই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মুক্ত আকাশের নীচে ধরিত্রী মাতার বক্ষোদেশে ইস্কুল বসিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সংগে শিশু-প্রকৃতির যোগসাধন করতে চেয়েছিলেন। অবশ্যপাঠ্য বিষয়গুলির সংগে অনাবশ্যক বহু বিষয় মিশিয়ে শিশুমনের সহজ কৌতূহল জাগিয়ে আনন্দের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। জ্ঞান চিত্তাকর্ষক না হলে তরুণ মন তাতে সাড়া দেয় না। তাই আজ বেত নির্বাসিত হয়েছে বিদ্যালয় থেকে, ফুলফল পশুপক্ষীর ছবি সমাদর পাচ্ছে বিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে। প্রায় অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের মর্যাদা পেয়েছে আবৃত্তি ও সংগীতানুশীলন।

শিক্ষার সংগে আনন্দের সংমিশ্রণ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় যে পাঠ্যতালিকা অনুসৃত হয়, তার মধ্যে মনের ঐশ্বর্য ও চিন্তার স্বকীয়তা বাড়ানোর উপকরণ বড় বেশী থাকে না। শৈশবকাল থেকেই শিশুদিগের শিক্ষায় স্বাধীনতা দিতে হবে। কেবলমাত্র স্মরণশক্তির উপরে নির্ভর না করে চিন্তা-শক্তি ও কল্পনা-শক্তির স্বাধীন পরিচালনায় নব নব বিস্ময় ও কৌতূহলের মধ্যে দিয়ে যদি শিশুশিক্ষা অগ্রসর হয়, তবেই শিশুর সমগ্র জীবন যথাকালে হবে সরস, হবে ফলপ্রসূ। অপরিমিত আশা ও চিন্তার আলো শিশুমনে সর্বদা সঞ্চারিত করে' রাখ্‌তে পারলেই প্রকৃত স্বাধীন শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠে।

স্বাধীন শিক্ষা

আমাদের শিক্ষা যাতে অন্তরের রসে রসায়িত হয়, আমাদের জ্ঞান ও কর্ম যাতে অন্তঃপ্রবাহী প্রাণধারার মত বয়ে চলে, আমাদের মননশীলতার বনিয়াদ যাতে ভিতরে

ভিতরে সুদৃঢ় হয়, তার দিকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও, তাহাদিগকে এই ভূমির আলিংগন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না।...বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্যে বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষ লীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও।" ষড়ঋতুর উৎসবে লীলায়িত প্রাণময়ী প্রকৃতির রঙ্‌মহলে, চেয়ার-বেঞ্চি-টেবিল-ডেস্ক-বর্জিত উন্মুক্ত প্রকৃতির পাঠশালায় শিশুশিক্ষার কথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, শিশুশিক্ষার প্রধান উপাদান প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও প্রকৃতি-পরিচর্যা। প্রথমটিতে জাগে মন, বাড়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি এবং দ্বিতীয়টিতে বিবিধ হৃদয়বৃত্তি পায় স্ফূর্তি। পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে পরিবেশগত শিক্ষাকেই রবীন্দ্রনাথ প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী। পারিপার্শ্বিকের সংগে পরিচিত হলে শিশুমন পায় উৎসাহ, শিশুর স্বভাবজাত গুণ হয় বিকশিত। নিছক প্রকৃতির সংগে একটা আনন্দময় যোগসাধনই নয়, পার্শ্ববর্তী লোকালয়ের জনগণকে জেনে তাদের জীবনযাত্রার বহুবিচিত্র সমস্যার সংগে পরিচিত হতে পারলেই আদর্শমণ্ডিত পরিবেশগত শিক্ষার সফলতা প্রকাশ পায়। এই শিক্ষাধারায় শিশুমনে দেশপ্রীতিও সত্য হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিশু যখন স্বাধীনভাবে কাঠ মাটি দিয়ে পুতুল গড়ে, তখন তাতে শিশুমনই পায় রূপ। সাহিত্য শিল্পকলা চিত্রকলা সংগীতবিদ্যা প্রভৃতির চর্চায় ঘটে শিশুশক্তির বিকাশ, শিশুচরিত্র হয় সমুন্নত, শিশুমনের বল পায় বৃদ্ধি। শিক্ষার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের এই সর্বাংগীণ বিকাশই চেয়েছিলেন। শিশুর স্বাস্থ্যচর্চার দিকেও ছিল তাঁর লক্ষ্য। আবার গানে গল্পে অভিনয়ে খেলাধুলায় ভ্রমণে শিশুর আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা যাতে রূপ পায়, তাও তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও পুরাপুরি ভাবসর্বস্ব ছিলেন না। তাই তিনি শান্তিনিকেতন কলাবিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্থাপন করেছিলেন শ্রীনিকেতন বিদ্যালয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে তিনি ভাবমূলক শিক্ষার বাহনরূপে প্রবর্তিত করে যে সর্বাংগসম্পূর্ণ নবশিক্ষাদর্শ আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, তা দেশে দেশে প্রচলিত শিক্ষার রকমারি পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে কেবলমাত্র অন্যতমই নয়, হয়তো-বা প্রথমতই।

শিক্ষা-পরিকল্পনা

শিক্ষার উদ্দেশ্য যাতে ব্যর্থ না হয়, তাহারই জন্য রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে সতর্ক করবার মানসে বলেছেন,—"শিক্ষা সম্বন্ধে সবচেয়ে স্বীকৃত এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে শিক্ষা জিনিষটা জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসংগ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসংগ সর্বাগ্রে।" পাশ্চাত্যের অনুকরণে

যে সমস্ত বোর্ডিং-ইস্কুল স্থাপিত হয়, সেগুলো রবীন্দ্রনাথের মতে "বারিক, পাগলাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠীভুক্ত।" রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত 'আদর্শ বিদ্যালয়' সেকালের তপোবন-বিদ্যালয় যেমন নয়, একালের পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন ইস্কুলও তেমনি নয়। "লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে" স্থাপিত রবীন্দ্র-পরিকল্পিত 'আদর্শ বিদ্যালয়ে'র "অধ্যাপকগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।... যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সংগে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক;—এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্রেরা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ, ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। কারণ, বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সংগে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাকাইতে থাকিবে।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিজ্ঞানের আরও কয়েকটি সূত্র

রবীন্দ্র-পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুঁথির স্থান বড় নয়, বড় গুরু বা শিক্ষকের ভূমিকা। কারণ, পুঁথির লেখা আর গুরুর মুখের কথার মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। "মুখের কথা তো শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা। তাহার সংগে প্রাণ আছে; চোখমুখের ভংগী, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইংগিত—ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সংগীত ও আকার লাভ করিয়া চোখ মন দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে,—সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সংগে কালের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।" তাই শিক্ষকের "জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হয়।" সত্যি কথা ব'লতে কি, "ছাত্রদের সংগে শিক্ষকদের সম্বন্ধ কেবল শিক্ষাদানের সম্বন্ধ হলে চলবে না,........ যথার্থ আত্মীয়তার সম্বন্ধ হওয়া চাই।" রবীন্দ্রনাথ পুঁথিকে যে কতখানি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর স্বপ্নে গড়া 'পথচারী বিদ্যালয়ের' মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"ভ্রমণ করতে করতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। তার কারণ কেবলমাত্র এ নয় যে, ভ্রমণে নানা বিষয় পর্যবেক্ষণের দ্বারা আয়ত্ত হয়, তার কারণ এই যে, নিত্যই নূতনের সংযোগ এবং অন্তর-বাহিরে উভয়ের সম্মিলিত পদক্ষেপে আমাদের জাগরূক চিত্তবৃত্তি সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় ছাত্রেরা শিক্ষার বিষয়ে যা কিছু পায় তাকে গ্রহণ করা তার পক্ষে সহজ হয়।"

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনা অনেকেরই কাছে বাস্তব বুদ্ধিহীন স্বপ্নচারী কবির কল্পনাবিলাস নামে আখ্যাত ও উপহসিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির ডালপালাগুলো ক্ষেত্রবিশেষে ছাঁটাই হলেও মূল সূত্রগুলো বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ইতিপূর্বেই গৃহীত হয়েছে অথবা এখন হচ্ছে। বর্তমানে মাতৃভাষাই ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন। জীবনের সংগে শিক্ষার যোগসাধনের প্রয়োজনীয়তাও আজকের এই জীবনভিত্তিক ও কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্র-পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতিরই মূল সূত্রানুসারে শিক্ষাসংস্কার হলেও প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনারও অবশ্য শেষ নেই। আজ্‌কের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যর্থ বলা হয় প্রধানত এই কারণে যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাকরী পায় না বা পেলেও ভাল পায় না। তার উত্তরে এইটুকুই বলতে চাই যে, রবীন্দ্র প্রবর্তিত শিক্ষা অর্থকরী শিক্ষা নয়—মৌলিক শিক্ষা। তাই যদি হয়, তবে অর্থোপার্জনে 'অকেজো' শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। রবীন্দ্রনাথ এক দিকে যেমন অর্থোপার্জনের চেষ্টাকে জাগানোর জন্য শ্রীনিকেতনে এক বিরাট্ প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, অপর দিকে তেমনি দেশবাসীদিগকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করবার মানসে তিনি যা স্থাপন করেছেন তা ঐ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিজ্ঞানের সমালোচনা

ভারতে সর্বোদয় ও ভূদান-যজ্ঞ

জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, তাহাই সর্বোদয় পরিকল্পনা। আর্থিক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক—জীবনের এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং আন্তর বিশুদ্ধি দ্বারা নূতনতর সমাজগঠনই সর্বোদয় পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু-বার্ষিকী দিনটি 'সর্বোদয় দিবস' নামে অভিহিত। এই দিনটিতে ন্যায় ও অহিংসার ভিত্তিতে এক সুষ্ঠু সমাজ-গঠনের সংকল্প লইয়া স্বাভাবিক মানবজীবন যাহাতে সমানাধিকারের ভিত্তিতে অব্যাহতভাবে বিকাশ লাভ করে, তাহারই প্রতিজ্ঞা অংগীকৃত হয়। শোষণহীন শ্রেণীহীন অহিংস সমুন্নত সমাজসৃষ্টিই এই মতবাদের প্রধান লক্ষ্য। গান্ধীজীর 'বাস্তব দার্শনিক মতবাদে'র অভিব্যক্তি হইয়াছে এই সর্বোদয় মতবাদে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত সর্বোদয়-সম্মেলনে গৃহীত পরিকল্পনাই

সর্বোদয় পরিকল্পনার সংজ্ঞা ও ইহার উদ্ভব

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২০-এ জানুয়ারীতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়। এই প্রস্তাব অনুসরণেই ভারতের পরিকল্পনা-কমিশন গঠিত।

সর্বোদয় পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে এইগুলি—(১) শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনায় আর্থিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য দান; (২) বিকেন্দ্রীভূত আর্থিক ব্যবস্থাকে কায়েমীকরণ ও গ্রামগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দান; (৩) সকলের ন্যূনতম জীবনমান নির্ণয়; (৪) 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই নীতির ব্যাপক প্রচার; (৫) কৃষিপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন; (৬) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন কুটীরশিল্পের মধ্যে সংযোগ সাধন; (৭) জমির রাষ্ট্রীয়করণ এবং মাটি ও মানুষের মিলন সাধন; (৮) শান্তিসৈন্য ও কৃষিসৈন্য গঠন করিয়া মানুষে-মানুষে প্রীতি-প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধকরণ; (৯) শ্রমের মর্যাদাদান ইত্যাদি।

সর্বোদয় পরিকল্পনার অর্থনৈতিক দিক

গান্ধীবাদীয় অর্থনীতিতে মহাত্মা গান্ধী এমন এক সমাজ চাহিয়াছিলেন—যেখানে ধনী ও দরিদ্র বলিয়া কোন শ্রেণীবিভাগ থাকিবে না, যেখানে মানবসমাজের উৎপাদন, বণ্টন ও কর্মধারা সর্বতোভাবে অসত্য ও হিংসার পথ পরিহার করিয়া চলিবে। সর্বোদয় অর্থনীতিরও মূলকথা ইহাই। শোষণ-শৃংখলমুক্ত সমানাধিকার ও আত্মবিকাশের সর্বাংগীণ উপায়নির্ণয়ই এই অর্থনীতির মূলকথা। সর্বোদয় পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প, যন্ত্রশিল্প অস্বীকৃত হয় নাই—পরন্তু যন্ত্রের প্রসার হোক, সকলের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আসুক—ইহাই কাম্য। তবে নব নব বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যান্ত্রিক প্রচেষ্টা যেন ক্ষুদ্রায়তন কুটীরশিল্পকেও প্রাণবন্ত সমুন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়া তোলে, ইহাই লক্ষ্য। মুষ্টিমেয় নগরের উন্নতিতে পল্লীপ্রাণ ভারতের পল্লীগুলিকে বঞ্চিত না করা এবং নগরের সহিত পল্লীর নাড়ীর যোগসাধন সর্বোদয় মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা।

গান্ধীবাদীয় অর্থনীতির সহিত সর্বোদয় মতবাদের সংগতি

সাংসারিক ও সামাজিক শান্তি সমৃদ্ধিই সর্বোদয়ের লক্ষ্য। সত্য প্রেম ও মনুষ্যত্বের আলোকে মানবসমাজের পুনর্গঠন ও সর্ববিধ 'বাদ' ও বিবাদকে একটি শৃংখলাময় সমন্বয়ের মধ্যে আনয়নই সর্বোদয় মতবাদের আদর্শ। সমাজ ও সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া কেবল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাববাষ্পের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা নয়—ইহার প্রতিষ্ঠাভূমি মানবসমাজ। যন্ত্রবিজ্ঞানের চরম উন্নতি কিংবা সমাজতন্ত্রের বস্তুবাদও ইহার লক্ষ্য নয়। মানবের শুভ বুদ্ধির উদ্বোধন, মানুষে মানুষে হৃদয়গত মিলন, সহিষ্ণুতা প্রীতি ও মৈত্রী ভাবের বিকাশ সাধনই সর্বোদয়ের মূল আদর্শ। সাম্রাজ্যবাদী অহিংসক সমাজগঠনই সর্বোদয়ের লক্ষ্য। রাজনৈতিক শাসনহীন বা

সর্বোদয় মতবাদের মূল আদর্শ

দণ্ডহীন সমাজ, শ্রেণীহীন সমাজগঠনই সর্বোদয়ের চরম রূপ। ব্যক্তিস্বার্থকে সমষ্টির স্বার্থে রূপান্তরীকরণ, দণ্ডহীন স্বাবলম্বী সহযোগিতামূলক সমাজ-গঠন যেমন ইহার মূল লক্ষ্য, তেমনি বিকেন্দ্রিক অর্থনীতির পটভূমিকায় শ্রমাশ্রিত নূতন সমাজগঠনও ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ভূমিকে পুঁজির হাত হইতে শ্রমের হাতে অর্পণ করাই শুধু নয়, পুঁজিনিরপেক্ষ উৎপাদনপদ্ধতি চালু করাও সর্বোদয়ের মূল কথা। অর্থাৎ সর্বোদয় পদ্ধতিটি পুঁজিবাদী নয়—পুরাপুরি শ্রমবাদী। কাজেই সর্বোদয় পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হইতেছে নেতৃত্ব পরিবর্তন। তবে সে নেতৃত্ব মজুর-শ্রেণীর হাত হইতে মজুরশ্রেণীর হাতেই আসিবে এমন কথা নয়। যিনি শ্রমের বিনিময়ে কিছু পাইবার অভিলাষী, তিনিই হইবেন 'শান্তিসৈনিক'। তাঁহারই হাতে অর্পিত হইবে নেতৃত্ব। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন আবশ্যক। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন,—"সর্বোদয়ের আদর্শ মানুষ গ্রহণ করিলে কায়েমী স্বার্থ ও অবৈধ শোষণের অন্যায় মুনাফা ও অনুচিত সঞ্চয়ের মনোভাব আপনিই দূর হইয়া যাইবে। আপনা হইতেই সামাজিক দারিদ্র্য ঘুচিবে—ধনীদরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চনীচ—নানা পর্যায়ে বিভক্ত বর্তমান সামাজিক বৈষম্য ঘুচিবে।"

সর্বোদয় বনাম ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম্

সর্বোদয় মতবাদে ধনতন্ত্রের শোষণবাদ যেমন অস্বীকৃত, তেমনি সমাজতন্ত্রবাদ বা কম্যুনিজমের বস্তুসর্বস্বতাও পরিত্যক্ত। সর্বোদয় মতবাদ সমাজবাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত সন্দেহ নাই। কিন্তু বলপ্রয়োগ কিংবা হিংসা সর্বোদয় মতবাদের অংগীভূত নয়, ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা-হরণের কোন সুযোগ সুবিধা সর্বোদয় মতবাদে স্থান পায় নাই। কৃষি শিল্প বাণিজ্যের সমবায়ীকরণ ও সমবণ্টনকে এই মতবাদ সমর্থন করে। সর্বোদয়বাদে উচ্চ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যমান প্রবর্তন করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনকে নবরূপ দানের কথা সমর্থিত হইয়াছে এবং তাহাতেই কেবল শোষণহীন পীড়নহীন সাম্যাশ্রিত নূতন সমাজসৃষ্টি সম্ভব। সর্বোদয়ের মর্মস্থলে আছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের স্বীকৃতি, কিন্তু বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসিদ্ধ সোশ্যালিজমে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদে তাহা নাই। তবে একথা ঠিক যে, সর্বোদয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলাদর্শটি গৃহীত হইয়াছে।

আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিজীবন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গোষ্ঠীজীবনের আদর্শ প্রবর্তনা ও দেশের চরম দারিদ্র্য নিপাত করাই সর্বোদয়ের লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, ভূমিহীনকে ভূমিদান ও মাটির সহিত তাহার সংযোগ সাধনও সর্বোদয় মতবাদের লক্ষ্য। তাই মহাত্মা গান্ধীর অন্তরংগ সহচর আচার্য বিনোবা ভাবে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিক্ষুব্ধ হায়দ্রাবাদের পোচম পল্লীর

ভূদান-যজ্ঞের আবির্ভাব

প্রার্থনা-সভায় 'ভূদান-যজ্ঞ' বা ভূমি-দান আন্দোলন সুরু করিলেন। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তেলেংগানা অঞ্চলে ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লওয়া ও কর্মীদের মধ্যে উহার বণ্টন আরম্ভ হইলে আচার্য বিনোবা যে শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন, তাহাই 'ভূদান-যজ্ঞ' নামে পরিচিত। আচার্য ভাবের মতে, এই আন্দোলন এক ধরণের সত্যাগ্রহই বটে। সর্বপ্রথম হায়দ্রাবাদের সর্বহারা ৮০টি পরিবারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডীর নিকট হইতে তিনি ১০০ একর জমি পাইলেন। হায়দ্রাবাদের প্রার্থনা-সভায় বিনোবাজী বলিয়াছেন,—'রাজতন্ত্রের যুগ চলে গেছে, অভিজাততন্ত্রের যুগও শেষ, প্রজাতন্ত্রের দিনও ফুরিয়েছে, আজ আগত সর্বরাজের দিন।— ভূদান-যজ্ঞই সর্বরাজের প্রতিষ্ঠা ক'রব, রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তুলবে।'

ভারতের অর্থনীতি ভূমিভিত্তিক। সেইজন্য ভূমিসংস্কার, ভূমিহীনকে ভূমিদান সর্বোদয়ের অন্যতম আদর্শ। বিনোবাজী সেই ভূমিসংস্কারার্থে যে বিপ্লবাত্মক অথচ অহিংসাত্মক কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই ভূদান-যজ্ঞ। কিন্তু তাঁহার মতে ইহা 'প্রজাসূয় যজ্ঞ।' এই যজ্ঞে প্রজার হয় অভিষেক, ধরিত্রীর সংগে সন্তানের হয় মিলন। ভারতের ভূমি সংস্কার প্রধানত যে পন্থায় সম্ভব বলিয়া দেশীয় সরকার ও বিভিন্ন মতবাদ বিশ্বাস করে, তাহা বলপ্রয়োগে অথবা আইনপ্রণয়নে। কিন্তু বিনোবাজী ঐ দুইটি মতের কোনটিকেই গ্রহণ না করিয়া হৃদয়ের পরিবর্তন সাধনে রত হইয়াছেন। সমাজে সকলেরই অবস্থিতি বাঞ্ছনীয় ও কাম্য। কাজেই জমির মালিকানা গ্রামের। গ্রাম হইবে জমির ভগবান। জমিদার তাঁহার একষষ্ঠাংশ ভূমিহীনকে দান করিয়া নূতন সমাজপত্তনে সাহায্য করিবেন, আর তাহার সংগে দিবেন হৃদয়ের প্রীতি। ইহাই ভূদান-যজ্ঞের অন্তর্নিহিত সত্যস্বরূপ।

ভূদান-যজ্ঞের পটভূমি

আচার্য ভাবে এই ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ৫ কোটি একর জমি সংগ্রহ করিয়া ভারতের ৫ লক্ষ গ্রামের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি চাষী-পরিবারকে ৫ একর করিয়া জমি দিয়া নূতন সমাজের পত্তন করিবেন। এই আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই বহু 'ভূদান সমিতি' গঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় সরকার সমর্থন জানাইয়াছেন। কোন কোন রাষ্ট্রে ইতিমধ্যে হয় ভূদান-আইন পাশ হইয়াছে, নয় পাশ হইবার ব্যবস্থা হইতেছে, যাহাতে ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে ভূমিদান ও বণ্টন সহজসাধ্য হয়। ইতিমধ্যে আহৃত ভূমি বণ্টনের জন্য মধ্যপ্রদেশে 'ভূদান-যজ্ঞ বোর্ড' গঠিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভূমিদানেই শুধু নয়, রাষ্ট্রীয় সরকারসমূহও চাষযোগ্য পতিত জমি অথবা নব সংস্কৃত ভূমি দান করিয়া এই আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। যেমন, ধরা যাইতে পারে মধ্যভারত

ভূদান-যজ্ঞের অগ্রগতি ও লক্ষ্য

সরকারের কথা। ঐ রাষ্ট্রীয় সরকার ২ লক্ষ একর জমি দান করিয়াছেন। বিহারের রামগড়ের রাজা যে বৃহত্তম ব্যক্তিগত ভূমিদান করিয়াছেন তাহার পরিমাণ ২½ লক্ষ একর। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৫১৯২৬০৬ একর জমি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। মোট দাতার সংখ্যা হইল ৫৬২৪০১। ভূমিহীন চাষীর মধ্যে বণ্টিত ভূমির আয়তন মোট ৪৯০৮৩৩ একর। এই আন্দোলনে ১৬৪৫৪০ পরিবারেরও অধিক উপকৃত হইয়াছে। বর্তমানে নিখিল ভারতব্যাপী এই আন্দোলনের প্রসারতা ও অগ্রগতি সত্যই সন্তোষজনক সন্দেহ নাই।

ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে ভূমি-পুনর্বণ্টন সমস্যার সমাধানই হইতেছে এই ভূদান-যজ্ঞের সব চেয়ে বড় অবদান। ভূমি-সংস্কারের নানাবিধ আইনকানুন পাশ হইয়াছে অথবা পাশ করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে সত্য, কিন্তু ঐ সমস্ত আইনকানুন ভূমিহীন চাষীকে নয়, রায়তকেই সাহায্য করিবে। ভূমিহীন চাষীর নিকটে ভূমির যোগান একমাত্র ভূদান-যজ্ঞের আনুকূল্যেই সম্ভব। অবশ্য এই যজ্ঞের একটা নৈতিক মূল্যও আছে। কারণ, যে-ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ও হিংসাত্মক উপায় অবলম্বিত হইতে পারিত, সেখানে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ও অহিংস প্রণালী অনুসৃত হইতেছে। সাম্য, সদিচ্ছা ও সমবায়মূলক প্রচেষ্টার একটি সুন্দর পরিস্থিতি রচনা করিয়া এই ভূমিদান আন্দোলনটি ভারতীয় সমাজের মনস্তত্ত্বের চূড়ান্ত পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। ইতিমধ্যেই উহা পরিলক্ষিত হইতেছে। 'শ্রমদান' 'বুদ্ধিদান', 'সম্পত্তিদান', 'জীবনদান' প্রভৃতির ন্যায় অপরাপর দানও এক্ষণে দেখা যাইতেছে। এই ভূদান-যজ্ঞের একটি উল্লেখযোগ্য ফলও আমরা আশা করি। কারণ, এই দেশে দূরপ্রসারী ভূমিসংস্কারাদির প্রবর্তন ব্যাপারে এই আন্দোলন অনুকূল পরিবেশই রচনা করিতেছে

ভূদান-যজ্ঞের তাৎপর্য

পরিশেষে একটি কথা। এই ভূদান-যজ্ঞের গুরুত্ব কিছুমাত্র খর্ব না করিয়া বলা যায় যে, এই আন্দোলন ভূমিহীন চাষীদের উন্নয়নমূলক অপরাপর প্রণালীর একটি বিকল্প ব্যবস্থা নয়। বলা বাহুল্য, জোতজমির একটা আদর্শ প্রণালীও ইহাতে মিলে না। ভূমিদান পাইবার জন্য নির্বাচিত চাষীদিগকে সমবায়মূলক চাষী-সমিতির মধ্যে সংগঠিত না করিতে পারিলে নবসৃষ্ট খণ্ড খণ্ড জোতজমির মালিকেরা আদৌ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ভূমি-সংস্কারের পদ্ধতিকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য সরকার অবশ্যই প্রয়াস পাইবেন। এই আন্দোলনে কৃষিমজুরেরা কিছুটা সাহায্য পাইতে পারে এবং তাহাদের বৈষয়িক ও নৈতিক দিকের উন্নতিও ঘটিতে পারে। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ভূমিহীন চাষীদের

উপসংহার

সমস্যাকে এই ভূদান-যজ্ঞ পুরাপুরি সমাধান আদৌ করিতে পারিবে না। এই আন্দোলনের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক অপরাপর উপায়ও অবশ্যই গৃহীত হওয়া সমীচীন।

ভারতের বন-মহোৎসব

জাতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসাবে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সর্বপ্রথম 'বন-মহোৎসব' অথবা 'অধিক বৃক্ষ ফলাও' অভিযান তৎকালীন কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রী কে. এম্. মুন্সী কর্তৃক উদ্‌যাপিত হইলেও, বনস্পতি মানবসভ্যতার সেই আদিম ঊষা হইতেই বিদ্যমান। ইহা আমাদের নূতন আবিষ্কার নয়। বৈদিক যুগে ঋষিরা বলিয়াছেন 'ঋষয়ঃ বনিণঃ জুষন্তি' অর্থাৎ 'ঋষিরা বনবাসীদের সেবা করে'। ভারতের সভ্যতা তপোবনেই উদ্ভূত। আর্যধর্মের চতুরাশ্রমের ব্রহ্মচর্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অতিবাহিত হইত ঐ তপোবনেই। তপোবনের ঋষিরা ছিলেন সভ্যতার পরিপোষক ধর্মনীতি রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতির পুরোহিত। তাহাদের সুললিত বাণী আজও ভারত বিস্মৃত হয় নাই। তপোবনের বৃক্ষরাজির সংগে মানুষের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। একই পরিবারের আপন জন ছিল তপোবনের বৃক্ষলতাদি। তাপস-কন্যাগণের আলবালে জলসেচন—বিদায়ক্ষণে সাশ্রুনয়নে বনতোষিণীকে আলিংগন—বৃক্ষপল্লবকে সাদর চুম্বন—কি নিবিড় আত্মীয়তারই-না সাক্ষ্য দান করে। আরণ্যক সভ্যতার প্রতিভূ ভারত সেইজন্য বৃক্ষকে চিরকালই আত্মীয় ভাবিয়াছে। ধর্মের অংগরূপে বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা বা রোপণকে সে গ্রহণ করিয়াছে। বনস্পতিকে দেবতাজ্ঞান অজ্ঞতার নামান্তর নয়। আধ্যাত্মিক দিক দিয়া ভারতের এমন গৌরবময় উন্নতি পৃথিবীর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। সেই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বৃক্ষপ্রতিষ্ঠান তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে জানা যায়, প্রাণের বিকাশসাধনই বন-মহোৎসবের মূল মর্ম। বৃক্ষের প্রাণ আবিষ্কার আধুনিক বৈজ্ঞানিকের কীর্তি হইলেও ভারতের তপোবনসম্মত ঐ অধ্যাত্ম-উপলব্ধি ও আবিষ্কার কিন্তু প্রাচীন কালেরই। সেইজন্য বাজের মধ্যবর্তী আত্মাকে বিকাশের সুযোগ দিয়া সনাতনের পথে মুক্তিদানই বন-মহোৎসবের লক্ষ্য। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগেও এই উপলব্ধি, এই ব্যবস্থা চালু ছিল। রাজতন্ত্রের যুগেও রাজন্যবর্গ তপোবনকে শান্তি প্রীতি ও আদর্শের নিকেতন বলিয়া ভাবিতেন। রাজপুরোহিতগণ থাকিতেন তপোবনে। তারপর ঐতিহাসিক যুগেও বৃক্ষরোপণ অজ্ঞাত ছিল না। জনকল্যাণের সুমহান্ আদর্শ সম্রাট্ অশোককে বৃক্ষরোপণের প্রেরণা দান করিয়াছিল। অশোকের শিলালিপিতে লিখিত আছে—'আমি পথিপার্শ্বে বটবৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ রোপণ করেছি—এরা মানুষ আর পশুকে সুশীতল ছায়া ও ফল দান করবে।'

সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ধারায় বনের স্থান ও অবদান

ভারতীয় সভ্যতার সূতিকাগার ঐ অরণ্যকে মানুষের লোভ যেদিন ধ্বংস করিয়া উহাকে নগর, জনপদ ও কৃষিক্ষেত্র প্রসারের জন্য নিয়োগ করিয়া তুলিল আর অধ্যাত্ম-উপলব্ধি যে দিন মানুষ হারাইল, সেইদিন অরণ্যভূমি যাত্রা করিল বিলুপ্তির পথে। প্রকৃতির শ্যামল স্নিগ্ধতা বিদূরিত হইল—রুক্ষকঠোর রসনা বিস্তৃত করিয়া মরু-অজগর আগাইয়া চলিল সভ্যতার প্রাণনাশ করিতে। প্রচণ্ড উত্তাপে ধরিত্রীর বক্ষ হইল উত্তপ্ত। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, ভারতের রাজপুতানার মরুভূমির ক্রমবিস্তৃতি নাকি বৃক্ষহীনতারই জন্য, ভারতের নানা স্থানে আধুনিক কালের ঋতুবিপর্যয় বৃষ্টিহীনতা ও রুক্ষতা নাকি অরণ্যসম্পদহীনতারই পরিচায়ক। বিজ্ঞান সেই দৈব-বিপর্যয়ের হেতু অন্বেষণে মনোনিবেশ করিল। তাহারই আবিষ্কার এই 'বন-মহোৎসব'। বিজ্ঞান বলিল, পরিকল্পনা-অনুসারে মহীরুহ রোপণ করিয়া জনপদ ও অরণ্যের ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে অদূরভবিষ্যতে শ্যামল ধরিত্রী মনুষ্যবসতির পক্ষে অযোগ্য মরুতে পরিণত হইবে। ভারতের বন-মহোৎসব সেই মানবকল্যাণব্রতের ধারক ও বাহক। তাই স্বাধীনতা লাভের পর বৃক্ষরোপণ জাতীয় উৎসবরূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বর্ষা-ঋতুতে সরকারী রাস্তার ধারে ধারে ও পতিত জমিতে অসংখ্য বৃক্ষশিশু তথা চারাগাছ রোপিত হইতেছে। এই বৃক্ষরোপণ উৎসবই বন-মহোৎসব।

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার কুঠারাঘাতে বননাশ ও ইহার প্রতিকারকল্পে 'বন-মহোৎসব' উদ্‌যাপন

মানবসভ্যতার আদিকাল হইতেই গাছের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গাছপালা নিত্য প্রয়োজনীয় ইন্ধন দান করে, গৃহ ও গৃহসজ্জা নির্মাণের উপকরণও যোগায়। পশুর খাদ্য, মধু, নানারূপ রং প্রভৃতি পাওয়া যায় অরণ্য হইতেই। জমির সার, রোগীর ঔষধ, কত রকমের সুমিষ্ট ফল, কত রং-বেরঙের ফুলই-না অরণ্য দান করে। ইহা ছাড়া অরণ্যানী পরিবেশকে করিয়া তোলে মনোরম, বাতাসকে করে বিশুদ্ধ। উহার শ্যাম শোভা কামনাকে দেয় মুক্তি, দান করে সুস্নিগ্ধ সুশীতল ছায়া। এই সহজলভ্য ও সহজদৃষ্ট উপকার ব্যতীত বৃক্ষরাজি মানবের আরও অশেষ কল্যাণ সাধন করে। ইহা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, ভূমিক্ষয় নিবারণ করে, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর অধিক নিম্নে নামিতে দেয় না, দেশের শীতাতপ ও বর্ষার মৃদুতা অথবা তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে, বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পকে আকর্ষণ করিয়া বৃষ্টিপাত ঘটায়, জলবায়ুকে সুসহ করিয়া রাখে। সত্যই বনস্পতি মানসিক সাংস্কৃতিক অথ নৈতিক প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে।

বৃক্ষরাজির উপকারিতা ও প্রয়োজন

বন-মহোৎসবের প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৩ কোটি বৃক্ষরোপণের লক্ষ্য স্থির করা হয়। কিন্তু কার্যত ৪ কোটিরও বেশী বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। পরবর্তী বৎসরগুলিতে অনুরূপ পরিমাণ বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। প্রথম বৎসরের রোপিত বৃক্ষগুলির মধ্যে শতকরা ৩৮টি এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে রোপিত বৃক্ষগুলির মধ্যে শতকরা ৫৩টি বৃক্ষ বাঁচিয়া আছে। সত্যই বন-মহোৎসব সাধারণের মধ্যে বেশ উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে। সরকার জনগণের উৎসাহ বর্ধনার্থে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার চার প্রকার শীল্ড প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন: (১) রাষ্ট্রপতি শীল্ড—যে-জেলায় সর্বাপেক্ষা বেশী বৃক্ষ রোপিত হয় তাহাকে দেওয়া হয়, (২) পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু শীল্ড—যে-গ্রামে সর্বাপেক্ষা বেশী বৃক্ষ রোপিত হয় তাহাকে প্রদত্ত হয়, (৩) সর্দারজী শীল্ড—যে সমবায়-প্রতিষ্ঠান বা শিল্পায়তন বেশী বৃক্ষ রোপণ করে তাহাকে দেওয়া হয় এবং (৪) মুন্সী শীল্ড—সারা ভারতের মধ্যে যে-বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাপেক্ষা বেশী বৃক্ষ রোপণ করে, সেই এই সৌভাগ্যের হয় অধিকারী। ভারত সরকার ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে ২০টি শীল্ড প্রেরণ করিয়াছেন। পশ্চিম বংগের মেদিনীপুর জেলা ১৯৫১, ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জেলা শীল্ড অর্জনের গৌরব লাভ করিয়াছে এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মুন্সী শীল্ড লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। পশ্চিম বংগের হিসাব হইতে জানা যায়, শতকরা ৪১ হইতে ৭২টি বৃক্ষ বাঁচিয়া আছে। সরকারী ভাবে বলা হইয়াছে, গত ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসরে বন-মহোৎসবের জন্য মোট খরচ হইয়াছে ৭৬ হাজার টাকা, তন্মধ্যে শীল্ডের জন্য খরচ হইয়াছে ২৪ হাজার টাকা। রাজ্যগুলিতেও বীজের খরচ ব্যতীত অন্যভাবে অতিরিক্ত খরচ হয় নাই। এই ব্যয়িত অর্থে ভারতে ৫ কোটি বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী ভাবে অনুসৃত বন-মহোৎসব অনুষ্ঠানের দ্বারা জনচিত্তও ক্রমেই অধিকতর আগ্রহশীল এবং সচেতন হইয়াছে। বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহই সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া পুরস্কার লাভে সমর্থ হইয়াছে।

বন-মহোৎসবের ক্রম-প্রসার এবং সরকারী বদান্যতা ও কর্মপন্থা

ভারতের আয়তন ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইল। সুতরাং ইহাতে ৪ লক্ষ বর্গমাইল বনসন্নিবিষ্ট অরণ্য থাকিলেই যথেষ্ট। ভারতে বৃক্ষরোপণের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। প্রতিরক্ষা বিভাগ, রেলওয়ে, পূর্ত বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, জেলাবোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ জমিতে বৃক্ষরোপণ করিতে পারেন। বৃক্ষরোপণে জনসাধারণ উৎসুক হইলে সরকার সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। গাংগেয় সমভূমিতে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমির চাষ হয়, প্রতি একরে ২টি করিয়া বৃক্ষরোপণ

বৃক্ষরোপণের সম্ভাব্যতা ও লক্ষ্য

করিলে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ বৃক্ষ রোপিত হইতে পারে। অর্থনৈতিক কারণেও ফলবান ও সারবান বৃক্ষরোপণ একান্ত আবশ্যক। তাল, খেজুর, আম, তেঁতুল, শিরিষ, নারিকেল, বেত, বাঁশ, বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষ সহজে বাঁচে এবং লাভও হয় অনায়াসে। মাটির গুণাগুণ বিচার করিয়া বৃক্ষ রোপিত হইলে বৃক্ষশিশুর মৃত্যুর সম্ভাবনা কম এবং অচিরে লাভও হয় প্রচুর। অর্থকরী, কার্যকরী এবং উপকারী—এই তিন দিকেরই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃক্ষরোপণ প্রয়োজন।

জনসাধারণকে বৃক্ষপ্রেমিক করিয়া তোলাই বন-মহোৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্বব্যাপী বিরাট্ জীবনের সংগে যোগস্থাপনে শ্যামল তরুরা সাহায্য করে। সবুজের রং যে প্রাণের রং। অরণ্যের সংগে ভারতীয় জীবনের ও সভ্যতার কিরূপ সম্পর্ক, তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়,—"প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করেনি, বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি।... ঔষধি বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাতে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভংগীতে ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।" বস্তুত আধুনিক ভারতে সরকারী প্রচেষ্টার বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথই তাঁহার শান্তিনিকেতনে বন-মহোৎসবের সূচনা করেন। সত্যদ্রষ্টা কবি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের সভ্যতার সংকট আসন্ন। চতুর্থ বার্ষিক বন-মহোৎসবের উদ্বোধনী-বক্তৃতায় পশ্চিম বংগের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—'কি হিন্দুধর্মে, কি ইহুদীধর্মে, কি খ্রীষ্টধর্মে বা মুসলমানধর্মে যে স্বর্গের কল্পনা আমরা করি, পরজন্মে শান্তি আনন্দ ও উপাসনার যে আশ্রয়নীড় লাভের জন্য আমরা কামনা ও চেষ্টা করি, সেই স্বর্গ, সেই আশ্রয়নীড় মূলত একটি উদ্যানেরই অনুরূপ। সেই উদ্যানে মানুষের অন্তরাত্মার সংগে গাছপালা একই সুরে বাঁধা।' সত্যই বন-মহোৎসবের আদর্শ সুমহান্, ইহার লক্ষ্য মানবকল্যাণ।

বন-মহোৎসবের সুমহান্ আদর্শ ও লক্ষ্য

কিন্তু বন-সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের বড়ই অভাব। প্রকৃতই বৃক্ষশিশুর অকালমৃত্যু নিবারণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েকদিন মহাড়ম্বরে বৃক্ষরোপণ উৎসবের ঘটা দেখিয়া দেশব্যাপী সমালোচনারও অন্ত নাই। সরকার কিংবা প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি উৎসবান্তে বৃক্ষশিশু রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ কেবলমাত্র আড়ম্বর ও ভাষণদানেই সকল শক্তি বিমূঢ় না করেন, তাহা হইলে বন-মহোৎসব অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র জাতির কল্যাণ অবশ্যই আনয়ন করিবে।

শেষ কথা

ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা

পল্লীকেন্দ্রিক ভারতের প্রাণ গ্রামে। ৬ লক্ষ গ্রাম লইয়া ভারতের পূর্ণতা। আবার শতকরা ৬৭ জনেরও বেশী লোক গ্রামের কৃষিকে অবলম্বন করিয়া আছে এবং শতকরা ৯০ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। পল্লীপ্রাণ ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিরক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা। অর্থনৈতিক পটভূমিকায় আধুনিক সভ্যতার সহিত সমান তালে চলিয়া ভারতভূমিকে উন্নত করিতে হইলে গ্রামের মানুষের প্রাণে নূতন আশার আলোক জাগাইতে হইবে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে, সমবায়মূলক প্রচারভিত্তিতে কৃষি স্বাস্থ্য শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিপ্লব আনিতে হইবে। কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছেন, বর্তমানের শোচনীয় আবেষ্টনীর মধ্যে জাতীয় উন্নতি ও প্রগতির কোন আশা নাই। সেইজন্য স্বাধীন ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার সংগে সংগে গঠিত হইয়াছে পরিকল্পনা-সমিতি এবং উহারই হাতে জন্ম লইয়াছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাদ। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ইহারই প্রধানতম অংগ। ইহার ক্রমবর্ধমান আকৃতি ও কার্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'সমাজ উন্নয়ন-মন্ত্রক' (Ministry for Community Development) গঠিত হইয়াছে।

সূচনা

'সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা' কথাটি আধুনিক হইলেও ইহার আদর্শ লক্ষ্য ও ভাবধারা নূতন নয়। প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান ভারতে স্বয়ংপূর্ণ গ্রামের অবস্থিতি নূতন নয়। প্রাচীন কালের বর্ণাশ্রয়ী সমাজব্যবস্থায় উদ্ভূত স্বয়ংপূর্ণ গ্রামগুলিতে ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির সমবেত লেনদেনের ভূমিকা। আজও পল্লীগ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নামে আঞ্চলিক অংশাদি রহিয়াছে এবং সেই সমস্ত স্থানে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার দান এই নগরে নগরে যান্ত্রিকতা-বিস্তারের ফলে ভারতীয় সমাজের ঐ স্বয়ংপূর্ণ অবস্থা আজ বিপর্যস্ত। গণতন্ত্রের বাস্তব প্রতিষ্ঠার তাগিদে গণসংযোগ একান্ত অপরিহার্য হওয়ায় সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছে। কেননা,—সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতা ও স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন না করিলে গণতন্ত্রের বাস্তব প্রতিষ্ঠা অসম্ভব এবং তাহা একমাত্র শিক্ষাবিস্তার ও মানবীয় মর্যাদা-দানের মধ্যেই এক্ষণে আছে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা সেই মহান্ উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাচীন ঐতিহ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুন্নত দেশের জন্য

কারিগরী সাহায্যকল্পে যে চার দফা সাহায্য (Point Four Aid) দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহার জন্যই ভারত এই পরিকল্পনা গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে। এই সাহায্য মার্কিন নিরাপত্তা আইনের অধীন। অবশ্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-প্রদেশের এটাওয়াতে পল্লীসংগঠনের আদর্শ ও গোরক্ষপুর মাদ্রাজ বরোদা প্রভৃতি স্থানে পল্লীসংগঠনের আদর্শ এবং ফরিদাবাদ ও নিলোখেরীতে শহর-সংযুক্ত মিশ্র-পরিকল্পনার আদর্শের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে বলা চলে। 'কমিউনিটি প্রজেক্ট' বা সরজনীন সমাজ-উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণে অতীতের অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী গ্রামোন্নয়নের বিবিধ অভিজ্ঞতাও আছে। অবশেষে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারীতে প্রধান মন্ত্রী নেহেরু ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টারবোল্‌স্‌ যথাক্রমে ভারত ও মার্কিন সরকারের পক্ষ হইতে 'ভারত মার্কিন কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি' (Indo—U S. Technical Co-operation Agreement)-তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামী পাঁচ বৎসর অর্থ-সাহায্য, কারিগরী-শিক্ষায় সাহায্য ও কর্মসূচী পরিচালনায় সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি এবং পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয়ে উপযুক্ত সাহায্য দানেরও আশ্বাস দিয়াছেন।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার আধুনিক রূপ

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধিত এই উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসূচী সুবিস্তৃত। সমগ্র ভারতে ৫৫টি উন্নয়নকেন্দ্র, ৮৪টি উপ-উন্নয়ন কেন্দ্র, ২৫টি শিক্ষাশিবির ও ৫টি শিক্ষাশিবির-সহ উন্নয়নকেন্দ্র কার্যকর করিবার সংকল্প গৃহীত হয়। ভারতের ৬ লক্ষ গ্রাম এবং ২৭৭০ লক্ষ গ্রামবাসীর মধ্যে মোটামুটি ভাবে ৩০ হাজার গ্রাম এবং ২ কোটি গ্রামবাসী এই উন্নয়নের আওতায় পড়ে। ১০০টি পরিবারে বিভক্ত মোট ৫ শত লোকের বাসভূমি প্রতিটি গ্রামই উন্নয়নের ক্ষুদ্রতম অঞ্চলরূপে গৃহীত হয়। প্রতিটি গ্রামকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ংপূর্ণ করিবার জন্য এই ১০০টি পরিবারের আপন আপন বৃত্তিও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই ধরণের ১০০টি স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম লইয়া এক একটি উপ-উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ৩টি উপকেন্দ্রের সমবায়ে গঠিত হয় প্রতিটি উন্নয়নকেন্দ্র বা অঞ্চল। জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, ভারতের শতকরা মাত্র ৫৫ ভাগকে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসূচী ও অগ্রগতি

পরিকল্পনার কর্মসূচী দুইটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত হয়। পৃথক হইলেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিদ্যমান। প্রথম ভাগটি—'ভারত-মার্কিন কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি'র অধীনে এবং দ্বিতীয় ভাগটি আমেরিকার ফোর্ড প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যে ভারতের কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য-দপ্তরের পরিচালনাধীনে। শেষোক্ত ভাগটি সংক্ষেপে 'ফোর্ড

প্রতিষ্ঠান' নামে অভিহিত। প্রথম ভাগটিকে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সহযোগিতায় ও একজন নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত 'সমাজ-উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ-মণ্ডলী' নামক সমিতির হস্তে অর্পণ করা হয়। আর দ্বিতীয় ভাগটি সরাসরি ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি-দপ্তরের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি রাষ্ট্রে আবার রাষ্ট্রমন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত 'রাষ্ট্র-উন্নয়ন সমিতি'ও বিদ্যমান। উন্নয়ন কমিশনার, জেলা উন্নয়ন কর্মচারী, উন্নয়ন কেন্দ্রগুলির কার্যনির্বাহক কর্মচারী প্রভৃতি 'রাষ্ট্র-উন্নয়ন সমিতি'র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রথম ভাগটির কর্মসূচী প্রধানত তিন অংশে বিভক্ত: (১) প্রাথমিক (Basic) সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা, (২) সমষ্টিগত (Composite) উন্নয়ন পরিকল্পনা, (৩) শিক্ষা-শিবির (Traning camp)। প্রথম অংশের উপর কৃষির উন্নতি, জনস্বাস্থ্য, সমাজশিক্ষা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি, দ্বিতীয় অংশের উপর কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্রায়তন কারিগরী শিল্প প্রভৃতি এবং তৃতীয় অংশের উপর বিশেষজ্ঞদের অধীনে জনসাধারণকে বাস্তব-শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ন্যস্ত আছে। দ্বিতীয় ভাগটির উপর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাঞ্চলের উন্নতির ভার ন্যস্ত। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার দুইটি পৃথক পর্যায়ের রূপটি এইরূপ :—

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বিমুখী কর্মপন্থা

	(১) ভারত-মার্কিন কারিগরী সহযোগিতা তহবিল ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থা-চালিত		(২) সম্মিলিত প্রচেষ্টা	(৩) বোর্ড প্রা[illegible]	
রাজসমূহ	পরিকল্পনা-অঞ্চল	উন্নয়ন-ব্লক	শিক্ষা-শিবির	পরিকল্পনা অঞ্চল	শিক্ষাশিবির-সহ উন্নয়ন অঞ্চল
ভাগ—এ	৩২	১৬	১৬	৩	৮
ভাগ—বি	১১	২	৬	৪	.
ভাগ—সি	২	৮	৩	৩	--
	৪৫	২৬	২৫	১০	৫

যে সকল অঞ্চলে জলসেচপ্রণালী উন্নত ও বৃষ্টিপাতের নিশ্চয়তা আছে, সেই সমস্ত অঞ্চলের উপর বেশী নজর দেওয়া হয়। নিম্নের তালিকা হইতে বিভিন্ন প্রদেশের তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নকেন্দ্রের সংখ্যা জানা যাইবে। প্রসংগত ইহাও স্মরণীয় যে, প্রতিটি ব্লক তিনটি কেন্দ্রের সমান অঞ্চল। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি রাষ্ট্রের কেন্দ্র ছাড়া ব্লক-স্থাপনের কথা চিন্তা করা হয়।

তালিকাদি

(১)	মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশ	..	৬টি করিয়
(২)	বোম্বাই, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব	...	৪টি ,,
(৩)	উড়িষ্যা	...	৩টি মাত্র
(৪)	মধ্যভারত, আসাম, হায়দ্রাবাদ, রাজস্থান, ত্রিবাংকুর, কোচিন		২টি করিয়,
(৫)	'বি' ও 'সি' রাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানে	..	১টি ,,
(৬)	পশ্চিম বংগ	.	৮টি ব্লক

পরিকল্পনা-কমিশন সমাজ-উন্নয়নের যে খসড়া রচনা করেন, তাহাতে ছয়টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় : (১) কৃষি-উন্নয়ন; (২) কুটিরশিল্প ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসংগঠন, (৩) বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা প্রচার, (৪) স্বাস্থ্যোন্নয়ন; (৫) আবাসগৃহের উৎকর্ষসাধন, (৬) যোগাযোগের উন্নতিসাধন। ইহা ছাড়া পশুপালন, পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা, সেচ উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতিও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যসূচীর অন্তর্গত। সারা ভারতে ৫৫টি উন্নয়ন-কেন্দ্রের ৬টিকে আধা-নাগরিক ও আধা-গ্রামীণ ধরণে রূপায়িত করা হয়।

প্রধান কর্মসূচী

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য সর্বপ্রথম ৬৫ কোটি টাকা বাজেট করা হয়; অবশ্য ৩৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা লইয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। তন্মধ্যে ভারত সরকার ৩৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৮৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা পরিকল্পনা-তহবিলে দান করিবার সংকল্প করেন। দুই পর্যায়ের ব্যয় এই তহবিল হইতেই হইবার কথা। অনুমিত হয়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ এবং গ্রামবাসীদের আয় শতকরা ৩৫ ভাগ বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমস্ত খরচ বাদ দিয়া প্রতিটি পরিকল্পনা হইতে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা করিয়া রাষ্ট্র-তহবিলে জমা হইবে বলিয়াও হিসাবে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক সমেত এই উন্নয়ন-কার্য সম্পাদনের জন্য শেষ অবধি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সর্বসমেত ৯১.৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়।

আনুমানিক আয়-ব্যয়

রাজশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা গ্রাম্য জনসাধারণকে গ্রামীণ ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সচেতন করিয়া তোলাই সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল আদর্শ ও লক্ষ্য। গণকল্যাণকামী রাষ্ট্র (Welfare State) গঠনে জনগণের আত্মসচেতনতা ও আত্মনির্ভরশীলতা একান্ত প্রয়োজন। সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা নিতান্ত আত্মঘাতী নীতি। এক কথায় বলা চলে, "এই

লক্ষ্য ও আদর্শ

পরিকল্পনা শ্মশানপুরী ভাবতেব দেউলিয়া অর্থনীতিব বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত বিদ্রোহ এবং ইহা ভাবতেব আত্মোন্নতি ও স্বাবলম্বনের অগ্নিপবীক্ষা।” এই পবিকল্পনায় যেটুকু সার্থকতা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে তাহাতে ইহাই সবিশেষ লক্ষণীয় যে, যাহা একদা জনগণেব সহযোগিতাব উপবে নির্ভবশীল সবকাবী কার্যপ্রণালীরূপে আত্মপ্রকাশ কবিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে সবকাবী সহযোগিতাব উপবে নির্ভবশীল জনগণেব কার্য-প্রণালীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

সমালোচনা ও প্রতিকার

সমাজ-উন্নয়ন পবিকল্পনাব স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনা হইয়াছে অনেক। কৃষিব প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান ব্যাপাব লইয়াই অধিকাংশ বিরূপ সমালোচনা। অবশ্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব আমলে বেকাব-সমস্যা দূবীকবণেব জন্য কুটীব ও স্বল্লায়তন শিল্পাদিব সংগঠন, সমবায়-প্রথা, পঞ্চায়েৎ-প্রথা, উন্নততব পল্লী-পরিবহন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য আমোদ-প্রমোদেব ব্যবস্থা ইত্যাদিব উপবেও দৃষ্টি দিবাব নির্দেশ বহিয়াছে। ইহা ব্যতীত মার্কিন সাহায্যকে প্রীতিব চক্ষে অনেকে দেখেন না। পবিকল্পনা নীবন্ধ নয় স্বীকার্য হইলেও সমালোচনায় শক্তিক্ষয় কবিয়া লাভ নাই। পবিকল্পনা যাহাতে বাস্তবে রূপায়িত হয়, তাহাব প্রতি মনসংযোগ কবা এবং সবকাবকে সহযোগিতা কবা একান্ত আবশ্যক।

প্রথম সমাজ-উন্নয়ন পবিকল্পনাব অভিজ্ঞতা ও জনসাধাবণেব উৎসাহ উদ্দীপনা দর্শনে এক্ষণে ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, দেশেব বিভিন্ন অংশে এই পবিকল্পনাব দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন। কিন্তু সর্বপ্রথম যে ব্যাপক কার্যতালিকা লইয়া ভাবতীয় যুক্তরাষ্ট্র অগ্রসব হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাব মত যে-পবিমাণ সম্পদ নাই। তাই বর্তমানে ভারত-রাষ্ট্র সমাজ উন্নয়ন পবিকল্পনাব পাশাপাশি জাতীয় সম্প্রসাবণ

উপসংহার

কৃত্যক (National Extension Service) চালু কবিয়াছেন। এই শেষোক্ত পবিকল্পনা প্রথমটিব ন্যায় অত নিবিড় নয়। বলা বাহুল্য, উভয় কার্যবিধিই পবস্পবেব অনুপূবক। জাতীয় সম্প্রসাবণ কৃত্যকেব অধীনে উন্নীত অঞ্চলেব মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক নির্বাচন কবিয়া সমাজ-উন্নয়ন পবিকল্পনাব অধীনে প্রেবিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব আমলে ১ লক্ষ ২০ হাজাব গ্রাম লইয়া সমাজ-উন্নয়ন পবিকল্পনাব অধীনে ৭০০টি ব্লকে এবং জাতীয় সম্প্রসাবণ কৃত্যকেব অধীনে ৫০০টি ব্লকে সমগ্র গ্রামীণ জনসংখ্যাব এক-চতুর্থাংশ সেবা পাইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনাব অধীনে সমাজ-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসাবণ কার্যেব জন্য দুই শত কোটি টাকা ববাদ্দ হইয়াছে। আশা কবা যায়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব শেষে অর্থাৎ ১৯৬০—৬১ সালে সমগ্র ভাবতবর্ষ জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক ব্লকে আবৃত হইবে এবং ঐ ব্লকগুলিব শতকবা ৪০টি সমাজ উন্নয়ন ব্লকে রূপান্তবিত হইবে।

পাক্-ভারতের
শরণার্থী ও তাহাদের পুনর্বাসন-জিজ্ঞাসা

আপোষকেন্দ্রিক বৈঠকী রাজনীতির সমুদ্রমন্থন-ফলে মাউণ্টব্যাটেন্ পরিকল্পনা-রূপিণী যে লক্ষ্মীদেবী উঠিলেন, তাঁহার ডান হাতে ছিল স্বাধীনতার সঞ্জীবনী-সুধা আর বাম হাতে ছিল ভারতবিভাগের প্রলয়ংকরী গরল। অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হওয়ায়, কোন প্রদেশবাসী পাইল অমৃতের মধুর আস্বাদ আবার কোন প্রদেশবাসী পাইল বিষের তীব্র জ্বালা। যেমন, ধরা যাইতে পারে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অখণ্ড পাঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চল এবং অখণ্ড বাংলার পূর্বাঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাগ্যে মিলিয়াছে ভারতবিভাগের বিষভাণ্ড। সমুদ্রমন্থনের বিষ হরণ করিয়া হর হইয়াছিলেন নীলকণ্ঠ, পাকিস্তানী হিন্দুসম্প্রদায় কি নীলকণ্ঠ হইতে পারিয়াছেন? সরকারী হিসাব-মতে, ১৯৫৬ সালের শেষ তক ভারতে আগত মোট হিন্দু বাস্তুহারার সংখ্যা ৮৭·২০ লক্ষ, ইহার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বাস্তু হারাইয়া আসিয়াছেন ৪৭·২০ লক্ষ লোক এবং পূর্ব পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু আসিয়াছেন ৪০ লক্ষ জন। ১৯৫৬-৫৭ সালের শেষ অবধি এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও সাহায্যকল্পে সরকারী অর্থব্যয় হইয়াছে মোট ৩৪৫·১৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সরঞ্জাম, বৃত্তি, ঋণ, গৃহ-নির্মাণ ও ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যয় হইয়াছে ২২২·০৪ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুহারাদের সরঞ্জাম, বৃত্তি, ঋণ ও গৃহনির্মাণের জন্য খরচ হইয়াছে মাত্র ১০৮·৩০ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া, উদ্বাস্তুদের জন্য আরও খরচ হইয়াছে ১৪·৮৩ কোটি টাকা। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালি দাংগার সময় হইতে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা পশ্চিম বাংলায় আসিতে সুরু করেন এবং আজ অবধি কিস্তিতে কিস্তিতে, কখনও কাতারে কাতারে, কখনও কম মাত্রায়, সেই আগমনের স্রোত বহিয়াই চলিয়াছে। পক্ষান্তরে, প্রায় ৫০ লক্ষ মুসলমান ভারত ছাড়িয়া পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পাকিস্তানের শরণার্থীরা মূলত যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পূর্ব-পাঞ্জাবেরই অধিবাসী।

ভূমিকা

ভারত-সরকার শরণার্থী-সমস্যাটিকে এক সর্ব-ভারতীয় সমস্যারূপে স্বীকার করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছেন। এই পাঁচটি অঞ্চল হইতেছে: প্রথম, পশ্চিম-বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যা; দ্বিতীয়, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ, তৃতীয়, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন দেশীয় রাজ্যসমূহ, চতুর্থ, দিল্লী, আজমীর, মেবার, রাজপুতানার দেশীয় রাজ্যসমূহ ও মৎস্যরাষ্ট্র, পঞ্চম, পূর্ব-পাঞ্জাব ও পূর্ব-পাঞ্জাবের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যসমূহ। ভারত সরকারের এই নির্দেশ-অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তান

হইতে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন-ব্যাপারে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। এ কথা সত্য যে, নীতির দিক দিয়া পূর্ববংগীয় হিন্দুদের শরণ লইবার স্থান এই ভারতবর্ষই, বিশেষ করিয়া পশ্চিম-বংগের নিকটবর্তী রাজ্যগুলি তো বটেই। কিন্তু প্রতিবাসী আসাম চালাইয়াছে 'বংগাল খেদা আন্দোলন' ও করিয়াছে নৃশংস নির্যাতন, বিহার-উড়িষ্যার আচরণও নিদারুণ মর্মান্তিক, কুচবিহারের মত দেশীয় রাজ্যও করিয়াছে মানবতা-বিরোধী ব্যবহার। তাই কেবলমাত্র পশ্চিম-বংগ ব্যতীত পূর্ববংগবাসীদের আশ্রয় লইবার স্থানই-বা কোথায়?

পুনর্বাসন-সমস্যার সমাধানে ভারত-সরকার

পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে লোকবিনিময়-নীতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া ভারত সরকার অত্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন যে, পাঞ্জাবের মত অবর্ণনীয় ঘটনা যখন বাংলায় ঘটে নাই, তখন পূর্ববংগীয়দের বাস্তুত্যাগ করা সমীচীন নয়। কারণ, ভারত যে শিশুরাষ্ট্র—ইহার উপর অত্যধিক চাপ দিলে রাষ্ট্রশৃংখলা ও অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারেই পড়িবে ভাঙিয়া। মহাত্মা গান্ধীও বাস্তুত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মাজীর যুক্তিটি অবশ্য মনুষ্যত্ববোধের উপরে কেন্দ্রিত। মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন, মৃত্যুভয় আসিলেও বা অমৃত-সামগ্রী থাকিলেও বাস্তুত্যাগ শুধুই যে অন্যায় তাহা নয়, ধর্ম এবং মানবতারও বিরোধী। মহাত্মা গান্ধী এবং প্রচলিত শাসকগোষ্ঠী ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এত বিরুদ্ধ মন্তব্য দিয়াও তো পূর্ব-বংগের বাস্তুহারাদের গতিস্রোত অবরুদ্ধ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ কি? পূর্ব-বংগে সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামা নাই-বা থাকিল, কিন্তু পূর্ববংগীয় হিন্দুরা পাকিস্তানে স্বাধীন নাগরিকের অধিকার অনুভব করেন না। বিশেষ এক জাতীয় গুণ্ডা, পুলিশ-বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা এবং শরিয়তী শাসনের অপপ্রয়োগ— এই সমস্ত মিলিয়া-মিশিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে এমন একটি পরিবেশ রচনা করিয়াছে যে, সেখানে হিন্দুদের পক্ষে বাস করা অতীব কঠিন। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব-বাংলায় ব্যাপক দাংগার ফলে আবালবৃদ্ধবনিতা বাস্তুত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহা ছাড়া, খাদ্যবস্তু এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় জিনিষের দুষ্প্রাপ্যতা ও মহার্ঘতার প্রকোপ এবং তদুপরি ভারতের মুদ্রামূল্যহ্রাসজনিত অর্থবিনিময় সমস্যার সংঘাত সহ্য করিতে না পারিয়াও পূর্ব-বংগের হিন্দুসম্প্রদায় হাজারে হাজারে ভারতবর্ষের পানে আগুয়ান। অবশ্য শরণার্থীদের আগমন প্রতিরোধকল্পে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি' তথা 'দিল্লী-চুক্তি' সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও নানা কারণে আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত। অতঃপর 'দিল্লী চুক্তি'কে অস্বীকার করিয়া ১৯৫২ সালের

পশ্চিম-বংগের পুনর্বাসন বিরোধী মতবাদ থাকা সত্ত্বেও শরণার্থীদের ভিড় হইবার কারণ

অক্টোবর মাসে 'পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথা প্রবর্তিত হইল। ফলে তখন প্রায় আড়াই লক্ষ পূর্ববংগীয় আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিম বংগে আসিলেন। এমনি করিয়া আজ অবধি নানা কারণে উদ্বাস্তুদের অবিরাম আগমনে শরণার্থী-সমস্যা আজ জটিলতম পরিস্থিতির সম্মুখীন।

নোয়াখালিতে হিন্দুনিধনযজ্ঞের পর হইতেই মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি ছাড়িয়া শিক্ষিত হিন্দুগণ হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে বসবাস করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। ইংরাজ-প্রভুর ক্ষমতা হস্তান্তরের গোড়া হইতেই সুরু হয় পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক দাংগা এবং কলিকাতার শেষ বড় দাংগাটিও হয় ঐ সময়েই। তাই সাধারণ লোকের ইহাই ধারণা হয় যে, হিন্দুরা হিন্দুস্থানে ও মুসলমানেরা পাকিস্তানেই নিরাপদ। এই ধারণাই শরণার্থী-সমাগমের মূল কারণ। উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কারিগর, ময়রা, মুদি, জেলে, ছুতোর, কামার, কুমোর, চাষা, মজুর—সব রকমের বৃত্তির লোকই ভারতে আসিয়াছেন এবং আসিতেছেনও। অবশ্য পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন এক জাতের লোকও আছেন, যাঁহাদের জমি জায়গা দুই বংগেই আছে, তবে পূর্ব-বংগ ছাড়িয়া পশ্চিম-বংগেই পাকাপাকি ভাবে বাস করিবার জন্য সম্প্রতি উদ্যোগী হইয়াছেন। আবার এমন এক জাতের লোক আছেন, যাঁহাদের বাস্তুভিটা পূর্ব-বংগের কোন্ এক বিস্মৃত গ্রামের বনের আড়ালে থাকিলেও, তাঁহারা পুরুষপরম্পরায় বাস করেন শহরের ভাড়াটিয়া বাড়িতেই। উল্লিখিত দুই শ্রেণী ছাড়াও আর এক শ্রেণী আছেন, যাঁহারা চাকুরীজীবী উভচর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। উভচর বলিতেছি এই জন্য যে, এই মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবিগণের দুই সংসার চালাইতে হয়—একটি গ্রামে অর্থাৎ দেশে এবং অপরটি চাকুরীস্থলে। সুতরাং বাস্তুহারা বলিতে কোন্ বিশেষ অবস্থাটিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার সংজ্ঞা নির্ধারিত হইবে, ইহাই সূক্ষ্ম ভাবে সর্বাগ্রে স্থির করা প্রয়োজন।

শরণার্থী-সমস্যার হেতু ও তাহার ব্যাপকতা

সে যাই হোক্, পূর্ব-বংগের আশ্রয়প্রার্থীরা যাহাতে সুশৃংখলিত রূপে যথাসম্ভব পশ্চিম-বংগে বসবাস করিতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত অবশ্যই করিতে হইবে। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভাগ্যপীড়িত বিপুল জনতা যদি এলোমেলো ভাবে গাদাগাদি করিয়া এখানে সেখানে বসবাস করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে স্বাস্থ্য জীবন ও অর্থ-সম্পর্কিত বিশৃংখলা তো দেখা দিতেই পারে, উপরন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবও ঘটিতে পারে। আশ্রয়প্রার্থীদের ভিড় শহরেই বেশী। কিন্তু সবাই যদি হয় শহরবাসী, তাহা হইলে খাদ্যোৎপাদন বাড়িবে না, পক্ষান্তরে বেকার এবং ভবঘুরের সংখ্যাধিক্যতা দিবে দেখা, অপরাধও যাইবে বাড়িয়া তীব্র গতিতে। নাগরিকের দায়িত্বশীলতার উপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রের জীবন। অতএব, রাজ্য-সরকার ছাড়াও পশ্চিম-বংগের নাগরিকেরা যদি সহানুভূতিশীল ও সক্রিয় হন, তবেই তো আশ্রয়প্রার্থী-

পুনর্বাসন সমস্যার স্বরূপ

সমস্যার গুরুত্বের লাঘব ঘটিবে। প্রচুর সেলামী ও চড়া দাম লইয়া জমি বিলি করিয়া পশ্চিম বংগের কোন কোন নাগরিক অত্যন্ত নির্মম ব্যবহার করিয়াছেন। আবার এমন কি, জমির ফাটকাবাজী করিয়াও কোন কোন পশ্চিমবংগীয় ধনবাদী বেশ দুই পয়সা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে পুনর্বাসন-সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে।

প্রথমেই ভাবিয়া দেখা দরকার যে, শরণার্থীরা কি চান? তাহারা চান বাস্তু, বৃত্তি এবং নাগরিকের পূর্ণ অধিকার। ইহা তো তাঁহাদের ন্যায়সংগত দাবি। বাস্তুর নিমিত্ত তাহারা চান স্থান। পশ্চিম-বংগের পতিত অনাবাদী জমি ও পরিত্যক্ত গ্রামগুলি সংস্কার করিয়া যদি শরণার্থী পূর্ব-বংগীয়দিগকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে, আশ্রয়প্রার্থী-সমস্যার পূর্ণ সমাধান হয় না। কেননা,—পূর্ব-বংগ হইতে কম পক্ষে যদি এক কোটি লোকও পশ্চিম-বংগে বাস্তুভিটার স্থান চান তো বর্তমান পশ্চিম-বংগের সীমা-চৌহদ্দির মধ্যে তাহাদিগের স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। চাষ-আবাদ তো দূরের কথা, যথাযথভাবে বসবাসের উপযোগী স্থান পাওয়াই অসম্ভব। প্রতিবেশী বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি রাজ্যসমূহের বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলের ফাঁকা জমিগুলি পাইলে পশ্চিম-বংগে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার কিছুটা সমাধান হইত। কিন্তু সে আশাও এক্ষণে দুরাশার নামান্তর মাত্র।

বাস্তুহারার দাবি ও তাহার বিশ্লেষণ

গ্রাম হইতে আগত বাস্তুহারা চান গ্রামেরই পরিবেশ, এবং শহর হইতে উদ্বাস্তু ব্যক্তি চান শহরেরই পরিবেশ। অতএব, কৃষিকেন্দ্রিক বৃত্তিগুলির যেমন চাই আদর্শ গ্রাম, তেমনি শিল্পকেন্দ্রিক বৃত্তিগুলির জন্যও চাই আদর্শ শহর। পুনর্বাসন-পরিকল্পনায় বৃত্তিমূলক ভাবেই গ্রাম এবং শহরের পত্তন করিতে হইবে এবং কৃষিপ্রধান গ্রাম অথবা শিল্পপ্রধান শহরকে প্রায় অনেকটা স্বয়ংপূর্ণ 'ইউনিটে' রূপায়িত করিতে হইবে। ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষানিকেতন, হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা, প্রসূতিসদন, হাট-বাজার, রংগশালা, ক্রীড়াক্ষেত্র, পাঠাগার, দীঘি ইত্যাদি নব-পরিকল্পিত গ্রামে এবং শহরে থাকা প্রয়োজন। আবার কয়েকটি গ্রাম বা শহরকে লইয়া এক একটি কারিগরী শিল্পনিকেতন এবং মহাবিদ্যালয়ও থাকা সমীচীন। এই পুনর্বাসন-ব্যাপারে সমবায়-সমিতির মারফতে গ্রামে চাষবাসের ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিত্তিতে সর্বজনীন সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাটি কার্যকরী হইলে পুনর্বাসন-সমস্যার নিরাকরণ বহুল পরিমাণে হইতে পারে। ইহা ছাড়া, আচার্য বিনোবা ভাবের ভূমিদান যজ্ঞও পরোক্ষ ভাবে উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধান-ব্যাপারে সহায়ক হইয়াছে।

পুনর্বাসন-পরিকল্পনা

বর্তমানে পূর্ব-বংগ হইতে আগত বাস্তুহারাদিগের পুনর্বাসন-সমস্যা সম্পর্কে ভারত-সরকারের দৃষ্টিভংগীতে যেন কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন-সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না একদা সংখ্যা-তথ্যাদি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের তুলনায় পূর্ব-বংগীয় উদ্বাস্তুদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। কারণ,—পশ্চিম পাকিস্তানে ভিটামাটি এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ফেলিয়া রাখিয়া ৪৯ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে আসিয়াছেন, কিন্তু ৫৫ লক্ষ লোক পূর্ব পাঞ্জাব, পেপসু, রাজস্থান, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে সর্বস্ব ফেলিয়া রাখিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে আশ্রয় লইয়াছেন। তাই জমাখরচের হিসাবমতে, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে দ্বিমুখী লোক-গমনাগমন-ফলে নবাগতদিগের পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ভারত সরকারের স্কন্ধে পড়ে নাই। শ্রীখান্না সংখ্যা-তথ্যাদি উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, পশ্চিম পাঞ্জাবের সন্নিহিত ভারতীয় অঞ্চল হইতে লক্ষ লক্ষ লোক দেশত্যাগী হওয়ায় ন্যূনপক্ষে ৬০ লক্ষ হইতে ৭০ লক্ষ একর সাধারণ জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া, পল্লী ও শহর অঞ্চলে হাজার হাজার বসতবাড়ি ও অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, যেমন কল-কারখানা, দোকানপাট, যানবাহন, আসবাবপত্র ইত্যাদি তাহারা ফেলিয়া গিয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানত্যাগী উদ্বাস্তুদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত জমির পরিমাণের চেয়ে সন্নিহিত ভারতীয় অঞ্চলত্যাগী বাস্তুহারাদের দ্বারা পরিত্যক্ত জমির পরিমাণই ছিল বেশী। তাই পশ্চিম পাকিস্তানত্যাগী বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনে সুযোগ ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে শ্রীখান্নার মতে, পশ্চিম-বংগ হইতে সাত লক্ষ মুসলমান ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া হয় পূর্ব-বংগে, নয় পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু 'নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি' অনুসারে পাঁচ লক্ষ মুসলমান আবার পশ্চিম-বংগে ফিরিয়া আসে এবং পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অধিকাংশই উহাদিগকে প্রত্যর্পিত হয়। অতএব বিদায়ী মাত্র দুই লক্ষ লোকের পরিত্যক্ত সম্পত্তি পশ্চিম-বংগে শরণার্থীদের কাজে লাগিয়াছে। ইহা তো সিন্ধুর মধ্যে বারিবিন্দু মাত্র। তাহারই ফলে পশ্চিম-বংগে শরণার্থী-সমস্যা এত বেশী জটিল ও এত বেশী দুরূহ।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে উদ্বাস্তু-সমস্যার তুলনামূলক আলোচনা

ভারতের ন্যায় পাকিস্তানেরও দুই অংশে উদ্বাস্তু তথা মোহাজের-সমস্যার গুরুত্ব বড় কম নয়। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানে ভাষার বিভিন্নতাই উদ্বাস্তু-সমস্যাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান মূলত কৃষিপ্রধান ভূমি, কিন্তু মোহাজেরদিগের সবাই তো আর চাষ-বাসের সহিত সম্পর্কিত নয়। ফলে পূর্ব-বংগে আগত বাস্তুহারাদের

পাকিস্তানে মোহাজের-সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি

পুনর্বাসন-সমস্যা দিনে দিনে গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। ইহার সহিত আবার শিক্ষানৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাও দেখা দিয়াছে। তাই পাকিস্তান-রাষ্ট্র যদি এই বাস্তুহারাদের জন্য বাসস্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা অতি সত্বরেই না করিতে পারেন, তাহা হইলে সর্বহারা অতৃপ্ত উদ্বাস্তুরা রাষ্ট্রের অপরিসীম অশান্তির কারণ হইয়া থাকিবে। সুতরাং পাকিস্তানের নিরাপত্তা, শান্তি ও অগ্রগতি বজায় রাখিবার ব্যাপারে এই মোহাজের-সমস্যার সমাধান যত শীঘ্র হয় ততই মংগল।

শেষ কথা

আসল কথা হইতেছে এই যে, এক সুপরিকল্পিত প্রণালী অনুসরণ করিয়া শরণার্থী জনসংহতিকে বাস্তু, বৃত্তি এবং নাগরিক মর্যাদা দিয়া পশ্চিম-বংগে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাহার ফল অতীব শোচনীয় হইতে বাধ্য। শরণার্থীদের পক্ষে সাতপুরুষের ভিটায় যখন আবার ফিরিয়া যাইবার কোন উপায় নাই, তখন তাহারা যাহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের দান দিয়া, সমষ্টিগত উৎপাদন ও শ্রম দিয়া বাঙালী সমাজকে ধারণ করে, পোষণ করে, তাহারই প্রয়াস পাইতে হইবে। নচেৎ বেপরোয়াভাবে যদি উদ্বাস্তুরা উচ্ছৃংখল যাযাবর-জীবনেরই পরিচর্যা করেন, তাহা হইলে আঘাতে আঘাতে বাঙালীর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সভ্যতার বনিয়াদ একেবারেই যাইবে ভাঙিয়া আর আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে উদ্বাস্তু বাঙালী হইবেন অবাঙালীর পদলেহী চাকুরীজীবী মাত্র। তাই বলি, দেশীয় সরকার যদি পশ্চিম-বংগের স্থায়ী বাসিন্দাদের সহযোগিতায় বেশ সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বাস্তুহারাদের স্থিতিবান্ করিতে পারেন, তাহা হইলে এই নবগঠিত সমাজ হীন প্রাদেশিকতার নাগপাশের বন্ধন ছেদন করিয়া দেখাইবে নতুন জগতের আলো।

আমাদের বেকার-সমস্যা

ঊর্ধ্বতন, মধ্যবিত্ত ও নিম্নতম—মনুষ্যসমাজের এই তিনটি স্তরের অন্তর্গত মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেই বেকারের সংখ্যা অধিকতম। সারা পৃথিবী জুড়েই বেকারের অভিশাপ ছড়ানো রয়েছে। তবে পাশ্চাত্য দেশে এর স্বরূপ শিল্পগত কিন্তু ভারতবর্ষে এর স্বরূপ কৃষি ও শিক্ষা-সম্পর্কিত, পক্ষান্তরে পাকিস্তানে এর স্বরূপ মুখ্যত কৃষিগতই। চাষ আবাদ মৌসুমী পেশাবিশেষ এবং মৌসুমী চাষবাসের কাজ যখন যায় মিটে, তখন বৎসরের কিছুটা সময়ে চাষীকে বেকার হয়ে বসে থাকতে হয়। এ ছাড়া চাষীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং নানাবিধ বৃত্তি অবলম্বনের সুযোগ না থাকায় যেখানে অল্পসংখ্যক চাষীর দ্বারা চাষ আবাদ হতে পারত, সেখানে অধিকসংখ্যক চাষীর দ্বারা জমির কাজ হয়ে থাকে। তাই কৃষি-সম্পর্কিত

ভূমিকা

কৃষি-সম্পর্কিত বেকার-সমস্যার স্বরূপ

বেকার-সমস্যাকে উপনিয়োগ-সমস্যা (under-employment problem) বা কোন কোন ক্ষেত্রে মৌসুমী বেকার-সমস্যা (seasonal unemployment problem) বলা যেতে পারে। দুর্ভিক্ষ ও বন্যার ফলে চাষী বেকারের সংখ্যা আগেকার মত আর দেখা যায় না। কেননা, বর্তমানে দুর্ভিক্ষ নিবারকরণের ত্বরিত প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। আবার মৌসুমী বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য দড়ি-বুনুনি, মাছের-চাষ, খেলনা-তোয়ের ইত্যাদি কুটিরশিল্পের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যতই চেষ্টা করা যাক্ না কেন, বেকার-সমস্যার ছোঁয়াচ্ কিছুটা থাকবেই। তাই প্রজননের বাড়তি-হার কমানো ও শিল্পোন্নয়নের দ্বারা জাতীয় অর্থনীতিতে বৃত্তিগত সমতা বজায় রাখা—এই যুগ্ম নীতি অনুসরণ করা উচিত।

য়ুরোপে শিল্প-সম্পর্কিত বেকার-সমস্যা যেরূপ তীব্র ও ব্যাপক, ভারতে ও পাকিস্তানে অবশ্য সেরূপ তীব্রতা ও ব্যাপকতা দেখা যায় না। পাক্-ভারতে শিল্পশ্রমিকের প্রাচুর্য তো নেই-ই, বরং অভাবই রয়েছে। কিন্তু যখন আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্পের চাহিদায় মন্দা পড়ে, তখন স্বভাবতই যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন-বাহুল্যে বাধা পড়ে। এইভাবে শিল্পগত বেকার-সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু সাধারণত পাক-ভারতে এই জাতীয় বেকারের সংখ্যা খুবই কম। কেননা,—

শিল্পগত বেকার-সমস্যার স্বরূপ

পাকা মাল উৎপাদনের ব্যাপারে পাক্-ভারতীয় মজুরের চাহিদা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কুটিরশিল্পীরা স্বাধীনভাবে পণ্যদ্রব্যাদি উৎপাদন ক'রে থাকে। কিন্তু যান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তাদের অধিকাংশই চাষবাসের দিকে সরে পড়েছে, আর সামান্য কয়েকজন হয়তো-বা কারখানায় যাচ্ছে।

ভারতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের অনেকেই আজ বেকার। তার কারণ যে, এরা নানাবিধ চাকরীর প্রয়োজনানুসারে নিজেদেরকে মিল খাইয়ে নিতে অপারগ। যে সমস্ত চাকরী পাওয়া যায় আর যারা চাকরী খোঁজে—এই দুটির মাঝে অসামঞ্জস্য থাকার জন্যই এই অর্থনৈতিক সমস্যা দাঁড়িয়েছে। শত বৎসর পূর্বে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় উচ্চ বর্ণ থেকেই সর্বতোভাবে গড়ে উঠেছিল। তারপর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পদ্ধতির গুণে এই উচ্চ বর্ণের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের আয়ের নতুন নতুন পথ যখন খুলে গেল, তখন তাদের প্রতিবেশিগণ এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে নতুন পথটি ধরবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ল। নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরা তাদের বংশানুক্রমিক পেশা পরিত্যাগ করে' চাকরী-খোঁজার দলকে ফাঁপিয়ে তুলল।

মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর পরিচয়

নিম্নতর সামাজিক স্তর থেকে এরা এসে ইস্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের স্ফীতি ঘটালো ও নিয়োগ-সমস্যা তীব্রতম হয়ে দেখা দিল। মাত্র কয়েকটি বাঁধাধরা পেশার উপরেই এক শ্রেণীর ঝোঁক: যেমন, ওকালতী,

ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা, কেরানীগিরি, সরকারী চাকরী ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো তো আর সকলকেই জীবননির্বাহের পথ দেখিয়ে দিতে পারে না।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ে বেকারের আধিক্য ও নিয়োগ-সমস্যা নিয়ে ১৯২২ সালে অখণ্ড বাংলা প্রদেশেই সর্বপ্রথম একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। অতঃপর মাদ্রাজ কমিটি, যুক্ত প্রদেশের দু'টি ও অখণ্ড পাঞ্জাবের দু'টি কমিটি এই বেকার-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে অখণ্ড পাঞ্জাবে বেকার-সমস্যার দ্বিতীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই সমস্ত কমিটিরই সাধারণ মত ছিল এই যে, শিক্ষার প্রসারই শিক্ষিত বেকার-সমস্যার প্রধানতম হেতু। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যানে জানা গেছে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতি বছরে ৭৫০০০ ডিগ্রীধারী বেরুচ্ছেন, আর সরকারী চাকরীর সুযোগ আছে বছরে মাত্র ৩০০০০ জনের। অতএব, প্রতি বছরে ৪৫০০০ ডিগ্রীধারী বেকার তৈরী হচ্ছেন। অতঃপর ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ বা ফেল করা বেকারের তো ইয়ত্তাই নেই। এরা কারিগরী বিদ্যায় অপটু বলে ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও এদের 'ঠাই নাই, ঠাই নাই, ছোট সে তরী'। লর্ড মেকলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনকালে লিখেছিলেন,—'We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions we govern, a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinion and in intellect.' মেকলের মহান্ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। দ্বিভাষী তোতার হয়েছে ও হচ্ছে।

সরকারী কমিটির মন্তব্যাদি—শিক্ষার প্রসারই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার-সমস্যার প্রধানতম হেতু

সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, বেকার ও কর্মে নিয়োগের অযোগ্য—এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বেকার-শ্রেণী কাজকর্মে সক্ষম ও ইচ্ছুক, কিন্তু নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী নিয়োগ পায় না। পক্ষান্তরে, শেষোক্ত শ্রেণীটি স্বভাবতই অথবা অন্যান্য কারণে কাজ করতে অপারগ। ইস্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের পর দীর্ঘকাল ধরে' বেকার-অবস্থায় অলস জীবনযাপন করায় ব্যবহারিক ভাবেও কর্মক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যায়। বেকারের পরিণাম অতীব ভয়াবহ। বেকার-বৃদ্ধির সংগে সংগে বিবাহ-অনুপাত যায় কমে'। পূর্ণবয়স্ক যুবা বিয়ে করতে রাজী হয় না। ফলে হয়তো-বা সে উচ্ছৃংখল ও চরিত্রহীন হয়ে পড়ে। বেকার অবস্থায় মানুষ যে ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তার ফলে গভীর নৈরাশ্য ও মর্মপীড়ার মধ্যে দিয়ে বংশপরম্পরায় সাধারণ দুর্নীতির ক্রমবর্ধমানতা প্রকাশ পায়। হতাশ বেকার যুবকের সংখ্যা যতই বাড়ে, রাষ্ট্রনৈতিক স্থায়িত্ব ততই বিঘ্নিত হয়। স্যাডলার কমিশন তো অতীতে স্পষ্টই বলেছিলেন যে,

বেকারের পরিণাম

অহৈতুকী অসন্তুষ্ট বুদ্ধিজীবী পরার্থপ্রার্থীর (intellectual proletariat) সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি উৎকৃষ্ট শাসননীতির বিঘ্নস্বরূপ। বিশেষত এই ভারতে যেখানে অশিক্ষিত জনসাধারণ বেশী, সেখানে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কথায় বলে, "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা"। তাই দেখি, যে মনুষ্যশক্তি প্রাকৃতিক সম্পদ-শোষণে ও সমাজের সম্পদবৃদ্ধিতে নিয়োজিত হতে পারত, তারই অব্যবহারের ফলে বেকারের উৎপত্তি। বেকারের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ইহা এমনই একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, তার উৎপাদনক্ষম দক্ষতাকে (productive efficience) নষ্ট করে দিয়ে এক গভীর নৈরাশ্য তার অন্তরে সঞ্চারিত করে। অতএব, বেকার-সমস্যার ত্বরিত সমাধান না হলে জাতীয় জীবন পংগু ও স্থবির হয়ে পড়বে।

বেকার-অবস্থার সৃষ্টির মূলে রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ। তবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে মনে হয়, এটা একটা সামাজিক সমস্যা। বর্ণাশ্রম-প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা, বাল্যবিবাহ—এই কারণগুলো বেকার-অবস্থার সৃষ্টিমূলে যতই উস্কানি দিক না কেন, মাড়োয়ারি-ভাটিয়াদের মধ্যে এই প্রথাগুলি প্রবলভাবে থাকা সত্ত্বেও তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতিশীল। আসল কথা এই যে, আমরা শারীরিক শ্রম করতে নারাজ। অবশ্য এই শ্রমবিমুখতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। তবে, প্রবর্তন-ক্ষমতা ও উদ্যমশীলতার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদিতে উত্তীর্ণ হয়ে সেই ধরাবাঁধা পথেই আমাদের ছেলেরা চলতে সুরু করে। বলা হয়ে থাকে যে, শিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি কেরানী, উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তৈয়েরির কারখানা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের

বেকারের মূল

শিক্ষানীতি ব্যবহারিক বৃত্তিমূলক কারিগরবিস্তৃচক ও শিল্প-সম্পর্কিত হওয়া উচিত। ইহা অত্যন্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ঘেঁষা হওয়ায় শিক্ষিত-সম্প্রদায় কৃষি শিল্প ও বৈষয়িক কার্যে বিমুখ হয়ে পড়েছে। পুঁজির অভাব এবং রাজনৈতিক আবহাওয়াও এই বেকার-অবস্থার অন্যতম কারণ। দেশীয় শিল্প-প্রয়াস পুরোপুরি উন্নত নয় আবার অধিকাংশ লোক চাস-আবাদের উপরে নির্ভরশীল—এই অসামঞ্জস্যময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশে বেকারের সংখ্যা তো বাড়বেই।

বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে সওদাগরী কারবারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, রেলওয়ে প্রভৃতিতে কর্মচারার সংখ্যা বেপরোয়াভাবে বাড়িয়ে দেওয়ার আশা সুদূরপরাহত। বেকার কমিটিগুলো "চাষবাসের উপনিবেশ" (Farm colonies) তৈয়ের করবার জন্য সুপারিশ করে গেছেন। কিন্তু ভদ্রলোক-শ্রেণীর জন্য বাড়তি আবাদযোগ্য জমি পাওয়া যাবে কি ? আর ভদ্রলোকেরাই যদি চাষবাস করতে সুরু করেন, তাহলে চাষীরা কি জমিহীন মজুরে পরিণত হবে ? তাহলে তো সেই পুরোনো সমস্যাই আবার এসে

পড়ে। বেকার ভদ্রলোককে কর্মরত করে' কর্মরত চাষীকে করা হবে বেকার! তা ছাড়া চাষী জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এমনিতেই চাষের জমির উপর অত্যধিক চাপ পড়ে গেছে। বেকার-অবস্থার প্রতিকারে কুটিরশিল্প খানিকটা কার্যকর হতে পারে। কলকারখানাজাত শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত কুটিরশিল্প টিকে থাকতে পারবে, সেইগুলোকেই আঁকড়ে ধরা যেতে পারে। আন্তঃপ্রদেশিক গমনাগমনেও (interprovincial migration) বেকার-সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধান ঘটতে পারে না। এতে দেশের সর্বত্র সমস্যার নিবিড়তাকে সমঞ্জসীভূত করা হয় এই মাত্র। দেশান্তর গমনাগমনে বেকারের প্রতিকার সম্ভব বলে মনে হয় না। সরকারী বিভাগাদি ও বিশ্ববিদ্যালয়াদি দ্বারা পরিচালিত নিয়োগ-আপিসের (employment-bureau) মারফতে কোন কোন বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে। এই সমস্ত নিয়োগ-আপিস নিপুণভাবে পরিচালিত হলে জনগণের আস্থাভাজনও হতে পারবে। হয়তো বা এদের মারফতে কারবারী বিভাগ ও সরকারী কর্মচারীদের যোগান-চাহিদার যথোচিত সাম্যসাধনও হতে পারে। কিন্তু চাহিদার চেয়ে যোগান যখন অত্যধিক বেড়ে যায়, তখন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বেকার নিয়োগের ব্যবস্থা কতটুকুই-বা করতে পারে? আসল কথা এই যে, দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ফলেই বেকার সমস্যা উদ্ভূত হয়। সাম্প্রতিক সার্বিক যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভের পর এই স্বাধীন ভারতে ও পাকিস্তানে যে সমরোত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা হচ্ছে, হয়তো-বা তাতে বেকার-সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। বৈষয়িক বুদ্ধি বলে, শিক্ষাই শিক্ষার লক্ষ্য, এই নীতির বদলে শিক্ষাকে অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার অংগীভূত করে নেওয়া দরকার। রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতিতে এখন আর শিক্ষিত মানুষ তোয়ের করবার ব্যবস্থা নেই। সিভিল সার্ভিস্ শিল্প বাবসায়, অর্থ সরবরাহ নিয়ে ব্যবহারিক মানুষ তোয়ের করবার ভার রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় রয়েছে। আজ ভারতেও এই জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রসারের প্রয়োজন।

বেকারের প্রতিকার

পশ্চিম—বাংলার মুখ্য মন্ত্রী ডক্টর রায় বলেছেন, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্যের শহরাঞ্চলে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার এবং পল্লী-অঞ্চলে ঐ সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৬০ হাজার। নিছক সরকারী হিসেবেই চার বছর আগে পশ্চিম-বংগে বেকারের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ১০ হাজার। বলা বাহুল্য, বিগত চার বছর ধরে এই বেকারের সংখ্যা কমে তো নাই-ই, বরং বেড়েই গেছে। সরকারী হিসেবেই যখন এই দারুণ দুরবস্থা, তখন পশ্চিম-বাংলার অবস্থা যে সত্যই অতীব শোচনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ,—এমন বাঙালী পরিবার নেই, যেখানে বেকার বা

পশ্চিম-বাংলার বেকার-সমস্যার স্বরূপ-প্রকৃতি

অর্ধ-বেকার যুবক, প্রৌঢবয়স্ক ব্যক্তি বা উপার্জনকামী স্ত্রীলোক নেই। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, এমন কি নিছক অক্ষবজ্ঞানসম্পন্ন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েবাও আজ অর্থ-কৃচ্ছ্রতাব চাপে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ফলে, সমাজের নবনাবী উভয় অংশই আজ গভীর সমস্যায বিধ্বস্ত। তদুপবি নারীব কর্মসন্ধানের দরুণ পাল্টা নব-বেকাবদেব চাকবী পাওয়াব ব্যাপাবে প্রতিক্রিয়া সঞ্চাবিত হচ্ছে। এমনি কবে বেকাব সমস্যাব জটিলতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে! আজ কল-কাবখানায়, আপিসে আদালতে কোথাও কি নির্বিঘ্নে চাকবী কবাব উপায আছে? যে কোন মুহূর্তেই ছাটাই-অস্ত্রেব প্রয়োগ সম্ভাবনা বয়েছে। শোনা যায়, কেবলমাত্র পশ্চিম-বংগেই দর্জিব কাজে নিযুক্ত ৪।৫ লক্ষ লোক অবধি বেকাব হয়ে পড়েছে। পশ্চিম-বংগে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তবেব ১২।১৫ হাজাব কর্মচাবী আজ বেকাব-সমস্যাব সম্মুখীন। জমিদাবী প্রথা-বিলুপ্তিব ফলে অন্তত ২০ হাজাব প্রাক্তন জমিদাব-কর্মচাবী বেকাব হয়ে পড়ছে। ক'লকাতাব টেলিফোন অর্থাৎ দূবভাষ-বিভাগেও বেকাব-সমস্যা তাব কবাল দংষ্ট্রা বিস্তাব কবছে। মোট কথা, পশ্চিম-বংগেব ক্রমবর্ধমান দাবিদ্র্য ও বেকাব-সমস্যাব প্রতিচ্ছবি পৃথিবীব আব কোন স্থানেই দেখা যায না। পূর্ব-বংগীয় বাস্তুহাবা জনগণেব আগমনেই অবশ্য বেকাব-সমস্যাব এত জটিলতা, এত তীব্রতা। এখানে কেন্দ্রীয সবকাবেব আর্থিক সাহায্যে ও সহানুভূতিতে পবিপুষ্ট হয়ে যদি শ্রমশিল্প বা কলকাবখানাব প্রসাবণ হয়, তবেই বক্ষে। অবশ্য জাতীয সবকাব আশা কবেন, দ্বিতীয ও তৃতীয পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা শুধু পশ্চিম-বংগেব কেন, সাবা ভাবতেবই বেকাব-সমস্যার সমাধান কববে।

ডক্টব পন্থ এই বেকাব-সমস্যাটিকে অন্য দিক থেকে বিচাব কবে দেখেছেন। অধিকাংশ অর্থশাস্ত্রীই বেকাব-যোগানেব দিকটাব উপবে জোব দিয়েছেন। যোগান নিয়ন্ত্রিত ও সংকুচিত কবতে পাবলেই যেন বেকাবেব সংখ্যা কমে। ডক্টব পন্থেব মতে, চাহিদাব দিকটাতেই রয়েছে এই সমস্যাব পূর্ণ সমাধান। তাব চিন্তাধাবাব গতি-প্রকৃতি এইরূপ। অন্যান্য সভ্য দেশেব সহিত তুলনায শিক্ষিত ভাবতীয়েব শতকবা হার নিম্নতম। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষাধাবা পংগু কবে শিক্ষাসংকোচ কবাব মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। ববং সুসমঞ্জসীভূত উপায়ে উত্তরোত্তর চেষ্টা কবে শতকবা একশ' জনকেই শিক্ষিত কববাব প্রযাস পেতে হবে। তবে অত্যধিক অর্থব্যয় কবে সাতিশয বিশিষ্টতাসম্পন্ন জ্ঞান দেবাব মধ্যে কোন যুক্তি নেই। কেননা,—এই জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিতেব চাহিদা অত্যন্ত কম। অনেকের ধাবণা,—ভারতেব সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতি অন্যায্য ও অসত্য। যেন পদ্ধতি বদলাতে পাবলেই চাহিদার সৃষ্টি হ'ব! কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, অন্যান্য দেশে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সংগে আমাদেব পদ্ধতিব পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। অতএব, উচ্চ শিক্ষার পাঠক্রমেব

মধ্যে যে পরিবর্তনাদিই সূচিত করা যাক না কেন, চাহিদা তোয়ের না করলে বেকার-সমস্যার সমাধান অসম্ভব। আনাড়ীর মত শিক্ষিতদের যোগান-দিকটা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তাদের নিয়োগ-দিকটায় লক্ষ্য রাখা দরকার। শিক্ষিতদের নিয়োগ বা তাদের চাহিদা আমরা কয়েকটি উপায়ে বাড়িয়ে তুলতে পারি। প্রথমত, সরকারী ও বেসরকারী চাকরীকে দেশীয়করণ। এতে য়ুরোপীয় চাকরের পরিবর্তে দেশীয় নিয়োগ যেমন এক দিক দিয়ে হবে, অপর দিক দিয়ে কিছু আর্থিক সাশ্রয়ও ঘটবে। দ্বিতীয়ত, চাকরীতে অধিকতম ও ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ। এটা খুবই পীড়াদায়ক যে, উপরওয়ালা কর্মচারিগণ তাঁদের কাজের তুলনায় পান মোটা বেতন অথচ নিম্ন কর্মচারিগণ হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও জীবননির্বাহোপযোগী অর্থ পান না। বেতনের মাঝে এই বিরাট অসামঞ্জস্য দূর করা দরকার। তৃতীয়ত, বৃহদায়তন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পাদি গঠন করে ভারতের বাজারে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন। প্রচুর পরিমাণে সব রকমের কাঁচামাল আমাদের আছে, মজুর যথেষ্ট মেলে; ভারত ও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বাজারও খুব বিস্তৃত। চতুর্থত, 'প্রতীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ" বর্তমানকার এই বালসুলভ পন্থার উচ্ছেদসাধন। সারা পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে যথারীতি কার্যাদি চলছে, অথচ আমাদের সরকার সেই আদ্যিকালের অবাধ বাণিজ্য, চাতুর্য-পরিচালিত বিনিময় (manipulating exchange), কৌশলোদ্ভাবিত সিক্কানীতি (Principle of Managed currency), অভিজ্ঞদের আমদানীকরণ ইত্যাদি করে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়ছেন। এ সবেরই বিলোপ করতে হবে। যদি উপরি-উক্ত চারটি ধারা-অনুযায়ী কাজ চলে, তাহলে ডক্টর পন্থের মতে, প্রতি দশ বছরে শিক্ষিতের হার শতকরা এক-শ' হিসেবে বাড়লেও শিক্ষিতের চাহিদাকে ছাপিয়ে উঠতে পারবে না। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের যোগানকে সংকুচিত না করে, তাদের চাহিদাকে বাড়িয়ে তোলার মধ্যেই রয়েছে বেকার-সমস্যার পূর্ণ সমাধান।

ডক্টর পান্থর মত

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র ও সমাজগঠন

পৃথিবী পরিবর্তিত হইতেছে। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী নানা পথ পরিক্রমা করিয়া আজ সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় সমুন্নীত হইয়াছে। সমাজতন্ত্র আজ পৃথিবীর মানুষের কাছে একটা নাস্তিক্যবুদ্ধির ভীতিজ্ঞাপক বস্তুমাত্র নয়—একটি বাস্তব জীবনাদর্শ, যেখানে মানুষে মানুষে শোষণের অবসান ঘটিয়াছে। কাজেই নানাভাবে পৃথিবীব্যাপী মানুষ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। শোষিত নির্যাতিত মানুষের কাছে ইহা মুক্তির বাণী আনিয়াছে—শোষকের নিকট উপস্থিত হইয়াছে মৃত্যুর বিভীষিকা লইয়া।

ভূমিকা

অবশ্য সমাজতন্ত্রের ধারণাটিরও একটি ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটিয়াছে। মার্ক্স-বাদের আবির্ভাবের পূর্বে সমাজতন্ত্র সামাজিক দ্রব্যাদির উৎপাদন সম্পর্কে বিশেষ মাথা ঘামাইত না। তখন জাতীয় সম্পদের যথাযোগ্য বণ্টনের উপরেই জোর দেওয়া হইত। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ নামে কথিত মার্ক্সবাদ গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচারে ব্রতী হইল। এই মতবাদ অনুসারে উৎপাদন-ব্যবস্থাগুলির সামাজিক মালিকানা এবং জাতীয় সম্পদ বণ্টনে অসাম্য দূর করার কথা বলা হইল। ইহার জন্য অবশ্য প্রয়োজন শ্রমিক-শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রশক্তির দখলীকরণ। এই শতাব্দীতে সোবিয়েতে বলশেভিক বা কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে মার্ক্সীয় মতাদর্শানুযায়ী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। সমাজতন্ত্র মাত্র ৩০ বৎসরের মধ্যে পশ্চাৎপদ রুশসাম্রাজ্যকে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত করিল। গত মহাযুদ্ধে সোবিয়েতের নিকট হিটলার-জার্মানীর পরাজয় এবং পূর্ব-য়ুরোপের বহুদেশ কর্তৃক সমাজবাদ গ্রহণ সমাজতন্ত্রের আদর্শকে আরও সম্প্রসারিত করিল। ১৯৭৯ সালে চীনে কমিউনিষ্টদের ক্ষমতা-দখল মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রীদের নবতর প্রচণ্ড অগ্রগতির সূচনা করিল। চীন অবশ্য নিজের দেশের অবস্থানুযায়ী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকানায় গৃহীত না হইয়া ব্যক্তিগত মালিকানাকে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইল। চীনের অগ্রগতিও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি জন-সাধারণের আগ্রহ ও আকর্ষণ বাড়াইয়া দিল।

সমাজবাদী ধারণার বিবর্তন

ভারতবর্ষে কেবল কেরল-ছাড়া কমিউনিষ্ট দল কিংবা শ্রমিকশ্রেণী শাসনাধিকার পায় নাই। জাতীয়তাবাদীরা কেন্দ্রে ও অন্যান্য রাজ্যে জাতির কর্ণধার এবং ধনতন্ত্রীদের প্রভাবও ইহাদের উপর কম নয়। একটি পশ্চাৎপদ অর্থনীতির দেশকে অগ্রসর একটি শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করার জন্য এবং আমাদের দেশের অতিশয় দরিদ্র জন-সাধারণের আশা বর্ধনের জন্য তাহাদের সামাজিক উন্নয়নে কর্মভার গ্রহণে উৎসাহিত করিবার জন্য কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজগঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। এই সমাজবাদ অবশ্যই মার্ক্সীয় সমাজবাদ হইতে ভিন্নতর। নেহেরুর মতে, মার্ক্সবাদ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব এই পরমাণবিক যুগে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস সমাজবাদী ধাঁচ (pattern)-এর কথা বলিয়াছে, ইহাকে একটি অপরিবর্তনীয় মৌল নীতি (dogma) হিসাবে গ্রহণ করে নাই।

আবাদী কংগ্রেস ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ঘোষণা

একটু লক্ষ্য করিলেই কংগ্রেস দল ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত এই সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যটি বুঝা যাইবে। সোবিয়েৎ প্রভৃতি একদল-

পরিচালিত রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্রের যে মূল্য স্বীকার করা হইয়া থাকে,ভারতীয় সংবিধান সে পন্থার অনুবর্তী নয়। রাষ্ট্র-কাঠামোয় কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং অর্থ-নীতির সংগঠনে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি মার্ক্সবাদী মতবাদের অনুগামী। ভারতের পদ্ধতি পৃথকতর। রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এখানে গণতন্ত্র স্বীকৃত, বহুদল দ্বারা এদেশে রাজনৈতিক জীবন সংগঠিত ও পরিচালিত। বহুশ্রেণীর বহুবিধ আদর্শ ও স্বার্থের প্রতি এখানে লক্ষ্য। কাজেই এদেশের সমাজতান্ত্রিক কাঠামো সোবিয়েৎ প্রভৃতি দেশ হইতে ভিন্নতর হইতে বাধ্য।

রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমাজবাদ

আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের লক্ষ্য সম্বন্ধে আবাদী কংগ্রেস অধি-বেশনে বলা হইয়াছে,—"Establishment of a 'Socialist pattern of Society', where the principal means of production are under social ownership or control, production progressively spuded up and there is equitable distribution of the national wealth." আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিও আজ এই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র ও সমাজগঠনের উদ্দেশ্যেই রচিত। সর্ববিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের অবসানই ইহাতে কাম্য। এই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনে রাষ্ট্রকে ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। মূল শিল্পগুলি স্থাপন ও সংরক্ষণের ভার রাষ্ট্রকেই লইতে হইবে, পরিকল্পনায় ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকাই হইবে প্রধানতম। বিশেষত রাষ্ট্রকে (১) বৃহৎ ও মূল শিল্পগুলি পরিচালনা করিতে হইবে, (২) অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে; (৩) দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, (৪) অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কিত সামাজিক উদ্দেশ্য ও প্রবণতার গতি নির্ধারণ করিতে হইবে; (৫) পরিকল্পনাহীন অর্থনীতিকে এবং ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন ব্যবসা-সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, (৬) সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের লক্ষ্য ও আদর্শ

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

কিন্তু রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিগত পুঁজির ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করিবে না। ভারতের মত দেশে শিল্প ইত্যাদিতে অধিকতর পুঁজির বিনিয়োগ প্রয়োজন। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানাকেও যথেষ্ট সুযোগ দিতে হইবে। নচেৎ পুঁজির বিনিয়োগ রুদ্ধ হইবে। কিন্তু এই পুঁজি জাতীয়

ব্যক্তিগত পুঁজি

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাঠামো অনুসারেই শিল্প-ব্যবসায়ে বিনিযুক্ত হইবে। সমবায় এবং গ্রাম্য ও কুটির-শিল্পের উন্নয়নেও ব্যক্তিগত পুঁজির দায়িত্ব লইতে হইবে।

পাশ্চাত্ত্য সমাজতন্ত্রের চেষ্টাই হইল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পব্যবস্থার চরম কেন্দ্রীকরণ। ভারতের বিশেষ অবস্থায় এই জাতীয় কেন্দ্রীকরণের দিকে ঝোঁক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত না। ভারতীয় সমাজবাদ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণকে সমন্বিত করিয়া এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পক্ষপাতী। এক দিকে ভারী শিল্প, অন্য দিকে গ্রাম্য ও কুটিরশিল্পের মধ্য দিয়া নীচের দিক হইতে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে গড়িয়া তোলা হইবে। এইভাবেই ভারসাম্যের সন্ধান করা হইতেছে।

অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ

দেশের সমাজবাদী অর্থনীতি গড়িয়া তোলার ব্যাপারে আত্মনির্ভরতাই সর্বাপেক্ষা বড় ভিত্তি। দেশের সাধারণ মানুষের সামান্য পুঁজিকে তাই জাতীয় পুনর্গঠনে নিযুক্ত করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইতেছে। কিন্তু সমাজবাদী কাঠামো গঠনের উপযোগী পুঁজির সমস্যা ইহাতে কিছুতেই মিটিবে না। কাজেই বিদেশী পুঁজিকে আহ্বান জানাইতে হইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা আমাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও অগ্রগতি কোনক্রমে ব্যাহত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিদেশী পুঁজির উপরে বেশি নির্ভরতা যে আদৌ স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, সমাজবাদ কাঠামোর কর্ণধারগণ তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সমস্ত সম্ভাবনা-সত্ত্বেও সংশয় যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। জয়প্রকাশ প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ এই সরকারী চেষ্টাগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত পুঁজিবাদের (State Capitalism) উদ্ভব ঘটিবে বলিয়া মনে করেন। শ্রেণীবিভক্ত দেশে—যেখানে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের উপর দেশীয় পুঁজিবাদের প্রভাব অল্প নয়, সেখানে এ আশংকা কি একেবারেই অমূলক ?

বিদেশী পুঁজি
রাষ্ট্রায়ত্ত পুঁজিবাদের আশংকা ?

দশমিক মুদ্রা

বিগত ১লা এপ্রিল থেকে ভারতবর্ষে দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হয়েছে। মুদ্রাপদ্ধতির এই পরিবর্তনের মূলে প্রত্যক্ষত রয়েছে লোকসভা কর্তৃক ১৯৫৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত "ভারতীয় মুদ্রা (সংশোধন) আইন।" কিন্তু এই পরিবর্তন আকস্মিক নহে। এর পশ্চাতে সুদীর্ঘকালের চিন্তা ও প্রস্তুতির একটি ইতিহাস আছে। গণিতের ক্ষেত্রে প্রাচীন জগতের মৌলিক অবদান দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কার। এই পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় দ্রুতসাধ্য ও সহজতর। এজন্য সমস্ত সভ্য জগৎ ভারতের এই মৌলিক অবদানকে সাদরে গ্রহণ

ভূমিকা

করেছিল। সভ্যতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সংগে সংগে এই পদ্ধতি শুধু গণিতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি ; পৃথিবীর বহুদেশ এই পদ্ধতির গুরুত্ব অনুভব করে একে নিজ নিজ মুদ্রার ক্ষেত্রেও গ্রহণ করেছে। দশমিক মুদ্রাপদ্ধতি সর্বপ্রথম গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৭৮৬ এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ; তারপর ফরাসী দেশ ১৭৯৯ এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। বস্তুত, পৃথিবীর যে ১৪০টি দেশের নিজস্ব মুদ্রা আছে, তাদের মধ্যে ১০৫টি দেশই দশমিক মুদ্রা-পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যদিও ভারতেই দশমিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়, তবু এতাবৎ ভারতবর্ষ কর্তৃক তা গৃহীত হয়নি। কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষ এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিল—একথা বললে অন্যায় করা হবে। অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় দশমিক মুদ্রা-পদ্ধতির সহজাত শ্রেষ্ঠত্ব হেতু ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞবৃন্দ বহুকাল যাবৎ এর পক্ষে মত ব্যক্ত করে এসেছেন। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়েছিল ৯০ বৎসর আগে—১৮৬৭ সনে। সমস্ত বিষয়টি বিশদভাবে পরীক্ষার পর গভর্ণমেণ্ট তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দশমিক পদ্ধতি ভারতবর্ষে ধাপে ধাপে গ্রহণ করা হবে। ১৮৭১ সনে এ বিষয়ে একটি আইনও পাশ হয়। কিন্তু নানা কারণবশত আইনটি তখন কার্যকরী হয়নি।

১৯৪৫ সনের গোড়ার দিকে ভারত সরকারের অর্থদপ্তর বিষয়টির প্রতি আবার মনোনিবেশ করেন এবং এ-ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও ভারতের অডিটর জেনারেল-এর মতামত আহ্বান করেন। সমস্ত অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল ও কণ্ট্রোলারদের মতামত গ্রহণ করে অডিটর জেনারেল দশমিক পদ্ধতি গ্রহণের অনুকূলে মত ব্যক্ত করেন এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে অগ্রসরের পূর্বে যে সকল সমস্যার সমাধান দরকার, তৎপ্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৪৬ সনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৪তম অধিবেশনের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আফজল হোসেন এক যুক্তবিবৃতিতে মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপের দশমিকীকরণের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। ১৯৪৬ সনে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে এ বিষয়ে একটি বিলও উত্থাপিত হয়। কিন্তু আসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিলটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪৯ সনে "ওজন ও মাপবিষয়ক বিশেষ কমিটি" তাঁদের রিপোর্টে মুদ্রার দ্রুত দশমিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। ওজন ও মাপের ক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতি গ্রহণের অনুকূলেও তাঁরা নিজেদের মত ব্যক্ত করেন। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ইন্‌স্টিটিউশন-এর সাধারণ সভা উক্ত মত সমর্থন করেন। এইরূপে ধীরে ধীরে বিশেষজ্ঞবৃন্দ, জনসাধারণ ও ভারত সরকারের মতের পোষকতার ফলে ভারতীয়

বিশেষজ্ঞদের মতামত

লোকসভা কর্তৃক ১৯৫৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রার দশমিকীকরণ বিষয়ক আইনটি (ভারতীয় মুদ্রা সংশোধনের আইন) গৃহীত হয়।

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতবর্ষ যখন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত, তখন চিরাচরিত মুদ্রাপদ্ধতির পরিবর্তন করে' নূতন মুদ্রার প্রচলনের এমন কী প্রয়োজন ছিল? পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দশমিক মুদ্রা চালু হয়েছে বলে আমাদের দেশেও এর প্রচলন করতে হবে, এমন কি কথা আছে? ব্রিটেনের মত শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ রাজ্যে এখনও তো দশমিক মুদ্রা চালু হয়নি? ইত্যাদি, ইত্যাদি। কথাটা ভেবে দেখবার মত। ভারতের বর্তমান মুদ্রাপদ্ধতি বহুকালাগত; এ সুষ্ঠুভাবে দেশের জনসাধারণের চাহিদা মিটিয়ে আসছে। শত শত বৎসর ধরে বংশানুক্রমে অভ্যাসমসৃণ হতে হতে বর্তমান মুদ্রাপদ্ধতিতে হিসাব একটা সহজাত সংস্কারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বিশেষত শুভংকর প্রভৃতি গণিতবিদ্‌দের কল্যাণে বিভিন্ন অঞ্চলে অতি অল্প সময়ে মুখে মুখে হিসাবের রেওয়াজ জনসাধারণ তথা অল্পশিক্ষিত ছোটখাট ব্যবসায়ীদের মধ্যেও বহু প্রচলিত। নূতন মুদ্রার প্রচলন জনসাধারণের মধ্য থেকে এই সহজাত হিসাবকুশলতার ভিতটুকু সরিয়ে নিয়ে তাদের বিহ্বলতার গভীর জলে নিক্ষেপ করবে। উপরের কথাগুলির যুক্তিবত্তা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষতির পিঠেই একটা লাভের অংকও হামেশাই থাকে। গণিতে দশমিকের ব্যবহারের ন্যায় মুদ্রার দশমিকের ব্যবহার বর্তমান পদ্ধতির তুলনায় সহজতর হবে—একথা বুদ্ধি দিয়ে একটু বিচার করলেই হৃদয়ংগম হবে। শত শত বৎসরের অভ্যাসমসৃণ সহজাত হিসাব-কুশলতা নূতন মুদ্রাপদ্ধতিতে গ্রহণের ফলে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে—এমন কোন আশংকার কারণ আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, নূতন মুদ্রাপদ্ধতিতেও বর্তমান মুদ্রাপদ্ধতির ন্যায় নূতন নূতন সহজসাধ্য হিসাবের আর্যা ও প্রণালী কালক্রমে আবিষ্কৃত হবে—এরূপ আশা করা বোধ হয় খুব অন্যায় হবে না। যাক, আগের কথায় ফিরে যাই। ব্রিটেনে দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হয়নি তার কারণ এই নয় যে, সে দেশে দশমিক পদ্ধতির উপকারিতা অনুভূত ও স্বীকৃত হয়নি। বস্তুত সে দেশে দশমিক মুদ্রার উপযোগিতা বহুস্বীকৃত। কিন্তু কতকগুলো বাস্তব সমস্যা সে-দেশে মুদ্রার দশমিকীকরণে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তন্মধ্যে স্বয়ংক্রিয় হিসাবযন্ত্রের (Automatic Calculating Machine) বহুল প্রচলনই সর্বপ্রধান। বস্তুত, ব্রিটেনের অভিজ্ঞতা আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার সুযোগ দিয়ে মুদ্রার দশমিকীকরণের অনুকূলে বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও সরকারের মত দৃঢ়তর করেছে। ভারতবর্ষ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রভৃতির ফলে আগামী ১০।১৫ বৎসরে ভারতে শিল্পবাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার ও সংগে সংগে লক্ষ লক্ষ স্বয়ংক্রিয় হিসাবযন্ত্রের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদের দেশে এসব যন্ত্রের

বর্তমান সময় কি অনুকূল?

খানিকটা প্রচলন আছে বটে, কিন্তু ব্রিটেন প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশের সংগে এ ব্যাপারে আমাদের দেশের কোন তুলনাই হয় না। তা ছাড়া, বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরিমাপযন্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগ ব্যাপারে আমাদের দেশ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। যদি দশমিক মুদ্রার প্রচলন আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়, তবে শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের সংগে সংগে যে প্রচুর হিসাব-যন্ত্রসম্ভার বর্তমান মুদ্রাপদ্ধতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে, তাদের ভবিষ্যতে দশমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন শুধু সময় ও কষ্টসাপেক্ষই নয়, অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষও বটে। প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে গড়িমসি করে' পরবর্তী সময়ে অহেতুক জাতীয় সম্পত্তি ক্ষয় কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

অন্য একটি কারণেও দশমিক মুদ্রা প্রচলনের এখনই সর্বোত্তম সময়। দশমিক মুদ্রা পুরোপুরি কার্যকরী হতে হলে মেট্রিক-পদ্ধতিতে ওজন ও পরিমাপের সংগে এর সংযোগ অবশ্য কর্তব্য। আগামী দশ বৎসরে ধাপে ধাপে ওজন ও মাপের দশমিকী-করণ সম্পন্ন করা হবে বলে প্রস্তাব উঠেছে। দশমিক মুদ্রা, ওজন ও মাপের মান-নির্ধারণরূপ (Standardisation) বৃহৎ সংস্কারের পূর্বপ্রস্তুতি মাত্র। ভারতবর্ষে বর্তমানে ওজন ও মাপের হাজারো রকমফের আর তার ফলে হাজারো রকমের গণ্ডগোল। দেশে একটিমাত্র মুদ্রাপদ্ধতি ও তদনুসারী ওজন ও মাপের প্রচলন এই দুরবস্থা দূর করে' হিসাবনিকাশ, ওজন ও পরিমাপ সরল ও সহজসাধ্য করে তুলবে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করবে। ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রেও প্রচুর সুযোগসুবিধার সৃষ্টি হবে। মোটের উপর, সব দিক দিয়ে বিচার করলে মুদ্রাসংস্কার যে সময়োপযোগী হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হয়। অপর একটি কারণবশতও আমি বর্তমান মুদ্রাসংস্কারকে স্বাগত জানাই। কারণটি আর কিছু নয়—ধারাপাত-বিভীষিকা। বুড়ি-গণ্ডা, কড়া-ক্রান্তি, ধুল-দন্তি, কাক-তিল, ঘুণ-বেণু প্রভৃতির গোলক-ধাঁধা। বর্তমান মুদ্রাসংস্কারের ফলে ধারাপাত ও প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী হতে এই সব অতি অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর ও কালবারিত পাঠ্যবস্তুর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয়ে পাঠক্রম নূতন মুদ্রাপদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্যশীল ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগনির্ভর অংশে সীমাবদ্ধ থাকবে—এ আশা দেশবাসী অবশ্যই করতে পারে। এবিষয়ে আমি দেশবাসীর ও শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাপ ও ওজনের সংগে সম্বন্ধ

নূতন মুদ্রাপদ্ধতিতে টাকাকে বর্তমান ৬৪ পয়সার স্থলে ১০০ 'নয়া পয়সায়" ভাগ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালে (অন্তত তিন বৎসর) পুরনো পয়সা ও "নয়া পয়সা" এক সংগে পাশাপাশি বাজারে চলবে। পয়সার এই পুরাতন ও নূতন শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে গণ্ডগোল এড়াবার জন্য নূতন দশমিক পয়সার নাম হয়েছে "নয়া

পয়সা"। অন্তর্বর্তীকালের শেষে পুরাতন মুদ্রা বাজার থেকে সম্পূর্ণ তুলে নেওয়া হবে। শুধু দশমিক মুদ্রাই বাজারে চলবে। নয়া পয়সা তখন আর "নয়া" থাকবে না। ১লা এপ্রিল থেকে ১, ২, ৫ ও ১০ নয়া পয়সার মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়েছে। সংগে সংগে পুরাতন ১ পয়সা, ২ পয়সা, ১ আনা ও ২ আনার মুদ্রাগুলিও বাজারে চালু আছে। উচ্চতর মানের মুদ্রা অর্থাৎ ২৫ ও ৫০ নয়া পয়সা ও নূতন টাকা বাজারে ছাড়া হবে। আর যতদিন তা না করা হয়, বর্তমান সিকি আধুলি ও টাকা এদের বদলে বাজারে চলতে থাকবে। এদের বর্তমান মুদ্রামানের কোন তারতম্য হবে না। টাকা দেওয়ার সময় ও হিসাবনিকাশের কাজে নূতন ও পুরাতন দু রকমের মুদ্রাই বিহিত মুদ্রা (লিগ্যাল টেণ্ডার) হিসাবে গণ্য হবে। গবর্নমেণ্টের হিসাবনিকাশ কিন্তু ১লা এপ্রিল থেকে শুধু টাকা আর নয়া পয়সায় করা হচ্ছে। টাকা আনা পাই-এ করা হয় না। ভারতের কম্প্‌ট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের সহিত পরামর্শ করে এবিষয়ে বিস্তারিত ব্যবস্থা যথাসময়ে করা হয়েছে এবং অডিট্-অফিস, ব্যাংক, ট্রেজারি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকল গবর্নমেণ্ট অফিসকেই এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নূতন মুদ্রা

নূতন মুদ্রার উপরিলিখিত বিভাগ-ব্যবস্থায় বর্তমান দুই আনা, এক আনা, ডবল পয়সা ও ১ পয়সা মানের মুদ্রাসমূহের হুবহু অনুরূপ কোন মুদ্রা নেই। তাদের স্থল মোটামুটি গ্রহণ করেছে যথাক্রমে ১০, ৫, ২ ও ১ "নয়া পয়সা"। প্রত্যেক নূতন মুদ্রার এক দিকে অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তি অংকিত থাকছে। সিংহ-মূর্তির এক পাশে লেখা থাকছে হিন্দীতে 'ভারত' এই শব্দটি। অপর পাশে ইংরেজিতে 'India' এই শব্দটি। মুদ্রার বিপরীত দিকে নয়া পয়সার হিসাবে তার মান ও বাজারে ছাড়ার বৎসর আন্তর্জাতিক সংখ্যায় মুদ্রিত থাকছে। তা ছাড়া, টাকার সহিত প্রত্যেকটি নূতন মুদ্রার সম্বন্ধ জনসাধারণকে সঠিক বোঝাবার জন্য বিভিন্ন মানের মুদ্রার গায়ে এদের কতটিতে এক টাকা হবে—হিন্দীতে তার উল্লেখ থাকছে। যেমন :—

বিনিময়-হার

সৌ নয়ে পৈসে—1 রুপয়া
রুপয়েকা আধা ভাগ—50 নয়ে পৈসে
রুপয়েকা চৌথা ভাগ—25 নয়ে পৈসে
রুপয়েকা দসবাঁ ভাগ—10 নয়ে পৈসে
রুপয়েকা বিসবাঁ ভাগ—5 নয়ে পৈসে
রুপয়েকা পচাসবাঁ ভাগ—2 নয়ে পৈসে
রুপয়েকা সৌবাঁ ভাগ—1 নয়ে পৈসে

১০০, ৫০ ও ২৫ নয়া পয়সার মুদ্রা তৈরী হবে বিশুদ্ধ নিকেলে আর ১০, ৫ ও ২ নয়া পয়সার মুদ্রা তৈরী হচ্ছে তামা ও নিকেল মিশ্রিত ধাতুতে (৭৫% তামা ২৫% নিকেল)। ১ নয়া পয়সা শুধু ব্রঞ্জেরই হচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাংকের অফিসগুলিতে, স্টেট ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়ার শাখাগুলিতে, অন্যান্য এজেন্সি ব্যাংকে এবং ট্রেজারি ও সাব-ট্রেজারিগুলিতে মুদ্রাবদলের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। মাত্র চার আনা ও তার গুণিতক সংখ্যার মুদ্রাগুলি, যেমন ৮ আনা ১২ আনা ১ টাকা ইত্যাদির বদলেই নূতন মুদ্রাগুলি দেওয়া হচ্ছে। জনসাধারণ নূতন মুদ্রার ব্যবহারে অভ্যস্ত হলে এবং নূতন মুদ্রা বাজারে যথেষ্ট চালু হলে সমস্ত পুরাতন মুদ্রা বাজার হতে তুলে নেওয়া হবে। এই অন্তর্বর্তীকাল অন্তত তিন বৎসরের কম হবে না-বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

নূতন ও পুরাতন মুদ্রাবিনিময়ের ক্ষেত্রে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দিবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর বিনিময়-তালিকা বিতরণের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান সহজতর হবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় মুদ্রাবদলের একটি তালিকা দেওয়া গেল। ঐ মুদ্রাবদলের তালিকাটিতে আনা পাই-এর মুদ্রায় দেওয়া অংকের নয়া পয়সার হিসাবে বিনিময়-মূল্য (সম্প্রতি সংশোধিত ১৯০৬ সনের ভারতীয় মুদ্রা আইনের ১৪(২) ধারার নির্দেশ অনুযায়ী ভগ্নাংশকে সম্পূর্ণ করার পর) দেওয়া হয়েছে। $\frac{1}{2}$ নয়া পয়সা ও তার চাইতে কম ভগ্নাংশকে বাদ দিয়ে $\frac{1}{2}$ নয়া পয়সার বেশী ভগ্নাংশকে ১ নয়া পয়সা ধরে নয়া পয়সার হিসাবে সমতুলের ভগ্নাংশকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। মুদ্রা-বদলের তালিকানুযায়ী ভগ্নাংশকে সম্পূর্ণ করার কাজটি কেবল তখনই করার দরকার হবে, যখন কোন লেনদেনের শেষে আনা এবং পাই-এর হিসাবে দেয় যে কোন পরিমাণ প্রাপ্যকে নয়া পয়সায় পরিবর্তিত করতে হবে। নূতন অথবা পুরাতন অথবা উভয় প্রকারের মুদ্রা মিলিয়ে যে কোনভাবে প্রাপ্য পরিশোধ করা যাবে। ক্রেতার নিকট কোন্ প্রকারের মুদ্রা আছে, তার উপরই কোন্ মুদ্রায় প্রাপ্য পরিশোধ করা হবে তা নির্ভর করবে। সুতরাং কোন লেনদেনের শেষে যখন টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হবে অথবা খুচরা পয়সা পেতে হবে, তখনই কেবল মুদ্রাবদলের তালিকাটির প্রয়োজন হবে। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে:— প্রতিটি পেন্সিল দেড় আনা হিসাবে এক ডজন পেন্সিল কিনে যদি কোন ক্রেতা শুধু নয়া পয়সা দিয়ে দাম মিটাতে চান, তবে প্রথমে বিনিময়-তালিকা দেখে নয়া পয়সায় দেড় আনার সমতুল ঠিক করে তাকে ১২ দিয়ে গুণ করলে ভুল হবে। সঠিক হিসাব নিম্নোক্ত দুটি উপায়ে করা যেতে পারে: হয়, নয়া পয়সায় দেড় আনার সঠিক সমতুল (অর্থাৎ ৯·৩৭৫ নয়া পয়সা) নির্ণয় করে তাকে ১২ দিয়ে গুণ করে

বিনিময়ের অসুবিধা

বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রায় পরিমাপ		নয়া পয়সার মুদ্রায় সমতুল	বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রায় পরিমাণ		নয়া পয়সার মুদ্রায় সমতুল্য
আনা	পাই		আনা	পাই	
০	৩	২	৮	৩	৫২
০	৬	৩	৮	৬	৫৩
০	৯	৫	৮	৯	৫৫
১	আনা	৬	৯	আনা	৫৬
১	৩	৮	৯	৩	৫৮
১	৬	৯	৯	৬	৫৯
১	৯	১১	৯	৯	৬১
২	আনা	১২	১০	আনা	৬২
২	৩	১৪	১০	৩	৬৪
২	৬	১৬	১০	৬	৬৬
২	৯	১৭	১০	৯	৬৭
৩	আনা	১৯	১১	আনা	৬৯
৩	৩	২০	১১	৩	৭০
৩	৬	২২	১১	৬	৭২
৩	৯	২৩	১১	৯	৭৩
৪	আনা	২৫	১২	আনা	৭৫
৪	৩	২৭	১২	৩	৭৭
৪	৬	২৮	১২	৬	৭৮
৪	৯	৩০	১২	৯	৮০
৫	আনা	৩১	১৩	আনা	৮১
৫	৩	৩৩	১৩	৩	৮৩
৫	৬	৩৪	১৩	৬	৮৪
৫	৯	৩৬	১৩	৯	৮৬
৬	আনা	৩৭	১৪	আনা	৮৭
	৩	৩৯	১৪	৩	৮৯
৬	৬	৪১	১৪	৬	৯১
৬	৯	৪২	১৪	৯	৯২
৭	আনা	৪৪	১৫	আনা	৯৪
[illegible]	৩	৪৫	১৫	৩	৯৫
৭	৬	৪৭	১৫	৬	৯৭
৭	৯	৪৮	১৫	৯	৯৮
৮	আনা	৫০	১৬	আনা	১০০

গুণফলকে বিনিময়-তালিকা দেখে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে। নয়ত, বর্তমান মুদ্রায় দেড় আনা হিসাবে ১ ডজনের দাম ঠিক করে নিয়ে টাকার উপরে যে আনা বা পাই হয়, তাকে বিনিময়-তালিকা অনুযায়ী নয়া পয়সার বদলে নিতে হবে। উপরের উদাহরণে ১২টি পেন্সিলের মোট দাম হয় ১৮ আনা অর্থাৎ ১৵০। বিনিময়-তালিকা দেখে নয়া পয়সায় এই ২ আনার সমতুল ঠিক করে নিতে হবে। ৵০ আনায় ১২ নয়া পয়সা। সুতরাং ক্রেতাকে ১ টাকা ১২ নয়া পয়সা দিতে হবে। অনুরূপভাবে কোন একটি লেনদেনের বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের সমষ্টির উপর যে প্রাপ্য দাঁড়াবে, তা যদি টাকা আনা ও পাই-এ হয়, তবে শুধু আনা ও পাইকে নয়া পয়সায় রূপান্তরিত করে টাকা ও নয়া পয়সায় প্রাপ্য পরিশোধ করতে হবে। পক্ষান্তরে, যদি কোন দ্রব্যের মূল্য নয়া পয়সায় দেওযা থাকে, আর ক্রেতার নিকট শুধু বর্তমান আনা ও পয়সা থাকে, তবে মোট দ্রব্যমূল্যকে নযা পয়সায় হিসাব করে টাকাব উপরে যত নয়া পয়সা হবে, তাকে বিনিময়-তালিকা দেখে আনা পাই-এ পবিবর্তিত করে মূল্য পরিশোধ কবতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি মোট বিলের পরিমাণ ৮টাকা ২০ নয়া পয়সা হয়, তবে ৮ টাকার পরিশোধ ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, নতুন ও পুরাতন টাকার মূল্যমান একই। ২০ নয়া পয়সাকে পুরাতন মুদ্রায় পরিশোধ করতে গেলেই যত অসুবিধা। সে ক্ষেত্রে বিনিময়-তালিকা অনুযায়ী ৶০ আনা দিলেই ১৯ নয়া পয়সার দাবী মিটান হবে। প্রাপ্য বাকি ১ নয়া পয়সা হয় ১টি পুরাতন পয়সা নয়তো ১টি নয়া পয়সা দিয়ে মিটাতে হবে।

ডাক ও তার বিভাগ বর্তমান ডাকটিকিট প্রভৃতির পরিবর্তে দশমিক মুদ্রার হিসাবে নূতন ডাক টিকিট, খাম, পোস্টকার্ড প্রভৃতি ১লা এপ্রিল থেকে বের করেছেন।

ষ্ট্যাম্প

ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে আপাতত বিভিন্ন মূল্যের ডাকটিকিটের নকশা একই রকম হয়েছে। নয়া পয়সার হিসাবে পোস্টকার্ড, খাম প্রভৃতির মূল্য নিম্নে উল্লেখ করা গেল—

১ পোস্ট কার্ড—	৫	নয়া পয়সা
জবাবী পোস্ট কার্ড—	১০	,,
লোক্যাল ডেলিভারী কার্ড—	৩	,,
জবাবী ডেলিভারি কার্ড—	৬	,,
খাম—	১৫	,,
ইনল্যাণ্ড খাম—	১০	,,
রেজিষ্ট্রি করার খাম—	৭১	,,
এয়ারোগ্রাম—	২০, ৫০ ও ৭৫ নয়া পয়সা	

ডাক টিকিট—	১, ২, ৩, ৫, ৬, ৯, ১০, ১৩, ২০, ২৫, ৫০ ৭৫ নয়া পয়সা
সার্ভিস টিকিট—	ডাকটিকিটের অনুরূপ, তবে ৭৫ নয়া পয়সার সার্ভিস টিকিট থাকবে না।

১লা এপ্রিল থেকে রেলের ভাড়াও নূতন মুদ্রার হিসাবে হচ্ছে। তবে রেলের শুল্কের হিসাব আরও কিছুকাল পুরাতন মুদ্রার হিসাবেই করা হবে। 'রেলপথ শুল্ক অনুসন্ধান সমিতি'র সুপারিশ-অনুযায়ী রেল-শুল্কের হার পরিবর্তনকালে পরিবর্তিত শুল্কের হার নূতন মুদ্রার হিসাবেই হচ্ছে।

রেলওয়ে

শিল্পবাণিজ্যের বর্তমান প্রগতির যুগে স্বয়ংক্রিয় হিসাব-যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। ভারতবর্ষ এখনও শিল্প-বিপ্লবের দ্বারদেশে। তবু ব্যবসায়ীমহলে, এমন কি সরকারের বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় হিসাব-যন্ত্রের ব্যবহার নিতান্ত নগণ্য নয়। এই সব যন্ত্রের নানাবিধ পরিবর্তন ও পরিবর্জন ব্যাপারেও যন্ত্রনির্মাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত ভারত সরকারের প্রাথমিক আলাপ আলোচনা হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে ইংরাজদের আগমনের পূর্বে মুদ্রার ধাতুমূল্য ও মূল্যমান সমানুপাতিক ছিল। নূতন মতবাদের প্রসারের সংগে সংগে মুদ্রা সম্বন্ধে লোকের ধারণার পরিবর্তন হল। আর পূর্ণমান মুদ্রার স্থান পরিগ্রহ করল প্রতীক মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রা (token coins and paper currencies)। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব কালে ভারতে স্বর্ণ ও রৌপ্য—উভয়বিধ মুদ্রাই পাশাপাশি চলত। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন বিনিময়-হার সঠিকভাবে নির্দিষ্ট ছিল না। কারণও ছিল। বহু রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক নরপতির নিজস্ব মুদ্রা ছিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে, অন্যূন ৯৯৪ রকমের মুদ্রা ভারতে প্রচলিত ছিল। বর্তমান আকার ও আকৃতির (size and form) ভারতীয় মুদ্রা সর্বপ্রথম নির্মিত হয় ১৮৩৫ সনে। আজকাল টাকশাল বলতে যা বোঝায়, তার গোড়াপত্তন হয় কলকাতায় ১৮২৪ সনে আর তাতে মুদ্রানির্মাণের কার্য আরম্ভ হয় ১৮২৯ সনের ১লা আগস্ট তারিখে। প্রায় ১২৫ বৎসর যাবৎ ভারতীয় মুদ্রা এই ঐতিহ্যকেই বহন করে আসছে। ১৯৫৭ সনের ১লা এপ্রিল থেকে দশমিক মুদ্রা প্রচলনের ফলে সেই ঐতিহ্যপ্রবাহের গতি ভিন্নমুখে প্রবাহিত হল। ভারতীয় মুদ্রার দশমিকীকরণ অন্যান্য দেশের অনুকরণমাত্র নয়। ভারতীয় মুদ্রাপদ্ধতির কালাগত মূল কেন্দ্রীয় মুদ্রা (অর্থাৎ টাকা) ও তার ভিত্তিকে অবিকৃত রেখে দশমিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ যেন এক সতর্ক বৃত্তচারণা। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ অতীতের সংগে নূতন যুগের ধ্যানধারণার অপূর্ব সমন্বয়। ঐতিহ্যবাহী এই মুদ্রা-সংস্কার অচিরে জয়যুক্ত হক!*

হিসাব-যন্ত্র

* বর্তমান পুস্তক-প্রণেতার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান অনিলকুমার আচার্য, এম. এ.-র সৌজন্যে।

পঞ্চশীল ও বর্তমান জগৎ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বৃহত্তম সমস্যা কি, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে একটি উত্তরই আসিবে, তাহা হইল শান্তিরক্ষার সমস্যা। পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তির পক্ষে ইহা অবশ্য কোন গৌরবের কথা নয় যে, একটি রক্তাপ্লুত বিশ্বযুদ্ধের সমস্ত ক্ষত বুকে লইয়াই তাহারা নবতর যুদ্ধপ্রস্তুতির পথে পা বাড়াইতেছে। বিশ্বরাষ্ট্র-সংস্থা (U. N. O.) গঠিত হইয়াছে, কিন্তু ন্যায়নীতি সম্পূর্ণত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে একথা আদৌ বলা চলে না। জার্মানী-ইতালী ও জাপানের ফ্যাসীবাদ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের মন হইতে যুদ্ধের আতংক সম্পূর্ণ কমে নাই। কখনও পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সম্পর্কের প্রশ্ন লইয়া পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে দ্বারপ্রান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছে। আবার কখনও কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধব্যবসায়ীরা একটি ঘোট পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতের অন্তর্গত গোয়া, ইন্দোনেশিয়ার ইরিয়ান এবং চীনের তাইওয়ান কতকগুলি বিপজ্জনক অঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিধাবিভক্ত কোরিয়া এবং ভিয়েৎনাম বহু রক্তস্নান সমাপ্ত করিলেও উপনিবেশবাদীদের রক্তের আস্বাদ বোধ হয় মিটে নাই। সাইপ্রাস, আলজিরিয়া এবং সুয়েজখাল অঞ্চলও পৃথিবীর শান্তিরক্ষার সামনে দুরূহ সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে।

শান্তিরক্ষার সমস্যা

খুব সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা চলে, পৃথিবীর অঞ্চলগুলি আজ ত্রিধাবিভক্ত। কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী এবং তাহাদের অনুচরদের লইয়া গঠিত। পৃথিবীর আরও স্বাধীন অঞ্চলকে নানা কায়দায় উপনিবেশবাদের জোয়ালে আবদ্ধ না করিয়া তাহাদের শান্তি নাই। তাহাদের আণবিক ও উদযান বোমার পরীক্ষা আমাদের শস্যশ্যামল বাংলা দেশের সবুজ শস্যক্ষেত্রকে পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। দ্বিতীয় গোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি। তাহারা একটি বিশেষ আদর্শ-অনুযায়ী তাহাদের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুনর্গঠনের পক্ষপাতী। আর তৃতীয় গোষ্ঠীটি হইতেছে সদ্য ঔপনিবেশিকতার জোয়ালমুক্ত ভারতবর্ষ প্রমুখ কতকগুলি দেশ।

ত্রিধাবিভক্ত পৃথিবী

এই অবস্থাকে বিবেচনা করিলে আমরা সাধারণভাবে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি: (১) পৃথিবীর কোন দেশই আর পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে রাজী নয়। বৃহৎ দেশগুলি তো জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছেই— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশও আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে আপন স্বাধীনতার জন্য। যেখানেই সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি এই চেষ্টায় বাধা দিয়েছে সেখানেই যুদ্ধের

আশংকা দেখা দিতেছে। (২) প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করিবার সময় আসিয়া গিয়াছে। আপনার শক্তি ও অস্ত্র-সম্ভারের সুযোগ লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সার্বভৌমতা খর্ব করিবার যে-কোন চেষ্টাই যুদ্ধের আশংকা বাড়াইয়া তুলিবে। (৩) উত্তর আতলান্তিক, মধ্য প্রাচ্য, দক্ষিণপূর্ব এশীয় প্রভৃতির ন্যায় যুদ্ধজোটগুলি জাতিসমূহের মধ্যে সংশয় এবং সন্দেহ বাড়াইয়া তুলিবে। অস্ত্রসজ্জা ও ঘাঁটি স্থাপন বাড়িয়া যাইবে। আজ শান্তিরক্ষার পথ এই জাতীয় জোটগঠনের বিপরীত দিকে প্রসারিত। পরস্পরের সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে এবং সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ গ্রহণ করিতে হইবে। (৪) কোন্ রাষ্ট্র কি ধরণের সমাজব্যবস্থা গঠন করিবে তাহা লইয়া অপরের উদ্বিগ্ন হওয়া অনুচিত। ঐ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে গেলে অবশ্যই পৃথিবীর শান্তি ব্যাহত হইবে। তাই স্থায়ী শান্তিরক্ষার জন্য নানা পন্থা উদ্ভাবনের সংগে সংগে সর্বপ্রথম প্রয়োজন এই জাতায় প্রশ্নগুলির সমাধান। কারণ,—ইহাদের যে কোনটিই নিখিল বিশ্বে যুদ্ধের দাবানল জ্বালাইয়া তুলিতে পারে।

যুদ্ধের সম্ভাবনার সূত্র

পৃথিবীর এই সমস্যাজর্জর দিনে ভারত ও চীনের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় 'পঞ্চশীল' বা পাঁচটি মূলনীতি প্রচার করিলেন। নীতিপঞ্চক এইরূপ: (১) রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা স্বীকার; (২) অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা আদর্শগত কোনও কারণে কাহারও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (৩) পারস্পরিক অনাক্রমণ; (৪) সমানাধিকার, পারস্পরিক কল্যাণসাধন; (৫) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি। এই নীতিগুলির একটু বিশ্লেষণ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার যে সব সম্ভাব্য কারণ রহিয়াছে, তাহার অনেকগুলিই ইহাদের দ্বারা অবসিত হইবে, জাতিগুলির মধ্যেকার অবিশ্বাস ও সন্দেহ বহুল পরিমাণে লোপ পাইবে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।

পঞ্চশীল কি?

এইবার পঞ্চশীলের নীতিগুলি বিশ্লেষণ করা যাক। কোন একটি স্বাধীন দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা তাহার সার্বভৌমত্বেরই অংগ। গোয়া অথবা তাইওয়ান কিংবা ইরিয়ান যে যথাক্রমে ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার অংশমাত্র, এ প্রশ্নটির সমাধান লইয়া তাই নানা কল্পিত সমস্যা তোলা ঠিক নয়। আজ সাম্রাজ্যবাদী যে সমস্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠী এই সমস্ত অঞ্চলে নিজেদের দখল রাখিতে চায়, তাহারা যুদ্ধের সম্ভাবনাকেই জীয়াইয়া রাখে। পঞ্চশীলের প্রথম নীতিটির প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলে সাম্রাজ্যবাদীরা এই চেষ্টা হইতে বিরত থাকিত এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইত। সুয়েজ খালের সমস্যাটির কথা প্রসংগত মনে পড়ে। সুয়েজ খাল সম্পূর্ণতই মিশরের নিজস্ব

পঞ্চশীলের প্রয়োগ ও শান্তিরক্ষার উপায়

অঞ্চল। সুয়েজ-কোম্পানী সম্বন্ধে কি নীতি তাহারা গ্রহণ করিবে, ইহা তাহাদের একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু পঞ্চশীলে স্বীকৃত এই সহজ সত্যটি সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স মানিতে পারিল না; অর্থের লোভ তাহাদের এতদূর যে অপর রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে তাহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছে। তৃতীয় নীতিটি হইল অনাক্রমণের। আমেরিকার প্ররোচনায় ও প্রত্যক্ষ সাহায্যে সীংম্যান রী যখন উত্তর কোরিয়া আক্রমণ করেন, তখন সমগ্র পৃথিবী একেবারে বিশ্বযুদ্ধের দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হয়। কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি না ঘটিলে এতদিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবর্তে পৃথিবী রক্তমোক্ষণ করিত। ভারত চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিও গোয়া-তাইওয়ানের ব্যাপারে তাহাদের ন্যায্য অধিকার থাকা সত্ত্বেও আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া এই নীতির পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। চতুর্থ নীতিটি পারস্পারিক সহযোগিতা-সংক্রান্ত। এক দিকে নানা অর্থনৈতিক সাহায্যের একটি জাল বিস্তার করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত পৃথিবীতে ডলার ছড়াইতেছে। কিন্তু সাহায্যের সংগে তাহারা যে সব সর্ত আরোপ করিতেছে, তাহা স্বাধীন জাতিগুলির পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর। বিশেষত তাহারা অনুন্নত দেশগুলির উন্নতি তো আদৌ চায় না, নানারূপ সূত্রে শেষ পর্যন্ত দেশের স্বাধীন সত্তা গ্রাসার্থে লোভের হস্ত প্রসারিত করে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বাজারের পাশে পাশে একটি সমাজতান্ত্রিক বাজারেরও উদ্ভব হইয়াছে। তাই নিরপেক্ষ স্বাধীন এবং শান্তিকামী জাতিগুলির পক্ষে আপন আপন দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পুঁজিবাদীদের যে-কোন সর্তে তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের অবসান ঘটিয়াছে। আজ পৃথিবীতে এমন শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভাব নাই যাহারা পরস্পরকে এবং অন্যান্য অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করিতে পারে এবং সে সাহায্য কোনরূপ হীন সম্বন্ধের সংগে যুক্তও নয়। এই জাতীয় সাহায্য সহযোগিতা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব ও বন্ধুত্বকে বাড়াইয়া তোলে এবং পৃথিবীতে যুদ্ধের বিপদ অনেকাংশে কমাইয়া দেয়। পঞ্চশীলের পঞ্চম নীতিটি হইল সহ-অবস্থিতি সম্পর্কীয়। ইহার মূলে রহিয়াছে অন্যের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা এবং এক নৈতিক সহনশীলতা। কোন রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক প্রথায় তাহার অর্থনীতি গঠন করিতে পারে, কোন দেশ পুঁজিবাদী বা অন্য যে কোন প্রথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। ইহা সেই দেশের একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। ইহার জন্য অপরের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনই কারণ নাই। পৃথিবীকে কমিউনিজম গ্রাস করিল,—চীন কমিউনিষ্ট হইয়া গেল, কোরিয়া ভিয়েৎনামে তাই স্বাধীন বিশ্বের নামে আমেরিকার সাম্রাজ্যতন্ত্র যুদ্ধ-সজ্জায় রুখিয়া উঠিল। ইহা চলিবে না। সোবিয়েৎ রাশিয়া যেমন ঘোষণা করিয়াছে—'কমিউনিজম্ চালান দেওয়া যায় না, যে কোন রকম সমাজব্যবস্থা যে কোন রাষ্ট্র গ্রহণ

করিতে পারে, সকল শ্রেণীর রাষ্ট্রের প্রতিই আমরা সাহায্য ও সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করিব', আমেরিকাকেও তেমনি ঘোষণা করিতে হইবে,—'পুঁজিবাদ, সমাজবাদ বা যে কোন বাদী রাষ্ট্র কোনরূপ যুদ্ধে প্রবিষ্ট না হইয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাশাপাশি বাস করিতে পারে।' পঞ্চশীলের পঞ্চম শীলে এই আহ্বানই জানানো হইয়াছে।

পঞ্চশীল আতংক ও বিভীষকাগ্রস্ত বিশ্বের সামনে আশা ও সম্ভাবনার দিগন্ত খুলিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর অনেক শান্তিকামী লোক এবং রাষ্ট্র পঞ্চশীলের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছে। ভারত ও চীন ইহার প্রবক্তা। তাহারা ছাড়াও সোবিয়েৎ, ব্রহ্ম, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব য়ুরোপের সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলি, ভিয়েৎনামের গণরাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়া, সিংহল এবং আরও অনেক শান্তিকামী দেশ এই পঞ্চশীলকেই সমস্ত যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতেছে। কেবলমাত্র যুদ্ধলিপ্সু মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ ইহাকে 'কমিউনিষ্ট চক্রান্ত' বলিয়া ধিক্কার দিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর যে কোন সৎমানুষ নেহেরুজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ইহার স্পষ্ট জবাব দিবে—"কোন দেশ যদি সাধু হয় অনাক্রমণে যদি তাহার আস্থা থাকে, তবে তাহাকে পঞ্চশীল মানিতেই হইবে।"

ঐতিহাসিক তাৎপর্য

বিশ্বশান্তি ও যুদ্ধ

১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল; পৃথিবীর মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল: তাহারা আবার সুখী ও সমৃদ্ধিশীল জীবন গড়িয়া তোলার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়া ভাবী যুদ্ধের কারণ বিদূরিত হইবে, ইহাই তাহারা আশা করিয়াছিল। কারণ,—চক্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার সময়ে মিত্রশক্তির কর্ণধারগণ একথা বারংবার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর বুক হইতে তাঁহারা যুদ্ধের বীজ উৎপাটিত করিবেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের শান্তির আগ্রহ পাশ্চাত্ত্য শক্তিসমূহের মধ্যে অনেকটা আন্তরিক ছিল, তাঁহার 'নিউ ডিল' ইহার প্রমাণ। 'ইয়াল্টা ও পট্‌সডম্‌ চুক্তি'তে ভাবী শান্তির বীজও উপ্ত হইল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই রুজভেল্টের মৃত্যু ঘটিল। ১৯৪৬ সালে চার্চিল মিসৌরিতে এক বক্তৃতায় সোবিয়েতের বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। নবনিযুক্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইহার সমর্থন করিলেন। রুজভেল্ট জীবিত থাকাকালে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে শান্তির যে ভূমিকা ছিল, বর্তমানে তাহার স্থলে যুদ্ধই মুখ্য হইয়া দাঁড়াইল। ইংলণ্ডের চার্চিল-এট্‌লী-গোষ্ঠীও ট্রুম্যানের যুদ্ধনীতির

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ও শান্তিকামনা: আবার বারুদের গন্ধ!

বিশ্বস্ত সহযোগী হইয়া পড়িল। 'মনরো ডক্‌ট্রিনে'র সমাধি রচিত হইল এবং 'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' নূতন যুদ্ধ পরিকল্পনা লইয়া সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি সাধারণ মানুষ তো যুদ্ধ চায় না। এক মহাযুদ্ধের ঘূর্ণিবাত্যা হইতে উদ্ধার পাইয়া তাহারা সুখে-শান্তিতে বাঁচিবে এই আশাই করিয়াছিল। তাহাদের লোভ সীমাবদ্ধ, লাভ-বুদ্ধি সামান্য। কর্ম ও আনন্দ, সুখ ও শান্তি, মাঠভরা ফসল এবং ঘর-ভরা হাসি হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাত বারংবার তাহাদের এই শান্তির স্বপ্ন ভাঙিয়া দেয়, তাহাদের উপর চাপাইয়া দেয় সর্বব্যাপী ধ্বংস। ডানা মেলিয়া মৃত্যুর দূত নামিয়া আসে, ঘরবাড়ি শস্যপূর্ণ ক্ষেত জ্বলিয়া যায়। তাই পৃথিবীর সহস্র কোটি মানুষের আত্মদীর্ণ এই প্রশ্ন—কেন এই যুদ্ধ? কেন এই মৃত্যু? কেন এই ধ্বংস?

জনগণ যুদ্ধপরিপন্থী

যুদ্ধারম্ভের বৈজ্ঞানিক কারণ হইল শোষণ, অপরের শ্রম ও সম্পদ লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি। ধনতন্ত্রবাদ আপন ধ্বংসকে এড়াইতে চায় বলিয়াই তাহার এই যুদ্ধকামনা এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জার্মানী, জাপান ও ইতালীর অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় সংকটের মুখে পড়ে। একমাত্র জার্মানীতে ৫০ লক্ষ লোক বেকার জীবনযাপন করিতে থাকে। ১৯৩৮ সালের আন্তর্জাতিক হিসাব-অনুযায়ী ক্ষুদ্র দেশ সুইজারল্যাণ্ডেরও যে পরিমাণ সোনা মজুত ছিল, জার্মানী জাপান ও ইতালীর একত্র মজুত সোনা (gold reserve) তাহার অপেক্ষা অনেক কম। এই অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হিট্‌লার নূতন বাজার ও উপনিবেশ দাবি করিলেন। কিন্তু দাবি করিলেই তো আর 'কলোনী' পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার শৃংখলে জড়িত। হিট্‌লার এই ব্যবস্থা মানিবেন কেন? "একমাত্র বৃটেনের ভোগ-দখলের জন্য তো ঈশ্বর পৃথিবীর কলোনী সৃষ্টি করেন নাই।" ফলে ফ্যাসিবাদী দেশগুলি আওয়াজ তুলিল, 'Gunshot butter.'

যুদ্ধ কেন হয়?

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর মানচিত্র বদলাইয়া গেল। এই পরিবর্তনগুলি সুদূরপ্রসারী এবং নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড আঘাত। (১) সোবিয়েৎ রাষ্ট্র অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে বিশ্বসভায় আসন লাভ করিল। প্রধানত তাহার প্রত্যক্ষ আক্রমণে জার্মান ফ্যাসিবাদ বিধ্বস্ত হওয়ায় পৃথিবীর শান্তিকামী জনসাধারণের নিকট তাহার গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। (২) পূর্ব-য়ুরোপের অনেকগুলি রাষ্ট্র ধনতন্ত্র-বাদের এক্তিয়ার হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সহযোগী শক্তি হিসাবে উদ্ভূত হইল। (৩) যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মহাচীনের জনগণ কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও তাহাদের বশংবদ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলাফল

চিয়াংকে বিতাড়িত করিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। (৪) এশিয়ার অনেকগুলি দেশ ঔপনিবেশিকতার জোয়াল-মুক্ত হইল। ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ঐতিহ্যপূর্ণ দেশগুলি হইতে সাম্রাজ্যবাদীদের পশ্চাদপসরণ করিতে হইল। (৫) ইহাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া অন্যান্য বহু পরাধীন দেশে স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ-আকাংক্ষা ও আন্দোলন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলির ফলাফল এক্ষণে বিবৃত করা চলে: (ক) পৃথিবী সোজাসুজি দুই শিবিরে বিভক্ত হইল। একটি সোবিয়েৎ-নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের শিবির, যাহারা এই বিবদমান বিশ্বে স্থায়ী শান্তিরক্ষার প্রধানতম গ্যারাণ্টি। এই শিবিরের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। অপর পক্ষে যুদ্ধবাদীদের শিবিরের আয়তন তো সংকুচিত হইলই, তাহাদের শক্তিও বহুল পরিমাণে হ্রাস হইল। (খ) প্রধানত জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি একটি তৃতীয় শিবিরে পরিণত হইল। ভারত-ব্রহ্ম ইন্দোনেশীয় মিশরের নেতৃত্বে এই শিবিরের শক্তি ক্রমেই বাড়িতেছে। এই শিবির নিরপেক্ষতার পোষক হইলেও, ইহাদের কার্যপদ্ধতির মধ্যে কোথাও কোথাও সামান্য দ্বিধা থাকিলেও ইহারা মূলত শান্তিরই পরিপোষক। শান্তিরক্ষার আন্দোলনে ইহাদের স্থান ও দান সমাজবাদী শিবির অপেক্ষা কম বলিয়া মনে হয় না। (গ) এশিয়ার কাঁচামাল সংগ্রহের এবং পণ্যবিক্রয়ের বিরাট্ বাজার সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল। অপর দিকে পৃথিবীর অর্থনীতিতে এক নূতন অবস্থা পরিলক্ষিত হইল। এক অখণ্ড সর্বব্যাপী বিশ্ববাজার ভাঙিয়া পড়িয়া তাহার স্থলে দেখা দিল দুই সমান্তরাল বাজার। একটি শান্তি ও গণতন্ত্রের শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বাজার, আর একটি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দেশগুলির বাজার। ইহার ফলে নিরপেক্ষ বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির পক্ষে স্বাধীন নীতি গ্রহণ সম্ভবপর হইল, তাহাদের আর একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী বাজারের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হইল না।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দুর্বলতা
শান্তিকামী শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি

এই অবস্থায় পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনীতি আবার সংকটের কাছাকাছি গিয়া পড়িল। নবজাত মানচিত্রের বর্ণ-পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তাহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিল। তাই একদিকে যুদ্ধ-প্রস্তুতি চলিতে লাগিল। কিন্তু নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি স্বাধীনতা হারাইতে প্রস্তুত নয়। কৃষকমজুর যেখানে মুক্তিলাভ করিয়াছে সেখানে তাহারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন চায়, আবার দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চায় না। পরন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলির সাধারণ মানুষ, যুদ্ধে যাহাদের লাভ কিছুই হয় না, কেবলমাত্র কামানের খোরাকেই

দুই শিবির
দুই শ্রেণী
দুই নীতি

পরিণত হইতে হয়, তাহারাও শান্তির পক্ষপাতী। কাজেই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের প্রচেষ্টা বন্ধ করিবারও নানারূপ চেষ্টা চলিতে লাগিল।

যুদ্ধপ্রচেষ্টার মধ্যে প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখ করা যাক: (১) সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির বাজেটের দিকে লক্ষ্য করিলেই তাহাদের এই যুদ্ধপ্রস্তুতির বাস্তব নিদর্শন মিলিবে। এই রাষ্ট্রগুলির বাজেটের একটা বড় অংশই যুদ্ধবাবদ নির্দিষ্ট।

যুদ্ধ-প্রস্তুতি

(২) এই রাষ্ট্রগুলি বিশেষত আমেরিকা সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া তাহাদের যুদ্ধঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। (৩) এই রাষ্ট্রগুলি N. A. T. O., M. E. D. O., S. E. A. D. O., ANJUS প্রভৃতি নানারূপ যুদ্ধজোট গঠন করিয়াছে। (৪) আণবিক ও উদযান অস্ত্রের পরীক্ষা নিয়তই চলিতেছে। (৫) চীনকে ইউ. এন. ও. হইতে দূরে রাখিয়া ও অন্য নানাবিধ চেষ্টায় এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটিকে কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। (৬) সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নানা উপায়ে বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছে। (৭) নিরস্ত্রীকরণের দিকে ইহাদের তেমন আগ্রহ নাই। (৮) কোরিয়া ও ভিয়েৎনামকে কেন্দ্র করিয়া ইহারা বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির মতলবে ছিল। (৯) সুয়েজখাল প্রসংগেও একটি ঘোঁট পাকাইয়া উঠিতেছিল।

(১) অপর পক্ষে সোবিয়েৎ ও পূর্ব-যুরোপের দেশগুলি তাহাদের বাজেটে যুদ্ধের জন্য সামান্য অর্থই ব্যয় বরাদ্দ করিয়া থাকে। সম্প্রতি তাহারা সৈন্যসজ্জা বিপুলভাবে হ্রাস করিয়াছে। (২) লোকের মন হইতে সর্ববিধ সন্দেহ ও সংশয় দূর করিবার জন্য 'কমিনফর্ম' নামক সংস্থাটিকে সোবিয়েৎ ভাঙিয়া দিয়াছে। অবশ্য ইহা একটি আদর্শগত সংস্থামাত্র ছিল, যুদ্ধজোট ছিল না।

শান্তি-আন্দোলন

(৩) বহুদিন হইতেই এই রাষ্ট্রগুলি সহ-অবস্থিতির নীতিতে দৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছে। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস না হইলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের আশংকা স্থায়ীভাবে দূরীভূত হইবে না, এ কথা তত্ত্বগত ভাবে সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলে শান্তির নামে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে। সোবিয়েৎ নেতাদের মতে, বিপ্লব রপ্তানী করা চলে না। কোন দেশ সমাজতন্ত্র গ্রহণ করিবে কিনা, ইহা সে দেশের জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাই সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র পাশাপাশি বাস করিতে থাকুক। অর্থনৈতিক ও আদর্শগত প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়া তাহারা আপন আপন পথের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করুক। জনসাধারণ তাহাদের পথ বাছিয়া লইবে। উভয় রাষ্ট্রব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতিই যুদ্ধবন্ধের প্রকৃষ্ট উপায়। (৪) চৌ-এন-লাই ও শ্রীনেহেরু পরিকল্পিত এবং বিশ্বের শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক সাদরে স্বীকৃ

সহ-অবস্থিতি

'পঞ্চশীল' শান্তিরক্ষার একটি প্রধান উপায় হিসাবে গৃহীত হইবার যোগ্য: (ক) এই নীতিগুলি হইল—সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব স্বীকার; (খ) অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা; (গ) অনাক্রমণ; (ঘ) পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা; (ঙ) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি। (৫) নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতের ভূমিকা বিশ্বশান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোরিয়ায় ও ইন্দোচীনে যুদ্ধ-বিরতির ব্যাপারে ভারতের নেতৃত্ব গভীর শ্রদ্ধার সংগে সব শান্তিকামী মানুষ স্বীকার করে। প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে আপোষ-আলোচনা চালাইবার ব্যাপারেও ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া বান্দুং সম্মেলন ভারত ও এশিয়া-আফ্রিকার নবজাগ্রত জাতিগুলির শান্তি-প্রচেষ্টার একটি বিরাট্ স্বাক্ষর। এই সম্মেলন হইতে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে এবং যুদ্ধজোটের নিন্দা করিয়া পঞ্চশীলের ভূমিকাকে জানানো হইয়াছে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি। (৬) ইহা ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবিগণের চেষ্টায় সংগঠিত বিশ্বশান্তি-আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর শান্তিরক্ষায় এই আন্দোলনের ভূমিকাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চশীল

বান্দুং-সম্মেলন

আজ ধ্বংস ও রক্তশোষণ কি স্থায়ী হইবে না মানুষের শুভবুদ্ধি জয়লাভ করিবে? যুদ্ধের তাণ্ডবে কি পৃথিবী লুপ্ত হইবে, না নূতন শস্যের শ্যামলিমায় সে হাসিয়া উঠিবে! মৈত্রীর বাণীকে শিরোধার্য করিয়া পঞ্চশীলের পতাকা হাতে লইয়া পৃথিবীর মানুষ আর একটি যুদ্ধের দানবীয় প্রচেষ্টাকে রোধ করিবেই, এ আশা কি অতি আশা বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে?

উপসংহার

নজরুল-প্রতিভা

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানী সম্রাট কাইজার যে আগুন জ্বালিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র য়ুরোপ জ্বলিয়া ছাই হইয়াছিল, আর সে অগ্নিকুণ্ড হইতে এক মহত্তর ও বিস্ময়কর স্বপ্ন বক্ষে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বিংশ শতকের ইতিহাসের প্রথম বিস্ময় রুশ-বিপ্লব। যে-আগুন দাবানলরূপে বন দগ্ধ করে, সেই আগুনই কাষ্ঠবাহী হইয়া গৃহে অবস্থান করে, শীত নাশ করে, অন্ন-ব্যঞ্জন তৈয়ারী করে। ধ্বংস ও সৃষ্টি একই অগ্নির ভিন্নমুখী ক্রিয়া। এই সত্যটি রুশ-বিপ্লবের মধ্যে ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া বিশ্বের যৌবন-চেতনাকে, ভাবকল্পনাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। পৃথিবীর যুবশক্তি যেন

রুশবিপ্লবের অগ্নিশিখায় বিশ্বের নূতন পরিচিতি

নিজের শক্তির উগ্র মন্থপান করিয়া সেদিন হুংকার দিয়া বলিয়াছিল—"ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।"

যুদ্ধফেরত বিংশতিবর্ষীয় তরুণ কাজী নজরুল এই যৌবনের জ্বলন্ত মশাল হাতে লইয়া বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাংলার সাহিত্যগগন তখনও অতিক্রান্ত-মধ্যাহ্ন রবির উজ্জ্বল দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হইয়াছিল, তাই তারার ক্ষীণ প্রভা লইয়া রবিচক্রের অন্তরালে ক্ষুদ্র কবিগোষ্ঠী তখন প্রায় দৃষ্টির অগোচরে পড়িয়াছিলেন। সেই সময় মশাল লইয়া নজরুল বাংলা-কাব্যমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন—হবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। ইহাতে আলোক বিস্তৃত না হইলেও ঘনীভূত হইল, উত্তাপ তীব্রতর হইল, দহন-দাহনের উগ্রতায় বাংলা সাহিত্যসমাজ যেন সচকিত হইয়া উঠিল। যৌবনের উদ্ধত স্পর্ধা আকাশচুম্বী হইয়া ঘোষণা করিল—

যৌবনের জ্বলন্ত মশাল হাতে নজরুলের বাংলা কাব্যে প্রবেশ

"বল বীর—
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির। —বিদ্রোহী।

'চির উন্নত মম শির'—কথাটি নজরুলের মুখ দিয়া বাহির হইলেও নজরুলের একার কথা নয়। ইহা চিরন্তন যৌবনের কথা, বিশেষ স্থানকালের প্রভাবে নূতন তীব্রতা লইয়া প্রকাশ হইয়াছিল এই মাত্র। 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করিয়া নজরুল যে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা পাইলেন, তাহার মধ্যেই যুগপ্রভাবটি চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার, বিশেষত বাংলার যুবশক্তির, সবপ্রধান পরিচয় ছিল বিদ্রোহী। আপাতদৃষ্টিতে ইহা ইংরাজ বিদ্রোহ বা রাজবিদ্রোহ হইলেও মূলত ইহার নাড়ীর যোগ ছিল বিশ্বমুক্তির, সর্ববন্ধনমুক্তির প্রয়াসের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে। এই কারণে, অন্যান্য কবির মত নজরুলের কবিপ্রতিভার যথার্থ বিচার করিতে গেলে, নজরুলের কবিমানস, তাঁহার চিত্তশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিশেষ বিকাশধারাটি অনুসন্ধানযোগ্য।

বিদ্রোহের সুরই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার মর্মবাণী

নজরুলের পিতা ছিলেন ধর্মপ্রাণ দরিদ্র লোক। পিতৃবিয়োগের পর কিশোর কবি ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন এবং অভিভাবক না থাকায় চরম উচ্ছৃংখলার মধ্যে বাল্য কৈশোর অতিবাহিত হয়। এই সময়ে লেটো গানের দলে গীতরচনা ও সুর সংযোজনা করার চেষ্টার মধ্যে নজরুলের কবিপ্রতিভার প্রথম বিকাশ দেখা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক জীবনে থাকিয়াও তিনি সাহিত্য চর্চা, মুখ্যত গদ্য রচনা করিয়াছেন। হিন্দু পুরাণ, ইস্‌লামী-

নজরুলের কবিমানস

পুরাণ, কোরান-হাদিস, গীতা-মহাভারত প্রচুর পড়িয়াছিলেন এবং সেই সংগে আরবী ফার্সি ও সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের চাবিটিও পাইয়াছিলেন। কাজেই যে কোন প্রাণময় আবেগকে ক্ষিপ্রভাবে উপযুক্ত শব্দের বন্ধনে শ্রুতিসুখকর করিয়া সৃষ্টি করিবার একটা বিস্ময়কর ক্ষমতা নজরুলের বাল্যজীবনের কাব্যচর্চার মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইহার প্রভাব অর্থাৎ দোষ এবং গুণ হইতে নজরুল সারা জীবনেও অব্যাহতি পান নাই।

এইজন্য নজরুল গভীর ভাববিশিষ্ট কবি হইতে পারেন নাই, হাল্‌কা ভাবের সাধারণ কবি হইয়াছেন। উত্তুংগ কোন বিশ্বাতিগ কাব্যমহিমা, অলৌকিক চমৎকারিত্ব নজরুল-কাব্যে যে একান্ত বিরল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিপিন পাল মহাশয়ের ভাষায় নজরুলের কাব্য "মাটির গন্ধে" ভরপুর। নজরুল মাটির কবি—মাটির সংগে যে-মানুষের প্রাণের যোগ যত বেশী, নজরুলের কাব্যে তাহার আঘ্রাণ ও পরিচয় তত সুস্পষ্ট। হাওয়ার মত ভাবের বিপুল ঔদার্য, আলোর মত বুদ্ধির উজ্জ্বল ঐশ্বর্য নজরুলের কাব্যে হয়ত কেহ কেহ অধিক পরিমাণে না পাইতে পারেন, কিন্তু মৃত্তিকার অফুরন্ত প্রাণসম্পদে নজরুলের কবিতা ও গান প্রকৃতই নিজ গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

নজরুল-কাব্যে মাটির সংগে মধুর

এই প্রাণপ্রাচুর্যই তো যৌবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য —তাই নজরুল যৌবনের কবি। ঐতিহাসিক কারণেই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা যৌবন-বিদ্রোহধর্মী, সর্ব শোষণ-শাসন-শৃংখল সবলে ভাঙিবার দুশ্চর সাধনায় ধৃতব্রত। নজরুলের মধ্যে ধূমকেতুর মত এই ভাঙিবার শক্তি এত আকস্মিকভাবে প্রকট হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্মিত স্নেহে তাঁহাকে অংগীকার করিয়া লইয়াছেন, যৌবনের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

যৌবনের কবি নজরুল

বাংলার বিদ্রোহাত্মক কাব্যরচনায় নজরুলের স্থান সর্বাগ্রে। স্বদেশী সাহিত্য রচনার মধ্যে যুগে যুগে আদর্শের পার্থক্যে ভাব ও রূপ বিচিত্র হইয়াছে; বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষ হইতে এই স্বাদেশিকতা ও স্বদেশপ্রেম বাংলার ভাবজগতে প্রত্যক্ষত বিদ্রোহধর্মী বলিয়া নজরুল এই কাব্যে ও কালে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা' প্রভৃতি কাব্যগুলির মধ্যে নজরুলের যে প্রকাশ, তাহা মুখ্যত বিপ্লবধর্মী, বিদ্রোহাত্মক। ইহার মধ্যে সকল কবিতাই যে রসোত্তীর্ণ বা প্রথম শ্রেণীর কবিতা তাহা নয়, পরন্তু তেমন কবিতার সংখ্যা নজরুলের এই জাতীয় রচনায় খুবই নগণ্য, কিন্তু তবুও অকপটতা, সারল্য ও প্রাণ-প্রাচুর্যে ইহা অনবদ্য, আস্বাদ্য ও অগ্নিস্রাবী হইয়া সেদিন রক্তে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছে।

নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতার গৌরব

"কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কর্‌রে লোপাট,
রক্তজমাট শিকলপূজার পাষাণবেদী।" —ভাঙার গান।

কিংবা— "শিকলপরা ছল মোদের এই শিকলপরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।" —শিকলপরা ছল।

কিংবা— "মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচ
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি।
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার মরে বাঁচি॥" —সব্যসাচী।

—এই জাতীয় কবিতা ও গান সেদিন তরুণ বাংলাকে পাগল করিয়া তুলিযাছিল, সভয়ে বৃটিশ সরকার তাঁহার কাব্যগুলিকে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন।

রুশিয়ার সাম্যবাদ ও নজরুলের সাম্যবাদের আদর্শের পার্থক্য

প্রারম্ভে আমরা রুশবিপ্লবের আগুনের কথা বলিয়াছি। কিন্তু নজরুলের সাম্যবাদ ও রাশিয়ার কম্যুনিজম একেবারেই এক বস্তু নয়। নজরুল ভারতীয় সংস্কৃতির মন লইয়া, সমস্ত প্রাণ দিয়া অসাম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইযাছিলেন, রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের মত ঈশ্বরের অস্বীকৃতি-দ্বারা তিনি বিশ্ববিধানকে জড়বাদের সাথে বিচার করেন নাই। সাম্য ও সমানাধিকারই জগতের নীতি—নজরুলের মতে, ইহাই ঈশ্বরের শাশ্বত বিধান।

"রবি শশী তারা প্রভাত সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে—
এই দিবা রাতি আকাশ বাতাস নহে একা কারো নহে।
এই ধরণীর যাহা সম্বল,—
বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,
সুস্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল, পাখীর কণ্ঠে গান,
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর 'ফারমান'।" —ফরিয়াদ।

'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল-প্রতিভার বীজ

সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে নজরুলের কবি-ধর্মের পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। 'বিদ্রোহী' কবিতার মুখ্য বাণী প্রচলিত অত্যাচারের অবসানকল্পে বিদ্রোহ ঘোষিত হইলেও তাহার মধ্যে যৌবনের অপর দিক— সৃষ্টি ও প্রেমের দিকের ইংগিতও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

"মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য।" —বিদ্রোহী।

অর্থাৎ কেবল ধ্বংসেরই নয়—সৃষ্টির স্বপ্নও কবি দেখেন। ধ্বংসের মধ্যে থাকে বিদ্বেষ ও ঘৃণা আর সৃষ্টির মধ্যে থাকে প্রীতি ও প্রেম। এই কারণেই নজরুলের প্রতিভা প্রেমকাব্যে সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

নজরুলের প্রেমের কবিতা আবেগপ্রবণ ও লিরিকধর্মী। কাব্যহিসাবে বিদ্রোহাত্মক কবিতা হইতে উহার স্থান উর্ধ্বে। গানের মধ্যেই নজরুলের প্রেমকাব্যের স্ফুরণ সুন্দরতর হইয়াছে। 'দোলনচাঁপা,' 'ছায়ানট,' 'সিন্ধুহিল্লোল,' 'চক্রবাক' প্রমুখ কবিতাগ্রন্থ, এবং 'বুলবুল,' 'চোখের চাতক' প্রমুখ সংগীতগ্রন্থের মধ্যে প্রেমকাব্যের চমৎকার প্রকাশ দেখা যায়। নজরুলের প্রেমের আদর্শের মধ্যে সহজিয়া ধর্মের বিশেষ প্রভাব আছে। প্রেম ও প্রেমের পাত্রকে এক মনে হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

নজরুলের প্রেমের কবিতার মূল সুর ও বৈশিষ্ট্য

"প্রেম সত্য, প্রেমপাত্র বহু—অগণন,
চাই—চাই, বুকে পাই; তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।
মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়
যে পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়।" —অনামিকা।

কিন্তু প্রেমিকাও কবির চক্ষে ছোট নয়। জীবনে প্রেমিকা আসেন বিজয়িনী-রূপে, এবং কবি বিদ্রোহের তরবারি চরণে রাখিয়া তাঁহাকে বরণ করেন :

"হে মোর রাণি, তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
আমার সমরজয়ী অমর তরবারি
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হ যে উঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে॥" —বিজয়িনী।

বাংলা গজল গান একদিক দিয়া বিচার করিলে নজরুলেরই সৃষ্টি এবং মহাকাব্যে মধুসূদনের মত বা টপ্পাগানে নিধুবাবুর মত স্রষ্টার হাতেই উহার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। বস্তুত নজরুল গীতিকার ও সুরকার হিসাবে কেবল অজস্রতা ও বৈচিত্র্যের জন্যই নয়—উত্তম কাব্যকলার জন্যও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। নজরুল সংগীত রচনা সুরসংযোজনার সহজাত প্রতিভা লইয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন। শিশুসাহিত্যেও নজরুল চমৎকার শক্তি দেখাইয়াছিলেন। 'ঝিঙে ফুল' কাব্যগ্রন্থে উহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এইরূপ :

বাংলা গজলে নজরুলের শ্রেষ্ঠত্ব
শিশুসাহিত্যে নজরুল
শ্লেষাত্মক কাব্যে নজরুল

"ভোর হোলো দোর খোলো খুকুমণি ওঠরে!
ঐ ডাকে যুঁই শাখে ফুল-খুকী ছোট রে।' —প্রভাতী।

কিংবা—

কাঠবেরালি! কাঠবেরালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি লেবু? লাউ?
বেরালবাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও?' —খুকী ও কাঠবেরালি।

এই সমস্ত কবিতা বাংলার শিশুসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ হইয়া আছে। ইহার সরসতা সরলতা ও কৌতুক অতুলনীয়।...শ্লেষাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা-রচনাতেও নজরুল সিদ্ধহস্ত। ইহার অধিকাংশই গান, হুল-ফোটার জ্বালাও বড়ো তীব্র!

"বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আস্‌নাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই॥" —প্যাক্ট্।

"উল্‌টে গেল বিধির বিধি আচার বিচার ধর্ম জাতি,
মেয়েরা সব লড়্‌ই করে, মদ্দ করেন চড়ুই ভাতি॥" —"দে গরুর গা ধুইয়ে"।

নজরুলের 'চন্দ্রবিন্দু' বইখানায় এই ধরণের বহু কবিতা সংকলিত হইয়াছে।

নজরুলের শব্দসম্পদ ও পুরাণ-জ্ঞান

নজরুল-প্রতিভা বিকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায় হইয়াছে কবির অফুরন্ত শব্দ-সম্পদের ভাণ্ডার। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ফারসী, আরবী, ইংরাজি প্রমুখ ভাষাগোষ্ঠী হইতে তিনি যথেচ্ছ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন। হিন্দু-পুরাণ ও মুসলমান-পুরাণ একত্র সমমর্যাদায় তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। শব্দ ও ভাবের এই অপরূপ মিশ্রণ নজরুল-কাব্যকে একটি চমৎকার বিশিষ্টতা দান করিয়াছে: যেমন,—

"দাউ দাউ জ্বলে আজি স্ফূর্তির জাহান্নাম,
শয়তান আজ ভেস্তে বিলায় শরাব জাম,
দুশ্‌মন দোস্ত্ একজামাত্
আজি আরফাত্—ময়দান পাতা গাঁয়ে গাঁয়ে,
কোলাকুলি করে বাদশা ফকিরে ভায়ে ভায়ে,
কা'বা ধরে নাচে "লাত্‌মানাত্॥" —ঈদ মোবারক।

অথবা

"আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুংকার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড" —বিদ্রোহী।

মানুষের কবি নজরুল

এক কথায় নজরুলের পরিচয় দিতে গেলে, তাঁহাকে বিদ্রোহী কবি বা প্রেমিক কবি না বলিয়া বলা উচিত মানুষের কবি। সুদৃঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাসের স্বাস্থ্যবান বায়ুমণ্ডলের মধ্যে, মাটির বুকে দাঁড়াইয়া, মানুষের গলা ধরিয়া কবি তাহার কাব্যতীর্থে পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এই মানুষ হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, তাহার একমাত্র পরিচয় সে মানুষ।

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।" —কাণ্ডারী হুসিয়ার!

অথবা

"গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!

নাই দেশ-কাল, পাত্রের ভেদ-অভেদ ধর্ম জাতি।
সবদেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি-" সাম্যবাদী।

সহজ-সরল, খোলা-চোখে মানুষের হৃদয় লইয়া মানুষের পক্ষে চড়া গলায় কথা কহিয়াছেন কাজী নজরুল ইসলাম—ইহাই তঁাহার কাব্যের চরম গৌরব। ভাষা, ধর্ম, আচার, আচরণ কোন-কিছুর বৈষম্যই কবির আন্তরসাম্যকে বিভক্ত বা দ্বিধাযুক্ত করিতে পারে নাই!

নজরুল-প্রতিভার শেষ পরিচিতি

নজরুল যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, অকপটে গভীর আবেগের উচ্ছলতায় তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এই উচ্ছলতা ফেনার মত ক্ষণিকর, বর্তমানের আলোকে অতি উজ্জ্বল হইলেও কোন স্থায়ী ভাবগাম্ভীর্যের রসোত্তীর্ণ কালজয়ী কাব্যকৌস্তুভের শাশ্বত জ্যোতি ইহার মধ্যে নাই। সমালোচকের প্রত্যাশার ব্যর্থতায় কবি নজরুল নিজেই যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। আত্মবিকাশের তথা আত্মসমালোচনার এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত বিরল না হইলেও অতিসুলভ নহে।

"বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে
রক্ত ঝরাতে পারিনাতো একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুঃখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।" —আমার কৈফিয়ৎ

নজরুল এই 'রক্ত লেখা'র কবি।......

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবন

প্রত্যেক দেশ বা জাতিরই একটি বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি আছে; এবং সেই সংস্কৃতির পাদপীঠে জাতীয় জীবনকে দাঁড় করিয়ে জগতের দরবারে তাদের বৈশিষ্ট্যকে দেখাতে চায়। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তাদের জীবনযাত্রার ছন্দ একটি বিশেষ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের মধ্যেই প্রত্যেক জাতির একটি গৌরবময় রূপ আছে, আর সেই রূপটি ফুটে ওঠে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে।

ভূমিকা

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়-সূত্রটিকে ধরতে গিয়ে আমাদের সর্বপ্রথম 'সংস্কৃতি' কথাটিকে বুঝে নিতে হবে। সংস্কৃতির মধ্যে একটি 'কৃতি' বা প্রাণময় বিকাশের জন্য সৃষ্টিমূলক দিক আছে,—আর আছে চিৎপ্রকর্ষের সুগভীর প্রকাশ-ব্যাকুলতা। বাইরের সৃষ্টিমূলক বিকাশের দিকটির সংগে তাল রেখে যদি চিত্তের বিকাশ সাধন না ঘটে, সত্যকারের সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। এই জন্যই সংস্কৃতির

মধ্যে একটি জাতির যেমন বহির্জীবনের কর্মসাধনার দিক আছে, তেমনি আছে মানস-সাধনার দিক। কর্মময় শক্তি ও জ্ঞানপিপাসু মনের যে পারস্পরিক সক্রিয়তা, তাই গড়ে তোলে একটি বিশেষ দেশের বা জাতির সংস্কৃতিকে। সংস্কৃতির মুকুরে ধরা পড়ে একটি জাতির মানসপ্রবণতা, তার অনুষ্ঠানময় সামাজিকতা, শিল্পসাহিত্যের কারুকৃতি, ধর্মের প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের সমুন্নতি। সংস্কৃতি তাই একটি জাতির প্রাণসত্তার কর্মময় ও চিন্ময় অভিব্যঞ্জনা। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তারেই বেজে ওঠে একটি জাতির মর্মধ্বনি।

'সংস্কৃতি' কথাটির অর্থ ও ব্যাখ্যা

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবন এ-গুলির প্রায় প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য নিয়েই গড়ে উঠেছে। তার যেমন বাইরের ঐতিহ্যগত সম্পদ আছে, তেমনি আছে মানস-সম্পদ। বহু প্রাচীনকাল থেকেই একটি গৌরবময় ইতিহাস পূর্ব-বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে জড়িয়ে রেখেছে। বহু জ্ঞানসাধকের তপস্যার সম্পদ দেশ-বিদেশের চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। যে-সংস্কৃতি বা সভ্যতা অন্য দেশের প্রাণকে আকর্ষণ করতে পারে, তাই হচ্ছে বরণীয় সংস্কৃতি। পূর্ব-পাকিস্তান সেইরূপ বিশেষ একটি সংস্কৃতির অধিকারী।

ঐতিহ্যগত সম্পদ ও মানস-সম্পদ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাবধারায় পরিপুষ্টি লাভ করে' বাঙালী সংস্কৃতি যখন নূতন একটি রূপ লাভ করল, তখন থেকেই পূর্ব-বংগ নবতম সংস্কৃতির স্বর্ণসৌধটিতে তার নিজের একটি সৃষ্টিরূপেরও মায়াকাজল বুলিয়ে দিয়েছিল। পাক্-ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে; বাঙালী সংস্কৃতি সেই আত্মপ্রকাশের পথে নূতন প্রাণসঞ্চার করবার জন্যই সচেষ্ট হয়েছে। পাক্-ভারতীয় সংস্কৃতি যখন ক্রম-বিকাশের পথটি ধরে' বহু সোপান অতিক্রম করে' অনেকটা এগিয়ে গেছে, তখন নূতন ঐতিহ্যের একটি রাজপথ সৃষ্টি করে' মুসলমান সংস্কৃতি এসে দেখা দিল। এই সংস্কৃতির যোগবন্ধনে বাঁধা পড়ে' বাঙালীর সাহিত্য ও শিল্পচেতনা জেগে উঠেছিল নূতন সৃষ্টির আনন্দে। পূর্ব-বংগ সেই সাংস্কৃতিক চেতনার মানস-ঐশ্বর্যকে গ্রহণ করে' তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপে, আধ্যাত্মিক মানসিকতার প্রকাশভংগীতে, গ্রাম্যসংগীতের বৈশিষ্ট্যে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার রীতি-নীতিতে একটি বিশেষ রূপায়ণে রূপায়িত করে' তুলেছিল। তাই পূর্ব-পাকিস্তানের যে সাংস্কৃতিক জীবন, তা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত মানস-চর্চার বহিঃপ্রকাশ।

বাঙালী সংস্কৃতির প্রাচীন পটভূমিকা

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে যেমন বৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি আছে, তেমনি আছে একটি মিষ্টিক মনোভাব। বৈচিত্র্য ফুটেছে বস্তুধর্মী সংস্কৃতিতে, আর মিষ্টিক মনোভাব

প্রকাশ লাভ করেছে আধ্যাত্মিকতার সংগীতে। পূর্ব-পাকিস্তানের যে-বাউল, মুর্শীদী, ভাটিয়ালী গান, তার মধ্যে রূপাতীতের সংগে মানস-সম্বন্ধ স্থাপন করবার কি যেন এমন এক রস-আবেদন আছে। বাউলের 'অন্তরে যে-বৈরাগী গায়'—তা যেন সমস্ত প্রাণমনকে উদাস করে' কোথায় কোন্ সুদূরের দেশের পানে টেনে নিয়ে যায়। নদীর তরংগে ছড়িয়ে পড়ে ভাটিয়ালী-গানের প্রাণ-ব্যাকুলতার সুর-ঝংকার। তা' ছাড়া জারিগান ও গাজীর গানের একটি বিশেষ রূপ আছে পূর্ব-পাকিস্তানে। কিছুদিন হলো কবিগানের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। আনন্দময় সংগীতের জগতে নূতন জাগরণের কল্লোলধ্বনি উঠেছে যেন। কবিগানের যে-সুরধারা একদিন পূর্ব-পাকিস্তানে শুষ্কপ্রায় হযে গিয়েছিল, তার পুনর্জাগরণে মনে হয় প্রাণময় চেতনার একটি দিক আবার যেন নূতন করে' সঞ্জীবনীমন্ত্র লাভ করেছে। কবিগানের একটি বিশেষ চর্চা পূর্ব-বাংলায় প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। কীর্তনগানের প্রচলন পূর্ব-পাকিস্তানে এক সময় খুবই ছিল, এখনও আছে। কৃষ্ণলীলাকে যাত্রার ছাঁচে ঢালাই করে' গান করবার রীতি বোধ হয় পূর্ব-পাকিস্তানের নিজস্ব। এ-গান আজ পর্যন্তও অনেকটা পূর্বের মতোই চলছে। বৈষ্ণব ও শক্তি আরাধনার দু'টি দিকই আজও পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুর জীবনকে ধর্মগত সাংস্কৃতিক চেতনার দিক দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে' তুলছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে বৈচিত্র্য ও মিষ্টিক মনোভাব

মানসিক ও কলাগত সংস্কৃতির দিক দিযেও পূর্ব-পাকিস্তান একটি স্মরণীয় দিক রক্ষা করে' চলেছে। 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববংগ-গীতিকা' তার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি মৃত্যুঞ্জয় স্বাক্ষর বহন করছে। অশিক্ষিত গ্রাম্যকবির কণ্ঠে পূর্ব-বংগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যেমন প্রশস্তি-গীতি দুই একটি গানের অল্প কথায় ফুটে উঠেছে, তেমনি ফুটে উঠেছে মানবমনের অতলান্ত প্রেমরহস্য। সেই ধারা আজ পর্যন্তও পূর্ব-পাকিস্তানে লুপ্ত হয় নি;—এখনও বহু গ্রাম্যকবি সংগীতের জগতে তাদের অন্তর্মুখী মন নিয়ে পল্লীর শ্যামল রূপের মৌন প্রশান্তির মধ্যে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করে। বংশীদাস, নারায়ণ-দেবের মনসামংগল, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ-গান, দ্বিজ কানাই, নয়ানচাঁদ ঘোষ, কবি মনসুরের কাহিনী-গীতি পূর্ব-পাকিস্তানের মানসগত সাংস্কৃতিক জীবনকে আজ পর্যন্তও মধুর করে রেখে দিয়েছে। বংশীদাস ও নারায়ণদেবের মনসামংগল নিয়ে একদিন পূর্ব-বাংলায় 'ভাসান-গানে'র আনন্দকল্লোল বয়ে গিয়েছিল। চেতনার তটদেশে সেই আনন্দস্মৃতি আজও নূতন ধ্বনি জাগিয়ে তুলে সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

মানসিক ও কলাগত সংস্কৃতি

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনগঠনের কার্যে বহুমূল্য উপাদানের যোগান দিয়েছে লোকসাহিত্যের অন্যান্য দিক। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থেকে বিভিন্ন

বিষয়ের ছড়াগুলি সারল্যভরা প্রকাশ-মাধুর্যে ও বিচিত্র উপলব্ধির সুর-ঝংকারে সকলের অনুভূতির তারে একই সংগে শিক্ষা ও আনন্দের গান বাজিয়ে যায়। সহজ অনুভূতির স্বত-উৎসারিত প্রকাশ বলেই লোকসাহিত্য জীবনকে প্রতিদিন শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ভরে' তোলে। পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসাহিত্য সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম প্রধান ধারক।

সাংস্কৃতিক জীবনে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য দিক

অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি আর একটি লক্ষণীয় দিক গড়ে তুলেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত একটি সংস্কৃতির রূপ পাওয়া যায় পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকটি অনুষ্ঠানে। এখানকার পল্লী-অঞ্চলে এখনও অনেক হিন্দু পীরের দরগায় সিরণি ও বাতি মানত্ করে যায়। নবান্নের উৎসবে, পৌষপার্বণের আনন্দরোলে, বিবাহের স্ত্রী-আচারে, ব্রতপার্বণের আলপনায় ও প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার অনেক কাজে সংস্কৃতিমূলক মানস-সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। চৈত্র-সংক্রান্তি চড়কপূজা উপলক্ষ্যে এখনও অনেক হিন্দু সঙ সেজে এসে নৃত্য গীত পরিবেশনে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই পরিতুষ্ট করে। চড়কপূজায় বহু মুসলমানেরও সমাগম হয়। মহরম উপলক্ষে মুসলমানগণ হিন্দু বাড়ীতে লাঠি খেলা দেখিয়ে আনন্দ দান করে। পূর্ব-পাকিস্তানের এই আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে আন্তরিক প্রীতি-মাধুর্যের পরিচয় মেলে।

অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি

সাংস্কৃতিক জীবনে আছে লোক-সংস্কৃতির আর একটি দিক। এই দিকটিও পূর্ব-পাকিস্তানের বিশেষ মূল্য দাবী করে। এই লোকসংস্কৃতির সংগে জড়িত রয়েছে কৃষিজীবীদের সংস্কৃতি। বহু রকমের গঠনকর্মে, চিত্রশিল্পের কারুকার্যে, পুতুল-রচনার পটুতায়, অলংকার-গড়ার চাতুর্যে একটি বাস্তব সাংস্কৃতিক জীবন পূর্ব-পাকিস্তানে অনেককাল আগে থেকেই আছে, এবং আজও তার বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণেই দেখা যায়। খড়ের চালের কুটির দারিদ্র্যের স্বাক্ষরচিহ্ন বহন করলেও কৃষক-জীবনের কারুকৃতিমূলক যে বৈশিষ্ট্যের দিক আছে, তারও পরিচয় বহন করে। পূর্ব-বাংলার বেত ও বাঁশের কাজ আবার যেন নূতন করে জেগে উঠেছে। গাজীর পট আঁকার এখন প্রচলন নেই বটে, কিন্তু পূজাপার্বণে শরায় ছবি আঁকার বিশেষ রীতিটির এখনও সমারোহ আছে। গ্রাম্যশিল্পের মধ্যে পোড়ামাটির পুতুল ও কাঠের পুতুল তাদের স্থানটিকে আজও বজায় রেখে চলেছে। ঢাকার শাঁখের কাজ, রূপার তারের কাজ, ময়মনসিংহের অন্তর্গত ইসলামপুরের কাঁসার বাসন, ঢাকার (ফুলতোলা কাপড়), টাঙাইলের তাঁতের শাড়ি, কুমিল্লার ময়নামতীর শাড়ি, রাজশাহীর মট্‌কা, কুমিল্লা ও নোয়াখালির শীতলপাটি প্রভৃতি আজ পর্যন্তও পূর্বপাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনকে অন্য দেশের কাছে লক্ষণীয়

লোক-সংস্কৃতির আর একটি দিক

করে রেখেছে। এখানে কাঁথা সেলাইয়ের একটি বিশেষ শিল্পসংস্কৃতি আছে, এবং তার মধুরতম প্রকাশরূপ দেখতে পাই পূর্ব-পাকিস্তানের স্বনামখ্যাত কবি জসীমউদ্দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্যটিতে। এই কাব্যের নায়িকা যখন তার কাঁথাটির উপরে নিজ জীবনের বেদনাকে রূপময় করে তুলেছে, তখন—'ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।' শুধু তাই নয়,—

'অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।'

প্রিয়বিচ্ছেদের হৃদয়-নিংড়ানো বেদনাময় ছবিটিকে একটি ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথার বুকে পূর্ব-পাকিস্তানের পল্লীরমণী বুঝি এমনি করেই ফুটিয়ে তুলে' সাংস্কৃতিক জীবনে একটি শিল্পসুন্দর অধ্যায়কে সকলের সামনে তুলে ধরেন। চিরুণী-শিল্পেরও এক ব্যাপকতা আজকাল এখানে দেখা যায়।

নৃত্যশিল্প

নৃত্যশিল্পে বুলবুল চৌধুরী যে-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর সহধর্মিণী ও অন্যান্য সুযোগ্য অনুসারিগণ সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার জন্যে যেমন আজকাল আগ্রহশীল হয়েছেন, তেমনি চেষ্টাও করেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উচ্চতর সংস্কৃতির প্রাংগণে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য একটি বিশেষ স্থান করে নেবে, সে আশা আমাদের আছে।

সংস্কৃতি-সৃষ্টিতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে উচ্চতর ভাবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয় ও বহুবিধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। পূর্ব-বাংলা সেই দিক দিয়ে ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিস্তারমূলক প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন রকম জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা ও গবেষণা চলছে। অনুসন্ধিৎসু বিদ্যার্থী-হৃদয়ের পিপাসা আজকাল চরিতার্থতার পথ করে' নিতে পারছে যেন। রাজশাহীতেও আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জ্ঞানতপস্যার আলোকময় পথে চলবার নির্দেশ লাভ করছে পূর্ব-পাকিস্তান। ঢাকায় একটি শিল্পবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদীন তাঁর শিক্ষাদান কাযের দক্ষতার দ্বারা একটি নূতনতম সংস্কৃতির দ্বার যেন মুক্ত করে দিচ্ছেন। যুগোপযোগী সিনেমা-শিল্প বিস্তারের জন্যও প্রবর্ধমান প্রচেষ্টার সাক্ষ্য মিলছে।

উপসংহার

পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকুকেই এর সামগ্রিক রূপ বলে ধরে নেওয়া চলবে না। সামাজিকতার পটভূমিতে দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাংক্ষা ও নূতন কিছু সৃষ্টি করার মানস-প্রবণতাকে জাগিয়ে রেখে জাতীয় সংস্কৃতিকে গড়ে' তুলতে হয়। নূতন স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তানের জনসমাজ একটি বিশেষ সংস্কৃতিকে গড়ে

তুলবার জন্য যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে, তা বেশ বোঝা যায়। বিশ্ববাসীর চোখে নব নব সংস্কৃতি সৃষ্টির দ্বারা পূর্ব-পাকিস্তান বরণীয় হ'য়ে উঠুক, এই সকলের কাম্য।*

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্যসাধনার ক্রমবিকাশ

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান বাংলাদেশে বিজেতা হিসাবে প্রবেশ করে এবং এই সময়ের কিছু পূর্বকাল হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষে এক নূতন সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। বাংলা দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতেই মুসলমান শাসকবর্গ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এদেশের প্রাণের সংগে গভীর যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইলে এদেশের ভাষা আয়ত্ত করা দরকার—এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই মুসলমান শাসককুল এদেশে আসিয়াই বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন, এবং তাঁহারা হিন্দুমুসলমান কবি ও সাহিত্যিকবর্গকে তাঁহাদের রাজসভায় স্থান দান করিয়া নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বাংলা ভাষা নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে পরিণতির পথে আগাইয়া চলিতে লাগিল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে একটানা-ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সব মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডীমংগল, কালিকামংগল, মনসামংগল, বৈষ্ণবজীবনী ও চরিত-সাহিত্য, বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য, ধর্মমংগল, শিবায়ণ বা শিবমংগল প্রভৃতি বিরচিত হইয়াছিল তাহাতে হিন্দু-মুসলমান কবি-সাহিত্যিক জাতিধর্মনির্বিশেষে রচনাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান লেখকবর্গের সাহিত্যে কাব্যে ধর্মই ছিল সাহিত্যিক প্রেরণার উৎস। সুতরাং মানবধর্ম বা মানবপ্রেম কাব্যপ্রেরণাকে কোনপ্রকারেই উদ্দীপ্ত করিতে পারে নাই—ভগবৎপ্রেমই ছিল কাব্য বা সাহিত্যের উপজীব্য। মানুষের স্বভাবধর্ম এবং প্রেম যে কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হইতে পারে, তাহা বৈষ্ণব পদকর্তাগণও ধরিতে পারেন নাই। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণও যুগের প্রভাব অতিক্রম করিয়া স্বকীয় মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কিন্তু ত্রয়োদশ—চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণের রচনা ও চিন্তাধারায় মৌলিকতার সন্ধান পাওয়া গেল। এই সময়ে যিনি সর্বপ্রথম মানুষের প্রেমকাহিনী—ইউসুফ-জোলেখার প্রেমের বিবরণকে—ভিত্তি করিয়া একখানি অনিন্দ্যসুন্দর কাব্য রচনা করিলেন, তিনি হইলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। সগীরের কাব্য বিখ্যাত পারস্য কবি

দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান কর্তৃক বংগবিজয় ও হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে বংগসাহিত্য সাধনার প্রকৃতি-পরিচয়

* অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত, এম. এ. মহাশয়ের সৌজন্যে।

ও দার্শনিক জামীর সুফীদর্শন ও ভাবের অনুসরণে রচিত। মূল আখ্যানভাগটি সগীর ধার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আখ্যায়িকার সুমধুর বর্ণনার ক্ষেত্রে সগীরের মৌলিকতা অসামান্য। গ্রন্থখানি বিরাট্ হইলেও ভাষার স্বচ্ছন্দগতি কোথাও ক্ষুন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। সমগ্র কাব্যের মধ্যে সগীর নরনারীর প্রেমের যে মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

দুইটি স্থান ছিল মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্য ও কাব্য আলোচনার কেন্দ্রস্থল। ইহার একটির নাম গৌড় এবং অপরটি আরাকান। বাংলাদেশে পাঠানেরা যখন শাসকরূপে গৌড়ের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন হইতেই তাঁহারা বাঙালীদের সহিত বসবাস করিতে ও অন্তরংগভাবে মেলামেশা করিতে লাগিলেন। তখন গৌড়ের ভাষা ছিল বাংলা। নূতন শাসকবর্গ হিন্দুদিগের পুরাণ ইতিহাস ও শাস্ত্রাদি আলোচনাচ্ছলে বাংলা ভাষা শুনিতে ভালবাসিতেন এবং প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থ যাহাতে বাংলায় অনুবাদিত হয়, সেজন্য উৎসাহিত করিতেন। গৌড়ের অধীনস্থ সুবাদার পরাগল খাঁ এবং তদীয় পুত্র ছুটি খাঁ ব্যাপকভাবে সাহিত্য-চর্চার আয়োজন করেন। গৌড়ের বিদ্যোৎসাহী সম্রাট্ হুসেন শাহ্ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রধানত তাঁহারই চেষ্টা-তদ্বিরের ফলে গৌড় দরবারের রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত শাস্ত্রচর্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন। এই সময়ে হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকগণ কাব্যচর্চায় অংশগ্রহণ করিলেও, তাঁহাদের সাধনা এবং অনুশীলনের মূলে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা সকলেই মুসলমান। গৌড়ের মুসলমান শাসকবর্গ মুক্তহস্তে ও অকপটে সাহায্য করিতেন বলিয়াই মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে আগাইয়া চলিল।

মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-গণের সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রস্থল দুইটি :—(১) গৌড়

শাহ মুহম্মদ সগীরের পর চট্টগ্রামবাসী কবি জয়েনুদ্দিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের কেহ কেহ কবি জয়েনুদ্দিনকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি বলিয়া অভিহিত করেন। কবি জয়েনুদ্দিন গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের (১৩৭৪—৮২ খ্রীষ্টাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর পবিত্র জীবনী অবলম্বনে "রসুল-বিজয়"। জয়েনুদ্দিনের পরে সৈয়দ সুলতান রচনা করেন 'নবীবংশ'। ইহা ছাড়াও তিনি 'সবে মেরাজ' ও 'ওফাতে রসুল' নামে আরও দুইখানি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার ভাষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রসাদগুণ-সম্পন্ন। রচনাভংগি কবি কৃত্তিবাস বা কাশীরাম অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।

গৌড়কেন্দ্রে মুসলিমের সাহিত্য-সাধনা—বংগসাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি কে ?

রচনার মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি সৈয়দ সুলতানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'নবীবংশে' তিনি বর্ণনা করিয়াছেন কয়েকজন নবীর জীবনকাহিনী। আলাওল ভিন্ন তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয় কবি আর কেহ ছিলেন না। কবি 'কাসাসুল আম্বিয়া'র মত অনেক পুঁথি রচনা করিয়া স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন। শা বিরিদ খাঁ ও শেখ চাঁন্দ 'রসুলবিজয়-কাব্য' প্রণয়ন করেন। শেখ চাঁন্দ ছিলেন অধ্যাত্মবাদী কবি ও তত্ত্বরসের রসিক। 'রসুলবিজয়' ছাড়াও তিনি 'শাহদৌল্লা পীরপুঁথি' রচনা করিয়াছিলেন। শা বিরিদ খাঁ বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-কাহিনী লইয়া 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য লেখেন। "মুহম্মদ হানিফা ও কায়রাপরী" নামক রোমান্টিক কাব্যও তাঁহার রচনা। মহম্মদ খানের রচিত 'মাকতুল হোসেন', 'সত্য কলি বিবাদ সংবাদ' ও 'কেয়ামত নামা' কাব্যত্রয়। 'মাকতুল হোসেন' কাব্যে কারবালার বিষাদময় কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 'সত্য কলি বিবাদ সংবাদ'-এ আছে যোগশাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক মারফতী আলোচনা। মহম্মদ খাঁকে অনুসরণ করেন ইয়াকুব আলি ও জনাব আলি প্রভৃতি কবিগণ। ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি আবদুল নবী রচনা করেন 'আমীর হামজা' কাব্য। 'আমীর হামজা'-র বিরাট কলেবর মহাভারতের সংগে তুলিত হইতে পারে। ভাষা স্বচ্ছ এবং সুন্দর। কাহিনী-বর্ণনা ও বিরাটত্বের দিক দিয়া ধরিলে আবদুল নবীর কাশীরাম দাসের সহিত তুলিত হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে যথেষ্ট। সৈয়দ মহাম্মদ আকবর 'জেবুন মুলক সামারোগ' কাব্য রচনা করেন। মানুষ ও পরীর কাহিনী বর্ণনার ভিতর দিয়া কবি উন্নত ধরণের কবি-প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছেন। কবি মহম্মদ রফিউদ্দীন, চুহর, কবি শেররাজ প্রভৃতির নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চুহরের 'আজরশাহ সোমনরোচ' গ্রন্থ, শেররাজের 'কাশিমের লড়াই' 'মল্লিকার সওয়াল' 'ফক্করনামা' ও 'সখিনার বিলাপ' প্রভৃতি কাব্য জাতীয় জীবনের রূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছিল।

উত্তর বংগের প্রথম মুসলমান-কবি রংপুর নিবাসী কবি হায়াৎ মামুদ। তিনি 'জংগনামা' 'মুসার সওয়াল' 'চিত্তউত্থান' 'হিতজ্ঞানবাণী' 'অম্বিয়াবাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাবে কবি গরীবুল্লা 'আমীর হামজা' (১ম খণ্ড), 'ইউসফ জোলেখা', 'জংগনামা' 'সোনাভান', 'সত্যপীরের পুঁথি' প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। গরীবুল্লার বাড়ী ছিল পশ্চিমবংগে। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী নিবাসী কবি সৈয়দ হামজা বিরাট গ্রন্থ 'আমীর হামজা' (২য় খণ্ড), 'হাতেম তাই', 'জৈগুনের পুঁথি', 'মধুমালতী' প্রভৃতি রচনা করিয়া স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় দান করেন। চট্টগ্রামের নসরুল্লা হজরত আলির বীরত্ব-কাহিনী লইয়া লিখিলেন 'জংগনামা' কাব্য। খলিল আহম্মদ 'ভানুমতীর লড়াই' কাব্য রচনা করেন অনেকটা নসরুল্লার অনুসরণে।

গৌড়কেন্দ্রে মুসলিমের সাহিত্য-সাধনায় ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিপত্তি

আবদুল হাফিজের বিরচিত 'নূরনামা' 'নূরফনদেব' 'নসিহৎনামা' 'লালমতি সায়ফুল-মূলক'। আল্লাবস্নলের কাহিনী গ্রথিত করিয়া কবি তাঁহার এই কাব্য কয়খানা লিখিলেন। মুহম্মদ জীবন 'কামরূপ-কুমার' 'বাহাম্র হুসেন বাহাবাম বোল' রচনা করেন। ইঁহাদের সকলের গ্রন্থের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা যায় নাই, কিন্তু গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বত্র ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই হিসাবেই এই কবিদিগের কাব্যের বিচার করিতে হইবে। বাউল বা কবিত্বের সম্পর্কে আলোক-পাত করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন কবি আলি রেজা ওরফে কানু ফকির। চট্টগ্রাম তাঁহার বাসভূমি। 'জ্ঞানসাগর', 'যোগকলন্দর', 'সাতচক্র দে', 'ধ্যানমালা' প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কবি ফয়জুল্লা সত্যপীরের কাহিনী লইয়া সর্বপ্রথম 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য প্রণয়ন করেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন আরিফ ও ওয়াজেদ আলি।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় হিন্দু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ভাবানুসারী অনেক মুসলমান কবি ও পদকর্তাও রহিয়াছেন। মুসলমান পদকর্তাদিগের মধ্যে যাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন শেখ কবির, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মুর্তজা, সালবেগ, আলীরাজা, ফৈজুল্লা, চাঁনকাজী, আকবর প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকজন কবি বিরহ-বেদনায় কাতর নায়িকার বার মাস যাপনের কাহিনী অবলম্বনে লিখিয়াছেন বারমাস্যা। বৈষ্ণব কাব্যের উপজীব্য পারমার্থিক প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করিয়া এই কবিকুল লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। যে প্রেমের মাহাত্ম্য পারস্যদেশীয় মরমী কবি হাফিজ ও ওমরের গজল-রুবাইয়াতে ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহাই যেন সুদূর বাংলা দেশের কবিগণের কণ্ঠে অনুরণিত হইয়া উঠিল, মুসলমান কবিগণও প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া পরমাত্মার সংগে মিলিত হইতে চাহিল। 'জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে'।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে মুসলিম কবিগণ

মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে মুসলমান কবিদিগের অবদান সর্বাপেক্ষা বেশী হইল রোমান্টিক কাহিনী-রচনার ক্ষেত্রে। এই ধারার কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবিগণ পারস্য কবিদিগের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন নানাভাবে। কাহিনী, ভাব ও পরিকল্পনার দিক দিয়া তাঁহারা পারস্য সাহিত্যকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন বেশী করিয়া। দৌলত উজির বাহারাম খাঁ 'লায়লা মজনু' কাব্য রচনা করেন। মুহম্মদ সগীর ও আবদুল হাকিমের পুস্তকগুলি রোম্যান্টিক কাব্য। কিন্তু রোম্যান্টিক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা আলোড়ন উঠে আরাকান রাজসভায় মুসলিম

(২) আরাকান-কেন্দ্রে মুসলিমের সাহিত্য-সাধনার স্বরূপপ্রকৃতি —রোমন্টিক কাহিনীর প্রাধান্য

কবিগণের রচনায়। পাঠান রাজগণ ও তাঁহাদের কর্মচারীদের অনুকরণে ও উৎসাহে আরাকান রাজসভা সপ্তদশ শতকে বাংলা সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এখানকার সব কবিই ছিলেন মুসলমান। শুধু আরাকানে নয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল। নিজের কাব্যগুলিতে তিনি স্বীয় জীবনের কথা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা একেবারে বৈচিত্র্যহীন নয়। তিনি 'পদ্মাবতী', লোরচন্দ্রানী', 'সৈফুলমুলুক বদিউজ্জমাল', 'হপ্তপয়কর', 'দারাসিকন্দর নামা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। আলাওলের কবিত্বশক্তি ছিল অসাধারণ। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের সংগে তাঁহার পরিচয় ছিল গভীর। সর্বোপরি কবির গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁহার আদি-রসাত্মক কাব্যগুলিকে একটি সংযতশ্রী প্রদান করিয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদ তিনি কোথাও করেন নাই। তৎকালে রূপবর্ণনা, বারমাস্যা বর্ণনা, বীররসাত্মক যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতির ভিতর দিয়া কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করিবার প্রথা ছিল। আলাওল স্বীয় কাব্যগুলিতে, বিশেষত 'পদ্মাবতী'-তে স্বীয় মৌলিকতার পরিচয় প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী' কবির এক অনুপম সৃষ্টি। সমগ্র কাব্যের মধ্যে কোথাও আন্তরিকতার অভাব নাই। কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন আলাওলের উৎসাহদাতা। ইনি আরাকানরাজসভার মন্ত্রী হইলেও কাব্যপ্রণয়নের ব্যাপারে কবি আলাওলকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। হয়ত তাঁহারই সাহায্যলাভে কবি আলাওল প্রতিভা বিকাশের ব্যাপারে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। আলাওল তাহার কাব্যে মাগন ঠাকুরের প্রশংসা করিয়াছেন। 'চন্দ্রাবতী' কাব্য-রচয়িতা মাগন ঠাকুর এবং রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুর এক ব্যক্তি কিনা, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের মূলকাহিনার সংগে সংযোজিত হইয়াছে তিনটি উপকাহিনা। উপকাহিনীগুলির পরস্পরের সংগে সংযোগ রহিয়াছে। কাহিনী হইয়াছে রসাল কিন্তু কবিত্বসুলভ নয়। কাব্যখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও কবিত্বশক্তি উচ্চগ্রামে বাঁধা হয় নাই। কবি মর্দান দৌলতকাজীর কিছু পরবর্তীকালের। কবি দৌলতকাজী ছিলেন আর একজন প্রতিভাশালী কবি। তাঁহার রচিত কাব্য 'সতীময়না' মধ্যযুগীয় হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নীতিগত আদর্শ ছিল, রুচি ছিল, কবিত্ব ছিল। ভাষা অতীব মনোজ্ঞ। সর্ব দিক দিয়া শালীনতাসম্পন্ন এমন একখানি চমৎকার কাব্য মধ্যযুগে বড় একটা দেখা যায় না। নারীর বিরহকালীন মনোভাব কবি বারমাস্যায় নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে নারীর যৌবনধর্মের কথাও রহিয়াছে। 'ময়নামতী'র ন্যায় শালীনতাসম্পন্ন, সুন্দর, মার্জিত ও অনুপম নারীচরিত্র বাংলাসাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। ভোগ ও কামনার প্রতীকরূপ কিছুই নাই দৌলত কাজীর 'সতীময়না কাব্যে'। 'লোরচন্দ্রাণী' তাঁহার আর একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য। কবি

সমসের আলি আরাকান রাজসভার অপর একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁহার রচিত 'রেজওয়ান শাহ' কাব্যখানি কবি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কাব্যের মূল কাহিনীটি পারস্য-সাহিত্যের অন্তর্গত। রোমান্টিক কাহিনী রচয়িতাদের মধ্যে কবি মার্দান রচিত 'নাসিরনামা', মুহম্মদ আকবর রচিত " 'জেবুলমুলুক' এবং মুহম্মদ রাজা রচিত "মিসরা জামাল" শ্রেষ্ঠ।

কতকগুলি পুঁথি এই সময়ে আরবী-পারশী-উর্দু সাহিত্য হইতে বাংলাভাষায় অনূদিত হইয়া রসিক-সমাজের কাছে সমাদর লাভ করিয়াছিল। অনুবাদ ছাড়া আর যাহা কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কবিত্বের নিকষে পরীক্ষা করিলে সেগুলিকে বিশেষ উচ্চস্থান দেওয়া যাইতে পারে না। এগুলির অধিকাংশের মধ্যেই কবিত্ব নাই; কিন্তু অনূদিত পুঁথিগুলি সম্পর্কে একথা খাটে না। 'আলেফ-লায়লা', 'কাছাছোল আম্বিয়া', 'আমীর হামজা' ও 'সবে মেরাজ' প্রভৃতি পুঁথিগুলি মুসলিম সাহিত্যের মুকুটমণি।

আরবী পার্শী উর্দু সাহিত্য হইতে অনূদিত পুঁথি-রচনায় মুসলিম কবিগণ

প্রধানত দুইটি কারণের জন্য পুঁথি-সাহিত্য মুসলমানদের কাছে আদর পাইয়াছে। প্রথমত, এগুলি বাংলার মুসলমানদের বোধগম্য সহজতম বাংলা ভাষায় রচিত। দ্বিতীয়ত, মুসলিম জাতির ধর্মকথা ও মুসলিম বীরগণের বীরত্বের কাহিনী ইহার প্রাণ। কবিত্বের দিক দিয়া মূল্য ইহার যাহাই হোক্, মুসলিম জনসাধারণের ধর্মজীবন গঠনের দিক দিয়া মূল্য অসামান্য। উত্তরবংগের পল্লীগীতি সাহিত্য মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্যসাধনার আর একটি স্বাক্ষর দান করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ প্রচেষ্টায় পূর্ব-বংগের ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলার পল্লীগীতি সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মোট ৫১টি গীতিকার মধ্যে ২৩টি গীতিকা সংগ্রহ করা হইয়াছে মুসলমান-দিগের বাড়ি হইতে। পল্লীকবির রচিত 'দেওয়ানা-মদিনার' কাহিনী মর্মস্পর্শী। কাহিনীটির ভিতর হাসিকান্না, হর্ষ-বিষাদ যেমন সুবিপুল পরিমাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সমগ্র কাহিনীটি মানুষের অন্তরপুরীর অনন্ত রহস্য-জাল দ্বারা বেষ্টিত। জগদ্বিখ্যাত মনীষী রোঁমা রোঁলা এই কাহিনীটির সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন : 'I was specially delighted with the touching story of Madina, which although only two centuries old, has an antique beauty and a purity of a sentiment which art has rendered faithfully without changing it"

মধ্যযুগে কবিগণ কাব্য রচনা করিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে গদ্যসাহিত্যের চর্চা করিতেন না তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। তদানীন্তন কালের প্রামাণ্য কোন গদ্য-

পুস্তক না পাওয়া গেলেও পারিবারিক চিঠিপত্র ও সরকারী দপ্তরে দাখিল করা দরখাস্ত দৃষ্টে মনে হয় যে, তখনও হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একপ্রকার বাংলা গদ্যের প্রচলন ছিল, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব লাভের পর শিক্ষিত হিন্দুগণ কলিকাতা ও হুগলী অঞ্চলে গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাহারই ফলে ভাগীরথী নদীর দুই তীর দিয়া একটি নূতন 'কালচার' বা সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিশনারীদিগের প্রচেষ্টার ফলে এবং সিভিলিয়ন-দিগকে বাংলা শিক্ষা দিবার প্রয়োজনে উইলিয়ম কেরীর তত্ত্বাবধানে বাংলা ভাষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন আরম্ভ হয়।

বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনায় মুসলিম সাহিত্যিকগণ

পাদ্রী কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতির সহায়তায় হিন্দু পণ্ডিতবর্গ সংস্কৃত-মিশানো বাংলা গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিয়া গদ্যগ্রন্থ প্রণয়নে যত্নবান্ হইলেন। নব-আবিষ্কৃত এই গদ্য ভাষায় মুসলমানগণ সহসা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, ফলে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তাঁহাদের লেখনী অচল হইয়া রহিল। সুদীর্ঘ ছয় সাত শত বৎসরকাল যে মুসলমান বাংলা তথা ভারতবর্ষ শাসন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে নানাদিক হইতে আক্রমণাত্মক আঘাত-সংঘাতে মুসলিম সমাজ জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, ফলে সমাজের ভিত্তিমূল অনেকখানি শিথিল হইয়া পড়িল। সমগ্র মুসলিম সমাজের যখন এমন একটি দুর্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তখন সমাজদেহে চেতনাসঞ্চারের নিমিত্ত যাঁহারা নিজেদিগের সমগ্র শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে মীর মশাররফ্ হোসেন (১৮৪৮--১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ), পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন মাসহাদী, মুন্সী রিয়াজ উদ্দীন, মুন্সী মেহেরুল্লা, শেখ আবদুর রহিম, ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকগণ সমধিক খ্যাত। ইঁহারা জাতীয় অধঃপতনের যুগে ধর্মীয় বোধে অনুপ্রাণিত হইয়া যেভাবে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। তাঁহারাই সে সময়ে জ্ঞানের দীপবর্তিকা হাতে করিয়া পথভ্রান্ত জাতিকে মুক্তিপথের সংকেত দিয়াছিলেন। মীর সাহেবের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। কি প্রবন্ধ, কি উপন্যাস, কি নাটক, কি জীবনচরিত, কি রসরচনা—যেদিক দিয়াই ধরা যাক্ না কেন, মীর সাহেবের তুলনা নাই। তিনি 'বিষাদ-সিন্ধু', 'রত্নাবতী', 'বসন্তকুমারী', 'জমিদার-দর্পণ' প্রভৃতি নাটক উপন্যাস রচনা করেন। 'বিষাদ-সিন্ধু' কারবালার এমাম হোসেনের (রাঃ) শাহাদৎ-প্রাপ্তির বিষাদময় ঘটনা লইয়া বিরচিত। ইহা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এখনও পর্যন্ত সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। পণ্ডিত রিয়াজ উদ্দীনের 'সমাজ-সংস্কারক' গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক জামালউদ্দীন আফগানীর জীবনকাহিনী লইয়া বিরচিত। এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী ভাবধারা তৎকালীন মুসলমান সমাজজীবনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইহা ছাড়া, 'সিরিয়া-বিজয়' এবং 'অগ্নিকুক্কুট' তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ। 'অগ্নিকুক্কুট' ব্যংগ পুস্তিকা। আবার তিনি "মিহির ও সুধাকর" নামে একখানি সংবাদপত্রও বাহির করিয়াছিলেন। মুন্সী মেহেরউল্লা ছিলেন শক্তিশালী লেখক। তিনি 'রদ্দে খৃষ্টানী বা খ্রীষ্টানী ধোঁকা ভঞ্জন', 'বিধবা-গঞ্জনা' প্রভৃতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় শতাধিক পুস্তক রচনা করিয়া দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শেখ আবদুর রহিম সাহেবের রচিত গ্রন্থ 'হজরত মোহাম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি'। সম্ভবত মুসলমান লিখিত ইহাই হজরতের জীবনীমূলক সর্বপ্রথম গ্রন্থ। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী রচিত 'অনলপ্রবাহ' তৎকালে তরুণ মুসলিমদিগের প্রাণে অনলশিখা জ্বালাইয়া তাহাদিগের প্রাণে চেতনা-সঞ্চার করিয়াছিল। Revivalist চিন্তাপদ্ধতি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার সব রচনায়। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিখ্যাত 'উচ্ছ্বাস, 'উদ্বোধন', 'নবউদ্দীপনা', 'প্রেমাঞ্জলি', 'স্পেনবিজয় কাব্য', 'রায়নন্দিনী', 'তারাবাঈ', 'ফিরোজাবেগম', 'নূরুদ্দিন', 'তুরস্কভ্রমণ', 'তুর্কীনারী জীবন', স্পেনীয় মুসলিম সভ্যতা' প্রভৃতি। কবির বিখ্যাত কাব্য 'মহাশিক্ষা' অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। কারবালার বিষাদময় কাহিনী 'মহাশিক্ষার' উপজীব্য বিষয়।

ইঁহাদের অব্যবহিত পরেই আর একদল সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটিল। ইঁহারা হইলেন—মওলানা আকরম খাঁ, শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মির্জা ইউসুফ আলি, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, সৈয়দ এমদাদ আলি, মোজাম্মেল হক, ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে মওলানা আকরম খাঁ 'মোহম্মদী', এবং চৌধুরী রওশন আলি 'আলইসলাম' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বাঙালী মুসলমান জাতির রসপিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মীর্জা ইউসুফ আলির 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' ইমাম গাজ্জালীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিমিয়ায়ে-সাদতে'র পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুবাদ। মীর্জা সাহেব ইসলামের সৌন্দর্য ও ধর্মীয় রীতি-নীতি বর্ণনার ক্ষেত্রে যে কুশলতা দেখাইয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। ফজলুল করিম সাহেবের 'পরিত্রাণ-কাব্য' সে যুগে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উদারপন্থী এক লেখক-সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিল এবং তাঁহাদিগের উদার ও স্বচ্ছ দৃষ্টভংগী সমাজের ভিত্তিপত্তনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এই সাহিত্যিককুলের সমবেত চেষ্টা ও সাধনার ফলে মরণোন্মুখ ও আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে জাগরণের একটা ব্যাপক সাড়া পড়িয়া যায়। জাতি পুনরায় নবপ্রাণ-চাঞ্চল্যে অধীর হইয়া উঠিল। ঢাকা ও কলিকাতার বাহিরেও এই নব্যসাহিত্যিক সম্প্রদায়ের নূতন 'স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগী সাহিত্যরসিকদের প্রাণে আবেদন জাগাইয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীর বংগ সাহিত্য-সাধনায় মুসলিম কবি-সাহিত্যিক

মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর) ও মোজাম্মেল হক বি. এ. (ভোলা) সাহেবদ্বয় কাব্য রচনার ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা দেখাইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের রচনাব মধ্যে কবিমনেব স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও কবিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। পণ্ডিত নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' 'মনোয়ারা' 'হাসান গংগাবাহমনি', কাজী আবদুল ওদুদের 'মীর পবিবার' ও 'নদীবক্ষে', হবিবর রহমানের 'আলমগীর', আবুল মনসুর আহম্মদের 'আয়না', 'ফুড্ কনফারেন্স' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হাবিল্দাব কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনা। তিনি 'বিদ্রোহী-কবি' নামে পরিচিত। কবি উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটক, মতবাদ, আচাবব্যবহার, বীতিনীতি সর্বত্র এই 'বিদ্রোহী' নামেব সারবত্তা প্রদর্শন কবিয়াছেন। মানবাত্মার আকুতি বেদনা ও বিচিত্র অনুভূতি নানাসুরে, নানাছন্দে, গদ্যে-পদ্যে, গানে-কবিতায়, কোমলে-কঠোবে কতভাবেই না লেখনীমুখে ধ্বনিত হইয়াছে। একদিকে 'অগ্নিবীণা' 'বিষেব বাঁশী' 'ভাঙাব গান' অগ্নিবৃষ্টি করিয়া মানুষেব ভিতরেব ক্লেদ অসাম্য ও কুসংস্কাবকে ভস্মীভূত কবিয়া দিয়াছে, অন্যদিকে 'দোলনচাঁপা' 'ব্যাথাব দান', 'বুলবুল', 'চোখের চাতক' গীতিধর্মী বসসর্বস্বতা দ্বারা মানুষেব প্রাণে স্নিগ্ধকোমল মোহ বিস্তার কবিয়া দিয়াছে। কাব্য ছাডাও নজরুল গল্প-উপন্যাস-নাটক সাহিত্যেব অন্যান্য বিভাগেও নিজেব লোকোত্তব প্রতিভাব স্বাক্ষর দান করিয়াছেন। প্রতি গ্রন্থেই নজরুলেব যে মুন্সিয়ানা প্রকাশ পাইযাছে তাহাই বাংলা-সাহিত্যে তাঁহাকে চিবঞ্জীব করিয়া রাখিবে। কাজী এমদাদুল হকেব 'আবদুল্লাহ্', ইব্রাহীম খানের 'কামালপাশা' 'আনোয়াবপাশা' 'সোনাব শিকল', ।কাযকোবাদেব 'মহাশ্মশান', 'শ্মশানভস্ম', 'অশ্রুমালা', 'শিবমন্দিব' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি মুসলমান সমাজেব সুখ-দুঃখ লইযা বচিত। কবি কাযকোবাদ সৌন্দর্যপাগল কবি। 'অশ্রুমালা' ও 'অমিয়ধারা' কাব্যের মধ্যে কবিত্বরস স্বাভাবিকভাবে উৎসাবিত হইয়াছে। 'মহাশ্মশান' কাব্য বচিত হইযাছে তৃতীয় পানিপথ-যুদ্ধেব কাহিনীকে ভিত্তি কবিয়া। মুসলমানদিগেব শৌর্য বীয ও গরিমাকে ফুটাইয়া তুলিবার বাসনায় তিনি এই বিবাট্ কাব্য-প্রণয়নে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কবি শাহাদৎ হোসেন ক্লাসিক কবি। তিনি কয়েকখানি কাব্য, নাটক রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি গ্রন্থেই কবির মৌলিকতার ছাপ স্পষ্ট। 'রূপচ্ছন্দা' বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। 'আনারকলি', 'মসনদের মোহ' নাটকগুলির মধ্যে শাহাদৎ হোসেনের গীতি-মানসের ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। মুসলমান লেখকবর্গের মধ্যে যাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের লুপ্ত গৌবব উদ্ধারকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রথিতযশা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকি, ডাঃ মুহম্মদ

এনামুল হক, ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন সাহিত্যালোচনা ও গবেষণার ভিতর দিয়া সেই সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানকে গড়িয়া তুলিবার আকাংক্ষায় ইঁহারা প্রচুর চেষ্টা করিযাছেন।

১৯৩৯-৪৫ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের সমাজজীবনে' আসিয়া লাগিল রূঢ় বাস্তবতার আঘাত। 'মানুষকে বাস্তবমুখীন করিতে হইবে' —এমনি একটি মতবাদ লেখক ও সাহিত্যিকগোষ্ঠির মধ্যে সংক্রামিত লইল। ফলে মুসলিম সমাজের সাহিত্যিকগণের চিন্তাধারায় আসিয়া লাগিল বাস্তবতার ঢেউ। বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ ঘটনা গণ-জাগরণ। সাধারণ নরনারীর সুখ দুঃখ-বেদনার কাহিনী ও ইতিবৃত্ত লইয়া সাহিত্য রচনা কবিবার তাগিদ বাঙালী মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হইল। দৃষ্টিভংগীর গভীরতায় ইঁহাদের সাহিত্য মর্মস্পর্শী। বিভাগপূর্ববর্তী কাল হইতেই যাঁহারা কাব্য ও সাহিত্যসাধনায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগের মধ্যে আবুল ফজলের 'রাঙা প্রভাত', 'চৌচির', মাহ্‌বুবুল আলমের 'মোমেনের জবানবন্দী', 'পল্টন জীবনের স্মৃতি', শওকত ওসমানের 'আমলার মামলা' আবুজাফর সামসুদ্দীনের 'পারত্যক্ত স্বামী' কাজী আফসার উদ্দীনের 'চরভাঙা চর' প্রভৃতি সমধিক খ্যাত। শওকত ওসমানের 'বাদার জোয়ান', 'পিঁজরা-পোল', 'সাবেক কাহিনী', 'জুনুআপা' ও 'বনি আদমের' মধ্যে লেখকের বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। জসীমুদ্দীন পল্লীকবি। তাঁহার কাব্য ও কবিতায় বাউল, গাথা ও পল্লীগীতিকার প্রভাব রহিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সৃষ্টিধর্মী কবি হিসাবে তিনি অতুলনীয়। তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন পথের পথিকৃৎ। 'নক্সীকাঁথার মাঠ', 'সোজনবাদিয়ার ঘাট', 'রাখালী', 'ধানক্ষেত', 'মাটির কান্না', 'বালুচর', 'হাসু' জসীমুদ্দীনের স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কবির কাব্য বাংলাদেশের নিরাবরণ ও নিরাভরণ মানুষের কথা ও কাহিনী-দ্বারা সমুজ্জ্বল। গোলাম মোস্তফা প্রাবন্ধিক ও কবি। 'মহানবী' তাঁহার একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। আশরাফ-উজ-জামানের 'মঞ্জিল' 'অরণ্যপথ', 'সাগর ও পর্বত' সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। শাহেদ আলির 'ফসল তোলার কাহিনী' 'একই সমতলে', সৈয়দ ওয়ালিউল্লার 'লাল সালু' ও 'নয়নতারা', আবুলকালাম সামসুদ্দীনের 'শাহেরবানু'তে বৈশিষ্ট্যের ছায়া পড়িয়াছে। অতি-আধুনিক কবি ও সাহিত্যিকগণের মধ্যে বেশী নাম করিয়াছেন কবি ফররুখ আহমদ ও আহ্‌সান হাবীব। আধুনিক কবিতা, হাস্যরসাত্মক কবিতা, গান, ব্যংগকবিতা, সনেট, সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে ফররুখের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার স্বাক্ষর মিলিবে। তিনি ধূলিম্লান পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য-সাধনায় মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ

আসিয়া ধূলির মানুষের কথা বড় মনোরম করিয়া বলিতে পারিয়াছেন। ফররুখের 'সাত সাগরের মাঝি' 'প্রেম-নারী-মানুষ' এবং আহ্সান হাবীবের 'রাত্রিশেষ' উল্লেখযোগ্য অবদান। আধুনিক প্রবন্ধকারদিগের মধ্যে সমধিক খ্যাত মোতাহের হোসেন চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলি আহ্সান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের নাম করা যাইতে পারে। পল্লীগ্রামের লুপ্ত প্রাচীন গাথা ও সংগীত উদ্ধার করিয়া মনসুরউদ্দীন ও জসীমুদ্দীন একটি কাজের মত কাজ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিভাগে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন এম আকবর আলি ও আবদুল জব্বার। বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস রচনা করিয়া যশ অর্জ্জন করিলেন আবদুল লতিফ চৌধুরী এবং নাজিরুল ইসলাম সুফীয়ান।

পাকিস্তানের পরিপূর্ণ রূপায়ণের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মানসালোকে আজ যে অভূতপূর্ব্ব উল্লাসধ্বনি শ্রুত হইতেছে, তাহার প্রতিফলন রহিয়াছে আমাদের প্রতিশ্রুতি-শীল তরুণ-কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের রচনায়। বিভাগোত্তর কালে প্রবীণ লেখকদিগের হাতে জাতীয় জীবনের যে বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়া আজিকার নূতন সাহিত্যিকবৃন্দগণ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। কি উপন্যাস, কি ছোটগল্প, কি প্রবন্ধ, কি সমালোচনা, কি রসরচনা, সর্ববিভাগে আজ বাঙালী তরুণ মুসলমান কবি-সাহিত্যিকবর্গ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে নূরুল মোমেন, আবু ইস্হাক, আসকার ইবনে শাইখ, আশরাফ সিদ্দিকী, মযহারুল ইসলাম, আবদুর রশিদ খান, সরদার জয়েন উদ্দীন, আলাউদ্দীন আলআজাদ, মুনীর চৌধুরী, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, তালিম্ হোসেন, ইব্রাহীম খলিল, চৌধুরী ওসমান, সামসুর রহমান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁহাদিগের রচনার মধ্যে নবযুগের সমাজচেতনা ও ব্যক্তিচেতনার আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন। আজ যাঁহারা সাহিত্যশিল্প লইয়া নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইতেছেন, সাধনার সর্বোচ্চ মিনারে চড়িবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের জয়যাত্রাপথের মঞ্জিল সার্বজনীন সার্বভৌম নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই গুরু দায়িত্ব যদি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে সমাজের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।*

বিভাগোত্তর কালে বাংলা-সাহিত্যের সেবায় পূর্ব পাকিস্তানী কবি-সাহিত্যিকগণ

আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের গতি-প্রকৃতি

যে-শিক্ষাব্যবস্থা প্রাত্যহিক জীবনের সংগে যোগসূত্রহীন পুরাতন 'অকেজো' কাঠামোর উপরে ভিত্তিলগ্ন, যে-শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রাণে কর্মপ্রেরণা সঞ্চারিত করে না, যে শিক্ষাব্যবস্থা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের

* অধ্যাপক জনাব গোলাম সাকলায়েন, এম. এ. মহাশয়ের সৌজন্যে।

সহজ বুদ্ধি ও বৃত্তিবিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি গড়িবাব সামর্থ্য রাখে না, সেই ঘুণে-ধরা শিক্ষাব্যবস্থাকে অনতিবিলম্বে পবিহার করিবার দিন আসিয়াছে। নিবক্ষবতা দূব করিতে পঞ্চাশ বছর লাগিযাছিল জাপানে, বিশ বছর লাগিয়াছিল রাশিয়ায়, পনেবো বছব লাগিয়াছিল 'ইউরোপেব চিরবোগী' নামে সুপরিচিত তুবস্কে। আর আমাদেব দেশে এখনও শতকবা নব্বই জন নিরক্ষব। শিক্ষাব ব্যবস্থা, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ও শিক্ষোত্তর কর্মজীবন—ইহাদের মাঝে কোন যোগসূত্রই নাই। এমনই হইয়াছে আমাদেব শিক্ষার প্রকৃতি।

ভূমিকা

পরাধীন অখণ্ড ভারতেব গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এক অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ভাবতেব সংস্কৃতি বিশ্বে এবং বিশ্বেব সংস্কৃতি ভাবতে প্রচাব করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বভাবতী প্রতিষ্ঠা করেন। নীরস একঘেয়ে পাঠ্যতালিকাকে আকর্ষণীয় কবিবাব জন্য উন্মুক্ত প্রান্তবে, সবুজপত্রশোভিত বৃক্ষেব ছায়ায়, তিনি শিক্ষা দিবাব ব্যবস্থা করেন। নিছক কেতাবী শিক্ষাব সংগে সংগীত, অংকন প্রভৃতি চারুশিল্প ও নানাবিধ কারুশিল্পের ব্যবস্থা হয়। ১৯২১ সালে শিক্ষাগুরু ববীন্দ্রনাথ দেশবাসীব হস্তে যে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয সমর্পণ কবেন, তাহাকে ভিত্তি কবিযাই বিশ্বভারতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বিশ্বভাবতী নিখিল বিশ্বে আদর্শ মহাবিদ্যালয রূপে আজ সুপরিচিত, ভারত সবকাব বিশ্বভারতীকে এক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালযেব মর্যাদা দান করিয়াছেন। বিশ্বভাবতীর প্রধান প্রধান বিভাগ হইতেছে—পাঠভবন (বিদ্যালয), শিক্ষাভবন (কলেজ), বিদ্যাভবন (গবেষণা), ববীন্দ্রভবন (মিউজিযাম ও রবীন্দ্রগবেষণা), চীনাভবন (চীন-ভাবতীয় গবেষণা), হিন্দীভবন (হিন্দী শিক্ষা ও গবেষণা), সংগীত-ভবন (সংগীত ও নৃত্য), কলাভবন (চারুশিল্প ও কারুশিল্প)। শান্তিনিকেতনে এই বিভাগগুলি আছে কিন্তু বিশ্বভারতীর পল্লী-উন্নযন বিভাগটি আছে শ্রীনিকেতনে।

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা

১৯৪৪ সালে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনেব উদ্দেশ্যে অখণ্ড ভাবতে প্রচলিত শিক্ষাব সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া স্যর জন সার্জেন্টের অধিনায়কত্বে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা-সংসদ যে পরিকল্পনাটি দাখিল করেন, তাহারই নাম সার্জেন্ট-পবিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় আছে জ্ঞানোন্মেষেব পর হইতেই শিক্ষা সুরু করিবার কথা। দেড বছর হইতে চার বছর বয়স অবধি সময়টি শিশুর ভাবজীবনেব সর্বাপেক্ষা সংকটময় সময়। এই সময়ে যে নৈতিক মানসিক ও শারীরিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য শিশুজীবনে সংক্রামিত হয়, তাহাই পরিণামে স্থায়ী ফল প্রসব করে। তাই তিন হইতে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্য নার্সারি ও শিশুস্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছে। নার্সারি শিক্ষাকে

সার্জেন্ট-পরিকল্পনার মোটামুটি পরিচয়

অবৈতনিক করিবার কথা হইয়াছে, কিন্তু আবশ্যিক করা হয় নাই। অতঃপর ছয় হইতে এগারো বছর বয়স অবধি নানাবিধ হাতের কাজের মধ্য দিয়া নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার কথা হইয়াছে। অংগচালনার মধ্য দিয়া হাতের কাজের প্রতি একটা আগ্রহ গড়িয়া তোলা হইবে সত্য, কিন্তু শিক্ষার্থী শিশুকে কোন বিশেষ বৃত্তিনির্বাচন করিতে হইবে না। অবশ্য এই সময় হইতেই শিশু মস্তিষ্কচালনা করিতেও শিখিবে। নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা-শেষে যাহারা ধীশক্তিগুণহেতু হাই স্কুলে যাইবার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে, কেবলমাত্র তাহারাই যাইবে স্কুলে। হাই স্কুলের শিক্ষাকাল এগারো হইতে সতেরো বছর বয়স অবধি। ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধিবৃত্তি, রুচি ও প্রণবতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পৃথক্ পৃথক্ দুইটি শিক্ষাধারার প্রবর্তন করিবার কথা হইয়াছে। একটি শিক্ষাধারা যান্ত্রিক অর্থাৎ শিল্প-শিক্ষায়তনের মধ্য দিয়া চারুকলা ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগকে প্রকট করিয়া তুলিবে। আর অপর শিক্ষাধারা অযান্ত্রিক অর্থাৎ জ্ঞানসঞ্চারী শিক্ষায়তনের মধ্য দিয়া শুধু জ্ঞানই বাড়াইয়া চলিবে। নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার পর এগারো হইতে চৌদ্দ বছর বয়স অবধি উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার সময় আপনার মনের মত একটি বৃত্তি-নির্বাচন করার কথা। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরাজি বাদ পড়িয়াছে, উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষায় ক্ষেত্রবিশেষে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা ও ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মতৈক্য আছে। উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষায় কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় জীবিকানির্বাহের সমস্যার অনেকটা সমাধান ঘটিয়াছে। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় অযান্ত্রিক হাই স্কুলে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষা ও নাগরিক বিজ্ঞান এবং যান্ত্রিক হাই স্কুলে নানাবিধ শিল্প ও সওদাগরী শিক্ষার কথা রহিয়াছে। যান্ত্রিক হাই স্কুল ছাড়িবার পর সতেরো হইতে কুড়ি বছর বয়স অবধি কোন উচ্চ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের পর ডিপ্লোমা এবং কুড়ি হইতে বাইশ বছর অবধি আরও কোন উচ্চতর শিক্ষপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষান্তে উচ্চতর ডিপ্লোমা দিবার ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যাহারা সাধারণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইতে চাহিবে, তাহাদিগকে পড়িতে হইবে আরও তিন বছর। কিন্তু কলেজগুলির গুরুতর ক্ষতি হইবে বলিয়া এই ব্যবস্থাটি অনেকেরই মনের-মত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যাও সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় আলোচিত হইয়াছে।

গান্ধীজীর ওয়ার্ধা-প্রস্তাব বা নঈ তালিম আজ শিক্ষাবিদ্‌দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কেননা,—দেশের উন্নতিপক্ষে যে গণশিক্ষার প্রয়োজন, শিক্ষাপদ্ধতির সংগে ভবিষ্যৎ জীবনের যোগাযোগ থাকিলে দেশের যে একান্ত চাহিদার পূরণ হয়, তাহা মিলিয়াছে এই নঈ তালিমেই। অধিকন্তু সার্জেণ্ট-পরিকল্পনাও নঈ তালিমের মূল নীতি

মানিয়া লইয়াছে। অতঃপর এই শিক্ষা-পরিকল্পনার বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমত, ইংরাজির ন্যায় দুরূহ ভাষার মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া প্রতিপদে অক্ষমতা ও দৈন্য প্রকট হয়, প্রকাশশক্তিও যায় শুকাইয়া। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা না ঘটিলে ব্যক্তিত্ববিকাশ ঘটিতে পারে না, ইহাই গান্ধীজীর মত। তাহা ছাড়া, কোন স্বাধীন দেশেরই গণশিক্ষা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে হয় না। গান্ধীজীর ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাও স্বাধীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতিকে সমুন্নত করিবার জন্য গঠিত হয়। দ্বিতীয়ত, সত্যকার মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চাই স্বাস্থ্য, চাই সমাজ, চাই সাধারণ বিজ্ঞান। শিশুমনে স্বাস্থ্যরক্ষার বীজ বপন করিতে পারিলে, পরবর্তী জীবনে উহা অভ্যাসবশে প্রতিপালিত হয়। সমাজে বাস করিতে হইলে সমাজবোধটি সদাজাগ্রত থাকা দরকার। মানুষ যদি শৈশব হইতেই এই শিক্ষা পায় যে, প্রতিটি মানুষেরই আছে অধিকার ও দাবি, খেয়ালখুশীমতে চলিয়া অপরের ক্ষতি অথবা অসুবিধা সৃষ্টি করিবার অধিকার কাহারও নাই, তাহা হইলে পরবর্তী জীবনে শৃংখলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা একটা পরম আশীর্বাদ হইয়াই দেখা দেয়। এই জিনিসটাকেই ছোট কাজের মধ্য দিয়া শিশুমনে বদ্ধমূল করিবার ব্যবস্থা আছে নঈ তালিমে। ইতিহাসের তারিখ, ভূগোলের সংজ্ঞা ও নামবাহুল্য নীরস ও ভীতিদায়ক। তাই গল্প নাটক ও শিশুমনস্তত্ত্বের সাহায্যে এই দুইটি বিষয় শিক্ষা দিবার কথা বলা হইয়াছে। শিশুর পর্যবেক্ষণশক্তি বাড়াইবার জন্য বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপারটিও আছে। কেন না, পর্যবেক্ষণশক্তিই অনুসন্ধিৎসা ও চিন্তাশক্তিতে প্রাখর্য ঘটাইয়া মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতি বাড়াইয়া থাকে। সমাজবোধ ও সাধারণ বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া এই যে নাগরিক বৃত্তি ও সামাজিক দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ জাগাইয়া দিবার এই যে পরিকল্পনা, ইহা প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করিবার পক্ষে আমাদের দেশে এক অভিনব রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে। তৃতীয়ত, শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে বৃত্তি-শিক্ষা ছিল 'হরিজন শ্রেণীর', তাহাকে মহাত্মাজী ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় স্থান দিয়াছেন। গ্রামসেবাই ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার মূল নীতি। বৃত্তিশিক্ষার সংগে যদি দৈনন্দিন জীবনের যোগসূত্র না থাকে, তাহা হইলে সে শিক্ষা নীরস অন্তঃসারশূন্য। বৃত্তিশিক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই, গান্ধীজী নঈ তালিমে গ্রামকে প্রিয় আকাংক্ষিত বস্তু বলিয়া গ্রহণ করেন। সূতা কাটা, তাঁতের কাজ, কৃষিশিক্ষা, কাঠের কাজ, কার্ডবোর্ডের কাজ, ধাতুর কাজ—এই সব বৃত্তিশিক্ষার মাধ্যমে সুযোগ বুঝিয়া ভূগোল, ইতিহাস, উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। হাতের কাজের সংগে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ও প্রাত্যহিক জীবনের নিকট সম্পর্ক থাকায় পাঠ্য বিষয় ও বৃত্তি উভয়েই আকর্ষণীয় হয়। ইহাতে এক দিকে যেমন কর্মনৈপুণ্য ও পারদর্শিতা বাড়ে, অপর দিকে তেমনি কায়িক

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা বা নঈ তালিমের কথা

পরিশ্রমের মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থত, শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর ন্যায় নঈ তালিমেও চারুকলা অর্থাৎ সংগীত, অংকন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পঞ্চমত, অংক-কষা, বাগানের কাজ, ব্যায়াম ও দেহচালনা ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় স্বীকৃত হইয়াছে। মোটের উপর, ধর্ম ও গ্রামসেবা—এই দুইটি জিনিষই নঈ তালিমের বনিয়াদ।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব যে অপরিমেয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। শিক্ষার জাতীয় পরিকল্পনা সর্বজনীন হইতে বাধ্য। কেন না,—ইচ্ছামূলক শিক্ষাপদ্ধতি মানবিক শক্তি ও উপাদানের বিরাট্ অপচয় ঘটাইয়া থাকে। ইহা রোধ করিতে হইলে অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, জাতির ভবিষ্যৎ গণশিক্ষারই উপরে নির্ভর করে। শক্তি, প্রবণতা ও প্রয়োজন—এই তিনটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জনশিক্ষার ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। স্বাধীন ভারতের শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সর্বজনীনতার ভিত্তিতে শিক্ষা-প্রবর্তনের সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব—শেষ কথা

আজাদ-পরিকল্পনা সার্জেণ্ট-পরিকল্পনাকেই মোটামুটি ভাবে অনুসরণ করিয়াছে। ছয় হইতে বারো বৎসর বয়স অবধি ছেলেমেয়েদিগের আবশ্যিক ভাবে কেতাবী শিক্ষার সংগে কারিগরী শিক্ষাও লইতে হইবে। সহজ বুদ্ধিবৃত্তি, আসক্তি ও পারিবারিক বৃত্তিব্যবসায়ের প্রতি নজর রাখিয়াই ছেলেমেয়েদিগের বৃত্তিনির্বাচন করিবার কথা। তবে কথাটি হইতেছে এই যে, ভারতের ন্যায় বিরাট্ ভূখণ্ডে ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা ও সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা উভয়কে একই সংগে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রবর্তন করা সমীচীন। কেন না,—উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য-সাধনের প্রয়োজন আছে। পশ্চিম-বংগে নঈ তালিমকে বিশেষ কার্যকর করিয়া তোলা হয় নাই, অবশ্য অন্যান্য প্রদেশে এই পরিকল্পনাকে কিছুটা ফলপ্রসূ রূপ দেওয়া হইয়াছে। বেশ কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কারসাধনের জন্য স্বাধীন ভারত সরকার 'রাধাকৃষ্ণন্ কমিশন্' বসাইয়াছিলেন। কমিশনের বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পরে তৎসম্পর্কে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আজ অবধি কোন উল্লেখযোগ্য নীতি ও প্রীতি প্রকাশ করেন নাই। ১৯৫৩ সালের ২৮-এ আগষ্ট তারিখে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তথা মুদালিয়র কমিশনের বিবৃতিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই কমিশনের মতে, বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা একদেশদর্শী, শিক্ষানিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য অত্যধিক, ছাত্রদের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও ঔৎসুক্য পূরণের ব্যবস্থা নাই, কার্যকরী শিক্ষার বিশেষ সুযোগ নাই এবং শিল্প-বাণিজ্যের সহিত সহযোগিতা নাই। কমিশন কৃষি-বিদ্যালয়, বাণিজ্য-বিদ্যালয় ও কারিগরী বিদ্যালয়ের কথা বলিয়াছেন, পল্লী-বিদ্যালয় পুনর্গঠনের সুপারিশও করিয়াছেন। কিরূপে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া বর্তমান শিক্ষাকে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় রূপান্তরিত করা যাইতে পারে, কমিশন তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়াছেন।

১৯৫৭ সালের ২০-এ সেপ্টেম্বর তারিখে রাজ্য শিক্ষা-সচিবদের সম্মেলনে কেন্দ্রী শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন যে, বুনিয়াদী ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থ গঠন না করিলে জনবহুল ভারতের শিক্ষাসমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বর্তমানে সার ভারতে ১০৬০৫ উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এই বিদ্যালয়-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১২০০০এ দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ভারত সরকার এই পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যেই, ১২ শত বিদ্যালয়কে সর্বার্থসাধক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিতে চাহেন। দশম শ্রেণীর স্কুলে একাদশ শ্রেণী তক এই ধরণের বিদ্যালয়ে পড়িতে হইবে। উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : প্রথমত, সর্বার্থসাধক (Multipurpose School) এবং দ্বিতীয়ত, মানবত্তাসম্পন্ন (School of Humanities)। এই উভয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রথমটি কারিগরি শিক্ষার পক্ষে এবং দ্বিতীয়টি আর্টস্ শিক্ষার পক্ষে অনুকূল। অতঃপর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে একটি বৎসর বৃদ্ধি করিয়া, ইন্টারমিডিয়েট্ পাঠক্রম একেবারে তুলিয়া দিয়া তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে নাকি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন হইবে।

পাকিস্তানের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত। পশ্চিম পাঞ্জাব, পূর্ব-বাংলা, সিন্ধু ও সীমান্ত—এই চারিটি প্রদেশের নিজ নিজ শিক্ষামন্ত্রী আছে। বাওয়ালপুর, খয়েরপুর, সোয়াট, কালাত ও অপরাপর দেশীয় রাজ্যগুলিতে শিক্ষা বিভাগ বিদ্যমান। বালুচিস্থান ও উপজাতীয় এলাকা কেন্দ্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার অধীন।

পাকিস্তানের শিক্ষা-সংস্কারের গতি-প্রকৃতি

পাকিস্তানের রাজধানী করাচী শহরের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে চীফ্ কমিশনারের হস্তে রহিয়াছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, বিভিন্ন অঞ্চল কর্তৃক সম্পাদিত শিক্ষাকর্মের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা ও পুরাপুরি তদারক করা—ইহাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, উভয় সরকারই স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ্গণের নিকট হইতে উপদেশ নির্দেশাদি লইয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার জন্য 'মন্ত্রণা-পরিষদ' ও 'পরামর্শদায়ী পরিষদ' গঠন করিয়াছেন। 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরামর্শদায়ী বোর্ড', 'আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড' 'কাউন্সিল অব্ টেকনিক্যাল্ এডুকেশন'—এই প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক বিহিত বিধানেরই জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিবিধ অভাব অভিযোগের খবর লইয়া প্রতিটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সাহায্যের অনুমোদন করিবার জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন'ও নিযুক্ত হইয়াছে। আজাদী পাইবার অনতিকাল মধ্যেই পাকিস্তান 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' (UNO) ও তাহার 'শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংঘে'র (UNESCO) সদস্য হইয়াছে।

এই আন্তর্জাতিক 'শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংঘে'র সংগে সহযোগিতা করিবার জন্য পাকিস্তানে 'জাতীয় কমিশন'ও (National Commission) গঠিত হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানদ্বয় পাকিস্তানের শিক্ষাসংস্কারের ব্যাপারে অনেকখানি প্রভাব সংক্রামিত করিয়া থাকে। শিক্ষা ব্যাপারে সামগ্রিক উন্নতি করিবার মানসে পাকিস্তানে যে 'ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনা' গৃহীত হইয়াছে, তাহা এই দেশকে অদূরভবিষ্যতে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, বোধে-বুদ্ধিতে যে প্রকৃতই গরীয়ান্ মহীয়ান্ করিয়া তুলিবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক প্রবন্ধসাহিত্য

ভূমিকা

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রবন্ধসাহিত্য যে বংগ-বিভাগোত্তর যুগে বেশ খানিকটা উন্নতি করেছে, সাধারণভাবে একথা বলা চলে। দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই সাময়িক পত্রগুলিকে অবলম্বন করেই প্রবন্ধসাহিত্যের উদ্ভব এবং দ্রুতবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতালাভের পরে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবিগণের মনে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে নানা বিতর্কমূলক সমস্যা জন্ম নিয়েছে, এবং বিভিন্ন মতাদর্শের সংঘাতে প্রবন্ধসাহিত্য নানামুখী বিস্তৃতি পেয়েছে। সংক্ষেপে এ সমস্যাগুলির উল্লেখ করা চলে :—পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিচার, ইসলামী জীবনবোধ ও নূতন জগৎ, সাহিত্য সমালোচনার নানা প্রণালী, বাংলা ভাষার জন্ম ও বিকাশের সমস্যা প্রভৃতি।

ভাষা ও সাহিত্য গবেষণায় ডক্টর শহীদুল্লাহ্, নাজিরুল ইসলাম, আবদুল কাদির

প্রথমেই সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কীয় গবেষকদের চেষ্টার বিচার করা যেতে পারে। সম্প্রতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন ডক্টর শহীদুল্লাহ্। এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় সর্বজনস্বীকৃত মনীষা। তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাচাই করা সন্তোষজনক তথ্যের ভিত্তিতেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পুনর্গঠন অত্যাবশ্যক। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস রচনা করা অতীব দুরূহ কাজ। নানা কারণে প্রাপ্ত তথ্যাদি সব সময়ে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। বিশেষত চণ্ডীদাস-সমস্যা কৃত্তিবাসের জীবৎকাল, বিজয় গুপ্তের অস্তিত্ব এবং লোক-সাহিত্যের সমস্যা এমন কতকগুলি ব্যাসকূটের সৃষ্টি করেছে যার সম্যক সমাধান প্রায় দুরধিগম্য। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেবের গবেষণা এই সমস্যাগুলির উপরে অন্তত

কিছুটা আলোকপাত করেছে। নাজিরুল ইসলামের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ "বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস" পূর্ব-পাকিস্তানে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বংগভাষার ইতিহাস সম্পর্কে নূতন মতবাদ এ গ্রন্থে উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার বিবর্তনের ফলে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম, এ তথ্যে তিনি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও বাক্যবিন্যাস প্রণালীর উপর দ্রাবিড় ভাষা-সমূহের প্রভাব দেখিয়ে তিনি অন্যতর সিদ্ধান্তের দিকে যেতে চান। তাঁর এ মতবাদের মধ্যে হয়ত অনেক সত্য আছে, কিন্তু যথোপযুক্ত ও প্রচুর উদাহরণের সাহায্যে এর মূল প্রত্যয়গুলি এখনও প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষা করছে। বাংলা ভাষা ও শব্দবিজ্ঞান নিয়ে আবদুল হাই-এর গবেষণাত্মক রচনাবলীও উল্লেখযোগ্য। তিনি সমস্যাটিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীতে বিচারের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য আঞ্চলিক ভাষাগুলি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করলেই এ সম্পর্কে কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌছানো যেতে পারে, তার পূর্বে নয়। আবদুল কাদির বাংলা সাহিত্যের ছন্দপ্রকরণ এবং তার সংগে সংগীতের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি সমস্যাটিকে আন্তরিকতার সংগে বিচার করছেন, তবে ভারতীয় ও গ্রীক ক্লাসিকাল ছন্দরীতিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি কাব্যাদির সৌন্দর্য নিয়েও আলোচনা চলেছে। যদিও সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তান এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে আছে, তবু কিছু কিছু প্রাবন্ধিক আন্তরিকতার সংগে এই বিষয়ে ভাবছেন। সৈয়দ আলী আহ্সান ও মোতাহের হোসেন আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। উভয়েই সৌন্দর্য-তত্ত্বের একটি বিশুদ্ধ মাপকাঠির পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য সমালোচনার পক্ষপাতী। সৈয়দ আলী আহ্সান নজরুল ও ইকবালের সাহিত্যসৃষ্টির যে সমালোচনা করেছেন তাতে এলিয়ট ও আই. রিচার্ডের আলোচনা-পদ্ধতি বহুল পরিমাণে অনুসৃত হয়েছে। এঁরা উভয়েই প্রাচ্য বিচার-প্রণালীকে পরিহার করে পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার ধারাটি অনুসরণের পক্ষপাতী। কিন্তু জাতীয় ঐতিহ্যবোধ সম্পর্কে এদের মধ্যে স্পষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। সৈয়দ আলী আহ্সান ঐতিহ্য বলতে পাকিস্তানের ইতিহাস, ধর্ম ও জীবন-দর্শনের সমষ্টিকে বোঝাতে চান, অপর পক্ষে মোতাহের হোসেন বাংলা ভাষা ও বাঙালীর জীবনযাত্রা-প্রণালীকেই তার ঐতিহ্য হিসেবে উপস্থিত করতে চান। তরুণ লেখক আশ্‌রাফ সিদ্দিকী উনিশ-শতকের কবি ও নাট্যকারদের প্রতিভার মূল্যবিচারে ব্রতী হয়েছেন। মুসলিম সাহিত্যিকদের সমালোচনার ব্যাপারে তাঁকে একরূপ পথিকৃৎ বলা চলে। ভবিষ্যতে তাঁর বিচার আরও সূক্ষ্ম, আরও সার্থক হয়ে উঠবে, এ প্রতিশ্রুতি তাঁর রচনাবলী নিঃসন্দেহে বহন করে।

সৌন্দর্য-বিচারে সৈয়দ আলী আহ্সান, মোতাহের হোসেন, আশ্‌রাফ্ সিদ্দিকী

জীবনচরিত ও আত্মচরিত

স্বাধীনতার পরে পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকখানি জীবনচরিত রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে হজরত মোহম্মদের জীবনী সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। অবশ্য বিষয়বস্তুর গৌরবের কথা মনে রাখলে এই জাতীয় জীবনী-রচনায় সাফল্যলাভ একরূপ অসম্ভব বলা যেতে পারে। ইকবালের দুইখানি এবং নজরুলের একখানি জীবনচরিত এই জাতীয় গ্রন্থের অভাব কিছুটা মিটিয়েছে। এ ছাড়া 'আসহান্‌উল্লাহ্‌র' আত্মচরিত একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ।

ইসলাম ও বর্তমান জগতের অবতারণায় ওয়াজি উল্লা, আক্রাম খাঁ, গোলাম মুস্তফা

রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা এবং ইসলামের আদর্শ ও কমিউনিজম্ সম্বন্ধে কিছু কিছু রচনাও আলোচনার যোগ্য। ওয়াজি উল্লার 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম' পুস্তকখানির ঐতিহাসিকতা সন্দেহের অতীত নয়। আক্রাম খাঁর ইসলামিক গঠনতন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের সমন্বয়ের দিক থেকে মূল্যবান। গোলাম মুস্তফার গদ্যরচনাও এদিক থেকে উল্লেখের দাবি রাখে। সম্প্রতি তাঁর দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। একখানিতে তিনি জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যখানিতে 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর' আদর্শগুলির বিচার-প্রসংগে ঐশ্লামিক জীবন-বোধের সংগে তার কতটা সমন্বয় সম্ভব তারও আলোচনা করেছেন:

দর্শনশাস্ত্রে

দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পূর্ব-পাকিস্তানে বড় একটা রচিত হয়নি। যাঁরা এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁরা উপযুক্ত বাংলা পরিভাষার অভাবে ইংরেজি ভাষার আশ্রয়ই সাধারণত গ্রহণ করে থাকেন। তরুণ লেখক সৈয়দ সাহাদাৎ হোসেন সাধারণের উপযোগী করে কয়েকজন খ্যাতনামা পাশ্চাত্ত্য ভাববাদী দার্শনিকের চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

নানা-নিবন্ধ রচনায়

রচনারীতির সৌকর্য ও রসাবেদনের দিক থেকে মুকুল মোমেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ঢাকার সামাজিক জীবনের আলো' উচ্চাংগ হাস্যরসে পূর্ণ। জসীমউদ্দিনের ভ্রমণ-কাহিনী 'প্রথম চলো মুসাফির' এ বিষয়ে পথিকৃৎ। নানা ধরণের ঐতিহাসিক সামাজিক রচনার দিক থেকে আবুল কালাম সামসুদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবন্ধগুলি মতবাদের তীক্ষ্ণতায় ও স্পষ্টতায় সমুজ্জ্বল।

উপসংহার

সার্বিক বিচারে তাই ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের ভাষায় বলা যেতে পারে, 'সমালোচনা ও রসাত্মক প্রবন্ধসাহিত্যে পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যসাহিত্য পাওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিক ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাগুলো যতই তাৎপর্যমূলক হোক না কেন, বর্তমান অবস্থায় গদ্যসাহিত্য হিসেবে তাদের মূল্য খুব বেশী বলে গণ্য করা যায় না।"

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের জাতীয় সরকার গণদেবতার সর্বাংগীণ উন্নতি করিয়া সমগ্র জাতিকে বিশ্বসভায় যথোচিত স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহারই মধ্যে পড়ে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এহেন পরিকল্পনার আদর্শ পৃথিবীতে নূতন নয়। রাশিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতের নেতাগণও এই চিন্তাধারা হইতে পশ্চাতে ছিলেন না। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, তখন বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর সভাপতিত্বে একটি 'জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি' গঠিত হয়। নানা কারণে বিদেশী ব্রিটিশ সরকার এই সমিতির সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বোম্বাই প্ল্যান'-এর (Bombay Plan) উদ্ভব হয়, কিন্তু তাহাও ফলপ্রসূ হয় নাই। পরিশেষে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারত সরকার শ্রীনেহেরুর সভাপতিত্বে একটি 'পরিকল্পনা কমিশন' গঠন করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে উক্ত কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করেন এবং উহাই ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই ডিসেম্বর তারিখে চূড়ান্ত রূপ লাভ করিয়াছে। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল ছিল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল সুরু হইয়াছে। প্রতি পাঁচ বৎসর ব্যাপিয়া কার্যকাল স্থির করিয়া আর্থিক উন্নতির শিখরে উপনীত না হওয়া অবধি এইরূপই চলিতে থাকিবে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্মেতিহাস

দেশের ব্যাপক নিরক্ষরতা, ব্যাধি, অনাহার, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি দূরীকরণের মহান্ ব্রত লইয়া কল্যাণকামী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যে বিভিন্নমুখী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রধান সাতটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :—(১) কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন ; (২) সেচ ও জলবিদ্যুৎ ; (৩) পরিবহন ও যোগাযোগ ; (৪) বৃহদায়তন শিল্প ; (৫) শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ ; (৬) পুনর্বাসন ; (৭) বিবিধ। কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন শাখায় কৃষিনীতি পরিবর্তন, জমিদারী প্রথার লোপ, জমিবণ্টন, সার, বীজ সরবরাহ, সমবায়প্রথার প্রসার সাধন প্রভৃতি আছে। সেচ ও জলবিদ্যুৎ শাখায় আছে জলসেচ, বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন কুটির শিল্পোন্নয়ন, মৎস্যচাষ, বনীকরণ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, পতিত জমি উদ্ধার প্রভৃতি বহুবিধ কার্য। দামোদর, বোকরা, নাংগল, ময়ূর, হীরাকুন্দ প্রভৃতি পরিকল্পনাও ইহার অন্তর্গত। পরিবহন ও যোগাযোগ শাখায় আছে রেলওয়ে

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যক্রম

সম্প্রসারণ, রেল ইঞ্জিন নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, বন্দর নির্মান, বিমান কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ, বিমানপথ সম্প্রসারণ, ভারতের সর্বত্র কাঁচা ও পাকা রাস্তা নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাম ও ডাকব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার প্রভৃতি। বৃহদায়তন শিল্পশাখার আছে লৌহ, ইস্পাত, খনিজ তৈল, সিমেণ্ট, সার, ভারী রসায়নদ্রব্য, সুরাসার ও য়্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি। শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ শাখায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্য নূতন বিদ্যালয় ও নূতন হাসপাতাল স্থাপন প্রভৃতি। পুনর্বাসন শাখায় আছে উদ্বাস্তুদের বাসগৃহ, অন্নসংস্থান, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ব্যবস্থা। পল্লী উন্নয়ন বা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধানতম অংগ।

জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। ইহাতে বলা হইয়াছিল, "জনগণের জীবনধারণের মান উন্নয়ন এবং তাহাদিগকে উন্নততর ও বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান ভারতে পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই ভারতের জনবল ও সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগ এবং আয়, ধন ও সুযোগের অসাম্য হ্রাস করিবার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে।" অতএব, ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনবৃদ্ধি, জনগণের ক্রয়ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং সুসমঞ্জসীভূত বণ্টনব্যবস্থা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল নীতি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও মূল নীতি

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যখন গৃহীত হয়, তখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মত ভারতেও মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অত্যন্ত প্রকট ছিল। খাদ্যসমস্যাও ছিল ভয়াবহ। শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, শ্রমিক বিরোধ, কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধা, যন্ত্রপাতি আমদানীর অনিশ্চয়তা প্রভৃতিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে বর্তমানে দামোদর ও ময়ূরাক্ষী উপত্যকা, শতদ্রুর পরিকল্পনা, চিত্তরঞ্জন সিন্দ্রী প্রভৃতির রূপায়ণ, টাটা ইণ্ডিয়ান আয়রণ প্রভৃতির সম্প্রসারণ, বিশাখাপত্তমে নৌনির্মাণ শিল্পের ও হিন্দুস্থান বিমানকেন্দ্রের অগ্রগতি, বহির্বাণিজ্যের উন্নতি, বিনিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতা, শিল্পোৎপাদনের সমুন্নতি প্রভৃতি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য সূচিত করিতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের অর্থনীতিতে অনেকটা সবলতা ও স্থায়িত্ব আনিয়া দিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান

কিন্তু সরকার-পক্ষের আত্মপ্রসাদবাণী বহু বিঘোষিত হইলেও নানা কারণে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সামগ্রিক ও সর্বব্যাপক রূপ লইয়া সমগ্র দেশবাসীর নিকট উপস্থিত হইতে পারে নাই। বিদেশী শাসনে মৃত জাতির অচেতনতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিভিন্ন দলের স্বার্থচিন্তা ও দলাদলি, নিম্ন জীবনমান, অশিক্ষা প্রভৃতি নানা কারণে সার্থক সম্ভাবনার স্বপ্ন ব্যর্থ হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের নিরিখ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফলতা

অতিক্রান্ত হইলেও মূল সমস্যাসমূহ অব্যাহতই রহিয়াছে। বেকার-সমস্যা ও উচ্চমূল্য-স্তরের তারতম্য ঘটে নাই, পরন্তু বিপরীত আকারই পাইয়াছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি যথাযথভাবে কার্যকরী না করা এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে বাস্তব জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অভাবই এই ব্যর্থতা আনিয়াছে।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করেন। অবশ্য ইহার পূর্বে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে অধ্যাপক পি. সি. মহলানবীশের খসড়া পরিকল্পনাটি ও অর্থমন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের অপর একটি পরিকল্পনাপত্র রচিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্য হইতেছে নিম্নোক্ত রূপ: প্রথমত, দেশের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকল্পে জাতীয় আয়ের যথোচিত বৃদ্ধি; দ্বিতীয়ত, মূল ও ভারী শিল্পের ক্রমোন্নতির দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া দ্রুত শিল্পায়ন; তৃতীয়ত, কর্মে নিয়োগ সুবিধাদির বিপুল সম্প্রসারণ; চতুর্থত, আয় ও বৈভবের দিক দিয়া বৈষম্যাদির হ্রাসীকরণ ও অর্থনৈতিক শক্তির যথাযথ বণ্টন। এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সর্বতোভাবে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় সরকারাদি হইতে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্ভব ও লক্ষ্য

এক্ষণে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাদ্বয়ের বিভিন্ন খাতে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল, তাহার একটি তুলনামূলক চিত্র পরিস্ফুট করা যাক:

	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা		দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	
	মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	শতাংশ	মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	শতাংশ
১। কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন	৩৭২	১৬	৫৬৫	১২
২। সেচ ও বিদ্যুৎ	৬৬১	২৮	৮৯৮	১৮
৩। শ্রমশিল্প ও খনিজ সম্পদ	১৭৯	৭	৮৯১	১৯
৪। পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৫৬	২৪	১৩৮৪	২৯
৫। সমাজসেবা, গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন	৫৪৭	২৩	৯৪৬	২০
৬। বিবিধ	৪১	২	১১৬	২
মোট একুনে	২৩৫৬	১০০	৪৮০০	১০০

উল্লিখিত ছকটি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আপেক্ষিক ভাবে শ্রমশিল্প ও খনিজ সম্পদের চেয়ে কৃষি ও সমাজ-উন্নয়নের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিন্তু শ্রমশিল্প ও খনিজ সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগের উপরেই অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের প্রায় অধিকই ইহাতে লাগিবে। আবার বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় উন্নয়নকর্মকে যদি শ্রমশিল্প প্রসারের অংগীভূত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমগ্র ব্যয়েব শতকবা ৫৭ ভাগ এই শিল্পায়নের ব্যাপারেই লাগিবে। লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট, সারদ্রব্যাদি, ভারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি, খনিজতৈল, কয়লা, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল শ্রমশিল্পাদির উপরে সবিশেষ জোর দেওয়া হইবে। ভোগ্য বস্তুব উৎপাদন ব্যাপারে পল্লী এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপরেই অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করা হইবে। কারণ,—একই পরিমাণ অর্থবিনিয়োগ অনুরূপ কারখানা-শিল্পের চেয়ে এই জাতীয় শিল্পে প্রায় ১৫ হইতে ২০ গুণ বেশি নিয়োগ তথা চাকুরীর সম্ভাবনা রহিয়াছে। অধিকন্তু, এই শ্রমশিল্পাদির উন্নয়নে বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা পাইবে এবং জনগণেব মধ্যে আর্থিক দিক দিয়া দুর্বলতর শ্রেণীসমূহ অতিরিক্ত কাজ করিয়া আয় বাড়াইতে পারিবে।

উভয় পরিকল্পনার তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর মতে, সর্বাংগীণ ভাবে বিচার করিলে সমাজতান্ত্রিক রূপ সার্থক করিয়া তোলাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য। উচ্চতর আয়সম্পন্ন জনগণের নিকট হইতে অধিকতর স্বার্থত্যাগের দাবি উপস্থাপিত করিয়া ও নিম্নতর আয়সম্পন্ন দরিদ্র জনগণের জীবনে অধিকতর নিরাপত্তা ও সেবা প্রতিফলিত করিয়া একটি সমভোগাত্মক সমাজগঠনই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাব প্রধানতম লক্ষ্য। ইহাতে ভারতের সামগ্রিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু যেমন ভাবগত দিক দিয়া কমিউনিষ্ট ও কমিউনিষ্ট-বিরোধী বিপরীতমুখী মতবাদদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটি পথ খুঁজিয়া সামঞ্জস্য রক্ষায় সচেষ্টিত আছেন, তেমনি শহর ও পল্লীর মধ্যে, বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন কুটিরশিল্পের মধ্যে এবং সরকারী শিল্পোদ্যম ও বেসরকারী শিল্পোদ্যমের মধ্যে তিনি সংগতি রাখিয়া চলিবার পরিকল্পনা করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও গণতন্ত্রের মূলনীতি সংরক্ষণ করাই শ্রীনেহেরুর উদ্দেশ্য। আর পরিকল্পনার চরম লক্ষ্যও তো হইতেছে জাতির সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি ও আর্থিক দিক দিয়া আত্মনির্ভরতা লাভ। মোট কথা, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতেছে জাতীয় আয় বার্ষিক শতকরা পাঁচ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রী নেহেরু

টাকা বৃদ্ধি ও. ১ কোটি হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নূতন কর্মের সংস্থান। অতঃপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বেকার-সমস্যা অনেকখানি মিটিবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দোষগুণ সম্বন্ধে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। শ্রী এ. ডি. গরওয়ালা বলেন, "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি শুধু একটি খরচের তালিকা।" আবার কোন কোন সমালোচক বলেন—"পরিকল্পনা ডিগ্রীপ্রার্থী অর্থনীতির ছাত্রের পাঠ্য পুস্তক।"

উপসংহার

সনাতনপন্থী অর্থনীতিশাস্ত্রীদের মতে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি অতিমাত্রায় কমিউনিষ্টগন্ধী। কিন্তু কথাটি এই যে, ভাল জিনিষ যদি কমিউনিজ্‌মেব মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তাহাও গ্রহণ কবিতে হইবে। মোট কথা, কমিউনিষ্ট বা কমিউনিষ্ট-বিরোধী—ইহাই বড় কথা নয়। বড় কথা হইতেছে বিষয়টি উত্তম অথবা কল্যাণকব কিনা আব ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সংগে উহার সামঞ্জস্য আছে কিনা। গণতান্ত্রিক বিধানে জোব করিয়া যেমন কোনও কিছু জনগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া যায় না, তেমনি আধুনিক কালে প্ল্যানিং ছাড়াও চলিতে পারে না। যদি একটি অপরটির বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়, তবে অবশ্যই নবতর কোন কাঠামোর কথা ভাবিতে হইবে। কারণ,—৩৬ কোটি নরনাবীর উন্নতি সমৃদ্ধি ও কল্যাণকে আদৌ উপেক্ষা কবা চলে না। সে যাই হোক, ধ্বংসাত্মক ও শূন্যগর্ভ সমালোচনা ত্যাগ কবিয়া নবতর ভারত গঠন করিবার কার্যে সকলের ব্রতী হওয়া এবং সরকারী পরিকল্পনাকে সহযোগিতা করাই হইবে প্রকৃত দেশপ্রেমিকেব কার্য।

একখানি গদ্যকাব্য

[বিষাদ-সিন্ধু : মীর মোশাবফ হোসেন]

ইংরাজবিজয়ের পরে যখন আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি এদেশে বিস্তৃত হইতেছিল, এদেশীয় মুসলমান-সমাজ তাহাকে নানা কারণে খুব সহজভাবে গ্রহণ করিলেন না। কাজেই কি নূতন ইংরাজি শিক্ষা, কি নূতন সাহিত্যসৃষ্টি—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহারা আধুনিক যুগের নবতর বিকাশগুলির দিকে পিছন ফিরিয়া বহিলেন। 'দ্বিভাষী পুঁথি-সাহিত্যে'র মধ্যেই তাঁহাদের যাহা-কিছু সাহিত্য-রচনা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল। এই অবস্থা হইতে বাঙালী মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের যাঁহারা মুক্তির পথ দেখাইলেন, তাঁহাদের মধ্যে কায়কোবাদ ও মীর মোশারফ হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। কায়কোবাদ মধুসূদন-হেমচন্দ্রের পন্থায় কাব্য রচনা করিয়া নবজাগৃতির কাব্যকল্পনার সংগে বাঙালী মুসলমানদের নাম সংযুক্ত

ভূমিকা

করিলেন এবং মীর মোশারফ হোসেন বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের গদ্যসাহিত্যের সহিত নিজের ঐতিহাসিক এই গদ্যকাব্যটির নামও অমর করিয়া রাখিলেন।

লেখক-পরিচিতি

১৮৪৮ সালে নদীয়া জেলায় মীর মোশারফ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছুদিন কুষ্টিয়ার ইংরাজী-বাংলা স্কুল এবং পদমদীর 'নবাব-স্কুলে' পড়িতে লাগিলেন। পরে 'কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে' ভর্তি হইলেন। ইহার পরে কলিকাতায় এক পিতৃবন্ধুর গৃহে থাকিয়া তিনি পড়াশুনা করেন। চাকুরীজীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি বিভিন্ন জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার প্রভৃতির পদে নিযুক্ত ছিলেন। মীর মোশারফ হোসেন দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল বংগসাহিত্যের সেবা করেন, তিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ পঁচিশখানি পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 'গাজী মিয়ঁার বস্তানী', 'গো জীবন', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'মোসলেম বীরত্ব', 'হজরত বেলালের জীবনী', 'বিবি কুলসুম' এবং তাঁহার সুবৃহৎ 'আমার জীবনী'র নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে 'বিষাদ সিন্ধু'ই শ্রেষ্ঠতম। গ্রন্থটি মহাকালের বিচারে উত্তীর্ণ হইয়া একালের সাহিত্য-রসিকদেরও মন জয় করিয়াছে।

কাহিনী-পরিচয় ও ঐতিহাসিকতা

'বিষাদ-সিন্ধু' একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। ইহার কাহিনী-অংশ ঘটনার উত্থান-পতনে ও দ্রুতগতিতে এবং বিরাট্ ব্যাপকতায় পাঠকের ঔৎসুক্য ও কৌতূহল শেষ পর্যন্ত জাগরূক রাখে। গ্রন্থটি তিনটি সর্গে বিভক্ত: প্রথম সর্গ মহরম-পর্বে এজিদের লোভ ও কাম-লালসায় এবং ইসলাম-বিরোধী মনোবৃত্তির ফলে কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে হজরত মোহম্মদের দৌহিত্র হাসান বিষপানে এবং হোসেন কারবালা-প্রান্তরে একবিন্দু জলের অভাবে নিহত হইলেন, তাহার মর্মস্পর্শী বিবরণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় সর্গ উদ্ধার-পর্ব। এই পর্বে হানিফা, কাক্কা প্রমুখ মুসলমান বীরদের জীবনপণ সংগ্রামে কিরূপে এজিদের বন্দীশালা হইতে হাসান-হোসেনের পরিবারবর্গ মুক্তি পাইলেন, তাহার বীরত্বোল্লসিত বর্ণনা রহিয়াছে। তৃতীয় সর্গ এজিদ-বধপর্ব। এই পর্বে গ্রন্থকার হোসেনপুত্র জয়নালের সিংহাসন-প্রাপ্তি, এজিদের অতি-যন্ত্রণাময় পরিণাম, বীরত্বের মোহে আচ্ছন্ন হানিফার পরিণাম বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "হিজরীর ৬১ সালের ৮ই মহর্‌রম তারিখে মদিনাধিপতি হজরত ইমাম হোসেন ঘটনাক্রমে সপরিবারে কারবালা-ভূমিতে উপস্থিত হন এবং এজিদ-প্রেরিত সৈন্যহস্তে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। সেই শোচনীয় ঘটনা মহর্‌রম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘটনার মূল কি এবং কি কারণে সেই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত

হইল।" কাহিনীর মূল ভিত্তি যে ঐতিহাসিক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণের সর্বাংশ ঐতিহাসিক সত্যতামণ্ডিত কিনা এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে প্রশ্ন উঠিয়াছে। ডক্টর আব্দুল গফুর সিদ্দিকী বহু গবেষণার পরে 'বিষাদ-সিন্ধু'র যে পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রশ্নের উত্তরদানের চেষ্টা আছে এবং সমগ্র গ্রন্থটির ঐতিহাসিক ভিত্তিটিকে পাকা করিবার উপযোগী সংশোধনী রহিয়াছে। 'জংনাম' 'মোক্তাল হোসেন' শ্রেণীর সত্যমিথ্যায় রঞ্জিত গ্রন্থাবলীকে ভিত্তি করাতেই বোধ হয় এইরূপ ত্রুটি আলোচ্য গ্রন্থটিতে দেখা গিয়াছে। এই জাতীয় কিছু কিছু ত্রুটির অভিযোগ সত্য বলিয়া গৃহীত হইলেও গ্রন্থটির সামাজিক ও সাহিত্যিক মূল্য আদৌ কমিবে না।

বাংলা ১২৯১ সাল হইতে ১২৯৭ সালের মধ্যে 'বিষাদ-সিন্ধু'র বিভিন্ন অংশ রচিত হয়। বাংলা গদ্যসাহিত্যে তখন বঙ্কিমের একাধিপত্য। কাজেই ভাষায় সংস্কৃত-প্রাধান্য এবং কথ্য-ভাষার সমন্বয়ের স্রোত প্রবাহিত। মীর মোশারফ হোসেনের গ্রন্থটিতেও বঙ্কিমী ভাষার প্রভাব রহিয়াছে। তবে সংস্কৃতের দিকে ঝোঁকটি কম থাকায় ভাষা যে খুবই সহজবোধ্য হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মাঝে মাঝে কিছু আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে, তবে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুপ্রযুক্ত। তাই ইহার ফলে কাহিনী যে দেশীয় পরিবেশে ঘটিয়াছিল, তাহার একটি ভাষাগত ব্যঞ্জনাও মাঝে মাঝে বিস্তৃত হইয়াছে। উনিশ শতকের সপ্তম অষ্টম দশক পর্যন্ত বাংলা দেশে আরব পারস্য সম্পর্কিত ইতিহাসের এমন সমৃদ্ধ গবেষণা হয় নাই যাহাতে ঐতিহাসিক কিছু কিছু ত্রুটি দেখাইয়া মীর সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারি।

রচনাকাল ও ভাষা

বাঙালী মুসলমান-সমাজ অন্যান্য মুসলমানদের মত মহরমের ঘটনাটিকে তাহাদেব ধর্মজীবনের একটি কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পটভূমিকায় যে করুণ কাহিনীটি বিদ্যমান, আলোচ্য গ্রন্থটি তাহা সহজ সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছে। উপরন্তু এই সব কাহিনীর মাধ্যমে কি বিপুল বিরোধ ও বাধার মধ্য দিয়া ইসলামধর্মের প্রথম যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার রক্তস্নাত ও বিশ্বাসোজ্জ্বল একটি চিত্রও সমগ্র মুসলমান-সমাজের গর্বের বস্তু হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও ইহার তাৎপর্যটি সহজে উপলব্ধি করিবেন। যে কোন সত্যধর্ম ও বিশ্বাসকেই অবিশ্বাস ও অজ্ঞানের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া অশেষ ত্যাগের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। যে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের কাছেই মহরমের এই শিক্ষা।

ধর্মকাহিনী ও সাংস্কৃতিক মূল্য

কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিভংগীর কথা ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র সাহিত্য হিসাবেই আলোচ্য গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। গ্রন্থটির মধ্যে মহাকাব্যসুলভ এক বিরাট্ ব্যাপ্তি ও

পর্বতকল্প সমুন্নতি রহিয়াছে। চরিত্রসৃষ্টিতে কিংবা কাহিনীর ক্ষেত্রে লেখক নূতনতর কোন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেন নাই। কারণ, সে সুযোগ তাঁহার ছিল না। বর্ণনার মধ্যে বিশেষ কৌশল, চেষ্টাকৃত সৌন্দর্য আরোপের কোন চিহ্নই গ্রন্থটির মধ্যে নাই। কিন্তু তবুও সহজ সবল বর্ণনার মধ্য দিয়াই জীবন-মৃত্যু আশা-আনন্দ বিশ্বাস-বীরত্বের যে মূর্তি তিনি আঁকিয়াছেন, তাহা আপন প্রাণবত্তাতেই ভাস্বর। মসহাব কাক্কা ও ওমর আলীর বীরত্ব, হোসেনের দার্শনিক জীবনপ্রতীতি ও মানববৃত্তির দ্বন্দ্ব, হাসানের অপরিসীম ধৈর্য, সাখিনার আত্মদান, এজিদের হিংস্র ক্রোধ, সীমারের পৈশাচিকতা, সিংহশিশু জয়নালের ক্রুদ্ধ গর্জন আর পর্বতবেষ্টিত হানিফার প্রচণ্ড ক্ষমতার আত্মধ্বংসী রূপ জীবন সম্পর্কে এক নূতন চেতনায় আমাদের চিত্তকে সমুন্নীত করে। ফোরাত নদীর কূল এজিদ-সৈন্যেরা আটকাইয়া রাখে, জলের পিপাসা শত্রুর তীরের মুখে চিরতরে মিটিয়া যায়, পুত্র পিতার জিহ্বা লেহন করিয়া শক্তি অর্জনের চেষ্টা করে আর এমাম হোসেন অঞ্জলিপূর্ণ জল মুখের কাছে ধরিয়াও স্পর্শ করিতে পারেন না—এই তো জীবন! দূর হইতে অগ্নিদাহের প্রচণ্ড জ্বালায় এজিদের চীৎকার ভাসিয়া আসে, হানিফার দুল্‌দুল্‌ প্রাচীরের চারপাশে পদচারণা করে, কারবালার বালুরাশি তৃষ্ণায় মুখর হইয়া ওঠে। আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিয়া একটি রবই ওঠে—'হায় হাসান! হায় হোসেন!' এই বেদনা, এই জীবনবোধ, এই চরিত্রগৌরব যে কোন সাহিত্যরসিকেরই দৃষ্টি এই অমর গ্রন্থের দিকে অবশ্যই আকর্ষণ করিবে।

সাহিত্য-মূল্য

পরিশিষ্ট

বাংলা বানান-রহস্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(১) ই, ঈ	
অঞ্জলী	অঞ্জলি
আত্মম্ভরী	আত্মম্ভরি
কালিপদ	কালীপদ
কৃতি (বিণ)	কৃতী
কৌলিন্য	কৌলীন্য
গণ্ডী	গণ্ডি
গৃহিত	গৃহীত
গোধুলী	গোধূলি
জটীল	জটিল
জীবি	জীবী
দায়ীত্ব	দায়িত্ব
দাশরথী	দাশরথি
দিঘী	দীঘি
ধন্বন্তরী	ধন্বন্তরি
নিরোগ	নীরোগ
নিরক্ত	নীরক্ত
নিরন্ধ্র	নীরন্ধ্র
পরিক্ষা	পরীক্ষা
পিরীতি	পীরিতি
পীপিলিকা	পিপীলিকা
প্রতিক্ষা	প্রতীক্ষা
বাল্মিকী	বাল্মীকি
বাসুকী	বাসুকি
বিকীরণ	বিকিরণ
ব্যতিত	ব্যতীত
ভাগিরথী	ভাগীরথী
মণীষি	মনীষী
মহিষি	মহিষী
রবিন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ
শশীভূষণ	শশিভূষণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সমীচিন	সমীচীন
সারথী	সারথি
সাংস্কৃতীক	সাংস্কৃতিক
হৃষিকেশ	হৃষীকেশ
(২) উ, ঊ	
অদ্ভূত	অদ্ভুত
অন্তর্ভূক্ত	অন্তর্ভুক্ত
অভিভুত	অভিভূত
অনুদিত	অনূদিত
আহুত	আহূত
উহ্য	ঊহ্য
উর্ধ্ব	ঊর্ধ্ব
দুর্বা	দূর্বা
ধুমায়িত	ধূমায়িত
নুপুর	নূপুর
পূণ্য	পুণ্য
বধু	বধূ
বিদূষী	বিদুষী
বিরূদ্ধ	বিরুদ্ধ
ভূল	ভুল
মধুসুদন	মধুসূদন
মুহুর্ত	মুহূর্ত
মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
স্ফুর্তি	স্ফূর্তি
সুচনা	সূচনা
সুত্রপাত	সূত্রপাত
সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
(৩) ণ, ন	
অনুমাত্র	অণুমাত্র
অণুচ্ছেদ	অনুচ্ছেদ
অপ্রানীপয়	অপ্রাপণীয়

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অহর্ণিশ	অহর্নিশ
কন্যারুপিনী	কন্যারূপিণী
ক্ষুন্ন	ক্ষুণ্ণ
ক্ষুণ্ণিবৃত্তি	ক্ষুন্নিবৃত্তি
ক্ষীয়মান	ক্ষীয়মাণ
চানক্য	চাণক্য
চিক্কন	চিক্কণ
দুর্ণাম	দুর্নাম
দুর্ণিবার	দুর্নিবার
নির্ণিমেষ	নির্নিমেষ
পুনর্ণবা	পুনর্নবা
প্রাংগন	প্রাংগণ
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ
সায়াহ্ণ	সায়াহ্ন
বণিতা	বনিতা
বাণপ্রস্থ	বানপ্রস্থ
বিনাপানি	বীণাপাণি
বিরহিনী	বিরহিণী
বীরাংগণা	বীরাংগনা
ভাণ	ভান
ভ্রাম্যমান	ভ্রাম্যমাণ
ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ
মৃণ্ময়	মৃন্ময়
রুপায়ন	রূপায়ণ
শূর্পনখা	শূর্পণখা
সর্বাংগীন	সর্বাংগীণ
স্থানু	স্থাণু
(৪) শ, ষ, স	
অষম	অসম
অষ্ফুট	অস্ফুট

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আবিস্কার	আবিষ্কার	স্বরস্বতী	সরস্বতী	চক্ষুদ্বয়	চক্ষুর্দ্বয়
কল্যানীয়েষু	কল্যাণীয়েষু	সান্তনা	সান্ত্বনা	দুঃশ্চিন্তা	দুশ্চিন্তা
কল্যানীয়াষু	কল্যাণীয়াসু	সার্থ	স্বার্থ	নিস্ব	নিঃস্ব
তিরষ্কার	তিরস্কার	স্বার্থক	সার্থক	বক্ষস্থল	বক্ষঃস্থল
নিসংগ	নিষংগ	(৬) য-ফলা		যশলাভ	যশোলাভ
নিস্ফল	নিষ্ফল	অচিন্ত্যনীয়	অচিন্তনীয়	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
পুরষ্কার	পুরস্কার	জৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ	শ্রেয়বোধ	শ্রেয়োবোধ
পরিস্কার	পরিষ্কার	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য	সদ্যচ্ছিন্ন	সদ্যশ্ছিন্ন
পরিষ্ফুট	পরিস্ফুট	পরিত্যাক্ত	পরিত্যক্ত	স্বঃ স্বঃ	স্ব স্ব
বহিস্কার	বহিষ্কার	বন্দ্যনীয়	বন্দনীয়	স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত	স্বত-উচ্ছ্বসিত
বিস্বাশ	বিশ্বাস	বাখ্যা	ব্যাখ্যা	(১০) ঁ (চন্দ্রবিন্দু)	
বিসম	বিষম	ব্যাথা	ব্যথা	একঘেঁয়ে	একঘেয়ে
বৃহষ্পতি	বৃহস্পতি	ব্যাক্তি	ব্যক্তি	কাঁচ	কাচ
সশ্য	শস্য	ব্যাবস্থা	ব্যবস্থা	খোঁকা	খোকা
সুসমা	সুষমা	বিদ্যান	বিদ্বান	গোঁড়া	গোড়া
স্পর্স	স্পর্শ	লক্ষ্যনীয়	লক্ষণীয়	ছুচ	ছুঁচ
আষ্পদ	আস্পদ	সমস্বা	সমস্যা	পাঁপড়ি	পাপড়ি
দন্তষ্ফুট	দন্তস্ফুট	(৭) তা-প্রত্যয়		বাঁটা	বাটা
প্রষংগ	প্রসংগ	ঐশ্বর্যতা	ঐশ্বর্য	ভিঁটে	ভিটে
(৫) ব-ফলা		উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	শাঁপ	শাপ
আয়ত্ব, আয়ত্ত্ব	আয়ত্ত	প্রসারতা	প্রসার	শুটি	শুঁটি
ইয়ত্বা	ইয়ত্তা	মৌনতা	মৌন	হাঁসি	হাসি
উচ্ছ্বল	উচ্ছল	সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য	হাঁসপাতাল	হাসপাতাল
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	(৮) তা-পূর্ববর্তী ঈকার		(১১) বিবিধ	
ধংশ	ধ্বংস	উপযোগীতা	উপযোগিতা	অত্যাধিক	অত্যধিক
পক্ক	পক্ব	গুণগ্রাহীতা	গুণগ্রাহিতা	আকাংখা	আকাংক্ষা
সর্বসত্ব	সর্বস্বত্ব	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত
সত্ত্বা	সত্তা	(৯) ঃ (বিসর্গ)		উচিৎ	উচিত
সত্বেও	সত্ত্বেও	অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়	কুৎসিৎ	কুৎসিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
জগত	জগৎ
জাত্যাংশে	জাত্যংশে
তড়িত	তড়িৎ
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
দুরাবস্থা	দুরবস্থা
পর্য্যটন	পর্যটন
পশ্বাধম	পশ্বধম
পৃথকার	পৃথগর
পৈত্রিক	পৈতৃক
পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য
প্রযুজ্য	প্রযোজ্য
প্রামাণ্য	প্রামাণিক
বর্ণছটা	বর্ণচ্ছটা
ব্যাধিগ্রস্থ	ব্যাধিগ্রস্ত
ভাগবৎ	ভাগবত
ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
মহিমাময়	মহিমময়
মুখস্ত	মুখস্থ
রুক্ষ্ম	রুক্ষ
লক্ষন	লক্ষণ
লজ্জাকর	লজ্জাকর
শক্র	শত্রু
সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ
সম্মান	সম্মান
সম্মুখে	সম্মুখে
সম্মন্ধে	সম্বন্ধে
সমৃদ্ধশালী	সমৃদ্ধিশালী
স্খালন	স্খলন
সাহার্য্য	সাহায্য
স্বচ্ছল	সচ্ছল

(১২) বিবিধ শুদ্ধ রূপ

অনটন, অনাটন

অবনি, অবনী
ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা
উদ্গিরণ, উদ্গীরণ
উষা, ঊষা
কান, কাণ
কাকলি, কাকলী
র, কুটীর
দ, কুসীদ
কেশর, কেসর
কৈকেয়ী, কৈকয়ী
কৃমি, ক্রিমি
খুড়ি, খুড়ী
গংগোত্রী, গংগোত্তরী
গার্হস্থ, গার্হস্থ্য
চিৎকার, চীৎকার
তুলি, তুলী, তূলি, তূলী
দম্পতি, দম্পতী
দাবি, দাবী
নিরব, নীরব
নিরস, নীরস

নিস্তব্দ, নিস্তব্ধ
নিহার, নীহার
পরিবেশ, পরিবেষ
পসরা, পশরা
পল্লি, পল্লী
পর্যটক, পর্যাটক
পাখি, পাখী
পুথি, পুঁথি
পূজারিনী, পূজারিণী
প্রতিকার, প্রতীকার
প্রত্যুষ, প্রত্যূষ
প্রবাহিনী, প্রবাহিণী
বশিষ্ট, বশিষ্ঠ
বাড়ি, বাড়ী
বিকশিত, বিকসিত
বীচি, বীচী
বেশি, বেশী
ব্যবহারিক, ব্যাবহারিক
ভিড়, ভীড়
ভংগি, ভংগী
ভ্রকুটি, ভ্রূকুটি
মঞ্জুষা, মঞ্জুষা
মিলন, মেলন
শেফালি, সেফালি
শরণি, শরণী, সরণি, সরণী
সম্মিলন, সম্মেলন
শক্ত, সক্ত
সোনা, সোণা
সৌহার্দ্য সৌহার্দ

ইতি